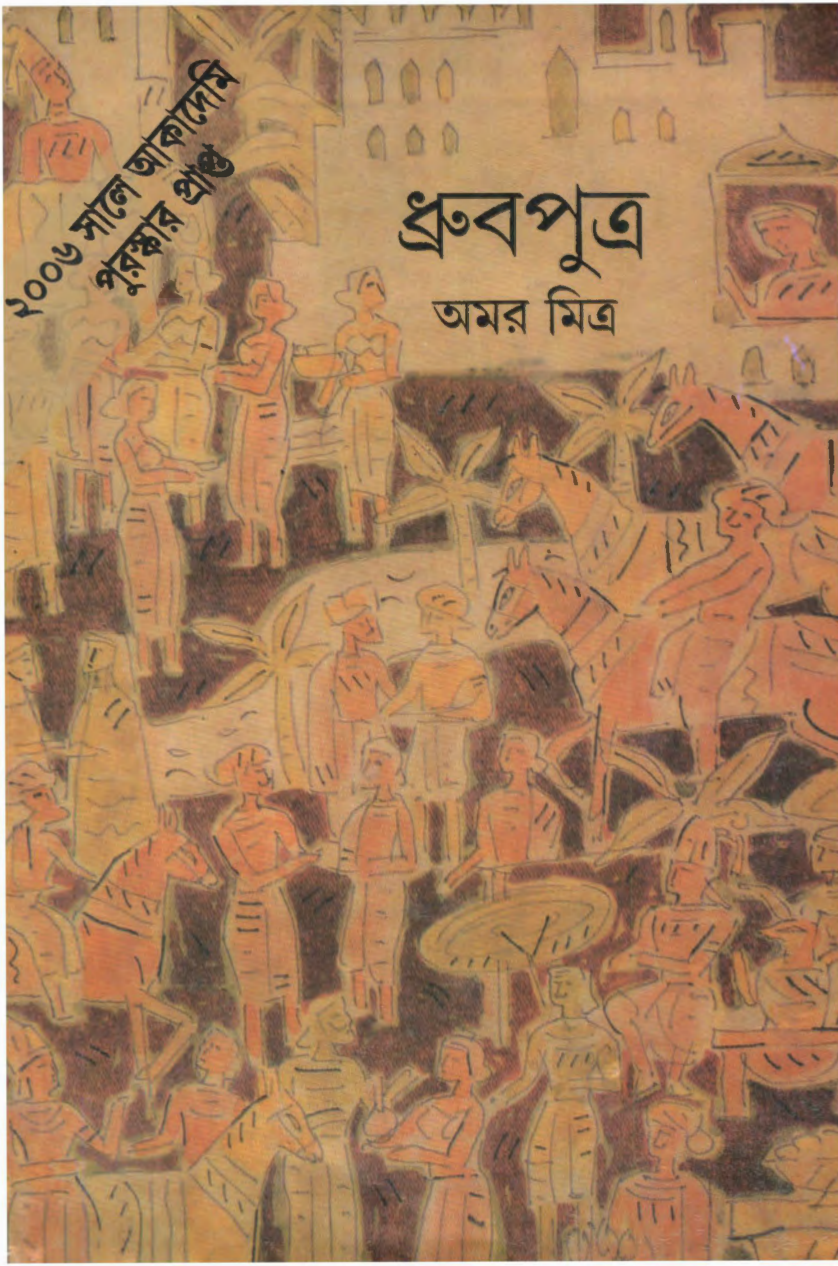


২০০৬ সালে আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত

ধ্রুবপুত্র

অমর মিত্র



জন্ম ৩০শে আগস্ট, ১৯৫১ খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমা (বর্তমানে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলা) শহরের সন্নিকটে ধূলিহর গ্রামে।
গ্রাম ও নগরের মানুষের ঐশ্বর্য হারানোর বেদনা মূর্ত হয় তাঁর রচনায়। তাঁর গল্প উপন্যাসের বিষয় ব্যাপ্ত। দূর মহারাষ্ট্রর ভূমিকম্প পীড়িত লাতুর, কিন্নারি যেমন তাঁর উপন্যাসের বিষয় হয় (নিসর্গের শোকগাথা), তেমনি বিষয় হয়ে আসে রাজপুত্র গৌতমের অশ্ব কন্থক, সারথী ছন্দক (অশ্বচরিত)।
'স্বদেশযাত্রা' গল্পের জন্য সর্বভারতীয় কথা পুরস্কার, ১৯৯৮। সমরেশ বসু পুরস্কার, ১৯৯২। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন পুরস্কার, ১৯৯১। 'অরুন্ধতী তারার রাত' উপন্যাস-এর জন্য অমৃতলোক পুরস্কার, ২০০২। অশ্বচরিত উপন্যাসটি ২০০১ সালের বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত।
২০০৬ সালে আকাদেমি পুরস্কার পান 'ধ্রুবপুত্র' উপন্যাসের জন্য।
এই উপন্যাস-ধ্রুবপুত্র গত সাতবছর ধরে নির্মাণ করেছেন লেখক প্রাচীন ভারতের পটভূমিতে। উজ্জয়িনী নগর, শিপ্রানদীর পটভূমিতে নির্মিত এই উপন্যাস সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে, সময়ের ধূসরতায় কল্পনারও অগোচরে যা থেকে গেছে এতকাল।

সাহিত্যের মত ওপথের যেমন নির্দিষ্টতা নেই, বিষয় ও তেমনি অফুরান। এই উপন্যাসের পটভূমি প্রাচীন ভারতের নগর উজ্জয়িনী, শিপ্রা নদী আর তার চারদিক—পশ্চিমের সৌরাষ্ট্র, মরুদেশ, উত্তর-পশ্চিমের সিন্ধুনদ, পুরুষপুর, গান্ধার বাহ্লিক দেশ, হিন্দুকুশ পর্বতমালা, অক্ষাস নদী, দক্ষিণের বিদিশা নগর, পূবের পাটুলিপুত্র থেকে লোহিত্যনদ—যেন সমগ্র ভারতবর্ষই। এই উপন্যাস সেই সময়ের কথা যে সময় আছে কালের ধূসর ছায়ার ভিতরে মুখ লুকিয়ে। উজ্জয়িনী নগরে প্রচলিত একটি লোককথা এই উপন্যাসের মূলসূত্র। সেই লোককথা বিস্তারিত হয়েছে মেঘ-নির্ভর ভারতবর্ষের হৃদয়ের কথায়। বাস্তবকে বাস্তবতার ইন্দ্রজালে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন কল্পনাপ্রবণ এই লেখক। দেবদাসী, গণিকা, রাজরানী থেকে সামান্য গৃহবধূ, গ্রামবালিকা, শূদ্রনারী, শূদ্র, নিষাদ—এক ভারতবর্ষ তার সময়ের চিহ্ন নিয়ে ধূসরতা থেকে জেগে উঠেছে উপন্যাসের বাস্তবতায়। ধ্রুবপুত্র নির্বাসিত, তাই নগর যেন অন্ধ হয়ে যায়—আশ্চর্য এক নির্বাসন ও প্রত্যাবর্তনের কথা এই সৌন্দর্যময় আখ্যানে বিস্তৃত হয়েছে আলো-ছায়ার বিস্তারের মতো, ধ্রুপদী সঙ্গীতের মতো।

ধ্রুবপুত্র

[২০০৬ সালের আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত]

অমর মিত্র

ISBN-81-8437-040-7

প্রথম সংস্করণ ঃ কলকাতা বইমেলা, ২০০২
দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি, ২০০৭
তৃতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি, ২০০৮
চতুর্থ মুদ্রণ এপ্রিল, ২০১১
পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ, ২০১৪
ষষ্ঠ মুদ্রণ নভেম্বর, ২০১৭

প্রচ্ছদ ঃ সুব্রত চৌধুরী

করুণা প্রকাশনীর পক্ষে ১৮এ টেমার লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে শ্রী বামাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, বর্ণ সংস্থাপনে রেজ ডট কম ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ এবং শিবদুর্গা প্রেস, ৩০বি, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলকাতা-৬ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ঃ ৪৫০.০০

যাঁরা বাঁচেন কিংবদন্তীর ভিতরে,
এই উপমহাদেশের সেই সব মানুষজনকে

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

অশ্বচরিত (বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত)
অরুন্ধতী তারার রাত
সুবর্ণরেখা
আগুনের গাড়ি
নদীবসত
জনসমুদ্র
খরাবন্যার ফুল
ধুলোগ্রাম
কৃষ্ণগহ্বর
নিসর্গের শোকগাথা
হাঁসপাহাড়ি
এখন মৃত্যুর ঘ্রাণ
সমাবেশ
নীল প্রহর
কাঁটাতার
শ্রাবণ অগ্রহায়ণ
নিরুদ্দিষ্টের উপাখ্যান
আসনবনি
বসন্ত বিলাস
অমর মিত্রর ছোটগল্প
পাঁজর
স্বদেশযাত্রা
চাঁদুগায়েনের ডাকতধরা
ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে (মনোজ মিত্রর সঙ্গে)

আজ দীপাবলী। বিশালার ঘরে ঘরে ধনদাত্রী লক্ষ্মীর আরাধনা, অলক্ষ্মীর বিদায়। সন্ধ্যায় এই বিশালা নগর—অবন্তী দেশের রাজধানী উজ্জয়িনী, কণকশৃঙ্গ মহাকালেশ্বর মন্দির, দুই নদী শিপ্রা, গন্ধবতীর বুক দীপের আলোয় আলোকিত হবে। অবন্তী দেশের প্রতিটি গৃহের দুয়ারে, বাতায়নে প্রদীপ জ্বলবে। আজ দীপোৎসব, আলোকোৎসব, কোথাও কোনও অন্ধকার থাকবে না। সারাদিন রাজপথে মানুষ হাঁটবে। ঘরে ঘরে গীতবাদ্য, গণিকালয়ে নুপুরধ্বনি, বীণা, বল্লকী মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনি—নগরের হিমেল বাতাস ভারী হয়ে উঠবে পুষ্প, অগুরু, চন্দন, ধূপ এবং সুরার গন্ধে।

হাট বসে গেছে দীপাবলীর। ক্রেতা বিক্রেতার সংখ্যা ক্রমশ অধিক হয়ে যাওয়ায় হাট বিস্তৃত হতে হতে শিপ্রা নদীর পূর্ব তীরে এসে থমকে গেছে। উজ্জয়িনীর মেলায় আজ নানারকম মানুষ, দেশবিদেশের বণিক, ব্যাপারি। এই অবন্তী দেশের পশ্চিমে অপরা-সমুদ্রের দুই বন্দর, বারুগাজা এবং শূর্পারক থেকে আসা যবন বণিকের দল। দূর সমুদ্র তীরের দ্রাক্ষাবীথির দেশ থেকে এসেছে তারা। এসেছে সার্থবাহ, দূর উত্তর-পশ্চিম থেকে, বাহ্লিক, গান্ধার, পুরুষপুর, কম্বোজ দেশ থেকে, সিন্ধুতীর হতে। বাহ্লিক দেশের সুখ্যাত পীত বর্ণের রেশম, কম্বোজের বেগবান অশ্ব নিয়ে। তাদের সঙ্গেই এসেছে উত্তর দেশ থেকে টাঙ্গন ঘোড়া, কম্বল, কাঁচা হলুদ, কাঁচা সোনার গয়না, নানা বর্ণের পাথর। এসেছে মগধ, কোশল, কলিঙ্গ, বঙ্গ, অপরান্ত দেশ থেকে নানা ব্যাপারি নানা পণ্যদ্রব্য নিয়ে। উজ্জয়িনীর হাট থেকে তারা নিয়ে যাবে নানা মণিমাণিক্য, রত্নসামগ্রী, চন্দন, রঙিন সুতীবস্ত্র, অতি সূক্ষ্ম মসলিন, কবুতর, ময়ূর, আরো নানা পণ্য। ক্রয়বিক্রয় জমে উঠেছে ক'দিন ধরেই। দীপাবলীর সকালে ক্রেতা বিক্রেতা, দর্শনার্থীর হাঁকডাকে হাট রমরমা। কামারশাল, কাঁসারির দোকান, শঙ্খের দোকান থেকে বিচিত্র শব্দ উঠছে ঠং ঠং, ঘর্ঘর, সাঁই সাঁই। সেই সব শব্দ মিশে যাচ্ছে মানুষের কণ্ঠস্বরের ভিতর।

বৃদ্ধ শিবনাথ, এই নগরের দুই যোজন পশ্চিমে গম্ভীরা নদীর কূল থেকে দীপাবলীর মেলায় এসে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই বণিককে, যে শূর্পারক বন্দর থেকে এসেছিল গেল ভাদ্রমাসের শেষে, যে নাকি শূর্পারক বন্দরেই দেখেছিল এক নবীন যুবককে, যার চোখের মণি নীল, গাত্রবর্ণ গ্রীসদেশীয় মানুষদের মতো গৌর, উচ্চতা ততটা নয়, মাথার ঘনকালো চুল অযত্নে লালিত, কাঁধ ছুঁয়েছে প্রায়, গালময় দাড়ি। গায়ে একটি শ্বেতবর্ণের রেশম চাদর, পরণে শিউলি ফুলের নির্যাসে রঞ্জিত সুতীবস্ত্র। এই খবর প্রোষ্ঠপদ মাসের শেষের। সে রঙিন বস্ত্র নিতে এসেছিল উজ্জয়িনীতে। অর্ণবপোতগুলির ছাড়ার কথা আশ্বিনের মাঝামাঝি। এ বৎসরও বর্ষা নেই। দক্ষিণ পশ্চিমের অনুকূল বাতাসের বেগও কম। তবু সেই ধীরগামী বাতাসে ভর করে পশ্চিমের অর্ণবপোত আসছে। এখন উত্তরপুবের বাতাস শুরু হয়ে গেছে। অর্ণবপোতগুলি ফিরছে নিজদেশে। শিবনাথ খুঁজছিল সেই ব্যাপারিকে। সে আসলে কোশল দেশের মানুষ, শূর্পারক বন্দরেই পড়ে থাকে ব্যবসার কারণে। দীপাবলীর মেলায় আসবে বলেছিল যবন বণিকদের সঙ্গে। সংবাদও আনবে। যদি পারে তাকে সঙ্গে করেই ফিরবে। সেই যুবককে। সে যে উজ্জয়িনীর সন্তান তা জানবে কী করে মণিভদ্র, সোপারা বন্দরের ব্যাপারি?

গলা থেকে পা পর্যন্ত দীর্ঘবস্ত্র পরিহিত বনায়ু দেশের যে বণিকেরা উজ্জয়িনীতে আসে, তারা বারংবার আসায় মালবীয় ভাষায় বেশ সড়গড়। যে তরুণ বণিক প্রথম এসেছে মহাকালেশ্বরের আশীর্বাদধন্য এই সোনার দেশে, তাকে সাহায্য করেছে তার সহযাত্রীরা। শিবনাথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল সেই মণিভদ্রকে। তার কথা কেউ বলতে পারেনি। যবন বণিকেরা এ ওর মুখের দিকে তাকিয়েছে। শিবনাথের বয়স ষাটের নিকটবর্তী, মাথার চুলের প্রায় সবটাই সাদা, গালে পাকাদাড়ি, চক্ষু দুটি ঘোলাটে, তার উজ্জ্বলতা ক্রমশ কমে যাচ্ছে মুখমণ্ডলের অন্ধকারে। মধ্যম উচ্চতার মানুষ শিবনাথের গায়ে একটি মৃগরোমের চাদর, মলিনবর্ণ, নগ্নপদ। ভোরবেলায় বেরিয়েছে বৃদ্ধ, তখন পূর্ব আকাশে আলোর আভাস ফুটেছিল। চরাচর

হিমনীল, মুক্তাবর্ণ। হাঁটতে হাঁটতে সূর্যোদয় দেখেছে এক বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে। জোয়ার এবার হয়নি ভাল। বর্ষাকালটি মেঘহীন গেছে প্রায়। মরা, আধমরা জোয়ারের ক্ষেতে দাঁড়িয়ে সে দেখেছিল গাছগাছালির আড়ালে ঘুমিয়ে থাকা সূর্যদেব উঠে আসছেন উপরে। মনে পড়েছিল বন্ধুপুত্রের কথা। কতদিন দেখেছে শিবনাথ, গম্ভীরার তীরে দাঁড়িয়ে উজ্জয়িনী নগর, মহাকালেশ্বর শিবের অধিষ্ঠানের দিকে তাকিয়ে দুটি হাত জোড় করে সূর্য বন্দনা করছে সে—

ওঁ জবাকুসুমশঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম
ধ্বন্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম

শিবনাথ বৈশ্য সম্প্রদায়ের। তার অকাল প্রয়াত বয়স্য ছিল ক্ষত্রিয়। ধ্রুব ক্ষত্রিয় সন্তান হলেও রাজসভা, সেনাবাহিনী প্রায় ত্যাগ করে উজ্জয়িনীর বণিক সুভগ দত্তের সঙ্গে বাণিজ্যে নেমেছিল। তার পুত্রটির বাণিজ্যে মন ছিল না, কৌতূহল ছিল। সে ছিল বিদ্বান, সর্বশাস্ত্রেই তার অধিকার নাকি সে ক্রমশ প্রতিষ্ঠা করছিল। ক্ষত্রিয় সন্তান তার হৃত অধিকার যেন ফিরে পাচ্ছিল। এখনো মনেমনে অবাক হয়, বাউন্ডুলে, প্রায় বোধহীন ধ্রুবের পুত্র কীভাবে এমন হলো! বঙ্গ, কলিঙ্গ, শূর্পারক, বারুগাজা এই সব দেশ, বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়াত সে। অপরা সমুদ্র, পূর্ব সমুদ্র, দক্ষিণ সমুদ্র, রেবা, তাপ্তি নদী, মলয় চন্দনাদ্রি পর্বত—পাগল, পাগল ছিল ধ্রুবসখা।

মণিভদ্রর কথা বলল একজন। সে পাটুলিপুত্র থেকে ব্রীহিধান্য নিয়ে এসেছে উজ্জয়িনীতে। তার সঙ্গে নাকি দেখা হয়েছিল কোশলদেশের ওই ব্যাপারির, সে যাচ্ছিল বঙ্গদেশে, সেখানে উত্তরপূর্বের লৌহিত্য নদের কূল থেকে গুবাক এনে অপেক্ষা করবে এক ব্যাপারি। গুবাক নিয়ে সে শূর্পারকে ফিরবে। এই দীপাবলীতে আর উজ্জয়িনীর পথে আসা হলো না তার।

পাটুলিপুত্রের ব্যাপারির নাম বৃকোদর। দ্বিতীয় পাণ্ডবের মতোই তার চেহারা। মস্ত শরীর, তামাটে বর্ণ, মাথার চুল অনেকটাই অন্তর্হিত হয়েছে সামান্য এই বয়সেই। মানুষটি যথেষ্ট কৌতূহলী, জিজ্ঞেস করল, কেন, তাঁর খোঁজ কেন, সে কি ঋণ শোধ করেনি?

মাথা ঝাঁকায় বৃদ্ধ, না, না, শুনুন আপনি তো নানা জায়গায় ঘোরেন, দেখেছেন কি এমন কোনো যুবককে ...। ধ্রুবপুত্রের রূপ বর্ণনা করল শিবনাথ। লোকটি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, বলে, কত মানুষই তো দেখি। তাদের মধ্যে ঠিক এই রকম ও যে নেই তা নয়, কিন্তু সে কে? কার কথা বলছেন?

শিবনাথ বলে, ওই মণিভদ্র, যদি দেখা হয়, বলবেন তার অপেক্ষায় ছিলাম আমি, যার কথা বললাম, যে যুবকের কথা, তার খোঁজ আনবে বলেছিল মানুষটা।

বৃকোদর বেশ ভাল মানুষ, বলল, আমিও খোঁজ করব, কিন্তু কী ব্যাপার বলুন দেখি সে কি আপনার পুত্র?

পুত্রের মতো, হয়ত তার চেয়েও বেশি, এই অবন্তী দেশ ছেড়ে চলে গেছে সে অভিমানে।

কেন?

শিবনাথ চুপ করে আছে। এই এক হাট লোকের মধ্যে সেকথা কি বলা উচিত? কতরকম মানুষ ঘুরছে, কোন কথা কার কানে চলে যাবে ঠিক কী। এখন তো বেচাকেনার সময়ও, বৃকোদরের কর্মচারী যদিও আছে বেশ কয়েকজন, তিনটি গো-শকট নিয়ে সে তার পণ্য এনেছিল, সেই পণ্যের বেশিরভাগ যদিও নিঃশেষিত, তবুও তার ব্যস্ততা তো আছেই। কিন্তু বৃকোদর শুনতে চাইছে। আবার জিজ্ঞেস করে কথাটি। শিবনাথের মুখে ক্লিষ্ট হাসি ফোটে, বিড়বিড় করে সে তার বয়স্য ধ্রুব সখার কথা বলে, ধ্রুবপুত্রের সামান্য পরিচয় দেয়।

বৃকোদরের কৌতূহল আরো বাড়ে। না ধ্রুবপুত্র নয়, ধ্রুব সম্পর্কে। কৌতূহল বাড়ারই কথা, ক্ষত্রিয় সন্তান, বাণিজ্যে মত্ত হয়েছিল যুদ্ধবিদ্যা ছেড়ে। কী কী বাণিজ্য করত, কোন পণ্য, কী রকম দর। লোকটির মাথা নিতান্তই মোটা। ধ্রুব মারা গেছে বছর পঁচিশ। তখন অবন্তী দেশের রাজা ছিলেন রাজা ভর্তৃহরির পিতা গন্ধর্ব সেন। আজকের কথা তো নয়। তখনকার দর শুনে করবে কী?

বৃকোদর বলল, আপনি কি জানেন যবন বণিকরা গুবাককে কী বলে, তারা জানে গুবাক বুঝি শূর্পারক বন্দরের ফল।

ঠোঁটের কোণে হাসি ফোটে শিবনাথের, এও কি আজকের কথা, ধ্রুবই তো বলেছিল, গুবাক নাকি শূপারি নামে চিহ্নিত হয়ে গেছে ওই সব যবন দেশে। অপরা সমুদ্রের কোলে এসেই পূর্বদেশীয় এই ফল তার নাম বদলে ফেলে। বৃকোদর কথাটি এই সদ্য শুনেছে পথিমধ্যে, ওই শূর্পারক বন্দরের ব্যাপারি মণিভদ্রর মুখে। কোথায় দেখা হয়েছিল? না বিদিশা নগরে। এক পান্থশালায় রাত্রি যাপন করেছিল দুই ব্যাপারি। বৃকোদর বলল, যদি ফেরার পথে আবার দেখা হয় বিদিশায়।

হাসি আসে শিবনাথের মুখে, তাহলে বিদিশায় অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে বৃকোদরকে। মণিভদ্র, যদি সেই ব্যাপারিই হয়, পূর্বদেশ থেকে ফিরতে বহু সময় নেবে। কম দূর নাকি? আর যদি অন্য পথে ফেরে, সমুদ্র উপকূল ধরে নেমে এসে—না, হয়ত হবে না, পাটুলিপুত্র হয়ে এই দিকে আসাই বোধহয় নিরাপদ পথ। ঠিক ধারণা নেই শিবনাথের। অবন্তী দেশ ছেড়ে বেরোয়নি সে কখনো। আর অবন্তীরই বা কতটা দেখেছে? বিদিশা নগরে ও তো যায়নি কখনো। চাষবাস নিয়েই কেটে গেছে জীবন। গম্ভীরা, উজ্জয়িনী, এইটুকু পথের যতগুলি গ্রাম, শিপ্রা, গন্ধবতী নদী, সপ্তসরোবর, এইটুকুই তার পৃথিবী। শুনেছে বিদিশা দক্ষিণপুবে, কম্বোজীয় অশ্বে গেলে দিন পাঁচ ছয়, এই গো-শকটে একপক্ষেও পৌঁছানো যাবে না। বৃকোদর আবার বলে, যখন বাণিজ্যে নেমেছি মহাশয়, দেখা তো হবেই, আমিও ভাবছি শূর্পারক বন্দরে যাব একবার এখান থেকে জোয়ার নিয়ে, না এবারে হবে না, আমি আবার কি না পিতা হতে যাচ্ছি।

বাহ্, এ তো অতি সুসংবাদ, এই প্রথম?

হ্যাঁ, মহাশয়, আমাকে ফিরতে হবে পাটুলিপুত্র, পাটুলিপুত্রের কাছেই আমার গ্রাম, এবার তাহলে মণিভদ্রর সঙ্গে দেখা হবে না বলছেন?

যেন কত কালের চেনা এই মানুষটি, এমন ভাবে কথা বলছে বৃকোদর। মণিভদ্রর সঙ্গে বিদিশায় দেখা হতে পারে না—এই কথা শুনে বিষণ্ণই হয়েছে যেন মানুষটি। বলছে, দেখা হলে খুব ভাল হত, যবন বণিকদের সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারলে লাভ প্রচুর হয় এই কথা শোনা যায়। কিন্তু সে ভয়ই পায় তাদের। পাটুলিপুত্র থেকে বিদিশা, উজ্জয়িনী আসতে দ্বিধা হয় না, কিন্তু বন্দরে গিয়ে ভিনদেশীদের সঙ্গে ব্যবসা করার সাহস থাকা চাই। সে বিদিশা থেকে আসতে আসতে ভেবেই রেখেছে মণিভদ্রর সাহায্য নেবে। মহাশয় কি জানেন, মণিভদ্র যবন ভাষাও জানে।

শিবনাথ চুপ করে আছে আবার। কী করে জানবে সে? মণিভদ্রর সঙ্গে তার একদিন মাত্র কথা হয়েছিল। আচমকা দেখা হলে চিনতেও পারবে না বোধহয়, তবে হ্যাঁ মনে পড়ে যাবে হয়ত, বিশেষত ধ্রুবপুত্রের খোঁজের জন্য তার নামটি সে যেভাবে মনে রেখেছে। বৃকোদর বাণিজ্যে নেমেছে এই প্রথম। তার উৎসাহ তাই খুব বেশি। ব্রীহিধান্য বিক্রয় করে লাভও করেছে কম নয়। বিদিশাতেও দুই শকট খালি করেছে। এখানে পাটুলিপুত্রের আরো ব্যাপারি এসেছে। আগামী কালই রওনা হবে সবাই এক সঙ্গে।

শিবনাথের মনে পড়ল গন্ধবতীর জন্য কিছু নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। কী নিয়ে যাবে? ধ্রুবপুত্র এই অবন্তী দেশ ত্যাগ করার পর শিবনাথের পিতৃহারা পৌত্রী গন্ধবতীর আনন্দময়ী ভাবটি চলে গেছে। প্রোষিতভর্তৃকা পুত্রবধূ রেবা, তার কন্যা গন্ধবতী— দীর্ঘশ্বাস ফেলল বৃদ্ধ। পাঁচটি বৎসর পার হয়ে গেল দশপুরার যুদ্ধের পর। সেই যে যুদ্ধে গেল কার্তিককুমার, হুণ বিজয় করে ফিরল অবন্তীর সেনাবাহিনী, ফিরল না সে। উৎসবের দিনগুলিতে শূন্যতা যেন আরো গভীর হয়ে ওঠে, আরো ব্যাপ্ত হয় চতুর্দিকে।

শিবনাথকে লক্ষ্য করেছে বৃকোদর, কী হলো মহাশয় আপনার?

কিছু না, ফিরতে হবে তো, অনেকটা সময় লাগবে, যেতে যেতে সূর্যদেব মাথায় উঠে যাবেন, কিছু কেনাকাটা আছে।

কিন্তু মণিভদ্রকে কী বলব তা তো পরিষ্কার করে বললেন না।

আশ্চর্য! যেন মণিভদ্রর সঙ্গে ওর দেখা হবেই, এবং তা বিদিশা নগরের সেই পান্থশালায়। বিদিশা থেকে মণিভদ্র তার কথা শুনে চলে আসবে উজ্জয়িনীতে। কবে দেখা হবে ঠিক নেই, দেখা হবে কিনা ঠিক নেই .....। বৃকোদরকে শিবনাথ বলে, বলবেন, উজ্জয়িনীতে তার জন্য অপেক্ষা করছে একজন।

সেই যে যুবকের কথা বললেন আপনি?

হ্যাঁ, তার খবর চাই, তাকে সে দেখেছিল নাকি শূর্পারক বন্দরে।

সে সমুদ্র যাত্রা করেনি তো?

ভীত হল শিবনাথ। বিহ্বল মুখে তাকিয়ে থাকল বৃকোদরের মুখের দিকে। এই ভাবনা তার ভিতরেও যে উঁকি মারেনি তা নয়, কিন্তু সযত্নে তাকে পরিহার করেছে বৃদ্ধ। তবে কিনা বন্দরে গেছে যে, সে তো চলেও যেতে পারে এই ভূখণ্ড ছেড়ে। মণিভদ্র কোনো খবর দেয়নি। কে জানে কোথায় ধ্রুবপুত্র!

বৃকোদর বলল, আমারও ইচ্ছে করে যবনদের দেশটি দেখে আসি, ওই দেখুন মহাশয়, শুনছিলাম বাহ্লিক থেকে এসেছে, যবন বণিক, রঙটা পুড়ে গেছে, তবু কী সুন্দর চেহারা, চুল দেখেছেন রেশমের মতো, রেশমই যেন, বাহ্লিক দেশের রেশম দিয়ে যেন তৈরি, ওদের আসল দেশ নাকি সমুদ্রপারে?

শিবনাথ শুনছে। এসব কথায় তাল দিতে পারত ধ্রুবপুত্র। সে এসবের কোনো খোঁজই রাখে না। মনে বিষণ্ণতা এলো। ধ্রুবপুত্র কত খোঁজই না রাখত। এই যে বৃকোদর মানুষটি, সত্য বলছে না অর্ধসত্য, অজানা কথা বলছে তা বলে দিতে পারত সে।

বৃকোদর বলে, এখনো যখন ফেরেনি, প্রোষ্ঠপদ, আশ্বিন, কার্তিক, সে বোধহয় সমুদ্রযাত্রাই করেছে, শুনলাম বিদিশার এক যুবক যবনদেশে চলে গেছে ভাগ্য অন্বেষণে।

শিবনাথ বিপন্ন হলো মনে মনে। লোকটির সঙ্গে আলাপ না হলেই যেন ঠিক হতো। এখন তো ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে। ধ্রুবপুত্র তো প্রোষ্টপদে যায়নি, গেছে গত বসন্তের আগের বসন্তের শেষে, চৈত্রপূর্ণিমার রাতে, সেদিন ছিল কামদেবের পুজা, রঙের উৎসব। তার আগে সে অপমানিত হয়ে চলে এসেছিল উজ্জয়িনী থেকে। যাঁর আশ্রয়ে ছিল, শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত, তিনিই ওকে নগর ত্যাগ করতে বলেছিলেন তাঁর কামনার রমনী গণিকা দেবদত্তার প্রতি তার আকাঙ্ক্ষার কথা জানতে পেরে। শিবনাথ এবার যাবে।

আমি আছি আজ সারাদিন, বৃকোদর বলল, তারপরেই যেন মনে পড়ল তার, হ্যাঁ, তা তো বললেন না কেন সে ত্যাগ করেছে অবন্তী দেশ?

শিবনাথ বলল, থাক এখন, মণিভদ্রর কাছে শুনে নেবেন।

বৃকোদর বলল, দাঁড়ান আর একটু।

মাথা নাড়ে শিবনাথ। গন্ধবতীর জন্য কী কিনবে সে? মুক্তা মালা। অনেক দাম। দশ রকমের মুক্তার কেনাবেচা হয় উজ্জয়িনীতে। তাম্রপর্ণী নদীর মুক্তা, মলয়কোটি পর্বতের মুক্তা, পাশিক্য নদীর মুক্তা, সিংহল দেশের কুলা নদীর মুক্তা থেকে হিমালয় পর্বতের মুক্তা হৈমবত। মুক্তা বিপণির দিকে যেতে হয় তাহলে। পৌত্রীর মুখে হাসি ফেরাতে একটি মুক্তাহার নিয়ে যাবে বলে প্রস্তুত হয়েই এসেছে বৃদ্ধ। ভীড় ঠেলে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরোতে হলো তাকে। এত মানুষের ভিতরেও ছোট একটি টাঙ্গন অশ্বে চেপে রাজসভার কর্মচারী উদ্ধবনারায়ণ ঢুকে পড়েছে হাটের ভিতর। শিবনাথের কাঁধে হাত দিয়ে তাকে থামিয়ে ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামল, আপনি এসেছেন খুড়ো মশায়, আমি তো আপনারই খোঁজ করছি।

আশায় মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল শিবনাথের। তাহলে কি উদ্ধবনারায়ণ খবর এনেছে ধ্রুবপুত্রের? নাকি এতকাল বাদে হুণ বিজয় থেকে না ফেরা কার্তিককুমারের খবর এল? অশ্বের বল্গা ধরে টানতে টানতে উদ্ধব জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছেন আপনি, আপনার সঙ্গে আমার খুব দরকার।

ধ্রুবপত্রের খবর—? অস্ফুটস্বরে বলল শিবনাথ।

সেই দুরাচারের খবর, কৃতঘ্ন।

একথা কেন বলছেন?

উজ্জয়িনী নগরবাসী এখনো অসন্তুষ্ট হয়ে আছে তার উপরে, শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত যে কী আঘাত পেয়েছেন তা তো জানেন না, রাজসভায় খবরটি যায়নি, তাহলে হয়ত আপনারই ডাক পড়ত মশায়, তবে হ্যাঁ আপনি ভয় পাবেন না, আমি তো সব জানি—, চলুন ওই অশোক গাছটির নিচে ঘোড়াটিকে বেঁধে কথা বলি।

দুই

রাজসভার কর্মচারী বলেই উদ্ধবনারায়ণের হাঁকডাক বেশি। ক্ষমতার অতিরিক্ত ক্ষমতা সে ধরে কিনা সেই পরীক্ষা হয়নি। কিন্তু সে তো বলে তাই। খর্বাকার মানুষ, গায়ে পীতবর্ণের রেশম চাদর, তার উপরে মেষ রোম থেকে তৈরি বক্ষবাস। মাথায় নীলবর্ণের রেশমী শিরস্ত্রাণ, কোমরে পুণ্ড্রদেশীয় শ্যামবর্ণের রেশম বস্ত্র। উদ্ধবনারায়ণের চক্ষু দুটির দিকে তাকালেই ধরা যায় চাতুর্য ব্যতীত অন্য কোনও ভাব সেখানে নেই।

কী কাজ করে উদ্ধব, জানে না শিবনাথ। তবে তার সন্দেহ হয় উদ্ধব হয়ত রাজার সত্রি, গুপ্তচর। উদ্ধবনারায়ণের গ্রাম গম্ভীরা নদীর ওপারে। পথটি শিবনাথের গৃহের পাশ দিয়ে। বৎসর কয়েক আগেও দেখেছে শিবনাথ, মলিন বেশে উদ্ধব যাচ্ছে নগরের পথে। ফিরছে হতোদ্যম হয়ে। আচমকা সুযোগ পেয়ে গেছে। কথা বলে তো চমৎকার। কিন্তু তার জন্য উদ্ধব এখানে আসবে কেন? শিবনাথের সঙ্গে তার কীই বা সম্পর্ক? নদী পার হয়ে যায় উদ্ধবনারায়ণ এইটুকু চোখে দেখেছে সে। আগে, যখন সে উজ্জয়িনীর পথে যেত, কখনো হয়ত দাঁড়াত জমির ধারে। শিবনাথ জমিতে এখন নামতে পারে না, মাথা ঘোরে, জমি অন্য চাষী চষে, অর্ধেক ফসল নিয়ে বাকিটা তাকে বুঝিয়ে দেয়। সেই ফসল ভাগ দেখেছে দাঁড়িয়ে।

উদ্ধব তার ঘোড়াটিকে অশোক গাছে বাঁধে না। হাতে বল্গা ধরে শান্ত করছে ঘোড়াটিকে, কিন্তু কেনাবেচার হই-হল্লায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে তিব্বতি ঘোড়া।

বারংবার ঘোড়াটির তেজ নিয়ন্ত্রণ করে উদ্ধব তার ব্যক্তিত্বকে বৃদ্ধের সামনে বড় করে তুলতে চাইছে, বলল, সময় খুব কম, আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?

এই তো বিপনির দিকে।

কার সঙ্গে কথা বলছিলেন যেন?

পাটুলিপুত্রের এক ব্যাপারির সঙ্গে, ব্রীহিধান্য এনেছে।

ক্রয় করবেন?

মাথা নাড়ে শিবনাথ, না, এমনি খোঁজ নিচ্ছিলাম।

কী খোঁজ নিচ্ছিলেন? বলে না পেরে ঘোড়াটিকে অশোক গাছে বাঁধতে থাকে উদ্ধব, বলে, খুব তেজি ঘোড়া, বুঝলেন তো তিব্বত দেশের, তবে এর চেয়েও তেজি কম্বোজের ঘোড়া, সেই ঘোড়া দেবে রাজসভা থেকে, প্রধান সেনাপতি খুব অনুরাগী আমার, জানেন তো ক'দিন আগে একটি গুপ্তচর ধরা পড়েছে, সে দেবপথ খুঁজছিল, জানেন কি এসব?

মাথা নাড়ে শিবনাথ। সে কিছুই জানেনা। না জেনে বেশ চলে যায় জীবন। কিন্তু ভাগ্যদোষে এখন সে বিপন্ন। পুত্রটি নেই, পুত্রশোক ভুলেছিল যাকে নিয়ে সেও নেই।

উদ্ধব বলে, লোকটির নাম কী বলুন তো?

বৃকোদর, পাটুলিপুত্রের লোক।

অচেনা, অন্য রাজ্যের মানুষের সঙ্গে কথা বলেন কেন?

ভীত চোখে উদ্ধবের দিকে তাকিয়ে আছে শিবনাথ। এই কি সেই যুবক, যে দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে ফসলভাগ দেখত। তার কাছে পরামর্শ নিয়েছিল বিনা করে জমি কী করে পাওয়া যায় রাজার কাছ থেকে। জমি নিয়ে সে অন্য কৃষক দিয়ে ফসল ফলাবে। উদ্ধবনারায়ণ যেন আবার জন্ম নিয়েছে এই পৃথিবীতে। জগতে কী না হয়। উদ্ধব তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা করছে।

বৃকোদরের সঙ্গে কী কথা বলছিলেন?

শূর্পারক বন্দরের এক বণিক মণিভদ্র—! কথাটা বলেই নিজেকে সামলে নেয় শিবনাথ। উদ্ধব কেন এত জিজ্ঞাসা করছে? জিজ্ঞাসার ধরণটিও তো ভাল নয়। সব কথার উত্তরই বা দিতে হবে কেন? সে তো উদ্ধবের কাছে কোনো বিষয়ে ঋণী নয়। উদ্ধবের কাছে সাহায্য চেয়েছে কী? হ্যাঁ, গত শ্রাবণ মাসে একবার বলেছিল বটে রাজসভায় যেতে হবে, সীতাধ্যক্ষের কাছে আবেদন জানাবে একটি বিষয়ে। কী বিষয় তা বলেনি উদ্ধবকে। উদ্ধবের শোনার সময়ও হয়নি। তারপর ব্যাপারটি আর এগোয়নি।

কে মণিভদ্র?

এক বণিক, কোশল দেশের মানুষ।

কে কোথায় কী করছে তা তো জানা সম্ভব নয়। বিড়বিড় করল উদ্ধব, কিন্তু এভাবে যার তার সঙ্গে যোগাযোগও ঠিক নয়, কে ভাল কে মন্দ তা কি জানেন আপনি?

উদ্ধবের কণ্ঠস্বর ঈষৎ ধারালো, বাঁকা, ভল্লের মতো যেন বা, অপমানিত বোধ করছিল শিবনাথ, বলল, আমি নিজে তো পরিচ্ছন্ন।

সেই তো বিপদ, উজ্জয়িনীর হাটে এত বিদেশী আসে যে আপনি নিজেও বুঝবেন না কোন চক্রান্তে পা দিয়ে ফেললেন এভাবে ভিনদেশী বণিকের সঙ্গে, বণিকের ছদ্মবেশে আসা গুপ্তচর কিনা সে তা না জেনে আলাপ করা ঠিক নয়।

ভয় পেল শিবনাথ, বৃকোদর তো পাটুলিপুত্রের মানুষ।

কোথাকার মানুষ, কী তার উদ্দেশ্য তা তো আপনি জানবেন না, জানব আমি, আমি অঙ্গবিদ্যা জানি, সর্বাঙ্গ পর্যবেক্ষণ করেই ধরতে পারি কে আসলে কী চায়।

হাসে শিবনাথ, ততো হবেই।

যাক, কথাটা বললাম, সাবধানে থাকবেন, আমি অনেক সময় দেখেছি আপনি কথা বলছেন লোকটার সঙ্গে, আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী আমি, অন্য কেউ হলে এখনই নিয়ে যেতাম রাজসভায়, ক'দিন আগে ধরা পড়েছে একজন, আপনি কী জানেন হুন জাতি এখনো সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়নি, বর্বর জাতি, তারা সুযোগ খুঁজছে।

মাথা নাড়ে শিবনাথ। এসব জানে না সে। এখন ভয় করছে। বৃকোদর কি তাহলে ছদ্মবেশি, ব্যাপারি নয়? তাই বা কী করে হবে? মানুষ দেখলে কী চেনা যায় না? বেশ ভাল, সরল প্রকৃতির লোক বৃকোদর। যাক, এসব কথা উদ্ধবনারায়ণকে বলা যায় না। বললে আর এক প্রস্ত শুরু হবে। এই যে বলছে, যে লোকটি ধরা পড়েছে সে আসলে মণিরত্ন নিয়ে এসেছিল সিন্ধুতীর থেকে। সিন্ধুতীরে উত্তর-পশ্চিমে হুন জাতি ক'বছর ধরে স্থিত হয়েছে। দশপুরার যুদ্ধে হেরে তারা সরে গেছে বটে এ অঞ্চল থেকে, কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছে, গোপনে খোঁজখবর নিচ্ছে। অবন্তীদেশ, উজ্জয়িনীর প্রতি কার না লোভ!

শিবনাথ বলে, আমি এসব কিছুই জানি না।

জানার কথা নয়, আপনি জানবেন কীভাবে, যা বলছি, সাবধানে থাকবেন, আপনার পুত্র হুনযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে, আপনার কোন বিপদ হয় তা আমি চাই না।

শিবনাথ বিষণ্ণ হয়, আমার পুত্রের কোনো খবর তো মেলেনি, সে তো হারিয়ে গেছে, হুনযুদ্ধে হত হয়নি।

হাসে উদ্ধবনারায়ণ, বেঁচে থাকলে সেনাবাহিনীর সঙ্গেই ফিরত, আপনি অনায়াসে ধরে নিতে পারেন সে—, আপনার কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এই কথাই তো সত্যি, পারলৌকিক ক্রিয়া করে ফেলুন, শুধু শুধু তার আত্মার মুক্তি হচ্ছে না।

শিবনাথ ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, থামুন আপনি, এসব কথা আমি শুনতে চাই না।

উদ্ধবনারায়ণ হাসে, জানি আপনার কষ্ট হচ্ছে। আমারও কষ্ট হচ্ছে, সে ছিল দেশপ্রেমিক, রাজার প্রতি বিশ্বস্ত।

শিবনাথ উত্তেজিত গলায় বলে, তার স্ত্রী, কন্যা তার অপেক্ষায় রয়েছে, আমিও আমার সন্তানের অপেক্ষায় রয়েছি এই পাঁচটি বৎসর, আপনি আমাদের অপেক্ষা, আকাঙ্ক্ষাকে মিথ্যে বলে দিচ্ছেন, সে নিশ্চয়ই আসবে, নিশ্চয়ই এমন কোন কিছু ঘটেছে, দশ-বারো বৎসর বাদে কতজন গৃহে ফেরে। পথ হারিয়েছে নিশ্চয়ই কার্তিককুমার।

নিজের যুক্তিটাকে ঠিক মত প্রতিষ্ঠা করতে পারছিল না শিবনাথ। সত্যিই তো, পাঁচ বৎসরেও সে পথ খুঁজে পায়নি! উজ্জয়িনীর নাম দশ দিগন্তের মানুষ জানে, ফেরা তো কঠিন নয়। হতে পারে সে কোনও সার্থবাহের সঙ্গে কোথাও বাণিজ্যে চলে গেছে। তাই বা কী করে হবে? সে ছিল স্ত্রী, কন্যা অন্তঃপ্রাণ। যুদ্ধে জয় হল, সে ঘরে ফিরল না, এর অর্থ কী হতে পারে? শিবনাথ মনে মনে বিপন্ন হয়ে গেছে। যুদ্ধে যত সৈনিক হত হয়েছিল তার ভিতরে কার্তিককুমারের নাম ছিল না। ভুলক্রমেও তো না থাকতে পারে। নাম ছিল না শুনে সে হত হয়নি এই যুক্তি প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। আর এমন হতে

পারে যুদ্ধে পরাস্ত ভিনদেশী হুনরা তাকে অপহরণ করে অন্যত্র হত্যা করেছে। এ চিন্তা যে মাথায় আসে না তা নয়, ভাবতে ভয় লাগে।

উদ্ধবনারায়ণ বলে, থাক ও সব কথা দীপাবলির সকালে আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না, আর ওই কথার জন্যেও আমি আপনার কাছে আসিনি, আপনি যার খোঁজ করছেন এখন সে তো আপনার পুত্র নয়,আপনার রক্তের সম্পর্কে কেউ নয়, সেই দুরাচারীর কথা বলছি, আপনার বন্ধুপুত্র, সে কোথায় গেল?

অবাক হয়ে শিবনাথ উদ্ধবনারায়ণের দিকে তাকায়। নীল বর্ণের শিরস্ত্রাণটি সে ভাল করে বেঁধে নিচ্ছে, বাঁধতে বাঁধতে আবার জিজ্ঞেস করে, সে গেল কোথায়?

জানি না তো।

কিন্তু কোথাও তো গেছে।

সেই খোঁজ নিচ্ছি।

খোঁজ নিতে হবে না, অনুমান সে উজ্জয়িনীর সব সংবাদ সংগ্রহ করে যথাস্থানে চলে গেছে, সে যে শত্রুর সঙ্গে যোগ দেয়নি তারই বা কী প্রমাণ?

শিবনাথ চুপ করে থাকে। উদ্ধবনারায়ণ কী পাগল? কোথায় শত্রু? অবন্তী দেশ তো শান্ত। হুন যুদ্ধের পর আর কোনও যুদ্ধই হয়নি। গুপ্তচর বৃত্তি নেবে ধ্রুবপুত্র। শিবনাথ একটু বাদে জিজ্ঞেস করে, আপনি কী বলতে ডাকলেন?

উদ্ধব বলে, কোথায় যাচ্ছিলেন, চলুন, ঘোড়া হাঁকিয়ে নিয়ে যাই।

কোথাও না, গ্রামেই ফিরব, মুক্তো বিপণির দিকে যাব ভাবছিলাম।

কেন, মুক্তো বিপণি কেন?

শিবনাথ একটু কঠিন হল, বলল, ব্যক্তিগত প্রয়োজন।

উদ্ধবনারায়ণ হাসে, রাজকর্মচারী, রাজসভার মানুষ জিজ্ঞেস করলে তো আর ব্যক্তিগত অভিপ্রায় লুকিয়ে রাখা যায় না। লুকিয়ে রাখাও ঠিক নয়।

পারিবারিক ব্যাপার?

কী পারিবারিক, মুক্তাহার কিনবেন?

হ্যাঁ। অন্যদিকে তাকিয়ে জবাব দেয় শিবনাথ।

উদ্ধবনারায়ণ হাসে, এই কথা কি বলা যায় না? দেখুন খুড়োমশাই দিনকাল খুব ভাল নয় যে তা আপনিই টের পাচ্ছেন। আপনি মুক্তো বিপণি, ধান্যের ব্যাপারি, সব জায়গায় যাচ্ছেন, এ তো কারো কারো চোখে সন্দেহের কারণ হয়ে যেতে পারে। আমাদের সবদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়, প্রতিটি নাগরিক কী ভাবছে তা জানতে হয়, রাজকর্মচারীর কাজ অত সহজ নয়, আমাদের কাজ সব সময় সন্দেহ করা, সন্দেহজনক কিছু সন্ধান করা।

হবে হয়ত, জানি না।

চলুন, মুক্তা বিপণিতে, কে পরবে মুক্তাহার! আপনার পৌত্রী?

শিবনাথ হাসে, হ্যাঁ। একটু সহজ হচ্ছে। এখন তার মনে হচ্ছে এই উদ্ধবনারায়ণ বাকপটু, বাকসর্বস্ব। তার পদগুরুত্ব বোঝাতে এতক্ষণ এতকথা বলল। কিন্তু তার সঙ্গে মুক্তা বিপণিতে যাবে কেন? সন্দেহ কী তাহলে সত্যি?

বিরক্ত হল শিবনাথ, বলল, আমাকে কি আপনার মনে হচ্ছে সন্দেহভাজন?

না, না, আপনাকে চিনি তো আমি, আপনার পরিবারকে আমার বেশ ভাল লাগে, পৌত্রীটি কী সুন্দর, কত বয়স হল গন্ধবতীর?

অনাবশ্যক কৌতূহল পছন্দ হয় না শিবনাথের, বলল, যদি চেনেন তো অনুসরণ করছেন কেন?

না, না, অনুসরণ নয়, আপনি মুক্তাহার কিনবেন, আমি সঙ্গে যাচ্ছি যাতে না ঠকে যান। আপনার পৌত্রীর জন্য কিনবেন তো, কী সুন্দর গন্ধবতী, পরম রূপবতী।

এ-কী কথা! শিবনাথ থমকে দাঁড়িয়ে যায়। কী সব কথা বলছে উদ্ধবনারায়ণ। এ তো ভাল কথা নয়। অনাত্মীয়া যুবতীর রূপে মুগ্ধতা প্রকাশ শিষ্টাচার নয়। আবার শিরস্ত্রাণ বাঁধছে উদ্ধব, বাঁধতে বাঁধতে

বলে, বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠেছে না?

শিবনাথ এতক্ষণে অনুধাবন করে উদ্ধবনারায়ণের এত কথার গূঢ় অর্থটি কী? তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে উদ্ধব, বলল, রাজসভায় মাসিক ভাতা ছাড়াও কত সুবিধে, আপনি মুক্তাহার মূল্য দিয়ে কিনবেন কেন, চলুন আমি বলে দিলেই দিয়ে দেবে, বণিকরা সবসময়ই আমাদের অনুগ্রহ প্রার্থী, আমাদের সন্তুষ্ট না করলে বাণিজ্য করতে পারবে?

না, না আমি উচিত মূল্যেই কিনব, প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

হাসে উদ্ধবনারায়ণ, মুদ্রা রেখে দিন, কত কাজে লাগবে, গন্ধবতীকে যেমন মানায় তেমন মুক্তার হার আমি আপনাকে দিচ্ছি, তাকে দিয়ে দেবেন, দীপাবলীর দিনটি শুভ, ধনরত্ন ঘরে আনতে হয়।

শিবনাথ বলে, ধন-ত্রয়োদশীতে, আজ নয়।

তা হোক, আজ না হয় অমাবস্যা, কিন্তু ধন-ত্রয়োদশীর উপলক্ষ্য তো দীপাবলীই, চলুন একশত মুক্তার লহরী মেলানো কণ্ঠহার কিনে দিই গন্ধবতীর জন্য, এই ভূষণের নাম দেবচ্ছন্দ, তা জানেন কি?

জানি না, কিন্তু আপনি দেবেন কেন?

আমার বাসনা যে দিই। উদ্ধবনারায়ণ বলে।

রাজসভার মানুষের বাসনা কি এইরকম?

হাসে উদ্ধবনারায়ণ, ভাবলে তেমন ভাবতে পারেন, আপনি বোধহয় বুঝতে পারছেন আমি আপনার পৌত্রীর জন্যই দিতে চাই, আপনি বিষয়টি নিয়ে একটু ভাববেন।

শিবনাথ হন হন করে উল্টোদিকে হেঁটে গেল। প্রায় দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ক্রেতা ব্যাপারির ভিড়ে মিশে গেল। বুক ধক ধক করছে তার। বোঝা গেল রাজকর্মচারীর অভিপ্রায়। গন্ধবতীর ভাগ্যে মুক্তাহার নেই। আর দাঁড়ায় না বৃদ্ধ। হাঁটতে থাকে পশ্চিম পথে, গম্ভীরার দিকে। তার ভয় করছিল। উদ্ধবনারায়ণ না তার তিব্বতি ঘোড়ায় চেপে ছুটে আসে এদিকে।

শিবনাথ আচমকা চলে যাওয়ায় উদ্ধবনারায়ণ হতাশ হয়েছে। ভেবেছিল শিবনাথের পিছনে গিয়ে তাকে বাধ্য করবে মুক্তাহারটি নিতে। কিন্তু সে বুদ্ধিমান। এগোয় না। কী যে হলো তার আজ আচমকা! শিবনাথকে দেখেই তার পৌত্রীর কথা মনে পড়ে গেল। আশ্চর্য সুন্দরী সেই সদ্য যুবতী। তাকে কয়েকদিন আগেই দেখেছে সে পথের ধারে, কূপ থেকে জল তুলতে। দেখে কামনায় শিহরিত হয়েছিল। আজ দীপাবলী, আনন্দের দিন। আজ সমস্ত দিন সে বারাঙ্গনা চতুরিকার ঘরে কাটাবে ঠিক করেই রেখেছে। যাওয়ার আগে দীপাবলীর মেলা থেকে যদি কিছু সংগ্রহ করা যায়। উদ্ধবনারায়ণ ধীর পায়ে এগোয়। অশোক গাছটির দিকে নয়, মুক্তা বিপণির পথে। এখন একটু ক্লান্ত লাগছে। রতিক্লান্ত হয়ে যেভাবে পুরুষ মানুষ সাময়িক অবসাদে পতিত হয়, উদ্ধবনারায়ণকে যেন সেই অবসাদ ঘিরে ধরেছে। হতাশ লাগছে এখন। আত্মরতির পর যেভাবে হতাশ হয় পুরুষ মানুষ, উদ্ধবনারায়ণ যেন সেই হতাশায় ডুবেছে। যেভাবে কল্পনা প্রসারিত করে ডানা মেলেছিল সে তা সফল হল না। মুক্তার হারটি শিবনাথের হাতে তুলে দিতে পারলেই সে নিশ্চিন্ত হয়ে গণিকালয়ে যেতে পারত। মহাফূর্তিতে ডুবে থাকতে পারত। গন্ধবতীর দিকে এইভাবে একটি পদক্ষেপ এগিয়ে থাকায় সুবিধে হত যথেষ্ট।

এখন গণিকালয়ে যাবে উদ্ধব। গন্ধবতীর কথা পরে ভাবা যাবে। মনে মনে পণ করেছে উদ্ধব, গন্ধবতীকে বিবাহ করবেই। সে তো পরের কথা। ফূর্তির জন্য গণিকার তুল্য কে আছে? আজ দীপাবলী। গণিকালয়গুলি ভোর থেকে পুষ্পশোভিত হচ্ছে। পরিষ্কার হচ্ছে। বারবধূরা যদিও এখন গভীর নিদ্রায়, কিন্তু উদ্ধবনারায়ণরা তো মনে মনে তৈরি হয়েই বেরিয়ে পড়েছে। মেলায় যতটুকু সময় অতিবাহিত হয়, বাকিটুকু তো গণিকালয়ে যাবে।

উদ্ধব ভাবে গন্ধবতীর জন্য মুক্তাহার সংগ্রহ করা হল না। কিন্তু চতুরিকার জন্য তো হতে পারে। আজ দীপাবলী, তার প্রিয় গণিকা, মার্জারিকা, সুন্দরী চতুরিকার গলায় না হয় সে পরিয়ে দিল শত লহরীর মুক্তাহার। মনে মনে চতুরিকাকে কল্পনা করে উদ্ধবনারায়ণ। প্রখর যুবতী সে। যৌবন আর ছলাকলায় সে নিশ্চিতভাবে গম্ভীরার কন্যা গন্ধবতীর চেয়ে পটিয়সী। তবু গন্ধবতী তাকে শিহরিত করছে বেশি। উদ্ধবনারায়ণ ভাবে চতুরিকার সঙ্গে গন্ধবতীর কোনো তুলনা হয় না। এক এক রমণী এক একরকমভাবে সুন্দর। চতুরিকার মত যৌবন কার? উনবিংশতি বর্ষীয় এই যুবতীর গাত্রবর্ণ যদি স্বর্ণচাঁপার মত হতো,

তবে কি উদ্ধবনারায়ণ দীপাবলীর অহোরাত্র তার নিকটে অতিবাহিত করার কথা ভাবতে পারত? চক্ষু দুটি যদি মার্জারির মত না হতো, মুখশ্রী যদি গণিকা শ্রেষ্ঠা দেবদত্তার মত হতো, তাহলে কি সে উদ্ধবনারায়ণেই ধন্য হতো? শ্যামাঙ্গী চতুরিকা না জানে বীণাবাদন, না জানে, নৃত্যকলা, যেটুকু জানে তা কিছুই জানা নয়। হতো যদি দেবদত্তার মত! উদ্ধব দাঁড়িয়ে পড়ে দুচোখ বন্ধ করে। দেবদত্তা এই নগরীর শ্রেষ্ঠসুন্দরী, দেবভোগ্যা, তার পরম অনুরাগী হলেন শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত, সবচেয়ে ধনী এবং ক্ষমতাবান। উদ্ধবের নারীচিন্তায় যেন দেবদত্তা না আসে। দেবদত্তার কথা ভাবতেই ভয় পায় উদ্ধব। বরং গন্ধবতী অনেক সহজলভ্যা।

মহাশয়, এইভাবে যে দাঁড়িয়ে? উদ্ধবের সামনে নত হয়ে একটি মধ্যবয়স্ক মানুষ।

চোখ খোলে উদ্ধব, দেবদত্তাকে সরিয়ে দেওয়া গেছে সামনে থেকে। উদ্ধব দ্যাখে গণিকালয়ের বীট মহাপার্শ্ব। রুগ্ন প্রায় দীর্ঘকায় মহাপার্শ্ব যষ্টির মত বেঁকে দাঁড়িয়েছে, মহাশয় উদ্ধবনারায়ণ, আপনার কোনও সংবাদ আছে, কাউকে কোনও সংবাদ দিতে হবে? নতুন একটি যুবতী এসেছে নিরীক্ষণ করবেন, নাকি আপনি যাবেন চতুরিকার কাছে?

উদ্ধব নত হওয়া মহাপার্শ্বর মাথায় চাঁটি মারে, আমি কোথায়, কার কাছে যাই কি না যাই সে আমার ইচ্ছে, তুই এত সকালে কোথায় যাচ্ছিস?

নাগর জোগাড়ে, আজ সবচেয়ে বড় বেচা-কেনার দিন। হাসে মহাপার্শ্ব, কাল অনেকরাত পর্যন্ত জাগা হয়েছে, ঘুম পোরেনি, কিন্তু মেলা তো বসে থাকবে না মহাশয়, নতুন নতুন মানুষ এসেছে নগরে, বেচা-কেনার পয়সা, বুঝলেন না। চোখ মটকায় মহাপার্শ্ব, তারপর হন হন করে হাঁটে। হাটের ভীড়ে মিশে যায়।

তিন

উজ্জয়িনীর পশ্চিমপ্রান্তেই শিপ্রা নদী, দক্ষিণ থেকে উত্তরে উঠেছে। শিপ্রার তীর ধরে অনেকটা পথ এগিয়ে, শেষ পর্যন্ত নদীকে ফেলে রেখে শিবনাথকে পশ্চিমে গম্ভীরার পথে যেতে হবে। নদী এবং গ্রাম দুই-ই গম্ভীরা।

মঙ্গলনাথের মন্দিরের কাছে পৌঁছে বুকের ধুকপুকানি কমল বৃদ্ধের। এতটা পথ হেঁটে আসার সময় তাকে বহুবার দাঁড়াতে হয়েছে, বট, অশ্বত্থ, পিপুল গাছ-গাছালির আড়ালে। দেখতে হয়েছে রাজকর্মচারী আসছে কিনা। বিপদটি যেন আকাশ থেকে নেমে এসেছে। সেই উদ্ধবনারায়ণ। কী বিষণ্ণ মুখখানি ছিল তার, কী বিনীত ভঙ্গি! কীভাবে রাজসভার আনুকূল্য পাওয়া যেতে পারে তা নিয়ে নাকি পরামর্শও করত ধ্রুবপুত্রের সঙ্গে। ধ্রুবপুত্র তো সান্দীপনি আশ্রমের সেরা শিক্ষার্থী, উজ্জয়িনীতেই তার বাস ছিল। বণিক সুভগ দত্ত শাস্ত্রশিক্ষার যাবতীয় ব্যয় বহন করতেন। রাজশক্তির অংশভুক্ত হয়ে, রাজশক্তির ছিটেফোঁটা স্বাদ পেয়ে কতটা না বদলে গেছে উদ্ধবনারায়ণ।

দাঁড়িয়ে শ্বাস নেয় বৃদ্ধ। কুলকুল করে ঘামছে সে। গৃহে কন্যা বয়স্থা হলে এমন বিপদই হয়ে থাকে। থাকত গন্ধবতীর পিতা কার্তিককুমার, উদ্ধব তার সামনে কীটের মত গুটিয়ে যেত। ওইটুকু উচ্চতার উদ্ধব, খর্বাকার, ও তো কার্তিককুমারের পায়ে নিচে পিষ্ট হত। দুই আঙুলে টিপেই মেরে ফেলত কার্তিক। কী ছিল তার শৌর্যময় দেহখানি, কতখানি ছিল তার উচ্চতা, কত প্রশস্ত ছিল বক্ষদেশ। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলে সে নিশ্চয়ই রাজসভায় কোনও পদ পেয়ে যেত। পদাতিক বাহিনীতেই তার নিযুক্তি হয়ে যেত কোনও এক বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে। সে নাকি অসম্ভব যুদ্ধ করেছিল। তার বীর্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল হুন যোদ্ধারা। ভল্লের আঘাতে ক্রমাগত আহত, হত করছিল শত্রু সৈন্যদের। শোনা যায় হুন যোদ্ধারা পালাচ্ছিল কার্তিককুমারকে দেখে। কার্তিককুমার তাদের তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছিল আরও সহযোদ্ধাদের নিয়ে। সব বলেছে ভৈরব। গোপ-সম্প্রদায়ের যুবক, কার্তিককুমারেরই সমবয়স্ক ভৈরব গিয়েছিল যুদ্ধে। ফিরেওছে। সে এসে গন্ধবতী, ধ্রুবপুত্র, গন্ধবতীর মা রেবাকে বলে গেছে কার্তিককুমারের বীরত্বের কাহিনী। যুদ্ধ অবসানের পর আরও দশদিন দশপুরায় ছিল অবন্তীর সেনাবাহিনী। মৃত যোদ্ধাদের দাহ করা হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রেই। সেনাবাহিনীর একটি অংশ থেকে গিয়েছিল সেখানে। না সেই অংশে ছিল না কার্তিককুমার। তার খোঁজ কেন হয়নি, তাও বিস্ময়ের। যুদ্ধজয়ের আনন্দে সামান্য যোদ্ধার কথা

বিস্মৃত হয়েছিল সকলে। উজ্জয়িনীতে ফেরার পর মনে পড়ল। পদাতিক বাহিনীর অধ্যক্ষ বলেছিলেন, সে রয়ে গেছে দশপুরায়। কিন্তু দশপুরার বাহিনীর সৈন্য তালিকায় তার নাম ছিল না। হুন বিজয়ের আনন্দে সামান্য সৈনিকের কথা কেউ মনে রাখল না। বলা হল, সে নিরুদ্দিষ্ট। আজ উদ্ধবনারায়ণ বলছে, সে মৃত। এতদিন বাদে কীভাবে প্রমাণিত হবে সে মৃত? মাত্র পাঁচ বৎসর কেটেছে। দ্বাদশ বৎসর অপেক্ষা করাই যেতে পারে। পুত্রবধূ রেবা বলেছে, যদি অনুমতি দেন শ্বশুর মহাশয় সে সমস্ত জীবন অপেক্ষা করবে তার জন্য। আপাতত আট বৎসর, তারপর আরও চার বৎসর অপেক্ষা করতেই পারে পুত্রবধূ। যদি বেঁচে থাকে ততদিনে কি ফিরবে না? মনের ভিতরে খচখচ করছিল উদ্ধবনারায়ণের কথাগুলি। আচমকা সে কার্তিককুমারের মৃত্যু ঘোষণা করতে চাইছে কেন? কী তার অভিপ্রায়? ধ্রুবপুত্রের সম্পর্কে যে কথা বলেছে তাও তো ভয়ঙ্কর। সে হুনজাতির আশ্রয়ে আছে, দেশের শত্রুর মিত্র হয়ে আছে। এর চেয়ে খারাপ কথা হয় না। এসব কথা বলে তার মনের উপর চাপ ফেলতে চাইছে যেন উদ্ধবনারায়ণ। কিছুটা এগোয় শিবনাথ। মঙ্গলনাথের মন্দিরের পাশে আচার্য বৃষভানুর আশ্রম। তিনি বড় জ্যোতির্বিদ, গ্রহনক্ষত্রচর্চাতেও তিনি সুখ্যাত। খালি চোখে আকাশের বহু তারা এখনও এই বয়সেও চমৎকার পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। পঞ্চাশের উপর তো বয়স হলই। দশদিক হতে কত নবীন যুবক এসে তাঁর কাছে জ্যোতির্বিদ্যা শেখে, আকাশের গ্রহতারা তাঁর কাছেই চিনেছিল ধ্রুবপুত্র। সন্ধেবেলায় সে গন্ধবতীকে তারা চেনাত। স্বাতী, চিত্রা, অভিজিৎ, কালপুরুষ, সপ্তর্ষিমণ্ডল চিনেছে গন্ধবতী তার সখা ধ্রুবপুত্রের কাছেই। আকাশ দেখা ছিল তার মনের আনন্দ, খেয়াল। সেই আনন্দ, খেয়াল সঞ্চারিত করে দিয়েছিল গন্ধবতীর ভিতরে। এখন গন্ধবতীর মনের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে যেন। কই আকাশে তাকিয়ে তো আর তার মা রেবাকে ডেকে দেখায় না, ওই, ওই যে দেখা যায় মা, ওই তো বশিষ্ঠ ঋষির পাশে মা অরুন্ধতী।

কে চেনাল তোকে? বিনবিনে গলায় জিজ্ঞেস করেছে রেবা।

কেন সখা! আকাশের দিকে তাকিয়ে মৃদুগলায় বলেছে গন্ধবতী। তার কণ্ঠস্বর তবুও কানে এসেছে শিবনাথের। সে যে কান পেতে থাকত সেই সময়। মনে মনে হেসেছে কত। মনের ভিতরে গোপন বাসনা জেগে উঠেছে ধীরে ধীরে। অরুন্ধতী তারা কে দেখায় কাকে? যৌবনে শিবনাথ তো তার নববধূকে দেখিয়েছিল বিবাহের পর আঙিনায় দাঁড়িয়ে। রেবাকেও চিনিয়েছিল নিশ্চয়ই কার্তিককুমার, তার স্বামী।

শিবনাথ দাঁড়ায়, ভাবে, যাবে নাকি আশ্রমে? বৃষভানুর কাছে গিয়ে বলবে নাকি তার উদ্বেগের কথা? কোথায় আছে ধ্রুবপুত্র, কোথায় আছে কার্তিককুমার? যে কথা বলল উদ্ধবনারায়ণ তা কি সত্যি? নাকি সব তার বানানো। সবটাই কোনও ছলনা থেকে জাত। সত্যিই কি ধ্রুপপুত্র অপমানিত হয়ে অবন্তী দেশ ত্যাগ করে চলে গেছে হুন রাজ্যে, সিন্ধুতীরে? এও কি সম্ভব! প্রেমে ব্যর্থ হলে মানুষ কি এইভাবে ধ্বংস করে দেয় নিজেকে? আর কার্তিককুমার কি হত হয়েছে সত্যি? দীপাবলীর প্রভাতে এসব কী শুনল সে? মৃতু সংবাদ! উদ্ধবনারায়ণ কী অক্লেশে বলে দিল বেঁচে নেই কার্তিককুমার। এই সংবাদ সে উজ্জয়িনী থেকে বয়ে নিয়ে গম্ভীরায় ফিরবে পুত্রবধূ, পৌত্রীর কাছে। শিপ্রাতীরে একাকী বসল শিবনাথ। মাথার উপর একটি নবীন ছাতিম বৃক্ষ ছায়া মেলেছে। গায়ের চাদরখানি খুলে বুকে ফুঁ দিয়ে শান্ত হতে থাকে শিবনাথ।

নদীর ওপারে জোয়ার ক্ষেতে চাষী নেমেছে। কিন্তু ফসল এবার হল কই? বৃষ্টিই তো হল না। সীতাধ্যক্ষের লোক এসে কতটা ফসল নেবে কর হিসাবে? ফসল তো মরে গেছে বৃষ্টির অভাবে। কতদিন বৃষ্টি হয়নি। বৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা থাকতে থাকতেই হিম পড়তে শুরু করেছে। হিম পতনও শুরু হয়েছে মাসাধিককাল হল। আকাশ ধূসর হয়ে আছে। পুড়ে গেছে যেন আকাশমণ্ডল।

এখানে শিপ্রা নদীর রূপটি অর্ধচন্দ্রাকার। নদী দক্ষিণ থেকে এসে পুবে বয়ে আবার দক্ষিণে বেঁকেছে। ডানদিকের ঘাটে নদীর জলে নেমে যাচ্ছে এক নবীন যুবক। ধ্রুবপুত্রেরই বয়সী। একি চেনে ধ্রুবপুত্রকে? নদীর জল কত নিচে নেমে গেছে। স্রোত অতি দুর্বল। কেমন ক্ষয়াটে লাগছে প্রকৃতিকে। শিবনাথ যুবকটির দিকে তাকিয়ে আছে। আচমন শেষ করে উঠে আসছে মধ্যম উচ্চতার যুবকটি। গায়ের রঙ তামাটে, মাথার চুল ঘন, কোঁকড়ানো। এইরকম চুল এদেশের জঙলি, নিষাদের ভিতরে দেখা যায়। মাথায় সবুজ পাতার রসে রঞ্জিত সবুজ বস্ত্রের পটি বাঁধা, সেখানে ময়ূরের পালক গোঁজা, কাঁধে ধনুক, পিঠে বাঁধা তলবাঁশের কোটরে তীর। কী স্বাস্থ্যবান তারা! অনাবৃত ঘনকৃষ্ণ দেহের দিকে তাকিয়েই থাকতে হয়।

যুবকটিকে দেখে নিষাদের কথা মনে পড়ে গেল। অথচ এই শীর্ণকায় যুবক যে ধনুক বা ভল্লের ভার সহ্য করতে পারবে না, তেমনই মনে হয়। শিবনাথ উঠে এগিয়ে গেল। যুবক দাঁড়িয়েছে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। শিবনাথ জিজ্ঞেস করে, মহাশয় কি আচার্য বৃষভানুর আশ্রমের শিক্ষার্থী?

যুবক ঘাড় কাত করে বলল, আপনি?

গম্ভীরা থেকে আসছি, আচার্য কি আছেন?

যুবকের সঙ্গে হাঁটতে লাগল শিবনাথ। দশার্ণ দেশের নীচৈঃ পাহাড়ের কোলের গ্রাম সোনাগাঁও থেকে তাম্রধ্বজ এসেছে বৃষভানুর নিকটে। ইচ্ছা জ্যোতির্বিদ্যা, গ্রহবিদ্যা অধ্যয়ন করে বিদিশানগরে ফিরে যাবে। যুবক যেতে যেতে বলছিল, বৈশ্য সম্প্রদায়ের সে, পিতা বেচা কেনা করেন।

শিবনাথ বলল, আপনি কি গ্রহবিদ্যা জানেন?

কেন বলুন তো?

শিবনাথ বলল, না, থাক, আচার্যের কাছে যাই, ধ্রুবপুত্র তো তাঁরই শিষ্য।

তাম্রধ্বজ বলল, আচার্য খুব উদ্বিগ্ন।

কেন?

তাম্রধ্বজ আকাশে তাকায়, দুই বৎসরের অধিক হলো অবন্তী দেশে বৃষ্টি নেই।

শিবনাথ মাথা দোলায়, তাই-ই তো। জোয়ার মকাই কোনওটাই ফলেনি।

তাম্রধ্বজ বলল, এমন নাকি কখনও হয়নি রাজা ভর্তৃহরির শাসনকালে।

শিবনাথ বলল, হ্যাঁ, তা বটে, রাজা ভর্তৃহরির শাসনকালে সুবৃষ্টি হয়েছে, সুভিক্ষার কাল।

তাম্রধ্বজ বলল, আচার্য গণনায় বসেছেন।

কীসের গণনা?

অনাবৃষ্টির হেতু।

তাহলে দেখা মিলবে না?

জানি না, আপনি কি কোনও গণনার জন্য এসেছেন?

হ্যাঁ, শিবনাথ বলে, রৌদ্রে কী উষ্ণতা! এই শিশির ঋতুতে এমন হয় না কখনও। বিড়বিড়িয়ে বলে বৃদ্ধ, আমি খুব বিভ্রান্তি, উদ্বেগের মধ্যে আছি।

তাম্রধ্বজ বলল, আচার্য গ্রহ-নক্ষত্র সাজিয়ে বসেছেন, তিনি ডুবে আছেন তার ভিতরে, এই যে আসুন, কথা বলবেন না।

আশ্রমের আঙিনায় পা দিল দু'জনে। তারপর ঘুরে আশ্রম গৃহের পিছনে ধীর পায়ে গিয়ে দ্যাখে গ্রহ-নক্ষত্রের স্থান নির্ণয় করতে আঙিনায় ভূর্জপত্রের উপর ছক এঁকে সামনে বসে আছেন আচার্য বৃষভানু। নিবিড় শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ। আচার্যের বয়স হলেও একটি কেশেও রূপোলি রং ধরেনি। রীতিমত ঘনকৃষ্ণ তাঁর চুল-দাড়ি। নিকানো প্রশস্ত আঙিনা।

তাম্রধ্বজ চাপা গলায় বলল, এখন আচার্য অন্য কোনও গণনায় যাবেন না, গ্রহ-নক্ষত্রকে যেভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন, তা থেকে সিদ্ধান্তে না আসা পর্যন্ত আচার্যদেবকে বিব্রত করা যাবে না, এই গণনায় অবন্তীর ভাগ্যকে জানবার চেষ্টা করছেন আচার্য।

শিবনাথ আকাশে তাকায়। ঘোলাটে নীল আকাশ। ওই আকাশ থেকে গ্রহ-দেবতারা সত্যিই কি অবন্তী দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করেন? নিশ্চিতই করেন, না হলে দীর্ঘকাল মেঘহীন হয়ে থাকে কী করে অবন্তীর আকাশ। দুই শ্রাবণ প্রোষ্টপদ গেল জলহীন হয়ে। এর কি কোনও কারণ নেই? তাম্রধ্বজ বলছে, আচার্য বৃষভানুকে রাজসভায় জানাতে হবে অনাবৃষ্টির কারণ, ফসলহানি কেন?

দু'জনে সরে এসেছে আঙিনার প্রান্তসীমায়। এখানে দাঁড়িয়ে আচার্যকে দেখা যায়, কিন্তু আচার্যর কানে তাদের কণ্ঠস্বর যাওয়ার সম্ভাবনা কম। তাম্রধ্বজকে শিবনাথ বলে, অবন্তীর আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র সন্নিবেশ যদি প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে, তার ছায়া কি অবন্তীর মানুষের জীবনেও পড়বে?

হাসে তাম্রধ্বজ, ফসলহানি তো হয়েছেই, এতে কি অবন্তীর মানুষ সুখী হতে পারে?

কেউ হয়ত অন্তর্ধান করল, নিরুদ্দিষ্ট হল অবন্তী দেশ থেকে, এও কি অবন্তীর আকাশে প্রতিকূল গ্রহ তারা সন্নিবেশের কারণে?

মাথা নাড়ে তাম্রধ্বজ, আমি কীভাবে বলব, আমি না জেনে কোনও কিছুই অনুমান করতে পারি না, কোনও কথাই বলতে পারি না।

আপনি তো আচার্যর কাছে শিক্ষা করেন গ্রহবিদ্যা?

এ এক অসীম রহস্য, রাত্রে আকাশে তাকালে কী ক্ষুদ্রই না হয়ে পড়ি আমি। বিড়বিড় করতে করতে তাম্রধ্বজ আবার শিপ্রা নদীর দিকে ফিরছিল। তাকে অনুসরণ করছিল শিবনাথ। তাম্রধ্বজ বলছিল, সে কিছুই যেন শেখেনি। গ্রহ, নক্ষত্র, তারাগুলি দশজন্মেও চেনা হবে না সব। শতকোটি আলোর বিন্দু! তবে হ্যাঁ, সব তো আচার্যদেবও চেনেন না, সব তারাগুলির নামও তো জানেন না তিনি। আসলে কেউই জানে না বোধহয়। আকাশগঙ্গায় কত তারা! বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়াল তাম্রধ্বজ, আস্তে আস্তে বলছে, শুক্রগ্রহের উদয় অস্তের উপর বৃষ্টিপাত নির্ভর করে, বৃষ্টিপাতের পরই ফসলের জন্ম, শুক্রই তো জন্মবীজ পাঠায় এ পৃথিবীতে।

বাহ্ চমৎকার বলেছেন।

আমার কথা নয়, আচার্যদেবের, তিনি এখন জানতে চাইছেন গত দুটি বৎসরে আষাঢ় মাসের পঞ্চমী তিথিতে শুক্র গ্রহের সঞ্চার কীভাবে হয়েছিল অবন্তী দেশের আকাশমণ্ডলে। কিন্তু এখন তো সন্ধ্যায় শুক্র অদৃশ্য। আরও সাতদিন বাদে ভোরের আকাশে দেখা দেবেন শুক্রাচার্য, কী রকম যেন বিশৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে সব, অথচ আকাশের শৃঙ্খলা তো এতটুকুও ভাঙে না কখনও। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, গ্রহ-তারাদের উদয় অস্ত তো গভীর শৃঙ্খলায় বাঁধা। আমার মনই বিশৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে মহাশয়, আমিও যে কেন চঞ্চল হয়ে পড়েছি প্রকৃতির এই নিদয়া রূপে!

শিবনাথ অস্ফুট স্বরে বলে, আচার্য এর ব্যাখ্যা দিতে পারবেন বোধহয়।

মাথা দোলায় তাম্রধ্বজ, তা পারবেন, কিন্তু মনের আকাশ তো মাথার ওই আকাশের চেয়েও অনেক অনেক বড়, মহাকাল ব্যতীত কে দেখবেন সেই আকাশের সবটা, আমার মনের ভিতরে যে বিপুল ব্রহ্মাণ্ড!

চমকে উঠে শিবনাথ। তরুণ শিক্ষার্থীর কথায় কেমন মগ্নতার আভাস। সে বলছে, আসলে কী জানেন মহাশয়, আকাশে চোখ রেখে বসে আছি আমি, শুধুই দেখতে চাইছি অরুন্ধতী নক্ষত্রটিকে, তিনি বারবার হারিয়ে যাচ্ছেন চোখ থেকে। অতি ক্ষুদ্র তো, যখন হারায় বুক কাঁপে। আপনি কি জানেন...?

কী! শিবনাথ যেন কাঁপল তাম্রবধ্বজের গভীর জিজ্ঞাসায়।

না থাক, অরুন্ধতী কেন হারাবে তাঁর চোখ থেকে?

কার চোখ থেকে?

না থাক, শুনুন মহাশয়, অবন্তীর রাজা খুবই ব্যগ্র হয়ে আছেন অনাবৃষ্টির কারণ জানতে, তা না হয় জানা গেল, কিন্তু আকাশে কি মেঘ আনা যাবে এরপর?

সে তো মহাকালের অভিপ্রায়।

কী জানি!

শিবনাথ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, কবে যে বৃষ্টি নামবে!

এখন বৃষ্টিতে কী হবে?

তা ঠিক। হাসে শিবনাথ, বৃষ্টি আসতে আবার সেই শ্রাবণ, কতদিন বাদে! মহাকাল মন্দিরের কোলে শ্রাবণী অমাবস্যায় মেলা বসবে।

তাম্রধ্বজ বলল, এই অবন্তী দেশে তেইশ দ্রোণ পরিমাণ বৃষ্টিপাতে শস্য ফলন স্বাভাবিক হয়, গত দুই বৎসর সর্বমোট দশ দ্রোণের চেয়েও কম বৃষ্টি হয়েছে, সেই কারণে ফসল হয়নি।

আপনার দশার্ণ দেশে?

বৃষ্টিপাত অপ্রতুল, বেত্রবতী, বন নদী শুকিয়ে গেছে প্রায়। শীর্ণ হয়ে গেছে, আমি অবশ্য সঠিক জানি না, দশার্ণ দেশ থেকে যে বণিকেরা আসে উজ্জয়িনীতে, তাদের কাছে শুনেছি।

কতদিন আপনি এখানে আছেন?

সেই গত আষাঢ়ের আগের আষাঢ় মাস থেকে, প্রকৃতির নির্দয় রূপ দেখছি তখন থেকে।

হাঁটছিল দুজনে। যুবকটিকে ভাল লাগছিল শিবনাথের। কথা বলে একটু বেশি, এই আশ্রমে কথা বলার মানুষ কই? বৃষভানুর অন্য শিষ্যাদি কোথায়? একা কি তাম্রধ্বজ থাকে?

তাম্রধ্বজ অনুমান করল তার জিজ্ঞাসা, বলল, দীপাবলীতে সকলে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছে, এখন ফসল কর্তনের সময়ও বটে, আমি একা।

আপনি যাননি?

মাথা নাড়ে তাম্রধ্বজ, দশার্ণ দেশ বহুদূর, আমার যাওয়া হয়নি, আর গৃহে ফিরলে হয়ত আবার এখানে ফেরা না হতেও পারে। আপনি কী জানতে চাইছেন আচার্যর কাছে?

বলবে নাকি তাম্রধ্বজকে সব কথা? শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা কি নিরুদ্দিষ্ট মানুষকে খুঁজে বের করে দিতে পারে? সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারে কোথায় আছে সে?

তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করল, কার কথা বলতে চাইছেন আপনি?

অবাক হয়ে গেল শিবনাথ। এই জ্ঞানী যুবক কি মনের কথা পড়তে পারে? এ তো আশ্চর্য ব্যাপার! কার কথা মানে? সে কি জানে ধ্রুবপুত্রের কথা, গন্ধবতীর পিতা কার্তিককুমারের যুদ্ধে গিয়ে না ফেরার কথা?

তাম্রধ্বজ বলল, আপনি নিজে না বললে আমি কীভাবে গণনা করি?

শিবনাথ জিজ্ঞেস করে, আপনি কি নিরুদ্দিষ্টের অবস্থান নির্ণয় করতে পারবেন?

তাম্রধ্বজ শিপ্রা নদীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ওপারে ফসল মরে যাওয়া জোয়ার ক্ষেত। ঘোলাটে ময়লা আকাশ। বৃষ্টিই হয়নি তো আকাশ পরিষ্কার হবে কীভাবে? তাম্রধ্বজ তার দিকে ফিরল, আপনার উদ্বেগ গভীর, আপনি নিজে না বললে আমি কীভাবে আপনাকে কোনও কথা বলি, যে মাসে, যে তিথিতে, যে সময়ে

শিবনাথ বলল, আপনি কি জানেন সব?

চুপ করে থাকে তাম্রধ্বজ। শিবনাথ বলল, ধ্রুবপুত্র এই আচার্য আশ্রমেরই শিক্ষার্থী ছিল, আমার বয়স্যের পুত্র, সে একটি বেদনাদায়ক ঘটনার পর...।

তাম্রধ্বজ বলল, আমি পড়তে পারছি আপনার কথা। আমি কিছুটা জানি, শুনেছি, তবু আপনি বলুন, আপনি নিজে না বললে নিজে মুক্ত হবেন না।

অবাক হয়ে তাম্রধ্বজের দিকে তাকিয়ে শিবনাথ বিহ্বল। সব জেনে গেছে এর ভিতরে? দশার্ণ দেশের এই গুণী যুবকটি আসলে কে? তাম্রধ্বজের হাত দুটি ধরে ফেলল শিবনাথ। গড়গড় করে বলতে লাগল ধ্রুবপুত্রের কাহিনী। কার্তিককুমারের কথা। উদ্ধবনারায়ণের কথা। কোথায় আছে তারা? কার্তিক বেঁচে আছে না মারা গেছে তা কি জানাতে পারবে তাম্রধ্বজ?

শুনতে শুনতে তাম্রধ্বজ হাত ছাড়িয়ে নিল। ধীর পায়ে ঘাট ভেঙে ভেঙে শিপ্রার জলের দিকে এগিয়ে গেল। পিছনে পিছনে শিবনাথও হাঁটে। জলে আকাশের ছায়া। তাম্রধ্বজ জলের দিকে দৃষ্টি স্থির করে নিশ্চল। শিবনাথ নিজের মুখখানি দেখল। মাথার উপর দিয়ে পাখি উড়ে যাচ্ছিল। একঝাঁক টিয়া। সূর্য রশ্মি জলে প্রতিফলিত হয়ে শিবনাথের মুখে লাগছিল। সময় যাচ্ছিল। শিবনাথ জলের দিকে এক এক ধাপ নামতে লাগল। শেষ ঘাটে উবু হয়ে বসে শিপ্রার জলে হাত দিয়ে অস্ফুট গলায় বলে উঠল, তোমার সন্তান আমরা, হারিয়ে যাওয়া সন্তানের ছায়াটি জলে কি আবার ধরবে না মা?

চার

এই সময় তো সপ্তঋষিরা আকাশে থাকেন না।

হ্যাঁ, আপনি তো আকাশ চেনেন মহারাজ। মৃদুস্বরে বললেন আচার্য বৃষভানু, মাঘ মাসে উত্তর আকাশে আবার দেখা দেবেন সপ্তঋষিরা, মহাঋষি বশিষ্টের স্ত্রী অরুন্ধতী।

রাজা ভর্তৃহরি শুনতে পেলেন কিনা বোঝা গেল না। তিনি উর্ধ্বমুখী, আকাশে তাকিয়ে। দৃষ্টি যেন এই চরাচর, আকাশমন্ডল, গ্রহ নক্ষত্রের সীমা পেরিয়ে, এই বিশ্বলোক পার হয়ে অনন্তগামী। সন্ধ্যায় একাকী রাজা ভর্তৃহরি দেবপথ ধরে রাজপ্রাসাদ থেকে শিপ্রাতীরে মঙ্গলনাথের মন্দিরের কোলে আচার্য বৃষভানুর আশ্রমে এসেছেন। আজ কার্তিক পূর্ণিমা। পূর্ণচন্দ্র মধ্যগগনে। হিমেল রাত্রি জ্যোৎস্নায় আবৃত। চাঁদের আলোয় শিপ্রা নদীটি যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা দুধ নদী হয়ে গেছে। বিড়বিড় করছেন রাজা ভর্তৃহরি, ওই উত্তর পুবে বৃষ রাশি, বৃষের ঈষৎ পশ্চিমে মেষ, তার ওপরে মীন রাশির তারকামন্ডল।

বৃষভানু বললেন, মধ্যগগনে তাকান, একটু দক্ষিণ ঘেঁষে মকর ও কুম্ভরাশিকেও দেখতে পাবেন। ওই যে দেখুন মহারাজ।

রাজা ভর্তৃহরি দেখলেন অতি উজ্জ্বল শ্রবণা নক্ষত্রকে ঠিক মাথার উপরে, একটু পশ্চিম ঘেঁষে। উত্তরে রয়েছে অভিজিৎ। তিনি আকাশের তারাদের আবার চিনে নিচ্ছিলেন। আচার্য বৃষভানুর কাছে অনেক সন্ধ্যায় বসে বসে তিনি আকাশ চিনেছেন।

বৃষভানু বলছিলেন, কার্তিক পূর্ণিমায় চন্দ্র কৃত্তিকা নক্ষত্রে থাকেন, কৃত্তিকা নক্ষত্রকে কি দেখতে পাচ্ছেন মহারাজ?

রাজা জবাব দিলেন না। মাথা নাড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। গায়ের পশম চাদরটি একটু আলগা করে দিলেন। কার্তিক মাসেই অবন্তীদেশে শীত নেমে যায়, এবছর শীতের প্রকোপ কম হবে মনে হচ্ছে। কই তেমন ঠান্ডা তো নেই। বৃষ্টি হয়নি, মাটি আর্দ্র নয়, শীত আসবে কোথা থেকে? উত্তরের বাতাস এখনো অবন্তীদেশে প্রবেশ করেনি। রাজা বললেন, শুক্রগ্রহকে তো এই সময় দেখা যাবেনা।

না, আর কয়েকদিন বাদে, এই মাসের শেষে সূর্যোদয়ের আগে ভোরের আকাশে শুক্র দেখা দেবেন। দেবগুরু বৃহস্পতি এ মাসের প্রথমে সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশে ছিলেন, এখন আর তিনি আকাশে নেই, মহারাজ ভিতরে আসুন হিম পতনের সময়, শরীর সহ্য নাও করতে পারে।

আঙিনা থেকে অবন্তীরাজ আশ্রমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তাঁর বসার জায়গাটি সাজিয়ে রেখেছে তাম্রধ্বজ। প্রদীপ হাতে সে ভর্তৃহরিকে পথ দেখালো। মৃদু, নরম আলোয় এখন রাজা ভর্তৃহরি এবং আচার্য বৃষভানু মুখোমুখি। বাতায়ন খোলা ছিল। খোলা বাতায়ন পথে চাঁদের আলো এসে প্রবেশ করছিল ভিতরে। জ্যোৎস্না এসে পড়েছে রাজার গায়ে। তিনি হাত নেড়ে প্রদীপটি নিভিয়ে দিলেন। বেশ তো জ্যোৎস্না আছে।

হ্যাঁ, এখনো কুয়াশা প্রবল হয়নি, আকাশ কীরকম পরিষ্কার তা তো দেখলেন।

রাজা চুপ করে থাকলেন। তাম্রধ্বজ ঘরের কোণে অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে বসে আছে। সে এখানে আসার পর এই তৃতীয়বার এলেন ভর্তৃহরি। এবার কেমন বিষণ্ণ। আজ কার্তিক পূর্ণিমা, দীপাবলী গেছে এইমাসের প্রথমে। একপক্ষ বাদেই উজ্জয়িনী নগরে আবার মেলা। এই মেলাটি পশুর। কিন্তু এ মেলায় বৈচিত্র্য তো বেশি। আজ সকালেই আচার্য বলছিলেন, এবারে বেশি পশু আসেনি। উজ্জয়িনীর এই মেলায় মরুদেশের উট, পূর্বদেশের হাতি, তিব্বতের টাঙ্গন অশ্ব, এমনকি কম্বোজের বেগবান অশ্বও আসে। এ ব্যতীত ময়ূর, কবুতর, নানা পাখি প্রচুর বিক্রি হয়। মেষ, গো-মহিষাদি, রাসভ আসে প্রচুর পরিমাণে। কার্তিক পূর্ণিমার সকালে শিপ্রাতীর অসংখ্য পশুর হাঁক ডাকে ভর্তি হয়ে যায়। পূর্ণিমার আগের রাতটি শুক্লচতুর্দশীর সমস্ত রাত জুড়ে পশু নিয়ে ব্যাপারিরা প্রবেশ করে নগরে। আচার্য কতরাত পর্যন্ত জেগে ওপাশের পথ অতিক্রম করা পশুর পালকে দ্যাখেন জ্যোৎস্নায়। তাদের ডাকে চতুর্দশীর রাতের স্তব্ধতা ভেঙে যায়। তাদের সঙ্গে আসা, বিশেষত রাসভ নিয়ে আসা গ্রাম্যমানুষজন আশ্চর্য সুরে গান ধরে। সে গান তাদের গলাতেই শোনা যায়। আচার্যর কানে তা লেগে আছে। গতরাতে কিন্তু স্তব্ধই ছিল রাত। পশুর পাল যে যায়নি তা নয়, কিন্তু খুবই কম।

রাজা বললেন, অনাবৃষ্টির কারণ জানতে পেরেছেন?

বৃষভানু বললেন, শুক্রগ্রহ...! থেমে গেলেন বৃষভানু, কয়েকদন্ড বাদে বললেন, না মহারাজ।

রাজা বললেন, গো-ধূম বপনের সময় পার হতে যাচ্ছে, মৃত্তিকায় আর্দ্রতা নেই, এমন তো কখনো হয়নি, গো-ধূম যারা বপন করেছিল, বলছে, অঙ্কুরোদ্গম হয়নি।

বৃষভানু বললেন, কখনো কখনো এমন হয়, অনাবৃষ্টি, ফসলহানি, এসব প্রকৃতির খেয়াল।

শুধুই খেয়াল, আর কিছু নয়?

বৃষভানু বললেন, হয়ত তাও নয়, এও বোধহয় প্রাকৃতিক নিয়ম, অনাবৃষ্টি কি আমরা দেখিনি?

পরপর দুটি বর্ষা মেঘহীন, এমন অনাবৃষ্টি কি সিংহাসনে আরোহণের পর হয়েছে কখনো?

বৃষভানু বললেন, মহারাজ উদ্বিগ্ন হবেন না, মানুষের শরীর যেমন প্রতিটি দিন একরকম থাকেনা, কখনো আলস্য আসে, কখনো তপ্ত হয় শরীর, কখনো অসুস্থ হয়, প্রকৃতিও তো সেইরকম।

ভর্তৃহরি মাথা দোলাতে লাগলেন, কিন্তু শরীরের তপ্ততা, শীতলতা, আলস্যর তো কারণ থাকে,

বৈদ্যরা তা জানেন, সেই মতো বিধান দেন, তাতে শরীর পূর্বাবস্থায় ফেরে, আমি জানতে চাই সেই কারণটি কী, আপনি গণনায় কী পাচ্ছেন?

বৃষভানু কিছুই পাননি। তিনি গণনা করে, আকাশের গ্রহ তারার অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে তেমন কিছু পাননি যা দিয়ে অনাবৃষ্টির কারণ নির্ণয় করা যায়। গ্রহদের সঞ্চরণে কোনো ব্যতিক্রম হয়নি।

রাজা ভর্তৃহরি বললেন, এবারেও আশ্বিনের আরম্ভে হিমপতন দেখা গেছে।

জানি। বললেন বৃষভানু, দেখে বিস্মিত হইনি।

হিমপতন তো বর্ষা অবসান সূচিত করে, গতবারের মতো এবারেও বর্ষা হলো না, অথচ...।

বৃষভানু বললেন, বৃষ্টি হয়নি বলেই শরতের আরম্ভে হিমপতন, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, আমি দেখছি অনাবৃষ্টির কোনো সূত্র যদি বের করা যায়।

আপনি কি গত শ্রাবণ মাসে বৃশ্চিক মন্ডলের তারা জ্যৈষ্ঠা নক্ষত্রটিকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন?

বৃষভানু বিস্মিত হলেন, কেন?

কোনরকম ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছিলেন?

মাথা নাড়লেন বৃষভানু, না, আপনি তো জানেন, গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান, সঞ্চরণ সবই মহাজাগতিক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ, তা ভাঙা তো সহজ নয়, ব্যতিক্রম নজরে আসেনি।

অবন্তীরাজ অধরোষ্ঠ দংশন করলেন। আচমকা উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, বৃশ্চিক রাশিকে এখন কি দেখা সম্ভব?

দক্ষিণ পশ্চিম দিগন্তে দেখেছি গতমাসে, এই মাসের প্রথমেও দৃষ্টি গোচরে ছিল, এখন নেই সূর্যাস্তের সঙ্গেই অস্তমিত হয়েছে।

রাজা বললেন, শ্রাবণে দক্ষিণ আকাশে বৃশ্চিক রাশির তারাগুলিকে দেখেছিলাম আমি, এবার মেঘহীন আকাশের কারণে দেখা সম্ভব হয়েছিল, আমার মনে হয়নি কিন্তু একজন বলছেন ওই সময় বৃশ্চিক রাশিমন্ডলের সবচেয়ে উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণের জ্যৈষ্ঠা নক্ষত্রটির রং পরিবর্তিত হয়েছিল, নক্ষত্রটি নাকি নীলাভ শ্বেত বর্ণের হয়ে গিয়েছিল, এর অর্থ ওই নক্ষত্র তপ্ত হয়েছিল তখন, অবন্তীর মাটিতে তাই বৃষ্টি নামেনি।

বৃষভানু দাঁড়িয়েছেন। অবাক হয়ে অবন্তীর রাজা ভর্তৃহরির কথা শুনছেন। এ এক আশ্চর্য কথা। জ্যৈষ্ঠা নক্ষত্রের রং বদলে গিয়েছিল। কে বলেছে এই কথা? এও কি সম্ভব? নতুন কোনো জ্যোতির্বিদ এলেন নাকি এদেশে? তিনি জানবেন না?

রাজা বললেন, নতুন কোনো তারা দেখেছেন কি আপনি?

জৈষ্ঠা নক্ষত্রের রঙ বদলের কথা, নতুন তারার কথা কে বলেছে আপনাকে?

ভর্তৃহরি চুপ করে থাকলেন। ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আঙিনায়। নরম শীতের ভিতরে শিপ্রা নদীর দিকে হাঁটছেন রাজা। তাঁকে অনুসরণ করেছেন বৃষভানু। বৃষভানুর পিছনে একটু তফাতে তাম্রধ্বজ। হাজার হাজার তারার কয়টিকেই বা চেনে মানুষ, এর ভিতরে নতুন তারার খবরও পেয়েছে। গ্রহ নক্ষত্রাদির বয়স কত সহস্র কোটি বছর। তাঁরা নতুন করে কি আবার জন্মাবেন?

বৃষভানু জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় সেই তারা?

আষাঢ়, শ্রাবণ, দুই মাসে পশ্চিম দিগন্তে শুক্র অস্তগামী হলে জেগে উঠত পূর্ব আকাশে, তারপর সমস্ত রাত্রি ধরে পশ্চিম গমন করত, ভোরের আগেই, মধ্যরাতে অস্ত যেত, রাজা বললেন।

দ্রুত সঞ্চরণ করত?

হ্যাঁ।

কে বলেছে, সেই জ্যোতির্বিদের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই, আপনি কি দেখেছেন মহারাজ, কোনো নিয়মেই এমন তারা দৃষ্ট হতে পারে না, সূর্যোদয়, সূর্যাস্তের একটি নির্দিষ্ট কাল আছে, দিবস ও রাত্রির কাল আছে, আমি দেখেছি আকাশের গ্রহ তারার উদয় অস্ত, সঞ্চরণ সবই এই কালের সঙ্গে শৃঙ্খলে বাঁধা। শুক্রগ্রহ যখন অস্তে যান সেই সময়ে উদয় হলে, মধ্যরাতে সেই তারা অস্তগামী হবে কীভাবে? পূর্ব দিগন্ত হতে পশ্চিম দিগন্ত ভ্রমণ করতে একটি নির্দিষ্ট কালের ব্যবধান তো থাকবেই।

ঘুরে তাকালেন ভর্তৃহরি। কথা থামিয়ে দিয়েছেন আচার্য। ভর্তৃহরির দুটি চক্ষু দীপ্ত হয়ে নিভে গেল

যেন। তিনি ঈষৎ নত হয়ে বললেন, আমি এবার যাব, আমি যা শুনেছি তা বললাম, কথাটি আপনার কাছেই রাখবেন।

কিন্তু সেই জ্যোতির্বিদকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনার সম্মুখে।

হাসলেন ভর্তৃহরি, থাক, কথাটা সত্য কিনা আমি জানতে চেয়েছিলাম, আপনার কথায় প্রত্যয় হলো, আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

রাজা চলে গেলেন জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে। শিপ্রাতীর ধরে হেঁটে তিনি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গুপ্ত পথ দেবপথে প্রবেশ করবেন। সেখানে পাথরের আড়ালে তিনি রেখে এসেছেন ঘৃতের প্রদীপ। সুড়ঙ্গ পথটি বড় অন্ধকার। এই পথের কথা তিনি জানেন। জানেন রাজমহিষী ভানুমতি। এ পথ রাজা-রানীর পথ। এ পথের খোঁজ রাজা তাঁর উত্তরাধিকারীকে দিয়ে যাবেন। যদিও প্রধান সেনাপতির জানা উচিত এইপথের দিক নিশানা। অবন্তীর প্রধান সেনাপতি, রাজা ভর্তৃহরির বৈমাত্রেয় অনুজ বিক্রম জানেন না পথটি কোথায়। সে, কৌতূহলও প্রকাশ করেনি তাঁর কাছে।

রাজা ভর্তৃহরি চলে গেলে তাম্রধ্বজ এসে দাঁড়ায় বৃষভানুর সামনে, গণনায় কিছুই বেরোয়নি আচার্য?

মাথা নাড়লেন বৃষভানু, কোনো ব্যতিক্রম চোখে পড়েনি আমার।

তাম্রধ্বজ বলল, উনি যে নতুন তারার কথা বলছেন।

জানিনা।

বর্ষার মেঘ অন্তর্ধান করেছে অবন্তী থেকে, আষাঢ় শ্রাবণের রাশি, গ্রহের সন্নিবেশ কী প্রকার ছিল?

সে-তো আষাঢ় শ্রাবণেই দেখিয়েছিলাম।

আপনি যে আবার গণনা করছিলেন?

বৃষভানু জবাব দিলেন না। তিনি জ্যোৎস্নালোকিত চরাচর, আকাশ দেখছিলেন। তাম্রধ্বজ চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করল, মানুষ যদি নিরুদ্দিষ্ট হয়, তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব কোন গণনায়?

বৃষভানু ফিরলেন তাম্রধ্বজের দিকে, জিজ্ঞেস করলেন, কে নিরুদ্দিষ্ট হলো?

তাম্রধ্বজ বলল, আপনি চেনেন আপনার কাছে সে আকাশ চিনেছিল, গম্ভীরা থেকে দীপাবলীর সকালে একজন এসেছিলেন। তাঁর পুত্র এবং সখাপুত্র দুজনেই...।

বৃষভানু বুঝতে পারলেন। তিনি এও জানেন না। তিনি যে এ বিদ্যা জানেন তা তো কখনো বলেননি। বৌদ্ধ মহাযানি তান্ত্রিকরা এসব গণনা জানে, তিনি শুনেছেন তা। তাম্রধ্বজ বৃষভানুর পিছনে পিছনে হাঁটছে। বৃষভানুর নিজেকে কেমন অজ্ঞানী মনে হচ্ছে। রাজার জিজ্ঞাসার কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি। এখন তাম্রধ্বজের কথার কোনো জবাব দিতে পারছেন না। আবার আকাশে তাকালেন তিনি। আকাশের লিখন পড়ার ক্ষমতা তাঁর নেই।

তাম্রধ্বজ বলল, অবন্তী দেশে, এই উজ্জয়িনীতে দশার্ণ দেশের এক ব্যাপারি এসেছিল দীপাবলীতে, তার যাবতীয় খাদ্যশস্য লুট হয়ে গেছে আসার পথে।

সে কী! ঘুরে তাকালেন বৃষভানু।

আর এক বণিক ক্রয়বিক্রয়ের পর ফিরছিল নিজ দেশে, তারও সব গেছে।

তুমি কী করে জানলে?

আজ সকালে পশুমেলায় শুনেছি, বলছিল অনেকে।

এমন তো কখনো হয় না অবন্তীদেশে।

হয়েছে, রাজাকে কেমন বিপন্ন মনে হয়নি আপনার?

মনে হয়েছিল বৃষভানুর। তাম্রধ্বজের কথা যদি সত্য হয়, রাজা তো বিপন্ন বোধ করবেনই। দুজনে এখন আঙিনায়। তাম্রধ্বজ বলল, মাসে মাসে, ঋতুতে ঋতুতে কত তারা আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়, এই যেমন এখন সপ্তর্ষি আকাশে নেই, কবে আবার ফিরবে তাতো আপনি জানেন।

জানি। বললেন বৃষভানু, তুমিও তো জান।

জানি, মাঘ মাস থেকে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করবেন সপ্তঋষিরা, ফাল্গুনে সাত মহাজ্ঞানী ঋষিদের উত্তর পুব আকাশে দেখা যাবে, ছায়াপথ তখন দিক বদল করবে, উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হবে।

কিন্তু আকাশের গ্রহতারা কখন কোন সময়ে দৃশ্য হবেন, অদৃশ্য হবেন, নিরুদ্দিষ্ট তারা কখন কোন ঋতুতে ফিরে আসবে আকাশমন্ডলে তা যদি জানা যায়, একটি মানুষ নিরুদ্দিষ্ট হয়ে কখন ফিরে আসবে তা কেন অজানা থাকবে?

বৃষভানু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন শিষ্যের দিকে। তিনি প্রাঙ্গণে শিউলি গাছটির নিচে বসেছেন শিশিরে সিক্ত মাটিতে। তাম্রধ্বজ তার সামনে বসে। বৃষভানু তাকে বললেন, তাঁর পুত্রটি হন যুদ্ধে নিরুদ্দিষ্ট, সখা ধ্রুবের পুত্র ত্যাগ করেছে অবন্তী দেশ, তা তুমি জান? কেন সে চলে গেছে তা জান?

শুনেছি।

বৃষভানু বললেন, আকাশের গ্রহ তারা এক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ, তার ব্যত্যয় ঘটতে আমি দেখিনি এ জীবনে, মানুষের জীবন তো তা নয়।

মানুষ তো গ্রহ তারার অধীন।

তাই তো জানি। বৃষভানু আকাশে তাকালেন। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা টের পাচ্ছেন তিনি। তাম্রধ্বজ যে ভাবে বলছে। তাকি সত্যিই জানা সম্ভব? জন্ম মুহূর্তের গ্রহ, রাশির সন্নিবেশ কি মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে? এ বিদ্যায় কি মানুষের জীবন, জন্মের সব সত্য জানা যায়? তাম্রধ্বজকে তিনি বললেন, কী বলেছ তুমি শিবনাথকে?

আমি গম্ভীরায় গিয়েছিলাম, দুইদিন আগে।

কেন?

এমনি, সাধও ছিল গম্ভীরা নদীটিকে দেখি, কৌতূহল আরো ছিল।

কেমন দেখলে?

তাম্রধ্বজ চুপ করে থাকে। সে গিয়েছিল, গিয়ে দেখে এসেছে তাপসী উমার মতো দুই নারীকে, মা ও কন্যা। মা রেবা, কন্যা গন্ধবতী। দুটিই দুই নদী। তাম্রধ্বজ তারপর তাদের দুজনের, ধ্রুবপুত্র এবং কার্তিককুমারের জন্মপত্র লিখে এনেছে। লিখে এনেছে তাদের গৃহত্যাগের দিনক্ষণ। কিন্তু শুধু এইটুকু। এ সব নিয়ে সে কী করবে বুঝে উঠতে পারছেনা। কী সুন্দর মা ও মেয়ে। দু'জনে পাশাপাশি বসেছিল দাওয়ায়। সে বসেছিল আঙিনায় একটি আসনে। তার মুখোমুখি বসেছিল বৃদ্ধ শিবনাথ। সে যখন উঠে আসে, দুই নারী নেমে এসেছিল আঙিনায়। তাদের চোখমুখে ছিল কাতর প্রার্থনা। গন্ধবতী তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, এমন কোনো বিদ্যা সে জানে কিনা, যার বলে নিরুদ্দিষ্ট মানুষকে দেখা যায়।

এ বিদ্যার কথা গন্ধবতী কোথা থেকে শুনেছে? জিজ্ঞেস করেছিল তাম্রধ্বজ।

শুনেছে সে, বৌদ্ধ তান্ত্রিকরা নাকি ভূত ভবিষ্যৎ সবই দেখতে পান। গম্ভীরা পার হয়ে আরো দূরে এক বিজন অরণ্য পাহাড়ের কোলে নাকি এমন এক মহাজ্ঞানী এসেছেন, তার কাছে যাবে কিনা মা ও মেয়ে তা ভাবছে।

বৃষভানু বললেন, ওইসব মহাযানি তান্ত্রিকদের চেয়ে অজ্ঞানী আর কেউ হয় না।

তাম্রধ্বজ বলল, কিন্তু জন্মপত্র, অন্যান্য দিনক্ষণ সব এনে আমি তো কিছুই করতে পারছিনা, আমি কেমন বিপন্ন বোধ করছি, কার্তিক পুর্ণিমার পরে যাব বলেছি, তারা অপেক্ষা করবে।

বৃষভানু কিছু বললেন না। তিনি গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন, কার্তিককুমারের কন্যাটির বয়স কত?

ত্রয়োদশী হবে।

আকাশে তাকালেন বৃষভানু। ত্রয়োদশী আর পূর্ণিমার তফাৎ আর কতটুকু। বরং ত্রয়োদশী ক্রমশ ভরে উঠে পূর্ণিমার দিকে যাবে। তাম্রধ্বজের চোখে তাকালেন তিনি। চোখ নামিয়ে নেয় যুবক। চোখের মণি ছলছল করছিল তা চোখে পড়েছে তাঁর।

তার কি বিবাহ স্থির? জিজ্ঞেস করলেন বৃষভানু।

মাথা নাড়ে তাম্রধ্বজ। বৃষভানু ভিতরে ঢুকে গেলেন। তাম্রধ্বজ ভিতরের আঙিনাটিতে দাঁড়িয়ে থাকল। আকাশের তারা অভিজিৎ, শ্রবণাকে মাথার উপরে পর পর দেখল। ঘুরে ঘুরে নক্ষত্র, গ্রহগুলিকে দেখতে থাকে। জ্যোৎস্নায় আলো হয়ে আকাশে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকে। ক্রমশ তার দৃষ্টি থেকে আকাশ সরে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠল এক শান্তিময়ী মুখশ্রী। অপলক দৃষ্টিতে আকাশ থেকে

দেখছে তাম্রধ্বজকে। সে অপেক্ষা করছে ধ্রুবপুত্রের জন্য। কে ধ্রুবপুত্র, যে নাকি নগরের প্রধান গণিকার প্রেমে অজ্ঞান হয়ে, অপমানিত অবস্থায় ত্যাগ করেছে এই অবন্তীদেশ। কী সুন্দর ওই কন্যা! ভাবতেই থরথর করে কেঁপে উঠে তাম্রধ্বজ। যতবার ভাবছে গম্ভীরা নদীর কথা, মনে পড়ে যাচ্ছে গন্ধবতী নদীর কথা। যতবার শিপ্রাতীর থেকে পুবে গন্ধবতীর কূলে দাঁড়ানো মহাকালেশ্বর মন্দিরের স্বর্ণচূড়া দেখছে মনে পড়ে যাচ্ছে গ্রাম-বালিকাটির কথা। সে একা একাই এগিয়ে এসে বলেছিল, আপনি বলুন সে কোথায় আছে, সে হুন রাজ্যে আশ্রিত হয়নি তো?

কথাটি বলতে পারলে কী সুন্দরই না হতো? বালিকা, কিশোরী নিশ্চিন্ত হয়ে হাসতে পারত। ফিরতে ফিরতে আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে তাম্রধ্বজ দেখেছিল পথের ধারে নিমগাছটিকে বেড় দিয়ে তার দিকেই চেয়ে আছে গন্ধবতী।

পাঁচ

রেবা জিজ্ঞেস করল, কতদিন গেল?

গন্ধবতী অস্ফুটস্বরে বলে, অঘ্রান মাস যাচ্ছে, আর তিনটি মাস, ছয় পক্ষবাদে চৈতি পূর্ণিমা, ঘোর বসন্ত ছিল, পাতা ঝরছিল বিরামহীন, কাপাসের তুলো উড়ছিল, ভ্রমর ঘুরছিল, আমের মঞ্জরীর কী সুগন্ধ, মা তোর মনে নেই, সেদিন ছিল মদনোৎসব।

রেবা ত্রস্ত হাত তোলে, থাক সুগন্ধা থাম, আশ্বিন মাসে আমের মঞ্জরী কোথায়, ওই সময়ে মদনোৎসবই বা কোথায়?

কথাটা শুনতে পায় না বোধহয় গন্ধবতী, ফিসফিস করে বলে, কামদেবের মন্দিরে গেলাম, পুজো দেব, সবাই গেছে সেদিন ওখানে, রানী এসেছিলেন, এসেছিলেন উজ্জয়িনীর কতো সব সুন্দরী, কন্দর্পের মতো তাদের প্রেমিক, ভালবাসার জন, আবীর নিয়ে ফুল নিয়ে এ ওর পিছনে ছুটছে, ফুল ছুঁড়ছে, আবীর ছুঁড়ছে, অশোক ফুলে বাগান মন্দির চত্বর রঙিন।

রেবা বিড়বিড় করছে, সে ছিল আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা সপ্তমী, আকাশ তারায় তারায় ভরা, সমস্ত রাত আমি বসেছিলাম আঙিনায়, হিম পড়তে শুরু করেছে তখন, দিনখানি মনের ভিতরে আঁকা হয়ে আছে।

গন্ধবতী এবারও যেন শুনতে পায় না। সে বিভোর হয়ে আছে চৈত্রপূর্ণিমার দিনটিতে। কামদেবের মন্দিরে, মদনোৎসবে সেই তার প্রথম যাওয়া। মা পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে পার্বতী বুড়ি। বুড়ি খুব কুটনি। ফিরল আঁচলভরে অশোক বকুল নিয়ে। সখা, ধ্রুবপুত্র ছিল ঘরবন্দী হয়ে। কামদেব, কন্দর্পের রূপখানি তার চোখের সামনে ভাসছে তখন। চোখের সামনে ভাসছিল আবীর, কুমকুম, অশোক ফুলে রঞ্জিত, কাম জর্জরিত প্রেমিক-প্রেমিকাদের মুখ। পুরুষরা সবাই কামদেব। সব প্রেমিকই সেদিন কামদেব। কী সুন্দর তিনি। সুচারু নাসিকা, উরু, কটি, জঙ্ঘা সুবৃত্ত। কুসুমরঙের বস্ত্রটি তাঁর কটিদেশ আবৃত করেছিল। বিস্তৃত বক্ষদেশ। তাঁকে দেখে ধ্রুবপুত্রের মুখখানি মনে পড়েছিল তার। শিহরিত হয়েছিল একা একা। কী সুন্দর তাঁর রূপ! চক্ষুদ্বয়, মুখ, ওষ্ঠাধর, পদতল, নখ সবই আরক্তবর্ণ। তিনি বকুল ফুলের স্তূপে বসেছিলেন মকর বাহন নিয়ে। মন্দিরে, বিগ্রহের চতুর্দিকে নববকুলের গন্ধ, হাতে কুসুমধনু, কুসুমশর—পুষ্পবাণ নিক্ষেপ করলেই প্রেমিক প্রেমিকারা উদ্বেল হয়ে উঠবে প্রেমে। ঘৃত প্রদীপের উত্তাপ নিয়ে ফিরে এসেছিল গন্ধবতী।

মা রেবা বলল, পাঁচটি বৎসর যেন কতকাল! কতকাল গেল!

দীর্ঘশ্বাস কানে আসতেই গন্ধবতী লজ্জায় অধোবদন হয়। তার দু'চোখে বিষাদ আসে। মা একটি তিথির সঙ্গে আর একটি তিথি মিশিয়ে দিচ্ছে। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথির কথা বলছে মা। সেদিন এক যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল। সেই যাত্রা শেষ হয়নি। শেষে প্রত্যাবর্তন করেনি এ বাড়ির মানুষটি। পিতার মুখখানি তার চোখের উপর থেকে সরে যাচ্ছে ক্রমশ। ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। সেই মুখ গিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ধ্রুবপুত্রের মুখখানি। গন্ধবতীর মনে পড়ে পিতা কার্তিককুমারের ধূসর হয়ে আসা মুখখানি। ডাক শোনে যেন গন্ধবতী। কে ডেকেছিল সুগন্ধ সুগন্ধা বলে? কবে, কোনদিনে, কোন কালে, কোন তারার আলোর ভিতরে? মাথার উপরে জেগে উঠেছে তখন আকাশগঙ্গা, তার ভিতরে

শ্রবণা নক্ষত্রটি। অভিজিৎ, স্বাতী নক্ষত্রটি জ্বলজ্বল করছিল আকাশগঙ্গার ওপারে। ছিল ধ্রুবতারা, সপ্তঋষি, আর শতভিষা। মানুষটি আঙিনায় দাঁড়িয়ে ওই সব নক্ষত্রদের প্রণাম করছিল। মনে পড়ে সব। বিকেলে হরিদ্রাবর্ণের পাগড়িটি কতবার যে বেঁধেছিল, কতবার খুলেছিল সেই কার্তিককুমার। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ডাকল, সুগন্ধা মা, মা সুগন্ধা সুগন্ধা আমার....। সবই মনে আছে তার, শুধু মুখখানি কেন যে আবছা হয়ে আসে। বাবা তার যুদ্ধে গিয়েছিল। হুন দমনে।

রেবার সম্বিত ফেরে এতক্ষণে। সে এমন হতভাগিনী যে মেয়ের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে নিজের দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে দিচ্ছে। তার যৌবন আর কতদিন! সুবৃষ্টির অভাবে মাটি যেমন পাথর হয়ে যায়, তার তো তেমনই হয়ে যাওয়ার কথা। সেই মানুষ কি ফিরবে? না ফিরলেও তার জন্য তো বসে আছে সে। ফিরবে জেনেই তো বসে আছে।

রেবা ডাকল মেয়েকে, কী বলছিলি, তুই চৈতি পূর্ণিমা, মদনোৎসব?

গন্ধবতীর আয়ত চক্ষুদুটির প্রান্তে জেগেছে শ্যামরেখা। মায়ের দিকে ফিরেছে সে। মা দেখল মেয়ের রূপ যেন তপস্বিনীর। মেয়ে ঘুমোয় না রাতে। মালা গাঁথে না, কবরী বাঁধে না। এই হেমন্তের কুন্দফুল তার কত প্রিয়ই না ছিল। কুন্দফুলে নিজেকে সাজাতো সে। সব ছেড়েছে এখন।

গন্ধবতী ডাকে, এবার যেন শীত আগেই নামল মা।

রেবা চুপচাপ। সে বুঝল, মেয়ে মদনোৎসবের কথা বলতে চাইছে না আর। বলছে শীতের কথা। কোথায় শীত? অন্যান্যবার অঘ্রানে শীতের দংশন আরো বেশি থাকে। এবার তো ঠান্ডাই হচ্ছে না প্রকৃতি। শিশিরপতন শুরু হয়েছে অনাবৃষ্টির পর। এই শিশিরে শীত নামেনা। মেয়ে কেমন হয়ে বসে আছে। জবুথুবু, যেন কোনো বিগত যৌবনা, জরা যাকে দখল করে ফেলছে একটু একটু করে। বিড়বিড় করছে গন্ধবতী, কতগুলি পূর্ণিমা গেল তারপর, বৈশাখী পূর্ণিমা থেকে সামনে অঘ্রানের পূর্ণিমা, এক বছরের পরেও সাতটি পৌর্নমাসি তিথি গেছে, আর একটি আসছে মা, সেই রাতে দক্ষিণ আকাশে অগস্ত্য নক্ষত্র ছিল, সে ওই নক্ষত্রকে লক্ষ্য করে দক্ষিণ-পূর্বে হেঁটে গেল, উজ্জয়িনীর গা ঘেষে চলে গেল যেন।

রেবা আনমনা হয়ে বলে, অগস্ত্য নক্ষত্রের উদয় হলে ধীরে ধীরে মেঘের সঞ্চার হয় আকাশে, আকাশের দেবতা প্রসন্ন হন, জল নামে, অথচ ওই এক বছরও আরো সাতটি পূর্ণিমায় কতগুলি পক্ষ গেল, তেমন বর্ষা হলো কই, তোর ঠাকুর্দা জমিতে গো-ধুম বীজ ফেলেছে, অঙ্কুর ওঠেনি, যা-ও উঠেছিল, মরে যাচ্ছে, মাটি পাথর, সত্যিই কি সেই বছর, এই বছর অগস্ত্য ঋষির উদয় হয়েছিল?

হ্যাঁ মা, আমাকে তো ধ্রুবপুত্র সখাই চিনিয়েছিল আকাশ, তারপর থেকে কোনো তারা চিনতে ভুল হয় না, আমি অরুন্ধতীকে চিনি, দেখতে পাই আকাশে, ঋষি বশিষ্ঠের পাশে থাকেন, সপ্তঋষিরা সেই সময় ছিলেন উত্তর আকাশে, পরের চৈতি পূর্ণিমাতেও তাই ছিলেন।

মা অবাক হয়ে মেয়ের দিকে চেয়ে আছে। অরুন্ধতীকেও চিনিয়েছিল সেই হৃদয়হীন। অরুন্ধতীকে চেনালে তো গন্ধবতীকে ত্যাগ করে যাওয়ার কথা ছিল না তার। মুখ নামায় রেবা। মেয়ে একথা বলছে কেন, তা ভাবতে চেষ্টা করে। মনে পড়ে রেবার, বিবাহের পর এই আঙিনায় দাঁড়িয়ে সে অরুন্ধতীকে চিনেছিল। কার্তিককুমার তাকে দেখিয়েছিল। অতক্ষুদ্র নক্ষত্রটিকে কার্তিককুমার তার জন্য চিনে রেখেছিল যেন। আকাশের অতসব উজ্জ্বল প্রভাময়, প্রভাময়ী তারাদের না চিনিয়ে চেনাল অরুন্ধতীকে। চেনাতে হয় সহধর্মিনীকে, তাই চিনিয়েছিল। আর কার্তিককুমার তো সৈনিক। তাকে অরুন্ধতীকে চিনেই রাজার বাহিনীতে স্থান নিতে হয়েছিল। প্রতিটি সন্ধ্যায় সে তাকে ডাকত, রেবা, দেখতে পাচ্ছ অরুন্ধতী দেবীকে?

রেবা ফিসফিস করে, তোকে কি ধ্রুবপুত্রই চিনিয়েছিল, সে ই?

হ্যাঁ মা।

গন্ধবতী মাথা নিচু করে বসে আছে। তার দুচোখ আর্দ্র হয়ে উঠছে। সে তো জানে বিবাহের এটি একটি অংশ। বিবাহের কুশণ্ডিকা কালে নববধুকে দেখানো হয় অরুন্ধতীকে। মা নিশ্চয়ই দেখেছিল তা। তারপর এই গৃহে পা দিয়ে সন্ধ্যায় বাবা তাকে...। গন্ধবতী ফিসফিস করে, মা তুমি বাবার কথা বলো, কীভাবে বাবা গেলেন যুদ্ধে।

রেবা বলল, আশ্চর্য! সেদিন ছিল যাত্রার অমৃতযোগ, সন্ধ্যায় শতভিষা নক্ষত্র ওঠার পর তিনি যাত্রা শুরু করলেন, ভুলিসনি তো সুগন্ধা, যাবেন উত্তর-পুবে উজ্জয়িনীতে, সেখান থেকে পরদিন সকালে

সেনাবাহিনী দশপুরার দিকে যাবে, তিনি নদীর কূল ধরে উত্তরে গেলেন, তারপর পুবে হাঁটলেন। পরদিন অবন্তীর সেনাবাহিনী তো এই পথেই পশ্চিমে গেল, আমি সমস্ত রাত আঙিনায় বসে।

কৃষ্ণা সপ্তমীর সন্ধ্যা তো অন্ধকার ছিল।

ছিল, মাসটি ছিল আশ্বিন, ধারাবর্ষণের পরআকাশ পরিষ্কার, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে কত তারা জ্বলে উঠল উপরে, শ্রবণা, অভিজিৎ, সপ্তর্ষিমন্ডল, হংসমন্ডল, ধ্রুব, শতভিষা, তিনি তারার আলোয় পথ দেখেছিলেন, তিনি বীর, অন্ধকারে তাঁর কী ভয়?

মা সেই মানুষটি তো আর এল না?

চমকে ওঠে রেবা, কে, কে এল না? আচার্য বৃষভানুর শিষ্য, দশার্ণ দেশের সেই তাম্রধ্বজ, কার্তিকপূর্ণিমার আগে এসেছিল।

আসেনি, গণনায় কিছু পায়নি।

ঠাকুর্দার সঙ্গে এসেছিল, ঠাকুর্দা তো আর গেলেন না?

জানি না। চুপচাপ হয়ে গেল রেবা। সে তো গোপন ভয়ে দিনপাত করছে। কী পায় গণনায় সেই তাম্রধ্বজ। তাম্রধ্বজ আসেনি; যদি না আসে তো বেশ হয়। যেদিন প্রথম এসেছিল। সেদিন উৎসাহিত হয়েছিল রেবা। পরে ভেবেছে গণনা না করলেই হয়। যদি খারাপ খবর আনে তাম্রধ্বজ? হুন যুদ্ধে নিরুদ্দিষ্ট মানুষটিকে নিয়ে যে আশায় বুক বেঁধে আছে সে, সেই আশা যদি ভেঙে যায়?

ঠাকুর্দাকে আমি বলব?

না। রেবা অস্ফুট উত্তর দেয়, গণনা করে তো আগে ফেরান যাবে না তাকে, তার বিভ্রম কাটলে সে ফিরবে, ধ্রুবপুত্র ফিরবেই।

বাবা?

রেবা মাথা নিচু করে থাকে। মেয়ের তো বোঝা উচিত। মেয়েরও কি ভয় করছে না? জন্মপত্র, যুদ্ধযাত্রার দিনক্ষণ তাম্রধ্বজ নিয়ে যাওয়ার পর থেকে সে শান্তিতে নেই। শ্বশুর মশায় দীপাবলী যাওয়ার পর এক সন্ধ্যায় উদ্ধবনারায়ণের কথা বলেছেন তাকে। তারপর থেকে ভয় আরো বেড়েছে। ভয় তো বাড়বেই। সেও তো দুঃস্বপ্ন দেখেছে ক'দিন। ঘুম ঘোরে ডাকও যে শুনেছে কার্তিককুমারের। কী রূপবান স্বামী তার! কী তার দেহখানি! যুদ্ধযাত্রার আগে তাকে তো সে নিজ হাতে সাজিয়েছিল। স্বামীযুদ্ধে গেল বলে সে গলার স্বর্ণহারটি খুলে রেখেছিল। যাওয়ার আগে যে হরিদ্রাবর্ণের শাড়িটি এনেছিল কার্তিককুমার তার জন্য, সেটি পরবে পরবে করেও পরেনি। তুলে রেখেছিল তোরঙ্গে। ভেবেছিল দীপাবলীর আগেই হয়ত ফিরে আসবে সেনাবাহিনী, চার পক্ষে তো ফিরবেই সেনাদল। তখন যুদ্ধে জয়ী স্বামীর কপালে বিজয় তিলক এঁকে...। কত সাধ ছিল। সেনাবাহিনী ফিরেছিল অবশ্য মাঘী পূর্ণিমার আগে। অনেকদিন লেগেছিল যুদ্ধজয়ে। হুনজাতি দুর্ধর্ষ। যোদ্ধার জাত তারা। লুণ্ঠনকারী। সৌরাষ্ট্রের উত্তর সীমা থেকে সেই হুনজাতিকে তাড়া করতে করতে অবন্তীর সেনাবাহিনী নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। নিশ্চিহ্নও হয়েছে তারা। শোনা যায় আরো উত্তর পশ্চিমে সিন্ধুনদের তীরে তারা বসত করেছে। অবন্তীর সেনাবাহিনী বড় কাজ করেছিল ওই যুদ্ধে। লুণ্ঠনকারীদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল কৃষক, প্রজাদের। সবই হলো, কিন্তু কার্তিককুমার বিজয়ী সেনাদলের সঙ্গে ফিরল না। রেবার তো সব মনে পড়ে। কিছুই ভোলেনি সে। সেই কৃষ্ণা সপ্তমীর সকাল থেকে বহুদিন পড়ে থাকা, অব্যবহৃত তলোয়ার পরিষ্কার করেছিল মানুষটা। মাথার শিরস্ত্রাণ ঝকঝকে করে তুলেছিল তেঁতুল ঘষে। নরসুন্দর ডেকে ক্ষৌরকর্ম করিয়েছিল। যুদ্ধে যাওয়ার উত্তেজনায় মানুষটা ফুটছিল যেন সারাদিন। ঝকঝকে তলোয়ার নিয়ে ছুটে গেল কুটিরের পিছনে ঝোপঝাড়ের দিকে। সাঁই সাঁই করে তলোয়ার ঘোরাতে লাগল। তোর মনে পড়ে না সুগন্ধা?

অস্পষ্ট মনে পড়ে গন্ধবতীর। মালা গেঁথেছিল মা কুরন্টক ফুলে। চন্দন ঘষেছিল। মালা চন্দনে সাজিয়েছিল মা তার স্বামীকে। যাত্রাকালে পূর্ণকুম্ভ, ঘৃতের প্রদীপ সব দেখেছিল বাবা। শঙ্খধ্বনি করে মা দশদিকে জানিয়ে দিয়েছিল যুদ্ধে যাচ্ছে তার স্বামী কার্তিককুমার। বাবা চলে যাওয়ার পর মা যোগিনী হলো। চুল বাঁধে না, গায়ে অলঙ্কার রাখে না, রঙিন বস্ত্র পরে না। গন্ধবতী নিজের দিকে তাকায়। তাকিয়ে শিহরিত হয়। মা যা করেছে বাবা যুদ্ধে গেলে, সেও তো সেই পথে যাচ্ছে। তার গায়ে কি রং আছে? কোথায় রং, কোথায় অলঙ্কার, কোথায় তার কবরী? মা বেঁধে দিতে চাইলেও তো সে নিষেধ করে

মাকে। দাঁতে অধরোষ্ঠ দংশন করে গন্ধবতী। সে কার জন্য বসে আছে? সখা, ধ্রুবপুত্র? সে তো উজ্জয়িনীর সেরা গণিকা দেবদত্তার প্রেমিক, তার দ্বারা প্রত্যাখাত হয়ে নিরুদ্দেশে গেছে। সখার জন্য সে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে বসে আছে, সখা কি মনের ভিতরে এক বিন্দুও মেঘ রেখেছে তার জন্য?

গন্ধবতী বিড়বিড় করে, সে আর বোধহয় ফিরবে না মা।

রেবা মুখ তোলে, ধ্রুবপুত্রের কথা বলছিস?

হ্যাঁ মা।

রেবা নিশ্চুপ। মেয়ে তার কাছথেকে আশ্বাস নিতে চায়। কী আশ্বাস সে দেবে মেয়েকে? মেয়ে বুক বাঁধুক। অপেক্ষা করুক। বিরহে, প্রত্যাখানের বেদনায় পুড়ুক। কতটুকুই বা তার বিরহ? সে কি তার মাকে দেখছে না? যুদ্ধে নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছে। কত পূর্ণিমা তিথি গেল, কত কৃষ্ণা সপ্তমী পার হয়ে গেল, পথ তো শূন্য। শূন্য হয়ে যাচ্ছে সে নিজেও। রেবা বলল, ভালবাসিস, অপেক্ষায় থাক, কিন্তু কতকালই বা থাকবি অপেক্ষায়?

গন্ধবতী বলল, তাম্রধ্বজ না হোক, ওই পশ্চিমে কোন এক যোগিনী এসেছেন, পাহাড়ের কোলে থাকেন, তাঁর কাছে গিয়ে জানা যেতে পারে কী তার ভবিষ্যৎ?

না, তোর ভয় করে না?

গন্ধবতী বলে, কত ভয় নিয়ে বাঁচব মা, কত কষ্ট নিয়ে?

সে তো গণিকার প্রেমে পড়েছিল, তোর ঘেন্না হয় না?

কিসের ঘেন্না? অবাক হয় গন্ধবতী।

রেবার মনে হচ্ছিল মেয়েকে আঘাত করে। বিবাহের বয়স হয়ে এল। পার হয়ে যাবে এরপর। মেয়ে কার জন্য যোগিনী হয়েছে? সে কে? না, অকৃতজ্ঞ হৃদয়হীন এক পুরুষ যে এক গণিকার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে গিয়েছিল। তার জন্য কিনা তার মেয়ে বিরহে দিনপাত করছে। বৃদ্ধ শ্বশুর মশায় উদ্ধবনারায়ণের কথা বলেছেন। উদ্ধবনারায়ণ ওই কথা বলে ভয় দেখাতে চাইছে তা স্পষ্ট। উদ্ধব বিবাহ করতে চায় গন্ধবতীকে। রেবা উঠে দাঁড়ায়, ঘেন্না হয় না কেন তা দেখে আমি অবাক হই সুগন্ধা, সে তো তোকে ভালবাসে না, তুই তার জন্য নিদ্রা ছেড়েছিস, জানিস সে নাকি হুনরাজ্যে চলে গেছে সিন্ধুতীরে?

কে বলেছে? আর্তনাদ করে ওঠে গন্ধবতী।

সংবাদ এসেছে, তোর ঠাকুর্দা জানে।

না, এ হতে পারে না।

হতে পারে, তোর সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে সে, তোর দিকে ফিরেও তাকায়নি, উজ্জয়িনী গিয়ে সে কিনা....। রেবার গলা জড়িয়ে যায় উত্তেজনায়, প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, বেশ হয়েছে, আমি চাই না সে এখানে ফিরুক।

তোমার আজ কী হয়েছে মা?

কিছুই হয়নি, যা সত্যি তাই বলছি।

সত্যি নয় মা।

হাসল রেবা, খোলা চুলে ঝুঁটি বাঁধল মাথায়, বলল, তুই চোখ বুঁজে আছিস, এতে তো আকাশের সব তারা নিভে যাবে না, সূর্যও অকালে অস্ত যাবে না, শোন সুগন্ধা ওর আশা ত্যাগ কর, আমাদের তো বাঁচতে হবে, ওই উন্মাদের জন্য বসে থেকে কোনো লাভ নেই, ওতো নগরে প্রবেশ করলেই বন্দি হবে, ও তো হুন আশ্রয়ে আছে।

সব মিথ্যা।

রাজার কথা সত্যি।

রাজা বলেননি, রাজা ওকে চেনেন না।

চেনেন, রাজার কি নিজে চিনতে হয়, রাজার লোক চিনলেই রাজার চেনা হয়, উদ্ধবনারায়ণ রাজার লোক, সে যখন বলছে তা সত্যি হবেই, আর রাজগণিকা যখন....। থেমে যায় রেবা।

মিথ্যা বলছে উদ্ধবনারায়ণ।

সে রাজকর্মচারী, তার কথা মিথ্যে হতে পারে না, রাজা শুনেছেন সব কথা নিশ্চয়, রাজা তাঁর কর্মচারীর কথা যা শোনেন তা বিশ্বাস করেন, শোন সুগন্ধা, তুইও তো সেই ধ্রুবপুত্রের কাছে প্রতারিত, তার কথা আর উচ্চারণ করিস নে।

গন্ধবতী থরথর করে কাঁপছে। মা যে এই কথা বলবে তা কখনো ভাবেইনি সে। মা বরং তাকে বুক বাঁধতে বলেছে। গন্ধবতীর দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসতে থাকে। উদগত কান্না থামাতে সে দু'হাতে মুখ ঢাকে। রেবা বলল, কেঁদে কী হবে, মরীচিকার জন্য বসে থেকে লাভ কী, রাজার কর্মচারী বলেছে তোকে বিবাহ করবে...

না। আঘাত পাওয়া নাগিনীর মতো ফণা তুলে দাঁড়ায় গন্ধবতী। মাথা ঝাঁকাতে থাকে, বিড়বিড় করে, সে অসৎ।

সৎটি কে? সেই ধ্রুবপুত্র। উদ্ধবনারায়ণ যখন প্রস্তাব দিয়েছে আমরা সে প্রস্তাব ফেরাব কী করে?

সে প্রস্তাব দেয় কী করে, আমি আর একজনের জন্য বসে আছি।

থাক। থামা তোর কথা, আমাদের তো বেঁচে থাকতে হবে সুগন্ধা।

গন্ধবতী আর দাঁড়ায় না। পিছিয়ে যেতে থাকে। তার ভয় করছে। মায়ের এই অদ্ভুত আচরণের কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছে না সে। দুই হাতে মুখমণ্ডল ঢেকে সে উঠোন ছেড়ে পথের দিকে হাঁটল। যাচ্ছে গম্ভীরার পথে। রেবা তার পিছনে হাঁটছে। গন্ধবতীকে অনুসরণ করে টলতে টলতে হাঁটছে সে। তার যে কী হলো! কিছুই হয়নি। এই সত্য এখন মেনে নিতে হবে। হবেই। এরপর যদি মেয়ের যৌবন নষ্ট হয়ে যায় ওই উদ্ধবনারায়ণ কি ফিরে তাকাবে? কী সুন্দর তার মেয়ে। উদ্ধবনারায়ণকে বিয়ে করে মেয়ে প্রতারণার জবাব দিক। উজ্জয়িনীর সেরা সুন্দরীতে মজেছিল ধ্রুবপুত্র। তার জন্য কেন বসে থাকবে গন্ধবতী? উদ্ধবনারায়ণ ক'দিন আগেও নাকি তার শ্বশুর মশায়কে ধরেছিল। সেই মুক্তার হার নিয়ে তার সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছিল তা শিবনাথ বলেছে পুত্রবধূকে। রেবা অবাক হয়ে দেখে গন্ধবতীকে। এই যৌবনে কে না মুগ্ধ হবে? শুধু ধ্রুবপুত্রই কি না— ! গণিকা দেবদত্তা কত সুন্দরী? এই নবীন যৌবনের চেয়েও? রেবা দেখছিল হেমন্তের ধূসরিত পথের ধূলিতে গন্ধবতীর পদচিহ্ন আঁকা হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি চরণচিহ্ন যেন ফুলের মতো। নির্দয়া ধরণীতে স্থলপদ্মের রেখা দেখতে পাচ্ছে রেবা। নুপুরের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে রেবা। উন্মাদ সে। উন্মাদ না হলে এভাবে কষ্ট দেয় গন্ধবতীকে।

রেবা ডাকল, সুগন্ধা, দাঁড়া, আমার কথা শোন্।

ভয় নেই মা, আমি মরব না, নিরুদ্দেশে যাব না, আমি বসেই থাকব তার জন্য, আমি বসেই থাকব মা, তুমি যাও, আমি গম্ভীরার ধারে যাচ্ছি, আমার জন্য তুমি ভেব না ; তোমার কোনো কথাই যে সত্যি নয়, তা তো তুমিও জান।

ছয়

অবন্তীর পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র দেশ। সৌরাষ্ট্রের উত্তরে মরু। অপরা সমুদ্রের তীরবর্তী ওই দেশটি গুর্জরদের বাসভূমি। গণিকা দেবদত্তার দেহে গুর্জর রক্ত। সেই রক্তে এসে মিশেছে যবন গ্রীক রক্ত। তার মা রসমঞ্জরী ছিলেন সৌরাষ্ট্রের সুখ্যাত গণিকা, চৌষট্টি কলা ও শাস্ত্রজ্ঞ, নৃত্য-পটিয়সী, পরম গুণবতী। সৌরাষ্ট্রের এক ভূস্বামীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে তাকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল অবন্তী দেশে। সেই কাহিনী জানে দেবদত্তা। অবন্তীর বৃদ্ধরা জানে। দেবদত্তার কাছে শুনেছে চতুরিকাও। কতদিনের কথা তা। ঘটনাটি রাজা গন্ধর্ব সেনের আমলের, তিনি ছিলেন রাজা ভর্তৃহরির পিতা।

গন্ধর্ব সেন আশ্রয় দিয়েছিলেন সুন্দরী শ্রেষ্ঠা, গুণবতী, রসমঞ্জরীকে। রসমঞ্জরীর কোলে তখন চারমাসের মেয়ে দেবদত্তা, যার পিতা এক গ্রীক বণিক, যিনি হত হয়েছিলেন সৌরাষ্ট্রের ভূ-স্বামীর হাতে। যদি শেষরক্ষা হতো তাহলে রসমঞ্জরী ওই বণিকের সঙ্গে পাড়ি দিত বাহ্লিক দেশে, হিন্দুকুশ পর্বতমালার কোলে, অক্সাস নদীর তীরে। বণিক সেই দেশ থেকেই এসেছিল। পবিত্র অক্সাস নদী (রসমঞ্জরী বলত আকসু নদী), শস্য শ্যামলা বাহ্লিক দেশের কথা মা রসমঞ্জরীর কাছেই শুনেছিল দেবদত্তা। মা শুনেছিল তার সেই যবন-দেশীয় প্রেমিকের কাছে। দেবদত্তার মনে মায়ের কাছ থেকে পাওয়া আকসু নদী সম্পর্কে এক অলীক কল্পনা আছে, স্বপ্ন আছে। সে একবার অন্তত যাবে তার পিতৃভূমিতে। আকসুর জলে স্নান

করে পবিত্র হবে। বাহ্লিক দেশ, হিন্দুকুশ পর্বতমালা তার পিতৃভূমি। স্বপ্নে তার স্থান আছে।

সন্তান ধারণ করায় রসমঞ্জরীকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল সন্তান জন্মের জন্য। বাহ্লিক দেশ, আকসু নদী তো কম দূর নয়। সিন্ধুনদী পার হয়ে পুরুষপুর তক্ষশীলা গান্ধার কত দেশ পার করে পৌঁছতে হয় সেখানে। তিনটি ঋতুই হয়ত লেগে যেত সেই দেশে পৌঁছতে। পথও দুর্গম। নদী, পাহাড়, অরণ্য পার হতে হয় অত দূরে পৌঁছতে। রসমঞ্জরীর অপেক্ষাই তার বিপদ ঘটিয়েছিল। প্রেমিকের মৃত্যু হয়েছিল, ভু-স্বামীর হাত থেকে বাঁচতে তাকে সেই বর্ষার ভিতরেই পাড়ি দিতে হয়েছিল উজ্জয়িনী। আশ্বিনেই তারা রওনা হতো বাহ্লিক দেশের পথে। মায়ের কাছে সেই সব দিনের কথা শুনেছে দেবদত্তা।

রসমঞ্জরী উজ্জয়িনীতেই এসেছিল, কেননা গ্রীক বণিক অ্যান্টিওকাসের সঙ্গে উজ্জয়িনী হয়েই আকসু নদীর দেশে যাওয়ার কথা ছিল। তার আশা ছিল শেষপর্যন্ত বেঁচে থাকবে অ্যান্টিওকাস। বেঁচে থাকলে উজ্জয়িনীতেই আসবে। সে তো রসমঞ্জরীর কাছে শিপ্রা, গন্ধবতী, মহাকালেশ্বর মন্দিরের কথা শুনেছিল। শুনেছিল দূরদেশে যাওয়ার আগে রসমঞ্জরী মহাকাল দর্শন করে যাবে। আকসু নদীর মতোই শিপ্রা,গন্ধবতী অতি পবিত্র।

মা অপেক্ষা করেছিল তার প্রেমিকের জন্য। সমস্ত জীবনই ছিল তার অপেক্ষা। রাজা গন্ধর্ব সেন পড়েছিলেন রসমঞ্জরীর প্রেমে। মায়ের ছিল দুই টান। রাজা গন্ধর্ব সেনের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় তাঁকে কোনোদিন ফেরাননি তিনি। ফেরাবার সাধ্যও ছিল না গণিকার। তবুও সে তার আচরণেও তো কিছু বলতে পারে। রসমঞ্জরীর দ্বিতীয় প্রেম ছিল রাজা গন্ধর্ব সেন।

রাজা গন্ধর্ব সেন সৌরাষ্ট্রের কন্যার গুণের সমাদর করতেন। সে ছিল নৃত্যনিপুণা। মায়ের বিদ্যা দেবদত্তাও পেয়েছে। সৌরাষ্ট্রের রক্তও তো আছে তার ভিতরে। ওই দেশের বারাঙ্গণাদের মতো নৃত্য-পটিয়সী কেউ হয় না। সৌরাষ্ট্রের রমণীরা কোন এক দূর অতীতে নৃত্যশিক্ষা করেছিল দ্বারকার গোপিনীদের কাছে। গোপিনীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্যকলা শিখেছিল শোনিতপুরের রাজপুত্রী, বাণরাজার কন্যা উষার কাছে। উষা ছিলেন হিমালয়ের কন্যা পার্বতীর সহচরী। শাপভ্রষ্টা হয়ে উষা জন্মগ্রহণ করেছিলেন শোনিতপুরে। উষা লাস্য নৃত্য শিখেছিলেন পার্বতীর কাছে। পার্বতী তাঁর স্বামী মহাদেবকে মোহিত করার জন্য এই নৃত্যকলা সৃষ্টি করেছিলেন নিজে। রসমঞ্জরী থেকে দেবদত্তা যে লাস্য নৃত্যের অধিকারী তা আসলে পার্বতীরই। পার্বতীকে স্মরণ করা হয় লাস্য নৃত্যের মধ্য দিয়ে।

চতুরিকা নৃত্যশিক্ষায় এসেছে দেবদত্তার কাছে। রসমঞ্জরীর কন্যা দেবদত্তার তুল্য নৃত্যপটিয়সী এই অবন্তী দেশে আর কেউ নেই। চতুরিকা দাসী-কন্যা। তার মা ছিল গণিকা রসমঞ্জরীর সহচরী। মা নৃত্যকলা শেখেনি। রসমঞ্জরীর সেবা করতে করতেই তার দিন গেছে। চতুরিকা জানে গণিকাবৃত্তিতে সফলতার শিখরে উঠতে হলে নৃত্যকলা শিখতেই হবে। জানতে হবে চৌষট্টি কলা। এই দুই বিদ্যায় পারদর্শী না হলে গণিকার কাছে কেন আসবে পুরুষ? যৌবনকে মহার্ঘ করে তুলতে, যৌবনকে বিকশিত করে তুলতে এই দুই বিদ্যার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। এসব না জানা গণিকা তো শুধুই নর্মসহচরী হতে পারে পুরুষের। আর সে পুরুষও সামান্যজন, রাজপুরুষ তার দিকে ফিরেও তাকাবে না। তার দাম না থাকলে সে প্রত্যাখ্যানও করতে পারবে না কাউকে। পুরুষকে মুগ্ধ করতে নৃত্যের কোনো বিকল্প নেই। দেবদত্তা অবশ্য আরো অন্য কথা বলে, শুধুই পুরুষ কেন, নিজেকে জাগিয়ে তুলতে, নিজের শরীর মনকে শুদ্ধ করে তুলতে নৃত্যছন্দই প্রধান কলাবিদ্যা। কী সুন্দর বলে দেবদত্তা, এ দেহ ছন্দময়, দেহের ছন্দকে পরিস্ফুট করে তুলতেই নৃত্য। নিজেকে নিবেদন করতেই ঈশ্বর সন্ধান হয় নৃত্যের ভিতরে।

দেবদত্তা 'সমনখম' মুদ্রায়, পায়ের দুটি পাতা পরস্পরে সংশ্লিষ্ট করে, নখগুলি সমভাবে এনে, দুটি হাত দেহের দুপাশে লতার মতো বাড়িয়ে ধরে, উরু, জংঘা পরস্পরের সংস্পর্শে এনে বলল, এই হল সমনখম, দেহের কোনো ভার থাকবে না, এবার পতাকাঞ্জলি বুকে স্থাপন করে মুখখানির নিম্নভাগ এইভাবে সম্মুখে বাড়িয়ে দাও।

চতুরিকা অনুকরণ করছিল। যুক্তকর বুকে এনে অবিকল দেবদত্তার মতো হয়ে উঠতে চাইছিল, শুনতে পাচ্ছিল দেবদত্তার মধুর কণ্ঠে নৃত্যের শ্লোক উচ্চারিত হচ্ছে—পতাকাঞ্জলি বক্ষঃস্থং প্রসারিত শিরোধরম/নিকুঞ্চিতাং সকুটং চ তল্লীনং করণং স্মৃতম। বল দেখি চতুরিকে।

চতুরিকা হাসে, ও আমি পারি না।

দেবদত্তা বলল, নিজের ভিতরে নিজে ডুবে গিয়ে প্রার্থনা করতে হয় এই সময়, স্মরণ করতে হয় শঙ্কর, পার্বতীকে, নৃত্যের আদি গুরু এঁরা। যে কাহিনী বলেছি, শোনিতপুরের রাজকন্যা ঊষা, দ্বারকার গোপিনী, সৌরাষ্ট্রের কন্যাদের, তাদের কাছে প্রার্থনা কর মনে মনে। আমি মা রসমঞ্জরীর কথাও স্মরণ করি, মায়ের বিদ্যায় তো ধনী আমি, এই বিদ্যা তুই অর্জন করছিস, এই অবন্তী দেশে আমার মায়ের তুল্য কে ছিল নৃত্যে, এই দ্যাখ।

দেবদত্তা তার পতাকাঞ্জলি ত্যাগ করে দুটি হাত হাঁসের ডানার মতো কাঁপাতে থাকে। তারপর তার দুটি হাত আবর্তিত হতে থাকে। পলকের ভিতরেই বাহু, কাঁধ ও কনুইয়ের শীর্ষভাগগুলি দুটি হাতের সঙ্গে ঘুরিয়ে হাঁসের ডানার মতো করতল দুটি উল্টোভাবে রেখে স্থির হয় দেবদত্তা। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চতুরিকা। কয়েক দণ্ডের ভিতরে যে রূপ ফুটে উঠল দেবদত্তার তা দেখে ধন্য হলো যেন সে।

চতুরিকা বলল, তুমি কীভাবে পার?

দেবদত্তার পা দুটি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুটি ত্রিভুজ মুদ্রায় স্থিত হলো। কটিদেশে দুটি হাত এসে মিলল, ঠোঁটের কোণে এসে ফুটল আনন্দময় হাসির রেখা, দু-চোখ প্রস্ফুটিত হলো ফুলের মতো, প্রসন্নভাব এল সেখানে।

চতুরিকা বলল, অঘ্রান পূর্ণিমায় তুমি মহাকালেশ্বরের জন্য কোন নাচ বেঁধেছো?

দেবদত্তা বলল, সে তো মহাকালই প্রথম দেখবেন।

মহাকাল কি দেখবেন সত্যি?

দেবদত্তার পদযুগল পরস্পরকে অতিক্রম করল জঙ্ঘাদ্বারা। স্বস্তিক চিহ্ন ফুটে উঠল পদযুগলের বিন্যাসে। দুটি হাত নিম্নগামী, বুকের কাছে স্থির করে অধোমুখ হলো সে, অস্ফুটস্বরে বলল, অবন্তীর রাজা তো আসবেন।

যদি তিনি না আসেন?

যে প্রসন্নতা, যে দীপ্তিময়তা এসেছিল দেবদত্তার সর্বাঙ্গে, তা ক্রমে ক্রমে মুছে গেল। আঁখিপল্লব নিশ্চল হলো, দু'চোখের মণি নিম্নমুখী, স্থির, অনুজ্জ্বল। চোখের আলো নিভে গেল। ম্লান মুখখানি ধীরে ধীরে উপরে তুলল দেবদত্তা, দৃষ্টি অর্ধনির্মীলিত, অনুচ্চ গলায় সে বলল, তুই একবার যাবি?

চতুরিকা দুই হাতের জোড়বদ্ধ পতাকাঞ্জলি বুকের উপর স্থাপন করে একটু আগে দেখা নৃত্যের মুদ্রা আয়ত্তে আনার চেষ্টা করছিল। মুখমণ্ডলের নিম্নভাগ সম্মুখে প্রসারিত করার সময় তার করতলের সংযুক্তি ভেঙে যাচ্ছিল। এক অঙ্গের সঙ্গে অন্য অঙ্গ মেলাতে পারছিল না সে, মনে মনে স্মরণ করতে চাইছিল শঙ্কর, পার্বতী, গোপিনীদের। মগ্নতা তৈরি করতে পারছিল না সে, তার চোখের সামনে বিষণ্ণ দেবদত্তার মুখখানি, সে বলল, সখী, মহাকালে যাবেন হয়ত অবন্তীরাজ, রাজমহিষীও সঙ্গে থাকবেন।

কে বলেছে এই কথা? দেবদত্তার দৃষ্টি ঊর্ধ্বমুখী হলো, মুখমণ্ডলের বিষণ্ণতা কেটে গিয়ে জেগে উঠল প্রশান্তি, ফিসফিস করে বলল সে, আসুন না রাজমহিষী, তিনিও দেখে যাবেন দেবদত্তার নিবেদন, এমন তিনি এই অবন্তী দেশে আর দেখতে পাবেন না।

কথা শেষ করতে করতে দেবদত্তা কনুই থেকে ভেঙে প্রসারিত হাতটি মাথার কাছে চাঁদোয়ার মতো ভাসিয়ে দিল যেন। পাঁচ আঙুলে মৃগশীর্ষ মুদ্রা রচনা করল। ডান হাতটি বুকের কাছে ভেঙে, পাঁচ আঙুলে ওই একই মুদ্রা রচিত হলো। ডান পাটি ত্রস্ত, কটিদেশের বামপার্শ্ব ঈষৎ প্রকট হলো। নৃত্যের তালে দেবদত্তা কাঁপতে থাকে, ফিসফিস করে বলল, এখানে যদি আসতেন অবন্তীরাজ! রাজা গন্ধর্ব সেন মায়ের কাছে আসতেন, রাজা ভর্তৃহরির কত শিক্ষা আমার মায়ের কাছে।

পতাকাঞ্জলি ভেঙে দিল চতুরিকা, দেবদত্তার অনুকরণে দুই হাতে মৃগশীর্ষ রচনায় রত হলো, তারপর আচমকা বসে পড়ল মেঝেতে, বলল, তোমাকে দেখি সখী।

তোকে কে বলেছে রাজমহিষীও আসবেন?

কে বলেছে? চতুরিকা অধোমুখী হলো। কে বলেছে তা কি জানাবে? বলেছে উদ্ধবনারায়ণ। সে কী করে অবন্তীরাজের অন্দরমহলের খবর জানল তা জানে না চতুরিকা। জানতে চায়ওনি। উদ্ধব একদিন বলেছিল গণিকার কৌতূহল তার পেশাকে সাহায্য করে না। বরং ক্ষতিকারক। কৌতূহল যত, তা হলো উদ্ধবের। সে খোঁজ নেয় সুন্দরী, পরম রূপবতী, উজ্জয়িনীর সেরা গণিকা দেবদত্তার গৃহে কে এল?

কখন এল? চতুরিকা দাঁড়াল দেবদত্তার ইঙ্গিতে। দেবদত্তার কাছে এল। দেবদত্তার হাতে মুদ্রা এবার বদলে গেছে। ময়ূর হস্ত হয়েছে সে। অনামিকা আর অঙ্গুষ্ঠ পরস্পরে সংযুক্ত। অন্য আঙুল প্রসারিত। চতুরিকা দৃষ্টি প্রসারিত করে দেবদত্তার ঊর্ধ্বমুখী ডান হাতের পাশ দিয়ে খোলা জানালার বাইরে দূরে স্বর্ণমণ্ডিত মহাকাল মন্দিরের চূড়া দেখল। উজ্জয়িনীর বারাঙ্গনাদের ভিতর দেবদত্তার গৃহটি সবচেয়ে সুন্দর। তার মা রসমঞ্জরীর জন্য এই গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন গন্ধর্ব সেন। প্রতিটি ঘর থেকেই মহাকাল শীর্ষ দেখা যায়। জানালায় গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায় গন্ধবতীর বালুকাময় তীর, শীর্ণ জলধারা।

দেবদত্তা জিজ্ঞেস করল, অবন্তীরাজ সন্ধ্যায় যাবেন তো, চন্দ্রোদয় হলে?

মাথা দোলায় চতুরিকা, তা তো জানি না।

শরীর শিথিল করে দুটি হাতে নানা মুদ্রা রচনা করতে থাকে দেবদত্তা। মুষ্টিবদ্ধ দুই হাতের অঙ্গুষ্ঠ ঊর্ধ্বমুখী করে শিখর হস্ত হলো। ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠে তর্জনী ও মধ্যমা স্থাপন করে লীলায়িত ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। শ্বাসপ্রশ্বাসে তার ভরা বুক কাঁপছে। সে একটু নিচু হয়ে চতুরিকার কানের কাছে মুখ এনে বলল, যাবি তুই অবন্তীরাজের কাছে?

আবার! বিস্মিত চতুরিকা সরে দাঁড়ায়। মনে পড়ে কার্তিক পূর্ণিমার আমন্ত্রণ নিয়ে সে গিয়েছিল অবন্তীরাজের কাছে। গণিকা দেবদত্তা তার আঙিনায় নৃত্য প্রদর্শন করবে, অবন্তীরাজের উপস্থিতি ভিক্ষা করেছে। আমন্ত্রণের ভূর্জপত্র নিয়ে সে রাজগৃহের এক রক্ষী মারফৎ পৌঁছে দিয়েছিল রাজা ভর্তৃহরির কাছে। অপেক্ষা করেছিল। রক্ষী এসে তার হাতে তুলে দিয়েছিল চতুর্দশ স্বর্ণমুদ্রা। ফেরত দিয়েছিল ভূর্জপত্রখানি, বলেছিল, মহারাজ আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু তিনি অপারগ, অন্য ব্যস্ততা আছে ওইদিন।

চতুর্দশ স্বর্ণমুদ্রা ভাগাভাগি করে সাতটি হাতে নিয়ে ফিরে এসেছিল চতুরিকা। যে দাসী তাকে রক্ষীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিল তাকে দিয়েছিল দুইটি মুদ্রা। পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা কম কিসের? কিন্তু মনে হয়েছিল শূন্য হাত। শূন্য হাত তো নিশ্চয়। দেবদত্তার মুখখানি রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল তার আমন্ত্রণখানি অবিকল ফিরে আসায়। অবন্তীরাজ দেখেছেন কি দ্যাখেননি তার কোনো চিহ্ন ছিল না সেখানে। দেখেছেন তো নিশ্চয়, না হলে স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে এল কেন রক্ষী? কার্তিক পূর্ণিমাটি গেছে বিষাদে। সেদিন খোপা বাঁধেনি দেবদত্তা, ফুল সাজে সাজায়নি নিজেকে।

দেবদত্তা বলল, মা রসমঞ্জরীর কাছে আসতেন কুমার ভর্তৃহরি, আমার মা না থাকলে কি তার কাব্য প্রতিভার স্ফুরণ হতো, দান ছিল না মায়ের? মা-ই তো বলেছিলেন কুমার ভর্তৃহরির অন্তর অতি শুদ্ধ, সেখানে অধিষ্ঠান করেন দেবী সরস্বতী, তুই বল চতুরিকে তার মতো রসশাস্ত্রে জ্ঞানী কে আছেন এই অবন্তী দেশে, যে শৃঙ্গার কাব্য রচনা করেছেন সেই শৃঙ্গারের আদি কথা তো শেখা মা রসমঞ্জরীর কাছে, কেউ বিকৃত রসের সন্ধান পায় তার ভিতরে, আর কেউ তার ভিতরেই খোঁজে জীবনের শুদ্ধ আনন্দ, শৃঙ্গার কাব্যের কত শ্লোকই না আমার কণ্ঠস্থ!

চতুরিকা চুপ করে থাকে। দেবদত্তার সব কথার মর্ম উদ্ধার করতে পারে না সে। শৃঙ্গার রস কীভাবে বর্ণনা করেছেন অবন্তীরাজ ভর্তৃহরি তাও জানে না সে। শৃঙ্গার শব্দটির সঙ্গে রাজকর্মচারী উদ্ধবনারায়ণের কামার্ত মুখের ছবি মনে ভাসে তার। দেহবিলাস ব্যতীত সে কী বোঝে? কিছুই না। তার জন্যই তো নৃত্যশিক্ষা, বীণাবাদন, যদি অন্যরসে রসিক হয়ে তার উপর পীড়ন কম করে উদ্ধবনারায়ণ। তার শরীর ছাড়ে। তার যে মন আছে এইটুকু বুঝতে পারে সে।

দেবদত্তা বলল, অবন্তীরাজ নিশ্চিত আসবেন সন্ধ্যায়, তুই যা।

চতুরিকার মনে অন্ধকার এল। তার তো মনে হয় অবন্তীরাজের মনে দেবদত্তার কোনো চিহ্নই নেই। সে শুনেছে রাজমহিষী, কনখল কন্যা ভানুমতি ব্যতীত অন্য কোনো নারীর দিকে সরাসরি দৃষ্টিপাত করেন না অবন্তীরাজ। যে শুদ্ধতার কথা বলল দেবদত্তা, সেই শুদ্ধতা এতই সত্যি যে শৃঙ্গার রসের রাজ কল্পনা সবই তার অর্ধাঙ্গিনীকে নিয়ে। এসব সত্ত্বেও তার মনে হয় কার্তিক পূর্ণিমায় অবন্তীরাজ তাঁর সুনামের প্রতি সুবিচার করেননি। কাউকে দুঃখ দেওয়ার অধিকার তাঁর নেই। তিনি অবন্তীর অধিপতি, তাঁর দিকে চেয়ে সকলে বেঁচে আছে। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁকে নিয়ে। মানুষের অন্তরের কথা তাঁকে জানতেই হবে সুশাসনের জন্য। তিনি কেন অপমান করবেন নগরীর শ্রেষ্ঠা নারীকে। দেবদত্তার তুল্য গুণবতী

কে আছে এই নগরে? রাজমহিষী তো দেবদত্তার সঙ্গে কোনো তুলনায় তুলনীয়া নন। অবন্তীরাজ বোধহয় সেদিন পত্রটি পাঠ করেননি। গ্রহণও করেননি। গ্রহণ করলে দেবদত্তার মুক্তোবিন্দুর মতো হস্তরেখায় মুগ্ধ হতেনই। কী অপরূপ চিত্রময় দেবদত্তার হস্তরেখা। ভাষা বিন্যাসই বা কী সুন্দর! প্রকাশ কী মধুর! পত্রের ভিতরে শৃঙ্গার রসের শ্লোকও ছিল উদ্ধৃত। কী যেন কণ্ঠস্থ করিয়েছিল তাকে দেবদত্তা? কিছুই মনে রাখতে পারে না চতুরিকা। যা শেখে তাই ভুলে যায়। এই নৃত্যবিদ্য, নানান মুদ্রা, লাস্যভঙ্গী ও ক'দিন ধরে রাখতে পারবে জানে না। এখান থেকে বেরিয়ে ঘরে গিয়ে উদ্ভবকে যদি দেখে, নিজের মুখটিও যেন অচেনা মনে হয়।

দেবদত্তা হাতের নানান মুদ্রা গড়ছিল, ভাঙছিল। মুদ্রা গড়তে গড়তে, ভাঙতে ভাঙতে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে পড়েছে। তার সামনে হাঁটু মুড়ে উরুবেদী প্রসারিত করে বসেছে চতুরিকা। দেবদত্তা চতুরিকার উরুতে হাত রাখে, নিবিড় গলায় বলল, অবন্তীরাজের খবর কি সেই রাজকর্মচারী দিল?

ওকথা থাক। বলল চতুরিকা।

তোকে আমি এমন নৃত্যপটিয়সী করে তুলব যে অবন্তী দেশের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি তোরই অতিথি হবেন, ওই উদ্ধবনারায়ণ থাকবে দ্বাররক্ষী হয়ে।

থাক্ ও কথা, শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত তোমার রূপে, গুণে মুগ্ধ। নিম্নস্বরে বলল চতুরিকা।

সেই মুগ্ধতা তোকে ঘিরেই হবে, তুই তো শিখে নিবি সব বিদ্যা আমার কাছ থেকে, তোর মতো মার্জারাক্ষি কে আছে এই নগরে?

সেই জন্য তো আমি অসুন্দর।

কে বলে? চতুরিকার চোখের পাতায় আঙুল ছোঁয়াল দেবদত্তা, চাপা গলায় বলল, এমন শ্যামবর্ণ ছিল আমার মা রসমঞ্জরীর, আমি তো পেয়েছি পিতা অ্যান্টিওকাসের রক্ত, গ্রীকরা ধবল বর্ণের হয়, কিন্তু তারা আকৃষ্ট হয় এমন তন্বীশ্যামায়।

চতুরিকা বিহ্বল হয়ে পড়ে। অধোমুখী হয়ে নিজেকে দ্যাখে। গভীর ভরন্ত বক্ষদেশ, কদলী কাণ্ডের মতো উরুযুগল, মসৃণ ত্বক। তার চোখে জল এসে গেল। রাজকর্মচারী যেদিন বুভুক্ষু থাকে দেহের কামনায়, তাকে যেন গিলে খেতে চায়। বস্ত্রে ঢাকা আছে সব। স্তনযুগল, উরুতে কত যে নখের আঁচড়, দাঁতের দাগ তা কি জানে দেবদত্তা? তাকে ঠেকিয়ে রাখতে হলে অন্য মদিরা চাই। এক একদিন মনে হয় সে আর্তনাদ করে পুরবাসীকে, পথচারীকে, সকলকে জানিয়ে দেয় উদ্ধবনারায়ণের আচরণের কথা। গণিকার অসম্মতিতে তার উপরে উপগত হওয়া, তাকে পীড়িত করা অপরাধ। অবন্তীরাজের কানে পৌঁছলে তিনি নিশ্চিত এর প্রতিবিধান করতেন।

দেবদত্তা বলে, শোন চতুরিকা, আমি রাজা ভর্তৃহরি ব্যতীত এই নৃত্য কোথাও দেখাব না, না মহাকালেশ্বরকেও না।

হাত বাড়িয়ে দেবদত্তার মুখ চাপা দিল চতুরিকা, ছি, এসব কী বলো পাপের কথা?

পাপ কোথায়?

মহাকালই তোমার নৃত্যের প্রেরণা, তিনিই তো আদিগুরু।

আমি মনে মনে স্মরণ করি কুমার ভর্তৃহরিকে, সেই যে তিনি আসতেন এখানে, তখন প্রকৃতি সদয় হয়েছেন সবে, আমার কোষে কোষে রক্তচঞ্চল হয়েছে, শরীর থেকে শরীর প্রস্ফুটিত হচ্ছে, মা বলতেন, রাজানুগ্রহই গণিকার সমস্ত বিদ্যাকে বিকশিত করতে পারে, মনে পড়ে কুমার ভর্তৃহরির চোখ দুটি। কীভাবে, কী আপন ভোলা হয়ে তিনি মায়ের কথা শুনতেন, নৃত্যের ব্যাখ্যা শুনতেন, নারী দেহের, পুরুষ দেহের ছন্দের কথা শুনতেন, আমার নৃত্যও দেখেছেন তিনি, তখন মা আমাকে সব পাঠ দিচ্ছেন, বলছেন কোন পদবিন্যাসে, কোন হস্তমুদ্রায়, আঁখি সঞ্চরণে কী ভাব ফুটে ওঠে। আমি মনে মনে রাজাকেই ভাবি, রাজা ভর্তৃহরিই আমার প্রেরণা।

এসব কথা মনেই থাক সখী।

দেবদত্তা বলে, মহাকাল বলিস, পার্বতী, গোপিনী বলিস, যাঁদের কথা বলেছি তোকে, তাঁরা তো নিরাকার, তাঁদের কথা উচ্চারণ করবি, কিন্তু মনের ভিতরে আরাধ্য একজন থাকবে, তিনি রক্তমাংসের মানুষ তাঁর কথা মনে রাখলেই সব শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে।

তিনি কে, আমি তো ওই উদ্ধব ব্যতীত কারোর কথাই ভাবতে পারি না, আবার উদ্ধবের কথা ভাবলে কখনো রোমাঞ্চিত হই, কখনো ভীত হই।

আমি তো বললাম এই নগরের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি তোর গুণে মুগ্ধ হবেন, মুগ্ধ হবেন সেনাধ্যক্ষ কুমার বিক্রমও, উদ্ধবনারায়ণ থাকবে দ্বারে।

কেঁপে উঠল চতুরিকা, না, না সখী, এই কথা যদি কোনোক্রমে কারোর কানে যায় তবে আমি বিপন্ন হবো, আমাকে খুন করে ফেলবে ওই উদ্ধব, সে খুব নৃশংস, পীড়ন ভালবাসে, থাক সখী, এসব কথা থাক। বলতে বলতে হাঁপাতে লাগল চতুরিকা। উত্তেজনায় তার সর্বাঙ্গ থরো থরো। কুমার বিক্রমকে দেখেছে সে। কী পৌরুষ তাঁর? কত বড় যোদ্ধা! হূন দমন করেছেন তো তিনিই। প্রধান সেনাপতির কথা সে শুনেছে উদ্ধবের কাছে। উদ্ধব তাঁর কত কাছের মানুষ সে কথা বলে মাঝে মাঝে। নিজের ক্ষমতার বহর দেখাতে সে কুমার বিক্রমের কথা, শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্তর কথা, তাকে পীড়ন করতে করতে, তার সমস্ত অঙ্গে আঁচড় কাটতে কাটতে বলে। এমনকি অদ্ভুত সব রতি বিহারে মত্ত হতে হতে, রতিক্রিয়ায় উন্মত্ত হতে হতে উদ্ধব বলে কুমার বিক্রমের কথা। কী আশ্চর্য! কীভাবে দেবদত্তা কুমার বিক্রমের কথা বলল? কোন অনুমানে? সে তো ভাবতেই চায় না তাঁর কথা। বড় হীন লাগে, শঙ্কিত হয়ে পড়ে। কী করে বলল সোনার রথাসীন শ্রেষ্ঠীর কথা? থাক এসব কথা। মুছে যাক এই মুহূর্ত, এই সময়। তিথি কালের মতোই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। প্রসঙ্গ বদলায় চতুরিকা। চাপা গলায় বলল, তুমি কি জান, সেই জন, সেই কবি, গম্ভীরাবাসী যুবক, যে তোমার প্রেম ভিক্ষা করেছিল, সে এখন কোথায়?

ঈষৎ আনমনা হলো দেবদত্তা, দু'চোখ ঊর্ধ্বমুখী, উদাসিনী হলো রসমঞ্জরীর কন্যা, বিড়বিড় করে বলল, ধ্রুবপুত্র, যে আমাকে বাহ্লিক দেশ, আকসু নদীর কথা বলত, গ্রীক বীর আলেকজান্দারের কথা বলত?

সে তোমার প্রত্যাখ্যানে অবন্তী ত্যাগ করে চলে গেছে।

হ্যাঁ, গেছে তো, দুবছর হতে যাচ্ছে, সে যবনদের কথা জানত অনেক, বিদিশায় নিয়ে যাবে আমাকে তা বলেছিল, ওখানে পুরুষপুরের এক যবন রাজপুত্রের সম্মানে নির্মিত স্তম্ভ আছে, হেলিওডেরাস তাঁর নাম ছিল।

তুমি তাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলে তাই তোমার প্রেমে পড়েছিল সে।

গুণী, গুণের সম্মান তো দিতে হবে, কিন্তু এর ফলে সে যদি—। কথা থামিয়ে দিয়ে উন্মনা হলো দেবদত্তা, মন খারাপ লাগে তার জন্য।

সে নাকি হূন রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, সেই উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধুনদের তীরে।

কে বলেছে তোকে?

চুপ করে থাকল চতুরিকা। দেবদত্তার তো বুঝতে অসুবিধে হবে না কে বলেছে। তার জানা-অজানার সূত্র তো একটিই। যুবক তো তাকে বলেছিল চলে যাবে বাহ্লিক দেশে তাকে নিয়ে। নবীন বয়স। তারই সমবয়সী হবে সে। একেবারে শিশুর মতো আচরণ ছিল তার। কী রূপবান! জ্ঞানী! তার গুণে মুগ্ধ ছিল সে। অথচ কী যে হয়ে গেল তখন। দেবদত্তা ঘুরে জানালা দিয়ে দৃষ্টি আকাশে প্রসারিত করে। আকাশের আলো কমে এল। অপরাহ্ন বেলা। চোখ বুঁজল সে। কল্পনার আকসু নদীর কলধ্বনি শুনতে চাইল দেবদত্তা। নিথর হলো একা একা। যুবকটিকে সে অপমান যত না করেছে, তার চেয়ে করেছিল তো এই নগরের সবচেয়ে ধনী সুভগ দত্ত, যে নাকি যুবকের পিতার সঙ্গে বাণিজ্য আরম্ভ করেছিল অনেকবছর আগে। শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত যুবকের শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছিল, এখানে পাঠিয়েছিল সে-ই। অথচ সেই মানুষই কিনা তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল এই নগর থেকে।

দেবদত্তা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। হূন আশ্রয়ে যাওয়ার মতো মানুষ সে ছিল না, কিছুতেই না। আহা মুখখানি মনে পড়ে। সে যেন যবন পুরুষেরই মতো ছিল। নাকি সে ছিল দেবতাদের মতো। কী গম্ভীর নীল চোখ দুটি। কী অদ্ভুত ছিল যুবক! উজ্জয়িনীতে যে বণিকরা আসত তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করত তাদের দেশে যাওয়ার পথনির্দেশ। তাদের কাছ থেকেই জানত তাদের দেশের সব কথা। সেই যে বাহ্লিক দেশ, আকসু নদী, গান্ধার পুরুষপুর, গিরিপথ, সব যেন তার চোখের সামনে ভাসত। যবন বণিকরা অবাক হয়ে যেত। কবে গেল এই যুবক ওইদেশে? ধ্রুবপুত্রর অসম্মান সে ঠেকাতে পারেনি। বরং নগরে

রটে গেছে সেই অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে যুবকটিকে। তার প্ররোচনায় শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত প্রহার করেছিল ধ্রুবপুত্রকে, যে শ্রেষ্ঠী তাকে আশ্রয় দিয়েছিল, সে-ই কিনা ভীষণ রুষ্ট হয়ে তাকে নগর থেকে বহিষ্কার করল! যুবকটি কেমন ছিল? অত যার জ্ঞান, অত যার কৌতূহল, কল্পনা, সে কিনা আন্দাজও করতে পারেনি পিতৃসখার দুর্বলতাটি কোথায়? সে কিনা সুভগ দত্তর নিকটেই নিজের মনোবাসনা প্রকাশ করে দিল। আর দেবদত্তা, যে কিনা পুরুষের মনের ভাষা পড়তে পারে, সে টেরও পায়নি ধ্রুবপুত্রর মনের কথাগুলি। ধরতে পেরেছিল এই চতুরিকা। সে একদিন আভাস দিয়েছিল, সখী, তোমার ওই ধ্রুবপুত্র, যাঁকে শ্রেষ্ঠী পাঠিয়েছেন, তার চোখ দেখেছ তুমি?

নীল, সাগরের মতো শুনেছি, সাগর যেন ওইরকম হয়।

নীল তো চিনি, আর সেই নীল তোমার সম্মুখে এসে আরো নীল হয়ে যায়, তা কি দেখেছ তুমি সখী, সে তোমাকে যেন কামনা করে।

দেবদত্তা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল চতুরিকার কথা। কিন্তু সত্যিই কি তাই! রোমাঞ্চ কি ছিল না ধ্রুবপুত্রকে দেখায়?

সাত

রাজমহিষী ভানুমতির প্রসাধন সম্পূর্ণ হলো প্রায়। বুড়ি দাসী নিপুণিকা তাঁকে পর্যবেক্ষণ করছে। যদি কোথাও খুঁত থেকে যায়। রাজমহিষী দাঁড়িয়েছেন দর্পণের সামনে। আজ শুক্লা চতুর্দশী। আজ কেন এই অভিসারিকার সাজ তা নিপুণিকার মাথায় ঢোকেনা। আগামীকাল অঘ্রানের পূর্ণিমা। রাজা ভর্তৃহরি মহাকাল যাবেন এমন একটি কথা শোনা যাচ্ছে। এই রাজ অন্তঃপুরে অবশ্য যা শোনা যায় তা সত্য হয় না। আবার যা সত্য হয় তা শোনা যায় না। সত্য যা তা উচ্চারণে নানা বিপদ আছে। দাসী নিপুণিকা জানে চোখ বুঁজে থাকাই সবচেয়ে ভাল।

রানী ভানুমতিকে দর্পণ দেখছে। দর্পণে তাঁর আয়ত চক্ষুর প্রতিবিম্ব। সেই চক্ষুতে মুকুলাভাব। এই ভাবটির কথা নিপুণিকা জেনেছিল রসমঞ্জরীর কাছে। চোখের পাতা অল্প অল্প কাঁপছে, দৃষ্টিতে অনুজ্জ্বলতা, কিন্তু এক গভীর আবেশ চারিয়ে গেছে। সুখে আবিষ্টভাব ফুটে উঠছে এখন ভানুমতির ভিতর। নিপুণিকা শুধু দুটি চোখই দেখছে। সেই চোখে কখনো ললিতা ভাব, মধুর প্রসন্নতা, কখনো বিভ্রান্তির ভাব, প্রসারিত দৃষ্টি। কখনো অর্ধমুকুলা, ঈষৎ সঞ্চরণশীল চোখের মণি, চন্দনের গন্ধ, কল্পনায় সুখদ অনুভবে বিহ্বল হচ্ছেন রানী। এই একটু আগে উন্মুক্ত স্তনে চন্দনের চূর্ণ ছড়াতে ছড়াতে রানীর চোখে যে ভাব জেগে উঠেছিল তা যেন মদিরাছন্ন হলেই দেখা যায়। দু চোখের পাতা ভারী হয়ে চোখ প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল, চোখের মণি প্রায় আড়াল হয়ে গিয়েছিল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দাসী নিপুণিকা দেখেছিল ভানুমতির স্তনযুগল দৃঢ় হয়ে উঠেছে কামনায়। ভয়ও পেয়েছিল সে। রাজমহিষী কি আত্মরতিতে মগ্ন হলেন মনে মনে? হায় অবন্তীলক্ষ্মী!

এই অন্তঃপুরে নিপুণিকার বাস অনেকদিনের। আছে সে রাজা গন্ধর্বসেনের সময় থেকে। সে প্রসাধন নিপুণা। প্রসাধনের সমস্ত কৌশল সে জানে। অসুন্দর কে সুন্দর করে তোলায় তার সিদ্ধি। সে এও জানে অসুন্দরকে সুন্দর করে তোলার চেয়ে সুন্দরকে আরো সুন্দর করে সাজানো কঠিন। সে দেখেছে সুন্দরী নারী সাজসজ্জায় যেন অসুন্দরই হয়ে পড়ে। রানী ভানুমতির রূপের কাছে সমস্ত প্রসাধন সামগ্রী, রত্নালংকার মিথ্যে হয়ে যায়। দাসী নিপুণিকার এই শিক্ষা গণিকা রসমঞ্জরীর কাছে। রসমঞ্জরী বলত যে সাজাবে নিজেকে সে যদি মনে এই ভাব আনে যে ঈশ্বরের জন্যই তার এই সাজসজ্জা, তার রূপ তবে বিকশিত হবে। এই কথা আজ এই একটু আগে অবন্তীলক্ষ্মীকে স্মরণ করাতে খিলখিল করে হেসে উঠেছিলেন ভানুমতি, এসব কী কথা, ভগবান কি কখনো বলবেন আমি কত সুন্দর! আমি সাজছি যার জন্য সেই আমাকে দেখবে।

এসব কথা বলোনা মা, মহাকাল আছেন।

দু'হাত জোড় করে মহাকালকে স্মরণ করে ভানুমতি বলেছেন, থাকুন মহাকালেশ্বর, তাঁকে প্রণাম করি, কিন্তু আমার রূপ তাঁরই জন্য যাঁর কথা আমি ভাবি।

কী খেয়াল হয়েছে আজ অবন্তীলক্ষ্মীর, যিনি সাজসজ্জা ত্যাগ করেছেন প্রায়, আজ সাজতে বসেছেন।

দুপুর থেকে একটু একটু করে নিপুণিকা যেন নির্মাণ করেছে এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে। করবী সাজিয়েছে, কণ্ঠহার, সুবর্ণবলয়, কানপাশা, চন্দ্রহার, বাজুবন্ধে সাজিয়েছে অবন্তীর রানীকে। পদযুগল অলক্তরাগে রাঙিয়েছে। চন্দনচূর্ণে রাজমহিষীর গাত্রবর্ণে সোনার আভা ফুটিয়েছে। রাজমহিষীর বয়স হয়েছে। সেই চতুর্দশী কন্যাটি এখন আরো চতুর্দশ বৎসর অতিক্রম করতে যাচ্ছে এই অবন্তীদেশে। সেই স্নিগ্ধ পূর্ণিমার রূপটি এখন যেন সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। বুড়ি দাসী নিপুণিকা কতটা সময় ধরে ভানুমতির শরীরের উত্তাপ টের পেয়েছে। অথচ এই বয়সে তো শরীরকে শীতল করতে হয়। শীতল হয়েও আসে দেহটি। অবন্তীর রানী অবন্তী দেশের গৃহলক্ষ্মী, সর্বাঙ্গে এত আগুন বয়ে বাঁচবেন কী করে তিনি?

নিপুণিকা টের পেয়েছে অঘ্রানের এই শীতল প্রকৃতিতে চন্দন প্রলেপেও স্নিগ্ধ হয়নি রানীর বরতনু। দাসী দেখেছে ভানুমতির বক্ষবাস বিদীর্ণ করে স্তনযুগল বিস্ফোরিত হয়ে যাবে যেন। মনের চিহ্নতো শরীরে ফোটে। ক্ষণে ক্ষণে অবন্তীলক্ষ্মীর প্রীতিময় ললিতা দৃষ্টি পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। আঁখিপল্লব, আঁখিতারা থেকে মুছে যাচ্ছে স্নিগ্ধতা। আচমকা আঁখি তারা ঘূর্ণমান, দ্রুতসঞ্চরণশীল হয়ে যাচ্ছে, আঁখি-পল্লব উর্ধ্বমুখী। এ ভাবের সঙ্গে অপরিচিত তো নয় বুড়ি দাসী। বারংবার রাণীর মনে কী জেগে উঠছে কে জানে? কী কল্পনা করছেন তিনি তা তাঁরই জানা। বুড়ি দাসীর ভাবতেও ভয় লাগে। চোখ বুঁজে থাকলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

ভানুমতি ঘুরে দাঁড়ালেন দাসীর দিকে, সাময়িক বিভ্রান্তি কেটেছে তাঁর, মুখে ফুটে উঠছে প্রসন্ন হাসি, ঠিক আছে তো?

নিপুণিকা তাকিয়ে আছে রানীর দিকে। তার দৃষ্টি মেখলার নীবিবন্ধনে, নাভিদেশে। সে অস্ফুটস্বরে বলল, শীত করছেনা মা তোমার?

কোথায় শীত, এবার বৃষ্টি হয়নি, শীতও হবে না।

উত্তুরে বাতাস শুরু হয়েছে, মহাকাল যদি যাও মাথা ঢেকে পশমবস্ত্র গায়ে দিয়ো।

শীতও নেই! বিড়বিড় করলেন ভানুমতি।

বুড়ি দাসী বিহ্বল চোখে রানীর দিকে তাকিয়ে আছে। কী রূপ অবন্তীলক্ষ্মীর, রূপ যেন আরো গভীর হচ্ছে দিনে দিনে, হেসে বলল নিপুণিকা, তুমি যেন আরো সুন্দর হয়েছ মা।

ভানুমতির দু চোখে ঘোর এল এই কথায়। চাহনি তির্যক হলো। বাঁকা হাসি ফুটল তাঁর মুখে, বললেন, সে কি তোর হাতের গুণ, না আমার?

দাসী নিপুণিকা সাহস করে বলল, তোমার স্বামী, অবন্তীর রাজার হাতের গুণ মা।

থাম দাসী থাম, তুই অধিকার ছাড়িয়ে যাচ্ছিস।

মুখখানি ম্লান হয়ে গেল নিপুণিকার। কী যে হয়েছে রাজ অন্তঃপুরে, খেই ধরতে পারে না সে। সে যে কথাটা বলেছে সেই কথাটা তো বলতে হয়। রসমঞ্জরী তো সেইরকমই শিখিয়ে দিয়েছিল। পতি প্রশংসা কোন নারী না শুনতে চায়।

রাজরানী দর্পণের সামনে নিজেকে যেন নানা কোণ থেকে বিকশিত করে তুলছেন। দর্পণের সামনে নিজেকে মেলে ধরেছেন বারবার। ঘুরে কী মনে হলো, বললেন, দর্পণ যদি না থাকত, কী করত মানুষ?

বুড়ি দাসী জবাব দেয়না। কথা না বলে চুপ করে থাকাই তো বুদ্ধিমতীর কাজ। ভানুমতি দিন দিন খেয়ালী হয়ে পড়েছেন, উদাসীন। কখন কিসে রাগেন রানী তা বোঝাই দায়।

ভানুমতি দুটি হাতের নানা বিভঙ্গে নৃত্যের মুদ্রা ফোটাতে ফোটাতে বললেন, দর্পণই আমার পুরুষ, পুরুষ মনে হয় না দর্পণকে? কীভাবে গ্রাস করে নেয়।

দাসী নিপুণিকা কিছুই বোঝেনা। সে রাণীর লীলায়িত ভঙ্গি দেখছিল। দর্পণের সামনে শরীর ও গ্রীবা আন্দোলিত করছেন, পদ যুগলের নানা বিন্যাসে দেহে ফুটে উঠছে মধুর ভঙ্গিমা, বিড়বিড় করলেন রানী, দর্পণের জন্যই আমার সাজ, নিজেকে নিজে দেখি আমি।

নিপুণিকা বলল, আমি এবার যাব?

না, যাবি কেন? ঘুরে দাঁড়ালেন ভানুমতি, বসে পড়েছেন আসনে। কী যেন ভাবছেন, তারপর আচমকা বললেন, এবার সাজ খুলে দে।

কেন? চমকে উঠল দাসী।

স্বর্ণতিলকটা খুলে দে। মাথায় হাত দিলেন ভানুমতি।

দাসী অবাক হয়ে অবন্তীর রানীর দিকে তাকিয়ে। রানী বলছেন, সাজ তো হলো, কিন্তু কেন হলো, তার চেয়ে বরং .... হ্যাঁ'রে নিপুণিকে কেন সেজেছি আমি?

জানে না নিপুণিকা। রানীতো সেজেই থাকবেন। সন্ধ্যায় রাজা আসবেন এই অন্তঃপুরে। তিনি কি সাজসজ্জাহীন রাজমহিষীকে দেখবেন? রানী দুলছেন বসে বসে। হাতের আঙুলে নানা মুদ্রা রচনা করে চোখের সামনে মেলে ধরছেন। এর কয়েকটি চেনে দাসী। কাম-রতি আকাঙ্ক্ষার মুদ্রা তৈরি করছেন রানী দু হাতে দশ আঙুলের মুদ্রায়। নেত্র, ভ্রূ, নাসা, অধরে ফুটে উঠছে আকাঙ্ক্ষা। দাসীবুড়ি তো অনেক চেনে রানী ভানুমতিকে। কিন্তু আগে যতটা তল পেত রানীর মনের এখন তা পায় না। আশ্চর্য। বিবাহের পর কনখল থেকে অবন্তীতে আসা সেই সদ্য যুবতীর ছায়া হয়ে থেকেও তাকে সাজাতে বসতে হয়নি কখনো। রতিবিলাসী সেই রাজবধূর শরীর স্পর্শ করতে হতো না। কনখল রাজপুত্রী তাকে দাঁড় করিয়ে নিজে সাজত। আবার কখনো স্বামীকে দিয়ে সাজাত। কী উৎসাহ ছিল তখন! সমস্ত দিনই যেত প্রসাধনে। এই অন্তঃপুর হয়ে থাকত চন্দনগন্ধময়। এতবছরে সব বদলে গেছে। আলস্য হয়েছে সন্তানহীনা রানীর সঙ্গী। খেয়ালি রানী কখন কী করবেন তার জন্য ত্রস্ত থাকতে হয় দাসীকে।

ভানুমতি বললেন, দাসী আজ আমার সাজ কেন?

দাসী নিপুণিকা চুপ করে থাকে, বিড়বিড় করে কয়েকদণ্ড পরে, মহাকাল তো কাল যাওয়ার কথা।

ভানুমতি বললেন, মহাকাল আমায় বঞ্চনা করেছেন শুধু।

বুড়িদাসীর জোড় হাত কপালে উঠল, তা কেন মা, তুমি যে রাজপুত্রী, রাজরানী তা তো মহাকালের ইচ্ছায়, তুমি পতিভোগ্যা, অবন্তীরাজের চোখের মণি, মহাকাল তোমাকে কত দিয়েছেন?

ভানুমতি দু হাত তুলে স্বর্ণতিলক মুক্ত করেন কপালকে। ঘুরে তাকান দর্পণে, বিড় বিড় করেন, সব দিয়েছেন মহাকাল, আবার কিছুই দেননি, আমি তো নিঃস্ব নিপুণিকে!

বুড়ির চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হলো। সন্তানের কথা বলছেন রানী। সন্তানহীনা কিন্তু তাতেও রাজার প্রেমে কোনো খাদ নেই। অবন্তীরাজ ইচ্ছে করলে আবার বিবাহ করতে পারতেন। কই করেননি তো। এতেই তো ধরা যায় তাঁর ভালবাসা কত নিবিড়।

ভানুমতি বললেন, এখন আর হয় না, তাইতো নিপুণিকে।

দাসী নিপুণিকা বলল, কেন হবে না মা?

রাজবৈদ্য ব্যর্থ হলো, যাগযজ্ঞে কিছু হলো না, শত ব্রাহ্মণের আশীর্বাদেও কিছু হলো না, অন্নহীনে অন্ন দিয়েও কিছু হলো না, কী হবে নিপুণিকে?

নিপুণিকা চুপ করে আছে। কী বলবে সে। নিজেও তো কম অবাক হয়নি। এত কিছুতেই সন্তান হয় না? একি নিস্ফলা গাছ? সে তো রানীর কানে কম মন্ত্র দেয়নি, মিলনের দিনক্ষণ জেনে এসেছে অবন্তীর প্রাচীনাদের কাছ থেকে, চাঁদের অবস্থান, নক্ষত্রের অবস্থান মিলিয়ে রাজারানী শয্যায় গেছেন। ব্যর্থ হয়েছে মিলন। নগরীর বারাঙ্গনা পল্লী থেকে সব সুলুক জেনে এসেছে নিপুণিকা, কিছু হয়নি। রাজা ভর্তৃহরি তো শৃঙ্গারপটু, রতি বিলাসী, তা সে শুনেছে রানীর কাছে, তবুও সব ব্যর্থ হয়েছে।

ভানুমতি জিজ্ঞেস করলেন, নতুন কোনো উপায় জেনেছিস তুই?

নিপুণিকা বলে, অবন্তীর আটক্রোশ পশ্চিমে, গম্ভীরা পার হয়ে আরো দূরে পাহাড়ের কোলে এক সিদ্ধা যোগিনী এসেছে মা, পরামর্শ নেবে?

ভানুমতি ধীরে ধীরে কণ্ঠহারটি খুলছেন, বক্ষবাস শিথিল করলেন। দু চোখ নিমীলিত তাঁর। ঘুমেই যেন ঢলে পড়ছেন রানী।

দাসী বলল, উনি বৈশালী দেশ থেকে এসেছেন, দূর উত্তরপুবের লোহিত্য নদ ছাড়িয়ে প্রাগজ্যোতিষপুরেরও দূরে তন্ত্রমন্ত্র শিখেছেন, উনি হয়ত পারলেও পারতে পারেন।

ভানুমতি চোখ খুললেন, তোকে এসব কে বলল?

দাসী এদিক ওদিক তাকায়। রাজ অন্তঃপুর নিরাপদ, তবু দেওয়ালেরও কান আছে ; চাপা গলায় বলে, আমি গিয়েছিলাম মা, বড় মধুর তাঁর ভাষণ, বয়স অনেক হবে, শতবর্ষ হতে পারে দ্বিশতবর্ষও হতে পারে, শুনেছি প্রাগজ্যোতিষপুরে কামদেবের অধিষ্ঠান, কাউকে সন্তানবতী করে তোলা ওই যোগিনী

মায়ের কাছে কোনো কাজই না, তুমি যাবে মা?

তুই কবে গিয়েছিলি?

গত পরশু, একাদশীর দিন।

বলিসনি তো?

কী বলব মা, আমার বড় কষ্ট লাগে, অবন্তীর রানী নিপুত্র, খোঁজ পেয়ে আমি গেলাম, তা উনি তোমার সাক্ষাত চান, না দেখলে তো হবে না।

উনি আসতে পারবেন না? সামান্য উৎসাহের ভাব জেগেছে রানীর মুখে।

কী করে আসবে মা, বামুন পণ্ডিতরা ঘেন্না করে, বজ্রযানী, পাষণ্ড ধর্ম পালন করেন উনি, মানুষের ঘরে যান না।

রানী নিশ্চুপ। বুড়ি দাসীর কথা মিথ্যে নয়। যোগিনীকে ঢুকতেই দেবে না দ্বাররক্ষী। নগরে যদি প্রবেশ করতে হয় তো অন্ধকারে, লুকিয়ে। পাষণ্ড ধর্মের যোগিনীরা কখনো লোকালয়ে আসেন না। তাঁদের কাছে যেতে হয়।

ভানুমতি বললেন, যদি আমি যাই?

ত্রস্ত হয় বুড়ি দাসী, কী করে যাবে মা, গেলে তো খুবই ভাল হয় পাঁচটি তাম্বুল, পাঁচটি গুবাক, এক মুঠো সর্ষে, পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে প্রণাম করলেই হবে।

কবে যাব বল, কোন তিথিতে?

বুড়ি বিড়বিড় করে, যাবে, গেলে কি অজানা থাকবে মা?

উনি অদৃশ্য হতে পারেন না, শুনেছি যোগিনীরা যোগ বলে অদৃশ্য হন, তিরস্করণী বিদ্যা জানেন না?

সে বিদ্যা কী মা?

অদৃশ্য হয়ে থাকা।

উনি কি জানবেন না, সব জানবেন, এসব তো ওঁর কাছে কিছুই না।

তবে অদৃশ্য হয়ে আসুন।

দাসী নিপুণিকা বিপদে পড়ল। একথা তো তাহলে গিয়ে বলতে হয় যোগিনীকে। কিন্তু যোগ বলে অদৃশ্য হয়ে থাকলে কি অপ্রকাশিত থাকবে তাঁর উপস্থিতি। বামুন, পুরোহিতরাও তো এসব পারেন শোনা যায়। দ্যুলোক ভূলোক তাঁরা দেখতে পান, বলেন তো স্বর্গ মর্ত্যের কিছুই তাদের অজানা নেই। শেষে না নিপুণিকাই দায়ী হয়ে পড়ে। তার শিরচ্ছেদ না হয়। দ্বাররক্ষী জানবে না, রাজা জানবে না মন্ত্রী সেনাপতি কেউ জানবে না অন্তঃপুরে বাইরের মানুষ ঢুকে যাবে। এর চেয়ে রানীমার যাওয়াই ভাল। রাজাকে বলুন উনি, দশদিক জানিয়ে রানী যাবেন যোগিনীর কাছে। দাসী নিপুণিকা যাবে তাঁর পদসেবা করতে করতে।

রানী বললেন আবার, যোগিনীরা কত কিছু জানেন, বশীকরণ জানেন, তন্ত্রমন্ত্র, যাকে আমি চাই, তাকে যদি না পাই তো পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন যোগিনীরা, তাই না!

নিপুণিকা বলল, হয়ত তাই।

শুনেছি এমন হয়। বলতে বলতে রানী তাঁর কবরী থেকে পুষ্পমাল্য খুলে দিতে লাগলেন। কুন্দফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে গেল পাথুরে মেঝেয়। রানী তাঁর খোপা ভেঙে দিতে উদ্যত হলে নিপুণিকা হা-হা করে ওঠে। কী করছ মা, এত সময় ধরে খোপা বাঁধা হলো, এত সাজ হলো, সব ভেঙে দিচ্ছো, কঞ্চুকিকে খবর দিই, রাজার কাছে যাক, তিনি আসুন।

ভানুমতি হাত তুললেন, থাক, রাজা কি আমার সাজ দ্যাখেননি?

তাঁর মতো মানুষ এই অবন্তীদেশে আছেন আর, সত্যিই তিনি অবন্তীর অধীশ্বর, তিনি গণিকা দেবদত্তার আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেন বারবার, আর কোনো নারীর দিকে ফিরে তাকান না, তাঁরই তো সব, তোমার মতো সৌভাগ্যবতী কে আছে বলো, সতীন এল না ঘরে, দ্বিতীয় বিবাহে বিধান দিল বামুন পুরোহিতরা, কই তিনি তো ....

থাম নিপুণিকে থাম, এত সৌভাগ্য আমার সহ্য হয় না।

নিপুণিকা অবাক হয়ে দ্যাখে রানী তার সাজসজ্জা ত্যাগ করতে উদ্যত। বিড় বিড় করছেন ভানুমতি, গণিকা দেবদত্তার কাছে গেলেই তো বাঁচি, তিনি যদি আর একটি বিবাহ করেন তবে তো বাঁচি, আমাকে দোষী হতে হয় না।

দাসী বুড়ি বলল, গণিকার ছলাকলা আছে, জানে অনেক কিছু, কিন্তু তোমার তুল্য তো তার রূপ নয় মা, তোমার কাছে সে তো কুরূপাই।

আচমকা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন ভানুমতি। কাঁপতে আরম্ভ করেছেন তিনি। শির উপরে নীচে চালিত হতে থাকে, আঁখিতারা অস্থির হলো, আঁখিপল্লব অচঞ্চল, কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে ওঠে, থাম তুই, গণিকার সঙ্গে আমার তুলনা করছিস, আমি কনখল দেশের রাজপুত্রী, গণিকা তো গণিকাই বটে।

দাসী বুড়ি ভীত হয়। দুটি হাত জোড় করে রানীর পায়ে মাথা নামায়, কেঁদে ওঠে, তুমি তো দেবী, অবন্তীর লক্ষ্মী, অপরাধ ক্ষমা করো মা, আমি ওকথা বলতে চাইনি।

ভানুমতি ধীরে ধীরে প্রসন্ন হলেন। ভীতা দাসী কয়েক হাত দূরে সরে গেছে আবার। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ভানুমতি দুহাত পিছন দিকে বাঁকিয়ে খোপা বাঁধতে লাগলেন। স্ফীত বক্ষ শ্বাস প্রশ্বাসে কাঁপছে। খোপা বাঁধতে বাঁধতে রানী গ্রীবা বাঁকিয়ে দেখলেন দাসী বুড়িকে, চাপা গলায় বললেন, তুই যা, সেনাপতি বিক্রমকে খবর দে, আজ সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দ্যূত ক্রীড়ায় বসব আমি।

দাসী নিপুণিকা এই ভয় পাচ্ছিল। মনে মনে ভাবছিল এমন হতে পারে। কী কারণে এতসাজ তা টের পাচ্ছে সে এখন। অনুমান মিথ্যে হলো না। সে দেখছে রানী অভিসারিকার সাজে সাজছে আবার।

ভানুমতি বললেন, না হয় আমি যাব তাঁর ওখানে, তুই খবর দে।

দাসী একপা একপা করে পিছিয়ে দরজার মুখে পৌঁছে দাঁড়িয়ে থাকে। সে এই অন্তঃপুর দেখেছে বহুকাল ধরে। অন্তঃপুরের খবর তার মতো কে জানে। মহারাজ গন্ধর্ব সেন অন্তঃপুরে রাজমহিষীকে রেখে উদ্যানের প্রান্তে সমুদ্র ঘরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন গণিকা রসমঞ্জরীকে। দেখেছে গন্ধর্ব সেনের দুই মহিষীর মলিন মুখ। গন্ধর্ব সেন উদ্যানে দোল দিচ্ছেন ছোট মহিষীকে, বড় রানী, ভর্তৃহরির জননী চোখের জল ফেলছেন ঘরে বসে। অবন্তীরাজ গন্ধর্ব সেন সদ্য যুবতী রানীর সঙ্গে জলক্রীড়ায় মত্ত, বড়রানী কুলদেবতা শিবের চরণে মাথা ঠেকিয়ে বসে আছেন সব সময়। রাজমহিষীদের রোষ দেখেছে সে, দেখেছে আবার অপমানিতা রানীদের। রানী দুইজনে একসঙ্গে চলেছে গণিকাগৃহে, দাসী নিপুণিকা তাদের পথ দেখাচ্ছে। দু'জনেই অবগুণ্ঠনে মুখ আড়াল করে। রসমঞ্জরীর কাছে গেছে তারা স্বামী ভিক্ষা করতে। রসমঞ্জরীর রূপে গুণে তারা বিস্মিতা, অভিভূতা। রসমঞ্জরীর কাছে তারা শিখে নিল পুরুষ বশের নানা কৌশল, শৃঙ্গার কর্মের অজানা পদ্ধতি। গণিকারা যা জানে, অন্তঃপুরবাসিনীরা তা জানেনা। জানতে পারে না। জানার উপায়ও নেই।

রানী আচমকা জিজ্ঞেস করলেন, গণিকা দেবদত্তা, সে সত্যিই কত গুণবতী?

জানিনা মা, আমি কিছুই জানিনা।

তুই যা, খবর দে কুমার বিক্রমকে, যা এই ফুলের মালাটি নিয়ে যা, বলবি আমি দংশন করেছি এর পাপড়ি, তাই ঝরে গেছে দু-একটি, বলবি এ আমার গলার মালা, এই বুকের তাপ লেগেছে এতে, যা নিপুণিকে, বুড়ি যা বলবি কেউ যেন না শোনে, বলবি যদি না আসেন তিনি, আমার চোখের কাজল রেখা ধুয়ে যাবে।

দাসী বুড়ি কী করে। ফুলমালাটি তার গায়ের চাদরের নীচে আড়াল করে মন্দচরণে অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে যেতে থাকে। অন্তঃপুর কত বড়। কত ঘর। কোন ঘরে বসবেন রানী আর তাঁর দেওর কে জানে। দাসী বুড়ির মুখে কোনো প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন নেই এখন। এসব তার কাছে নতুন কী? এই ক'দিন আগে গণিকা দেবদত্তার পত্র সেই তো পাঠিয়েছিল রাজার কাছে

আট

উদ্ধবনারায়ণ এসেছে মার্জারিকা চতুরিকার গৃহে। অঘ্রান পূর্ণিমার রাতে তার ঘরে আসবে বলেছিল উদ্ধব, সে আর কোনো অতিথি নেয়নি। দুয়ার থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে কতজনকে। এর ভিতরে এক মগধী বণিকও ছিল। অনেক স্বর্ণমুদ্রা দিতে চেয়েছিল। সাহস হয়নি চতুরিকার যে তাকে ঘরে নেয়।

উদ্ধবনারায়ণকে রাগিয়ে সে এই নগরে থাকতে পারবে না, শেষে স্থান হবে উজ্জয়িনীর বাইরে বারবণিতা পল্লীতে। অথচ সেই মগধের বণিককে পান্থশালা থেকে অনেক ছলাকলা করে ডেকে এনেছিল বীট মহাপার্শ্ব, গণিকার প্রতিনিধি। বণিক মানুষটা নাকি অতি সজ্জন। মথুরা যাওয়ার পথে উজ্জয়িনীতে যাত্রা-বিরতি দিয়েছিল। প্রচুর অর্থের অধিকারী। রুচিমান মানুষ। সাতঘরে ঘুরিয়ে চতুরিকাকে শেষ পর্যন্ত পছন্দ করাতে পেরেছিল বীট মহাপার্শ্ব, চোখ মটকে চতুরিকাকে বুঝিয়েছিল দোহন করে নেওয়ার মতো ধনী।

উদ্ধব পূর্ণিমার রাতে আসেনি। প্রতিপদে এসেছে। উদ্ধব বলে, আচমকা তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল মহাকাল মন্দিরে নজরদারি করার জন্য।

পূর্ণিমায় কত পুণ্যার্থী না আসে মহাকালে, তাদের মধ্যে মন্দ মানুষও থাকতে পারে, সেনাধ্যক্ষ কুমার বিক্রম তাকে দায়িত্ব দিয়েছিল মহাকাল পরিদর্শনে, রাজা রানীর যাওয়ার কথা ছিল মহাকালে, গন্ধবতী নদীতে ময়ূরপঙ্খী নাও সাজানো হয়েছিল, বীণা হস্তে প্রস্তুত হয়েছিল বাজিয়েরা, মন্দির প্রাঙ্গণে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল দুপুর থেকে, দেবদাসীরা নৃত্যের জন্য তৈরি হয়েছিল, গণিকা দেবদত্তাও তো গিয়েছিল সন্ধ্যায়।

চতুরিকা জিজ্ঞেস করে, রাজা কখন গেলেন, রানী তাঁর দক্ষিণে ছিলেন না বামে?

উদ্ধব বলে, পানপাত্র সাজাও দেখি।

চতুরিকা গরগর করে ওঠে, কাল আর আজ দু'দিনেরটা পুষিয়ে দিতে হবে সত্রিমশায়।

উদ্ধব মনে মনে বলে, মগধী বণিকের সঙ্গে ফূর্তি মারাতেই পারতিস মাগি, চাঁদ ওঠার একপ্রহর বাদে তো চলেই এলাম মহাকাল থেকে, তখনো তো আসতে পারতাম, আসিনি, নতুন একটা মেয়েমানুষ পুরোহিতের কাছে থেকে পেলাম, পুরোহিতের বারবাড়িতে খুব ফষ্টিনষ্টি হলো, কিন্তু কচি মেয়েমানুষের ঝামেলা অনেক, এমন কেঁদে ভাসাল যে ইচ্ছেটাই মরে গেল, যদি শুনতাম মগধী বণিক ঢুকেছে তোর ঘরে, আজ তোর কপালে দুঃখ ছিল।

চতুরিকা বলে, দেবদত্তার ঘরে শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত এলেন তো কত রাত্তিরে, দেবদত্তা মহাকাল থেকে ফেরার পর।

উদ্ধব মনে মনে বলে, আমার তো ওঁর দশা না, পুরুষ মানুষ, ধনসম্পত্তি অঢেল, দরকারে যবন দেশ থেকে খাঁটি যবনী নিয়ে আসতাম, দেবদত্তার প্রেমে পড়েছে শ্রেষ্ঠী, গণিকাও কেমন। গুছিয়ে নেবে, পারছে না।

চতুরিকা বলে, রাজা-রানীর কথা তো বললে না।

উদ্ধব দেখল আজ গণিকার লাস্য যেন বেশি। অলক্তরঞ্জিত পা দু'খানি মেলে ধরেছে উদ্ধবের সামনে। উদ্ধব ঈষৎ চঞ্চল হয়। চতুরিকার পায়ের পাতায় তর্জনী ছোঁয়ায়, বিড়বিড়িয়ে বলে, রাজা-রানী তো আসেননি।

সে কী, কেন? চতুরিকা না জানার ভান করে।

উদ্ধব জবাব দেয় না। রাজা-রানী নিয়ে আলোচনা এই গণিকাপল্লীতে বিধিসম্মত নয়। সে হলো রাজকর্মচারী, কার কী উদ্দেশ্য তা সে জানে না। কে কোথায় বসে আছে গুপ্ত কথা শুনতে তা কে জানে। সে কোমর থেকে ক্ষুদ্র রেশম পেটিকা বার করে। চতুরিকার পায়ের কাছে রেখে দেয়। চতুরিকা দেখেও দ্যাখে না, আবার জিজ্ঞেস করে, রাজা-রানী যাননি?

উদ্ধব বিরক্ত হয়। গণিকার এই কৌতূহল ভাল নয়। তার কেমন সন্দেহ জাগে। সে আচমকা দৃষ্টি বদল করে চতুরিকাকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। অঙ্গবিদ্যা প্রয়োগ করতে থাকে। গণিকার চোখদুটিকে নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করতে থাকে। কী বলতে চায় চতুরিকা? মগধী বণিককে ঘরে নেয়নি, তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। সেটা হয়ত ছল। মেয়ে-মানুষের মতো কূটবুদ্ধি কে ধরে? একে মেয়েমানুষ, তায় গণিকা, এদের মতো চতুর কে হয়? মেয়েমানুষ অতি খল প্রকৃতির হয়, যত শক্তি ওই মাথার ভিতরে। মুনি-ঋষিরা কী বলে গেছেন, না নারীই বিপদের আধার। কী না করতে পারে মেয়েমানুষ, তাকে ফাঁসিয়ে দিতে পারে অনায়াসে। ভাবতে ভাবতে উদ্ধবনারায়ণ সতর্ক হলো আরো। এই মেয়েমানুষ ফূর্তি ছাড়া কোন কাজে লাগে? উদ্ধব সন্দেহের চোখে চতুরিকাকে দেখতে থাকে। শ্যামবর্ণের যুবতী সম্পর্কে কী বলে গেছেন ঋষি পণ্ডিতরা? মনে পড়ে না উদ্ধবের, তবে সে ভেবে নেয় ভাল কথা তো বলেননি

তাঁরা নিশ্চয়। সুস্তনী, সুনিতম্বিনী নারী কামের আধার, তার যদি এমন মেঘেরও মতো রঙ হয়। কামই তো সব সর্বনাশের গোড়া। উদ্ধব চতুরিকাকে পর্যবেক্ষণ করে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। এই গণিকা হস্তিনী প্রকৃতির, প্রবল কামুক, তাতে কিছু প্রমাণও অবশ্য করা যায় না। উদ্ধবের মনে হচ্ছিল যদি কিছু প্রমাণ করা যেত, সন্দেহ সত্যি হতো, তাহলে কী লাভই না হতো। যদি সে ধরতে পারত চতুরিকা গণিকা কোনো চক্রান্তে লিপ্ত, তাহলে সোজা গণিকালয় থেকে বন্দিশালায়, বন্দিশালা থেকে দু'হাত ছেদন করে নগরের বাইরে। তার অবস্থান এক্ষেত্রে ভাল হতো রাজসভায়, পদোন্নতি ঘটত। তার ভাগ্যে কি তা হবে? একটা মেয়েমানুষ গেলে দশটা মেয়েমানুষও পাওয়া যাবে, কিন্তু চক্রান্তের হদিশ পাওয়া কি সোজা কথা? এই যে এতদিন সে রাজকর্মচারী হয়েছে, সত্রির কাজ করছে, একজনও চক্রান্তকারীকে কি বন্দি করতে পেরেছে? পারলে তো হয়েই যেত। গম্ভীরার ওই কন্যাটি, গন্ধবতী তার পায়ে এসে মুখ ঘষত। ক্ষমতায় কী না হয়? রাজশক্তির চেয়ে বড় শক্তি কী আছে এই পৃথিবীতে?

উদ্ধব জিজ্ঞেস করে, বণিক কি মগধের ছিল, না পশ্চিমদেশীয় যবন?

চতুরিকা খিল খিল করে হাসে, খোঁজ নিয়ে দ্যাখো, মহাপার্শ্বর সঙ্গে গিয়ে খোঁজ নাও কোন পান্থশালায় উঠেছে সে, বড় পছন্দ হয়েছিল আমাকে, শুধু তোমার জন্যেই ফিরিয়ে দিলাম, হ্যাঁ গো, বললে না রাজা-রানী কেন এলেন না?

উদ্ধবের ভিতরে সন্দেহ ঝিলিক দেয়, সতর্ক হয়, বলে, রানীর শিরঃপীড়া হয়েছিল।

কে বলল?

অন্তঃপুরের খবর, তুমি পেটিকাটি খুলে দেখলে না?

চতুরিকা হাত দিয়ে পেটিকাটি একধারে সরিয়ে দিয়ে অনাবৃত জংঘা, অলক্তরঞ্জিত পদযুগল এগিয়ে দেয় উদ্ধবের দিকে, খিলখিল করে হাসে, আমিও ওই মগধী বণিককে বললাম, শিরঃপীড়া হয়েছে, শরীর অসুস্থ, ভান করলাম, তাতে সে কী করে আসে?

উদ্ধব অবাক হয়ে চতুরিকাকে দেখছে। কী বলতে চায় চতুরিকা তা যেন ধরেও ধরতে পারছে না। চতুরিকার দিকে ঝুঁকে তার পুষ্ট উরুর উপর হাত রাখে বস্ত্রের উপর দিয়ে। বিড়বিড়িয়ে বলে, কী হয়েছে রাজঅন্তঃপুরে, কে জানে তা, সন্তানহীন রাজার জন্য অবন্তী দেশ ছারখার হয়ে গেল, দ্বিতীয়বার বিবাহও করল না রাজা, একি ঠিক হলো?

আচমকা এই কথায় চতুরিকা অবাক হয়ে উদ্ধবনারায়ণকে দেখছে। সহসা এই কথার মানে? বললই বা কেন? তার কথার সঙ্গে রাজা-রানীর তো কোনো সম্পর্কই নেই।

উদ্ধব বলে, এ বড় কু-লক্ষণ, সন্তানহীন রাজা কি রাজ্যে সুখ-সমৃদ্ধি আনতে পারবেন, এসব কথা তো হাটে মাঠে শুনি, দেখছ না কীরকম অনাবৃষ্টি চলছে, রাজার কোনো অধিকার নেই সিংহাসনে বসে থাকার।

চতুরিকার চোখের মণি জ্বলজ্বল করে ওঠে। ওষ্ঠাধারে জেগে ওঠে হাসির রেখা, সে বলে, ঠিকই তো রাজার দায়িত্ব অনেক, বৃষ্টি নেই, যাগযজ্ঞ হচ্ছে কই?

উদ্ধব বলে, রাজার সুশাসন নেই।

চতুরিকা বলে, তাই তো, অবশ্য তা বোধহয় অন্তঃপুরে।

অবন্তীর মানুষের সুখ নেই, ঘুমও নেই।

চতুরিকা মাথা দোলায়, কই আমার তো খুব ঘুম হয়।

অবন্তীর সিংহাসন এবার অন্যের হাতে যাবে, কে যোগ্য বলো দেখি, সেনাধ্যক্ষ না নগরের সবচেয়ে ধনী, শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত, একজন শ্রেষ্ঠী যদি সিংহাসনে বসেন ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব উন্নতি হবে, দেশের অবস্থাও ভাল হবে, ধনী ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে যাবে।

চতুরিকার মুখের ভাব বদল হলো। বিস্মিত হয়েছে সে। বিস্ময় শেষ হতেই হি হি করে হেসে ফেলে, কী যে বলো তুমি, তুমি বড় চালাক, আমার নাম চতুরিকা, আর তুমি হলে চতুর চূড়ামণি সত্রিমশায়, আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছ ফূর্তির কাজে এসে, অবন্তীর অধিপতির তুল্য গুণবান রাজা এই ভূ-মণ্ডলে নেই, তিনি কবি মনের মানুষ!

উদ্ধবের মুখের রং বদল হয়ে গেছে। ইস কী ভুলই না করল? তার কৌশলটি যেমন প্রকাশ করে দিল চতুরিকা গণিকার কাছে, তেমনি আরো জানিয়ে দিল নগরে কী সব কথা উঠছে। সে এসেছে আনন্দ

করতে। গত রাতটি খুব খারাপ গেছে। ধর্ষণে সুখ আছে বটে, কিন্তু সেই সুখ ধুয়ে গেছে মেয়েমানুষটির বিলাপে। তার চেয়ে এখানে এলে অনেক ভাল হতো। কী আশ্চর্য! সে গণিকাকে পরীক্ষা করতে গেল কেন? গণিকা কি রাজ সিংহাসনের দাবীদার? না সিংহাসনের বসার আকাঙক্ষা পোষণ করে মনে? ওই যে চতুরিকা তার পদযুগল থেকে অনাবৃত অঙ্গ ঢেকে নিয়েছে মেখলায়। উত্তরীয়তে আড়াল করেছে দেহখানি। উদ্ধব বোঝে তার দানে ভুল হয়ে গেছে। গণিকাই তাকে পরীক্ষা করল এত সময়।

উদ্ধব হাসতে চেষ্টা করে, পরীক্ষা করব কেন, তুমি পানপাত্রে সুরা ঢাল দেখি, ওই পেটিকাটি খুলে দ্যাখো চতুরিকের জন্য কী এনেছি আমি, মগধী বণিকও দিত না এই অলংকার।

কী এনেছো, চন্দ্রহার?

খুলেই দ্যাখো না।

কণ্ঠহার, বাজুবন্ধ?

খোল না কেন?

স্বর্ণতিলক, পায়ের নুপুর, মাথার মুকুট, সোনার বলয়?

আহা দ্যাখোই না।

চতুরিকা অবহেলায় পেটিকা উন্মোচন করে। ভিতর থেকে মুক্তোর কণ্ঠহার বেরিয়ে আসে, সে অবহেলার সঙ্গে মুক্তোগুলি পর্যবেক্ষণ করে।

পছন্দ হয়েছে তো মার্জারিকে? উদ্ধব চতুরিকার গন্ডদেশ স্পর্শ করে।

ধীরে ধীরে মাথা দোলায় চতুরিকা, এ আমার প্রয়োজন নেই।

চমকে ওঠে উদ্ধবনারায়ণ। বলে কি গণিকা? সে কি তাকে চাপ দিয়ে আরো কিছু নিতে চায়? মুক্তোর হার পছন্দ হবে না তো কী পছন্দ হবে? তাহলে কি মগধী বণিক ছিল এখানে? ঢুকেছিল ভিতরে? সবটাই লুকোচ্ছে তার কাছে চাতুরিকা। আবার সন্দেহ জাগে উদ্ধবের মনে। সন্দেহ করাই তার পেশা। সন্দেহ করতে পারলে সে খুশি হয়। এ সন্দেহ যদি সত্যি হয়, ভিনদেশী বণিকের সঙ্গে রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে গণিকা, তার পদোন্নতি হবেই। এমন মেয়েমানুষ কত জুটবে। কার্তিকপূর্ণিমার মেলায় যেমন পশুপাখি জোটে, তেমনি জোটে মেয়েমানুষ, মেলাতেও বিক্রি হয়, এমনিতেও মেলে।

চতুরিকা বিড়বিড় করে, মহালতা, চন্দ্রহার, স্বর্ণতিলক, বাজুবন্ধ, বলয়, নুপুর, কণ্ঠহারই বা কত রকমের! সব অলঙ্কারের নামও জানিনে আমি, তুমি দেখবে সত্রিমশায়?

সন্দেহ ঘনীভূত হলো। উদ্ধব তার সন্দেহভরা চোখে চাতুরিকাকে লক্ষ্য করতে থাকে। সন্দেহ করতে পারলে তার সুখ। সন্দেহ গভীর হলে সে যেন কামজর্জরিত হয়ে ওঠে। সর্ব অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়। দুই ঠোঁট শুকিয়ে যায়। জিভের জলে ঠোঁট ভেজায় উদ্ধবনারায়ণ। মনে মনে বলে, হে মহাকাল, সন্দেহটা যেন সত্যি হয়। নারী অবলা জীব, তাকে সন্দেহ করতে পারার চেয়ে সুখ আর কিছুতে নেই। কল্পনা করল উদ্ধব, গণিকা চতুরিকা রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে বন্দি হয়েছে। বন্দিশালায় সাত শকুন দিয়ে খাওয়াবে বিশ্বাসঘাতিনীকে, ধর্ষণ করাবে রক্ষীদের দিয়ে। রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত! তার চেয়ে বড় পাপ কী আছে? গণিকা, মেয়েমানুষকে শাস্তি দেওয়া কত সুবিধে। পন্ডিত, ব্রাহ্মণেরা তো বলেইছেন গণিকাকে বিশ্বাস করা যায় না। উদ্ধবের শ্বাস প্রশ্বাস গাঢ় হলো উত্তেজনায়। যদি সত্যি হয় সন্দেহ, তাহলে গণিকা চতুরিকার দুটি কানই কেটে নেওয়া যাবে। এই কাজ করতে পারলে অবন্তীর রাজসভায় তার মর্যাদা বাড়বে, গণিকালয়ে তার সেবিকার সংখ্যা বাড়বে। সন্দেহ সত্যি হবেই, না হলে যে চতুরিকা বিনামূল্যেই তাকে দেহ দিতে অভ্যস্ত, একটি দু'টি স্বর্ণমুদ্রা পেলে বর্তে যায়, সে কিনা একশত মুক্তার লহরী মেলানো কণ্ঠাহার থেকে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। কী অপরূপ এই মুক্তাহারের গড়ন, দীপাবলী থেকেই দেওয়ার ইচ্ছে ছিল উদ্ধবের। সংগ্রহ করা হয়নি। বিনামূল্যে সংগ্রহ তো করতে হবে। এই কণ্ঠহার, এই দেবছন্দ সে আর একটিও সংগ্রহ করতে যাচ্ছে গন্ধবতীর জন্য। উদ্ধব সন্দেহে উদ্বেল হয়ে ওঠে। এখন কৌশলে নামটি জেনে নিতে হবে, কে হয়েছে চতুরিকার নতুন নাগর। কোন বিদেশী? সে কি এখনো আছে এই নগরে? দুজনকে একসঙ্গে বন্দি করতে পারলে তার কপাল খুলে যাবে। কই, যে সব অলঙ্কারের কথা বলছে চতুরিকা, কোথায় তা? কী বলছে গণিকা, না পূর্ণিমার রাতে সে এত অলঙ্কার পেয়েছে যে সমস্ত দেহই আবৃত হয়ে যাবে। ফুলের অলঙ্কার তো দূরের কথা, গায়ে আবরণও লাগবে না। যত রকমের

কণ্ঠহার পেয়েছে সে, তাতে তার বুক ঢেকে যাবে, হি হি করে হাসছে চতুরিকা, বক্ষবাসের প্রয়োজন হবে না যেন। সে যেন রাজার রত্নভাণ্ডারের সব পেয়ে গেছে গত রাত্রিতে। সোনায় মুড়ে যাবে তার দেহ। অপেক্ষা করছিল উদ্ধবের জন্য, তার কাছেই সাজবে সে ওই অলঙ্কারে।

এ কী কান্ড! বিস্ফারিত হয়ে যায় উদ্ধবের দুই চোখ। উত্তাপ বাড়ছে শরীরে। চতুরিকা কি গণিকা হওয়ার যোগ্য? নৃত্য যা জানে, তা কিছুই না। খাঁটি রসিকের হাতে ধরা পড়লে কবে ও এই নগরের বাইরে চলে গিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করত। আছে সে গণিকা দেবদত্তার অনুগ্রহ নিয়ে, আর উদ্ধবনারায়ণের কৃপায়। উদ্ধব সেকথা কি স্মরণ করায় না তাকে? বারবার বলে না কি সেনাধ্যক্ষের কৃপাধন্য সে, সে কৃপা করছে বলে চতুরিকা আছে। হ্যাঁ, এই গণিকার যৌবন অতি মোহময়। এই যৌবন ভোগের পক্ষে অতি উত্তম। কিন্তু যৌবন কার না থাকে, যৌবনে কে না সুন্দরী হয়, কুক্কুরি পর্যন্ত। যুবতী নারী তো ভোগেরই বস্তু। তার নিজের কি অভাব আছে যুবতীর? রাজশক্তির অংশ সে। এসব এমনিই জোটে, গত রাতে যেমন জুটেছে। মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের চেলা জোগাড়ে বুড়ো বামুন পর্যন্ত ইচ্ছেমত ভোগ করতে পারে, প্রবীণ পুরোহিত না হয় বাদই থাকল। চতুরিকাকে অত অলঙ্কার কে দিল? ও কি তার যোগ্য? শুধুই শৃঙ্গার কর্মের জন্য, রতি নিপুণতার জন্য এত পাওয়া যায়?

চতুরিকা উঠেছে। ভিতরের ঘর থেকে একটি বড় রেশম পেটিকা বয়ে এনে মেঝেয় ফেলেছে। ধাতু আর পাথরের সংঘাত হয়ে বিচিত্র এক শব্দ শোনা গেল। চমকে ওঠে উদ্ধব। ঘুরে তাকায়। অর্গল রুদ্ধই আছে। এই রেশম পেটিকাই তো খুব দামী। এ তো যে কোনো মানুষ ব্যবহার করে না। সাধারণ নাগরিক এই পেটিকা ভরে অলঙ্কার দেবে? তাহলে সূর্যোদয় পশ্চিমে হতো।

উদ্ধব শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করে, সব অলঙ্কার?

হ্যাঁ খুলে দ্যাখো।

স-অ-অ-ব। বিস্ফারিত দুই চোখ নিয়ে উদ্ধব গণিকাকে দ্যাখে। এখন একেবারে নিরাভরণ, শুধু পুষ্প অলঙ্কারে সেজেছে চতুরিকা। সে পেটিকার দিতে তাকায় না। দুহাতে চতুরিকাকে আকর্ষণ করে, সব সোনাদানা, মণিরত্ন?

দ্যাখোই না তুমি। খিলখিল করে হাসে চতুরিকা, সমস্ত জীবনেও এত গয়না জোগাড় করতে পারতাম না, তুমি আমি কেউ দেখিনি।

মনে মনে বলে উদ্ধব, তুই না দেখিস, আমি যে দেখব না ভবিষ্যতে একথা তুই বলিস কী করে মাগি। বিড়বিড় করতে করতে উদ্ধব চোরা চাহনি দিয়ে পেটিকার খোলামুখ একঝলক দ্যাখে। ঘরে প্রদীপের আলো, পেটিকাটিতে আলো পৌঁছচ্ছে না, কিন্তু পেটিকার ভিতর থেকে যেন আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে। এই তো শেষ রাত্রি। এত অলঙ্কার যে পেয়েছে চতুরিকা, বিনিময়ে এমন কিছু করেছে যা অপরাধ। অপরাধ ব্যতীত এ জিনিস জোটে না। উদ্ধবনারায়ণ আরো তপ্ত হয়ে উঠে চতুরিকার বক্ষবাস ছিঁড়ে ফেলে। আর্তনাদ করে ওঠে চতুরিকা, কী করছ, আহ্, তুমি এতো ব্যস্ত কেন, পানপাত্র সাজাই, সুরা পান করো। চতুরিকা জোর করে উদ্ধবের আকর্ষণ মুক্ত হয়ে পানপাত্রে সুরা ভরতে থাকে। তখন উদ্ধব সতর্ক হয়ে পেটিকাতে হাত দেয়। হাতে যেন আগুনের ভাপ লাগে। দু'হাত ভরে অলঙ্কার পেটিকামুক্ত করে মেঝেয় রাখতে থাকে। চতুরিকা যা বলছিল, এ যে তার চেয়ে বেশি। এই অলঙ্কার কে দিতে পারে? আচমকা উদ্ধবের গা ঠান্ডা হয়ে আসে। সন্দেহের উল্টো কিছুও তো হতে পারে? হয়ত রাজা, রাজা ভর্তৃহরিই এই গণিকাতে মুগ্ধ হয়েছেন। গত রাত্রে রাজা মহাকালে যাননি, তাহলে কি এখানে এসেছিলেন? কী সর্বনাশ! তাহলে তো তার স্থান হবে বন্দিশালায়। রাজার গণিকার ঘরে কোন সাহসে ঢুকেছে সামান্য রাজকর্মচারী উদ্ধব? নাকি এসেছিলেন সেনাধ্যক্ষ কুমার বিক্রম? নাকি শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত? এঁদের ভোগ্যা যে রমণী, সে তো নিজেই একটি রত্ন বিশেষ। এত অলঙ্কারের চেয়েও তার দাম বেশী। উদ্ধব কুঁকড়ে যায় অলঙ্কারের বিভায়। ভীত চোখে একবার তাকায় গণিকার দিকে। সে নিজেই টের পায়নি এই গণিকার দাম। এত পেতে পারে? সে অতি নির্বোধ, যদি সন্দেহের কোনো কারণ থাকে তো চতুরিকা কি এই পেটিকা তার সামনে নিয়ে আসত, এত অলঙ্কার দেখাতো তাকে? অধোবদনে বসে আছে উদ্ধবনারায়ণ। তার আগেই বোঝা উচিত ছিল। এখন তার মাথাটি গণিকার পায়ে ঠেকিয়ে পালিয়ে যেতে হবে এখান থেকে। যদি রাজার কাছ থেকে, সেনাধ্যক্ষ বা শ্রেষ্ঠীর কাছ থেকে ডাক আসে চতুরিকার? বক্ষবাস

ছিন্ন করেছে সে। কী ভীষণ অপরাধ। এই অপরাধে তার দক্ষিণ হস্ত কেটে ফেলার আদেশও হতে পারে।

চতুরিকা সুরাপাত্র তার দিকে বাড়িয়ে ধরেছে, উত্তরীয়তে ঢেকে নিয়েছে উন্মুক্ত বক্ষ। ঝুঁকে পড়েছে তার সামনে, ডাকছে, কী হলো নাগর, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি সত্রিমশায়?

নয়

দু-ঢোক সুরাপানে উদ্ধবের নেশা হয়ে গেছে। ঝিম ঝিম করছে শরীর। ঘরের আলো তার চোখে এখন আরও উজ্জ্বল। পেটিকা উপুড় করে দিয়েছে চতুরিকা তার সাজানো শয্যায়। মণিরত্ন ঝকমক করছে। উদ্ধব সুরাপানেও সিধে হতে পারছে না। ঝিমঝিমে শরীর আরও কুঁকড়ে যাচ্ছে যেন। চতুরিকা অলংকারের স্তূপ থেকে একটি রত্নখচিত কণ্ঠহার তুলে ধরল হাতে, এ হারের নাম জানো?

উদ্ধব মাথা নাড়ে। তার চোখে জল এসে যাচ্ছে যেন। হায় চতুরিকা, এত গুণবতী তুমি তা কে জানত? মুগ্ধ দৃষ্টিতে চতুরিকার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে উদ্ধবনারায়ণ। এখন ঘর থেকে বেরোতে পারলেই হয়। বীট মহাপার্শ্বর কাছে জেনে নেবে আসল খবর। নেশায় চুর চুর উদ্ধবের মনে প্রেম জেগেছে সহসা। বিরহ তৈরি হচ্ছে। কতদূরের হয়ে যাবে গণিকা চতুরিকা, এরপর হয়ত দ্বারে দাঁড়াতে হবে তাকে। সেনাধ্যক্ষ যেমন আদেশ করবেন তেমন হবে। বড় ভয় লাগে তার সেনাধ্যক্ষ কুমার বিক্রমকে। সামনে দাঁড়ালেই পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে। রাজার কাছে যেতে বুক হিম হয়ে যায়। রাজকর্মচারী হওয়ার আগে এমন হত না। সাধারণ নাগরিক হয়ে সে রাজসভায় হাজির হয়েছে কতবার। শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত'র কাছেও তো হেঁটেছে অনেকবার। এখন শ্রেষ্ঠীর সামনে অধোমুখে দাঁড়াতে হয়। রাজসভায় শ্রেষ্ঠীর প্রভাব অনেক। উদ্ধব ভয় পায়, এখন যদি শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত এসে দাঁড়ান দরজায়। উদ্ধবের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে।

চতুরিকা যে কণ্ঠহারটি তুলে ধরেছে, তার দিকে তাকাতে উদ্ধবের চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছে। দুপুরের সূর্যের দীপ্তি যেন। হীরক খচিত রয়েছে যেন সোনার পাতে। চতুরিকা লাস্যময়ী হয়ে উঠছে ক্রমশ, হাতছানি দিচ্ছে উদ্ধবকে, বলল, এ হার কি গজমোতির?

মাথা নাড়ে উদ্ধব, জানে না সে। অবাক হয়ে শুনছে চতুরিকার কথা, সপ্তলহরী হার, গজমোতির হার, সীতাহার। চন্দ্রহারটি তুলে চতুরিকা ডাকে, কোমরে পরিয়ে দেবে? মেখলার বন্ধন শিথিল করে গণিকা তার কটিদেশ উন্মুক্ত করল। উদ্ধবের ভয় বাড়ল। চতুরিকা কি তাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে? অবন্তীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান, সবচেয়ে ধনবান ব্যক্তির চোখে পড়া রমণীর সামনে বসে নেশা করছে সে। মহার্ঘ কটিদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। উদ্ধব পিছিয়ে আসে, আমি এবার যাব।

খিলখিল করে হাসে চতুরিকা, কী হল নাগর তোমার, কাছে এস, সব আমাকে পরিয়ে দাও, দেখি এত গয়না গায়ে তুললে কেমন লাগে। পা বাড়িয়ে দেয় চতুরিকা, নুপুর পরিয়ে দাও, আমি সমস্ত গয়না পরে দেবদত্তার মতো নাচব, কেমন শিখেছি দ্যাখো।

উদ্ধব এবার কাঁপতে আরম্ভ করে। হায় মহাকাল। এ কোন ফাঁদে পড়ল সে? এত অলঙ্কার সে জীবনে দ্যাখেনি। মুহূর্তে মনের ভিতরে সন্দেহ জেগে ওঠে। চুরির মাল নয়ত? মনে করতে চেষ্টা করে নগরে এর ভিতরে কোনও চুরির ঘটনা ঘটেছে কি না। উজ্জয়িনী থেকে বিদিশা ফেরার পথে এক বণিকের সর্বস্ব অপহরণ করেছিল দস্যুদল। সেই জিনিস নয়তো? উদ্ধব দ্যাখে তার কোলের কাছে চতুরিকা তার পা দুটি বাড়িয়ে হাসছে। গণিকারও নেশা হয়ে গেছে। উরু পর্যন্ত উন্মুক্ত করে তাকে আহ্বান জানাচ্ছে চতুরিকা। উদ্ধব কাম সম্বরণ করে সন্দেহভরা গলায় জিজ্ঞেস করে, কে দিয়েছে এত অলঙ্কার?

খিলখিল করে হেসে শয্যায় লুটিয়ে পড়ে চতুরিকা, নাগরের হিংসে হচ্ছে?

এ তো অতুল সম্পদ, তুমি এর দাম জানো?

ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায় গণিকা, কিছুই জানি না, কাল রাত থেকে শুধু পেটিকা উপুড় করছি এই বিছানায়, আর নাড়াচাড়া করছি, সোনায় সোনায় ঠোকাঠুকিতে অদ্ভুত এক ধ্বনি ওঠে, কী সুন্দর লাগে তা, রাত্তিরে আমি ঘুমোইনি পর্যন্ত, ভাবছি কখন আসবে আমার নাগর, সে আমাকে সাজাবে, এতো গয়না একা পরে কী হবে, যদি তুমিই না দেখ।

উঠে বসেছে গণিকা। উর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত, কটিদেশ থেকে শিথিল হয়ে মেখলা কোনোরকমে দেহের

নিম্নদেশ ঢেকে আছে। উদ্ধব দ্যাখে যুবতীর ভিতরে কাম জেগে উঠছে। অধরে, স্তনে, কামভাব স্পষ্ট। উদ্ধবের সাহস একটু একটু করে বাড়ছে। এই গণিকা এত নির্বোধ নয় যে রাজা, সেনাধ্যক্ষ বা শ্রেষ্ঠীর উপঢৌকন দিয়ে তার সঙ্গে লীলা করার সাহস দেখাবে। এ নিশ্চয়ই চুরি করা মাল। আর তাই চতুরিকার এত রঙ্গ আজ। অন্যদিন দেহের সুতো সরাতে কত সাধনা করতে হয়। রতিলীলার সমস্ত সুখ গণিকার সহযোগিতা ব্যতীত পাওয়া সম্ভব নয়। শৃঙ্গার কর্মের এক অঙ্গ তো ওই সাধনা। অথচ আজ চতুরিকার অন্য রূপ। উদ্ধব সিধে হয়ে বসে। যদি চুরির মাল হয়, বিদেশী বণিকের জিনিস হয়, এই অলঙ্কার রাজসভায় গচ্ছিত করতে হবে। তা যদি করে সে, তবে তার পদোন্নতির সম্ভাবনা দেখা দেবে। ক্ষমতা বাড়বে। কিন্তু এত গয়না না গচ্ছিত করে সে যদি আত্মসাৎ করে তাহলেও লাভ কম নয়। গণিকার কপালে দুঃখ আছে এই অলঙ্কারের জন্য।

উদ্ধব জিজ্ঞেস করে, কী করে পেলে এত গয়না?

পেয়েছি। চতুরিকা ভাঙে না।

কে দিয়েছে তা জানতে হবে তো আমাকে, আমার কর্তব্য হলো খোঁজ রাখা।

চতুরিকা বলল, সব জানতে হবে?

উদ্ধবের সন্দেহ গাঢ় হয়, জানতে তো হবেই, কে দিতে পারে এত গয়না?

চতুরিকা বলে, নাই বা জানলে।

উদ্ধব টের পায় লুকোতে চাইছে চতুরিকা। লুকোতে দেবে না সে। জেরা করে বার করে আনবে সত্যি কথা। জানতেই হবে। উদ্ধব বলে, এ কি চুরির মাল?

তার অর্থ?

ভিনদেশী বণিকের সর্বস্ব লুঠ করে নিয়েছিল দস্যুদল, এইতো দীপাবলীর পরের ঘটনা, যা জানা গেছে এইরকম পরিমাণ গয়না ছিল সঙ্গে।

চতুরিকা কথাটির কোনও গুরুত্বই দেয় না, বলে, আমি কি দস্যুতা করেছি, নাকি তুমিই হলে আসল দস্যু, আমি কি তোমাকে চিনি না নাগর?

চতুরিকার এই কথায় যে যৌনতার ছোঁয়া তাতে উদ্ধব টলে না, সে বোঝে গণিকা তাকে রূপ আর কামে ভুলাতে চাইছে। ভুলবে কেন উদ্ধব? সে রাজকর্মচারী। রাজশক্তির আরও অধিকার নিতে চায়। এ তার গোপন বাসনা। সে বলল, আমার সন্দেহ হচ্ছে।

চতুরিকা এবার বিরক্ত হয়, কিসের সন্দেহ?

তা তুমি বুঝতে পারছ না, কে দিয়েছে এত গয়না এক্ষুনি বলো।

চতুরিকা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চন্দ্রহার নিয়ে উন্মুক্ত কটিদেশে স্থাপন করতে করতে বিড়বিড় করে, এমন হবে জানলে আমি নিজেই সাজতাম একা একা, রাজকর্মচারীর রস নেই, তুমি কেমন মানুষ, শুনবে কে দিয়েছে, শুনলে অবাক হবে।

দুই ভ্রূ কুঁচকে উদ্ধবনারায়ণ তাকিয়ে আছে গণিকার দিকে। তার ভিতরে আবার সঙ্কোচ তৈরি হচ্ছে। কে দিয়েছে, কে দিতে পারে? অপহরণের কল্পনা অন্তর্হিত হলো। আবার ভয় জেগে উঠল ভিতরে। চতুরিকা তাকে পরীক্ষা করছে নাকি? তাহলে সেই কথাই সত্যি যা সে আগে ভেবেছে। অপহৃত সম্পদ হলে চতুরিকা গোপন করত।

চতুরিকা বলে, এক ধনাঢ্য ব্যক্তির উপঢৌকন এইসব।

গা হিম হয়ে আসে উদ্ধবের। আর জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না কে সেই ধনাঢ্য। চতুরিকা সরে আসে তার কাছে। দু-হাত বাড়িয়ে আকর্ষণ করে উদ্ধবনারায়ণকে। উদ্ধব যেন সাড়হীন, নিশ্চল পাথর যেমন হয় তেমনি। চতুরিকার স্পর্শে উদ্ধবের ভিতরে কোনো রোমাঞ্চ জাগে না। তার কর্ণকুহরে চতুরিকার মুখ। ওষ্ঠের স্পর্শ পাচ্ছে উদ্ধব, তার কর্ণমূলে চতুরিকার জিহ্বার ছোঁয়া। উদ্ধবকে কঠিন আলিঙ্গনে বাঁধে গণিকা, চাপা গলায় বলে, শুনলে তুমি অবাক হবে।

কার? বিহ্বল উদ্ধবনারায়ণ কর্তব্য ঠিক করতে পারছে না।

চতুরিকা ফিসফিস করে নামটি উচ্চারণ করতেই উদ্ধবনারায়ণ ছিটকে সরে আসে চতুরিকার আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে। শয্যা থেকে নেমে ঘরের কোণে গিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হাঁপায়। প্রদীপের আলোয়

চতুরিকা ঝলমল করছে। গলায় দিয়েছে রত্নখচিত স্বর্ণহার, কপালে স্বর্ণতিলক। চতুরিকা সেজে উঠছে। কী আশ্চর্য। তার ভয় সত্যি হলো? সে কোথায় এসেছে? অধোমুখে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে উদ্ধব। কী অলৌকিক কান্ড ঘটিয়েছে এই সামান্য যুবতী। যৌবনের এত শক্তি? এই গণিকা তো কোনো বিদ্যাই জানে না, তবুও বশ করতে পেরেছে যাকে, তার কথা ভাবতেই উদ্ধব কেঁপে ওঠে। এতক্ষণে জানা গেল। উদ্ধব বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকায় গণিকার দিকে। এ কি সেই চতুরিকা যে উদ্ধবের প্রহারে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য হয়েছে। এ কি সেই গণিকা যে উদ্ধবের যাবতীয় বিকৃত রুচিতে সায় দিয়েছে দিনের পর দিন। কামলীলায় উদ্ধব যেমন আচরণ করতে বলেছে সে করেছে দাসীর মতো। উদ্ধবের মনে হয় সে ভুল করে নগরের এই শ্রেষ্ঠ গণিকার ঘরে ঢুকে পড়েছে। তার যতটা ক্ষমতা, তাতে তার ফূর্তির উপায় হতে পারে নগরের উপান্তে গড়ে ওঠা বারাঙ্গনাপল্লী। সে এখানে এল কীভাবে?

চতুরিকা ঝলমল করতে করতে এগিয়ে আসে। আরো গয়নায় নিজেকে সাজিয়েছে চতুরিকা। প্রদীপের আলো তার সমস্ত অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। উদ্ধব নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। তার ভয় করছে চতুরিকার দিকে দৃষ্টি ফেলতে। এই গণিকা তো তার ভোগ্যা নয়, যার ভোগ্যা তার কাছে নতজানু হয়েই তো রাজশক্তির আস্বাদ পেয়েছে সে। যদি জানতে পারে সেই ব্যক্তি, উদ্ধবের পরিণাম হবে গম্ভীরার সেই যুবকের মতো, যে অবন্তী দেশ ছেড়ে চলে গেছে। অবন্তীতে প্রবেশ করলেই, এই নগরে পা দিলেই তাকে যে করে হোক বন্দিশালায় পাঠানোর ব্যবস্থা করবে উদ্ধব। তার আগেই গন্ধবতীকে বিবাহ করে গৃহবন্দি করবে। উদ্ধবের মাথায় ঝিলিক দিল একটি চাতুরী। এই গণিকার নাগর ছিল সে তিনদিন আগেও। চতুরিকাকে দিয়েই গন্ধবতীকে বিবাহ করার ব্যবস্থা পাকা করতে পারে সে। চতুরিকা যদি তার নতুন নাগরকে বলে, তার কথা ফেলতে পারবে না শিবনাথ।

একহাত দূরে দাঁড়িয়ে চতুরিকা তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলছে। কামার্ত হয়ে উঠেছে গণিকা। এমন কখনো হয়? হয়েছে? যতবার ভোগ করেছে উদ্ধব, তাকেই তো সক্রিয় হতে হয়েছে প্রথমে। এই গণিকাকে জাগাতে হয়েছে। কতবার এর অনিচ্ছায়ও ধর্ষণ করেছে উদ্ধব। কিন্তু এখন কী দেখছে! চতুরিকার আঁখিতারার নিমীলিতভাব, ওষ্ঠাধরের রসবতী হয়ে ওঠা, শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে যুগলবক্ষের কম্পন তো তার শরীরের উদ্বেলতাই প্রকাশ করছে। যখন গণিকা তার হাতের মুঠো থেকে সরে গেছে, তার অধিকারমুক্ত হয়েছে তখন কি না সে তার দিকে কামভাবে তাকাচ্ছে। উদ্ধব মাথা নিচু করে। চোখ বন্ধ করে। এখন চতুরিকার দিকে কামভাবে তাকানো অপরাধ। যে রাজশক্তির অংশ হয়ে গেছে চতুরিকা তার নতুন গুণগ্রাহীকে পেয়ে, তা উদ্ধবের কাছে অকল্পনীয়। উদ্ধব তার কোনো কথাই মনে রাখতে চায় না। যে গণিকা তার ভোগ্যা ছিল, সে গণিকা যেন এ নয়, অন্য কেউ। উদ্ধব যার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে হলো এই নগরের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের একজনের চোখের মণি। উদ্ধব বরং চতুরিকার অনুগ্রহ ভিক্ষা করবে এরপর। চতুরিকার অনুগ্রহ পেলে সে এই নগরের শ্রেষ্ঠ মানুষের অনুগ্রহ পাবে। জীবন তার ধন্য হবে।

খিলখিল করে হেসে ওঠে চতুরিকা, ভয় পেয়েছো নাগর?

উদ্ধবের গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় না, সে একটি কথাও বলে না। অধোমুখেই টের পায় তার সঙ্গে যেটুকু ব্যবধান ছিল চতুরিকার তা যেন লুপ্ত হয়ে গেল। গণিকা দু-হাতে তাকে কঠিন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে। এই স্পর্শ অন্যরকম। ফুলের গয়নায় সজ্জিতা গণিকার স্পর্শে অভ্যস্ত উদ্ধবের মনে হয় গায়ের ছাল-চামড়া যেন ছিঁড়ে যাবে চতুরিকার গায়ের গয়নার ঘষাঘষিতে। উদ্ধবের মনে হয় রক্তমাংসের নারী নয়, সোনার মূর্তি যেন তাকে কঠিন পেষণে মেরে ফেলবে এবার। স্তন, উরু থেকে যুবতী গণিকার সমস্ত অঙ্গ যেন ধাতু নির্মিত হয়ে গেছে। অলঙ্কারে অলঙ্কারে ঘর্ষণে আশ্চর্য এক ধ্বনি উঠছে। এ ধ্বনির সঙ্গে পরিচিত নয় উদ্ধব। ঘরের পাথুরে মেঝে থেকে উঠে আসা শৈত্যপ্রবাহে উদ্ধবের গায়ের রক্ত যেন বরফ হয়ে গেছে। কী সর্বনাশ। এতদিনের অপমানের শোধ নিতে চাইছে যেন গণিকা চতুরিকা। যে শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত'র উপঢৌকন নিয়ে বসে আছে, সে কেন উদ্ধবনারায়ণের সঙ্গ চাইবে? উদ্ধবের মনে হলো সে আলিঙ্গন-মুক্ত হয়ে চতুরিকার পায়ে মাথা ঠেকায়। ক্ষমা চেয়ে নেয়। শ্রেষ্ঠী শুনলে খুশি হবে। শ্রেষ্ঠীর ভোগ্যা গণিকাও তো উদ্ধবের ভজনার পাত্রী। চতুরিকার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে উদ্ধব এবার পালাবে, তার আগে মুক্তোহারটি উদ্ধার করতে পারলে হতো। ওটি শুধু শুধু গেল। এইসব অলঙ্কারের

কাছে ওই মুক্তোহারের মূল্য কী? উদ্ধব মুখ তুলে দ্যাখে তার দেওয়া মুক্তোহারটি চতুরিকার স্তন ঘিরে আছে। ওটিও পরেছে গণিকা। কিছুই ছাড়বে না।

চতুরিকা বলে, নাগর আমাকে নূপুর পরিয়ে দেবে না?

উদ্ধব ক্লান্ত গলায় বলে, দিতে আজ্ঞা হোক, নূপুর জোড়া কোথায়?

হি হি করে হাসতে থাকে চতুরিকা, তাকে দু-হাতে ঝাঁকানি দেয়। কানের কাছে ফিসফিস করে, আমি তোমারই আছি সত্রিমশায়, আচ্ছা সোনার গয়না কি শরীর গরম করে? কাল রাত থেকে যতবার নাড়াচাড়া করেছি এসব ততবার দেহ যেন আগুন হয়ে উঠেছে, কিন্তু তোমার কী হলো, শোনো গো, এইসব গয়না শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত'র উপঢৌকন কিন্তু আমাকে তো নয়, শ্রেষ্ঠী দিয়েছিলেন দেবদত্তা সখীকে গতরাত্রে, দেবদত্তা সখী সব দান করে দিয়েছে আমাকে, শোনো গো, দেবদত্তা রাজঅনুরাগিনী, রাজা ভর্তৃহরির প্রেমে পড়েছে দেবদত্তা, রসমঞ্জরীর মেয়ে, কিন্তু শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত তো ছাড়বে না তাকে, সে নাকি রাজার চেয়েও বেশি ধনী, দেবদত্তাকে সোনায় মুড়ে দিয়েছে....।

উদ্ধব চমকে গেছে। কী নির্বোধ সে। গণিকা দেবদত্তা যে শ্রেষ্ঠীর ভোগ্যা তা কি অজানা তার? গম্ভীরার সেই ধ্রুবপুত্র তো তাই অবন্তী দেশ ছেড়ে চলে গেল। তার তো আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল। কিন্তু তাই বা করবে কী করে? দেবদত্তার পাওয়া গয়না চতুরিকার অঙ্গে ওঠার কারণ কী? বলছে চতুরিকা। অলঙ্কারে বিতৃষ্ণা দেবদত্তার, আবার তা যদি হয় শ্রেষ্ঠীর দেওয়া। শ্রেষ্ঠীকে সহ্যই করতে পারে না। শ্রেষ্ঠীর দেওয়া অলঙ্কারকে সে অবহেলায় দান করে দিয়েছে চতুরিকাকে। দেবদত্তা বলেছে, ওই গয়না তার কাছে ভীষণ ভার। ওই ভার সহ্য করতে পারবে না। শ্রেষ্ঠীকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করার সাহস তার নেই, এইভাবে গোপন প্রত্যাখ্যানে নিজেকে শুদ্ধ করতে চেয়েছে সে।

উদ্ধব ধীরে ধীরে চতুরিকার কাছ থেকে সরে এসে তীব্র দৃষ্টিতে তাকে বিদ্ধ করতে থাকে। এত ছলাকলার কারণ কী? উদ্ধবের ভিতরে রোষ জাগে। চতুরিকা বলে যাচ্ছে কীভাবে মধ্যরাতে শ্রেষ্ঠী চলে যাওয়ার পরে গোপনে দেবদত্তা তার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। তার সঙ্গে দ্যূতক্রীড়ায় বসেছিল শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত। বার বার পরাস্ত হয়ে এক একটি করে অলঙ্কার পরিয়ে দিয়েছিল দেবদত্তাকে। অলঙ্কারের ভারে শিরঃপীড়া আরম্ভ হয়েছিল দেবদত্তার। তার অঙ্গ নাকি জ্বলছিল অলঙ্কারের স্পর্শে। উদ্ধবের ভিতরের রোষ তীব্র হয় চতুরিকার কথা শুনতে শুনতে। মনে মনে সে নিজেকে তিরস্কার করতে থাকে। ক্রোধে সে কাঁপতে থাকে। মনে মনে বলে, এই কথাটা আগে বলতে পারিসনি মাগি, শতবার তোর পায়ে মাথা ঠেকালাম আমি মনে মনে, কতরকম ভাবলাম! উদ্ধব ঝাঁপিয়ে চতুরিকার কেশ আকর্ষণ করে তাকে শয্যায় নিয়ে ফেলে, মুখে বলে, কথাটা আগে বলতে হতো ছেনাল মাগি, এতটা সময় নষ্ট হলো।

উদ্ধবের পরিবর্তনে ভীত হয় চতুরিকা। কাঁপতে আরম্ভ করেছে সে। তার শরীরের কামনা আচমকা মিলিয়ে গেছে। উদ্ধবনারায়ণের প্রকৃত রূপ যেন আরো আরো বেশি প্রকৃত হয়ে উঠেছে এখন। চতুরিকা কী বলতে গেলে উদ্ধব তার মুখে উত্তরীয়র একটা অংশ গুঁজে দেয়। এইভাবে গতকাল সে ধর্ষণ করেছে একটি কিশোরী কন্যাকে, যে ছিল সম্পূর্ণ কুমারী, যার আঘ্রাণ তার আগে কোনো পুরুষেরই নেওয়ার সৌভাগ্য হয়নি।

কী করছ? চতুরিকা উদ্ধবের পেষণমুক্ত হতে চায়। তার গলা দিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরোয়। উদ্ধবনারায়ণ গর্জন করে ওঠে, বলে, এইভাবে কাল রাতে একটা মেয়েছেলেকে বশ করেছি, বুঝলি চতুরিকে।

চতুরিকার সমস্ত শরীর এলিয়ে যেতে থাকে। তার সমস্ত কল্পনা যা গতরাত থেকে সে নির্মাণ করেছিল একা একা তা ভেঙে যেতে থাকে। এতবার পুরুষ সঙ্গ করার পরও ধর্ষিতা হতে হতে চতুরিকার চোখে জল এসে যায়।

অনেকটা সময় পরে উদ্ধব ক্লান্ত হয়। চতুরিকার মুখ থেকে গোঁজা উত্তরীয় বের করে এনে তার নগ্ন, ধর্ষিতা, শরীর দেখতে থাকে। হাঁপায় উদ্ধবনারায়ণ, হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, এও একপ্রকার শৃঙ্গার, রতিক্রিয়ার এও এক উপায়, বুঝলি চতুরিকে, এভাবেই নাগর তৃপ্ত হয়।

চতুরিকা মুখ তোলে না। উদ্ধব তার সমস্ত অঙ্গে লেপ্টে থাকা সোনার গয়নাগুলি নেড়ে-চেড়ে

দেখতে থাকে, বলে, রাগ করিস নে চতুরিকে, আমি এইরকম, এভাবে যে শরীর তৃপ্ত হয় তা গতকাল আবার দেখেছি। কিন্তু সে মেয়েমানুষটা কেঁদেই সব ফূর্তি শেষ করে দিয়েছিল, তুই তো তেমন করিসনি।

চতুরিকা ওঠে শয্যা ছেড়ে। শীত করছিল তার। একটি পশম চাদর গায়ে দিয়ে শয্যার অন্যপ্রান্তে গিয়ে বসে। উদ্ধবনারায়ণ বলছে এবার অন্য কথা। রাজার সেনাপতি কুমার বিক্রম তার পদোন্নতি ঘটাবে শীঘ্রই। তখন সে চতুরিকাকে এত অলঙ্কারে নিজেই মুড়ে দিতে পারবে। আজ চতুরিকা তাকে তৃপ্ত করেছে। তার ছলনায় সে সফল হয়েছে। ছলাকলা না জানলে কিসের মেয়েমানুষ। কত রমণী ভোগ করেছে সে, আজকের মতো এত তুষ্ট কখনো হয়েছে কি? হয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু আজও কাটল চমৎকার। সে সবই জানত। চতুরিকা তো সামান্য গণিকা, তার উপরে উদ্ধবের ভোগ্যা। এ কথা তো রাজ-সেনাপতি, শ্রেষ্ঠী সবাই জানে। রাজাও জানে গণিকা চতুরিকা আসলে উদ্ধবেরই রক্ষিতা। সবটা বুঝতে পেরেও উদ্ধব নাকি অভিনয় করছিল। এই অভিনয়ও তো শৃঙ্গারের অঙ্গ। এতটা সময় এই অভিনয় না করলে ধর্ষণের ইচ্ছা জাগত কী করে তার ভিতরে? গতরাতের অপূর্ণ কামনা পূরণ হতো কী করে? সে যেভাবে রতিকর্ম করেছে আজ, তা তারই উদ্ভাবিত এক পদ্ধতি। উদ্ধব এইভাবে তার ধর্ষণের পক্ষে যুক্তি সাজায়। ধর্ষণটিও অভিনয়। হাসে উদ্ধব। তারপর চতুরিকার মুক্তকেশ আকর্ষণ করে আবার বলে, প্রাচীনকালে রাজপুরুষরা এইভাবে রমণী আকর্ষণ করত, রমণীদের এই যে দীর্ঘকেশ, খোপা সাজানো, এইসবই তো পুরুষ যাতে তাকে সহজে আকর্ষণ করতে পারে সেইজন্য। চতুরিকাকে টেনে নিজের কোলে এনে ফেলে উদ্ধব, পশম চাদরের ভিতরে দুটি হাত প্রবেশ করিয়ে তার অলঙ্কার অনুভব করতে করতে বলে, চতুরিকে, আর কে জানে এই গয়নার কথা?

বিহ্বল, বিষাদময়ী গণিকা মাথা নাড়ে।

কেউ জানে না তো?

চতুরিকা কোনোক্রমে বলে, বায়সপক্ষীও নয়।

উদ্ধব চতুরিকার গায়ের গয়না খুলতে খুলতে বলে, সযত্নে রক্ষা করতে হবে এই গয়না, শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত দিয়েছেন তাঁর প্রিয় গণিকাকে, তা তোর ঘরে রাখা ঠিক হবে না মার্জারিকে, এখন চতুর্দিকে নানা গোলমাল, কী থেকে কী হয়, আমাকে ভাবতে হবে তো তোর কথা, তোর যদি কিছু হয় এই গয়নার জন্য তাহলে আমিও কি ছাড়া পাব, শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত বড় কঠিন মানুষ, তাঁর কানে যদি যায়...।

কোমরের চন্দ্রহার খুলতে থাকে উদ্ধবনারায়ণ। খুলতে খুলতে বলে, আজ তো তাম্বুল দিলি না চতুরিকে, তোর মুখের তাম্বুল আমার প্রিয়, দাঁড়া গয়না আমি পরাইনি এইজন্য, খুলতে তো হবেই, নিজের পরানো গয়না নিজে খুলি কী করে?

প্রদীপের বুকের তেল ফুরিয়ে এসেছে। দপ্ দপ্ করছে আলো। চতুরিকার শীত করছে। উদ্ধবনারায়ণের হাত কী ঠান্ডা! যেন মরা মানুষের হাত। কাঁপতে লাগল চতুরিকা। দু-চোখ বন্ধ করে কাঁপছে সে শীতে। তার গায়ের গয়না খুলতে খুলতে উদ্ধবনারায়ণ ভুল করে তার কোমল অঙ্গ না ছিঁড়ে ফেলে। ভয় করতে লাগল গণিকার।

দশ

রাজা গন্ধর্ব সেনের দুই রানী ছিল, দুই রানীর দুই পুত্র, তাছাড়াও ছিল গণিকা রসমঞ্জরী, রসমঞ্জরীর কথা জানতো খুড়িমা, এখন যার কথা শোনা যায় গণিকা দেবদত্তা, তারই মা, দেবদত্তা নাকি পরমাসুন্দরী অতি গুণবতী। বলল পদ্মাবতী, রেবার প্রতিবেশিনী, তারই বয়সী, স্বামীপুত্র ভরা সংসারে গরবিনী। বলতে বলতে তাম্বুল মুখে নিল। পিকদানিটিও হাতে করে এনেছে সে, তাম্বুল রসে ঠোঁটদুটি যে সব সময় রাঙা।

কথাটা শুনল রেবা। দূরে বসেই শুনল। সে কাপড় রাঙাচ্ছিল গৈরিক রঙে। এরপর এই কার্পাস বস্ত্রে লতাপাতার ছাপ ফেলবে কাঠের ছাঁচ দিয়ে। এই কাজটি তাকে শিখিয়েছিল তার স্বামী। কার্তিককুমার কত কিছুই না জানত। কাঠের কাজ করত সুন্দর। তার হাতে তৈরি এই লতাপাতার ছাঁচ অবিকল। কার্তিককুমার বলত, ঝরা পাতা, ঝরা ফুলের ছাঁচ তৈরি করবে, শীতে যখন পাতা ঝরতে শুরু করে, বাতাসে ঝরাপাতারা যেভাবে ওড়ে, অবিকল সেই ছাপ তুলবে রেশম বস্ত্রে, ওই বস্ত্র পরলে যেন মনে হয় বসন্ত আসছে পাতা তো বসন্তের আরম্ভেও ঝরে। পত্র ঝরণের মায়া আনবে বস্ত্রে। কার্তিককুমার

বলেছিল, যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে অমন বস্ত্র ছাপাই করে সে রেবাকে দেবে, নিয়ে যাবে রাজসভায় রানী ভানুমতির জন্য। রেবার ঠোঁটের কোণে মলিন হাসির ভাব জাগল, সে এক সৈনিকের বউ, তার জন্য এবং রানীর জন্য একই রকম বস্ত্র! এ কখনো হয়, হতে পারে? সেই জন্যই কি মানুষটা যুদ্ধ থেকে ফিরল না। রেবা ঘুরে তাকায় গন্ধবতীর দিকে। গন্ধবতী উঠে দাঁড়িয়েছে।

পদ্মাবতী, যাকে কথাটা বলেছে সে হলো বুড়ি পার্বতী। এও প্রতিবেশিনী। তবে অনেক বয়স, স্বামী বেঁচে নেই, বহুকালের বিধবা। একটু কূটনি প্রকৃতির। আদি রসে উৎসাহ বেশি। পদ্মাবতীর কথায় বুড়ি পার্বতী বলল, পুরুষমানুষ যদি দশটা মেয়েমানুষ ভোগ না করে তবে সে কিসের পুরুষ, গন্ধর্ব সেনের আরো কত গণিকা ছিল, কোনো পূর্ণিমায়, উৎসবে স্বামীর মুখ দেখতে পেত না রানীরা, পুরুষমানুষ তো এমনই হয়।

না, না তা কেন, রাজারা এমন হন। পদ্মাবতী কথাটা বলে রেবার দিকে ফিরে সমর্থন চায়। রেবা জলে হাত ধুয়ে আঁচল মুছতে মুছতে গন্ধবতীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তুই উঠলি যে, কোথায় যাবি?

গন্ধবতী বলল, জল আনতে যাই ইঁদারায়।

যাবি রে যাবি। পদ্মাবতী হি হি করে হেসে পিকদানিতে পিক ফেলল, এখনই ইঁদারায় গিয়ে একা বসে থাকবি, ও রেবা, ওর ভাল সম্বন্ধই তো এসেছে।

রেবা জবাব দিল না। আকাশে তাকায়। পৌষ মাসের পক্ষকাল কেটে গেছে। সূর্যদেবের উত্তরায়ণ শুরু হয়ে গেছে বেশ ক'দিন। রোদের তাপ এখনো বাড়েনি বটে, আর দু'পক্ষ কাটলেই ধার বাড়বে। তেমনই তো হয়ে থাকে।

এবার অবন্তীদেশে শীতের কামড় অন্যান্য বৎসরের তুলনায় কম তীব্র। উত্তরদেশ থেকে শৈত্য বয়ে আনা বাতাস গতবারের চেয়েও যেন হীনবল। এই দেশে এই সময়ে রাতের তাপমাত্রা অনেক নেমে আসে, শীত প্রবল হয়। রাতে শীত যেমন প্রবল, দিনমানে সূর্যের কিরণে সব দিক পরম উষ্ণতায় ছেয়ে যায়। এ বছর দিনমানের উত্তাপ আছে, কিন্তু তাতে জারিত হওয়া যেন নেই। রোদ আছে তার উজ্জ্বলতা নেই। কেমন ঘোলাটে ভাব যেন রোদের ভিতর। আকাশের গায়ের নীলেও যেন ধূসরতা মিশে গেছে। অবন্তীদেশের মানুষের কাছে এই সময়ের রৌদ্র অতি প্রিয়। দুপুরে রৌদ্রসেবন করতে করতে মানুষ গল্প করে। গল্পের জন্য দুপুরটি এই দেশের রমণীদের কাছে প্রশস্ত। রেবার আঙিনায় তিন প্রতিবেশিনীর গল্প হচ্ছিল।

রেবা আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে পদ্মাবতীকে জিজ্ঞেস করে, গোধূম হয়েছে?

পদ্মাবতী মাথা নাড়ে, যেমন তোদের জমিতে হয়েছে, ও খুড়িমা এমন কখনো হয়নি গো, গোধূম ক্ষেত দেখে এস; দেখে আয় রেবা।

দেখেছে রেবা। গোধূম বপন করা হয়েছিল কার্তিকের শেষে। গতবার তবু কিছু জন্মেছিল, এবার অধিকাংশই অঙ্কুরিত হয়নি। মাটিতে জল নেই বলছিলেন শ্বশুরমশায়। এই সময়ে গোধূম ক্ষেত সবুজ হয়ে থাকে। সেই সবুজতা ধূসর হয়ে গেছে যেন। এখানে ওখানে খন্ড খন্ড মলিন সবুজ গোধূমপুঞ্জ, বাকি অংশে ধূসর কৃষ্ণ মৃত্তিকা। কী চেহারা হয়েছে দশদিকের। কাপাস বনের গাছগুলি হতশ্রী। অবন্তীদেশের এমন বিষাদময়ী রূপ দ্যাখেনি মানুষ। বসন্তে ফুল ফুটবে তো?

রেবা গোধূমের কথা তুলল প্রসঙ্গ বদলাতে। কিন্তু বুড়ি পার্বতী আবার প্রসঙ্গেই ফিরে যেতে চাইল, বলল, গন্ধর্বসেনের ভোগের স্পৃহা ছিল, অবন্তীর রাজা ভর্তৃহরির তা নেই।

উনি তো নাকি কবি? জিজ্ঞেস করল পদ্মাবতী রেবাকে।

রেবা বলল, তাই তো শুনেছি।

মহাকবি ভাসের মতো?

তা তো জানিনা।

পদ্মাবতী বলল, স্বপ্ন বাসবদত্তম তো মহাকবি ভাসেরই রচনা শুনেছি।

গন্ধবতী এবার যোগ দিল কথায়, হ্যাঁ, জানো খুড়িমা, স্বপ্ন বাসবদত্তম নাটকে একজন আছেন পদ্মাবতী, তিনি বৎসরাজ উদয়নের মহিষী, মগধের রাজার ভগিনী।

পদ্মাবতী অবাক হয়ে বলল, আমি তো জানি ওটি উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোৎ মহাসেনের কন্যা বাসবদত্তা

আর বৎসদেশের রাজা উদয়নের কাহিনী,আছে নাকি পদ্মাবতী?

আছে, শুনবে তা?

বুড়ি পার্বতী বলল, ওই দ্যাখ বৎসরাজেরও দুই বিয়ে, আমাদের রাজা একটির বেশি মেয়েমানুষের দিকে তাকাবেন না, নিঃসন্তান তবুও বিয়ে করবেন না আর।

রেবা বলল, থাক খুড়িমা, রাজার কথা থাক।

থাকবে কেন, রাজা যদি নিঃসন্তান হয় রাজ্যের কি মঙ্গল হয়?

থাক, ওসব কথা বলার আমরা কে? রেবা ভয় পায়।

বুড়ি পার্বতী বলে, আমরা না বললে কে বলবে, ওই যে আছে এক গণিকা দেবদত্তা, তার দিকেও নাকি রাজার মন নেই, মেয়েমানুষ নিয়ে থাকে না এমন লোক কি পুরুষ হয়?

কেন, রাজমহিষী পরম রূপবতী।

তার চেয়ে রূপবতী ওই গণিকা, তার নাকি অশেষ গুণ, ও রেবা তুই কি জানিস তা?

রেবার মুখ অন্ধকার হলো। বুড়ির লক্ষ্য কী তা ধরা যাচ্ছে। পদ্মাবতী অতটা ধরতে পারে না। খোলা প্রকৃতির সে। সে জিজ্ঞেস করে, গণিকার কী গুণ খুড়িমা?

বুড়ি ফোকলা দাঁতে হাসে, কী আবার গুণ, পুরুষমানুষ বশ করে তারা, কত রকম জানে সব, তুই কি নাচতে জানিস, কাব্য জানিস, বীণাবাদন জানিস?

জানি না, কিন্তু ওরা জানল কী করে?

জানতে হয় ওদের, নাহলে পুরুষমানুষ ওদের ঘরে সর্বস্ব ঢেলে দেব কেন, কিন্তু অবন্তীর রাজার এ কী হলো, রাজা আটকুড়ো থাকলে, দেশেরও তাই হবে।

পদ্মাবতী ফিরল গন্ধবতীর দিকে। মেয়েটি পথের দিকে তাকিয়ে উদাসী। ওর উত্তরীয় ধরে টানল পদ্মাবতী, কী বলছিলি বল না, উদয়ন আর বাসবদত্তার কাহিনী, বাসবদত্তা তো অবন্তীরই রাজকন্যা ছিল, তাই না?

গন্ধবতী বলল, তুমি কি জানো না সে কাহিনী?

পদ্মাবতী বলল, জানি কিন্তু ভুলে যাই, বললে মনে পড়ে, অনেকে খুব মনে রাখতে পারে, যেমন তুই, আমি পারি না।

উদয়ন আর বাসবদত্তার কাহিনী গন্ধবতী শুনেছিল ধ্রুবপুত্রের কাছে। ধ্রুবপুত্র সেই কাহিনী শুনেছিল গন্ধবতীর পিতামহ শিবনাথের কাছে। গন্ধবতী যতটুকু শুনেছিল, সব অবিকল মনে রেখেছে। সেই যে বৎসরাজপুত্র উদয়ন বীণাবাদন শেখাতেন উজ্জয়িনীর রাজপুত্রী বাসবদত্তাকে। তারপর দু'জনে উজ্জয়িনী থেকে অন্তর্হিত হয়ে বিবাহ করলেন। লাবাণক-এ হলো এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড, তখন বৎসরাজ গেছেন মৃগয়ায়। অগ্নিকাণ্ডে বাসবদত্তা আর বৎসদেশের মন্ত্রী মারা গেলেন। বৎসরাজ বিলাপ করতে লাগলেন অবন্তিকা বাসবদত্তার জন্য....। ধ্রুবপুত্র গম্ভীরার কূলে বসে এক অপরাহ্নে এই কাহিনী বলেছিল। ঘোষবতী বীণার কথা বলেছিল। সেই বীণা বাজাতেন বাসবদত্তা। সেই বীণা পাওয়া গেল কুরচি বনে, রেবা নদীর তীরে। উদয়ন যেন শুনতে পেলেন ঘোষ রাগে বীণা বেজে চলেছে। গন্ধবতীর মনে পড়ে এ কাহিনী বলতে বলতে ধ্রুবপুত্রের চোখে জেগে উঠত কী বিহ্বলতা! ধ্রুবপুত্র বলত, উদয়ন আর বাসবদত্তা জানতেন না, তাঁদের পরিণয়ে সম্মত ছিলেন অবন্তীর রাজা প্রদ্যোৎমহাসেন আর রাজমহিষী। বড় আঘাত পেয়েছিলেন তাঁরা যখন বাসবদত্তা উজ্জয়িনী ছেড়ে চলে গেল উদয়নের সঙ্গে। তাঁরা রাজপুত্র রাজকন্যার ছবি আঁকিয়ে পুরোহিত ডেকে মিলন ঘটিয়েছিলেন। এমনও কী হয়? সত্যি হয়? সেই বিবাহ, সেই মিলন কি শাস্ত্রসিদ্ধ? গন্ধবতী মনে মনে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। দু চোখ বন্ধ করে ধ্রুবপুত্রের মুখখানি মনে করতে থাকে। ধ্রুবপুত্র যেন বৎসরাজ উদয়ন। গন্ধবতী নিজেকে মনে মনে বাসবদত্তা কল্পনা করে। মিল নেই, কোনো মিল নেই এ কাহিনীতে, ধ্রুবপুত্র কি মনে রেখেছে তার কথা? তাও রাখেনি হয়ত।

পদ্মাবতী ডাকল, চুপ করে আছিস কেন?

বুড়ি পার্বতী বলল, বাসবদত্তার গল্প কে না জানে, থাক, বলি কি অবন্তীর রাজা কী রকম মানুষ, রাজা বোধহয় পুরুষ না।

আহ্ কী বলছ খুড়িমা, রাজ-নিন্দা পাপ!

বর্ষা হয়েছে শেষ কবে, বারো বারো চব্বিশ মাস কেটে গেছে, রাজা নিঃসন্তান বলেই এদেশে মেঘ নেই, কথাটা কি মিথ্যে, জোয়ার হল না, গোধূম হবে না, বলি মানুষ খাবে কী?

রেবা বলল, উনি হূন দমন করেছেন।

পার্বতী বলে, হূনরা নাকি আবার আসবে?

বুকটা ধক করে ওঠে, রেবা মুখ নিচু করে বলল, জানিনে তো।

এই ধ্রুবপুত্র নাকি হূন রাজ্যে পালিয়েছে? বুড়ি পার্বতী গন্ধবতীর দিকে তাকায়, ও মেয়ে তুই কিছু জানিস, সে বেটা গেল কোথায়?

গন্ধবতী বলে, সে জানেনা। মুখ ঘুরিয়ে নেয় সে। চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

তুই জানিস না, তা জানবিই বা কী করে, সেই গণিকা জানে?

গন্ধবতী কাঁপছিল, জবাব দেয় না।

গণিকাকে দেখেছিস, ও মেয়ে? বুড়ি ডাকল, কত সুন্দরী সে, খুবই হবে, নাচ গান নিয়ে যারা থাকে, তারা সুন্দর হয় যে কেন?

কী জানি কেন হয়, শুনি তো যেমন রূপ তেমন গুণ। তাম্বুল রসে ঠোঁট রাঙাতে রাঙাতে বলল পদ্মাবতী, বলতে থাকে, আমি গেল শ্রাবণী পূর্ণিমায় মহাকাল গেছিলাম, তখন এক গণিকাকে দেখেছিলাম খুড়িমা, ওই আমার গণিকা দেখা।

দেবদাসী?

দেবদাসী না খুড়িমা, গণিকাই।

তারাও তো তাই। বুড়ি বিড়বিড় করে।

সে কী, তা হবে কেন, তাঁরা মহাকালের সেবা করেন, গণিকা তো তা করে না, যা বলছিলাম সেই গণিকা কিন্তু তেমন সুন্দরী নয়। আমাদের মতোই শ্যামবর্ণ তার, চোখদুটি আবার বিড়ালির মতো, দেখে মনেই হবে না গণিকা, তবে সাজ খুব উগ্র, তা হোক, তাকে দেখে মনে হবে না কিন্তু সে গুণবতী, নৃত্য, বীণাবাদন জানে।

কাকে দেখতে কাকে দেখেছিস তুই? বলল বুড়ি পার্বতী।

না খুড়িমা, সবাই বলল গণিকা।

কী নাম তার?

তা তো জানতাম, ভুলে গেছি।

দেবদত্তাকে দেখিসনি তো?

না তো, সে শুনেছি পরম রূপবতী, কাঁচাসোনার মতো রং তার।

কে বলেছে? বুড়ি জিজ্ঞেস করে।

কে আবার বলবে, শোনা কথা।

কার কাছে শুনেছিস?

ভুলেই গেছি, কেউ না কেউ বলেছে।

তোর স্বামী?

জিভ কাটে পদ্মাবতী, সে এসব কথা বলে! বলে না, তবে বলতেও পারে, আমার মনে নেই, সে তো গণিকালয়ে যায় না।

তবে যায় কোথায়?

তাতো জানি না।

যায় নিশ্চয়।

পদ্মাবতী হি হি করে হাসে, গেলে কি বলবে?

বুড়ি পার্বতী বলে, তোর খুড়ো মানুষটা বলত, কিছুই গোপন করত না আমার কাছে, সেই তো বলে রসমঞ্জরীর কথা, আমি বললাম বীণাবাদন শিখব।

পদ্মাবতী হি হি করে হাসে আবার, শিখলে?

বুড়ি মাথা নাড়ে, ঘরের বউ ওসব শিখে কী হবে, বলল সেই মানুষ।

খুড়ো কি রসমঞ্জরীর কাছে যেত?

বুড়ি মাথা নাড়ে, তা কী করে যাবে, রসমঞ্জরী ছিল রাজার গণিকা, সে বলত তার কথা।

তুমি শুনতে?

হ্যাঁ, শুনতে শুনতে কী রকম যেন মনে হতো, সে যেত বারাঙ্গনা পল্লীতে, আমি একবার রামগিরি গিয়েছিলাম কার্তিকেয়র মন্দিরে, যেতে দেখেছিলাম বারাঙ্গনাপল্লী, উজ্জয়িনীর পুবদিকে আছে, বিজন এলাকায় নিঃঝুম হয়ে আছে, তখন বিহানবেলা তো, সব ঘুমিয়েছিল, কী হতশ্রী চেহারা!

রেবা হাত তুলল, থাক না এসব খুড়িমা, মেয়েটা রয়েছে।

রয়েছে তো রয়েছে, মেয়ে কি শিশু, বিয়ের বয়স হয়নি?

রেবার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। গন্ধবতী আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। একটু দূরে। তার সমস্ত শরীর কেমন শক্ত হয়ে যাচ্ছে দাদি বুড়ি আর খুড়িমার আলাপ শুনতে শুনতে। উঠে এল বটে, কিন্তু কৌতূহল তো হচ্ছিলই। দোটানায় পড়ে গেছে সে। দূরে দাঁড়িয়ে বুড়ি পার্বতীর উচ্চকণ্ঠ বর্ণনা শুনতে লাগল বারাঙ্গনাপল্লীর। বুড়ি বলছে সেদিন তার খুব কষ্ট হয়েছিল গো-শকটে যেতে যেতে। স্বামীর জন্যই কষ্ট। মানুষটা এই বারাঙ্গনাপল্লীতে আসে ফূর্তি করতে। তাদের যদি অনেক সম্পদ থাকত, ধনী হতো যদি তারা, তাহলে কি বারাঙ্গনাপল্লীর ভোক্তা হতো তার স্বামী? বুড়ির কথা শুনতে শুনতে ভুলো-মনা পদ্মাবতী বলে, তার স্বামী যায় না কোথাও। তা শুনে অবিশ্বাসীর কী হাসি।

গন্ধবতী আকাশ দেখতে দেখতে গৃহের সীমানায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে কেতকী বনের গায়ে। এখন তার কানে কথা আসছে না। কখনো কখনো উচ্চকিত হাসির শব্দ ভেসে আসছে। বীণাবাদন, নৃত্য এসব কি শেখা যায়না? গণিকা ব্যতীত কারো অধিকার নেই ওই বিদ্যায়? ধ্রুবপুত্র যে বীণাবাদন, নৃত্যের অনুরাগী তা তো সে জানতেই পারেনি। এখন মনে হচ্ছে ওই গুণে গুণবতী না হলে......? বুক হা হা করে করে ওঠে গন্ধবতীর।

রেবা ডাকল, ও সুগন্ধা ওখানে দাঁড়ালি কেন?

খুব শক্ত মেয়ে গন্ধবতী, ফিরে তাকায়, বলল, এমনি মা।

পদ্মাবতী ডাকল, এদিকে আয়, এসব জানতে হবে বৈকি।

কী জানছে সে? জানছে কেন ধ্রুবপুত্র দেবদত্তা গণিকার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল। সে তো পুরুষমানুষের ইতিহাস শুনছে যেন। এক নারীতে তাদের তৃপ্তি নেই। পুরুষের প্রকৃতিই এমন। গৃহবধূ গৃহে থাকবে, সন্তানের জন্ম দেবে, পুরুষ ঘুরবে এ নারী থেকে ও নারীতে। ধ্রুবপুত্রও কি তাই? কেমন হবে সে ভবিষ্যতে? গন্ধবতীর দুচোখ ভিজে যায় ধীরে ধীরে। তার সাড় নেই। দুচোখ দিয়ে অশ্রুধারা নেমে আসছে বুকের উপর। কল্পনায় সে দেখতে পাচ্ছে সব। গণিকায় আসক্ত হয়েই তো ধ্রুবপুত্র তার কাছ থেকে সরে গেল। সেই চৈত্র পূর্ণিমার রাতে, চাঁদ যখন পশ্চিমপারে ঢলেছে, ধ্রুবপুত্র গম্ভীরার জলে দাঁড়িয়ে। কত ডাকল সে। মোহাচ্ছন্নের মতো উঠে এল বটে, কিন্তু হাঁটল উত্তরপূর্বদিকে। তার দিকে ফিরেও তাকাল না। গন্ধবতীর গায়ে হাত রাখল রেবা, কী হলো?

কী সব বলছ তোমরা?

আমি কিছু বলছি না।

আমার বাবাও কি ওই রকম ছিল মা?

রেবা মাথা নাড়ে, তিনি তো ছিলেন যোদ্ধা, হূন দমনে গিয়ে পথ হারিয়েছেন, বীর তিনি, তিনি কেন যাবেন ওসব জায়গায়, তাঁর প্রকৃতিই ছিল আলাদা।

এই কথা শুনতে শুনতে গন্ধবতী দেখতে পাচ্ছিল দূরে তার পিতামহকে। শিবনাথ তার সঙ্গে একজনকে নিয়ে আসছে। গন্ধবতী উত্তরীয়তে চোখ মুছল। তাম্রধ্বজ? হ্যাঁ সেই তো। অরণ্যচারী ব্যাধের মতো চেহারা মানুষটার, কিন্তু কী ঠাণ্ডা প্রকৃতি! একদিনই এসেছিল সে। সেই দীপাবলীর সময়। গন্ধবতীর বুক কাঁপল। খোঁজ এনেছে তাহলে ধ্রুবপুত্রের। খোঁজ এনেছে বাবার? গন্ধবতী বলল, মা সেই তাম্রধ্বজ, গণনা করেছে নিশ্চয়, ও মা।

গন্ধবতী দেখল ভীত রেবা সরে যাচ্ছে আঙিনা থেকে। গৃহের অভ্যন্তরের অন্ধকারে লুকোল তার মা। সে একা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। দশার্ণ দেশীয় জ্যোতির্বিদের জন্য।

পদ্মাবতী আর বুড়ি পার্বতী কথা বলতে বলতে বেরিয়ে যাচ্ছে আঙিনা থেকে।

এগার

তাম্রধ্বজ এসেছে। পৌষের দ্বিপ্রহর নিঃশেষ প্রায়। রোদ ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে দশদিক থেকে। তাম্রধ্বজ এই কুটিরে পা দিল না। গন্ধবতীর পিতামহকে সঙ্গী করে সে চলে গেল পশ্চিমের পথে। আঙিনায় গন্ধবতী একা। কীরকম হতভম্ব হয়ে সে পথের দিকে তাকিয়ে থাকল। তাম্রধ্বজ এবং শ্বশুরমশায় ঢুকলেন না দেখে রেবা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। মেয়ের পাশে এসে দাঁড়াল, অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কোথায় গেলেন ওরা?

বোধহয় গম্ভীরা নদীর দিকে। গন্ধবতী জবাব দেয়।

কেন, ওদিকে কেন? বলে রেবা টের পায় প্রশ্নটি নিজের কাছেই হয়ে গেল যেন। গন্ধবতী যে তিমিরে, সেও তো তাই। তারপর মনে পড়ে গেল ওদিকে গোধূমক্ষেত্র আছে। সেই ক্ষেত্র পরিদর্শনে গেল নাকি দশার্ণ দেশের গণক যুবকটি?

রেবা বলল, গণনা করে এসেছে নাকি?

কী জানি!

কী গণনা করল কে জানে? বিড়বিড় করল রেবা, তারপর বলল, গণনায় যদি সামান্য ভুল হয় ফলাফল অন্যরকম হয়ে যেতে পারে।

হুঁ। গন্ধবতী পথের দিকে তাকিয়েই আছে।

যা হয় হত, ভবিষ্যৎ জেনে লাভ কী?

গন্ধবতী মায়ের দিকে ফিরল, চাপা গলায় বলল, ভয় করছে মা?

জানি না। রেবা নিশ্চুপ হয়ে গেল।

সুসংবাদও তো আসতে পারে। বিড়বিড় করে গন্ধবতী।

রেবা কথা বলছিল না। ধীরে ধীরে মেয়েও চুপ করে যায়। মা মেয়ে স্থির হয়ে পথের দিকে তাকিয়ে। রেবা বুঝতে পারছিল ফিরবে ওরা এখনই। ফিরবে এবং এই আঙিনায় দাঁড়িয়ে অরণ্যাচারী মানুষের মতো, নিষাদের মতো ওই মানুষটা ঘোষণা করবে যে সংবাদ তা মধুর হবে না। রেবা তো ভেবেই ছিল বছরখানেকের মধ্যে ফিরে আসবে কার্তিককুমার, যদি না হূন দল তাকে বন্দি করে নিয়ে যায় দূর অঞ্চলে। হূনরা অতি নিষ্ঠুর, যোদ্ধা জাতি। হূনদের হাতে বন্দি যদি হয়ে থাকে, কী অপরিসীম কষ্ট না ভোগ করছে সে। আর যদি রাজকর্মচারী উদ্ধবের কথা সত্যি হয়, বুক হিম হয়ে যায় রেবার সে কথা ভাবলে। সে তো ভাবতেই পারে না লোকটা আর ফিরবে না। এইতো গেল উজ্জয়িনীর পথে। সন্ধ্যার অন্ধকারে শতভিষা নক্ষত্রকে দেখে তবে সে আঙিনা ত্যাগ করল। হাঁটল উত্তরে। সব শুভ থাকলে, কী করে সে ফেরে না? কোন লিখন তার কপালে আঁকা হয়েছিল যার ফলে যুদ্ধ থেকে ফিরল না!

গন্ধবতী বলল, মা ওরা আসছে না কেন?

রেবা বলল, বেলা পড়ে আসে, প্রদীপ জ্বালা শঙ্খধ্বনি কর, তুই চুল বাঁধবি না?

আর কখন? আচ্ছা মা, এমনও তো হতে পারে ধ্রুবপুত্র গেছে বাবার খোঁজেই।

চমকে উঠল রেবা, কী বলিস তুই, কী বলিস! আবেগে মেয়েকে জড়িয়ে ধরল, তাও কি সম্ভব?

তোমার মনে হয় না একথা?

রেবা নিরুত্তর। আশ্চর্য এই কথাটি কেন মনে হয়নি? এই কথাটি মনে এলে তো মা মেয়ে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে পারে। এ এক অলীক কল্পনা মনে হয়, কিন্তু অসত্য নাও তো হতে পারে। ধ্রুবপুত্রের রক্তে তো ক্ষত্রিয় যোদ্ধার রোষ। বহু যুদ্ধের স্মৃতি। সে তো নিজেও বলত তাই। গণিকার হাতে অপমানিত ধ্রুবপুত্র হয়ত দেশ ত্যাগ করেছে ওই কারণেই। অন্নের ঋণ শোধ করতে সে বেরিয়ে পড়েছে কার্তিককুমারের খোঁজে। এ এক আশ্চর্য কল্পনা। এই কল্পনা আপাতত নিরুদ্বিগ্ন করল রেবাকে। মনে মনে কী যেন ভেবে নেয় সে। মেয়েকে ছেড়ে ঘরের দিকে পা বাড়ায়। যেতে যেতে ভাবে, যে কথা বলল মেয়ে তা অলীক হবে কেন? তাই-ই সত্যি। সত্যি সত্যি সত্যি। কুটিরের কোন অংশে যেন লুকিয়ে আছে এক তক্ষক। তার ডাক শোনে রেবা।

প্রদীপ জ্বলল। শঙ্খধ্বনির ভিতরে প্রবেশ করল তাম্রধ্বজ। এক অবর্ণনীয় গোধূলির মায়া দশদিক ব্যাপ্ত করে রেখেছে এই সময়। নিঃশেষ হয়েও যেটুকু পড়ে আছে তা যেন প্রাচীন এই পৃথিবীর গায়ে

জড়িয়ে থাকা আলো। রেবা কুটিরের গায়ে দাঁড়িয়ে দেখল ধূলি-ধুসরিত পা দুটি মেলে দশার্ণদেশীয় যুবকটি বসেছে জলচৌকির উপরে। পাশে জলপাত্র রেখেছিল সে। জলপাত্রে হাত দিল না তাম্রধ্বজ, বলল, আবার তো ফিরতে হবে।

আপনি এই ঠাণ্ডায় বসবেন আঙিনায়? শিবনাথ বলে।

তাম্রধ্বজ বলে, কোথায় ঠাণ্ডা?

পা দুটি ধুয়ে বসলে ক্লান্তি যাবে।

তাম্রধ্বজ জলপাত্র হাতে কেতকীর বেড়ার গায়ে রাখা প্রস্তরখণ্ডে দাঁড়িয়ে চোখমুখ ধোয়। পা ধোয়। মানুষটা কীরকম যেন! চঞ্চল। ঠোঁটের কোণে হাসি এল গন্ধবতীর। এতটা পথ এসেছে, নিজেকে শুদ্ধ করবে না? ভাবল একরকম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত করল আর একরকম। আসলে সে বসতে চাইছে এই কুটিরে। তার ইচ্ছা আছে। তা প্রকাশ না করতে পেরে বিপরীত কথা বলল বোধহয়।

পা ধুয়ে শুষ্ক বস্ত্রে মুছে তাম্রধ্বজ এসে বসল আবার জলচৌকিটিতে। শিবনাথ বলল, হিম পড়বে, দাওয়ায় উঠুন।

না এই আকাশতলই ভাল, হিম তেমন পড়ছে না।

অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হল উঠোনে। তাম্রধ্বজ গায়ের পশম চাদরটি মাথায় টেনে নিল, বিড়বিড় করে বলল, ঠিক তো ছিল না আসার, আচমকা মনে হল যাই, কেন যে মনে হল!

গণনা করেছেন? শিবনাথ বলে।

সম্পূর্ণ তো হয়নি, কাল সকালে বেরোলেই ঠিক হত, কিন্তু দিনমানে তো আকাশের তারারা লুকিয়ে থাকে, হারিয়ে থাকে, রাতের আকাশ অনুপম, রাত্রিকালে যখন ফিরব, তারা লক্ষ্য করে ফিরতে পারব, আর কী যেন! তাম্রধ্বজ কথা খুঁজে পায় না।

কথাটিতে গন্ধবতী মনে মনে হাসল। ধ্রুবপুত্র বলত কোন দূরে অপরান্ত সমুদ্র আছে। সেই সমুদ্রের বাণিজ্যপোত পথ খোঁজে আকাশের তারা দেখে। ধ্রুবনক্ষত্র দেখে। এই গম্ভীরা, উজ্জয়িনী কি মহাসমুদ্র যে তারা দেখে রাত্রিকালে তাকে ফিরতে হবে? রেবা উবু হয়ে বসেছে দাওয়ায়। শিবনাথ আর একটি জলচৌকিতে বসে তাম্রধ্বজের মুখোমুখি। গন্ধবতী অনেকটা দূরে। কথা শোনা যাচ্ছে দুজনেরই।

তাম্রধ্বজ বলল, এই গম্ভীরা নদীটি আমার খুব মনে ধরেছে, বেতসলতা এই শীতে শুকিয়ে মরে গেছে বটে, বর্ষায় নীল হয়ে থাকে লতাগুলি তাই না?

হুঁ। বলল শিবনাথ।

গন্ধবতী কীরকম বিহ্বল হয়ে আকাশে তাকায়। উত্তর আকাশে ধ্রুবতারার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করেছে সে। অন্ধকারে তাম্রধ্বজের কথা শোনা যাচ্ছে। কী আশ্চর্য! এই কণ্ঠস্বর যেন আগে শুনেছে সে। কী গম্ভীর, কী মায়াময়, যেন ধ্রুবপুত্র কথা বলছে। সত্যিই কি তেমন? হয়ত গম্ভীরাকূলের বেতসবনের কথা বলল, তাই। এই নদী, বেতসবন, আকাশ, নদীতীরের জোয়ার ক্ষেত ; নদীর উপরে ব্যাপ্ত মেঘপুঞ্জে মুগ্ধ ছিল ধ্রুবপুত্র। তাম্রধ্বজ কি জানে তা? জেনেছে তা? কী করে জানবে? যতটুকু জানে, সে তো গন্ধবতীই। আর কেউ না। তাহলে গণনায় কি ধ্রুবপুত্রের মুখ দেখতে পেয়েছে তাম্রধ্বজ? সে কি দেখেছে বর্ষার মেঘের নিচে ধ্রুবপুত্র দাঁড়িয়ে আছে গম্ভীরা তীরে। বকের উড়াল দেখছে অপরাহ্ণে। তাম্রধ্বজ কি তার জ্যোতির্বিদ্যায় এসব দেখতে পেয়েছে? অবাক হয়ে থরথর করে কাঁপছে গন্ধবতী। ধ্রুবতারার দিকে তাকিয়ে অন্ধকারে তার চোখদুটি সজল হয়ে উঠছে। কী করে দেখল তাম্রধ্বজ ওইসব দিনগুলিকে? বেতসলতা গম্ভীরার স্রোতে ভেসে যেতে চাইছে। গম্ভীরার জলে মেঘ শুয়ে আছে। এ কোন কালের কথা? কোন যুগের স্মৃতি? সেই যে মেঘ উধাও হল কত বৎসর আগে, তারপর তার আর দেখা নেই। ধ্রুবপুত্রও যেন সেই মেঘের সঙ্গে উধাও হয়ে গেছে অবন্তীদেশ থেকে, যেন বহুকাল আগে বর্ষার পর সে আবার ফিরল উজ্জয়িনী, তারপর ফিরল চৈত্র পূর্ণিমার সকালে। সে কোন চৈত্র পূর্ণিমা? হায় কতকাল যে কেটে গেছে তারপর!

তাম্রধ্বজ বলল, গৃহত্যাগের দিনটির কথা মনে আছে?

চমকে তাকায় গন্ধবতী আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে। শিবনাথ তাম্রধ্বজের কথা শুনে ঘুরে তাকায় গন্ধবতীর দিকে। গন্ধবতী দাওয়ায় বসে থাকা মায়ের দিকে তাকায়। অন্ধকারে মা রেবা মাথা নিচু করে আছে।

শিবনাথ জিজ্ঞেস করল, কার কথা বলছেন?

যে গৃহত্যাগ করেছিল।

আমার পুত্র কার্তিককুমার যুদ্ধে গিয়েছিল, সে তো গৃহত্যাগ করেনি।

গৃহত্যাগ করেছিল তো ধ্রুবপুত্র। তাম্রধ্বজ বলে।

হ্যাঁ, সে গিয়েছিল প্রায় দুই বৎসর হলো, চৈত্রপূর্ণিমার রাতে।

তখন আকাশের চাঁদ কোথায় ছিল?

শিবনাথ মাথা নাড়ে, সকলের অজ্ঞাতে সে গৃহত্যাগ করেছিল, যদি জানা যেত তাহলে তো তার নিরুদ্দেশে যাওয়া হত না।

তাম্রধ্বজ বিড়বিড় করল কী যেন, তারপর আচমকা ডাকল রেবাকে, মা খাদ্যদ্রব্য কিছু আছে?

গন্ধবতী শিহরিত হয়ে তার মায়ের কাছে ছুটে গেল। কানে কী শুনল? অন্ধকারে তাম্রধ্বজের কথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে সে। এ ডাক কি সেই ধ্রুবপুত্রের নয়? দূর থেকে পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে সে তো এইভাবেই ডাকত রেবা মাকে।

শিবনাথ উঠে দাঁড়িয়েছে, আমরা খুবই লজ্জিত, আপনি ক্ষুধার্ত?

একপাত্র গোদুগ্ধ দিলেই হবে। তাম্রধ্বজ অন্ধকারে রেবার দিকে ফিরে কথাটি বলল। রেবা শশব্যস্ত হয়ে ওঠে। আহারে, নিজ মুখে খেতে চেয়েছে। আঙিনার এক কোণে পাতা উনুনের ধারে গিয়ে বসল সে গন্ধবতীকে চাপাস্বরে নির্দেশ দিয়ে। ঘরের ভিতরে রাখা প্রদীপটি হাতে গন্ধবতী পাকশালে যায়। দুধের পাত্রটি নিয়ে বেরিয়ে আসে অন্ধকারে। ধীর পায়ে আঙিনায় নামে।

রেবা ঘুরে ঘুরে তাম্রধ্বজের দিকে তাকাচ্ছে। তার মুখে জেগে উঠেছে অপত্যস্নেহ। কতটা পথ হেঁটে এসেছে, ক্ষুধার্ত হতেই পারে। ঠিক যেন ধ্রুবপুত্র! দীপের আগুন থেকে শুকনো ডালপালা জ্বালিয়ে উনানে দুধের পাত্র বসিয়ে গালে হাত দিল রেবা। তার পাশে উবু হয়ে বসে আছে গন্ধবতী। উনানের আগুন লকলকিয়ে উঠল। যেটুকু শীত লাগছিল তা ঝপ করে নেমে গেল। তাম্রধ্বজ আস্তে আস্তে গুছিয়ে কথা বলে। তাম্রধ্বজের কথায় কান পেতে আছে মা ও মেয়ে।

তাম্রধ্বজ বলল, এ বড় আশ্চর্য ঘটনা, কেন অনাবৃষ্টি তা জানা যাচ্ছে না, তবে শোনা যায় কোনো বিশেষ কারণে প্রকৃতির রূপ বদল হয়, যখন কোনো পুণ্যবান মহাপুরুষ জন্ম নেন পৃথিবীতে, দেবতারা যখন মর্ত্যে নামেন তখন পৃথিবী শস্যশালিনী হন, সুবৃষ্টি হয়, মানুষের ভাল হয়।

শিবনাথ বলে, এ তো তেমন কোনো রূপবদল নয়, এ যে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র।

তাম্রধ্বজ বলে, দুই আষাঢ়ে দুই বৎসরাধিক বৃষ্টি হয়নি, এই মাঘে বৃষ্টি হতে পারে, বৃষ্টির সময় যায়নি, এমন কি কখনো হয়নি, বর্ষাঋতুতে তেমন বৃষ্টি হল না?

হয়েছে, কেন হবে না, আগে পরে হয়েছে, আষাঢ়, শ্রাবণ পার করে প্রোষ্ঠপদ-এ বৃষ্টি হয়েছে। একটি ফসল মরে গেছে, আর একটি ফসল জন্মেছে, বৃষ্টি শেষ কবে হয়েছে তা মনে নেই, গেল মাঘের আগের মাঘে বৃষ্টি হয়েছিল একদিন, তখন মনে হয়েছিল প্রকৃতি সদয়, সেই বোধহয় শেষ বর্ষা, গেল শ্রাবণে দু-চার ফোঁটা নেমেছিল, আষাঢ়েও কিছুই না, তারপর সব শূন্য।

তাম্রধ্বজ বলল, দশার্ণ দেশেও তেমন বৃষ্টি হচ্ছে না, সংবাদ পেয়েছি, এ বড় কঠিন সময়, তবে মনে হয় এ কোনো ইঙ্গিতও, এই পৃথিবী সবিতানক্ষত্রের অধীন, মানুষের জীবনও তাই, উজ্জয়িনীর জ্যোতিষীরা বলছেন আকাশের নতুন এক তারার কথা!

কোন তারা! চমকে আকাশে মুখ তুলল শিবনাথ।

এখনো হয়ত তার উদয় ঘটেনি, কী জানি!

গন্ধবতী, রেবা শুনছিল তাম্রধ্বজের কথা। দুধ ফুটে উঠেছে। আঁচল দিয়ে পাত্রটি উনান থেকে নামিয়ে রাখল রেবা। ঘন দুধের গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। দুধ একটু আগে উথলে উঠেছিল। এ বড় শুভ লক্ষণ, সমৃদ্ধি, সুখের ইঙ্গিত।

শিবনাথ বলল, আপনি কি গণনা করেছেন?

আমার জানা প্রয়োজন গৃহত্যাগী কোনদিকে গিয়েছেন এই গম্ভীরা ত্যাগ করার সময়।

ধ্রুবপুত্র?

হ্যাঁ, তিনি তো প্রায় দুই বৎসরের মতো নিরুদ্দিষ্ট, কার্তিককুমার পাঁচটি বৎসর, তাঁকে যতটা না স্পষ্ট দেখব, তার চেয়ে অনেক স্পষ্ট হবেন ধ্রুবপুত্র।

চমকে ওঠে শিবনাথ, স্পষ্ট দেখবেন মানে?

মনশ্চক্ষে দেখছি তো, আমি তাঁর জন্মপত্রিকা ধরে গ্রহনক্ষত্র বিচার করে দেখেছি যেন বেতস বনে তিনি দাঁড়িয়ে, আকাশে ঘন মেঘ।

কী বলছেন আপনি?

দুধের পাত্র এল। দুধ হাতে পাত্রটি মুখের কাছে তুলে তাম্রধ্বজ নিঃশেষ করে দিল সবটা। অন্ধকারে উঠে হাত মুখে জল দিয়ে এসে বসল আবার পুরনো জায়গায়, বলল, উজ্জয়িনীর জ্যোতিষীরা যা বলেন তা আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু আচার্য বৃষভানু সত্যিই আকাশমণ্ডল চেনেন, তিনি গ্রহ নক্ষত্রের দৃশ্য, অদৃশ্যমানতা ও মানুষের জীবনের উত্থান পতন এই দুইয়ের এক শৃঙ্খলা খুঁজে বের করতে চাইছেন, তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন অনবরত, সমস্ত রাত প্রায়ই জেগে থাকেন।

শিবনাথ বলল, কিন্তু আপনি কি সত্যিই দেখেছেন?

আমি তাঁর গৃহত্যাগের সঠিক মুহূর্তটি জানতে চাই, দেখুন তাঁকে অনুভব করা কোনো আশ্চর্য ঘটনা নয়, আচার্য বৃষভানুর মতো আমিও আকাশমণ্ডল এবং মানুষের জীবন, দুইয়ের এক সম্পর্ক খুঁজে বেড়াচ্ছি, আচার্যর শিষ্য আমি।

কী ভাবে তা জানা সম্ভব?

তাম্রধ্বজ বলল, এই যে পৌষমাসের আকাশ, এ আকাশে সপ্তঋষিরা কেউ নেই, তাঁরা অদৃশ্য, তার মানে কি তাঁরা চিরকালের মতো নিরুদ্দিষ্ট?

তা কেন হবে, আশ্বিনে তাঁরা তো উত্তর-পশ্চিমাকাশে ছিলেন।

অস্তগামী ছিলেন, কার্তিকে অস্ত গেছেন, আবার মাঘেই দেখা দিতে থাকবেন উত্তর-পূর্ব আকাশে, তারপর থেকে ক্রমশ প্রকাশিত হবেন, এ এক শৃঙ্খলায় বাঁধা, প্রতিটি মানুষ যদি নক্ষত্ররাশি, গ্রহের অধীন হয়ে থাকেন, তাঁদের জীবনেও এইরকম উত্থান পতন, উদয় অস্ত আছে ধরা যেতে পারে।

জ্যোতিষীরা তো তাই বলেন।

বলেন নিশ্চয়, কিন্তু ব্যাখ্যা দিতে পারেন না, যদি আকাশকে সম্পূর্ণ ধারণ করতে না পারি মাথার ভিতরে, তাহলে ব্যাখ্যা কীভাবে দেব, শুনুন,আচার্য বৃষভানু অদৃশ্য সপ্তঋষিদের দেখতে পান, তাঁর দৃষ্টি মহাব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়ে আরো অসীমে প্রসারিত হয়, তিনি আমাকে তা শিখিয়েছেন, যে তারা রাতের আকাশে অদৃশ্য সেই তারা কোথায় আছে তা জানতে চাইছি আমি, যে অগস্ত্যঋষি দক্ষিণ দিগন্তে জেগে উঠবেন চৈত্রে, তিনি কীভাবে এগিয়ে আসছেন কল্পনা করুন দেখি, সমস্ত ঋতুতে অগস্ত্য আকাশে না থাকলেও মহাব্রহ্মাণ্ডে আছেন নিশ্চয়, নিরুদ্দিষ্ট নক্ষত্রকে খুঁজে বার করা যদি যায় তো মানুষটিকে খোঁজা যাবে না? মানুষের জীবনেও তো প্রকৃতির মতো ঋতুচক্র রয়েছে, মার্গশীর্ষ অগ্রহায়ণে যে জীবন আরম্ভ, কার্তিক মাসে তার শেষ, যতদিন বাঁচে একটি মানুষ তার ভিতরেই এই ঋতুগুলিকে ভাগ করে দেওয়া যায় যদি, শৃঙ্খলাটি স্পষ্ট ধরা যাবে। বলতে বলতে থামল তাম্রধ্বজ, নিম্নস্বরে বলল, আমি কি স্পষ্ট করতে পারছি আমার কথা?

গন্ধবতী, রেবা অবাক হয়ে দেখছিল তাম্রধ্বজকে। গন্ধবতীর দিকে তাকিয়ে রেবা নিম্নস্বরে বলল, কখন গেছে ধ্রুবপুত্র তা কে জানে, চাঁদ তখন কোথায় ছিল?

গন্ধবতী মায়ের গলা জড়িয়ে বুকে মুখ রাখল, আমি জানি।

জানিস?

হ্যাঁ জানি।

তাহলে বল ওঁকে, উনি মহাজ্ঞানী।

রেবার হাত ধরে গন্ধবতী এগিয়ে যায়, ধরা গলায় বলল, আমি জানি।

জানো! উঠে দাঁড়ায় তাম্রধ্বজ, বল তাহলে, চাঁদ কোথায় ছিল, কোনদিকে গেলেন তিনি, বল, আমি এবার যাব, শীতও বাড়ছে ক্রমশ।

স্থিরদৃষ্টিতে তাম্রধ্বজ তাকিয়ে আছে গন্ধবতীর চোখের দিকে। অন্ধকারে তাম্রধ্বজের চোখে তারার আলো। গন্ধবতী ওই দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে মাথা নামায়।

বারো

উজ্জয়িনীর সপ্তসাগর যেন অবন্তী লক্ষ্মীর গলায় সপ্তলহরীর মুক্তোহার। কথাটা কে বলেছিল? না, ধ্রুবপুত্র। সে আসত এই রত্নাকর সাগরতীরে বসা বৃদ্ধ সৈনিক পরাশরের কাছে। বৃদ্ধর জীবনে ধ্রুবপুত্রের আগমন এক মস্ত প্রাপ্তি। কোন মহাজ্ঞানী ক্ষত্রিয় শূদ্রের কাছে এসে বসে? তার জীবনের গল্প শোনে, শীতের বেলায়, গ্রীষ্মের সন্ধ্যায়, হেমন্তের অপরাহ্নে। শূদ্র পল্লীর সকলে চিনত সেই দেবতার মতো রূপবান যুবককে।

উজ্জয়নীর সপ্ত সরোবর যেন সাতটি তিথি। দুবার প্রদক্ষিণ করলেই চতুর্দশী, তারপর পৌর্ণমাসী রাত্রি। জ্যোৎস্নায় সপ্তসাগরে ফোটা অফুরান পদ্মফুল সপ্তকোটি চাঁদের শোভা ধারণ করে প্রোষ্ঠপদ থেকে অঘ্রান মাস পর্যন্ত। নগরের পূর্বে এই রত্নাকর সাগর, পশ্চিমে মহাকাল মন্দির সংলগ্ন রুদ্রসাগর। আর পাঁচটি সরোবর নগরে ছড়ানো। পুষ্কর সাগর রাজপ্রাসাদের দক্ষিণে, রাজঅন্তঃপুর সংলগ্ন ক্ষীরসাগর, উত্তর গোবর্দ্ধন সাগর, আরো উত্তরে পুরষোত্তম সাগর, বিষ্ণুসাগর।

সাত সাগরের নাম উচ্চারণ করছিল বৃদ্ধ সৈনিক পরাশর। রত্নাকর সাগর-এর দক্ষিণ দিয়ে পশ্চিমে রাজপ্রাসাদ যাওয়ার পথ। পথের ধারে সবুজ তৃণভূমি, তারপর শূদ্র বসতি। সরোবরের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ বলছিল, রাজা গন্ধর্ব সেনের কথা। তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে নাকি এইরূপ ঘটেছিল। অনেকদিন বৃষ্টি না হওয়ায় সরোবর প্রায় জলশূন্য হয়ে গিয়েছিল। সেবারও পদ্মফুলের আকাল হয়েছিল।

কত কাল আগে? এক যুবক জিজ্ঞেস করল।

সে হিসেব নেই, মনে হয় সেবার পদ্ম ফোটেইনি! বুড়ো বিড় বিড় করে, তারপর তো আকাশে মেঘ এল আচমকা, জলে থৈ থৈ করতে লাগল সাত সাগর।

এই রত্নাকর সাগর শূদ্র পল্লীর জন্য। এ জলে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য কিংবা ক্ষত্রিয় কোনো অধিকার দাবি করে না। শূদ্র সরোবর রত্নাকর সাগর শুকিয়ে গেছে প্রায়, যে জল আছে তা ব্যবহারের অনুপযোগী, কর্দমাক্ত হয়ে গেছে। জলের দিকে তাকিয়ে পূর্ণ সরোবরের স্মৃতি জেগে উঠছিল বৃদ্ধের মনে। বয়স তার অনেক। কত বয়স তা সে নিজেই জানে না।

বৃদ্ধ বলে কত যুদ্ধে কত দেশে গেছে সে রাজা গন্ধর্ব সেনের সৈন্য হয়ে। রাজা ছিলেন দিগ্বিজয়ী। একবার সেনাবাহিনী দক্ষিণে রেবা নদী, তাপ্তি নদী, গোদাবরী পার হয়ে আরো দক্ষিণ দেশে কাবেরী নদীর কুলে গিয়ে থামল। আহা কী সেই দেশ। সেই দেশেই অগস্ত্য নক্ষত্র উদিত হন। চারদিকে নারকেল আর সুপারির বন। চন্দনবৃক্ষ সেই দেশেই জন্মায়। মলয় পর্বতের সানুদেশে সেনাবাহিনী পৌঁছে গেল। আহা মলয় পর্বতের কোলে সেই রাত্রি যাপন। সে যেন ইহজন্মের কথা নয়। কী আশ্চর্য ছিল সেইসব তারা ভরা রাত্রি, চন্দন গন্ধে ভরা বাতাস। সে যেন দেবতাদের বাসভূমি। সেখানে ছিল চির বসন্ত। অগ্রহায়ণেও শীতের কোনো চিহ্ন ছিল না। সমস্ত রাত্রি আকাশের তলে শুয়ে থাকা, ছায়াপথে স্বপ্নের ভিতরে হেঁটে যাওয়া। মলয় পর্বত কী বিপুল। মেঘের মতো ছড়িয়ে গেছে যেন দশ দিগন্তে। বৃষ্টির মেঘ দেখলে এখনো যে তার মনে পড়ে মলয়চন্দন পাহাড়ের কথা। সেই দেশের রমণীরাই বা ছিল কত সুন্দর, মমতায় ভরা বুক তাদের। পান ভোজনে অসুস্থ সৈনিককে ফেলে সেনাবাহিনী রওনা দিলে এক রমনী মায়ের মমতা দিয়ে সেবা করে তাকে সুস্থ করে তুলেছিল.....।

বৃদ্ধ বলে যাচ্ছিল নানা কথা। আকাশে বহুকাল মেঘের চিহ্ন নেই, তাই মলয় পর্বতের কথা এল। মেঘের জন্মভূমিও বুঝি সেই দেশ, অগস্ত্য যখন উদিত হন, মেঘও জন্মায় নিশ্চিত।

তার জীবন বর্ণময়। ঝুলিতে কম গল্প নেই। সেই গল্পে রামধনুর রঙ। সেই গল্পে বিন্ধ্য, সাতপুরা, মলয় পর্বত শ্রেণীর রঙের মতো মেঘের ঢাল। অতি বৃষ্টি দেখেছে সে। দেখেছে এমন অনাবৃষ্টিও। সরোবর খটখটে, শিপ্রা, গন্ধবতীর বালুকাময় বুক খুঁড়ে খুঁড়ে জল সংগ্রহ, কত স্মৃতি তার। নদীর অন্তঃস্থল কখনো শুকোয় না। নদী হলো মা। আর এই নগর তো উজ্জয়িনী। মহাকালেশ্বর শিবের লীলাক্ষেত্র। এখানে মহাকাল শঙ্কর ত্রিপুরাসুরকে বধ করেছিলেন। সেই পুরাণ তাকে শুনিয়ে গেছে ধ্রুবপুত্র। বিনিময়ে সে শুনে গেছে দক্ষিণ দেশের চন্দন বন, চন্দনগন্ধী বাতাস, মলয় পর্বত, রাতভর সেই পর্বতের উপত্যকায় বসে গাওয়া গান, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, নারিকেল ও গুবাকেরবন রেবা, তাপ্তি, কাবেরী, গোদাবরী নদী, নারকেল রসের সুরা, যেতে যেতে সাতপুরা পর্বত শ্রেণী, পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের গুহা.....কত কথাই

না! বুড়োর কানে যেন এখনো ধ্রুবপুত্রের কণ্ঠস্বর আচমকা বেজে ওঠে। এই সামান্য জীবনে অমন সুন্দর একটি মানুষের দেখা সে আর পায়নি। এই যে এখন সে বলছে, মহাকালেশ্বর মহাদেব শঙ্করের বিজয়রথ তৈরি হয়েছিল কত কিছু না দিয়ে। এই পৃথিবী, মন্দারপর্বত, দিগবিদিগ, নক্ষত্রমণ্ডল, সপ্তর্ষিমণ্ডল, বাসুকী, হিমালয়, বিন্ধ্যপর্বত, সিন্ধু, গঙ্গা, সরস্বতী নদী, দিনরাত্রি, শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের অংশ দিয়ে তৈরি হয়েছিল সেই রথ। চাঁদ ও সূর্য ছিল মহাদেবের রথচক্র। ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবের দেবতা হয়েছিলেন তাঁর রথের ঘোড়া। সেই রথের ধ্বজাদন্ড ছিল সুমেরু পর্বত। আকাশের বিদ্যুৎরেখায় ভারী মেঘ হয়েছিল তার পতাকা.....। বলতে বলতে থামে পরাশর। শ্রোতারা সবাই মধ্যবয়সী, নবীন বয়সী, বালকও আছে তার ভিতরে। সকলে গভীর তন্ময় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে গ্রামবৃদ্ধের দিকে। যতটা বলে থেমেছে পরাশর, তারপরের অংশটি বলতে পারে কিন্তু কেমন অবোধ্য ঠেকে তার কাছে। সংবৎসর মানে ছয় ঋতু নিয়ে এক বর্ষকাল। তা কী করে মহাদেবের ধনুক হবে আর কালরাত্রিই বা কী করে সেই ধনুকের জ্যা হবে? ধ্রুবপুত্রের কাছে এর অর্থ জেনে নেবে ভেবেছিল বুড়ো। কিন্তু সে তো অবন্তী দেশ থেকেই চলে গেছে। দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার।

শ্রোতাদের একজন জিজ্ঞেস করে, চাঁদ সূর্য রথের চাকা, বুড়ো বলো তো আবার প্রথম থেকে, কী দিয়ে তৈরি হয়েছিল সেই রথ, কত জোরে ছুটত তা?

বলতে আরম্ভ করবে বুড়ো পরাশর, তখনই তার কানে এল রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ। পশ্চিম থেকেই আসছে। পশ্চিমে রাজার বাড়ি, নগরের শ্রেষ্ঠ মানুষরা থাকেন সেদিকে, পশ্চিমেই শিপ্রা আর গন্ধবতী নদী, পশ্চিমেই মহাকালেশ্বর-এর অধিষ্ঠান। ওই, ওই যে আসছে রথ। আকাশে ধুলো উড়ছে। মেঘের মতো ধুলোয় ঢেকে গেছে পশ্চিম দিগন্ত। চট করে উঠে দাঁড়াল বুড়ো পরাশর। মেঘ উঠল নাকি পশ্চিমে? ওকি মেঘের গুড়গুড় শব্দ। বৃষ্টি আসবে নাকি! কিন্তু এই সময় তো পশ্চিম থেকে মেঘ আসে না। শীতের যে বৃষ্টি, সেই বৃষ্টির মেঘ হাওয়া আসে উত্তর থেকে, উত্তর-পূর্বের মেঘ চলে যায় পশ্চিমে অপরা সাগরের দিকে। যদি আসে তাহলে? রথই তো! রথ! বুক ছম ছম করে ওঠে বুড়ো পরাশরের। সে যে এতক্ষণ রথের কথাই বলছিল, মহাকালেশ্বর মহাদেব শঙ্করের বিজয় রথ। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল রথচক্রের ঘর্ঘর। তাহলে কি মহাকালেশ্বরই ছুটে আসছেন এদিকে। ক্রুদ্ধ, দিগবিদিগহীন মহাকাল তার রথ ছুটিয়ে আসছেন এই পথে? বিরূপ হলেন তিনি? মহাকাল বিরূপ হলে এই পৃথিবী শেষ। তাই তো জেনেছে বৃদ্ধ এতকাল ধরে। আসছেন তিনিই। মহাকালেশ্বরের রথের কথা বলতে বলতে যে ঘোর জেগেছে বুড়ো পরাশরের মনে, সেই ঘোর থেকেই সে টের পেল ওই আসেন তিনি। তাই ধুলোয় ঢেকে যায় পৃথিবী। ও তো ধুলো নয়, মেঘ, বিদ্যুৎ, মহাকালের রথের পতাকা। সে শূদ্র হয়ে মহাকালেশ্বর শিবের মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি কখনো। সেই অধিকারই নেই। দ্যাখেনি কেমন সে মূর্তি। যা শুনেছিল, সবই ওই ধ্রুবপুত্রের কাছে। শূদ্রের মুখে দেবতার নাম উচ্চারণও কি পাপ? ভীত পরাশর চিৎকার করে উঠল, পালাও, পালাও, যে পালাবে সে বাঁচবে, হায়, এ আমি কী করলাম, মহাকাল শিব তাঁর বিজয়রথ নিয়ে আসছেন এদিকে। বুড়ো মাথাটি মাটিতে ঠেকিয়ে ভীমাকার এক পাথর খণ্ডের মতো নিশ্চল হয়ে চোখ দুটি বন্ধ করে ফেলে।

চারদিক কয়েক দণ্ডের মধ্যেই জনশূন্য। একা পরাশর মাঠের ভিতরে নিশ্চল, অন্ধকার। যারা ছিল তারা গেল কোথায়? কোন গর্তে, কোন বটবৃক্ষের আড়ালে, গাছের ডালে পাতার অন্ধকারে ভীত পক্ষীর মতো লুকিয়ে গেছে সবাই। রথের ঘর্ঘর শব্দ ক্রমশ বেড়ে উঠছিল।

রথ আসছিল। নির্জন শীতের দুপুরে রথ আসছিল রত্নাকর সাগরের দিকে, শূদ্র পল্লীর কাছে। কাম্বোজদেশীয় সাদা ঘোড়ার খুরে, রথচক্রে ধুলো উড়ছিল খুব। ঘোড়া দুটি পা আছড়াতে আছড়াতে থামল। কী স্বাস্থ্যবান ঘোড়া! রথের চালকটিই বা কেমন? সে উত্তরদেশীয় কৈলাশ পর্বতেরই মানুষ। রথটি ছিল রত্নখচিত। এটি যুদ্ধের রথ নয়, পরিযানিক, কিন্তু অতীব সুসজ্জিত। পীতবর্ণের রেশমি চাঁদোয়া, ঝালর, ধ্বজাটি আরো একটু উঁচু হলে বলা যেত এটি রাজার রথ। পতাকাটি অতি শুভ্র, রাজহংসের পালকের মতো তার বর্ণের উজ্জ্বলতা। দশপুরুষ উচ্চ এবং বার পুরুষ বিস্তৃত রথের ভিতরে নিশ্চল বসে আছেন এক মধ্যবয়সী। রত্নখচিত রেশমি পোশাক, তার উপরে অপরূপ সূচীকার্যে গড়ে ওঠা নানান নকশায় সমৃদ্ধ মদ্রদেশীয় পশম চাদর, তাও দুধ সাদা। মাথায় ছিল গোলাপি শিরস্ত্রাণ, তা

হাতে নিয়ে রথাসীন মানুষটি গম্ভীর গলায় বলল, হে উতঙ্ক, মানুষগুলি সব গেল কোথায়?

উতঙ্ক অর্থাৎ রথের চালক বলল, ভয়ে পালিয়েছে।

উতঙ্ক তুই হাঁক দে।

হাঁক দিতে হলো না। উতঙ্ক নামটি যে সবার জানা। তাহলে উতঙ্কের রথ আসছিল। মানে শ্রেষ্ঠীর রথ। অবন্তী দেশের সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত এলেন অমন দিগ্বিজয়ীর মতো রথ ছুটিয়ে। অমন রুষ্ট যোদ্ধার মতো রথ উড়িয়ে এলেন শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত। চোখ খুলল পরাশর। আচমকা উঠে দাঁড়াল। সে উঠে দাঁড়াতেই উতঙ্ক হা হা হাসিতে ফেটে পড়ল, প্রভু ওই যে একজন, পাথর মানুষ হয়ে গেল।

থাম। সুভগ দত্ত ভৎর্সনা করে উতঙ্কের হাসি থামালেন। উতঙ্ক কেমন নুব্জ্য হয়ে গেল রথে দাঁড়িয়েই। বুড়ো পরাশর রথটিকে দেখছিল। রথের মানুষদের দেখছিল। তার তো ভাবাই উচিত ছিল এ হতে পারে উতঙ্কের রথ। উতঙ্কের রথ এমনিই ছোটে। নগরের পথে যখন বেরোয় এই রথ, পথের মানুষ দুই ধারে সরে যায়। সবকিছুকে নস্যাৎ করে ছোটে রথ। রথে নিশ্চল বসে নগরের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিটি শুধুমাত্র মস্তক সঞ্চালন করে দু'পাশ দ্যাখেন। এই রথ বিপজ্জনক তো নিশ্চয়। ভয়ের। বছর দুই আগে গাঁ-এর একটি যুবক এই রথের সামনে পড়ে ঘোড়ার পদাঘতে, চক্রের ঘষটানিতে নুলো হয়ে গেছে। তাকে অবশ্য বণিক সুভগ দত্ত কিছু অর্থ সাহায্য করেছিলেন, তিনশত পনের মতো পেয়েছিল সেই নুলো হয়ে যাওয়া যুবক। তাকে তো আর দেখা যায় না এই পথে।

সুভগ দত্তকে রথ থেকে নামাল উতঙ্ক। রথচালক যুবকটি এক দর্শনীয় পুরুষ বটে। শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্তর শখ মনোমত দাস সংগ্রহ করা। তাঁর গৃহে নানা দেশ থেকে আনা দাস আছে। এই উতঙ্ক হলো উত্তর-পূর্ব দেশীয়। বালক উতঙ্ককে কতদিন আগে সেই শীতপ্রধান পাহাড়ি দেশ থেকে উজ্জয়িনীতে নিয়ে এসেছিলেন সুভগ দত্ত। তাকে খাইয়েদাইয়ে পুষ্ট একটি সবল মানুষ করেছেন। উতঙ্কের দিকে তাকালে কখনো বিস্ময় জাগে, কখনো ভয় তৈরি হয় মনের ভিতরে। চক্ষুদুটি ক্ষুদ্র, ভ্রূ যুগল প্রায় বিলীন, গাত্র ত্বক মসৃণ, উজ্জ্বল গৌরবর্ণের, নাসিকা প্রায় মিশে গেছে মুখমণ্ডলে। 'উতঙ্ক' নামটি সুভগ দত্তর দেওয়া। বৈদিক ঋষি আয়োদধ্যোমর শিষ্য বেদমুনি। বেদমুনির শিষ্য উতঙ্ক। প্রভুভক্তিতে তার জুড়ি মেলা ভার। তার কাছে নারী থেকে ধনসম্পদ সবই নিরাপদ, নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন প্রভু সুভগ দত্ত যেমন ছিলেন বেদমুনি।

রথ থেকে এগিয়ে ধীর পায়ে সরোবরের তীরে দাঁড়ালেন শ্রেষ্ঠী। বুড়ো পরাশর সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে এসে উতঙ্ককে দেখছিল। ভাবলেশহীন মুখ। নিশ্চল প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে সুভগ দত্তর দাস। বুড়ো পরাশর আরো সাহস সঞ্চয় করে সুভগ দত্তকে অনুসরণ করে। বিস্মিত চোখে সে দেখছিল শ্রেষ্ঠীকে। সুভগ দত্ত তার দিকে ফিরলেন, নিম্নস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, রত্নাকর, সাগর এমন হয়ে গেল,জল নেই। কবে হলো?

বৃদ্ধ জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন রত্নাকর সাগরের জলহীনতার জন্য দায়ী সে-ই। সুভগ দত্ত দক্ষিণতীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে পশ্চিমমুখী কিছুটা এগিয়ে সরোবরের পশ্চিমতীরে পা রাখলেন। তাঁকে অনুসরণ করছে বৃদ্ধ সৈনিক। সুভগ দত্ত আবার ঘুরে তাকিয়েছেন। এই লোকটিকে তিনি চেনেন। রাজার বাহিনীতে ছিল বহুকাল আগে। এই শূদ্র পল্লীর সব যুবকই তো সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে অস্ত্র ধরে। এই যোদ্ধারাই তো অবন্তীরাজের শক্তি। বৃদ্ধকে নিরীক্ষণ করছেন সুভগ দত্ত। নগ্নপদ, মলিন বেশ, গায়ের বস্ত্রটি বহু পুরাতন তুরগাস্তরণের ন্যায় শতছিন্ন। চোখ দুটিতে ভয়ের ভাব। জোড়হাতে দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ। সুভগ দত্ত আচমকা জিজ্ঞেস করলেন, পদ্ম কোথায়, নেই?

এ সময় তো থাকে না। বৃদ্ধের গলা ঘড়ঘড় করে, বিড়বিড়িয়ে বলে, ক্ষীর সাগরে, রাজবাড়ির গায়ে যে সরোবর সেখানে সম্বৎসর নাকি ফোটে, শুনেছি তাই।

এখানেও তো ফুটত? সুভগ দত্তর গলা উঠল।

বৃদ্ধ অবাক হয়ে শ্রেষ্ঠীকে দেখছে। নগরের শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য ব্যক্তির মুখে এই অকিঞ্চিৎকর জিজ্ঞাসায় সে বিব্রত। সে নিজে জানে প্রোষ্ঠোপদ থেকে অঘ্রান, এই ক'মাসই পদ্মের সময়, এই রত্নাকর সাগর ওই সময়েই পদ্মে পরিপূর্ণ থাকে।

সুভগ দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, পৌষ মাসে পদ্ম থাকে না?

আজ্ঞে? বৃদ্ধ হতভম্ব হয়ে কী জবাব দেবে বুঝতে পারে না। পৌষ মাসে যে পদ্ম থাকে না এ আর নতুন কথা কী? শ্রেষ্ঠীর কথায় মনে হচ্ছে এই সময়ে পদ্ম থাকা উচিত ছিল। এ কেমন কথা? শ্রেষ্ঠী কি জানেন না কখন পদ্ম ফোটে।

সুভগ দত্ত এবার নিম্নস্বরে বললেন, সাত সরোবরেই সম্বৎসর পদ্ম ফুটে থাকত এককালে, তা কি তুমি দ্যাখোনি?

বৃদ্ধ এবার টের পায় শ্রেষ্ঠী আসলে কী বলতে চাইছেন। সে মাথা দুলিয়ে সমর্থন জানায় নীরবে। শ্রেষ্ঠী এই নগরের অনেক ক্ষমতাবান মানুষ। শ্রেষ্ঠী হলেন প্রভু। শূদ্র জাতি তাঁর দাস। তিনি তাঁদের লালন না করলেও শূদ্রেরা তাঁর দাসানুদাস। প্রভু যা বলেন তা কখনো মিথ্যে হতে পারে না। প্রভুকে সমর্থন জানালে শূদ্রের মঙ্গল হবে। সম্বৎসর অন্ন আসবে ঘরে, শ্রেষ্ঠীর কৃপায় মানুষ সুখে থাকবে। তাঁর কথা মিথ্যে হতে পারে না, সুতরাং এই রত্নাকর সাগরে সম্বৎসর ফুল ফুটতই। বৃদ্ধ নিজে হয়ত দ্যাখেনি, সে দ্যাখেনি বলে শ্রেষ্ঠীর কথা মিথ্যে হতে পারে না।

সুভগ দত্ত বললেন, কয়েক বৎসর যাবৎ দেখা যাচ্ছে পদ্ম শেষ হয়ে যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি, সরোবর যদি পদ্মহীন হয়ে থাকে, উজ্জয়িনীর থাকল কী?

হতে পারে তা। বৃদ্ধ বলল।

তুমি জান না?

জানি প্রভু।

পদ্ম যে নেই তা তোমরা রাজাকে জানিয়েছ?

না প্রভু।

কেন পদ্ম নেই সে খোঁজ রাখো?

বৃদ্ধ আর দ্বিধা করে না, বলল, আজ্ঞে, অনেকদিন তো জল নেই, দেখুন আঁজ্ঞে।

জল নেই কেন?

আকাশে জল নেই তাই স্থলেও নেই।

এই সরোবর, উজ্জয়িনীর সপ্তসাগর কি আকাশের জলে পুষ্ট হয়?

বৃদ্ধ এবার নিশ্চুপ। সে তো জানে আকাশের জলেই নদী, সাগর, সরোবর সবই পুষ্ট হয়। আকাশে জল নেই তাই শিপ্রা, গন্ধবতীও কেমন শীর্ণ হয়ে গেছে। মাটি পাথর হয়ে যাচ্ছে। গো-ধূম চাষ হল না প্রায়। জোয়ার ওঠেনি। গাছাগাছালি, বন, হাওয়া সব কেমন তপ্ত হয়ে আছে। এই শীতেও পাথর কেমন তেতে যাচ্ছে মধ্য দুপুরে। বৃষ্টি হলে এমন হয় না। মাটিতে রস নেই, গাছেও নেই। ইক্ষুতে রস হলোই না তেমন এই শীতে। সে তার অভিজ্ঞতায় দেখেছে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক হলে পৃথিবী থাকে স্বাভাবিক। মানুষের দিনযাপনে থাকে ছন্দ।

বৃদ্ধকে নিশ্চুপ দেখে সুভগ দত্ত আবার বললেন, আমি তো কখনো এমন দেখিনি বৃষ্টি না হলে সরোবর শুকিয়ে যায়, তুমি দেখেছো?

পরাশর কী বলবে ধরতে পারছে না। তার স্মৃতিতে বেশ কয়েকবার জলহীন সরোবর আছে। আবার বৃষ্টি হয়েছে, সরোবর পরিপূর্ণ হয়েছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠী বলছেন অন্য কথা। কোমরে ঝোলান রেশম পেটিকা নাচান সুভগ দত্ত, স্বর্ণমুদ্রার শব্দ চেনে পরাশর। শিহরিত হয়। শ্রেষ্ঠী আবার কোমরে ঝোলালেন তাঁর পেটিকা। গ্রামবৃদ্ধ পরাশর বলে, আজ্ঞে, এমন দেখিনি কখনো।

সম্বৎসর পদ্ম ফুটে থাকত বলেই তো এই নগর কুমুদবতী, কুমুদ হলো পদ্ম, চাঁদ।

হ্যাঁ আজ্ঞে।

এমনকি কখনো হতো যে এই কুমুদবতী নগর কুমুদশূন্য?

একই প্রশ্ন। হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো। এখন সে মাথা তুলে দেখছে শ্রেষ্ঠীকে। মাথা দোলাচ্ছে। সুভগ দত্তর ঠোঁটের কোণে আবছা হাসি জেগে ওঠে। হাসি লুকিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন চোখে আকাশে তাকান, আকাশ থেকে সরোবরের দিকে। মাথা নাড়াতে থাকেন। চিন্তামগ্ন হয়ে বুড়োর দিকে তাকান, কী হবে বলো দেখি?

পরাশর নিশ্চুপ। সুভগ দত্ত দেখছেন তাঁর রথের ধারে কিছু মানুষ জড়ো হয়েছে। রথকে ঘুরে ঘুরে দেখছে। তারপর কী মনে করে তারা সরোবরের দিকে রওনা হলো। সারিবদ্ধভাবে পরপর আসছে সরোবরের দিকে। ওরা আছে সরোবরের দক্ষিণ দিকে। পশ্চিমতীরে দাঁড়ানো শ্রেষ্ঠীর কাছে সরাসরি না এসে দক্ষিণ থেকে পূর্ব তীরের দিকে রওনা হলো। সরোবরটিকে প্রদক্ষিণ করেই ওরা যেন শ্রেষ্ঠীর কাছে পৌঁছবে। সুভগ দত্ত অবাক হয়ে দেখছেন দীর্ঘকায়, খর্বকায়, শীর্ণ, স্থূলকায়, নানারকমের নানা বয়সের মানুষগুলি ধীর পায়ে প্রদক্ষিণ করছে জলহীন রত্নাকর সাগর।

সুভগ দত্ত তাকালেন বৃদ্ধের দিকে, সরোবর যে জলহীন, এ কি মঙ্গলচিহ্ন?

না আঁজ্ঞে।

আকাশ যে জলহীন, তাও কি মঙ্গল চিহ্ন?

না আঁজ্ঞে।

পৌষেই এই অবস্থা, সামনে ভয়ঙ্কর গ্রীষ্ম!

হ্যাঁ, আঁজ্ঞে।

এবার কি বসন্ত আসবে?

হ্যাঁ আজ্ঞে।

সুভগ দত্ত চিন্তাকুল হয়ে বললেন, শীতের পর বসন্তই আসে, এতদিনে তার নানা চিহ্ন ফুটে ওঠে, দেখতে পাচ্ছো কি তা?

বৃদ্ধ বিড়বিড় করে, আমার চেয়ে আপনিই বেশি বোঝেন প্রভু।

সুভগ দত্ত পায়চারি করছেন, এবার বসন্ত আসবে না, শীতের পরই গ্রীষ্ম।

কী ভীষণ হবে তা! বৃদ্ধের মুখে ভয়ের চিহ্ন ফোটে।

এমনকি কখনো হয়েছে সরোবর জলহীন, বৃষ্টি নেই, অবন্তী দেশ নিরন্তর পুড়ছে।

বৃদ্ধ মাথা নাড়ে, না প্রভু।

মানুষগুলির সরোবর প্রদক্ষিণ শেষ। সুভগ দত্তর সামনে এসে ধীরে ধীরে সকলে দাঁড়িয়ে যায় মাথা নীচু করে। সুভগ দত্ত বললেন, তোমরা দেখেছ?

কী। সকলে মাথা তুলল একসঙ্গে।

অবন্তী দেশ থেকে বরুণদেব চলে গেছেন।

না প্রভু। সকলে চিৎকার করে ওঠে।

আর অবন্তীতে বৃষ্টি হবে না, সরোবর জলহীন, আকাশও তাই, তোমরা কি জানো মাথার আকাশ হলো আর এক সাগর, কত জল সেখানে জলভরা মেঘে!

হ্যাঁ প্রভু।

তোমরা এই স্বর্ণমুদ্রার পেটিকা নাও, কিন্তু সরোবর যে মড়ার মতো পড়ে আছে, এর কী উপায়?

বিষ্টি চাই। সকলে সমস্বরে বলে ওঠে।

বৃষ্টি আর হবে না। বলতে বলতে সুভগ দত্ত স্বর্ণমুদ্রার পেটিকা বুড়ো পরাশরের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, অবন্তী দেশের জন্য তোমরা কতবার যুদ্ধ করেছ, তোমাদের দিলাম, কিন্তু সম্বৎসর যে সরোবরে পদ্ম থাকত, তা কেন থাকে না সেই খোঁজটি করো, কেন মেঘ নেই কেন বসন্ত আসবে না.....। বলতে বলতে সুভগ দত্ত রথের দিকে ফিরতে লাগলেন। ফিরতে ফিরতে শুনলেন শূদ্রকুল তাঁর জয়ধ্বনি করছে। শুধু বৃদ্ধ সৈনিকটি অবাক হয়ে শ্রেষ্ঠীকে দেখতে লাগল। তিনি রথের দিকে হাঁটছেন। তিনি যা বলে গেলেন তার কোনোটাই হয়ত সত্যি নয়, কিন্তু প্রভু কি মিথ্যে বলেন? বৃদ্ধ এবার সরোবরের ভিতরে কর্দমাক্ত জলে নেমে যেতে থাকে। আশ্চর্য! সে তো কখনোই দ্যাখেনি সম্বৎসর এই সরোবরে পদ্ম থাকত, অথচ শ্রেষ্ঠী বলে গেলেন। বলে গেলেন যখন তা সত্যিই। তিনি মিথ্যা বলেন না, মিথ্যায় ভয় পায় বুড়ো পরাশরও। মিথ্যার শাস্তি অনেক। শেষ জীবনটুকু নিশ্চিন্তে কাটাতে চায় সে। বিড়বিড় করতে থাকে পরাশর, ভাদ্র থেকে শ্রাবণ, আবার আশ্বিন পদ্ম ফুটে থাকত এখানে, শ্রেষ্ঠীর কথা মিথ্যে হতে পারে না।

তের

কামদীপ্ত অগ্নিশিখারা যেন নৃত্যছন্দে দেহ সঞ্চালন করছিল। প্রধান পুরোহিত দ্বিজদেব ব্রহ্মদেব ভট্টর সন্ধ্যারতি শেষ হওয়ার মুখে। সায়ংকাল থেকে একটি প্রহর যায় তাঁর দেবারতিতে। এখন ক্লান্ত হয়েছেন ধরা যাচ্ছে। এই শীতেও তাঁর কপালে স্বিন্দ বিন্দু ঘাম। তাঁর বামপার্শ্বে যুক্ত উরু বেদীর মতো প্রসারিত করে তাঁকে চামরব্যজনরতা দেবদাসীও ক্লান্ত হয়েছে। নীলকণ্ঠ মহাদেবের বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান দেবভোগ্যা দেবদাসীও যেন শ্রান্ত হয়েছে প্রহর জুড়ে এই সন্ধ্যারতিতে। তার হাতও থামছে না। চামরব্যজনে তার দেহে এই ছন্দ এসেছে। সেই ছন্দেই তার মুক্তি যেনবা।

শ্রেষ্ঠী বসে আছেন মূল প্রকোষ্ঠের বাইরে, দ্বারমুখে। তিনি এসেছেন আরতি আরম্ভ হওয়ার পর। তাঁর চোখের সামনে পঞ্চপ্রদীপের অগ্নিশিখারা দপ দপ করে দুলছিল। শ্রেষ্ঠীর আচমকা মনে হলো গণিকা দেবদত্তার কথা। পীতবর্ণের রেশমের যে রঙ, সেই রঙ আগুনের। সদ্য উদিত চন্দ্রের। পীতবর্ণের রেশমবস্ত্রে দেবদত্তা যেন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা। তার নৃত্য দেখেছিলেন শ্রেষ্ঠী এই মন্দির প্রাঙ্গণে। সে ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। দেবারতি আরম্ভ হলো মহাদেবের। গণিকাই যেন অগ্নিশিখা হয়ে মহাকাল মন্দিরকে অর্চনা করতে আরম্ভ করল। তারপর। সেই ঢাক, কাঁসরঘণ্টার শব্দের ভিতর যুবতী যেন অগ্নিময়ী হয়ে উঠল। তার দুটি হাত যেন সহস্র হাত হয়ে জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিকে গ্রাস করতে লাগল। রাজা এসেছিলেন, এসেছিলেন প্রধান সেনাপতি, এসেছিলেন রানী ভানুমতি, আর ছিলেন তিনি। তিনিই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন ধ্রুবপুত্রকে। সেই নিয়ে আসাই হলো তার কাল। ধ্বংসের বীজ বপন হলো সেই প্রহর জোড়া লাস্যনৃত্যে। শ্রেষ্ঠী দেবদাসীর দিকে তাকিয়েছিলেন। সুযুবতী, সুগঠনা, সুন্দরী। প্রতিজনই দেবতা এবং পুরোহিতের কাছে নিবেদনযোগ্য নারী। মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন শ্রেষ্ঠী। কম্পমান দীপশিখার ভিতরে তিনি যেন দেবদত্তাকে দেখতে পাচ্ছেন। এই যে অগ্নিশিখা দিয়ে দেবারতি, এযেন কামাগ্নির মতো স্ফুরিত হয়ে উঠেছে। দেবতার শীত-গ্রীষ্ম নেই, তাঁদের বাস যেখানে, সেখানে চিরবসন্ত। কামাগ্নিই একমাত্র বিচলিত করতে পারে তাঁদের। শ্রেষ্ঠী মস্তক সঞ্চালন করে নিজের মনের ভিতরে উদয় হওয়া অশিষ্ট ভাবনাগুলিকে ত্যাগ করতে চাইলেন। কিন্তু দেবতার পাশে দাঁড়ানো দেবদাসীর দেহের বিভঙ্গে, শরীর চালনায় আবার চঞ্চল হলেন। সে ঈষৎ ন্যুব্জ হয়ে নীলকণ্ঠের লিঙ্গ মূর্তির উপর চামর ব্যজন করছে। তার বিস্তৃত নিতম্বদেশ, পরিস্ফুট স্তনযুগল, শ্যামবর্ণের দেহলতা, মেখলার আড়াল থেকে প্রস্ফুটিত উরুরেখা সবই চোখে পড়ছিল শ্রেষ্ঠীর। এই যুবতী এখন এই ঋতুতে দেবসেবার অধিকারী হয়েছে। রাত্রে মহাকালের গর্ভগৃহের দ্বারে শুয়ে থাকে। মহাকালের ডাক এলে দ্বার খুলে যায়।

ঢাক বাজছিল। কাঁসরঘণ্টা বাজছিল। ক্রমশ ঢাক এবং ঘণ্টার শব্দ উত্তাল হয়ে উঠছিল। আরতির সময় প্রায় শেষ হলো। মহাকাল মন্দিরের উত্তরে মহাকাল অরণ্যে শৃগাল প্রহর ঘোষণা করলেই যেন থামবে। শ্রেষ্ঠী দেখছিলেন পঞ্চপ্রদীপের অগ্নিশিখার সঙ্গে দেবদাসীও কাঁপছে। তিনি দেখছিলেন প্রধান পুরোহিতের পাশে প্রস্তর মূর্তির মতো স্থাপিত যুবতীর হাতের চামর টলছে। সেই যে বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে প্রহর জোড়া নৃত্য, তা থামেনি প্রহর শেষ হলেও। নৃত্যে বিভোর হয়ে গিয়েছিল প্রধান গণিকা। তার পদক্ষেপণে মন্দির প্রাঙ্গণের পাথর থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠছিল। কটিদেশ থেকে ঊর্ধ্বাঙ্গ যেন স্বয়ং শিহরিত হচ্ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমা বাতাসে ছিল যে নমনীয়তা, শীতলতা, তা অগ্নিশিখার কাছে এসে তপ্ত, হয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছিল। জ্যোৎস্না হয়ে উঠেছিল উষ্ণ, আলো ফুটেছিল বিহানবেলার মতো। মস্তক সঞ্চালন করে শ্রেষ্ঠী আবার অশিষ্ট ভাবনাগুলিকে দূর করতে লাগলেন। দৃষ্টিপাত করলেন সম্মুখে। আরতি প্রায় শেষ। কিন্তু শেষ না হলেই যেন ঠিক হতো। দেবদাসী যুবতী ক্রমশ ঝুঁকে পড়ছে নীলকণ্ঠ মহাদেবের লিঙ্গমূর্তির অভিমুখে। মাথার ভিতরে আবার অলীক ভাবনার উদয় হলো। দুটি চোখ বন্ধ করলেন শ্রেষ্ঠী। তাঁর মনে হচ্ছে এই যুবতী নিশ্চিত কামার্ত হয়েছে। নিবেদনে উন্মুখ হয়েছে। দেবতা, মহাকাল কি জেগে উঠবেন?

ঢাক, কাঁসরঘণ্টার মিলিত ধ্বনির সঙ্গে শঙ্খধ্বনির মিলন হলো। দুই দেবদাসী গর্ভগৃহের বাইরে, শ্রেষ্ঠীর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আকাশমুখী হয়ে শঙ্খধ্বনি করতে লাগল। শঙ্খধ্বনি আরম্ভ হলো মন্দির প্রাঙ্গণেও। মন্দির চূড়ায় আশ্রয় নেওয়া, মন্দিরের ছাদের ঘুলঘুলিতে আশ্রয় নেওয়া কবুতরগুলি আচমকা জেগে উঠে ডানা ঝাপটিয়ে, বকম বকম করতে করতে ধীরে ধীরে নিঃশব্দ হলো। পুরোহিত উদ্দাম হাতে

অগ্নিশিখা দোলাতে লাগলেন। চামরব্যজনরতা যুবতী দেবদাসীর শরীর ভাঙতে লাগল বারংবার। সুভগ দত্তের দেহের অভ্যন্তরে রক্ত চলাচল দ্রুত হলো।

চঞ্চল হয়েছেন শ্রেষ্ঠী। তাঁর দেহ আচমকা তপ্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর দৃষ্টি বারেবারেই অধিকার করে নিচ্ছিল মহাকালের কাছে সমর্পিতা যুবতীর সর্বস্ব। শঙ্খধ্বনি তার নিঃশ্বাস দ্রুত করেছে। তিনি রক্তের গভীরে মত্ততা টের পাচ্ছিলেন। এ যেন মিলনের কাল ঘোষণা। এ যেন আগুনের প্রতি আগুনের আহ্বান। অবাক শ্রেষ্ঠী দেখছিলেন চামরব্যজনরতা যুবতীর চঞ্চলতা বেড়েছে। এমন গভীর নিবেদনে ভরা দেহ বিভঙ্গ তিনি যেন এজন্মে দ্যাখেননি। দেখেননি আঁখিতারার এত চঞ্চলতা, কাম বিহ্বল কটাক্ষ। দুই চোখ ক্রমে জুড়ে আসছে শৃঙ্গারে ব্যাপৃতার মতো। তাঁর মনে হচ্ছে ওই দেবদাসী তার সত্তা বিলীন করে দেবে মহাকালে। থরথর করে কাঁপছেন শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত।

মন্দিরে এখন তেমন আসা হয় না শ্রেষ্ঠীর। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে প্রধান পুরোহিত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। উপঢৌকন নিয়ে আসেন। শেষ কবে এমন নিবিষ্ট হয়ে সন্ধ্যারতি দেখেছেন তা মনে পড়ে না সুভগ দত্তর। যেটুকু মনে পড়ে তা হল কোনো এক বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে গণিকা দেবদত্তার লাস্যনৃত্য। তাও কতদিন হয়ে গেল তা! যেন বহু যুগ। সেই নিবেদন, সেই সমর্পণের সঙ্গে এই সন্ধ্যার সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছেন তিনি। ওই দুই দেবদাসীর নিবেদনের সঙ্গে অগ্নিময়ী দেবদত্তার নিবেদনের ভাবটুকুর গভীর মিল। মনে পড়ে রসমঞ্জরীর কন্যার রূপে সেই সন্ধ্যার জ্যোৎস্নাও যেন মলিন হয়ে গিয়েছিল। চাঁদের আলো ঢেকে গিয়েছিল গণিকার রূপে, যেমন আকাশের তারার আলো ঢেকে যায় চন্দ্রালোকে। তার লাস্যনৃত্যে, আকুল নিবেদনে মহাকাল যেন জেগে উঠেছিল। মন্দির প্রাঙ্গণ কাঁপছিল। সুভগ দত্তর মনে পড়ে প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নিশিখা যেমন পতঙ্গকে টেনে নেয়, সেইভাবে তাঁকে টেনেছিল, টেনেছিল ধ্রুবপুত্রকেও। ধ্রুবপুত্র আগুনে পুড়েছে। তিনি পুড়ছেন। তাঁর ধনসম্পত্তি, অতুল বৈভব তাঁকে রক্ষা করছে বটে কিন্তু তিনি তো পুড়েছেনই। সেই রাত্রেই তিনি ছুটেছিলেন গণিকাগৃহে। ক্লান্ত গণিকা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিল, ওই রাত্রিটি সে মহাকালকেই উৎসর্গ করেছিল, এই কথা বলে। স্বর্ণমুদ্রাভরা পেটিকাটিও ফেরত দিয়ে জোড় হাতে তাঁকে ফিরে যেতে বলেছিল। তারপর তো ওই আগুনের পাশেই তিনি ঘুরছেন। টানটান হয়ে বসলেন অবন্তীদেশের শ্রেষ্ঠ ধনী মানুষটি। মাথা ঝিমঝিম করছে। তাঁর মনে হচ্ছে মহাকালের প্রতি নিবেদিতা ওই দেবদাসী, এমনকি পুরোহিতের সেবাদাসীও যেন নগরের প্রধান গণিকার চেয়ে যৌবনে ধনী। বয়স তো কম। যৌবন এখনো হয়ত অনাঘ্রাত। দেখে তেমনই মনে হলো তাঁর। শ্রেষ্ঠী মস্তক সঞ্চালন করলেন। দেবভোগ্যা দাসীদের প্রতি প্রলুব্ধতা বিধিসম্মত নয়।

প্রলুব্ধ হতেন না তিনি, কিন্তু যুবতীর ছন্দোবদ্ধ চামরব্যজনে তপ্ত হয়ে উঠছেন তো সত্যি। তার চামরব্যজনে যে ভঙ্গিমা, যে ছন্দ তৈরি হচ্ছে প্রতি দণ্ডে, প্রতি পলে, তা যেন লাস্যনৃত্যেরই আর এক রূপ। উরু যুগল ভাঙছে মেখলার আড়ালে, যুক্ত উরু প্রসারিত হচ্ছে শিবলিঙ্গের নিকটে, জঙ্ঘা ভাঙছে উরু প্রান্তে এসে। কটিদেশ, উরুমূল, নিতম্ব সব একই ছন্দে মুক্ত হচ্ছে ছায়া থেকে আলোয়। কটিদেশ থেকে উর্ধ্বদেশ শুক্লা চতুর্থীর চাঁদের মতো বঙ্কিম রূপে ঝুঁকে পড়ছে দেবতার উপর। ঘোর নিঃশ্বাস পড়ছে শিবলিঙ্গে। পরিপূর্ণ বক্ষদেশ শিথিল হয়ে আবার ছন্দের নিয়মেই হয়ে উঠছে কামনায় দৃঢ়, দেবদাসী উন্নত করছে তার দেহলতা, দেহের এই নানা বিভঙ্গে উত্থিত নূপুর ধ্বনি চঞ্চল করছে শ্রেষ্ঠীকে। নিমীলিত চক্ষু শ্রেষ্ঠীর কানে আসছে সঘন নিঃশ্বাসের শব্দ। তিনি কল্পনায় মত্ত হয়ে উঠলেন আবার। ঢাক, কাঁসর ঘণ্টা, শঙ্খধ্বনির মিলিত শব্দ যেন উত্তেজনার শিখরে তুলেছে দেবদাসীকে। এই উত্তেজনার ছায়া এসে পড়েছে পুরোহিতের প্রতি নিবেদিতা যুবতীতেও। কোথাও কোনো নিষ্কাম ভক্তির চিহ্ন দেখছেন না শ্রেষ্ঠী কেননা তিনি নিজেই তো নিষ্কাম নিবেদনে স্থির হয়ে নেই। শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত টের পাচ্ছিলেন পৌষমাসের রাত্রিটিতে আগুন ধরে গেছে। গোপন আগুনে প্রস্তরনির্মিত মন্দিরতল, মন্দিরগাত্রও তপ্ত হয়ে উঠেছে। মিলিত ঘণ্টাধ্বনি, শঙ্খধ্বনির ভিতরে ঢেকে যাচ্ছে অলৌকিক এক শীৎকার ধ্বনি। তিনি যেন গোপন শীৎকারে মত্ত হলেন।

সহসা পৃথিবী স্তব্ধ হলো। যে ধ্বনিময়তা ব্যাপ্ত হয়েছিল এই বিপুল মন্দিরে, মন্দিরের উপরে অসীমে বিস্তৃত তারাজ্বলা আকাশে, মন্দির সংলগ্ন গন্ধবতী নদীর অন্ধকারে, প্রাঙ্গণে, এই উজ্জয়িনী নগরে, তা থেমে গেল। থেমে গেছে শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি, ঢাকের শব্দ। মিলিয়ে যাচ্ছে উত্তরে মহাকাল অরণ্যে

শৃগালের প্রহর ঘোষণা। উঠে দাঁড়ালেন শ্রেষ্ঠী। ঘর্মাক্ত হয়ে গেছেন তিনি বহু মূল্যবান মদ্রক দেশীয় পশম আবরণের ভিতর। চাদরটি সরিয়ে বুক আলগা করে দিলেন সুভগ দত্ত। তাঁর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এখন ধীর লয়ে বইছে। পরিশ্রান্ত হয়েছেন তিনি। কোমর থেকে স্বর্ণমুদ্রার পেটিকাটি বের করে অস্ফুট গলায় বললেন, অপূর্ব, অপূর্ব ওই চামরব্যজন, মহাকাল তৃপ্ত হবেন নিশ্চিত।

চামরব্যজনের প্রশংসায় বিরক্ত প্রবীণ পুরোহিত ঘাড় বাঁকিয়ে পশ্চাতে তাকিয়ে শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্তকে দেখে বিরক্তি লুকিয়ে মুখে প্রসন্নতা আনলেন, বিগলিত হলেন, বললেন, দেবদাসীটির কথা বলছেন মহাশয়?

শ্রেষ্ঠী পুরোহিতের কথা শুনতে পেলেন না। তাঁর চোখ পুরোহিত ব্রহ্মদেবকে পার হয়ে মন্দির গাত্রে এলিয়ে পড়া দেবদাসীর দিকে। মাথার পশ্চাত অংশটি পাথুরে দেওয়ালে আঘাত পেয়েছে যে তা তিনি বুঝতে পেরেছেন। শব্দটি তাঁর কানে এসেছে। হাতের চামর পড়ে গেছে। যাক্ অগ্নিশিখায় অর্চনার সময়ই তো মহাকাল উত্থিত হন, এখন তাঁর বিশ্রামের সময়। কিন্তু দেবদাসী, পদ্ম শোভিত সরোবরের মতো পরিপূর্ণ যুবতী কি সত্যিই আত্মনিবেদনে বিভোর হয়ে গেছে? দুই চক্ষু নিমীলিত। পরিপুষ্ট অমৃতফলের মতো স্তনযুগল শ্বাস প্রশ্বাসে উত্থিত হচ্ছে বারেবারে। অবাক হয়ে স্তন সুষমা দেখতে দেখতে অস্ফুট গলায় চিৎকার করে উঠলেন শ্রেষ্ঠী, কী হলো ওর, এখন তো মহাকাল ঘুমিয়ে।

মহাকাল ঘুমোন না। তাঁর নিদ্রা নেই, সবই জাগরণ, কখনো ধ্যানস্থ থাকেন মাত্র। বলতে বলতে প্রধান পুরোহিত ঘুরে মহাকালের দিকে ফিরলেন। তাঁর সেবাদাসী যুবতীটি দ্রুত এগিয়ে দেবদাসীকে ধরেছে দুই হাতে। তার মাথাটি কোলের উপর তুলে নিয়েছে। বিরক্ত হলেন শ্রেষ্ঠী। ওই রতিবিহ্বল ভঙ্গীটি তাঁকে আবার উষ্ণ করছিল। দেবদাসীকে আড়াল করেছে যুবতী সেবাদাসী। শঙ্খধ্বনিরতা অন্য দুই দেবদাসী বাইরে থেকে অস্ফুট আর্তনাদ করে ভয়ার্ত হয়ে গর্ভগৃহে প্রবেশ করল। প্রধান পুরোহিত বেরিয়ে এলেন জ্বলন্ত পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে। সোনার প্রদীপে সোনার আগুন দপদপ করছিল। প্রধান পুরোহিত আগুনের তাপ নিজ হাতে নিয়ে শ্রেষ্ঠীর কপালে ছোঁয়ান, নিজে নেন তারপর। হেঁকে ডাকলেন এক যুবতীকে, এটা নে, কী হলো ওর?

ভীত সেবাদাসী তার কোল থেকে দেবদাসীর মাথা নামিয়ে প্রধান পুরোহিতের কাছ থেকে পঞ্চপ্রদীপ গ্রহণ করল, প্রধান পুরোহিত তাকে ভর্ৎসনা করলেন, তোর কাজ কী, দায়িত্ব ভুলে তুই ওকে ধরলি কেন?

ভীতা যুবতী কী বলল তা বোঝা গেল না। মুখ অন্ধকার করে পঞ্চপ্রদীপ হাতে সে দাঁড়িয়ে আছে। প্রদীপের আগুন নিভে যাচ্ছে। দপদপ করে পাঁচটি বুকই পুড়ছে।

প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মদেব ভট্ট এবার ভৎর্সনা তীব্র করলেন, তোর সৌভাগ্য যে তুই এই মন্দিরে প্রবেশ করতে পেরেছিস, ভুল করলে আঁস্তাকুড়ে স্থান হবে।

যুবতী ফিসফিস করে বলল, সুভদ্রা জ্ঞান হারিয়েছে।

প্রধান পুরোহিত বললেন, জ্ঞান ফিরবে আপনি, ও মহাকালের আশ্রিতা, মহাকাল ওকে দেখছেন, তুই ওকে ধরার কে?

সমস্ত দিন উপবাসে ছিল। বিড়বিড় করল যুবতী।

উপবাসে থাকতে তো হবেই। প্রধান পুরোহিত গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে এলেন। শ্রেষ্ঠী তাঁর পাশে হাঁটছেন। প্রধান পুরোহিত বললেন, আপনি প্রীত হয়েছেন?

কীসে?

দেবদাসী সুভদ্রাকে দেখে?

চামরব্যজনের ভঙ্গিটি সুন্দর। বললেন সুভগ দত্ত।

প্রধান পুরোহিত বললেন, আপনার কথা দেবদাসীকে অবগত করাব, মহাকালের কৃপায় আপনার দৃষ্টি পড়েছে ওই সুভদ্রার প্রতি, যুবতী সৌন্দর্যময়ী, আত্মনিবেদিতা।

হাঁটতে হাঁটতে দুইজনে প্রধান পুরোহিতের কক্ষের দিকে যাচ্ছেন। তাঁদের সম্মুখে এক দেবদাসী দীপ হাতে পথ দেখাচ্ছে। সে দীপের পথটুকু আলোকিত করে তোলার জন্য ঝুঁকে পড়েছে অনেক। যেতে যেতে প্রধান পুরোহিত বললেন, আপনি কি সুভদ্রাকে আকাঙ্ক্ষা করেন?

থাক, ও মহাকালের আশ্রিতা।

দু'জনের আলাপনের মধ্যে দেবদাসীর হাতের দীপ কেঁপে গেল। রমণী পা ঘষটে এগোচ্ছে। তার পায়ের নূপুর নিক্কন অন্ধকারে শুনতে পাচ্ছেন শ্রেষ্ঠী। তিনি দৃষ্টি প্রসারিত করে এই দেবদাসীটিকে দেখতে চেষ্টা করলেন। অন্ধকারে বোঝা যায় না যুবতী না প্রাচীনা। নূপুর ধ্বনিতে যে কল্পনা তৈরি হয় যুবতীরই। শ্রেষ্ঠী দেখছিলেন দীপের কোমল হলুদ আলোয় মন্দির গাত্রে, মন্দিরের ছাদে নানারকম ছায়ার নকশা তৈরি হচ্ছে। মূলমন্দির, গর্ভগৃহ থেকে প্রধান পুরোহিতের শয়নকক্ষ সামান্য পথ। সেই কক্ষও মন্দিরের অংশ। মস্ত পাথুরে চাতাল, অগণিত স্তম্ভ পার হয়ে যেতে হয়। মাথার ছাদটি অনুচ্চ। একটু চেষ্টা করলেই তা স্পর্শ করতে পারেন শ্রেষ্ঠী। সেই ছাদে দেবদাসীর হাতে ছায়া পড়েছে। দেওয়ালে তার ছায়া কাঁপছে।

শ্রেষ্ঠী জিজ্ঞেস করলেন, ও কি নৃত্যে পারঙ্গমা?

নৃত্য ব্যতীত মহাকাল তুষ্ট হবেন কেন? বললেন ব্রহ্মাদেব।

এই যুবতী কোন দেশের, কোন গ্রামের?

অবন্তীরই, কিন্তু নারীর তো শেষ পর্যন্তই কোনো সূত্র থাকে না, যার কাছে আছে তার, এই মহাকালেই ওই দেবদাসীর জন্ম মনে করতে দোষ কী?

দু'জনে কক্ষদ্বারে দাঁড়িয়েছেন। দীপ হাতে দেবদাসী ঢুকে গেছে ভিতরে। আসন সাজাচ্ছে। তার নূপুরধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন শ্রেষ্ঠী। ওই নূপুরেই তো ধরা যায় আছে কোনো রমণী। নূপুরের শব্দ না থাকলে ধরা যায় না কেউ আছে কিনা। ধ্বনি নিঃশব্দ হলো। কয়েকদণ্ড কোনো শব্দ নেই। প্রধান পুরোহিত চাপা গলায় ডাকলেন, কী হলো, থেমে গেলি কেন?

ত্রস্তপায়ে অন্ধকারে বেরিয়ে এল রমণী। দ্রুতবেগে একটি স্তম্ভের গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। আবছা দেখে মনে হলো যুবতীই। প্রধান পুরোহিত বললেন, ওখানে বসে থাক, ডাকলে যেন সাড়া পাই, আসুন মহাশয়।

দুটি আসনে দু'জন বসেছেন। দীপ জ্বলছে একধারে। ধূপের গন্ধে ঘরটি ভরপুর। কিন্তু অন্য একটি গন্ধও যেন নাকে আসছিল শ্রেষ্ঠীর। তিনি ঠিক ধরতে পারছিলেন না, ধূপের ধোঁয়ার ভিতরেই ওই গন্ধটি ভেসে আছে কিনা। ভাবতে ভাবতে শ্রেষ্ঠী তাঁর কোমর থেকে স্বর্ণমুদ্রায় ভারি রেশম পেটিকাটি বের করে এগিয়ে দিলেন পুরোহিতের দিকে, দেবদাসী সুভদ্রার জন্য।

পুরোহিত ব্রহ্মাদেব গ্রহণ করতে করতে উজ্জ্বল হলেন। পেটিকাটির ভার পরখ করে দক্ষিণ হস্ত থেকে বামহস্তে স্থানান্তর করে বললেন, আপনি উদার প্রকৃতির মানুষ।

গমগম করে ওঠে শ্রেষ্ঠীর কণ্ঠস্বর, শুনুন ব্রাহ্মণ, আমি আজ দ্বিপ্রহরে রত্নাকর সাগরে গিয়েছিলাম, শূদ্রপল্লীর সন্নিকটে।

শূদ্রপল্লী! ব্রাহ্মণের মুখে ঘৃণার ভাব জেগে উঠল, বললেন, আপনার আশ্রিত সেই ধ্রুবপুত্রও ক্ষত্রিয় সন্তান হয়ে শূদ্র গমন করত, তার ফল সে পেয়েছে, আপনি কি কোনো শূদ্রানীর খোঁজে গিয়েছিলেন?

হাসলেন শ্রেষ্ঠী, বললেন এই নগর কি এতই তুচ্ছ, যে সুভগ দত্তকে যেতে হবে শূদ্রানীর খোঁজে, শুনুন সেখানে শুনলাম, মানুষজন বলছে যে সরোবর কোনোদিন জলহীন হয় না, যে সরোবরে সম্বৎসর পদ্ম ফুটে থাকত, তার এই করুণ দশা কেন?

সরোবর কি শুকিয়ে গেছে? ব্রহ্মাদেব জিজ্ঞেস করলেন।

যাওয়ার মুখে।

অনাবৃষ্টির দরুন?

শূদ্রপল্লীর মানুষজন বলছে সরোবরের জলের উৎস বৃষ্টি নয়, এর আগেও যে অনাবৃষ্টির কাল আসেনি তা নয়, যা ঘটছে তা অভূতপূর্ব।

প্রধান পুরোহিত বললেন, কিন্তু সে কথা শূদ্রজাতির মুখে শুনতে হবে কেন, শূদ্র এবং নারী দুইই নির্বাক থাকবে, এই তো সমাজের অনুশাসন।

শ্রেষ্ঠী বললেন, কথাটা ধীরে বলুন, আপনার দেবদাসীটি বাইরে আছে, তাকে চলে যেতে বলুন।

হাসলেন ব্রাহ্মণ, বললাম না শূদ্র এবং নারী, দুই জাতিরই কোনো ক্ষমতা নেই, দুই জাতিই মনুষ্যেতর প্রাণীর মতো অবলা, যে বসে আছে তার কোনো চিন্তা করার ক্ষমতা আছে, না বোধশক্তি আছে? কিছুই

নেই, আপনি নিশ্চিত থাকুন, তেমন কোনো সম্ভাবনাই নেই, ওরা জানে খাদক অনেক, প্রয়োজনে মহাকাল অরণ্যের বন্য পশুরা, শৃগালে ভক্ষণ করবে সুস্বাদু মাংস, বলে যান শ্রেষ্ঠী।

সুভগ দত্ত গন্ধটি অনুভব করছিলেন। কোনো প্রাণীদেহের পচনের গন্ধ। মুষিক হতে পারে। তিনি বললেন, আপনার কথা সত্যি, তবে নারীজাতির সঙ্গে শূদ্রজাতি তুলনীয় নয়, শূদ্রানী হতে পারে, কিন্তু শূদ্র পুরুষ তো সেনাবাহিনীর হয়ে অস্ত্র ধরে।

কথাটি শুনে পুরোহিতের কণ্ঠস্বর নিম্নখাদে নেমে এল। একটু ঝুঁকে রেশম পেটিকাটি এ হাত থেকে ও হাতে নিতে নিতে তিনি বললেন, আপনার কথা সম্যক উপলব্ধি করতে পারছি না।

সুভগ দত্ত বললেন, শূদ্র জাতি সমাজের সবচেয়ে নিম্নস্তরে অবস্থান করে, কথাটা সেখান থেকে উঠছে, তারাই বলছে অবন্তী দেশে এমন কখনো হয়নি, সাগর শুকিয়ে যায় এ কখনো কেউ শুনেছে, কমলহীন সমস্ত নগর, এ কখনো হয়েছে?

কমলের ঋতু তো পার হয়ে গেছে।

যাক্ আগে নাকি সমস্ত ঋতুতে সরোবরগুলি শ্বেতকমল, নীলকমলে শোভিত থাকত।

মনে নেই?

মনে করুন, কথাটা নিম্নস্তরে উঠছে, কথাটা এখানেও উঠুক, সম্মুখের দিনগুলি কঠিন।

কিন্তু মাঘ ফাল্গুনে তো বৃষ্টি হয়। ব্রহ্মদেব বললেন।

দু বছরের উপর বৃষ্টি নেই, আশা করি এখনও তাহলে না।

বরুণদেব কি অত নির্দয় হবেন, বর্ষা ঋতু যদি নির্জলা যায়, এই সময়ে বৃষ্টি নামে।

মহাকাল করুন বৃষ্টি না নামে যেন, এমন প্রাকৃতিক দুর্বিপাক তো ইচ্ছা করলেই আসে না।

প্রধান পুরোহিতের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠছিল, তিনি আচমকা চিৎকার করে উঠলেন, ললিতা, ললিতা কোথায় তুই?

জবাব পেলেন না দেখে তিনি চট করে উঠে দাঁড়ালেন, দ্বারমুখে গিয়ে চাপা গলায় ডাকলেন, ললিতা, কোথায় চলে গেলি মাগি, দেওয়ালে গা ঘষছিস, এ মাগিটার কামড়ানি বেশি।

নূপুরধ্বনি শোনা গেল। দূর থেকে অন্ধকারে নূপুরধ্বনি এগিয়ে আসছে। দাঁড়িয়ে থাকলেন পুরোহিত। তিনি উত্তেজিত হয়েছেন শ্রেষ্ঠীর কথায়। উত্তেজনা নিরসনের জন্যই উঠে দাঁড়িয়েছেন। দেবদাসীর নূপুরধ্বনি থামল। তিনি চাপাগলায় বললেন, কোথায় ছিলি?

দূরে।

যা, আরো দূরে গিয়ে অপেক্ষা কর, তবে ডাকলে যেন সাড়া পাই।

সুভগ দত্ত উঠেছেন, কীসের গন্ধ, পচাপ্রাণীর মনে হয়, কিছু পচেছে ভিতরে।

তাই! প্রধান পুরোহিত আচমকা শ্রেষ্ঠীর হাত ধরে ফেলেছেন, গন্ধ ভুলে যান মহাশয়, আপনি কি চান অবন্তী দেশ আরো কিছুকাল অনাবৃষ্টিতে থাকুক।

চাই তা। তার জন্য যা প্রয়োজন সব পাবেন।

বরুণ দেবতাকে বিমুখ করতে হবে, সে অতি কঠিন কর্ম, আমিও শাপগ্রস্ত হয়ে যেতে পারি, আমি রাজরোষে পড়তে পারি।

আপনি নিশ্চিত থাকুন, রাজকোষে টান পড়েছে, প্রজার জমিতে ফসল নেই, রাজা আমারই সাহায্য প্রার্থী হন এই সময়ে, রাজভাণ্ডার আমার মুখাপেক্ষী, এতো কারোর অজানা নয়।

গন্ধটা তীব্র হচ্ছিল। ধূপের গন্ধ ছাপিয়ে উঠছিল অন্ধকারে ভারী হয়ে ওঠা পচা প্রাণীটির গন্ধ। দ্বারমুখে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে ভিতরে আবার প্রবেশ করলেন দু'জনে। শ্রেষ্ঠী বলছিলেন, আপনি পারবেন, রাজা কি যজ্ঞের কথা বলেছেন আপনাকে?

বলেন নি, হয়ত বলবেন।

যজ্ঞের অর্থ দেবে এই সুভগ দত্ত, গোপনে যজ্ঞ নষ্ট করুন আপনিই।

ভীত হলেন প্রধান পুরোহিত, আমি যজ্ঞ করব, আমিই নষ্ট করব?

হ্যাঁ, আমি বলছি এই প্রাকৃতিক দুর্বিপাক মানুষের কাছে একসময় আশীর্বাদ হয়ে উঠবে, প্রকৃতি আমাদের সাহায্যকারী শক্তি হয়ে দেখা দিয়েছেন, প্রজারা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে, আপনি কি তা টের পান?

প্রধান পুরোহিত নিশ্চল। শ্রেষ্ঠীর দেওয়া স্বর্ণমুদ্রার পেটিকাটি বুকের উপর আঁকড়ে ধরে বসে আছেন তিনি। ভীতও হয়ে উঠছেন। শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত রাজ-অনুরাগী মানুষ। রাজদরবারে তাঁর অসীম ক্ষমতা। রাজা তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হয়ে ওঠেন কখনো কখনো। তার মুখে এমন স্পষ্ট কথা শুনতে পাবেন তা ভাবেননি তিনি। কদিন আগে এসেছিলেন সুভগ দত্ত সকালে। তখন যা কথা হয়েছিল সব ভাসাভাসা। বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন সুভগ দত্ত, এই খরার কারণ কী, প্রকৃতি মুখ ফেরানোর অর্থ কী, কার জন্য উজ্জয়িনী, অবন্তী দেশের এই অবস্থা, এর থেকে মুক্তি পাওয়ার বিধান কী?

শ্রেষ্ঠী উঠলেন। ধীর পায়ে দ্বারমুখে দাঁড়িয়ে বললেন, ওই দেবদাসী সুভদ্রা আপনার কাছেই থাকুক, আমি উপঢৌকন দিলাম স্বর্ণমুদ্রাসহ, আপনি আপনার লক্ষ্যটি সম্পর্কে অবিচল থাকুন। মহাকাল মন্দিরের প্রধান পুরোহিত, আপনার আঁজ্ঞাই শিরোধার্য। বলতে বলতে সুভগ দত্ত হাঁটু মুড়ে বসে মাথা ঠেকালেন পাথুরে ভূমিতে। কানে শুনলেন, জয় হোক। অবন্তী লক্ষ্মী আপনার প্রতি আরো প্রসন্না হন। অবন্তী দেশের কল্যাণ হোক; কল্যাণের জন্য কোনো পথই পরিত্যাজ্য নয়।

চৌদ্দ

ছায়া দুলছিল। রাজা ভর্তৃহরি ঘুরে দাঁড়ালেন। জানালার কপাট খুললেন। ঠেলে দিলেন। চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল পৌষের আকাশ। দীপের আলো জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে ভেসে গেল। আকাশে চোখ রাখলেন ভর্তৃহরি। শীতের ধারালো বাতাস প্রবেশ করছিল ভিতরে। রাজা তাঁর গায়ের শ্বেত বর্ণের আবিকটিতে স্বচ্ছন্দ হলেন এই বাতাসে। এটি মদ্রদেশীয়। এটির গায়ে চমৎকার সূচীকার্য আছে। শোনা যায় মেষলোমের এই বস্ত্রটি এমন অলঙ্কারখচিত করেছিল ভানুমতি। এখন ভানুমতি স্বীকার করে না। আশ্চর্য! বলে কতদাসী ছিল পিতৃগৃহে। তারা কতইনা গুণবতী ছিল। তাদের কেউ করেছিল বোধহয়। রাজা গিয়ে খোঁজ করতে পারেন কোন গুণবতীর কাজ এইটি। সে খুব সুন্দরী, অক্ষয় যৌবন তার। কিন্তু তাতেই বা রাজার কী? তিনি তো বৈরাগ্য নিয়েছেন।

অবন্তীরাজের মনে পড়ছিল। তিনি খোলা জানালা দিয়ে দূরের ক্ষীর সাগরকে লক্ষ্য করতে থাকেন। আকাশে অষ্টমী তিথির চাঁদ, পৌষের হিম কুয়াশা, ক্ষীর সাগর মিশে গেছে আলো আঁধারে। চেনা যাচ্ছে না, নির্ণয় করা যাচ্ছে না কোথায় সেই সরোবর। সম্বৎসর শ্বেত পদ্মে ভরে থাকে সরোবরের জল, যেন অগণিত চাঁদ প্রতিবিম্বিত হয় জলের চক্ষুতে। অবন্তীরাজের স্থির চক্ষুতে কোনো আলো নেই। প্রভা নেই। নিষ্প্রভ চোখে তিনি তাকিয়ে আছেন অন্ধকারে। এমন কখনো হয়নি যে ক্ষীর সাগরকে এই জানালা দিয়ে দেখা যায়নি। ক্ষীর সাগর দৃষ্টিপথে অদৃশ্য হয়েছে। এ হলো বিরল ঘটনা। ক্ষীর সাগরের পদ্ম শুকায়, ঝরে। কিন্তু কখনোই এক সঙ্গে নয়। কিছু ফুল আছে বারোমাস ফোটে। কিছু ফোটে ঋতুতে ঋতুতে। বর্ষা থেকে হেমন্ত-শীত পর্যন্ত ফুটে থাকে তারা। কিন্তু এমন কি হয়েছে ওই সরোবর জলহীন? পদ্ম আর ফুটে নেই। জলচর হাঁসেরা যায়না ওদিকে। জলের মাছ কবে কখন মরেছে? কোন পাঁকে মাথা গুঁজে আছে তা জানেনা কেউ। রাজা ঘুরে দাঁড়াতে চাইলেন আবার। এবার জানালার দিকে এসে ঘুরে দাঁড়ালেন। জানালা বন্ধ করলেন। কেমন উচ্ছিন্ন লাগছে নিজেকে। গায়ের আবরণটি আলগা করলেন। আবার ঘুরলেন। এগিয়ে যেতে লাগলেন। প্রজ্জ্বলন্ত দীপ পড়ে থাকল পিছনে। সামনের দেওয়ালে রাজার ছায়া দোলায়মান। তিনি স্তব্ধ হলে ছায়াও নিশ্চল হয়। রাজা তাঁর রাক্ষুসে ছায়ার দিকে তাকিয়ে ভাবলেন মঙ্গলনাথে যেতে হবে। গিয়েছিলেন সেই কার্তিক পূর্ণিমায়। তারপর তো কেটে গেছে অনেকটা সময়। পৌষ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথি আজ। পৌষ পূর্ণিমাও এসে গেল, সাতটি দিন বাকি। রাজার পিঠ দেওয়ালে।

এই ঘরটি তাঁর বিদ্যাচর্চার। এই ঘরে বসে তিনি রচনা করেছেন শৃঙ্গারের শ্লোক। ভানুমতিকে বিবাহের পরে শুনিয়েছিলেন। ওই যে পড়ে আছে ভূর্জপত্র, হংসপাখা, মসিপাত্র। রাজা আরো কত শ্লোক রচনার কথা ভেবেছেন। সেই শ্লোক কি হবে শৃঙ্গারের আরো? নাকি হবে শৃঙ্গারবিহীন প্রেমের? অন্ধকার চরাচরের দিকে তাকিয়ে যেভাবে আবেগদীপ্ত হয়ে ওঠে শরীর মন, সেই আবেগই হোক না নতুন শ্লোকের উপাদান। এই কাব্য শৃঙ্গারের হবে না, এ হবে প্রেমের। কিন্তু একটি শ্লোকও রচনা করতে পারেন নি তিনি। অন্ধকার চরাচরে, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে, গোধূলিবেলায়, উষাকালে কে তাঁকে উদ্দীপ্ত করবে? কোন বিরহ-বিষাদ

তাঁকে দিয়ে সৃষ্টি করাবে আরও নতুন নতুন চরণ? রাজার ঘাড় নুয়ে গেল। ভানুমতি! ভানুমতি কেন নয়? ভানুমতি তার ভিতরে তো অনন্ত বিরহের আঁধার বিস্তৃত করেছে যেন। নতুন শ্লোক যেন সেই আঁধার নিয়েই লেখা হবে। বিরহের আঁধারে এ যেন হবে বিরহের কথা। ওই যে ভানুমতি ঘুমিয়ে আছে দক্ষিণের শয়নকক্ষে। একা। রাজা আছেন এখানে। একা। ভানুমতি সেই মস্ত পালঙ্কে একা। রাজা ভর্তৃহরি তাঁর বিরহ নিয়ে একা। একা হলেই তো বিরহ জন্মায়। দক্ষিণের ওই শয়নকক্ষ যেন শত যোজন দূরে। মনে পড়ে ভর্তৃহরির শ্লোক রচনার সময় জেগে বসে থাকত তরুণী বধূ। থাকত দরজার ওপারে, ভূমিতে আসীনা। যতক্ষণ না কবি তাঁর রচনা শেষ করে শয্যায় যান বধূ কী করে শয্যা গ্রহন করে? আবার স্বামীর পাশে যে বসে থাকবে তাই বা কী করে হয়। কবি তাঁর শ্লোক রচনায় গভীর নিমগ্ন। বধূ কাছে গেলে সেই নিমগ্নতা ভেঙে যেতেও তো পারে। কত সন্ধ্যা, রাত্রি গেছে, একটিও শব্দ প্রস্ফুটিত হয়নি ভূর্জপত্রে। হংসপাখা মসী ছুঁয়েছে, হংসপাখা আর ভূর্জপত্র ছোঁয়নি।

কবি বলতেন, সৃষ্টির রহস্যটাই জানেনা মানুষ, যে সৃষ্টি করে সেও জানেনা, গতকাল দুইটি শ্লোক রচনা করেছি। আজ একটিও নয়, পারিনি।

তরুণী বধূর দু চোখে বিস্ময়, উদ্ভাসিত চোখে সে জিজ্ঞেস করেছে, সৃষ্টি কর্তা যদি না জানে, তবে সৃষ্টি হয় কী করে?

জানিনা।

বধূ তার দুই চোখ খোলো জানালা আকাশে স্থাপিত করত যেন, গ্রহ, তারা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, এই যে ব্রহ্মান্ড, এর সৃষ্টি কর্তাও কি জানেনা কীভাবে কী হলো?

রাজা বললেন, হয়ত জানেন, কিন্তু যদি জেনেই ফেলেন সৃষ্টির রূপটি আগাম, তাহলে তিনি কী সৃষ্টি করলেন? যার অস্তিত্ব রয়েছে তাই-ই তো জানা যায়, আর অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব দেওয়াতেই তো সৃষ্টির আসল আনন্দ।

কত জিজ্ঞাসা ভানুমতির। কবির দিকে কীভাবে চেয়ে থাকা। মধ্যরাতে ঘুমন্ত কবির দিকে চেয়ে জেগে থাকা। জ্যোৎস্না কীভাবে সরে যায় কবির মুখমন্ডল থেকে তা দেখতে দেখতে ঘুমে ঢলে পড়া, পরদিন অকপট হওয়া।

ভানুমতি বললেন, রাজা সন্তান ধারণ করাও...।

রাজা বললেন, এর চেয়ে বড় সৃজনকর্ম আর নেই, শত সহস্র শ্লোক রচনা করেও ওই সন্তানের কাছে আমি পৌঁছতে পারব না।

ভানুমতি জিজ্ঞেস করলেন, জ্ঞান আগে না সৃষ্টি আগে?

রাজা বললেন, জ্ঞানের সন্ধান পাওয়াই তো সৃষ্টি, সৃষ্টকর্ম থেকেই তো জ্ঞানের উন্মেষ হয়।

নাকি জ্ঞান থেকেই সৃষ্টির প্রেরণা?

কবি বললেন, অসত্য নয়।

তবে জ্ঞানের উন্মেষ?

তাও অসত্য নয়।

অসত্য কোনটি তা হলে?

রাজা বললেন, এই ব্রহ্মান্ড, আকাশ, মহাবিশ্ব সবই সত্য, অসত্য কোথায় তা জানি না।

ভানুমতি বললেন, সত্য থাকলে অসত্যও থাকবে, যা আছে তা না থাকলেই তো অসত্য হয়ে যাবে সত্য অসত্য কী?

রাজা বললেন, অজ্ঞানতা।

অজ্ঞানতা কী?

যা সৃষ্টির বিপক্ষে।

সৃষ্টি কী?

আলো, ভোরের আলো দেখেছ ভানুমতি?

শুনতে শুনতে ভানুমতির দু'চোখ আলোয় ভরে যায়। সে ধীরে ধীরে বলে, কত আলোই না দেখেছি রাজা, ভোরের আলো, চাঁদের আলো, তারার আলো, তোমার চোখের আলো, তুমি কি জানো, যখন

তোমার হাতের হংসপাখাটি ভূর্জপত্রের উপর রচনা করতে থাকে শ্লোকটি তখন তোমার চোখে কোন আলো ফুটে ওঠে, সেই আলোও তো জ্ঞান।

এখন রাজার চোখে অজ্ঞানতার বিষাদ। মন বিশৃঙ্খল হয়ে আছে। বিশৃঙ্খল মনে শ্লোক রচনা করা যায় না। রাজার মনে হচ্ছিল মঙ্গলনাথে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। এখন দু'চোখ অনিদ্রায় জেগে থাকবে। অনিদ্রা দীর্ঘ হতে হতে রাতই ফুরিয়ে যাবে হয়ত। শ্লোক রচনার ব্যর্থতা, ভানুমতির প্রত্যাখ্যান, একাকী নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন থাকা, সবই মনের বিশৃঙ্খলার অন্তর্গত। রাজা ঘর থেকে বেরিয়ে দীপের আলোয় ঈষৎ আলোকিত, আলোছায়ায় ঢাকা দীর্ঘ অলিন্দ বেয়ে হাঁটতে থাকেন। অলিন্দটি সঙ্কীর্ণ, মধ্যভাগে দাঁড়িয়ে দুটি হাত দু'দিকে প্রসারিত করলে দেওয়ালে হাত তো বাঁধা পাবেই, সম্পূর্ণ প্রসারিত করা যাবে না। রাজা অন্ধের মতো হাঁটছিলেন। দেওয়ালের প্রস্তর গাত্রে একহাতের তিনটি আঙুল ঘষে যাচ্ছিল। দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। দক্ষিণ দিকে রাজা রানীর শয়নকক্ষ। রাজা তাঁর মনশ্চক্ষে ভানুমতিকে দেখতে পান।

এখনতো ওই দেহখানি, ওই যৌবনে অলঙ্কৃত ভানুমতির অঙ্গ স্পর্শের কোনো স্পৃহাই জাগেনা রাজা ভর্তৃহরির ভিতর। সুখ আর কামনা তো পরস্পরের পরিপূরক হতে পারে না। কাম নিবারণ কি সুখ? ভানুমতি কি সুখের আধার? তাই যদি হতো রাজার ভালবাসার প্রতিদান দিতে বিমুখ হত না ভানুমতি। স্ত্রী অঙ্গ কি সমস্ত সুখের আবাস? তাহলে রাজার মনে, শ্রেষ্ঠীর মনে বিষাদের জন্ম হত না। রমণীরত্নের অভাব কোথায় রাজার রাজত্বে? মানুষ তৃষ্ণার্ত হলে শীতল জলপানে শান্ত হয়, তৃষ্ণা নিবারণ করে, ক্ষুধার্ত হলে অন্ন গ্রহণ করে ক্ষুধার অনল থেকে মুক্ত হয়, মানুষ কামার্ত হলে রমণীকে গ্রহণ করে, সে রমণী পত্নী হোক বা বারাঙ্গনা হোক। কামাগ্নি তো তৃষ্ণার মতো, ক্ষুধার মতোই সাময়িক জ্বলে ওঠা আগুন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম হলো জীবিত প্রাণীর বেঁচে থাকার উপকরণ। মনুষ্যেতর প্রাণীরও ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, কাম আছে। ক্ষুধা তৃষ্ণার অন্নজলের মতোই কামনা বাসনা নিবারক রমণী অথবা পুরুষ। এসব তো বেঁচে থাকার উপকরণ। কিন্তু সুখের উপাদান তো নয়, বেঁচে থাকা সুখ নয়। সুখ বেঁচে থাকার বাইরে আরো কিছু। অন্ন জল, রমণী, মানুষের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামনারূপ ব্যাধির প্রতিষেধক। মানুষ কি তা জানেনা?

রাজা ভর্তৃহরি প্রবেশ করলেন শয়নকক্ষে। এই ঘরের কোণে একটি ঘৃতের প্রদীপ। সেই নরম হলুদ আলো পালঙ্কের কিনারা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। পালঙ্কের অন্ধকারে ভুবনমোহিনী রূপ নিয়ে ঘুমিয়ে আছে ভানুমতি। রাজা ঘরের ভিতরে পা রেখেই সেই রূপের আঁচ পেলেন। এই আঁচ কি আগুনের? রূপের আগুন! এই আগুন কি কামনার? ভোগের! রাজার দুই চক্ষু মুদিত। মুদিত চক্ষু নিয়েও তিনি তাঁর দৃষ্টি থেকে ভানুমতিকে অদৃশ্য করতে পারছেন না। এখন যদি জেগে ওঠে ভানুমতি, অবন্তীলক্ষ্মী, তার দু চোখের তারার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হবে তাঁকে। যেন আকাশে ফুটে ওঠা নতুন তারাকেই দেখবেন রাজা। তাঁর ভিতরে সৃষ্টি হতে থাকবে নতুন সব রঙ। নতুন শ্লোক। যদি আহ্বান করে ভানুমতি রাজা যেন পতঙ্গের মতোই এগিয়ে যাবেন অগ্নিশিখাময় ওই রূপের দিকে। বিড়বিড় করলেন ভর্তৃহরি, হায় ভানুমতি! ডাকো, আমাকে ডাকো।

রাজা প্রদীপটি দু'হাতে তুলে নিলেন। উচ্চতা পাওয়ায় প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো আবৃত করল ঘুমন্ত ভানুমতির দেহটিকে। যে রূপ ছিল অন্ধকারের আড়ালে তা প্রকাশিত হলো। প্রদীপের আলো যেন ভানুমতির রূপের আশ্রয় হলো। রাজা তাঁর দুই চক্ষু মেলে ধরলেন। কী দেখলেন? চাঁদের মতো মুখখানিতে নীলকান্তমণির ছায়া। গুরুভার স্তন যুগল, শীতের কম্বলে আবৃত থাকা সত্ত্বেও তার রেখা খুব স্পষ্ট। ব্যাকুল হলেন তিনি। তাঁর দুচোখ ভানুমতির রূপে বিহ্বল হলো। ঘুমন্ত রমণীর রূপে যে রূপের অতিরিক্ত সৌন্দর্য ফুটে ওঠে তা প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন রাজা। পরনারীর মতো তিনি দেখতে লাগলেন ভানুমতিকে। চাপা স্বরে ডাকলেন, ভানুমতি!

ভানুমতির ঘুম ভাঙেনা। রাজার হাতের প্রদীপ কাঁপছিল। প্রদীপটি স্বস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে চঞ্চল রাজা স্থির হতে চাইলেন। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আবার ডাকলেন, ভানুমতি ওঠো; ভানুমতি।

রাজা টের পাচ্ছিলেন তাঁর সমস্ত শরীরে প্রবেশ করেছে আগুন। কোন আগুন? ভানুমতির রূপের? সেই আগুনে পুড়ছেন তিনি। আত্মদহনে জ্বলছেন। তিনি স্পর্শ করতে পারছেন না ভানুমতিকে, কিন্তু ভানুমতি তার সমগ্রসত্তা নিয়ে প্রবেশ করেছে তাঁর ভিতরে। রাজা বসে পড়েছেন বরফ শীতল মেঝেয়।

চিত হয়ে শীতল পাথরের উপরে শুয়ে পড়লেন। দুই চোখ মেলে দিয়েছেন ছাদের দিকে। প্রদীপ শিখা কাঁপছে। রাজা নিজেকে রক্ষা করছিলেন। ক্রমশ তাঁর দেহের আগুন নিভে যাচ্ছিল। তখন তাঁর অগোচরে পালঙ্কের উপর জেগে উঠেছেন ভানুমতি। পালঙ্কে বসেই ভানুমতি দেখতে পাচ্ছিলেন রাজাকে। অবন্তীর অধিপতি ভূমিশয্যায় শায়িত।

ভানুমতি ডাকলেন, কী হলো ওখানে যে!

রাজা নিশ্চল হয়ে আছেন। তার চঞ্চল শরীর স্থির হচ্ছে।

ভানুমতির অসহ্য হলো, কর্কশতা এলো কণ্ঠধ্বনিতে, ডেকে উঠলেন, এমন আত্মপীড়নের কারণ কী রাজা, আমি তো ঘুমোতে পারব না।

রাজা ধীরে ধীরে উঠে বসলেন অন্ধকারে। দাঁড়ালেন। ভানুমতির মনে হলো মৃত্তিকাগর্ভ থেকে উঠে এলেন যেন অবন্তীরাজ। ভানুমতির মনে হলো পাথর ফাটিয়ে মাথা তুললেন রাজা ভর্তৃহরি। ভানুমতির মনে হলো শূন্য অন্ধকার থেকে আবির্ভূত হলেন অবন্তীর রাজা। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন ভানুমতি। রাজা ভর্তৃহরি, অবন্তী অধিপতি রাজা ভর্তৃহরি, স্বামী ভর্তৃহরিকে কেমন অচেনা মনে হয় যেন। এখন আর কাছের মনে হয় না মানুষটাকে। মনেই হয়না এই মানুষই রচনা করেছিলেন শৃঙ্গারের শ্লোক। বিশ্বাস হয়না রতিবিলাসী, কামনা বিহ্বল সেই রাজপুরুষ এখন নিজেকে কামনারহিত করে তুলতে শীতল মেঝেয় শয়ন করেন। বোঝেননি কি ভানুমতি? টের পাননি কি তিনি? আর নিজেও তো ভানুমতি কোনো আগ্রহই বোধ করেন না রাজার প্রতি। কী আশ্চর্য! জীবন এমন! এক সময় এই পুরুষের কণ্ঠস্বরেই তাঁর সর্বঅঙ্গ বেজে উঠত যেন। শিহরিত হতেন তিনি একা একা এই মানুষটির কথা স্মরণ করে। কী উদ্দাম ছিল সেই প্রেমময় দিনগুলি। রাজা এই হিমেল রাতে মেঝেয় শুয়েছেন, শরীরকে শীতল করেছেন তাহলে তাঁর দেহ উষ্ণ হয়েছিল। মেঝেতে শোওয়ার আগে রাজা নিশ্চয় দাঁড়িয়ে ছিলেন এই শয্যার কিনারে। তখন ভানুমতি নিজে ছিলেন ঘুমিয়ে। রাজা তাঁর ঘুমন্ত রূপ দেখেছিলেন নিশ্চয়। রাজা ভর্তৃহরির এ ছিল এক গোপন অভ্যাস। কতদিন ঘুম ভেঙে দেখেছেন রানী তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছে দুটি চোখ। রাজা তো বলতেন, ভানুমতির অজান্তে ভানুমতিকে দেখতে ভাল লাগে তাঁর। সেই অভ্যাসই ফিরে এসেছিল রাজার ভিতরে। উষ্ণ শরীরকে নিয়ন্ত্রণে আনতে রাজা হিম শীতল পাথরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভানুমতির মাথা টলমল করে ওঠে। রাজার প্রেম এখন অসহ্য লাগে তাঁর। রাজা যে কামনায় উষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন তাঁর ঘুমন্ত শরীরের দিকে চেয়ে তা অনুধাবন করে শরীর যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে বসলেন ভানুমতি।

রাজা বললেন, সপ্ত সরোবর জলশূন্য, মাটি পাথর, কতদিন উজ্জয়িনীর আকাশে মেঘ নেই, আমি কী করে কুসুমশয্যায় শয়ন করি?

রানী চুপচাপ। তাঁর মনে হচ্ছিল আবার ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়লে ওই রাজপুরুষ প্রদীপ হাতে আবার তাঁর রূপ দেখতে থাকবে। কামনায় জর্জরিত হবে। সেই কামনা থেকে মুক্ত হতে হিমশীতল পাথরে শয়ন করবে। রাজার সেই স্পর্ধা নেই যে তাঁকে স্পর্শ করে। স্পর্শের আগেই তো ঘুম ভেঙে যাবে ভানুমতির। আশ্চর্য! ঘুমের ভিতরেও যে কীভাবে টের পান ভানুমতি।

রাজা বলছেন, আবার মঙ্গলনাথে যেতে হবে।

রানী নিশ্চল। স্তূপ অন্ধকারের মতো বসে আছেন ভানুমতি। প্রায় অনস্তিত্ব হয়েই গেছেন তিনি। রাজা ভর্তৃহরি যেন অন্ধকারের সঙ্গে কথা বলছেন। নিজের সঙ্গে কথা বলছেন। তিনি বলছেন, আচার্য বৃষভানু কী বলেন শোনা যাক, আকাশে নাকি নতুন একটি তারা জন্মাচ্ছে, তার ফলে এই অনাবৃষ্টি ফসলহীনতা।

ভানুমতি বললেন, আমি এবার ঘুমোব।

রাজা ব্যথিত হলেন, আমার কথার গুরুত্ব অনুধাবন করছ রানী?

কী হবে?

তুমি অবন্তীর রানী, অবন্তীলক্ষ্মী, তুমি যাবে আমার সঙ্গে, বৃষভানুর আশ্রম হয়ে আমরা যাব মহাকাল মন্দিরে, প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলব।

রানী আবার নীরব। নিশ্চল। জমাটবাঁধা অন্ধকারে আড়াল হয়ে আছেন যেন তিনি। রাজা নিম্নস্বরে

বলছেন, এমন কখনো হয়নি আগে। সাতটি সরোবরই জলহীন, একটি পদ্মও কোথাও নেই। আমি অবন্তীর রাজা, আমি কী করে এখন ঘুমোই, কুসুম শয্যাও যে এখন কন্টক শয্যা হয়ে উঠবে। হিম শীতল কর্কশ পাথর হয়ে উঠবে। অবন্তীর এখন দুর্দিন, কোনো জমিতে ফসল নেই, এবার গোধূম বপন করা হয়নি, যব, ধান, ওঠেনি..., রাজা বলে যাচ্ছিলেন, রাজসভায় জ্যোতিষীরা বলছেন উজ্জয়িনীর আকাশে নতুন একটি তারা দেখা দিয়েছে। সেই জ্যোতিষ্কটির প্রভাবে বর্ষার মেঘ উধাও। মহাকাল মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের দূত এসেছিল, তিনি খুব উদ্বিগ্ন, সময় চেয়েছেন আমার কাছে। আমি বলেছি অধিক রাত্রে তাঁর নিকটে যাব। প্রধান পুরোহিতকে রাজসভার আসতে দেখলে কথা উঠবে, মানুষ কল্পনা করতে ভালবাসে...।

রানী ধীরে ধীরে শয়ন করলেন পালঙ্কে। অন্ধকারে রাজা ভর্তৃহরি শুনতে পাচ্ছিলেন ভানুমতির শ্বাস নেওয়ার শব্দ। অন্ধকারে ভানুমতির শরীরের রেখা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন ভর্তৃহরি। ভানুমতি মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে শুয়ে আছে। ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়লেন তিনি ভানুমতির উপর। সুগন্ধ টের পাচ্ছিলেন তিনি। ভানুমতির শরীরের গন্ধ। মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে রাজার। তিনি অস্ফুট গলায় ডেকে ওঠেন, প্রিয়ে, ভানুমতি।

ভানুমতি শুনতে পেয়েছেন কিনা তা ধরতে পারলেন না ভর্তৃহরি। তাঁর সর্ব অঙ্গ আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল ভানুমতির সৌরভে। দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে ভানুমতির শরীর স্পর্শ করতে চাইলেন তিনি। তাঁর মনে হচ্ছিল ভানুমতি তাঁকে আবার সুযোগ দিক। আবার তাঁরা পরস্পর পরস্পরের দর্পণ হয়ে ওঠেন যেন। থরথর করে কাঁপছিলেন তিনি। অন্ধকারে তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন ভানুমতির শরীরে বিপুল বিহ্বলতা। পশম বস্ত্রের ভিতরে ভানুমতির শরীরখানি শ্বাস প্রশ্বাসে থমথম করছে। তিনি স্পর্শ করলেন। ভানুমতি এবার টের পেয়েছেন, চাপা গলায় বললেন, শীত খুব, তুমি যেতে পারো, আমি যাব না।

রাজা ভানুমতির কপাল স্পর্শ করতেই শিউরে উঠে ছিটকে সরে গেলেন ভানুমতি, কী ঠান্ডা, যেন মৃতের হাত, তুমি যাও রাজা।

রাজা সরে এলেন। আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন তিনি। দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। রমণী বা পুরুষ যখন কেউ কারোর প্রতি বিমুখ হয়, এভাবে হয়ে থাকে। একের স্পর্শ অন্যের কাছে মৃতের স্পর্শ মনে হয়। ভানুমতির প্রত্যাখ্যানে রাজা নিজে প্রত্যহ সরে আসছেন হয়ত এই পালঙ্ক থেকে, এই শয়নকক্ষ থেকে, ভানুমতির চোখের সামনে থেকে, কিন্তু কখনো কখনো তো বিস্ফোরণ ঘটে। যে বিস্ফোরণ ঘটল এই এখন। ভানুমতির অস্তিত্ব যে এখনো এই পুরুষ মানুষটির সত্তায় প্রবল। তিনি এখন এই মুহূর্তে মরা মানুষের মতো হয়ে গেলেন ভানুমতির কাছে। আর ভানুমতিও সেইরকমই হয়ে যাচ্ছেন কোনো আহ্বানেই সাড়া না দিয়ে।

রাজা দেবপথে প্রবেশ করছেন হাতে একটি দীপ নিয়ে। এই গোপন পথটি শিপ্রাতীরে উঠেছে একদিকে, অন্য দিকে গন্ধবতীর তীরে, মহাকাল মন্দিরের নিকটে। দুটি পথই গভীর, নির্জন। এর খোঁজ প্রধান সেনাপতি, তাঁর বৈমাত্রেয় অনুজ বিক্রম ব্যতীত আর কেউ জানে না। দেবপথে অন্ধকারে প্রবেশ করতে করতে থমকে দাঁড়ালেন রাজা ভর্তৃহরি। ঘুমন্ত কবুতরগুলি আচমকা জেগে উঠল যেন। ঘুমের ঘোরে বকম বকম করতে করতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল তারা। রাজা এদিক ওদিক তাকিয়ে দীপ হাতে ঢুকে পড়লেন দেবপথে। হাঁটতে লাগলেন।

পনের

রাজা হাঁটছিলেন দেবপথ ধরে। এই পথে এখন তাঁকে একা যেতে হয়। আগে কখনো তা হয়নি। ভানুমতিই তাঁকে টেনে নিয়ে গেছেন গভীর রাত্রে মহাকালের দিকে। গন্ধবতী নদীর কূলে, আকাশের নীচে, পরম জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে। শিপ্রার তীরেও গেছেন তাঁরা এই পথে। কিন্তু তা কবে? শেষ বর্ষার আগে। শেষ বর্ষা কবে এসেছিল? গেল আষাঢ়, শ্রাবণের আগের আষাঢ়, আগের শ্রাবণ তার আগের বছর। তার আগে বৈশাখ, সেই বৈশাখী রাত্রিতে গভীর নির্জন অন্ধকারে দুইজনে হাত ধরে হয়ত গেছেন মহাকালে, নতুবা শিপ্রার ধারে। নদীতীরে, আকাশের নীচে, তারার আলোয় পরস্পর পরস্পরকে গভীরভাবে চিনেছেন। কতদিন মিলিত হয়েছেন দুজনে সেই অতুল নৈঃশব্দের ভিতরে। শরীর ছুঁয়েছে

যখন শরীরকে, সেই ধ্বনিও যেন শুনতে পেয়েছেন তাঁরা। সেই ধ্বনি কী মধুময়! প্রতি অঙ্গ ছুঁয়ে যায় প্রতি অঙ্গ তার। তারপরই তো বর্ষা এল। কতবার বর্ষা এসেছে, গেছে বসন্ত, গ্রীষ্ম। কতবার বর্ষার পরে শীত এসেছে, শীতের আগে হেমন্তের সন্ধ্যা। হেমন্তের আগে শরতের সকাল। কী মায়াময় ছিল সেই পৃথিবী। বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত।

ভর্তৃহরি টের পাচ্ছেন, সেই বর্ষার স্মৃতিও ধূসর এখন। সেই বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, চৈত্র, ফাল্গুন মাস বসন্ত ও গ্রীষ্মের স্মৃতিও অলীক হয়ে গেছে, যেমন অলীক হয়ে গেছে শরৎ, হেমন্তের স্বপ্ন। কতকাল আগের কথা সেসব? কোন জন্মের? দেবপথ থেকে আকাশের নীচে উঠে এসেছেন অবন্তীরাজ। দীপটি ওই পথেই রেখে দিলেন একটি পাথরের আড়ালে। এবার তিনি তারার আলোয় পথ চলবেন। শুক্লা অষ্টমীর চাঁদের আলোয় পথ চিনে নেবেন। জ্যোৎস্না এখন কুয়াশায় জড়িয়ে ঘোলাটে করে তুলেছে চরাচর। মাথাটি পশম বস্ত্রে মুড়ে রাজা দ্রুত হেঁটে যাচ্ছেন এই আশ্চর্য পৃথিবীতে যেখানে আর কোনও মানুষ জেগে আছে কিনা ধরা যায় না। ওই যে দেখা যায় কণকশৃঙ্গ। মহাকাল শীর্ষেই এখন চন্দ্রের অবস্থান। রাজা দাঁড়িয়ে সেই বিরল দৃশ্যটি দেখলেন। প্রণাম করলেন মাথা নত করে। আবার হনহন করে হাঁটতে লাগলেন। দ্রুত। যেন গোপন অভিসারে চলেছেন তিনি। এইভাবেই তো আত্মগোপন করে যায় নগরীর প্রেমিক-প্রেমিকারা। এদিক ওদিক চকিত দৃষ্টি ফেলে গন্ধবতীর তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে তিনি মহাকাল মন্দিরের গোপন প্রবেশপথে এসে দাঁড়ালেন। শত্রু আক্রমণে, বিপদে এইপথেই নিষ্ক্রান্ত হওয়া বিধেয়। ধীর পায়ে সেই সুড়ঙ্গ পথে অন্ধকারে প্রবেশ করলেন রাজা। অতি সন্তর্পণে, হাত ও পায়ের স্পর্শে স্পর্শে পথ বুঝে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এসে উঠলেন মন্দিরের পশ্চাত দিকে। এগিয়ে এসে অলিন্দে পা রাখলেন। অপ্রশস্ত অনুচ্চ অলিন্দ ধরে এগোতে লাগলেন। এই দীর্ঘ অলিন্দটি তাঁর চেনা, এই মন্দিরের প্রতিটি কোণ তাঁর চেনা। অন্ধকারে কোনও অসুবিধে হয় না। অবন্তী দেশটিও তিনি চেনেন যতটা পারেন। অন্ধকারে তিনি হেঁটে যেতে পারেন অবন্তীর পথে পথে। উজ্জয়িনী নগরটি তো তাঁর নখদর্পণে। চোখ বুঁজলেই উজ্জয়িনীর কখন কোথায়, কোন পথের উপর ছায়া পড়ে, কোথায় কখন সেই ছায়া কত দীর্ঘ হয়, তা মনে পড়ে তাঁর। পূর্ণিমা রাতে কোন পথ কতটা জ্যোৎস্নায় ভিজে থাকে তা তিনি জানেন। এই যে দীর্ঘ অলিন্দ, এর কোথায়, কোন কোন বিন্দুতে সকালের প্রথম রোদটি এসে পড়ে তা তিনি জানেন। এই অলিন্দেরই অন্যভাগের কোনো বিন্দু থেকে শীতের রোদটি নিঃশেষ হয়ে যায় অপরাহ্ন বেলায় তা তিনি জানেন। জানেন সেই রোদ বৈশাখের অপরাহ্নে শুয়ে থাকে কোন জায়গাটিতে।

অলিন্দ প্রায় পার করে এলেন রাজা ভর্তৃহরি। একটি দীপের আলো তাঁর লক্ষ্য ছিল। দীপটি অন্ধকারে একটি নিঃসঙ্গ তারার মতো জ্বলছিল। তেল কমে আসায় দীপশিখা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। দীপের স্থান ছিল দেওয়ালের ক্ষুদ্র কুলুঙ্গিতে। দীপের নীচে যে অন্ধকার সেখানে শয্যা বিছিয়ে শুয়েছিল দেবদাসী ললিতা। শয্যাটি পশুরোমের, কিন্তু খুবই কর্কশ, নিম্নমানের পশমবস্ত্র। সর্বাঙ্গে বিদ্ধ হয় রোমের অগ্রভাগ।

অদূরেই প্রবীণ পুরোহিতের ঘর। দেবদাসী যেন পাহারা দেয় তাঁর নিদ্রাকে। প্রধান পুরোহিতের নিদ্রা খুব অভিমানী। এমনও রাত যায় যে বারবার তাঁকে উঠতে হয়। প্রধান পুরোহিত বয়সজনিত নানা পীড়ায় ভোগেন, ফলে তাঁর নিদ্রা গভীর হয় না। সেই নিদ্রাকে অচঞ্চল রাখার দায়িত্ব দেবদাসী ললিতার। যে কোনও উপায়ে। প্রধান পুরোহিত জেগে আছেন আর সে ঘুমিয়ে, এমন কখনো হয় না। হতে পারে না। তার উপরে সেই আদেশ নেই। দ্বিজদেব তো মহাকালের প্রতিনিধি। তাঁর ইচ্ছাই মহাকালের ইচ্ছে। দ্বিজদেবের নিদ্রার সময়টুকুতেই সে নিদ্রা যেতে পারে। সেই অভ্যাস হয়েছে তার। অন্যথা হয় না, হলে প্রধান পুরোহিতের সেবাকার্যের অধিকারচ্যুত হবে সে। দ্বিজদেব রুষ্ট হলে এই মহাকাল মন্দিরে তার স্থান হবে না। মহাকাল যদি তাকে পরিত্যাগ করেন তার স্থান কোথায় হবে তা ভাবতেও পারে না সে। ভয় করে।

দেবদাসী ললিতার তন্দ্রা এসেছিল। সেই তন্দ্রার ঘোরে সে যেন স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্নে মহাকাল অন্য বেশে তার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। সে স্পষ্ট দেখছিল গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে দীর্ঘ অলিন্দ ধরে ভগবান মহাকালেশ্বর হেঁটে আসছেন তার দিকে। কী রূপবান পুরুষ। কী তেজময় তিনি! হায় মহাকাল! তোমার চরণেই তো আশ্রিত আমি। তোমাতেই নিবেদন করেছি আমি আমার সর্বস্ব।

তন্দ্রাচ্ছন্নতা আচমকা ভেঙে যায় রাজার পায়ের শব্দে, যদিও সেই শব্দ এতই অস্পষ্ট যে তা প্রায়

নৈঃশব্দেরই নামান্তর। কিন্তু ললিতার নিদ্রা অথবা তন্দ্রা তাতে ভাঙবেই। দ্বিজদেব তাঁর শয্যায় পাশ ফিরলেও তা টের পায় ললিতা। রাজার নিঃশব্দ পদধ্বনি না হোক, সে হয়ত বা ভূমির কম্পন টের পেয়েছিল যেভাবে টের পায় সতর্ক সরীসৃপ। তার আতঙ্ক এমনই। ভীতমুখে উঠে বসেছে সে শতচ্ছিন্ন পশম বস্ত্রে গা ঢেকে। শীতে কাঁপছিল সে, অথবা সম্মুখে একটি মানুষের উপস্থিতি তাকে ভয়ার্ত করে তুলেছিল। মানুষটির দীর্ঘ অবয়বে সে টের পেয়েছে ইনি দ্বিজদেব নন। তিনি খর্বকায় মানুষ। এ জন অন্য মানুষ। অন্য কেউ। কিন্তু কে? ভয় বিস্ময় তাকে ক্রমশ অনড় করে দিচ্ছিল। ধীরে ধীরে কম্পন থেমে আসছিল। সে অবাক হয়ে দেখছিল আগন্তুকের মাথার আবরণ সরে যাচ্ছে। সে আবার কাঁপতে শুরু করল। ইনি কে? যে স্বপ্নের ভিতর আচ্ছন্ন ছিল সে, সেই স্বপ্ন যেন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজার মুখখানি তাঁকে বিস্ময়ে বিহ্বল করে তোলে। ভর্তৃহরির মুখে দীপের আলো পড়েছিল। সেই নরম হলুদ আলোয় মুখের প্রসন্নভাব আরও গভীর হয়েছিল। রাজা জিজ্ঞেস করলেন নিম্নস্বরে, দ্বিজদেব ঘুমিয়ে?

দেবদাসী নুয়ে পড়েছে। রাজাকে সে চিনতে পারেনি। একবার তো দূর থেকে দেখেছিল। একবারই। রাজা-রানী যখন আসেন মহাকালে সকল দেবদাসীর তো অধিকার থাকে না তাঁদের নিকটবর্তী হওয়ার। সে মিলিয়ে নিচ্ছিল তন্দ্রার ঘোরে দেখা স্বপ্নের চিহ্নগুলিকে। নুয়ে যাচ্ছিল আরও। যুক্ত করে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে সে রাজার মুখোমুখি। অস্ফুট স্বরে কেঁদে উঠে, হায় মহাকাল।

রাজার পায়ে মাথা নত করল দেবদাসী ললিতা। দেবদাসী নিঃশব্দে অশ্রুপাত করছিল রাজার পায়ে। রাজা কয়েক দণ্ড পরে সরে দাঁড়ালেন। তাঁর কানে আসছিল দেবদাসীর বিলাপ ধ্বনি। 'মহাকাল' নামটি স্পষ্ট ধরতে পারছিলেন, বাকিটা গোঙানো শব্দ। সরে দাঁড়িয়ে ভর্তৃহরি বললেন, রোদন থামাও, দ্বিজদেবকে জাগাতে হবে।

ললিতা দাসী থরথর করে কাঁপছিল। সে কান্না সম্বরণ করতে চাইছিল। পারছিল না। আবেগ-সর্বস্ব নারী, সে ধরেই নিয়েছে মহাকালের পায়ে মাথা ছোঁয়াতে পেরেছে। সে জেনেই গেছে স্বপ্নের পথ ধরে মহাকালেশ্বর শিব তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ জন্মে এ ঘটনা ঘটবে কে ভেবেছিল? এই মন্দির অলিন্দের পাথরে মাথা ঠুকে যৌবন ক্ষয় করতেই না তার এখানে আসা। সেইভাবেই তো যৌবন ক্ষয় করে কতজন চলে গেছে নগরীর বাইরে বারাঙ্গনা পল্লীর ক্লেদে। কতজন হয়ে গেছে নিরুদ্দেশ। কিন্তু যে পেয়েছে মহাকালের দর্শন, তার জীবন গেছে বদলে। কে পেয়েছে এই ভগবানের দেখা তা জানে না ললিতাদাসী, কিন্তু এটি জানে প্রবীণ পুরোহিত দ্বিজদেব সাক্ষাৎমানুষ হলেও মহাকাল ভগবানের প্রতিনিধি। মহাকাল ভগবানের সঙ্গে তাঁর কথা হয়। মহাকালের নির্দেশ তাঁর মাধ্যমেই প্রেরিত হয়। তিনি পুণ্যবান মানুষ। ক্ষমতাবান মানুষ। ঐশ্বর্যবান মানুষ। মণিরত্ন অলঙ্কার তাঁর সঞ্চয়ে অঢেল। এই নগরেই আছে তাঁর প্রাসাদোপম অট্টালিকা। তাঁর মতো সুখী মানুষ উজ্জয়িনী নগরে কে আছে?

ললিতাদাসী অস্ফুটস্বরে বলছিল, হায় মহাকাল, প্রসন্ন হও, কৃপা কর, অভাগিনী বড় দুঃখী।

রাজা ভর্তৃহরি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন। যুবতীর কপাল আবার তাঁর পদতল স্পর্শ করছিল। তিনি সরে দাড়ালেন। তখন ললিতা মাথা তুলে দুটি হাতে রাজার দু'টি পা জড়িয়ে ধরেছে, বিনবিনে কান্নায় চূর্ণ হতে হতে রাজার দুটি পা বুকে ধারণ করেছে, কাঁদছে, অভাগিনী বড় দুঃখী, হে ভগবান তুমি সব দ্যাখো, কোনও কিছুই তোমার অজানা নয়, হতভাগিনী এখন দ্বিজদেবের সেবাদাসী, কৃপা কর, প্রসন্ন হও, দ্বিজদেবকে আমি সর্বস্ব দিয়ে সেবা করি হে প্রভু, এই জীবন এই যৌবন তাঁরই প্রতি নিবেদিত, তিনি তৃপ্ত হলে তুমিও তৃপ্ত হবে তা আমি শুনি, কিন্তু মন সায় দেয় না।

কাঁদতে কাঁদতে ললিতাদাসী অনুভব করছিল নীলকণ্ঠ শিবের প্রস্তরমূর্তি এখন আর প্রস্তরের নেই। রক্তমাংসের হয়ে গেছে। রক্তমাংসময় মানুষের রূপ ধরে মহাকাল ভগবান তার সম্মুখে। সে শিহরিত হলো। আর বক্ষদেশ দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। শরীরময় রক্ত চলাচল দ্রুত হচ্ছিল। ভগবানের প্রতিনিধি, ভগবানের আর একরূপ হল প্রধান পুরোহিত, প্রৌঢ় দ্বিজদেব। তাঁকে তো এই শরীর দিয়ে সেবা করতে হয় ললিতাকে। কিন্তু সেই সেবার ভিতরে থাকে ভয়, নিয়মপালন। প্রৌঢ় দ্বিজদেবের দেহ যখন তাকে অধিকার করতে থাকে অষ্টপদীর মতো, তখন তো শরীরের রক্ত যেন জমে যেতে চায়, এ দেহে কোনও ঢেউ ওঠে না। মনে হয় ক্লেদে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে তার কুসুম কোমল দেহখানি, যা শুধু মহাকাল ভগবানের প্রতি নিবেদিত। অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে সে। প্রৌঢ় প্রধান পুরোহিতের মুখ নিঃসৃত লালা যখন তার দুই স্তন

আবৃত করে ফেলে, শরীর কুঁকড়ে যেতে থাকে। সে যেন শিথিল চর্মের বিগতা যৌবনা কোনও বৃদ্ধাতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তার কোনও সাড় থাকে না। সেই সাড়হীন শরীরেই বিচরণ করে দ্বিজদেবের শিথিল শরীর। নিঃসাড় যুবতীদেহ নিয়ে যখন মত্ত হন প্রৌঢ় প্রবীণ পুরোহিত, তাঁকে দেখলে মনে হয় গণিকালয়ের বাঁট অথবা ওই শ্রেণীর মানুষের রুচিও তাঁর চেয়ে সুন্দর। প্রবীণ পুরোহিত মানুষটি অত্যন্ত কামুক। বিকৃতচারী। ভোগ্যাকে পীড়ন করে, দলিত করেই সুখ আহরণ করতে ভালবাসেন। আর তাঁর কাম চরিতার্থ হয়ে গেলে ভোগ্যা দেবদাসীটিকে শয্যা থেকে সময় লাগে না। পদাঘাতে শয্যা থেকে সরিয়ে দেন রমণীটিকে।

এইসব মনে পড়ছিল দেবদাসী ললিতার। তার যুবতী শরীরে মহাকাল রূপী রাজার পা দু'খানি পিষ্ট হচ্ছিল। দুই বুক ছুঁয়েছিল রাজার পা দু'খানি। সেই ছোঁয়ায় সে জেগে উঠছিল বহুদিন বাদে। তাঁর যুবতী দেহ মন এভাবে জাগে না এখানে। জাগাতে পারে না। মহাকালের আশ্রয়ে থেকে শরীর কখনোই সজাগ হয়ে উঠতে পারে না। প্রৌঢ় পুরোহিতের পীড়ন তাকে কষ্ট দেয়। সে কাঁপছিল। তার দেহের কোষে কোষে অচিন্ত্যনীয় এক উন্মাদনার জন্ম হচ্ছিল। সে দেবদাসী। দেবতার প্রতি নিবেদিতা। তার প্রতিটি অঙ্গ দেবতার নিকট উৎসর্গ করেছে যেন মনে মনে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। দেবতা তাকে কখনোই জাগান না। দেবতার কথা ভেবে কখনোই তার শরীর জাগে না। পাথর! পাথর! একদিন গর্ভগৃহে নীলকণ্ঠ শিব মহাকালের লিঙ্গমূর্তি স্পর্শ করেছিল সে সকলের অজ্ঞাতে। স্পর্শের আগে সে নিজে হয়ে উঠেছিল চঞ্চল। কিন্তু সেই পাথরের পুরুষাঙ্গ কী শীতল! বরফের মতো প্রায়। তাতে কোনও সাড় নেই। যেন সে সাড় পাওয়ার আশায় স্পর্শ করেছিল তা। আতঙ্কে সে গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ধরা পড়ে গিয়েছিল প্রবীণ পুরোহিত দ্বিজদেবের কাছে। পাথরের দেবমূর্তির শীতলতা তার শরীরকে অসাড় করে দিয়েছিল যেন। প্রবীণ পুরোহিত তাকে আসতে বলেছিলেন তাঁর ঘরে। গর্ভগৃহের সেবাকর্মের অবসান হল সেইদিন। কিন্তু প্রধান পুরোহিত তাকে গ্রহণ করলেন দেবতার পরিবর্তে। তিনি দেবতার প্রতিনিধি। মহাকালেশ্বর নাকি তাঁর ভিতরে ভর করেন। প্রধান পুরোহিতের বিকৃত কামের কথা ভাবলে সবই তো মিথ্যা মনে হয় ললিতা দাসীর।

আবেগে, কামনায়, অলৌকিক আনন্দে দেবদাসী ললিতা যেন অন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ভগবান মহাকাল রক্তমাংসময় মানুষ হয়ে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। এতদিনে ভগবান তার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। অন্ধ দেবদাসী তার কামনা বিহ্বল, আবেগ বিহ্বল, ভক্তি বিহ্বল শরীর নিয়ে উত্থিত হতে থাকে। হে মহাকাল, তুমি আমাকে গ্রহণ কর প্রভু! আমার ডাকে সাড়া দিয়েছ হে প্রভু, সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করো প্রভু...।

উত্থিত যুবতী শরীর আকর্ষণ করছিল রাজা ভর্তৃহরিকে! দীপটি প্রায় নিভে এল যেন। রাজা শুনতে পাচ্ছিলেন,অস্ফুট ধ্বনি 'মহাকাল' উচ্চারণ করে যাচ্ছে ক্রমাগত। রাজা অনুভব করছিলেন এই দেবদাসীর শরীর অতি উত্তম। পরম যুবতী এই নারী তাঁর পরিচয় জানে না। বিভ্রম পড়ে গেছে। দেবদাসীর বিভ্রমে তিনি আর অবন্তীর অধিপতি নন এই মুহূর্তে। যে সম্বোধন তাঁর কানে আসছে, তাতে রাজা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছেন, কিন্তু নিজের পরিচয় উন্মোচন করতেও পারছেন না। দেবদাসী তার নবযৌবন নিয়ে জেগে উঠছে মহাকালের সামনে। তিনিই মহাকাল! মহাকালেশ্বর শিব! তিনিই নীলকণ্ঠ। দেবদাসীর অস্ফুট উচ্চারণে শিহরিত হচ্ছেন রাজা। যুবতী তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে ধীরে ধীরে। দেবদাসীর ছোঁয়ায় রাজা যেন উজ্জীবিত হয়ে উঠছেন। তাঁর মনে পড়ল কতদিন তিনি বঞ্চিত হয়ে আছেন। এমন যুবতী শরীরের স্পর্শ তিনি কতদিন পাননি। কতদিন ধরে বিমুখ হয়ে আছেন রানী ভানুমতি। তাঁর নরম কণ্ঠস্বর ফুটল অন্ধকারে, দ্বিজদেব জেগে উঠবেন!

হে মহাকাল! সবই তো তোমার ইচ্ছা, দ্বিজদেব জাগবেন কি না জাগবেন সবই তোমার ইচ্ছা হে প্রভু, আমি কতদিন তোমার জন্য বসে আছি আমার সর্বস্ব নিয়ে, হে প্রভু, কতদিন তোমাকে দর্শন করতে পারিনি, তোমার পায়ে মাথা ছোঁয়াতে পারিনি।

রাজা বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। কামনায় উত্তাল হয়ে উঠেছে তাঁর শরীর। আর যুবতীও বিস্মৃত হচ্ছে সবকিছু। যুবতীর প্রতিটি অঙ্গ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে। রাজা বিস্মৃত হলেন তাঁর আত্মপরিচয়। যুবতী শরীরের স্পর্শে রাজা বিস্ফোরিত হয়ে যাবেন যেন। ভানুমতির মুখখানি এক মুহূর্তের জন্য মনে পড়ল তাঁর। তারপর বিপুল অন্ধকারে কোথায় যে ভেসে গেল অবন্তীর রানী। রাজা সাড়া দিতে লাগলেন দেবদাসীর

আলিঙ্গনে। সাড়া দিতে দিতে তাঁর আবার মনে পড়ছিল ভানুমতির নিদারুণ প্রত্যাখ্যানের মুহূর্তগুলি। তিনি ভাবছিলেন তাঁর তো যাওয়ার কথা ছিল মঙ্গলনাথে, চলে এলেন মহাকাল মন্দিরে। তাঁর সঙ্গে আসার কথা ছিল রানীর। সেই ইচ্ছাতেই তো ডেকেছিলেন ভানুমতিকে। ভানুমতি আসেনি। এসব কি মহাকালের অভিপ্রায়? না হলে মহাকাল মন্দিরের এই অলিন্দে এই সুযুবতী দেবদাসী বিভ্রমে পড়ে কেন এই মধ্যরাত্রিতে? মহাকালের ইচ্ছা ব্যতীত এমন হয় না। হওয়ার কথা নয়। দেবদাসীর এমন সাহস হয় কী করে যে রাজার শরীর প্রার্থনা করে সে নিজের শরীর শান্ত করতে। সে তো নারী। নারীই।

দেবদাসী ললিতা সক্রিয়.হয়ে উঠেছে। এই জগৎ-সংসার, এই অবন্তীদেশ, উজ্জয়িনী, রাজসিংহাসন, রানী ভানুমতি, বহুদিনের বৃষ্টিহীনতা, শিপ্রা, গন্ধবতী দুই নদী, জলহীন সপ্তসাগর, মহাকাল মন্দির, অবন্তীর আকাশ, আকাশের গ্রহতারা, সব ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছিল রাজার কাছ থেকে। রাজা ভর্তৃহরি অলিন্দের কঠিন প্রস্তরময় ভূমিতে মিলনে মগ্ন হচ্ছেন এমন এক যুবতীর সঙ্গে যার মুখ তিনি দ্যাখেননি। দেখতে পাচ্ছেন না। কুলুঙ্গির দীপটি নিভে গেছে এর ভিতরেই।

যুবতী দেবদাসী কৃতজ্ঞতায় গলে পড়ছিল। বিভ্রমের অন্ধকারে সে দেবতা আর মানুষের তফাৎ করতে পারেনি। পারছিল না। যুবতী তার আরাধ্য দেবতার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে এই কথা ভাবতেই শিহরিত হচ্ছেন রাজা। প্রস্তরময়, শীতল, কঠিন, নিঃসাড় লিঙ্গমূর্তি যে উষ্ণ রক্তমাংসময় হয়ে উঠেছে সেই কল্পনায় যুবতী শিহরিত হচ্ছিল ক্রমাগত, ফিসফিস করছিল, হে প্রভু, এ আমার কী ভাগ্য, কোন পুণ্য, হে মহাকাল তুমিই আমার শয়নে থাকো, স্বপনে থাকো, আমাকে গ্রহণ করো হে মহাকাল।

রাত্রি উষ্ণ হয়ে উঠতে থাকে। অন্ধরাত্রির শত শত চোখ খুলে যায়। যেতে থাকে। মিলন সম্পূর্ণ হয়। রাজা উঠে দাঁড়ালেন অনেকক্ষণ বাদে। দেবদাসী ললিতা পাথুরে কঠিন ভূমিতে রতিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ঘুম-নির্ঘুমের ভিতরে পরিভ্রমণ করছিল। সাড় ছিল না তার। মিলনে এত নিবিড়তা, এত সম্পূর্ণতা সে আর পায়নি এ জীবনে। মিলন অভিজ্ঞতাই যেন হয়নি তার, অথচ সে দিনের পর দিন ধর্ষিতা হয়েছে। নিঃসাড় হয়ে, মৃতের মতো হয়ে শরীর মেলে ধরেছে প্রৌঢ় পুরোহিতের কাছে। ধর্ষণের কালে সে যন্ত্রণাদীর্ণ হতে হতে মনের ভিতরে মহাকালকে ধরে রাখত। স্মরণ করত মহাকালকে। ওই অপমান, অসম্মান থেকে, ব্যথাতুর জীবন থেকে তাকে উদ্ধার করবেন মহাকাল। সে মহাকালের চরণাশ্রিত, তিনি ব্যতীত তার অন্যকোনও আশ্রয় নেই। দেবদাসী ললিতা, রতিশ্রমে শারীরিক তৃপ্তি ও তন্দ্রার ঘোরে দেখতে পাচ্ছিল প্রবল পৌরুষ নিয়ে মহাকাল সরে যাচ্ছেন যেন। আহা কী স্নিগ্ধতা মহাকালের স্পর্শে।

দেবদাসী ডাকে, হে প্রভু!

রাজা ভর্তৃহরি ঘুরে দাঁড়ান। তিনি এবার প্রাসাদে ফিরবেন। যে ঘটনাটি ঘটে গেল তা অভাবনীয়। তাঁর জীবনে এই প্রথম। হয়ত এই প্রথমই তিনি একটি যুবতীর আকাঙ্ক্ষায় সাড়া দিয়েছেন। এর আগের সব মিলনেই তো তাঁর ইচ্ছাই প্রধান হয়ে উঠত। উঠেছে সব সময়। এখানে তিনি নিজের কামনা পূরণে আসেননি। এসেছিলেন প্রবীণ পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলতে। অথচ একটি কামজর্জর যুবতীর সঙ্গে রতিক্রিয়া সমাপন করে ফিরে যাচ্ছেন প্রাসাদে। যুবতীই তাঁকে বাধ্য করেছে। তিনি যুবতীকে জাগাননি, যুবতীই তার শরীর জাগিয়েছে। এভাবে তাঁকে কেউ এর আগে জাগায়নি, জাগাতে পারেনি। না, সেরা সুন্দরী, উজ্জয়িনীর রানী ভানুমতিও নয়। রাজা অত্যন্ত তৃপ্ত বোধ করছিলেন। তিনি বাধ্য হয়েছেন রতিলীলায়। কিন্তু সেই বাধ্যতা তাঁকে বিভোর করেছে। এমন সম্পূর্ণ করে নারীশরীরকে পাওয়া এর আগে কখনো ঘটেনি। কখনো কোনও নারী এভাবে উজাড় করে নিজেকে নিবেদন করেনি তাঁর কাছে। এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতা ভানুমতি তাঁকে দেয়নি। দেয়নি মানে ভানুমতির ভালবাসা নিখাদ নয় যেমন নিখাদ এই দেবদাসীর আত্মসমর্পণ মহাকালের প্রতি। পাথরের দেবতা, তাঁর প্রতি এই যে আকুল আহ্বান, তাতে পাথরের দেবতাও রক্তমাংসের মানুষ হয়ে এল ওর কাছে। ভর্তৃহরি নিচু হয়ে বসলেন দেবদাসীর শায়িত শরীরের পাশে। নিজের কণ্ঠহারটি খুলে দেবদাসীর বুকের উপর রেখে দিলেন। অন্ধকারে ললিতা টের পেয়েছে তা।

রাজা উঠলেন। দেবদাসী আবার তাঁকে অধিকার করতে হাত বাড়িয়েছিল। রাজা আর দাঁড়ালেন না। তাঁর কাছে আবার উজ্জয়িনী, অবন্তীদেশ, রাজসিংহাসন, শিপ্রা, গন্ধবতী দুই নদী, অনাবৃষ্টি, আকাশে নতুন নক্ষত্রের আসা সব ফিরে আসতে লাগল। তিনি যে উজ্জয়িনীর রাজা তা মনে পড়ল। দ্রুত পায়ে

মহাকাল মন্দির থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগলেন রাজা। কেমন এলোমেলো পায়ে, দিকহারা পাখির মতো ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে যেন চলেছেন রাজা ভর্তৃহরি। চলতে চলতে দাঁড়ালেন। ওই যে কণকশৃঙ্গ মহাকাল। ওর শীর্ষ থেকে চাঁদ ঢলে গেছে পশ্চিমে। রাজা নত হলেন। মাটিতে মাথা ছোঁয়ালেন। ধুলোমাটিতে কপাল ছুঁয়ে গেল। ধুলোয় উড়ছিল সামান্য। রাজা ডাকলেন মহাকালকে, হে প্রভু। হে প্রভু আমাকে ওই শক্তি দাও, আমি যেন তোমাকে রক্তমাংসের করে পাওয়ার মতোই উজ্জয়িনীর মাটিতে বৃষ্টি নামাতে পারি।

রাজা কত সময় ধুলোমাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আছেন তা তাঁরও ঠাহর হয় না। রাত গড়াতে থাকে সকালের দিকে।

ষোল

মাঘের দুপুর। গন্ধবতী তামার কলস রজ্জু নামিয়ে দিচ্ছিল কূপের অন্ধকারে। জল নেমে গেছে অনেকটা। এই গম্ভীরা গ্রাম গম্ভীরা নদীকূলে হওয়ার কারণে জলস্তর এখানে কাছেই। চৈত্র থেকে তা অকুলান হতে থাকে, স্তর নেমে যায় অনেকটা। আবার যদি মাঘে বৃষ্টি হয়, চৈত্রে বৃষ্টি হয়, একদিনেই জলস্তর উঠে আসে। তবু ওই চৈত্রেই রজ্জুর দৈর্ঘ্য বদলাতে হয়, প্রমাণ মাপের চেয়েও বেশি লাগে অনেক। এবার জলস্তর অনেক নীচে। রজ্জু বদলাতে হয়েছে অঘ্রানের শেষে। সেই রজ্জুও যেন ছোট হয়ে আসে। গন্ধবতী কূপের অন্ধকারে তাকায়। তাকিয়েই থাকে। তার মুখখানি অন্ধকারে ঢেকে যায়। মনের ভিতরে সেই অন্ধকার প্রবেশ করে।

এই কূপ রাজার দেওয়া। কোন রাজা? গন্ধর্ব সেন। দশপুরা বিজয়ের পর গ্রামে পুষ্করিনী খনন, বৃক্ষরোপণ, গ্রামে গ্রামে যত কূপ, শিপ্রা, গন্ধবতী, গম্ভীরার তীরে যত দেবালয় আছে সব সংস্কার করেছেন রাজা ভর্তৃহরি। এসব শোনা কথা গন্ধবতীর। তখন সে কত ছোট। সে ছিল সুগন্ধা। কার্তিককুমারের কন্যা সুগন্ধা। খুব আবছা মনে পড়ে গন্ধবতীর।

রাজা ভর্তৃহরির নাম অবন্তী দেশের মানুষ সম্ভ্রমের সঙ্গেই উচ্চারণ করে। ধ্রুবপুত্রের কাছে শুনেছে সে রাজার কথা। রাজা বিদ্বান, বিদ্যোৎসাহী। সান্দীপনি আশ্রমে সাহায্য পাঠান প্রতি পূর্ণিমায়। রাজা কবিতা প্রেমী। শ্লোকের কাব্যের দু'একটি পদ ধ্রুবপুত্র উচ্চারণ করেছিল তার সামনে। কর্ণমূল আরক্ত হয়ে গিয়েছিল অজান্তেই। ধ্রুবপুত্র কি নিষ্ঠুর ছিল? উদাসীন! সে কি একবিন্দুও টের পায়নি গন্ধবতীর মনের কথা? তাকে শোনাচ্ছে সখা সেই শৃঙ্গারের শ্লোক, অথচ সখার তখন মন পড়ে আছে গণিকায়। গণিকা দেবদত্তার কাছে যাবে গন্ধবতী। দেখতে চায় তাকে। কত না তার রূপ তা নিজে চোখে দেখবে।

চারদিক থমথমে। কূপের এখানটা তো নির্জনই। তাদের গৃহ-প্রাঙ্গণ এখান থেকে দেখা যায় না। মা বসে আছে একা। মা রেবা দিন দিন মৌন হয়ে যাচ্ছে। এবার শীত ততো কঠিন হয়নি বটে, কিন্তু তাও তো কম নয়। এদেশে শীতের প্রকোপ বেশি। সেই শীতও শেষ হয়ে এল প্রায়। চারদিকের গাছগাছালি নির্জীব। বট, অশ্বত্থ, পিপুল, অশোক, নিম, সিন্ধুবার, যত লতাগুল্ম সব যেন মৃতপ্রায়। মলিন হয়ে গেছে পাতা। পাতাঝরণের কাল চলছে। বাতাসে ধুলো উড়ছে, ধুলোয় ঝরাপাতা। গম্ভীরার পশ্চিমে শালবন। পাতা খসে যাচ্ছে ধ্যানমগ্ন তপস্বীর মতো গাছগুলির।

কূপের প্রায় তলদেশে পৌঁছে গেছে তাম্রকলস। গন্ধবতী অন্ধকারে দৃষ্টিপাত করে। রজ্জু তার দু'হাতে ধরা। সে একটু একটু করে কলসটি তুলে আনতে থাকে। নির্ভার কলসটি উঠে এল অনায়াসে। গন্ধবতী দু'হাতে কলসটি কূপের পাশে রাখে। কোথায় জল? গন্ধবতীর মুখ চোখে বিপন্নতা এল। সে অবাক হয়ে দ্যাখে যেটুকু জল উঠেছে তা বালিমাখা, কাদামাখা। এই বছরে কূপ সত্যিই শুকিয়ে গেল? তার এই সামান্য জীবনে এমন অভিজ্ঞতা তো হয়নি আগে। কূপের জল যে শুকিয়ে যেতে পারে তা সে ভাবতেও পারেনা। গন্ধবতী কলসের জল পায়ের কাছে ঢেলে দেয়। পায়ের পাতা বালুকণায় ভরে যায়। সে আবার কলস নামিয়ে দিতে থাকে কূপের অন্ধকারে। দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অনুমান করতে থাকে জল আছে কিনা। অন্ধকারে বিভ্রম লাগে। কিছুই আন্দাজ করতে পারে না। কলসটি জলে পড়লে যে ধ্বনি উঠে আসে, তা কানে আসে না। কানে যা আসে তা ধ্বনির ভঙ্গুরতা। আচমকা কলসটি গিয়ে পড়েছে বালু মৃত্তিকার কঠিন স্তরদেশে। এ ধ্বনি বড় কর্কশ। অথচ জলে যখন আচমকা গিয়ে পড়ে কলস, জলে

যখন ঝাঁপায় কলস, সেই ধ্বনি কী গম্ভীর, কী শীতল সেই ধ্বনির মায়া। কানে এলেই গম্ভীরা নদী ভেসে ওঠে চোখের সামনে। গন্ধবতী রজ্জু টেনে কলসটির সাহায্যে পাতালে জল খোঁজে। হায়! পাতালও জলহীন হলো। সে মাথা নিচু করে জলচিহ্ন খুঁজতে থাকে। ব্যর্থ হয়। ডাক দেয় অন্ধকারে, জল-জল! আ-হা-হা-আহ্! প্রতিধ্বনিত শব্দরাশি তার কাছে উঠে আসে। সে কলস দোলায় অন্ধকার শূন্যে। রজ্জুর পরিমাপে ধরা যায় এই জায়গায় জল থাকার কথা ছিল। নেই। সে কলসটি টেনে তুলতে থাকে। কলসটি কি ভরে গেছে জলে? কলস উঠে এলে সে অতি সাবধানে তা জমিতে রেখে পায়ের পাতার অগ্রভাগে ভর দিয়ে জানু ভেঙে বসেছে। কোথায় টলটলে জল! কর্দমাক্ত বালুমাখা জলের মুখ দেখে গন্ধবতী কলস উপুড় করে দেয় মাটিতে। আকাশে তাকায়। এমনকি কখনো হয়েছে? সবে তো মাঘ মাসের পক্ষকাল গেছে। সামনে তাহলে কী দিন আসছে? বুকটা ধকধক করে ওঠে তার। আকাশ এখন ঘোর শূন্য। উড়ন্ত পাখিও চোখে পড়ে না। মহাশূন্যে, সেই দৃষ্টি সীমার শেষে উড়ন্ত শকুনও যে নেই। গন্ধবতীর মুখে ছায়া নামে। এ ছায়া মনের। কী করবে সে এখন? সকলকে জানিয়ে দেবে শুকিয়ে আছে রাজার কুয়ো। ধ্রুবপুত্রই না বলত, রাজার কুয়ো শুকোবো না কোনোদিন, এত গভীর করে খনন করা হয়েছে তা। গন্ধবতী কি এবার দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে জানাবে রাজার কুয়োয় জল নেই? রাজার কি তাহলে তৃষ্ণা নিবারণের শক্তি ফুরোল? ধ্রুবপুত্র কেন, তার পিতামহ শিবনাথও বলে, ওই কূপের জল কখনো শুকোবে না। রাজশক্তি নিহিত আছে কূপের অন্ধকারে, ওই কূপ দিয়ে রাজা তৃষ্ণা নিবারণ করছেন সব সময়, এটা মনে রাখলে রাজভক্তি অটুট থাকে, রাজভক্তি ব্যতীত রাজার রাজত্বে বাঁচা যায় না।

গন্ধবতী বিড়বিড় করে, কী হলো, অবন্তীরাজও তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষমতা হারালেন, হায় রাজা! তোমার দেওয়া জল তো ফুরোবার কথা নয়। ধ্রুবপুত্র থাকলে এর ব্যাখ্যা পেত গন্ধবতী। আচমকা তার মনে হলো ধ্রুবপুত্র থাকলে কি জলহীন কূপের সামনে বসে থাকতে হতো তাকে? জল থৈ থৈ অন্ধকারে গিয়ে ঝাঁপাত না তাম্রকলস? ধ্রুবপুত্র থাকলে কি অবন্তী দেশের আকাশ নির্মেঘ থাকত আষাঢ়, শ্রাবণে? পরপর দুটি বৎসর? সূর্যদেব তার শুভ্র কিরণ দিয়ে যে শুক্লবর্ণ জলরাশি সমস্ত বৎসর ধরে মেঘেদের দান করেছেন, সেই মেঘ কোথায়? ধ্রুবপুত্র বলত, সূর্যের তাপ বাতাসের সাহায্যে সর্বভূত থেকে, বিশেষত সরোবর, নদী, সমুদ্র থেকে জলরাশি আহরণ করে মেঘেদের দেয়। সেই মেঘ থেকে যে বৃষ্টি নামে তা সর্বজীবের মঙ্গল সাধন করে।

কলসটি বুকে চেপে গন্ধবতী আকাশে তাকায়। আকাশের নির্দয়া ছায়া ব্যতীত আর কিছুই সে দেখতে পায় না। সে ভীতা চাতকিনীর মতো আকাশের পূর্ব-পশ্চিম দ্যাখে, উত্তর দক্ষিণে ভ্রমণ করে মনে মনে। মেঘের কোনো চিহ্ন নেই। দীর্ঘকাল যে জলরাশি আহরণ করলেন সূর্যদেব, তা কোথায় নামছে? কোন দেশে? সখা বলত, সূর্যদেব পৃথিবী থেকে যে জল আহরণ করেন তাঁর উত্তাপে, ফিরিয়ে দেন তার সহস্র গুণ। সখা নেই। তার কথাও অসত্য হয়ে যাচ্ছে। কতদিন বৃষ্টি নেই! গন্ধবতী মনে মনে গণনা করে শেষ বৃষ্টি কবে দেখেছিল সে। মনেই পড়ে না। বৃষ্টি নেই বলে, আকাশের জল নেই বলে পাতালের জলও ফুরিয়েছে। হায় ধ্রুবপুত্র! তুমিই কি মেঘ! মেঘ হয়ে চলে গেছ অবন্তী ছেড়ে। চোখে জল চলে আসে গন্ধবতীর।

সখা, তুমি কি জানো তুমি অবন্তী ত্যাগ করার পর এই দেশ আর মেঘের ছায়া দ্যাখেনি। সেই মেঘ, আগ্নেয় মেঘ, ব্রহ্মজ মেঘ, পক্ষজ মেঘ, তুমিই তো বলেছিলে আমাকে। বলেছিলে মেঘ বায়ুজাত বজ্রধ্বনি, আর অগ্নিজাত বিদ্যুৎ প্রকাশ করে স্বমহিমা দেখায়। হে সখা, তোমার সেই আগ্নেয় মেঘ, ব্রহ্মজ মেঘ, পক্ষজ মেঘ কোথায়? তুমি কি জান, অবন্তীর মানুষ শুধু মেঘের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে? কী অপরূপ ছিল সেই মেঘময় অবন্তীর আকাশ। এখনো মেঘের কথা মনে করলে তোমার কথা মনে আসে যেন। ধ্রুবপুত্র তুমি, তোমার প্রিয় ঋতু ছিল বর্ষা।

বর্ষাই ছিল ধ্রুবপুত্রের প্রিয় ঋতু। ধ্রুবপুত্র বলত, সর্বভূতের শরীরে জল আছে। স্থাবর, জঙ্গম যখন ভস্মীভূত হয়, যে ধোঁয়ার রাশি আকাশে ওঠে তা তো জলই। সেই জল থেকে অভ্রের উৎপত্তি। ভ্রষ্ট হয় না বলেই মেঘের নাম অভ্র। আহা কী দিনই না গেছে এই গম্ভীরা তীরে! আকাশ ঢেকে আছে কৃষ্ণকায় ঐরাবতের মতো মেঘে, বৃষ্টির শব্দে মুখর হয়ে আছে পৃথিবী। গম্ভীরা নদী আকাশের জলে পুষ্ট হয়ে অধীরগামিনী হয়েছে। মেঘের ছায়া ধারণ করে সে হয়েছে নিমীলিত চক্ষু, ঘোর শ্বাসপ্রশ্বাসে দিকহারা

প্রায়। তার স্রোতের উপর ঝুঁকে পড়েছে নীল রঙের বেতস লতাগুলি, স্রোতের টানে তারা কাঁপছে সবসময়। যখন থামল বৃষ্টি, আকাশে আবার ডাকতে লাগল মেঘ, ময়ূরগুলি পেখম সাজিয়ে মেঘকে অর্চনা করল। ময়ূর-ময়ূরীর সেই রূপ কতদিন যে দ্যাখেনি গন্ধবতী। গেল বর্ষায়, তার আগের বর্ষায় গন্ধবতীর মনছিল না নদীতীরে যাওয়ার। দুই ঋতুতেই বর্ষা আসতে আসতেই বিদায় নিল। যেন ভুল পথে এসেছিল মেঘ। অবন্তী তার গন্তব্য ছিল না। তাই গম্ভীরাতীরের বেতস লতাগুলির নীল মেঘবর্ণ পুড়ে গিয়েছিল রৌদ্রে। গম্ভীরা নদী হয়েছিল ধীর, বিগতযৌবনা যেনবা, কোনোরকমে টানছিল নিজেকে। এখনো তাই। সেই সমস্ত দিনও তাই। সেই যে তাম্রধ্বজ গেল, আচার্য বৃষভানুর শিষ্য নবীন জ্যোতির্বিদ... কী আশ্চর্য! তার কথা মনে পড়ল কেন? সেই বা কীরকম কথা বলেছিল, একেবারে বর্ষার কথা। বর্ষায় গম্ভীরার যে রূপ হয় সেই কথা বলল কিনা পৌষে এসে। একেবারে ধ্রুবপুত্রের মতো কথাগুলি। সে যেন দেখেছিল বর্ষায় গম্ভীরাতীরের বেতসকুঞ্জ, বেতসলতার নীলরঙ। গন্ধবতী নিশ্চুপ, নিঃঝুম, বিহ্বল, তার চোখের সামনে থেকে মুছে যাচ্ছে এই দ্বিপ্রহর, ভেসে উঠছে পৌষের সেই সন্ধ্যা, অন্ধকারে উপচে পড়ছে ফুটন্ত দুধ। বসে আছে নবীন জ্যোতির্বিদ। তার আবার আসার কথা ছিল। আসেনি কেন? কেন এল না এতদিনে? গণনা কি শেষ হয়নি?

টাঙ্গন অশ্বটি কখন এসে দাঁড়িয়েছে পথের উপর তা খেয়াল করেনি গন্ধবতী। সে তো আর নিজের ভিতরে ছিল না। মুখখানি নামিয়ে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল নিজের ভিতরে। তখন অশ্বটি পথের ধারে আমগাছের গায়ে বেঁধে খটখট করে হেঁটে এল উদ্ধবনারায়ণ। তার মাথায় রক্তবর্ণের শিরস্ত্রাণ, গায়ে নীলবর্ণের রেশম বস্ত্র, তার উপরে মদ্রদেশীয় পশম আবরণ। সেই আবরণের ঘোরে মেঘের রং। গলায় একটি হলুদ রঙের বুনো ফুলের মালা। পাদুকাটিতে জরির কাজ। রাজপুরুষের মত লাগছে উদ্ধবকে। ঈষৎ পান করেছে, ফলে চোখ মুখে ঘোরালো ভাবও এসেছে। টাঙ্গন অশ্বটি নতুন মনে হয়। বেশ স্বাস্থ্যবান। অশ্বের গলাতেও একটি রক্তবর্ণের বুনো ফুলের মালা। কোন মালিনী দিয়েছে কে জানে?

উদ্ধবনারায়ণ গলাখাঁকারি দেয়, এখানে যে পাব তা তো আশা করিইনি মেয়ে, তুমি কি আমার জন্য অপেক্ষা করছ? আমি যে এই পথ অতিক্রম করি তা তো তুমি জান, কিন্তু এখন যে যাব তা কে বলেছে, কোন শুকপাখি?

চমকে ঘুরে তাকায় গন্ধবতী। কী লজ্জা! সে না ধ্রুবপুত্রের কথা ভাবতে ভাবতে সেই গণক জ্যোতির্বিদ যুবকের কথা ভাবছিল। আর তখন কিনা এসে দাঁড়িয়েছে এই পাষণ্ড উদ্ধবনারায়ণ। সে উদ্ধবের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকল। জবাব দেয় না উদ্ধবনারায়ণের কথার।

উদ্ধবনারায়ণ বলে, আমি ঠিকই করেছিলাম আজ আমার প্রণয় নিবেদন করব গম্ভীরার এই কন্যাটিকে, হে সুগন্ধা আমার দিকে তাকাও।

কণ্ঠস্বরেই গন্ধবতী ধরতে পারে সুরা পান করে এসেছে উদ্ধবনারায়ণ। কিন্তু সুরা পান করে অনাত্মীয়া যুবতীর সামনে এসে দাঁড়ান তো বিধি সম্মত নয়। সে কেমন জবুথবু হয়ে গেল। উত্তরীয়খানি টেনে আবৃত করল উর্ধাঙ্গের বসন। উদ্ধবনারায়ণ রাজকর্মচারী। রাজকর্মচারীর ক্ষমতা অনেক। সে দেখছিল টাঙ্গন অশ্বটিকে। পা আছড়ে ধুলো ওড়াল। কলসের অন্তর্গত শূন্য অন্ধকারে দৃষ্টিপাত করে গন্ধবতী।

উদ্ধবনারায়ণ বলে, আজ কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, রাত্রির প্রথম প্রহরে চাঁদ উঠবে, তখন কি দেখা হতে পারে?

গন্ধবতী কেমন বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে শূন্য কলস অবলম্বন করে বসেই থাকে। ভয় লাগছে। লোকটা কত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। উদ্ধবনারায়ণের কণ্ঠস্বর আবার কানে আসছে, খুড়োমশায় কি তোমাকে সবকিছু অবগত করাননি, আচ্ছা তিনি কি গৃহে আছেন, মাঘ মাস বয়ে যায়, এই মাসেই কার্য সম্পন্ন হতে পারে, কোথায় খুড়োমশায়, তিনি যে কথা দিয়েছেন আমাকে।

সাহস সঞ্চয় করে গন্ধবতী তাকায় উদ্ধবের দিকে, তিনি নগরে গেছেন।

নগরে গেছেন, এখন আমি কী করি, অবশ্য তোমার সঙ্গে দেখা হলো সুগন্ধা, তুমি এমন তপস্বিনীর মতো বসে আছ কেন?

গন্ধবতী বলল, আপনি যে পথে যাচ্ছিলেন সেই পথে যান।

সেই পথ তো এসেই গেছি, গন্তব্য তো এইখানেই, সুগন্ধা তুমি কি জানো রাজসভায় আমি কোন

পদে আছি?

গন্ধবতী হেসে ফেলেছে, রাজকবির পদে, শুনেছি ওই পদটির দাবীদার হওয়া সহজ।

উৎসাহিত হয় উদ্ধবনারায়ণ, না না রাজকবি কেন, খুব বড় পদে আছি, তুমি বিবাহের পরেই জানবে, আর যদি ইচ্ছা করো এখনই জানাতে পারি, তবে খুব গোপনীয়।

গন্ধবতীর মুখের হাসি নিভে গেছে। সে কলসটি দু'হাতে চেপে কলসকেই আশ্রয় করে যেন। তার ভয় করতে থাকে। ঠাকুর্দার সঙ্গে তো মায়ের কথা হয়ে গেছে। ঠাকুর্দা কি সেই কথা এই লোকটিকে জানাননি এখনো। কী ভয়ানক ব্যাপার। লোকটির দৃষ্টি তার সর্ব অঙ্গ স্পর্শ করছে। কে জানে কী কল্পনা নিয়ে এসেছে উদ্ধবনারায়ণ। সখা বলত লোকটা মূর্খ। কিছু বিদ্যা অর্জন করেছে বটে, কিন্তু কল্পনাহীন। কল্পনাহীনের বিদ্যা অর্জন বৃথা। গন্ধবতী ভীত বিহ্বল চোখে উদ্ধবনারায়ণকে দ্যাখে, কী কল্পনা করেছে ও?

উদ্ধব বলে, এই রেশম বস্ত্র বাহ্লিক দেশের, পশম বস্ত্র মদ্র দেশের, টাঙ্গন অশ্বটি হিমালয়ের, সদ্য কিনেছি, তুমি অশ্বে সওয়ার হয়েছ কখনো, এসো সুগন্ধা।

গন্ধবতী বলে, আপনি যান, আমি কোথাও যাব না, অশ্ব নিয়ে আপনি ফিরে যান, অনাত্মীয়া নারীর সঙ্গে আপনার কী কথা?

ঈষৎ বিমর্ষ হলো যেন উদ্ধবনারায়ণ, সে পায়চারি করছে পথের উপর। টাঙ্গন অশ্বটির পাশে দাঁড়াল। শিরস্ত্রাণটি ঠিক করে, কোমর থেকে একটি ক্ষুদ্র রেশমপেটিকা বের করে তার ভিতর থেকে একটি রত্নহার আঙুলের ডগায় তুলে আনে। রত্নহারটি দেখতে থাকে নিজের মনে। দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অদূরে আসীন গন্ধবতীর দিকে। চেয়েই থাকে। দৃষ্টিতে বিমোহিত ভাব ফুটে ওঠে। যুবতী অতি সুন্দরী, এমন যৌবন যে কোনো পুরুষেরই আরাধ্য হতে পারে। অলঙ্কার একে আর কত সুন্দর করে তুলতে পারে? সে ধীরে ধীরে আবার গন্ধবতীর সামনে দাঁড়ায়, অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, তোমার জন্য একটি কণ্ঠহার এনেছিলাম, মহালতার অনুরূপ, বহু মূল্য এর, ধরো রাজরানীর কণ্ঠেই এই হার শোভা পায়, এমন এর সৌন্দর্য। ধরো কোনো রাজকন্যার গলায় শোভা পাওয়ার জন্যই এর নির্মাণ, রাজকন্যাকে এই কণ্ঠহার হয়ত পরিয়ে দিতে পারেন কোনো শ্রেষ্ঠী, রাজপুরুষ। তুমি মুখ তোলো, দ্যাখো কণ্ঠহারটি।

গন্ধবতী অধোমুখে নিশ্চল, ধীরে ধীরে বলে, আমি কোনো রাজকন্যা নই, আমি সামান্য সৈনিকের পুত্রী, পিতা যুদ্ধে গিয়ে ফেরেননি, আমার চিরসখা অবন্তী ত্যাগ করেছে প্রায় দুই বর্ষাকাল, আমি উদ্বিগ্ন, চিন্তিত, নিদ্রাহীন যায় প্রতিটি রাত, আপনি ফিরে যান, আমি অন্যের জন্য বসে আছি, আপনার জন্য নয়।

উদ্ধবনারায়ণ তো এসব কথা জানে। জানে বলে বিস্মিত হয় না, বিমর্ষ হয় না। সে আরো জানে ইপ্সিত রত্নকে অধিকার করতে হলে অধৈর্য হতে নেই। আর তা যদি রমণীরত্ন হয় তবে তো আরো ধৈর্যশীল হতে হয়। সে গন্ধবতীর অজ্ঞাতে তার যৌবন সুধা পান করছিল দুই চোখ দিয়ে। ক্রমে দুই চোখ শত শত চোখ হয়ে উঠছিল। অপ্সরা উর্বশীর রূপ এর কাছে তুচ্ছ। উদ্ধবনারায়ণের দৃষ্টিতে কামভাব তীব্র হয়। আরক্ত চোখে সে গন্ধবতীকে লেহন করতে থাকে। গন্ধবতী এক নদী। স্রোতস্বিনী। বৃষ্টির স্মৃতি নিয়ে বাঁচে। উদ্ধবের দৃষ্টিতে ভয় পায় সে। মনে হতে থাকে আকাশ-বাতাস সব জ্বলে যাচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে। সেই জ্বলন থেকে তারও রেহাই নেই।

উদ্ধব এগিয়ে আসে, চাপা গলায় বলে, রমণী লুণ্ঠন বীরের ধর্ম।

গন্ধবতী পাথর। তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে।

উদ্ধব হিসহিস করে, আমি রাজসত্রি, সত্রির পদ অনেক উঁচু, কী না পারি, প্রয়োজনে তোমার ঠাকুর্দাকে নিধন করে ফেলতে পারি, মাতা-পুত্রী একসঙ্গে লুণ্ঠিত হবে।

গন্ধবতী বালুকাময়। বাতাসে ঘূর্ণী হয়, বালুকায় ঝড় ওঠে। শুকিয়ে যেতে থাকে যত নদী, যত সরোবর। অধোমুখে বসে আছে গন্ধবতী। দু'চোখে জল আসতে আসতে উত্তাপে শুকিয়ে যায়। হে ধ্রুবপুত্র, দ্যাখো, উদ্ধব সত্রি আমাকে স্পর্শ করছে। হে ধ্রুবনক্ষত্র, দিনমানে জানিনা তুমি আছ কিনা, উদ্ধব সত্রি আমার কেশ আকর্ষণ করেছে। অগ্নিময় নিঃশ্বাস নির্গত হয় গন্ধবতীর দেহ থেকে। গাছের মতো শ্বাস নেয় সে যেন অজস্র সবুজ পাতায়।

এ এক ভয়ানক সময়। এইকালে আগ্নেয় মেঘ, ব্রহ্মজ মেঘ, পক্ষজ মেঘ-সব নিয়ে ধ্রুবপুত্র নিরুদ্দেশে গেছে। এমন অনাবৃষ্টি বহুদিন দ্যাখেনি মানুষ। এমন জ্ঞানের অভাবও না। কোথাও কোনো আলোর চিহ্ন নেই, অজ্ঞানতা ছেয়ে ফেলছে অবন্তীর আকাশ। জ্ঞানভাণ্ডার যত আছে সব যেন নিয়ে গেছে ধ্রুবের পুত্র, সেই পরমরূপবান যুবক, গন্ধবতী নদীর সখা, শিপ্রা নদীর সখা, গম্ভীরা নদী, রেবা নদী, বেত্রবতী—সব নদীর সখা। তার মুখটিও ভুলে যাচ্ছে যেন গন্ধবতী। তবু সে তাকেই ডাকে। তার ভিতরে তাম্রধ্বজের মুখখানি ভেসে ওঠে। কী অদ্ভুত! ধ্রুবপুত্র যা বলত, তাম্রধ্বজ তাইই বলে। তবুও কি সে ধ্রুবপুত্রই হয়ে উঠবে কখনো?

গন্ধবতী আর্তনাদ করে ওঠে। ডাক দেয় শূন্য আকাশের ভিতরে মহাশূন্যকে। দু'হাতে মাটি চাপড়ায়, ধুলো ওড়ে। ধুলো উড়িয়ে সে কাঁদে। উজ্জয়িনীর বাতাস তার কান্না বয়ে নিয়ে যায়। যায় যায়, বহুদূর যায় গন্ধবতীর আকুল আর্তনাদ।

দ্বিপ্রহরে বিভ্রান্ত অবন্তীরাজ শোনেন কান্নার শব্দ। অনাবৃষ্টিতে পক্ষীকুল কি এভাবে কাঁদে? বৃক্ষেরা? রাজা শূন্য দিগন্তে চেয়ে আছেন খোলা জানালা দিয়ে। দিগন্তে যেন মেঘের চিহ্ন। মেঘ নয় ও, গৃধিনী যূথ নেমে আসছে মাটিতে। তিনি যে গৃধিনী-উল্লাস শোনেন। গন্ধবতীর ডাক শুনতে পান না।

কান্নার শব্দ শোনেন প্রধান পুরোহিত। এমন কান্না তাঁর চেনা। ধর্ষিতা এভাবে কাঁদে। তাঁর মন্দিরপার্শ্বে গন্ধবতী নদী। নদীর বালি থেকে কান্নার শব্দ উঠে আসছিল। তিনি সহাস্যে শ্রেষ্ঠীর দিকে তাকান, শুনতে পাচ্ছেন, আর দেরি নেই, এই তো সময়।

কান্নার শব্দে চঞ্চল হয়েছে মা রেবা। ঘরবার করছে। রৌদ্রময় পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে চোখদুটি ঝলসে যায় যেন। এদিক ওদিক দেখে, না পেরে আঙিনায় নেমে এসে করতলে মুখ আড়াল করে ডাক দিল নদী জননী, সুগন্ধারে, সুগন্ধা-আ-আ।

মা জননীর ডাক বাতাস বয়ে নিয়ে যায় দূর থেকে বহুদূরে। উজ্জয়িনী নগর থেকে দশার্ণ দেশে, বিদিশা নগরীতে। রামগিরি, আম্রকূট কত পর্বত না শোনে নদী-জননীর ডাক। অনাবৃষ্টির কালে মা জননীকে এইভাবে ডাকতে হয়। না ডাকলে মেঘ আসবে কেন? মেঘ, মেঘ, মেঘ...। নদী তো মেঘেরও জননী। রেবা তো ধ্রুবপুত্রের জননীসমা। ডাকছিল রেবা তার মেয়েকে। ডাক শুনছিল তাম্রধ্বজ। আর কেউ কি? সেই ধ্রুবপুত্র। যে কিনা সঙ্গে করে নিয়ে গেছে সমস্ত মেঘ। মেঘজননী ডাকছিল তার সন্তানকে। মনে আছে কি ধ্রুবপুত্রের? মনে আছে সব? নাকি সে এক স্মৃতিভ্রষ্ট পুরুষ এখন। ভুলে গেছে সব। এই উজ্জয়িনীর কথা, এই গম্ভীরার কথা অবন্তী দেশের কথা। রেবা তার মেয়েকে ডেকেই যাচ্ছিল ভীরু পক্ষীজননীর মতো। অনাবৃষ্টির কাল প্রবাহিত হতে থাকে।

সতের

গন্ধবতী ভয় পেয়েছে। রাজকর্মচারী উদ্ধবনারায়ণ কী ভয়ানক মানুষ! কী নিষ্ঠুর। কেমন বলে দিল, তার বাবা কার্তিক কুমার হূন যুদ্ধে হত হয়েছেন। কেমন বলেছিল নিরুদ্দিষ্ট ধ্রুবপুত্র হূন আশ্রয়ে আছে। অবন্তী দেশে প্রবেশ করলেই সে বন্দি হবে। হাসতে হাসতে বলছিল, ধ্রুবপুত্রের প্রাণদণ্ড হবে। প্রাণদণ্ড যদি মুকুব করা হয় দক্ষিণহস্ত কর্তন করা হবেই। একটি চোখও উপড়ে নেওয়া যেতে পারে। দুটি পায়ের একটি অকেজো করেও দেওয়া যেতে পারে। এসব না হয়ে যদি প্রাণদণ্ডই বহাল থাকে তবে তাকে জনসমক্ষে পুড়িয়ে মারা হবে। অথবা খণ্ড খণ্ড কেটে শৃগাল, সারমেয় দিয়ে ভক্ষণ করানো হবে। বলতে বলতে হাসছিল উদ্ধবনারায়ণ। হাসতে হাসতে মাটিতে পদাঘাত করেছিল, কী সাহস ওই দুরাচারীর। শ্রেষ্ঠীর ভোগ্যা গণিকার দিকে হাত বাড়ায়। শ্রেষ্ঠীরই আশ্রয়ে থেকে তাঁর মেয়েমানুষে হাত। নির্বোধ ধ্রুবপুত্র।

গন্ধবতী নিশ্চুপ বসেছিল কুটিরের দাওয়ায়। কয়েক হাত দূরে তার মা রেবা। গন্ধবতীর মুখে রাজকর্মচারী উদ্ধবনারায়ণের কথা শুনে রেবাও ভয় পেয়েছে। উদ্ধব যে-কোনো উপায়ে গন্ধবতীকে অধিকার করতে চায়। সামনে যে কী দিন আসছে! গন্ধবতীকে যদি অপহরণ করে উদ্ধব, কে রক্ষা করবে? বৃদ্ধ পিতামহ শিবনাথ? রেবা মুখ নিচু করে ভাবছিল এসব। মাথা তুলে দেখল তাম্রধ্বজ আসছে। রেবা মুখ ঘুরিয়ে গন্ধবতীকে বলল, মুখটা মুছে নে, আচার্য বৃষভানুর আশ্রমের সেই তাম্রধ্বজ আসছে,

যা বরং জলে ধুয়ে আয়, তোর গালে জলের দাগ পড়েছে।

গন্ধবতী চট করে উঠে দাঁড়ায়। তার সর্বশরীর উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ঐ তাম্রধ্বজ আসা মানে ধ্রুবপুত্র আর কার্তিককুমারের খবর বয়ে আনছে নিশ্চয়। তার মানে মিথ্যা হয়ে যাবে উদ্ধবনারায়ণের প্রচার। গন্ধবতী কয়েকদণ্ড দাঁড়িয়ে দেখল তাম্রধ্বজকে। না রাজবেশ তো নেই। টাঙ্গন অশ্বেও আসেনি দশার্ণ দেশের জ্যোতির্বিদ যুবক। হেঁটে আসছে, সঙ্গে পিতামহ শিবনাথ। গন্ধবতী হিসেব করল,ঠিক একমাস বাদে এল তাম্রধ্বজ। অবাক হয়ে সে দেখছিল মোটা পশম বস্ত্র কাঁধে ফেলা উত্তরীয় গায়ে যুবকটিকে। নিষাদের মতো কী? পিতামহ তাই বলেছিলেন। তাম্রধ্বজের রূপে নিষাদের ছায়া আছে। তাইই তো। তাম্রধ্বজ এগিয়ে আসছে তাদের গৃহের দিকে। কই না তো? পিতামহ আসছেন। তাম্রধ্বজ পথ ধরে সোজা চলে গেল পশ্চিমে গম্ভীরার পথে। গন্ধবতী ঘুরে মাকে বলল, মা রাজার কুয়োর জল ফুরিয়েছে, রাজার দেওয়া জল নাকি চিরকাল থাকে, কোনোদিন শুকোয় না, তাইতো শুনেছিলাম, কিন্তু কূপ তো শুকনো, শুধু বালি।

কথাটা শুনে রেবা অবাক হয়ে গেল, কী বলিস!

হ্যাঁ মা।

তুই কুয়োর ভিতরে কলস নামিয়েছিলি?

হ্যাঁ মা, জল এক ফোঁটাও নেই।

রেবার চোখমুখে কী রকম এক উদ্বেগের অন্ধকার ছায়া ফেলল, সে গায়ের উত্তরীয় টেনে, মাথার কাপড়টি বাড়িয়ে আঙিনায় নেমে এগিয়ে গেল। জল চৌকিখানি এনে আঙিনার মধ্যে রেখে সরে দাঁড়াল একপাশে মাথা নিচু করে। শিবনাথ এসে বসল, বলল, তাম্রধ্বজ গেছে গম্ভীরায়, আসবে এখনই।

দিনমানে আসতে পারে না, অন্ধকার হয়ে যাবে এখনই, কত সময় কথা বলবে! রেবা বলে।

হাসে শিবনাথ, ও বলে আকাশে যদি তারা না জ্বলে, কোনো কথাই বলতে ভাললাগে না, গ্রহ তারাদের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে ও ভাল, যার যেমন! তবে ও নাকি অন্ধকারেও দেখতে পায়!

কী বলছেন!

হ্যাঁ অন্ধকারে হেঁটে যেতে ওর কোনো অসুবিধে হয় না, ওতো দশার্ণ দেশ থেকে হেঁটেই এসেছিল উজ্জয়িনীতে, তখন ছিল বসন্ত, ও বলে বসন্তের রাতে পথ হাঁটা ছিল এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা, রাতেই হাঁটত বেশি, দিনে বিশ্রাম নিত, চৈত্রমাসের রোদ তো কঠিনও নিশ্চয়।

রেবা যেন কী ভাবছিল, বলল, কোন বসন্তে এসেছিল উজ্জয়িনীতে?

হতে পারে যে বসন্তে ধ্রুবপুত্র গেল।

রেবা অস্ফুটস্বরে বলল, চৈত্রপূর্ণিমার রাতেই চলে গেল ধ্রুবপুত্র।

হ্যাঁ, কেমন নীরব হয়ে যেতে লাগল শিবনাথ, ঠিকই মনে করেছ, ধ্রুবপুত্র যাওয়া মানে সব চলে যাওয়া, তবে তাম্রধ্বজও জ্ঞানী।

রেবা নিশ্চুপ তাকিয়ে আছে পথের দিকে। এল নাকি তাম্রধ্বজ গম্ভীরা ঘুরে? ধ্রুবপুত্রও গম্ভীরার তীরটি ভালবাসত। শিবনাথ বলল, জানো মা, ও বলে রাতে হাঁটলে নাকি গাছের কথা শোনা যায়, একটা গাছ আর একটা গাছকে ডাকে, তাম্রধ্বজ অদ্ভুত!

তখন রেবা ফিরল গন্ধবতীর কথায়। বলল, জানেন রাজার কুয়ো শুকিয়ে গেছে।

সে কী! কে বলল?

আপনার নাতনি।

কী সব্বোনাশ, জল কে দেবে তাহলে?

রেবা বলে, গম্ভীরা, বালি খুঁড়তে হবে বাবা।

মাথা ঝাঁকাতে লাগে শিবনাথ, এমন কখনো হয়নি, অনাবৃষ্টি কি নতুন কিছু!

রেবা বলল, উদ্ধবনারায়ণ ধরেছিল সুগন্ধাকে।

শিবনাথ বসে পড়ল মাটিতে, এ কী বলছ তুমি!

স্পর্শ করতে পারেনি, মেয়ে পালিয়ে এসেছে, আপনি কি উদ্ধবকে কথা দিয়েছেন?

না তো, খলপ্রকৃতির পুরুষ ও, ওকে কথা দেব কেন? তুমি রাজি হলেও আমি রাজি ছিলাম না।

রেবা বলল, মেয়ে বিয়ের মতো হয়ে উঠেছে, তাই হ্যাঁ বলেছিলাম, কিন্তু ওতো খল, কিন্তু রাজকর্মচারী, ও যদি অপহরণ করে, আমার ভয় করছে বাবা।

শিবনাথ রেগে ওঠে, অপহরণ করবে, বললেই হলো, দেশে রাজা নেই, আমি যাব রাজার কাছে।

রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধে রাজার কাছে অভিযোগ জানালে কী লাভ হবে বাবা, রাজকর্মচারীর দোষ রাজা কি দেখবেন? অন্য রাজকর্মচারীরা তো উদ্ধবকে রক্ষা করবে, রাজার কর্মচারীর কোনোদিন শাস্তি হয় শুনেছেন?

শিবনাথ চুপচাপ শুনছিল রেবার কথা। কথা অসত্য নয়। রেবা খুব যুক্তিপূর্ণ কথা বলে। এই যে স্বামী ফেরেনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে, পাঁচটি বছর চলে গেছে, কখনো রেবা ভেঙে পড়েনি, পথের দিকে চেয়েই দিনপাত করছে।

গোধূলি শেষ হয়ে যাচ্ছিল। তখন তাম্রধ্বজ এসে দাঁড়াল প্রাঙ্গণে! ডাকল অনুচ্চ কণ্ঠে, রেবা মা।

কে-এ-এ! চমকে ওঠে রেবা। কার কণ্ঠস্বর!

রেবার সামনে এসে দাঁড়াল তাম্রধ্বজ, আমি আচার্য বৃষভানুর আশ্রমের তাম্রধ্বজ, আমাকে কি বিস্মৃত হলেন আপনি?

রেবা ত্রস্ত পায়ে সরে দাঁড়ায়, মাথার উত্তরীয় টেনে বলল, তুমি যে মা বলে ডাকবে তা তো আমি ভাবিইনি, সুগন্ধা এই দ্যাখ, সেই জ্যোতির্বিদ এসেছে, বাবা তুমি দাঁড়াও, আমি আসন আনি।

আসন নিয়ে এল গন্ধবতী। আর একটি জলচৌকি আঙিনায় রেখে দূরে সরে দাঁড়াল। রেবা আনল জলপাত্র। শিবনাথকে ডাকল, জল এনেছি বাবা, মুখ-হাত ধুয়ে নিন, তাম্রধ্বজ তুমিও নাও, তুমি তো যখন আসো, সূর্যদেব আকাশে থাকেন না তুমি নাকি রাত্রিকে পছন্দ করো।

হাসে তাম্রধ্বজ। রাত্রি কে পছন্দ করে, যে নিশাচর সে, আমি অবাক হয়ে যাই রাত্রির আকাশ দেখে, এখন তো কৃষ্ণপক্ষ, কুয়াশাও কমেছে অনেক, দেখুন এর ভিতরে আকাশ কীভাবে ঝলমল করে উঠছে, আকাশ যে এত সুন্দর তা সূর্যের আলো না নিভলে কী করে বোঝা যেত?

কথাটা শেষ হলে রেবার সঙ্গে গন্ধবতীও তাকায় আকাশে। আকাশ ক্রমশ অলঙ্কৃত হচ্ছে নক্ষত্র মালায়। গন্ধবতীর সঙ্গে রেবাও মাথা নামায়। তাম্রধ্বজ আকাশেই তাকিয়ে। মা মেয়ে দশার্ণ দেশের যুবকটিকে দেখছিল।

গন্ধবতী বলল, মা দুধ ফোটাবে না?

হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করি।

গন্ধবতী চাপা গলায় বলল, জিজ্ঞেস করতে হবে না। পথ তো অনেক, হেঁটে এসে নিশ্চিত ক্ষুধার্ত হয়েছেন উনি।

হ্যাঁ যাই! বলেও দাঁড়িয়ে থাকল রেবা। তাম্রধ্বজ আরো একটু বাদে চোখ নামায় আকাশ থেকে। হাসল মা, মেয়ের দিকে চেয়ে। বলল, আজ তো কৃষ্ণা তৃতীয়া, চাঁদ উঠে যাবে যখন আমি রওনা হবো, চাঁদের আলোয় আলোয় পৌঁছে যাব।

গণনা সম্পূর্ণ হয়েছে? চাপাগলায় জিজ্ঞেস করে রেবা।

হবে মা, কিন্তু আমি তো সবটা জানতে পারিনি সেই দিন, এর আগে যেদিন এলাম।

একটি মাস আগে, পৌষ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী ছিল সেদিন। বলল গন্ধবতী।

চমকে মেয়ের দিকে তাকায় রেবা। তার তো মনে নেই দিনক্ষণ, মেয়ে মনে রেখেছে। রাখবেই তো। তাম্রধ্বজ যে খবর আনবে ধ্রুবপুত্রের, কার্তিককুমারের। তাম্রধ্বজ আবার আকাশ দেখল, তারপর রেবাকে বলল, মা তোমার কন্যাটির মন অতি কোমল, শুদ্ধ, আলোর মতো প্রায়, তার স্মৃতিও প্রখর, আর কী জান?

রেবার মুখে হাসি ফুটল। গন্ধবতী কুঁকড়ে যায় আচমকা তাম্রধ্বজ তাকে নিয়ে প্রসঙ্গ অবতারণায়, সে একটু পিছিয়ে যায় আঙিনার অন্ধকারে। যাতে কথাগুলো শোনা যায় অথচ তাকে না দেখতে পায় তাম্রধ্বজ। আচার্য বৃষভানুর শিষ্য বলছে, তোমার কন্যাটি সুলক্ষণা, তার স্নিগ্ধতাও অপরিসীম, সে যদি চায় গ্রহ যতই বিরূপ হোক নিরুদ্দিষ্ট জন তার কাছে ফিরে আসবেই, আমি ধ্রুবপুত্রের কথা বলছি।

গন্ধবতী এগিয়ে এল। সে টের পেল পরের কথাটি বলতে গিয়ে তাম্রধ্বজ নিজেকে ঘুরিয়ে নিল।

নিয়ে যেন নিজের ভার থেকে নিজে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করল। অথচ গন্ধবতী নিজে টের পাচ্ছে তাম্রধ্বজ আরো ভারী হয়ে গেছে। কী কথা বলতে চেয়েছিল সে? কোনো দুঃসংবাদ কি আবিষ্কার করে তাকে শান্ত করতে চাইছে তাম্রধ্বজ? তার গুণগান করে আড়াল করতে চাইছে দুঃসংবাদটিকে? সংবাদটি কি ধ্রুবপুত্রকে ঘিরে?

গন্ধবতী জিজ্ঞেস করল, আমার পিতার কোনো খবর পেলেন আপনি?

তাম্রধ্বজ বলে, আসলে যত সময় যায় তত আবছায়া হয়ে যায় সব।

আপনি কী জেনেছেন?

তাম্রধ্বজ বলে, ধ্রুবপুত্রের সেই নিষ্ক্রমণের দিনের কথাটি তুমি আমাকে শুনিয়েছিলে, তোমার পিতারটা শুনেছিলাম তোমার মায়ের কাছে।

তাতে কী হলো, আপনার গণনা কী বলছে?

তাম্রধ্বজ আকাশে তাকায়। একটি বিষয় নিয়ে ভেবে দেখি বরং, আচ্ছা মা রেবা তুমি থাকো, কিন্তু পিতামহ কি থাকবেন?

শিবনাথ উঠে দাঁড়ায়। আমি ক্লান্ত, তুমি কথা বলো ; আমি তো সবই জানি। আবার কী শুনব।

গন্ধবতী জিজ্ঞেস করে, ঠাকুর্দা সব জানেন?

হ্যাঁ জানেন, আজ আশ্রম থেকে হেঁটে আসার পথে সব বলেছি।

কী বলেছেন?

তাম্রধ্বজ বলল, তুমি যে কথা বলেছিলে, সেই চৈত্র পূর্ণিমার রাতের কথা।

গন্ধবতী মাটিতে ধুলোর উপরে বসে পড়েছে। তার গায়ে নিজের গায়ের পশম চাদরটি চাপা দিল রেবা, বলল, আমি বরং তোমার জন্য দুধ ফোটাই।

তুমি শুনবে না?

মেয়ের কাছে শুনে নেব।

মাথা নাড়ে তাম্রধ্বজ, আমি ক্ষুধার্ত নই। মা তুমি বসো, মেয়ে গন্ধবতী এই তাম্রধ্বজ যা বলেছে তা তো তোমাকে পুনর্বার বলতে পারবে না, আর এই দশার্ণ দেশীয় মানুষ যা বুঝেছে তাও মেয়ে তোমাকে স্পষ্ট করে বলতে পারবে না—।

গন্ধবতী অবাক হয়ে যাচ্ছিল। কী জেনেছে গণনায় এই পুরুষটি? সে মাথা নিচু করে বসেছিল। তখন তাম্রধ্বজ তার কথা আরম্ভ করল। শোনো মা, যদি দিনক্ষণ ঠিক পাই, যা ঘটেছিল তা হুবহু শুনতে পাই, চোখের সামনে তা যদি হুবহু ভেসে ওঠে, তাহলে তো সবকিছুই খুঁজে পাওয়া যায়।

গন্ধবতী চাপাগলায় বলল, আপনি আমার বাবার কথা বলুন।

আমাকে আমার কথা শেষ করতে দাও।

গন্ধবতী বলল, ধ্রুবপুত্রের কথা শুনতে চাই না, আমার বাবা কোথায় গেলেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে, সেই কথা বলুন।

তাম্রধ্বজ বলল, তুমি যতটা ছবির মতো আভাস দিয়েছ আমাকে, মা ততোটা দেননি, তুমি তো আমাকে সেই চৈত্র পূর্ণিমার রাতে গম্ভীরা নদীর ধারে নিয়ে গিয়েছিলে গন্ধবতী, মনে পড়ে সেই কামদেবের মন্দির থেকে ফেরার কথা, গৃহবন্দি হয়ে আছে সখা ধ্রুবপুত্র।

গন্ধবতী চাপা গলায় যেন ফোঁস ফোঁস করে ওঠে, আমি ওসব আর মনে রাখতে চাই না হে দশার্ণ দেশের মানুষ, আমার পিতা কার্তিককুমারের কথা বলুন, আমার আবছা মনে পড়ে সব। কুয়াশায় যেমন ঢেকে গিয়ে প্রকৃতি তার আভাসটুকু জাগিয়ে রাখে পিতা তেমনই রেখেছেন, মনে পড়ে তিনি সুগন্ধা সুগন্ধা ডাক দিলেন, আমি ছুটে গেলাম তাঁর কোলে....।

সব সত্য তো প্রকাশিত হয় না একদিনে, আমাকে তুমি বলতে দাও ধ্রুবপুত্রের কথা, তুমি যেমন বলেছিলে চৈতিপূর্ণিমায় মদনোৎসবের কথা, তেমনই বলছি আমি, তারপরও কিছু কথা থাকবে আমার।

গন্ধবতী উঠে দাঁড়াল। ধ্রুবপুত্র যাক, হারিয়ে যাক। হুন আশ্রয়ে যাক। তার জন্য আমার কত অসম্মানই না হলো। আমাকে সে না বুঝে গণিকায় মত্ত হলো, গণিকার কাছে, শ্রেষ্ঠীর কাছে অসম্মানিত হয়েও আমার দিকে ফিরল না, চলে গেল অবন্তী ছেড়ে। আপনি কার্তিককুমারের কথা বলুন। আমার পিতার কথা কী জেনেছেন গণনায়! বলতে বলতে গন্ধবতী অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হলো।

আঠারো

সেদিন ছিল মদনোৎসব। চৈত্র পূর্ণিমা। কামদেবের মন্দিরে যৌবনমেলা, যৌবনোৎসব। সেদিনই অতি প্রত্যুষে, উষার আলোয় ঘরে ফিরল ধ্রুবপুত্র। গন্ধবতীর ঘুম ভেঙেছিল আরো আগে চৈত্র পূর্ণিমার ভোরে। বসন্তোৎসবের দিন। সখার টানেই যেন ঘুম ভেঙে উঠে আবছা আলোর ভিতরে সে বসেছিল আঙিনায় পুবের দিকে চেয়ে। ওই আকাশে তখন শুকতারাটি জ্বলজ্বল করছিল, দক্ষিণ দিগন্তে অগস্ত্য নক্ষত্র। নক্ষত্ররা আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। তখন দেখা গেল ধ্রবপুত্রকে। ঝুঁকে হাঁটছে। বোধহয় মধ্যরাতে উজ্জয়িনী থেকে রওনা দিয়েছিল। চৈত্রের রাত তো শীতলই হয়। ধ্রুবপুত্রের গায়ের উত্তরীয়খানি ময়লা, বুকটি উদলা। দেহটি শীর্ণ, হয়ত অনাচারে অমন হয়েছিল। রক্তবর্ণ চক্ষু দুটি কোটরগত। ক্ষৌরকর্ম না করায় মুখখানি আরো রুগ্ন লাগছিল। শুকতারাটি নিভে গেল, ধ্রুবপুত্র আঙিনায় পা দিল। গন্ধবতী অভিমানে মুখ ফিরিয়ে ছিল।

গন্ধবতীর তখন সবই জানা। ওই উদ্ধবনারায়ণ কত দিন ধরে চেয়ে আছে গন্ধবতীর দিকে। উদ্ধবনারায়ণই একটি খচ্চরের পিঠে চেপে এসে খবর দিয়েছিল তার ঠাকুর্দাকে। প্রধান গণিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নগরে ভীষণ ঝড় তুলেছে ধ্রুবপুত্র। ওই গণিকা, দেবদত্তা তো শ্রেষ্ঠী সুভগদত্তের নয়নের মণি, এ কথা কে না জানে। নির্বোধ যুবক শেষ পর্যন্ত কিনা শ্রেষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদে হাত দিতে গেল তারই আশ্রয়ে থেকে।

গন্ধবতী বিশ্বাস করেনি। তার ভালই লাগেনি উদ্ধবের উপস্থিতি। উদ্ধবের চোখের ভাষাও ছিল সন্দেহজনক। কিন্তু ঠাকুর্দাই তো তারপর ওই খবরই জানালেন নগরে গিয়ে। তিনি দেখা পাননি ধ্রুবপুত্রের। শ্রেষ্ঠী ছিলেন ভীষণ ক্ষুব্ধ। সে তখনই উজ্জয়িনী ত্যাগ করেছিল কিনা তা জানা যায় না, তবে ফিরেও তো এল চৈত্র পূর্ণিমার ভোরে। ওই ফেরা চিরকালের ফেরা তা ভেবেছিল গন্ধবতী। না হলে সে মদনোৎসবের দিনে ফিরবে কেন? হায়, কেন যে অভিমানে অন্যদিকে ফিরে ছিল সে? যদি জানত অবন্তী ত্যাগ করার জন্যই শেষবারের মতো ফিরেছে তার সখা, সে কি তাকে যেতে দিত? সখার দিকে মুখটি ফেরালেই সখার সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যেত। সমস্ত অপমান, লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত হতো সখা। ঘরে ঢুকল ধ্রুবপুত্র। অর্গল রুদ্ধ করল।

এসব আমি জানি। চাপা গলায় বলল রেবা, সে এখন কোথায়?

তাম্রধ্বজ বলল, সমস্তটা আপনার জানার কথা নয়, সমস্তটা কেউ জানে না, না গন্ধবতীও নয়, নয় সেই ধ্রুবপুত্রও।

তাহলে কে জানে?

তাম্রধ্বজ বলল, আমি জানি মা।

তোমার গণনায় জেনেছো?

হাসে তাম্রধ্বজ, সে তো নিশ্চয়ই। আপনি আকাশের দিকে তাকান, আপনার মনের ভিতরেও জেগে উঠবে অজানা সত্যগুলি।

আমি যে গ্রহ তারা চিনি না, কয়েকটি মাত্র চিনতে পারি।

তাম্রধ্বজ বলে, লক্ষ কোটি তারা, কে চেনে সব? আকাশগঙ্গায় কত সহস্র তারকা, নীহারিকাপুঞ্জ, কে চেনে তাদের? কিন্তু আকাশে তাকালে, অযুত আলোর বিন্দুর দিকে রাত্রিকালে তাকালে বুক ভরে ওঠে না! আপনি ওই আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবুন সেই দিনটির কথা। পরমান্ন রাঁধলেন ধ্রুবপুত্রের জন্য। সেই পরমান্ন গ্রহণ করল না সে। দুয়ার খোলে না। জানালাও বন্ধ। গন্ধবতী কতবার ডাকল, সখা সাড়া দিল না।

সব আমার জানা।

কী আর জানা, যেটুকু চোখে দেখেছেন, সেইটুকুই তো। চোখের আড়ালে যা ঘটে গেছে তার খবর তো রাখেন না মা। আমি এলাম গম্ভীরা হয়ে, নদীটি জলহীন হয়ে পড়ে আছে। বালুরাশি সরিয়ে নদীর অন্তঃস্থল থেকে জল সংগ্রহ করছে গ্রামবধূ, গ্রাম বালিকারা। এই তো সেই নদী, যে নদীর স্বচ্ছ জলে বর্ষার মেঘের ছায়াময় শরীর প্রবেশ করত। সেই জল, সেই মেঘ অবন্তীর আকাশে নেই। মনে পড়ে কি মা, বর্ষায় এই ধরণী কেমন উল্লসিত হয়ে উঠত, কেমন মধুর গন্ধ ব্যাপ্ত হয়ে যেত চারদিকে, সেই

গন্ধ উঠত মাটি থেকে, সজীব বৃক্ষাদি লতাগুল্ম থেকে, বাতাসে মিশে যেত নদীর স্রোতধ্বনি, নদীতীরের ডুমুর বনে ডুমুর পেকে উঠছে ধীরে ধীরে......।

আশ্চর্য। অস্ফুটধ্বনি বেরিয়ে এল রেবার কণ্ঠ থেকে, এসব তুমি দেখেছো?

উহুঁ, আমি তো বেত্রবতীতীরের মানুষ, বেত্রবতী দশার্ণ দেশের দক্ষিণ-পুবে।

তবে তুমি গম্ভীরার বর্ষার রূপ জানলে কী করে?

জানি মা।

গণনায় জেনেছো?

তাম্রধ্বজ বলে, বেত্রবতী নদীও শুকিয়ে গেছে, জল নেই, দশার্ণ দেশেও বৃষ্টি হয়নি। একটি অরণ্যে দাবানল লেগেছিল দূর আম্রকূট পর্বতের সানুদেশে। সেই দাবানল এখনো জ্বলছে মা। ধিকিধিকি জ্বলছে আগুন। গ্রাস করে নিচ্ছে সমস্ত সবুজ। অরণ্যচারী নিষাদরা পালাচ্ছে। অরণ্যের প্রাণীরা লোকালয়ে এসে পড়ে নিহত হচ্ছে।

কী করে জানলে?

শুনেছি মা, আম্রকূটের দিক থেকে আসা একদল বণিক উজ্জয়িনী পার হয়ে কনখলের দিকে চলে গেল।

আশ্চর্য! রেবার দুটি চোখ বিস্ময়ে স্ফীত হয়ে উঠেছে অন্ধকারে।

তাম্রধ্বজ বলে, ওই আম্রকূটেই রেবা নদীর জন্ম। সেই নদী শুষ্ক, বিশীর্ণা।

তারপর! রেবার চোখদুটি ছলছল করে আকাশের দিকে চেয়ে।

তাম্রধ্বজ বলে, আম্রকূট থেকে উত্তরের পথে সেই নদী পার হয়েছিল বণিকেরা। বালু ধূ-ধূ, বৃষ্টি নেই, রেবা নদী প্রমত্ত হবে কী করে? এবার কদম্ব কি ফুটেছিল? জানিনা। ভুঁইচাঁপা কি ফুটেছিল ভিজে মাটিতে? দেখিনি। মনে পড়ে মা সেই বর্ষার কথা, মেঘের তলা দিয়ে চিতল হরিণ যূথ ছুটে যাচ্ছে নদীতীর ধরে, আকাশের মেঘের দিকে চেয়ে ময়ূরের কেকাধ্বনি। আমার দশার্ণ দেশ এক সুন্দর বাসভূমি, কেতকীর সার দিয়ে ঘেরা। দশার্ণ দেশটি জম্বুবনে শ্যামল, জম্বুবৃক্ষে পরিপক্ক ফল, ওই বৃক্ষেই আবার পাখিরা বাসা নির্মাণ করছে খড়কুটোয়, কেতকী বনে কুঁড়ি এসেছে বর্ষার আগমনে, বেত্রবতী ছিল জলপূর্ণ, কী লীলায়িত ভঙ্গী সেই নদীর—এখন জলহীন।

রেবা স্তব্ধ হয়ে আছে। সে জানেও না অদূরে অন্ধকারে এসে দাঁড়িয়েছে গন্ধবতী। তাম্রধ্বজ দেখতে পাচ্ছিল গন্ধবতীর অবয়ব। চোখ দুটি অন্ধকারে যুগল দুই নক্ষত্রের মতো জ্বলছিল আলোর বিন্দু হয়ে। তাম্রধ্বজ বলছিল নীচৈঃ পাহাড়ের কথা। দশার্ণ দেশের রাজধানী বিদিশা নগরীর কথা। বেত্রবতী নদীর তীরেই বিদিশা নগরী। তার উপকণ্ঠে নীচৈঃ পাহাড়। এখন সেই পাহাড়ের চারপাশের গভীর নৈঃশব্দ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। পাহাড়ের নির্জনতা তো প্রণয় বিলাসী-বিলাসিনীদের পরম প্রিয় ছিল। নির্জন গিরিগুহায় যুবক-যুবতীরা মিলিত হতো, প্রণয় সম্ভাষণে মুখর করে তুলত দশদিক। সেইসব বিলাসী, বিলাসিনী নারী-পুরুষের দেহের সুগন্ধে ভরে থাকত নীচৈঃ পাহাড়ের গুহা। এখন দ্বিপ্রহরে শুধু শৃগালেরা ঘুরে বেড়ায় ওই পাহাড়ের কোলে। গুহাগুলি হিংস্রপ্রাণীর বাসভূমি হয়েছে। মনে পড়ে বেত্রবতীর নদীর দুই কূলে নববর্ষায় যূথিকার বন গভীর হয়ে যেত। সেই বনে রমণীরা পুষ্পচয়ন করতে আসত। এখন নদীতীর খাঁ খাঁ, শুধু বালি ওড়ে।

গন্ধবতী এগিয়ে এল, এসব আপনাকে কে বলেছে?

কেউ না, আমি তো দশার্ণের মানুষ।

কিন্তু আম্রকূট পাহাড়, রেবা নদী?

বণিকেরা।

বণিকেরা এত মধুর করে দেখতে জানে?

হাসে তাম্রধ্বজ, কী জানি!

আপনাকে কে বলল, বলুন।

তাম্রধ্বজ আকাশে তাকায়, আকাশের নক্ষত্রদের দিকে হাত তুলে তর্জনী নিক্ষেপ করে। মগ্নস্বরে বলল, আকাশের তারারা। আকাশে তাকিয়ে এই সবই যেন দেখতে পাই আমি। দেখতে পাই সেই বর্ষায়

গম্ভীরা কেমন ছিল, গম্ভীরার কূলে কারা দাঁড়িয়েছিল।

আপনি বলুন আমার পিতা কার্তিককুমার কোথায় আছেন।

রেবা আচমকা চাপাস্বরে কেঁদে ওঠে, না, থাক, আমি জানতে চাই না।

গন্ধবতী এগিয়ে মাকে স্পর্শ করে। সে কাঁপছিল থিরথির। তার মনে হচ্ছিল মা রেবা বোধহয় জানে উদ্ধবনারায়ণের সেই কথা। রটনাটি শুনেছে মা। কিন্তু তাই বা কী করে হয়? তাহলে কি মা তার কাছে প্রকাশ করত না রটনাটি?

রেবা নিজেকে সম্বরণ করে নিয়েছে। বলল, তুমি যা বলছিলে বলো, আমাকে জানাও কোথায় কীভাবে আছে ধ্রুবপুত্র।

গন্ধবতী মাকে ভর করে বসে পড়ল আঙিনায়। মা-মেয়ে বসে আছে পাশাপাশি। তাম্রধ্বজ বলল, যে কল্পনাহীন তার কথার কোনো মূল্য নেই।

চমকে ওঠে গন্ধবতী, এ কার কথা। এই কথাই যেন সখা বলত উদ্ধবনারায়ণ সম্পর্কে। হায়। কে বসে আছে সামনে?

তাম্রধ্বজ বলল, এই যে অবন্তীদেশ, উজ্জয়িনী নগর, এই নগরের আকাশে, মহাকাল মন্দিরের শীর্ষে, হর্ম্যশ্রেণীর মাথায় যখন হিমালয়ে যাত্রা করা মেঘ এসে দাঁড়াত, মনে পড়ে মা?

রেবা নয়, গন্ধবতীর দু'চোখ দিয়ে জল পড়ছে। এই মানুষটি কি ইন্দ্রজাল জানে? এই কথা তো ধ্রুবপুত্রের। অবিকল ধ্রুবপুত্রের।

রেবা বলল, এইসব কথার সঙ্গে ধ্রুবপুত্রের কী সম্পর্ক? সে কোথায় আছে তাই তো শুনতে বসে আছি।

তাম্রধ্বজ বলল, সেই কথার ভিতরে প্রবেশ করতে এত কথা, শোনো মা, সেই ধ্রুবপুত্র নেই, অবন্তী, দশার্ণ দেশ পুড়ছে রৌদ্রে, মেঘ নেই, তুমি মা মেঘের কথা জানো?

রেবা চুপ করে আছে। রেবা ঠিক ধরতে পারছে না কী বলতে চায় তাম্রধ্বজ। কোন কথা থেকে কোন কথায় চলে যাচ্ছে সে। গন্ধবতী ভাবছিল সে কি ঠিক শুনছে! নাকি সবটাই তার শ্রবণের বিভ্রম। যে কথা শুনত সে গম্ভীরা তীরে বসে, এই গ্রামের ধূলিতে ধূসরিত হতে হতে, বকুল ফুলের মালা গাঁথতে গাঁথতে, সেই কথাই যেন শুনছে এই অন্ধকারে বসে। ওই যে বলছে তাম্রধ্বজ, মেঘ তিনরকমের। উৎপত্তি ভেদে মেঘ আগ্নেয়, ব্রহ্মজ ও পক্ষজ। এই কথাটি ধ্রুবপুত্র বলেছিল? বলেনি বোধহয়, কিন্তু মনে হয় যা বলছে ওই দশার্ণদেশীয় জ্যোতির্বিদ, তার সবটাই সে যেন তার সখার কাছে শুনেছে। সখাই তো এমন কথা জানে। আর কেউ জানে না। কিন্তু বলে যাচ্ছে তো তাম্রধ্বজ আকাশের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে।

যে মেঘ নেই অবন্তীর আকাশে, সেই মেঘ আগ্নেয়, ব্রহ্মজ, পক্ষজ। আগ্নেয় মেঘ জলজাত। এই মেঘ মহিষ, শূকর ও মত্ত হস্তীর আকারে আকাশে ভেসে ওঠে, পৃথিবীতে নামে। এরাই জীমূত। এদের দিয়ে প্রাণবান হয় পৃথিবী। এই মেঘ নিজেকে নিঃশেষিত করে পৃথিবীকে সিক্ত করতে করতে। এই মেঘ নিঃশব্দে ধারাবর্ষণ নামায়। আর যে মেঘ বিদ্যুৎগুণসম্পন্ন, গর্জন করে যায় আকাশমণ্ডলে, যে মেঘের ডাকে বলাকারা গর্ভবতী হয়, যে মেঘ ব্রহ্মা নিঃশ্বাসে উৎপন্ন, সেই মেঘই ব্রহ্মজ মেঘ। এই ব্রহ্মজ মেঘই পাহাড় চূড়ায়, হর্ম্যশ্রেণীর মাথায় ডেকে ডেকে ফেরে আষাঢ়, শ্রাবণ, প্রোষ্টপদে। ধরণী এই মেঘের ডাকে শস্যশালিনী হয়, সুন্দর হয়ে ওঠে। এই মেঘের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অতি মধুর। মা সেই মেঘের কথা কি মনে পড়ে?

গন্ধবতী অস্ফুট শব্দে শিহরিত হয়, সবই যেন শোনা আমার!

তাম্রধ্বজ তখন বলে যাচ্ছিল পুষ্করাবর্ত মেঘের কথা। পক্ষজ মেঘেরই সেই নাম। মহাতেজস্বী পর্বতগণ আগে পক্ষধর ছিল। তারা উড়ে উড়ে বেড়াত পৃথিবীময়। তাদের অত্যাচারে প্রাণীকুল দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হয়। দেবরাজ তখন পর্বতের পক্ষ ছিন্ন করেন। সেই ছিন্ন পক্ষই হয়ে যায় জলেভরা মেঘ। সেই মেঘের নামই পুষ্করাবর্ত। তাদের নানারূপ। কথিত আছে এই মেঘ কল্পের শেষে বর্ষণ করে, কল্প হলো ব্রহ্মার এক অহোরাত্র। ব্রহ্মার অহোরাত্রর কথা কল্পনায় আসেনা। কোটি কোটি বর্ষ তা। জ্ঞানীরা বলেন চারিশত বত্রিশ বর্ষ অন্তে এক কল্প শেষ হয়। এই মেঘে বৃষ্টি হবে যুগান্তকালে। এই রকম কত

যুগান্তই না পার হয়ে গেছে আমাদের অজ্ঞাতে। কত সহস্রবার বৃষ্টিপাতে পৃথিবী, প্লাবিত করেছে পুষ্করাবর্ত মেঘ।

গন্ধবতী বলে, এবার কি পুষ্করাবর্ত মেঘে বৃষ্টি হবে, প্লাবিত হবে পৃথিবী। যুগান্ত হয়ে যাবে, না হলে আকাশ এমন অন্ধ, ঘুমিয়ে আছে কেন?

তাম্রধ্বজ বলে, যেন মনে হয় তাই! না হলে এমন হবে কেন, ধ্রুবপুত্র কি কিছু বলে গিয়েছিল?

গন্ধবতী বলে, এসব বলেছিল কিনা মনে নেই, তবে এখন যেন মনে হচ্ছে এইসব কথাও যেন বলতে চেয়েছিল সে, ঠিক এই কথা, এমন কথা বলার কথা ছিল তার সেই চৈত্র পূর্ণিমার সন্ধ্যায়।

সত্যি বলছ?

হ্যাঁ, সেও তো বলত পুষ্করাবর্ত মেঘের কথা, সেই মেঘ সব আগুন নিভিয়ে দেয়, পরাবহ নামে এক বাতাসের আশ্রয়ে তারা থাকে......।

বলো, বলে যাও। তাম্রধ্বজ বলে।

আমার সব মনে নেই, তবে মেঘের কথা সে খুব বলত, সমস্ত মেঘের ধূমের কথা বলত, সেইসব ধূমের ভিতরে চার দিগগজ— গজ, পর্বত, মেঘ, সর্প এবং পর্জন্যই হলো শ্রেষ্ঠ।

তাম্রধ্বজ বলে, হ্যাঁ, গজ, পর্বত, মেঘ এবং সর্প, এই চার দিগগজ একই কুল থেকে এসেছে। একই জল থেকে এদের জন্ম হয়েছে। পর্জন্য ও দিগগজেরা হেমন্তকালে শস্যবৃদ্ধির জন্য তুষারপাত ঘটায়, হিমপতন হয় তাদেরই জন্য।

গন্ধবতী বলে, এখন কি মেঘেরই কথা বলা হবে?

হ্যাঁ তাই।

এসব কথা তো আমার শোনা মনে হয়, ওই যে যুগান্তের কথা বললেন সবই তো আগে শুনেছি যেন, গম্ভীরা তীরে শুনেছি, শুনেছি এই আঙিনায় চন্দ্রালোকের ভিতরে বসে, নাহলে পরাবহ বাতাসের কথা বললাম কীভাবে, পুষ্করাবর্ত মেঘের আশ্রয় যে বাতাসে।

শোনো গন্ধবতী তোমাকে এই শীতঋতুর বৃষ্টির কথা বলি, তোমার কি মনে পড়ে হিমালয়ের উত্তরে, সুমেরু পর্বতের দক্ষিণে হেমকূট নামে এক পর্বত আছে।

মাথা নাড়ে গন্ধবতী। ফিসফিস করে, এই কথা হয়ত সেই চৈত্র পূর্ণিমার রাতে বলত ধ্রুবপুত্র, সে এখন কোথায়?

তাম্রধ্বজ যেন শোনেই না কথাটা, বলে, হেমকূট পর্বতের সানুদেশে এক নগর আছে, পুণ্ড্র তার নাম।

শুনেছি যেন।

আগে কি বলেছি?

বোধহয়। অনুচ্চ কণ্ঠে বলে গন্ধবতী।

শোনো হেমকূট পর্বতে তুষার বৃষ্টি হলে বাতাস সেই জল ধারণ করে হেমকূট থেকে হিমালয় পর্যন্ত বর্ষণে ভাসায়। সেই বর্ষার প্রভাবে অন্যদেশেও ঈষৎ বর্ষণ হয়ে থাকে, সামান্য বর্ষণ। সমতলে নেমে আসে সেই মেঘ, সমতলে সেই মেঘের প্রভাবে ফসল জন্মায়, মাঘের বৃষ্টি তো সুসময় আনে, মাটি নরম হয়, হল কর্ষণের উপযোগী হয়ে ওঠে।

মাঘ তো শেষ হয়ে গেল, আসবে সেই মেঘ?

তাম্রধ্বজ আকাশের অযুত নক্ষত্রের দিকে তাকায়, মগ্নস্বরে বলে, হেমকূট থেকে হিমালয়, হিমালয় থেকে সেই বাতাস আসে এইসময়, মদ্রদেশ, পাঞ্চালদেশ, সিন্ধু নদ, পঞ্চনদ পার হয়ে সেই মেঘ যমুনার কূলে কূলে বৃষ্টি নামায়, চর্মণ্বতী নদীর দুই অনার্দ্র তীর আর্দ্র করে এইসময়। ক্ষণবর্ষণ হলেও তা মানুষের অতিপ্রিয়। সেই মেঘ হিমালয় থেকে সমুদ্রের দিকে যায়, অপরা সমুদ্রে গিয়ে নিঃশেষ হয়।

সেই মেঘের কোনো চিহ্ন আছে আকাশে?

মাথা নাড়ে তাম্রধ্বজ, নেই।

তবে! গন্ধবতীর বুক থেকে যেন চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে। কোথাও কোনো আশ্রয় নেই। উদ্ধবনারায়ণ এসে দাঁড়াচ্ছে পিঠের কাছে। শরীরে ছায়া ফেলছে সেই দুর্বৃত্ত। রাজার জলভাণ্ড শুকিয়ে

গেছে। গম্ভীরার বুকে বালি উড়ছে। হায়! এ কোনদিন এল? কেন এল? এর থেকে পরিত্রাণের কী উপায়? যে বলতে পারত সে এখন কোথায়, কোন সুদূরে?

তাম্রধ্বজ বলে, সেই নিষ্ক্রমণের মুহূর্তগুলি জানতে এসেছি, যতটা জানো আমাকে বলো তুমি, চৈত্র পূর্ণিমার ভোরবেলায় সে ফিরে এল উজ্জয়িনী থেকে, তারপর?

গন্ধবতী আকাশে তাকায়। অযুত নক্ষত্রের ভিতরে ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল সেই চৈত্রের পূর্ণিমা। সেদিন ছিল মদনোৎসব। কামদেবের মন্দিরে যাওয়ার দিন। মনে আশা ছিল সখার হাত ধরে যাবে মদনোৎসবে।

সে এল ভোরে। গন্ধবতী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল অভিমানে। ঢুকল ধ্রুবপুত্র নিজ ঘরে। ওই যে সেই ঘর। দুয়ার টেনে বন্ধ করা আছে। ওই ঘরে আর ঢোকেনা গন্ধবতী। কিন্তু আচমকা এমন কি মনে হয় না যে ঘরে হয়ত ফিরে এসেছে ধ্রুবপুত্র। কোনো কোনোদিন লাফ দিয়ে ওই কুটিরের দাওয়ায় উঠে দরজা ঠেলে দেয়। ভিতরে স্তব্ধ শূন্যতা। বাতাসে গুমোট গন্ধ। ধ্রুবপুত্র যদি না ফেরে ধীরে ধীরে ওই কুটির পড়ে যাবে মাটিতে। কে ওর সংস্কার করবে? কেন করবে? ঠাকুর্দা বলেছিল একবার। কিন্তু তারপর তিনিও তো নিশ্চুপ।

গন্ধবতী জিজ্ঞেস করে, আপনি কোনোদিন কামদেবের মন্দিরে গেছেন?

কোথায়?

এখান থেকে দক্ষিণ-পুবে।

তা আমি জানি।

তবে যে জিজ্ঞেস করলেন?

আমার দশার্ণ দেশে, বিদিশা নগরেও আছে কামদেবের মন্দির।

দেখেছেন কামদেবকে?

তাম্রধ্বজ অস্ফুটস্বরে বলল, দেখেছি।

কবে দেখেছেন, বাল্যকালে?

না। সেই দশার্ণ থেকে এলাম অবন্তীতে, পথেই কৌতূহল হলো, দেখি কামদেবকে, কী সুন্দর দেবতা তিনি!

হুঁ। গন্ধবতী আকাশে চোখে মেলে দেয়।

যৌবন অমন সুন্দর হয়, জীবনের সেই পরম লগনে এসে পৌঁছেছিল ধ্রুবপুত্র, তুমিও গন্ধবতী সেই লগনই স্পর্শ করেছ।

আকাশ ঝলমল করে উঠল গ্রামবালিকার চোখের সামনে।

উনিশ

পরমান্ন রেঁধেছিল মা রেবা। সেই পরমান্নর সুবাস ঘর-আঙিনায় ছড়িয়ে গেল। দুয়ার বন্ধ বলে সখা তা টেরও পেল না। মায়ের হাতের পরমান্ন তার অতি প্রিয় ছিল। মা ডাকল কতবার, কতবার ডাকল গন্ধবতী। সে দুয়ার খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল না। চৈত্র পূর্ণিমা। মা বলল, কামদেবের মন্দিরে পুজো দিয়ে আয়, বুড়ি পার্বতী যাবে সঙ্গে।

মা বোধহয় আগেই ভেবে রেখেছিল মেয়েকে পাঠাবে কামদেবের মন্দিরে। আর গন্ধবতীর মনেও তো বাসনা ছিল দেখে আসে কামদেবের রূপ। কামদেব আর রতি দেবীর কথা শুনেছিল সে মায়ের কাছে। শুনেছিল কামদেব কীভাবে ভস্ম হয়েছিলেন মহাদেবের রোষে। সেই শাপ থেকে মুক্ত হন কীভাবে কামদেব মর্ত্যলোকে জন্ম নিয়ে। রতিদেবীও স্বামীর উদ্ধারের জন্য জন্ম নিয়েছিলেন মর্ত্যে।

পার্বতী বুড়ি কুটনি। প্রাচীনা। বহুকালের বৈধব্য নিয়ে বুড়ি যেন ত্রিকালদর্শী। দেখেছে যেন এই সসাগরা পৃথিবীর সব। স্থলভাগ, জলভাগ। কী না জানে বুড়ি। অকালবৈধব্য নিয়ে জীবন কাটাল কিন্তু পুরুষ মানুষ সম্পর্কে তার কথাই যেন শেষ কথা। বুড়ি কামদেবের মন্দিরে কতবার গেছে। শরীরে রঙ নেই, মনেও নেই, তবুও যায়। কামদেবকে দেখে তার আনন্দ হয়। মনের রং ফেরে। বুড়ি বলে, চৈতি পূর্ণিমায় নারী-পুরুষের মিলনের কত লক্ষণই না দেখা যায় কামদেবের মন্দিরে। তা দেখেও সুখ।

এ জন্মে আমি রতির মতো দিন কাটালেম, পরজন্মে মর্ত্যে জন্ম নেব মায়াবতী হয়ে, ভস্ম হওয়া স্বামীকেও পাব সেখেনে, কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন হয়ে জন্ম নেবেন তিনি—হা কপাল। যার কেউ নেই তার কামদেব আছেন, কামদেবই তার সাধপূরণ করেন—।

কুটনি বুড়ি হাত ধরে গন্ধবতীর, ধ্রুবপুত্র তো গণিকায় মজেছে।

চমকে উঠেছে গন্ধবতী। মুখখানি কালো হয়ে গেছে দুঃখে। একথাও সব মানুষ জেনেছে। সব প্রাণী জেনেছে। ময়ূর, কবুতর, চকোর, চকোরী, চাতক, টিয়া, টিট্টিভ সব পাখি জেনেছে। জেনেছে বনের হরিণ, ধবলী গাইটি। জেনেছে গম্ভীরা নদী, নদীতীরের বেতসবন, বালুকাময় নদীর বুক, গাছ-গাছালি, সব। জেনেছে আকাশ, মাটি, রৌদ্র, বাতাস, সব। এই যে কামদেবের মন্দিরে গন্ধবতী চলেছে বুড়ি পার্বতীর হাত ধরে, পথে শুধু পত্র ঝরণের শব্দ, গাছের পাতাগুলি ঝরে ঝরে যাচ্ছে শুধু এই দুঃখে যে ধ্রুবপুত্র গণিকায় মত্ত হয়ে ভুলেছে গম্ভীরার মেয়েকে আর গম্ভীরার মেয়ে যাচ্ছে কামদেবের মন্দিরে পূজার ডালি নিয়ে ম্লানমুখে। তার মুখের ছায়া পড়েছে হাতের ডালিতে ধরা অশোক ফুলে। ফুল কালো হয়ে যাচ্ছে যেমন হয়েছে তার মুখখানি, রক্তাভ অধরখানি। সমস্ত রাত অনিদ্রায় গেছে তার, সেই ছায়া চোখের দু'কোলে। এই শ্যামরেখা আর প্রিয় সান্নিধ্যে নিদ্রাহীনতার শ্যামরেখায় দুস্তর তফাৎ। চোখ দুটি যেন গহ্বরে প্রবিষ্ট হয়েছে। কৃশ হয়েছে কন্যা। শরীর হয়েছে অনার্দ্র, নীরস তরু। মনে যে সুখ নেই তাকে দেখলে তা ধরা যায়। মনের ছায়া তার সর্ব অঙ্গে ফুটে উঠেছে।

বুড়ি পার্বতী জিজ্ঞেস করে, গণিকা নাকি তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে?

গন্ধবতীর মুখ অন্ধকার। একথা কেন তুলছে বুড়ি দাদি। এসবের সে কী জানে? বুড়ি কি জানেনা সখার জন্য দিবারাত্র তার মন পোড়ে। বুড়ি বলছে, কুকুর বেড়ালের মতো তাকে নাকি তাড়িয়েছে গণিকা দেবদত্তা চোরের মার খেয়েছিল বেটা।

জানিনে দাদিমা, যা রটে তার অনেকটাই রটনা। বলে গন্ধবতী।

বুড়ি তার দন্তহীন মুখে হাসে, বলে, যা রটে তার অনেকটাই ঘটে, উল্টো বলিস কেন, বেটা ছেলে তো গণিকা ঘরে যাবে, তার উপর আবার ধ্রুবদাসের বেটার বিয়ে হয়নি, মেয়েমানুষ কেমন তা জানেনা, কিন্তু শরীর তো জানতে চাইবে, তখন গণিকা ছাড়া কে জানাবে সব, গণিকা আছে বলে গেরস্তর ঘর নিশ্চিন্ত আছে, নইলে আইবুড়ো, সধবা বিধবা সবাইকে ধরে টানত পুরুষগুলো।

থাক দাদিমা, এসব শুনে কী হবে?

বুড়ি বলে, যাচ্ছিস কামদেবের মন্দিরে, বড় হলি এখন, তুই তো জানবি সব, সংসার হবে, স্বামীকে বশ করে রাখার উপায়, ছলচাতুরি তো জানতে হবে, না যদি জানিস তো সে পুরুষমানুষ গণিকার ঘরে গে পড়ে থাকবে, গণিকার পায়ে সব দেবে।

কেঁপে ওঠে গন্ধবতী। নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকায়। শূন্য নীলিমায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ছলছল করে ওঠে চোখের নদী। ধ্রুবপুত্র তার সখা, সে ধ্রুবপুত্রের সখী। সখী তো জানেনা কীভাবে সখাকে বেঁধে রাখবে মনের ভিতরে। সে যা জানে, সব তো ওই সখার কাছেই জানা। বুড়ি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলে, ওরে মেয়ে, আর কেন এবার যে কোনো উপায়ে চার হাত এক করে দিক তোর মা, তোর এই যৌবনের রূপ যদি না দেখল তো....।

দাদিমা, তুমি থামো।

হি হি করে হাসে বুড়ি পার্বতী, এই আমার বুক দ্যাখ, ছিল ওই তোর মতো, ওই রকম পূর্ণচন্দ্র। যৌবন থাকে না চিরকাল, যতক্ষণ আছে পুরুষমানুষও আছে সঙ্গে, ভেড়া হয়ে তাকবে, তোর পায়ের কাছে লুটোবে, শোন মেয়ে, না হলো বিয়ে সে কি তোকে ভালবাসেনি?

দাদিমা! দু চোখ দিয়ে দুই ধারা জল বয়ে যায়। গন্ধবতী নদী দুভাগ হয়ে দুদিকে বয়ে যায় যেন। বুড়ি পার্বতী তার কানে কানে বলে, পুরুষ মানুষ বশ করার ছল-চাতুরির কথা, যৌবন যার এত সুন্দর। বসন্ত যাকে ঘিরে ধরেছে এভাবে, তার কাছ থেকে ভ্রমর অন্য কোথাও চলে যাবে কেন? ও মেয়ে এই তো ভোগের সময়, যদি সে তোকে ভোগ না করতে পারে, যাবেই তো ছেড়ে, শোন মেয়ে, গণিকারা জানে অনেক কিছু, কত বিদ্যাই না জানে তারা। নৃত্য জানে, সঙ্গীত জানে, বীণা বাজায় তারা, শয্যা রচনা, পুষ্পচয়ন, পুষ্পসজ্জা, সূঁচীকার্য করে কী সুন্দর, দেহ সাজায় কী মধুর করে, চৌষট্টিকলায় পটিয়সী

গণিকার সঙ্গে পারবে কেন গৃহবাসীর মেয়ে, কিন্তু গৃহবাসীর যা আছে তা তো গণিকার নেই মা, ভয় পাসনে।

গন্ধবতী বলেছে, ভয় আমি কেন পাব, তুমি অন্য কথা বল দাদিমা।

বুড়ি পার্বতী তার গায়ে হাত দেয়। আচমকা তার বুকে হাত দেয়! কী ভয়ানক সেই ছোঁয়া। গা গুলিয়ে ওঠে যেন মেয়ের। গায়ে যেন সরীসৃপ হেঁটে যাচ্ছে এমন ছিল সেই অনুভূতি। বুড়ি তার কোমল স্তন পিষ্ট করে নিতম্বে তার লোলচর্মাবৃত হাত স্থাপন করে বলে, এমন যার যৌবন, এমন ফুলের মতো যে বসন্ত, তার কেন মুখ অন্ধকার হবে রে মেয়ে, গণিকারও যৌবন থাকে, কিন্তু সে যৌবন শতভ্রমরের হুল বেঁধানো, তার মধু দশরকম ভ্রমর এসে পান করে যায়, আর গৃহবাসীর যৌবন তো শুধুই সেই পুরুষের জন্য, তুমি হবে তার ভার্য্যা, তোমার ভরণপোষণের ভার তার উপর, তুমি শুধু তাকে খুশি করবে তোমার রূপ দিয়ে, এমন মধুর যৌবন তার, সে কিনা গেল গণিকার ঘরে, আবার কোন গণিকা, না দেবদত্তা, কোন দেবদত্তা, যে কিনা রাজভোগ্যা, নগর শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্তর ভোগ্যা, সুভগ দত্ত বলে সেই গণিকার জন্য রথভর্তি অলঙ্কার নিয়ে যায়, সোনায় মুড়ে দেয় তাকে। অতসব ছেড়ে ধ্রুবদাসের বেটার কথায় মত্ত হবে কেন সে, কানাকড়িও ওর কাছে আছে বলে মনে হয় না। গণিকার খাঁই মেটানোর সাধ্য ছিল কি তার, ছিল না। তাই অপমানিত হয়েছে।

গন্ধবতী অনুভব করে রোদ ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। তাপ বাড়ছে। তার শরীরের অনাবৃত অংশগুলিতে যেন আগুনের ছোঁয়া লাগছিল। দু'পাশের গোধূম ক্ষেত্র প্রায় শূন্য, শস্য কর্তন শেষ হয়ে যাওয়ার মুখে। শস্যক্ষেত্রে দু'চারজন কৃষক। কালোমাটি শুষে নিচ্ছিল যেন চারপাশের আলো। পাতা ঝরছিল পথের ধারের গাছগুলির। ঝরছিল তো ঝরছিলই। চারদিকে পাতা ঝরার শব্দ গভীর হয়ে তার সত্তাকে ঘিরে ধরছিল যেন। বুড়ি আবার গণিকার সঙ্গে তার তুলনা করছিল। গণিকা কী পারে সেই কথা বলছিল বুড়ি। দরকারে তাকে নিয়ে যাবে সেই গণিকার কাছে। গণিকা দেবদত্তার কাছে নিয়ে গিয়ে এমন গুপ্তবিদ্যা শিখিয়ে আনবে যে ধ্রুবপুত্র তাকে ঘিরে থাকবে সমস্তজীবন। পুরুষকে বশে রাখার কতরকম বিদ্যা যে আছে, ঘরের মেয়েমানুষ তা আয়ত্ত করতে পারে না বলে পুরুষমানুষ ঘর ছেড়ে বাইরে যায়। বুড়ি বলছিল, সে দেখেছে গণিকা দেবদত্তাকে। এক শ্রাবণী পূর্ণিমায় মহাকাল মন্দিরে গিয়েছিল সে। বুড়ি বর্ণনা দিচ্ছিল গণিকার রূপের। সাক্ষাৎ রতিদেবী যেন দেবদত্তা। তার রূপ কামদেবের পত্নীরই রূপ যেন বা। যেমন তার মুখখানি, তেমন তার চোখদুটি। তার মা রসমঞ্জরীকেও দেখেছিল বুড়ি পার্বতী অনেককাল আগে। রসমঞ্জরীর রূপে যত আগুন ছিল, এর আগুন যেন আরো বেশি। ওই আগুনে তো উজ্জয়িনীর বহু পুরুষ ঝলসেছে। ধ্রুবপুত্র না হয় সেভাবেই ঝলসে পুড়ল। কিন্তু দেবদত্তা তো শুধু কামনার আধার নয়, অশেষ গুণবতী। শোন মেয়ে, গণিকা যা শেখাবে প্রিয় মিলনের কৌশল তা আর কেউ পারবেনা।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে গন্ধবতী, এসব বলছ কেন, আমি তার বাল্যসখী, সে আমার বাল্যসখা, সখা আজ ফিরেছে ঘরে।

সে তো দেখেই এলাম, দোর বন্ধ করে বসে আছে বেটা, শোন মেয়ে কামদেবের কাছে প্রাণভরে যাঞা কর, মনের মানুষ ঠিক ফিরে আসবে তোর কাছে।

গন্ধবতী নিশ্চুপ। সে নিজেই যেন জানেনা যাচ্ছে কেন কামদেবের মন্দিরে। সখাকে নিজের অধিকারে আনার জন্য কি? মাথা নামিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে যাচ্ছিল সে।

বুড়ি নিজের মনে বকতে বকতে হাঁটে, যে পুরুষ ঘরে সুখ পায় না সেই তো যায় গণিকার কাছে, আর গণিকা তাকে যা দেয় তা ঘরের বউ কি দিতে পারে, গেরস্ত ঘরের মেয়েমানুষ কি দিতে পারে? গণিকার কটাক্ষ, গণিকার মদিরতা যে একবার দেখেছে তাকে ফেরানোই কঠিন কামদেবের আশীর্বাদ ভিন্ন। তাকে যদি বশীভূত করে কামদেব ঘরের মেয়েমানুষের কাছে ফিরিয়ে দেন তবে সে ফেরে, তোর মা আমাকে সব বলেছে, তুই প্রাণভরে ডাক কন্দর্প ঠাকুরকে।

মা কী বলেছে? গন্ধবতী জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে যায়। কিন্তু তার মনের ভাবটি যেন টের পায় বুড়ি পার্বতী, বলল, তোর মা বলেছে তুই ওর কাছে সমর্পণ করেছিস নিজেকে, শয়নে, স্বপনে ধ্রুবপুত্তুর।

গন্ধবতীর সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরে যাচ্ছিল। সে জানেনা সখার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে কিনা, তবে সখার মুখ দেখলে প্রাণে শান্তি আসে, শরীর মন স্নিগ্ধ হয়। সখাকে কোনোদিন মুখ ফুটে তো কিছু বলেনি! বুড়ি পার্বতীর কথায় তবু সে প্রতিবাদ করতে পারে না। বুড়ির হাত তার কোমরে, বুড়ি বলছে, এমন যৌবন, চাঁদের মতো মুখখানি, ফুলের মতো দেহখানি, এমন সুগন্ধ যে দেহে, এমন সুধারস যার কথায়, তাকে ছেড়ে যে পুরুষ গণিকার ঘরে যায় তাকে ধিক।

রোদ পোড়াচ্ছিল গন্ধবতীকে। চৈত্রমাস শেষ হয়ে এল প্রায়। কালোমাটি শুষে নিচ্ছে পৃথিবীর সব সুষমা। রোদে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর সব রস, বসন্তের ফুল ঝরে ঝরে কালো হয়ে যাচ্ছে রোদে। পথে একটি বকুল গাছের ছায়ায় বসল দু'জনে। বকুল ফুলে ছেয়ে আছে বৃক্ষতল। বকুলের গন্ধ বাতাসে গাঢ় হয়ে আছে। প্রকৃতি সুগন্ধময়। প্রকৃতি পুষ্পগন্ধবতী। বাতাসে উড়ছিল কালো ধুলো। সামনে যে পথ চলে গেছে সেইদিকেই দূরে কোথাও কামদেবের মন্দির। মন্দির ছাড়িয়ে শিপ্রা নদী। নগরের মানুষ শিপ্রার কূল ধরেই আসে কামদেবের মন্দিরে।

তাম্রধ্বজ শুনছিল গন্ধবতীর কথা। গন্ধবতী বলছিল, বুড়ি পার্বতী যত বলে তাকে ধিক যে যায় গণিকার ঘরে, সে তত যেন বিরহ-আকুল হয়ে উঠছিল ধ্রুবপুত্রর জন্য। গন্ধবতী কতদিন বসে আছে কথাগুলি শোনাবার জন্য। তার কথাটি শুনবে কে? শোনাতে পারলে তার এই বিরহের দুঃখ যেন কমে। সেই যে চৈত্রদিনে তার শরীরের ভিতরে রোদ ঢুকেছে, তাপ ঢুকেছে জ্বলন্ত পৃথিবীর, তা যেন নিঃশেষ হয়নি এখনো। কী রোদ তার কী রোদ! পুড়ে যায় যেন সর্ব অঙ্গ! সেই যে জ্বলন আরম্ভ হলো চৈতি পূর্ণিমায়, শরীর জ্বলেই যাচ্ছে।

তাম্রধ্বজ বলল, তুমি বলে যাও। ধ্রুবপুত্রের সন্ধান মিলবে এর ভিতরেই।

গন্ধবতী বিড়বিড় করে, বুড়ি দাদি যতই বলুক, ধ্রুবপুত্র অতি শুদ্ধ পুরুষ, শুদ্ধ মনের মানুষ, জ্ঞানী কখনো অশুদ্ধ মনের মানুষ হয় না....।

তা শুনে খিলখিল করে হাসে বুড়ি! কে বলেছে সে অশুদ্ধ, অপবিত্র! পুরুষ মানুষ কোনোকালে অশুদ্ধ হয় না, পুরুষমানুষের সর্ববিষয়ে অধিকার, সর্বনারীতে অধিকার, ভোগের অধিকার, সে গণিকার কাছে গেল না পরস্ত্রীর কাছে গেল তা নিয়ে ভাবে না কেউ, অশুদ্ধ হয় মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ কুলটা হলেই সব্বোনাশ, তখন সে বারনারী, তাকে ভোগে সবার অধিকার, মেয়েমানুষকে সর্বকুল রক্ষা করে চলতে হয়।

তাম্রধ্বজ বলে, কথাটা তো অসত্য নয়, এই রকমই তো হয়ে থাকে।

গন্ধবতী ফিসফিস করে, এমন ভাবেই বলত সে, এভাবেই ভাবত সে।

তাম্রধ্বজ বলে, মানুষের তো কখনো কখনো বিভ্রম হয়।

হয় বোধহয়। অস্ফুট গলায় বলে গন্ধবতী।

তারপর কী হয়েছিল? জিজ্ঞেস করল তাম্রধ্বজ।

গন্ধবতীর শরীর ভেঙে যাচ্ছিল কান্নায়। শরীর ভেঙে কান্না বেরিয়ে আসছিল যেন। বুড়ি পার্বতী তাকে বোঝাচ্ছিল পুরুষমানুষ মানে সেই ধ্রুবপুত্রকে বশীকরণের প্রথম ধাপ হলো মদনোৎসবে যাওয়া। তখন নিজেকে ছোট লাগছিল। তার মনে হচ্ছিল কামদেবের মন্দিরে গিয়ে তার কাজ নেই। বাড়ি ফিরে দুয়ার খুলে বের করে আনে সখাকে। আবীরে রাঙিয়ে দেয় তাকে। ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়েছে সখার মোহন রূপটি। নদীর জলে স্নান করিয়ে তাকে আবার স্নিগ্ধ করে তোলে। মনে পড়ল গন্ধবতীর। কতদিন আগের কথা তা, সে তখন বালিকামাত্র। ধ্রুবপুত্র এক সন্ধ্যায় তাকে চেনাতে শুরু করল আকাশ। উত্তর আকাশের জ্বলজ্বলে তারাটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি চেন ওই তারাটিকে?

না তো।

ধ্রুব, ধ্রুবতারা।

গন্ধবতী আকাশে তাকিয়ে আছে অবাক হয়ে। তার সমস্ত গায়ে রোমাঞ্চ। ওই তারা থেকে জন্ম নাকি সখার? ধ্রুব তো সখার পিতা? পিতা তোমার?

হ্যাঁ। আত্মগত সেই কণ্ঠস্বর যেন এখনো শোনা যায়, আমি যেন ওই নক্ষত্রেরই সন্তান, পিতা ওই নক্ষত্রে আছেন, আমি যেন ওই নক্ষত্র থেকেই নেমেছিলাম গম্ভীরার কূলে, গন্ধবতী ওই তারা দেখে

সমুদ্রের নাবিকরা দিশা খুঁজে পায়।

গন্ধবতী বলে, আমি তাকিয়েছিলাম তার চোখে, কী তার রূপ।

ওই রূপেই তো মজলি তুই, না হলে কত রাজপুত্তুর তোকে নিতে পারে, উদ্ধব দাস রাজসভার লোক, রাজপুত্তুরের সঙ্গে তার তফাৎ কীই বা? সে তো এককথায় রাজি তোকে বে করতে। যদি বলিস তার সঙ্গে বে' দিয়ে ওই বেটাকে জবাব দিই মুখের উপর, তুই কি রাজি? বুড়ি পার্বতী জিজ্ঞেস করেছিল আশা নিয়ে।

কী যে বল তুমি দাদিমা! ও কি মানুষ!

কার কথা বলিস, উদ্ধব?

গন্ধবতী চুপ করেছিল। বুড়ি তখন দু'হাতে বেড় দিয়েছিল তাকে, বলেছিল, জানি তুই একথা বলবি, ও বেটা কিনা আমাকে ধরেছে, যাক গে, তোর সখা তোরই থাক, কামদেবের কাছে প্রার্থনা কর, তিনি তোর সাধ পূরণ করবেন। একমাস পরে বৈশাখী পূর্ণিমা, ওইদিন না হয় চার হাত এক করা যাবে। তোর মা মনে মনে ঠিক করে রেখেছে ওই দিন তোর গলায় মঙ্গলসূত্র উঠবে, ধ্রুবপুত্তুরের হাতে তোকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে।

এ সব তো কিছুই জানত না গন্ধবতী। সে অবাক হয়ে শুনছিল বুড়ির কথা। পাথর হয়ে বসেছিল। বুড়ি বলছিল চৈত্র পূর্ণিমা থেকে বৈশাখী পূর্ণিমা পর্যন্ত চোখে চোখে রাখতে ধ্রুবপুত্রকে। ও যেন গম্ভীরা না ছাড়ে, ও যেন নগরে না যায়। গণিকারা কুহকিনী। তারা ঘর পায়না, সংসার পায়না তাই সংসারের মানুষ টেনে নেয়। ঘর ভাঙে, সংসার ভাঙে। কুহকিনী এমন মায়ায় ভোলাবে যে বার বার তার কাছে ছুটে যাবে পুরুষ মানুষ। পুরুষ মানুষকে বাঁধতে হলে ছলাকলা করতে হবে গণিকার মতো। রূপে ভোলাতে হবে তাকে। গন্ধবতীকেও হয়ে উঠতে হবে কুহকিনী।

শুনছিল গন্ধবতী। এলিয়ে পড়ছিল গরম বাতাসের ঘোরে। তার ভয় হচ্ছিল বুড়ির কথা শুনতে শুনতে। তারপর একসময় বুড়ি তাকে টেনে তোলে। দু'জনে আবার হাঁটে কামদেবের মন্দিরের দিকে। বুড়ি যে কী বলতে চাইছিল তা নিয়ে তার মনে ধন্ধ তৈরি হচ্ছিল। বুড়ি আবার গুণগান করছিল উদ্ধব দাসের। রাজসভার মানুষ তো ধ্রুবপুত্র নয়, বরং সে ধিকৃত হয়েছে উজ্জয়িনী নগরে। রাজগণিকার ধিক্কার তো রাজধিক্কারের চেয়ে অনেক বেশি অসম্মানের। ধ্রুবপুত্র কি কোনো কালে রাজসভার স্থান পাবে? পাবে না যে সে বিষয়ে বুড়ি খুব নিশ্চিত। এমন যার অতীত তাকে কেন অবন্তীর রাজা তাঁর সভায় দাঁড়াতে দেবেন? রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতেই পারবে না কোনোদিন ধ্রুবপুত্র। আর রাজ-অনুগ্রহ ব্যতীত কোনো মানুষ কি জীবনে উন্নতি করতে পারে, না ক্ষমতা অর্জন করে? উদ্ধব দাসের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করে, উদ্ধব দাস আজ কি এসেছিল?

হ্যাঁ।

কী বলে সে?

এখনো আশা ছাড়েনি? ওকে আমার ভয় করে, খুব ভয় করে।

ভয়ের কথাটা বলেছিল গন্ধবতী বুড়ি পার্বতীকে। শুনে বুড়ির কী হাসি! উদ্ধব নাকি অতি সরল মনের, সরল প্রকৃতির মানুষ। গন্ধবতীকে রানী করে রেখে দেবে। যদি বলে গন্ধবতী, উদ্ধবের সঙ্গে মিলতে পারে যে-কোনো নির্জন জায়গায়, সে ব্যবস্থাও করে দেবে বুড়ি।

তাম্রধ্বজ বলে, তারপর কী হলো?

তারপর গন্ধবতী আর পার্বতী পৌঁছেছিল শিপ্রাতীরে কামদেবের মন্দিরে। মন্দির নয়, সে যেন যৌবনের উপবন। মন্দিরের পথে শত ফুল ফুটেছিল। কাপাসের তুলো উড়ছিল, ভ্রমর উড়ছিল, আমের মঞ্জরীর সুগন্ধ ছিল কত। ছিল বকুল ফুলের গন্ধ, ছিল নাম না জানা বুনো ফুলের তীব্র সুবাস। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল মেলা বসে গেছে। রঙীন মেখলা, রঙীন উত্তরীয় উড়িয়ে আসছিল যুবতীরা। তাদের পিছু আসছিল ভ্রমরের মতো মধুলোভী যুবকেরা। যুবতীদের অনেকেই ছিল নগরবধূ। তাদের নাগররা তাদের হাত ধরে চলছিল। বল্লকী মৃদঙ্গ নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে আসছিল গায়কের দল। আটবেহারা পালকি বয়ে নিয়ে এল অবন্তীর রানী ভানুমতিকে। সাজ সাজ রব উঠল। তখন তারা মন্দিরে

প্রবেশাধিকার পেল না। কত সময় দাঁড়িয়ে থাকল। দেখল রানী ভানুমতির সঙ্গে আছে রাজার প্রহরী। আসার কথা ছিল রাজ-সেনাপতি, রাজার অনুজ কুমার বিক্রমের, তিনি নাকি আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গন্ধবতীরা দেখল এল কত নববধূ তাদের স্বামীর হাত ধরে হাসতে হাসতে। এল কত প্রেমিক তাদের প্রেমিকার মুখখানি দেখার আশায়। কত জন এল একা, এল শুধু কামদেবের কাছে প্রার্থনা জানাতে। কতজন আবার এসেছে শুধুই ফূর্তির আশায়। যদি সুযোগ পায় ফুলের শর ছুঁড়ে দেবে কোনো যুবতীর বসনে। বসন সব রঙীন। লাল, নীল, হরিদ্রাবর্ণ, হরিৎবর্ণ, গোলাপী, আকাশী। কত রকম রঙ সেই সব মেখলায়, উত্তরীয়তে। বাতাসে আবীর উড়ছিল। বাগানের দিকে আড়ালে ছুটে যাচ্ছিল আবীর ছড়ানো স্ত্রী-পুরুষ। যুবতীদের ধাওয়া করছিল যুবকের দল। ফুল ছড়িয়ে যাচ্ছিল। অশোক ফুলের পাপড়িতে পথ রঙীন। বাগানে বীণা বাজাতে বসেছিল এক গণিকা। সুর যত না উঠুক, তারের ঝঙ্কারেই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল কতজন।

বাগানের অজ্ঞাত কোণ থেকে উড়ে আসছিল শীৎকার ধ্বনি। বাতাসে এক আশ্চর্য গন্ধ উড়ছিল। সেই গন্ধ কিসের? বুড়ি পার্বতী বলছিল, কামদেবের গন্ধ, চৈত্র পূর্ণিমায় কামদেব ছড়িয়ে যান আকাশে বাতাসে, তার গন্ধ পায় যে মানুষ সে সৌভাগ্যবতী হয়।

কামদেবকে দেখেছিলে? জিজ্ঞেস করে তাম্রধ্বজ।

দেখেছিলাম। গন্ধবতী মুখ তুলল। দৃষ্টি মেলে ধরে তাম্রধ্বজের উপরে। তাম্রধ্বজ আকাশের দিকে তাকিয়ে কথাটা জিজ্ঞেস করেছে, যেন আকাশেই রয়েছে গন্ধবতী। মুগ্ধ হলো গন্ধবতী আচার্য বৃষভানুর শিষ্যর দিকে তাকিয়ে। বৃষভানুর শিষ্য আকাশের দিকে চেয়ে আবিষ্ট।

ভাগ্যবতী দেখল কামদেবকে। আহা কী সুন্দর তিনি। ঠিকই বলেছিল বুড়ি পার্বতী। সখার রূপটি যেন কামদেবের সঙ্গে তুলনীয়। বুড়ি বলেছিল, নাকি সে নিজেই ভেবেছিল তা। তাঁর নাসিকা সুচারু, উরু, কটি, জঙ্ঘা, সুবৃত্ত। কুসুমরঙের বস্ত্রখানি তাঁর কটিদেশ আবৃত করেছিল। কী বিস্তৃত তাঁর বক্ষদেশ। ওই বক্ষদেশ যেন গন্ধবতীকে নির্ভয় করে তোলার জন্য। গন্ধবতীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য। যে-কোনো নারীর আরাধ্য ওই আশ্রয়। চক্ষুদুটি, মুখমণ্ডল, ওষ্ঠাধর, পদতল, নখ, সবই তাঁর আরক্তবর্ণ। মকরবাহনে বসেছিলেন কামদেব বকুলফুলের স্তূপে। তাঁর হাতে কুসুমধনু, কুসুমশর। তাঁর সামনে জ্বলছিল ঘিয়ের প্রদীপ। কামদেবকে অশোক, বকুল ফুলে অর্চনা করে সে অনিমেষ দৃষ্টিতে স্থির হয়েছিল। দেবতা তার দিকে চেয়ে ছিলেন যেন। গন্ধবতীর দু'চোখে তখন জলের ধারা।

তাম্রধ্বজকে সে দেখল কুয়াশা অন্ধকারে মিশে যেতে। চলে যাচ্ছে দশার্ণদেশীয় জ্যোতির্বিদ। গন্ধবতী এগিয়ে এল, শেষ হয়নি সব।

ফিরল না তাম্রধ্বজ। হাঁটতে লাগল। আঙিনা পার হয়ে গেল।

কুড়ি

মনে পড়ে তোর, এক সন্ধ্যায় শ্রেষ্ঠী এলেন, সুভগ দত্ত। চাপা গলায় ফিসফিস করে দেবদাসী সুভদ্রা, কত বয়স হয়েছে তাঁর কিন্তু একটুও ধরা যায় না, মনে হয় যুবক।

ললিতা দাসী অবাক হয়, জরার চিহ্ন তো সুভগ দত্তের মুখমন্ডলে। তা কি দ্যাখেনি সুভদ্রা? তবে হ্যাঁ, প্রধান পুরোহিতের চেয়ে তাঁর বয়স কম, তার অর্থ এই নয় যে তিনি সদ্যযুবা, তাঁকে মনের ভিতরে লালন করবে যুবতী দেবদাসী। কত বয়স হবে সুভদ্রার? অষ্টাদশী হবে, অথবা ঊনবিংশতী বর্ষীয়া। সুভগ দত্তর বয়স পঞ্চাশৎ-এর নিকটবর্তী। ললিতা দাসী অন্ধকারে অবাক হয়ে তাকায় সুভদ্রার মুখে। আজ ফাল্গুনের শুক্লাপঞ্চমী। এই এখনই শৃগাল তৃতীয় প্রহর ঘোষণা করেছে। ভগ্নের মতো বাঁকা চাঁদ দূর পশ্চিমে মহাকাল অরণ্যের উপর ঢলে গেছে। সুভদ্রা তার শয্যা থেকে উঠে এসে পুরোহিতের কক্ষের নিকটে অলিন্দে নিদ্রামগ্ন ললিতা দাসীকে টেনে তুলে মন্দিরের বাইরে প্রশস্ত চাতালে এসে বসেছে। ললিতা দাসী চমকেছিল সুভদ্রার স্পর্শে। সেই পৌষমাসের শুক্লা অষ্টমীর রাতটি তার মনে আঁকা হয়ে আছে গভীর রঙে। আবার কি ডেকেছেন মহাকাল? নিদ্রার ঘোরে সে ডেকেওছিল মহাকালেশ্বরকে। কিন্তু চোখ মেলার পর ভ্রম কেটেছিল। সুভদ্রার হাতে দীপ জ্বলছিল। দীপের আলোয় সে সুভদ্রাকে দেখেছিল।

এখন অন্ধকারে দু'জন মুখোমুখি। তারার আলোয় দু'জন পরস্পরের কাছে প্রকাশিত। সুভদ্রা বলছে, স্বপনে এসেছিল শ্রেষ্ঠী, শ্রেষ্ঠীকে স্বপ্নের ভিতরে দেখেছে সে, তাই আকুল হয়ে উঠে এসেছে মনের কথাটি বলতে।

ললিতা দাসী বও, তুই কি পাগল হলি সুভদ্রা, তুই না মহাকালের দাসী?

তা হোক, তিনি সেই সন্ধ্যায় আমার নাচে মুগ্ধ হয়েছিলেন, আমার রূপেও।

কে বলেছে?

আমি দেখেছিলাম।

তুই তো জ্ঞানহারা হয়েছিলি?

না, আমি যেন সেইদিনই মহাকালকে অনুভব করেছিলাম, আমি জ্ঞানহারা হয়েছিলাম পরম আনন্দে, সেই সন্ধ্যায় যেন এ জীবন সার্থক হয়েছিল।

তাই ই তো হয়। বিড়বিড় করল ললিতাদাসী। তার মনে পড়ে যায় শীতের সেই রাত্রির কথা। স্বয়ং মহাকাল এসে মিলিত হয়েছিলেন তার সঙ্গে। সেই মিলনের পরম আনন্দের রেশটুকু এখনো যেন শরীরে লেগে আছে। এখনো তার স্তনাগ্র দৃঢ় হয়ে ওঠে সেই রাত্রির কথা মনে এলে। শরীরের রোম অশিথিল, দু'চোখ বুঁজে আসে। স্তন দুটিতে কি খুঁজে পাওয়া যাবে না সেই রাতের নখের চিহ্ন। তিনটি পক্ষ গেছে তারপর। ওই চিহ্ন সমস্ত জীবন ধারণ করে রাখবে যেন ললিতা দাসী। কিন্তু সেই স্পর্শ তো ছিল মহাকালের। মহাকালের ভোগ্যা সে। মহাকালের দাসী। মহাকালেই নিবেদন করেছে নিজের সমস্ত সত্তাকে। সে জানে মহাকালের দাসী মহাকাল ব্যতীত অন্য কারোর কথা ভাবতে পারে না। কিন্তু কী বলে সুভদ্রা?

সুভদ্রা বলল, আমি যখন মহাকালেশ্বরকে দেখছিলাম, দেখছিলাম যেন রূপবান শ্রেষ্ঠীকে, ধূপের ধোঁয়ার ভিতরে তিনি চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। মহাকাল সেদিন যেন শ্রেষ্ঠীর রূপে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তারপর তো শ্রেষ্ঠী এলেন না।

শ্রেষ্ঠী কেন আসবেন, প্রধান পুরোহিত দ্বিজদেব তাঁর কাছে যান। বলল ললিতা।

আমার সেই সন্ধ্যার কথা অনবরত মনে হয়।

এ চিন্তা পাপ, তুই মহাকালের দাসী।

আমি তাঁকে অনুভব করতে করতে জ্ঞানহারা হয়ে পড়লাম, তারপর তিনি তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন, মনে আছে সব।

হাসল ললিতা, তুই উপোসে দুর্বল ছিলি।

না, আমি তো জানি কেন লুটিয়ে পড়েছিলাম মহাকালের সামনে।

এবার নিশ্চুপ হলো ললিতা দাসী। অবাক হচ্ছিল সে যেমন, ভয়ও পাচ্ছিল। দেবদাসী সুভদ্রা কিনা কামনা করছে শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্তকে। আশ্চর্য! ধনবান বটে শ্রেষ্ঠী, কিন্তু রূপ কোথায় তাঁর? পৌরুষ কোথায়? আর কয়েক বছর পরে প্রধান পুরোহিতের মতোই তো হয়ে যাবেন তিনি। আর মহাকালের কাছে যে দাসী সমর্পিতা, সে কেন অন্য পুরুষকে কামনা করবে? তাহলে তো কুলভঙ্গ হয়। কুলটা হয় নারী। এই কথা যদি প্রধান পুরোহিতের কানে যায় হেনস্থার শেষ থাকবে না সুভদ্রার। সত্যিই তো, মহাকালের গর্ভগৃহে প্রবেশাধিকার দিয়ে তাঁর অঙ্গ মার্জনার অধিকার যে দাসীকে দেওয়া হয়েছে তার মনে যদি অন্য পুরুষ প্রবেশ করে তবে তো এই মন্দিরই হবে অপবিত্র। হায় সে কী ভীষণ হবে! এক দেবদাসীর পাপে সকলেই না পাপী হয় প্রধান পুরোহিতের চোখে, রাজার চোখে, এমন কি শ্রেষ্ঠীর চোখেও।

ললিতা জিজ্ঞেস করে, তুই কি এই কথা বলতে ডেকে তুললি আমাকে?

হ্যাঁ।

গর্ভগৃহের দুয়ার খোলা?

হ্যাঁ।

দ্বিজদেব জানেন?

তাঁর দরজার কাছেই তো তুই ঘুমিয়েছিলি বাঈ।

মহাকাল জেনে যাবেন। ফিসফিস করে বলে ললিতা দাসী।

মহাকাল তো পাথর।

চমকে ওঠে ললিতা, হাত বাড়িয়ে মুখ চাপা দিল সুভদ্রার, কী বলিস, এসব কথা উচ্চারণ পাপ। মহাকালই আমাদের আশ্রয়।

সুভদ্রা মাথা ঝাঁকায়, অন্ধকারে তার মাথার খোঁপা ভেঙে দেয়। এলো চুল নিয়ে খেলতে থাকে নিজের মনে, বলে, আমি কতবার ছুঁয়েছি ওই মূর্তি।

শিহরিত হয় ললিতা, কী বলিস?

অঙ্গ মার্জনা করেছি, প্রস্তরমূর্তি হিম শীতল, স্পর্শ করলে শরীরের রক্ত যেন জমাট বেঁধে যায়, কী নিশ্চল। স্পন্দনহীন।

থাম! ললিতা দাসী ধমকে ওঠে সুভদ্রাকে, তোর তো পাপের কোনো সীমা নেই, তুই এসব কী বলিস?

কেন তুমি কোনোদিন মার্জনা করনি ওই মূর্তি?

যখন অধিকার ছিল, করেছি।

কী অনুভব করেছিলেন তখন?

মহাকাল আমার আশ্রয়, তাঁকে স্পর্শ করতে পারা আমার পরম সৌভাগ্য।

সত্য কথাটি বলো।

মহাকালকে ছোঁয়ার সময় কোনো পাপ আমার মনে থাকত না। বলল ললিতা দাসী, মহাকাল সময়ে দেখা দেন, আমি তাঁর দেখা পেয়েছি।

চমকে ওঠে সুভদ্রা, দেখা পেয়েছিস বাঈ?

হ্যাঁ, তিনি আমাকে সমস্ত কিছু দিয়েছেন।

কী বলিস বাঈ?

হ্যাঁ, পাথর ঠান্ডা হতে পারে, কিন্তু তাতো তোর কাছে, আমি তাঁকে পেয়েছি রক্তমাংসের মানুষের মতো, তপ্ত সেই দেবশরীর। হে মহাকাল। যুক্তকরে অন্ধকারকে প্রণাম করল দেবদাসী ললিতা। অতঃপর যুক্তকরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকল। তার মনে হচ্ছিল গর্ভগৃহের খোলা দরজা দিয়ে মহাকালেশ্বর বেরিয়ে এসেছেন এই অন্ধকারে। খুব কাছেই আছেন তিনি। তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছে ললিতা। অবিকল মানুষের শরীর। মহাকাল তার সঙ্গে প্রিয়ামিলনে মত্ত হয়েছিলেন সেই শুক্লা অষ্টমীর হিমেল রাত্রিতে। সে হয়ে উঠেছিল তপঃক্লিষ্টা উমা। উমার তপস্যার কথা কি জানেনা সুভদ্রা? মহাকালকে পাওয়া কি এতই সহজ? তিনি কি এত সহজে ধরা দেন? থরথর করে কাঁপছে ললিতা দাসী। তার স্মৃতিতে সেই রাত্রি সম্পূর্ণ হয়ে ফিরে এসেছে। শিহরণ জাগছে অঙ্গে অঙ্গে।

সুভদ্রা বলল, পাথর কী করে রক্তমাংসের হয়?

পাপের কথা বলিস না তুই।

স্তব্ধতা ঘিরে ধরেছে দুই নারীকে। ললিতা দাসী নিশ্চুপে কান পেতে আছে। ওই অদূরে শীর্ণস্রোতে বয়ে যাচ্ছে গন্ধবতী নদী। রাত্রিচর কোনো পশু সরে যাচ্ছে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে। খসখস শব্দ কানে আসছে। মেঠো খরগোস হয়ত পার হয়ে যাচ্ছে বুনোপথ। নাকি অন্য কেউ? ললিতা দাসী সতর্ক হয়ে শব্দটি আবিষ্কারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হতে থাকে। অলিন্দে কি কোনো পদশব্দ জেগে উঠল? মহাকাল কোন পথে এসেছিলেন তার কাছে? গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে অলিন্দ পার হয়ে? নাকি তিনি গন্ধবতীর কুল থেকে উঠে এসেছিলেন?

সুভদ্রা বলল; মহাকালের দাসী কিন্তু প্রধান পুরেহিতের ভোগ্যা।

উনি যা করেন তা মহাকালের অভিপ্রায়।

কে বলেছে?

উনিই বলেন, উনিই জানেন মহাকালের ইচ্ছা। বলতে বলতে গলা বুঁজে যায় ললিতার। পৌষ মাসের সেই রাতটির কথা কিন্তু সে গোপনই রেখেছে নিজের কাছে। যে কারুকার্যময় সোনার হারটি সে পেয়েছিল সেই পৌরুষের দানে, তার কথা কাউকে বলেনি। মন্দিরের বাইরে একটি গোপন জায়গায় পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে তা। নিজের কাছে রাখা তো বিপদ। তার নিজের বলতে কী আছে এখানে?

একটি ঘরও বরাদ্দ নেই তার জন্য। অলিন্দে পড়ে থাকতে হয়। এই অলিন্দে ঘুমন্ত অবস্থায় সে প্রথমে প্রধান পুরোহিতের কামনায় পুড়েছিল। এই মন্দিরে যা ঘটে তা দেবতারই অভিপ্রায়, এই কথা সে বিশ্বাস করতে শিখেছে। সেই বিশ্বাস গভীর হয়েছে মহাকালের সঙ্গে সেই হিমরাত্রির অলৌকিক মিলনে।

সুভদ্রা বলল, দ্বিজদেবের সব কথাই মিথ্যা।

আতঙ্কিত হলো ললিতা, চাপা গলায় বলল, এই মন্দিরের পাথরেরও কান আছে, প্রধান পুরোহিত রাজারও শ্রদ্ধার মানুষ, তাঁর সম্বন্ধে এসব কী বলিস?

সুভদ্রা বলল, তুমি কি বোঝ না কোনো কিছুই?

আমি সামান্য নারী, আমি মহাকালের আশ্রিতা, মহাকাল ব্যতীত অন্য কিছুতে আমার মন নেই, প্রধান পুরোহিত মহাকালের সেবায়েত, তিনি রাজারও উপরে থাকেন...।

সুভদ্রা চুপ করে থাকে। বলতে বলতে থেমে যায় ললিতাও। তার ভয় হচ্ছে সত্যিই। এমন কথা যে কেউ অবন্তী দেশে, উজ্জয়িনী নগরে, মহাকাল মন্দিরে বসে ভাবতে পারে, তা অচিন্তণীয়। যদি একথা প্রধান পুরোহিত কেন, যে কোনো ব্রাহ্মণের কানে যায় তাহলে কি রক্ষা থাকবে? সুভদ্রার স্থান হবে মহাকাল অরণ্যে। অরণ্যের পশুদের খাদ্য হবে সে তখন। ললিতা দাসী বলে, আর নয়, তুই এবার ফের।

ভয় করছে? জিজ্ঞেস করে সুভদ্রা, বলল, শ্রেষ্ঠীর কাছে আমাকে যেতে হবে, তাঁর দর্শন পেতে হবে বাঈ, শ্রেষ্ঠীই নগরের শ্রেষ্ঠ মানুষ।

প্রধান পুরোহিতকে বল।

প্রধান পুরোহিতই আমাকে বলেছেন শ্রেষ্ঠী আমার নৃত্যে মোহিত হয়েছিলেন।

তারপর?

হায় মহাকাল। তোমার সমস্ত ক্ষমতার যাঁর নিকটে গচ্ছিত আছে, সেই দ্বিজদেব ব্রহ্মদেব, প্রধান পুরোহিত এত নিষ্ঠুর কেন এত অশ্লীল কথা কেন তাঁর মুখে?

ললিতার হাত সুভদ্রার মুখে। সুভদ্রা ঝুঁকে পড়ল। দুই হাঁটুর ভিতর মাথাটি স্থাপন করে বলল, আমি শ্রেষ্ঠীর কাছে যাব, তিনিই আমার মহাকাল।

ললিতা দাসী বলল, এত অবুঝ হলে কী করে পাবি তাঁকে, শ্রেষ্ঠী যদি তোকে ফেরত দেয়, কার কাছে যাবি? ধনবান শ্রেষ্ঠীর কি নারীর অভাব? তাঁর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলে মহাকাল নেবেন?

সুভদ্রা মুখ তোলে না। জবাবও দেয় না। ললিতা আকাশগঙ্গা দেখে মাথাটি তুলে। তৃতীয় প্রহর অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। এখন হিমপতন বৃদ্ধি পেয়েছে। ললিতা ওঠে। তার সঙ্গে সুভদ্রাও। দু'জনে অলিন্দের অন্ধকারে এসে দাঁড়ায়। ললিতা বলে, অপেক্ষা করলে মহাকাল একদিন ধরা দেবেন, আমি তাঁকে পেয়েছি।

সুভদ্রা বলল, কীভাবে পেলে, তুমি তো দেবদাসীই রয়েছ?

মহাকালের দাসী, যাব কোথায়?

পুরোহিত তোমার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন।

করুন, তিনি তো জানেন না আমি কার অনুগ্রহে বলীয়ান।

সুভদ্রা অন্ধকারে খুব ভাল করে দেখতে পায় না ললিতার মুখখানি। কিন্তু অবাক হচ্ছিল তার কণ্ঠস্বরের গভীরতায়। সে বলল, জানলে তো তোমার ভাল হতো।

না। ললিতার কণ্ঠস্বর গাঢ়, বলছে মহাকাল যার আশ্রয়, তার কী যায় আসে পুরোহিতের নিষ্ঠুরতায়, পুরোহিত আমাকে কত খারাপ কথা বলেন তা কি তুই জানিস? তুই তো গর্ভগৃহের দাসী, তোর তবু ছাড় আছে, কিন্তু আমি তো এখন নৃত্যের অধিকারও যেন হারিয়েছি।

তবু বলো মহাকাল সহায়!

হ্যাঁ, তাঁকে আমি পেয়েছিলাম শুক্লা অষ্টমীতে, সে ছিল পৌষমাস, পুণ্যতিথি।

সুভদ্রার ঠোঁটের কোণে কৌতুক-ছায়া ফুটে ওঠে অন্ধকারে। সে কৌতুকের সুরেই বলল, তুমি তো লুকিয়ে গর্ভগৃহে প্রবেশ করেছিলে, দুয়ার তো বন্ধ ছিল?

না, তিনিই এসেছিলেন আমার কাছে।

দুয়ার খুলে?

জানিনা, মহাকাল সর্বত্র আছেন, এই অন্ধকারেও আছেন, পাথরেও আছেন, আকাশে আছেন, চাঁদের আলোতেও তিনি থাকেন, এসেছিলেন কোথা হতে তা আমি জানব কী করে?

তোমার স্বপনে এসেছিলেন?

না, জাগরণে, তুই শুনে অবাক হবি, মহাকাল আসেন এইভাবেই।

সুভদ্রা ঘোর অবিশ্বাসী হয়ে পড়েছে শ্রেষ্ঠীকে দেখার পর থেকে। আর শ্রেষ্ঠীর কথা জানাতে জানাতে বৃদ্ধ পুরোহিত যখন তার প্রিয় অঙ্গ স্পর্শ করে নিজের কামনা মেটাচ্ছিলেন, তখনই যেন সকল বিশ্বাস গেছে জলাঞ্জলি। এখন মহাকালের সম্মুখে সমর্পণ নৃত্য প্রদর্শন করে বটে, কিন্তু নিজেই টের পায় ওর ভিতরে আবেগ নেই। যেন সে তার কৃতকর্মই সম্পাদন করছে। দায়িত্বটুকু পালন করছে মাত্র। তাকে প্রধান পুরোহিত বলেছিল তার নৃত্যে মোহিত হয়েছিলেন শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত, কিন্তু সুভগদত্ত তাকে ভোগ করার দায়িত্বটি দিয়ে গেছেন বৃদ্ধ পুরোহিতকেই। একশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে গেছেন শ্রেষ্ঠী, সেই মুদ্রা সুভদ্রার, কিন্তু বিনিময়ে বৃদ্ধ পুরোহিত দ্বিজদেব ব্রহ্মদেব ভট্ট তার সর্বস্বের অধিকারী। হায় মহাকাল। এসব বৃদ্ধ পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণের মতোই করেই বলেছেন তাকে গর্ভগৃহে বসে। যত বলেছেন সুভদ্রা ততো আকুল হয়েছে শ্রেষ্ঠীর প্রেমে। কাউকে অবলম্বন না করে সে এই যৌবন নিয়ে বাঁচে কীভাবে? কে তাকে বাঁচাবে এই খিন্ন জীবন থেকে? গর্ভগৃহে দেবতার সম্মুখে বসে যদি বৃদ্ধ পুরোহিত অশ্লীল আচরণে প্রবৃত্ত হয়, তবে হে মহাকাল তুমি কার?

ললিতা দাসী বলল, সুভদ্রা আমাকে গর্ভগৃহে ভগবানের সম্মুখে নিয়ে যাবি?

যাবে তুমি?

যাব; কতদিন তাঁকে নিরালায় দেখিনি, পাইনি তাঁকে, সেই রাত্রির পর পর তিনটি পক্ষ চলে গেছে, আর তো এলেন না মহাকাল।

সুভদ্রার কৌতূহল প্রবল হলো। সে অন্ধকারে হাত ধরল ললিতাদাসীর। অতি সতর্ক পায়ে দুই রমণী দেবতার উদ্দেশে রওনা হলো। অন্ধকার অলিন্দে তাদের পায়ের নূপুরের শব্দ ওঠে ক্ষীণ। ওই শব্দই তো তাদের অস্তিত্বকে প্রকাশ করে দিতে পারে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নিকটে। যদি তাঁদের ঘুম ভেঙে যায় জিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসায় জীবন যাবে। নূপুরের শব্দ লুকিয়ে মহাকালের নিকটে পৌঁছতে সময় লাগে অনেক। কিন্তু গর্ভগৃহের সম্মুখে প্রশস্ত আঙিনায় পৌঁছে আবেগে যেন বিস্ফোরিত হয়ে যায় ললিতা দাসী, কেঁদে ওঠে, হে ভগবান!

ললিতাকে টেনে গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করায় সুভদ্রা। সে ক্রমশ ভীত হয়ে পড়ছিল ললিতার আচরণে। যদি কেউ টের পায়? মধ্যরাতে দুই রমণীর তো একসঙ্গে গর্ভগৃহে বাস শাস্ত্রসম্মত নয়। দুয়ার বন্ধ করে সুভদ্রা। মহাকালেশ্বরের সম্মুখে দুই উরু বেদীর মতো প্রসারিত করে বসেছে দুই রমণী।

গর্ভগৃহ ধূপগন্ধে ভরপুর। ঘরটিতে পুষ্পগন্ধ আছে। কিন্তু সেই গন্ধের তাজা ভাবটি এই মধ্যরাতে অন্তর্হিত। পচন ধরেছে সমস্ত দিনে নিবেদিত পুষ্প অর্ঘ্যে। এখন মহাকাল ভগবানের নিকষ কালো লিঙ্গ মূর্তিটির তিন-চতুর্থাংশ পুষ্পের স্তূপে ঢেকে। স্তূপ ভেদ করে লিঙ্গমূর্তিটি যেন মাথা তুলেছে। এই মূর্তি শুধুই পাথর। এই মূর্তির কোনো অঙ্গ নেই। ত্রিনয়নের একটিও নেই। এই মূর্তির কোনো প্রসন্নতা নেই, নেই বিষণ্নতা। নেই রোষচিহ্নও। ইনি শুধুই পৌরুষ। ইনি প্রাণীর জন্মসূত্রে প্রোথিত হয়ে জীবজগতের জন্মবীজ ধারণ করে আছেন।

দেবতার সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছিল। প্রদীপের আলো ঘরের সর্বত্র পৌঁছতে পারেনি, কিন্তু মহাকাল মূর্তির গায়ে পড়ে পিছলে যাচ্ছে তাঁর তৈলাক্ত দেহ থেকে। ললিতা দাসীর দুই চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসছে গন্ডদেশে, তা থেকে আনন্দাশ্রু পড়ছে বুকের উপর। মলিন পশম চাদর, মলিন উত্তরীয়খানি দেবদাসী সরিয়ে রেখেছে গা থেকে। উত্তেজনায় যুগল-বক্ষ কম্পিত হচ্ছে। শ্বাস-প্রশ্বাসে দেবদাসীর দেহে তরঙ্গ উঠছে। ললিতার দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে আছে সুভদ্রা দাসী। যা বলছে তা কি তাহলে সত্যি?

ললিতা দাসী বহুদিন পরে গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। তার সাধ হয়েছিল সেই শুক্লা অষ্টমীর রাতের পরের দিন মহাকালের কাছে নিজেকে নিবেদন করে নৃত্যে। কিন্তু তা হয়নি। প্রধান পুরোহিত তাকে সে অনুমতি দেননি। এখন কি এই মধ্যরাতে সে জাগিয়ে তুলবে মহাকালেশ্বর ভগবানকে? লাস্য নৃত্যে জাগাবে তাঁকে?

সুভদ্রা নিজের উত্তরীয় দিয়ে মুছে দিল ললিতার চোখের জল, তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, বলবে না, ভগবানকে কী ভাবে পেয়েছো?

বলবে। বলার জন্যই তো উন্মুখ হয়ে আছে ললিতা। তার জীবনের এক পরমপ্রাপ্তি হয়েছে সেই পুণ্য রাতটিতে। সে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গর্ভগৃহটি দেখছিল। চতুষ্কোণ ছাদ, একটি স্তম্ভ, ঝামাপাথরের দেওয়াল, অমসৃণ মেঝে। সে উপুড় হয়ে মাথাটি স্পর্শ করাল মেঝেয়, ডাকল ভগবানকে, হে মহাকাল, সেই পুণ্যরাত্রির কথা আমি উচ্চারণ করছি তোমার সামনে, তোমাকে সাক্ষী রেখে, হে ভগবান তারপর থেকে আমি শুধু তোমাকেই স্মরণ করি, আর তো এলে না দেবতা, আমার সমস্ত অঙ্গে তোমার স্পর্শ এখনো অনুভব করি ভগবান, আমার দুই বুকে তোমার সোহাগ চিহ্ন এখনো যেন রয়েছে, হে দেবতা, সেই সেই হিমশীতল রাত্রে তুমি এলে যেন রাজবেশে...।

সুভদ্রা বিস্মিত হলো। সুভদ্রার দুই চোখ স্ফীত হলো ললিতা দাসীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে। উঠে বসেছে দেবদাসী। গায়ের পশম উত্তরীয় সরিয়ে বক্ষাবরণী থেকে মুক্ত করেছে স্তন দুটিকে। দেবতার সামনে তুলে ধরেছে নগ্নতা। একটু একটু করে বর্ণনা করছে সে মোহময়ী রাত্রিটিকে। কী আশ্চর্য। এ যে প্রিয় মিলনের বিবরণ। নারী আর পুরুষের মিলন মুহূর্তটিকে কী অনুপম ভঙ্গিতে না শোনাচ্ছে ললিতা দাসী। শুনতে শুনতে শিহরিত হয় সুভদ্রা। তার জীবনে তো এমন কখনো ঘটেনি। বৃদ্ধ পুরোহিত যে আচরণ করেছেন তার সঙ্গে তা তো মনুষ্যেতর প্রাণীর জীবনেও ঘটে না কখনো। সারমেয়র জীবনও অমন হয় না কখনো। সুভদ্রার দুই চক্ষু বুঁজে যায়। তার মনের ভিতরে শ্রেষ্ঠী সুভগদত্ত জেগে ওঠেন। কানে আসছিল ললিতাদাসীর অদ্ভুত উচ্চারণ। মন্ত্রপাঠের মতো করে ললিতা দাসী বর্ণনা করছিল মহাকালের সোহাগ বিবরণ। মহাকাল সেই হিম-রাত্রিকে করে তুললেন উষ্ণ। তিনি যেন গিরিনন্দিনী উমার সঙ্গে মিলিত হলেন সেই অন্ধকারে।

একুশ

ললিতা দাসী অস্ফুটস্বরে বলল, তোর কথা সত্য।

কী সত্য?

ঘাড় ঘুরিয়ে গর্ভগৃহের দুয়ারে তাকায় দেবদাসী। অর্গল রুদ্ধ আছে কিনা দেখে নেয়। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে দেবতার দিকে তাকিয়ে নিচুস্বরে বলে, তোর মতো আমারও মনে হতো মহাকাল পাথর মাত্র, মহাকাল যেন হিমশীতল।

কী বলছ? বিস্মিত হয় দেবদাসী সুভদ্রা।

যা বলছি তা সত্য, মহাকাল যেন জড়, অনড়, প্রস্তরবৎ।

দেবদাসী সুভদ্রার মুখমণ্ডলে ভয়ের ছায়া ফুটে ওঠে। কুঁকড়ে যায় যেন সে। যে কথা সে নিজেই উচ্চারণ করেছিল এই গর্ভগৃহের বাইরে, চাতালের অন্ধকারে বসে, সেই কথা দেবতার সামনে অন্যের মুখে শুনতে তার স্বস্তি চলে যায়। এই গর্ভগৃহে দেবতা আছে। দেবতা আছেন তার সম্মুখে। দেবতার সম্বন্ধে যে কথাই বলুক না কেন সুভদ্রা, তা তো এখানে উচ্চারিত হয়নি। হয়েছিল মন্দিরের চাতালে, অন্ধকারে, এই গর্ভগৃহ থেকে দূরে। এখন ললিতা দাসী তার সূত্র ধরে সেই কথা শুরু করেছে আবার। যেন সে মহাকালকে শোনাতে চাইছে কী বলেছে সুভদ্রা মহাকালের অগোচরে। যেন মহাকাল সত্যিই রক্তমাংসের কেউ। তিনি গর্ভগৃহে থাকলে সেখানেই থাকেন, তিনি মন্দিরে থাকল সেখানেই থাকেন, তিনি তখন গর্ভগৃহের বাইরে, মন্দিরের বাইরে, উজ্জয়িনী নগরের বাইরে থাকতে পারেন না যেন। তিনি প্রদীপের আলোর নীচে থাকলে অন্ধকারে থাকতে পারেন না নিশ্চয়। তিনি মানুষের মতো একমাত্রিক। গর্ভগৃহে তাঁর অধিষ্ঠান, তাই গর্ভগৃহে এসে দেবদাসী ললিতা তাঁকে জানিয়ে দিচ্ছে কী বলেছে সুভদ্রা দাসী এই গৃহের বাইরে মহাকাল দেবতার অসাক্ষাতে।

সুভদ্রা বলল, থাক ওসব কথা।

কথাটি যেন শুনতেই পায় না ললিতা দাসী, ধীরে ধীরে বলে, তোর কথা সত্য মহাকাল যেন শুধু পাথর, পাথর আর পাথর।

না। আতঙ্কিত হয়ে কুঁকড়ে যায় সুভদ্রা।

ললিতা দাসী বলল, কিন্তু পাথরকে তো জাগাতে হয়, ওই হিম শীতলতা যেন আমাদের পরীক্ষা। মহাকাল যেন দেখতে চান কত নিষ্ঠাবতী আমি, শোন রে সুভদ্রা, দ্বিজদেব তো ভয় দেখাতেন অনাচার হলে তাঁর নির্দেশের ব্যত্যয় ঘটলেই মহাকালের তৃতীয় নয়ন জ্বলে উঠবে, ভস্ম হয়ে যাব আমরা।

হ্যাঁ। মুখ নিচু করে বসে আছে সুভদ্রা।

ললিতার মুখখানিতে জেগে ওঠে প্রসন্নভাব। সে ধীর কণ্ঠে বলে, আসলে তা নয়, যখন মহাকাল হরণ করলেন আমার উত্তরীয়, যখন হরণ করলেন আমার মেখলা, আমার দেহখানি যখন উন্মুক্ত হয়ে গেল মহাকালের সামনে, তখন লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে আমি তাঁর দুটি চোখ ঢেকে দিয়েছি দু'হাত দিয়ে, কিন্তু তিনি যে মহাকাল, তিনি প্রবল কামুক পুরুষ তখন, তাঁর তৃতীয় নয়ন তখন জেগে উঠল, আমি কিছুই করতে পারলাম না, তিনি আমাকে দেখতে লাগলেন, আমি যে দেহখানি প্রতিদিন নিষ্ঠাভরে নিবেদন করতাম তাঁকে, সেই দেহখানিতে তিনি এঁকে দিতে লাগলেন ভালবাসার চিহ্ন।

সুভদ্রা শিহরিত হলো। সে মহাকালেশ্বরের লিঙ্গমূর্তির দিকে সভয়ে তাকায়। ওই হিম শীতল পাথর প্রাণ পেয়েছিল? সুভদ্রা সন্দেহভরা চোখ নিয়ে ললিতাকে দেখতে থাকে। দীপের আলোতেও ললিতা দাসীর মুখমন্ডলে শিহরণের ভাব স্পষ্ট। সে ললিতার কাছে সরে যায়। তার পিঠে হাত রাখে, কে এসেছিল?

ললিতা আনত হয়, মহাকাল।

সত্য বল।

মহাকালই চিরসত্য।

পুরোহিত দ্বিজদেব, ওই বুড়োটা?

না।

শ্রেষ্ঠী?

না।

কোনো রাজকর্মচারী?

না।

ভিনদেশী কোনো বণিক?

না। দু' হাতে কান চেপেছে ললিতা, আমি মিথ্যে বলছি না।

স্বপ্ন দেখেছিলি?

না।

কেমন ছিলেন তিনি?

আশ্চর্য পৌরুষ তাঁর।

তাঁকে দেখেছিলি?

না, চোখ খুলতে পারিনি।

একবারও চোখ খুলিসনি?

অন্ধকার ভীষণ, অন্ধকারে তিনি মিশে গিয়েছিলেন যেন।

সত্য বল, যতই অন্ধকার হোক, সে তো তোর উপর উপগত হয়েছিল।

ললিতা দাসী বলল, এভাবে কথা বলে না সুভদ্রা, তিনি এই মহাকাল, আমার আরাধ্য, তাঁকেই নিবেদন করেছি নিজেকে।

সে তো সব দেবদাসী করে, নতুন কী?

তাঁর সঙ্গে ছলনা চলে না, মহাকালের দাসী হয়ে শ্রেষ্ঠীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পাপ, মহাকাল সব জানেন।

কোনোদিন মহাকাল আমার স্বপ্নেও আসেন না।

প্রাণভরে তাঁকে না ডাকলে আসবেন কেন?

আর কেউ কি ডাকেনি, সকলকে তো মহাকাল ছাড়া আর সকলে ভোগ করে।

ললিতা বলল, আমি জানিনা, দেবতার সামনে এসব উচ্চারণও ঠিক না। সুভদ্রা, যদি সেই সময়

হতো, দেখাতাম এই বুকে তাঁর দংশনের চিহ্ন।

সুভদ্রা শিহরিত হলো আবার। ললিতার উন্মুক্ত স্তন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কাঁপছে। স্তনবৃন্ত দৃঢ় হয়ে উঠেছে। কামতপ্ত হয়েছে যেন ললিতা। সে দীপটি তুলে ধরল। দীপের আলোয় পর্যবেক্ষণ করল ললিতাকে। এতদিন কি থাকে সেই চিহ্ন? মিলিয়ে গেছে। তার কৌতূহল প্রবল হচ্ছে। কৌতূহলে তার বক্ষদেশ স্ফীত হয়ে উঠেছে যেন। কে এসেছিল? শ্রেষ্ঠী কি? সে তো শ্রেষ্ঠীকে মনে মনে কামনা করে। টের পেয়েছিল শ্রেষ্ঠী তার রূপে, নৃত্যে মুগ্ধ হয়েছেন। সে জানে শ্রেষ্ঠীর ভোগ্যা হতে পারলে এই মন্দির থেকে মুক্তি। প্রধান পুরোহিতের বিকৃত আচরণে দলিত হতে হতে দেবতার প্রতি বিশ্বাসই যেন টলে গেছে তার। ললিতার একটি কথাও বিশ্বাস হচ্ছে না সুভদ্রার। সবই বোধহয় ললিতার কল্পনা। এখন তো দেবতার অঙ্গমার্জনার অধিকারও নেই তার। তবুও মহাকাল তাকে গ্রহণ করেন? পাগল হলো নাকি ললিতা? যা বলছে সব তার কল্পনা। নাকি কেউ এসেছিল সত্যি? সে কে?

ললিতা বলল, আমার কাছে তাঁর চিহ্ন আছে।

কই চিহ্ন? সুভদ্রা নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে ললিতার বুক।

ললিতা পশম উত্তরীয়তে বুক ঢেকে বলল, তিনি রেখে গেছেন তাঁর চিহ্ন, তাঁর কণ্ঠহার, সেই হার দেখলে তো বিশ্বাস হবে।

সুভদ্রার চোখে গভীর সন্দেহ জেগে ওঠে। তাহলে কি সত্যিই শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত? শ্রেষ্ঠী গ্রহণ করেছেন ললিতা দাসীকে? ললিতা তাকে মহাকাল জ্ঞানে নিবেদন করেছে নিজের সর্বস্ব? ললিতা উঠে দাঁড়াল, আয় আমার সঙ্গে।

সুভদ্রা চলল। গর্ভগৃহের দ্বার টেনে দিয়ে দু'জনে বেরিয়ে এল অন্ধকারে। অলিন্দে যে দীপটি জ্বলছিল তা হাতে নিল ললিতা। একহাতে মৃদু বাতাস আড়াল করে দীপ হাতে সে এগোতে থাকে।

সুভদ্রা বলল, এতদিন তো বলিসনি?

মনে হতো মহাকাল গোপন রাখতে বলেছেন।

তবে বললি কেন?

মহাকাল ক্ষমা করবেন, তুই যখন নিজের অবিশ্বাসের কথা বললি...।

সুভদ্রা ভয় পেল। এই কথা যদি প্রধান পুরোহিতের কানে যায় আর রক্ষা থাকবে না। এই মন্দিরের দেওয়ালও সজাগ। কথা চলে যায় প্রধান পুরোহিতের কাছে। এই মন্দিরে যে হাওয়া থাকে, তা শীতের হোক, গ্রীষ্মের হোক, বসন্তের হোক, সেই হাওয়ায় কথা চলে যায় প্রধান পুরোহিতের কাছে। কী সর্বনাশ! কেন সে ললিতার কাছে মনের বাসনা খুলে বলল? ললিতা যদি বলে দেয়? সুভদ্রা বলল, আমার কোনো অবিশ্বাস নেই, তুই সব ভুলে যা।

কী ভুলে যাব, সেই রাত্রের কথা?

না, আজকের কথা। অস্ফুটস্বরে বলল সুভদ্রা।

ললিতা কোনো জবাব দিল না। তারা মন্দিরের পিছনের দিকে চলে এসেছে। মূল মন্দিরের পর অনেকখানি পতিত ভূমি। তারপর দেড়মানুষ প্রমাণ প্রস্তর প্রাচীর। প্রাচীরের পিছনে গন্ধবতীর ধারা। মাথায় হিমরাত্রির আকাশ। দক্ষিণ-পশ্চিমে লুব্ধক নক্ষত্রটি জেগে। তার নীচে যে নক্ষত্রটি, সে হলো অগস্ত্য। চাঁদ দেখা যায় না। নক্ষত্রের আলোর নীচে দাঁড়িয়ে ললিতা বলল, মন্দিরের দ্বার বন্ধ হয়ে যায় সন্ধ্যারতির পর, যিনি আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি এই মন্দিরেই বাস করেন।

চিহ্নটি কই?

আমার কথা সত্য, মন্দিরে যাঁরা থাকেন তাঁরা ব্যতীত কেউ তো আসতে পারে না আমার কাছে?

প্রধান পুরোহিত, ওই কামুক বৃদ্ধ?

না, তিনি মহাকালেশ্বর। দু'হাত জোড় করে ললিতা দাসী নত হলো, মন্দিরের দিকে তাকিয়ে বলল, এই যে এখানে।

প্রাচীরের কাছে নিম গাছের গোড়ায় নিচু হয়ে বসল ললিতা। তারপর পাথর সরিয়ে কণ্ঠহারটি বের করল। ছিন্ন একটি মেখলার একখন্ড বস্ত্রে জড়ানো হারখানি তুলে অন্ধকারে তা খুলে দেখায়।

আকাশ থেকে যেন আলোর ফুল নেমে এসে শূন্যে মালা তৈরি করেছিল। সুভদ্রা বিস্ময়ে বোবা

হয়ে গেছে। হীরে, মণিমুক্তা খচিত সোনার হারখানি যেন আকাশগঙ্গায় ভেসে যাওয়া আলোর ফুল দিয়ে গাঁথা। আলোর স্রোত বয়ে গেল সুভদ্রার সামনে। দ্যুতিময় হয়ে ওঠে পুরনো আঁধার। চোখ ঝলসে গেল সুভদ্রার। এ তো অমূল্য সম্পদ। এ কণ্ঠহারের নাম কী? এই কি মহালতা? মহালতার কথা শুনেছে সুভদ্রা, কোনোদিন চোখে দ্যাখেনি। মহালতার কথা মনে পড়তেই দেবদাসী সুভদ্রা শিহরিত হলো। কী আশ্চর্য! সেই হার কিনা সামান্য দেবদাসীর অধিকারে? কে দিতে পারে? সুভদ্রা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মহালতা তো সামান্য সম্পদ নয়। শুনেছে শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত তার কন্যার বিবাহের সময় মহালতা অর্পণ করেছিলেন। শুনেছে উজ্জয়িনীর রাজা ভর্তৃহরির পিতা গন্ধর্ব সেন এই অলঙ্কার দিয়েছিলেন তাঁর আশ্রিতা গণিকা রসমঞ্জরীকে। এসব শোনা কথা। রসমঞ্জরী থেকে সেই কণ্ঠহার কি দেবদত্তার অধিকারে গেছে? আর এই হার থাকতে পারে রানী ভানুমতির, রাজা ভর্তৃহরির। থাকতে পারে সুভগ দত্তর। থাকতে পারে খুব ধনী কোনো শ্রেষ্ঠী, বণিকের। ভাবতে ভাবতে উত্তেজিত সুভদ্রা ছিনিয়ে নেয় হারখানি, তারপর অন্ধকারে দৌড়ায়।

কী করলি বাঈ? ফিরিয়ে দে, ও যে মহাকালের দেওয়া, ও তে মহাকালের ছোঁয়া। চাপা আর্তনাদ করে সুভদ্রার পিছনে ধাবিত হয় ললিতা। চাপা গলায় ডাকছে সে, গর্জন করছে রাগে, ওরে তোর সব্বোনাশ হবে, মহাকাল তোকে শেষ করবেন।

সুভদ্রা মন্দিরে প্রবেশ করে অন্ধকারে মিশে গেল। তার নূপুরধ্বনি অনুসরণ করে ললিতা দৌড়তে লাগল। চেনা অন্ধকার চেনা অলিন্দ। তার অনুমান ঠিক সুভদ্রা গেছে গর্ভগৃহের পথে। ললিতা হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছে দেখে গর্ভগৃহের দরজা বন্ধ। দরজার বাইরে, দেওয়ালে কুলুঙ্গিতে রাখা প্রদীপ নিভু নিভু। ললিতা দরজায় করাঘাত করে। ডাকে সুভদ্রাকে, বাঈ, দোর খোল, বাঈ রে আমাকে ভগবান দিয়েছেন ওটা। স্তব্ধ মন্দিরের ললিতার ক্রন্দনধ্বনি, করাঘাত, নূপুরের শব্দ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এতক্ষণে সেই শব্দে মন্দিরের খিলানে খিলানে আশ্রয় নেওয়া কবুতরের ঘুম ভাঙল। কবুতরের দল জেগে উঠে ডাকতে আরম্ভ করল। কবুতর ডাকতে, ডানা ঝাঁপটাতে মন্দিরের সীমানার নিম, আম, কাঁঠাল, কাঠগোলাপ গাছে আশ্রয় নেওয়া পাখিরা ডেকে উঠল। সেই পাখির ডাক মন্দিরের প্রাচীর পার হয়ে চলে গেল। প্রাচীরের ওপারে গন্ধবতী নদীর ধারের পুরনো এক শিরিস গাছে ঘুমিয়ে থাকা কাকের দল অন্য পাখিদের-ডাকে জেগে উঠে অন্ধকারে ভয় পেয়ে ডাকতে আরম্ভ করল। অন্ধের মতো অন্ধকারে ডানা ঝাপটে আবার ডালে ফিরে আর্তনাদ করতে লাগল। কাকের ডাক, পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল পথের কুকুরদের। তারা জেগে উঠে সন্দিগ্ধ হয়ে কোনো দিশা না খুঁজে পেয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল আকাশের দিকে চেয়ে। অন্ধকারে গ্রহ তারা খচিত ফাল্গুনের আকাশই তাদের চেনা। আকাশের গ্রহ তারাদেরও তারা চেনে। চেনে তাই দক্ষিণ আকাশের অস্তগামী অগস্ত্য, তার উপরে জ্বলজ্বলে লুব্ধকের দিকে চেয়ে কাঁদতে লাগল। আকাশগঙ্গার দিকে চেয়ে কাঁদতে লাগল। কেঁদে কালপুরুষকে ডাকতে লাগল যেন। সপ্তঋষির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে থাকল। তারা ভয় পেয়েছিল। কুকুরের কান্নায় গন্ধবতী নদীর পাড়ের ধীবরপল্লীর মানুষজন জেগে ওঠে। তারা কলরব করতে লাগল। অন্ধকার নদীর দিকে তাকাল, আকাশের দিকে তাকাল। নগরে কি শত্রুসৈন্য ঢুকল? হুন দল? তারা কিছু না বুঝতে পেরে জেগে থাকল অনেকজন মিলে।

বুড়ো প্রধান পুরোহিতের ঘুম আসেনা গভীর হয়ে। যত বয়স হচ্ছে, ঘুম তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তবে এরই ভিতর ঘুম আর জাগরণে পড়ে থাকেন তো। তাঁর ঘুম ভাঙল। ঘুম ভাঙতেই কুকুরের ডাক শুনলেন প্রধান পুরোহিত। অন্ধকারে কুকুর কাঁদে কেন? কাক ডাকছিল না? এখন থেমে গেছে। কবুতর ডাকতে ডাকতে আবার স্তব্ধতায় ফিরে যাচ্ছে। প্রধান পুরোহিতের মনে হলো ওঠেন। তস্কর আসতে পারে। তবে কিনা এ হলো মহাকাল মন্দির। অবন্তী দেশের মানুষের মহাকালে অসীম বিশ্বাস। মহাকাল মন্দিরে তস্কর প্রবেশের আগে দশবার ভাববে। বছর কয় আগে তস্কর ধরা পড়ে মন্দিরের ভিতর। সে গর্ভগৃহে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল। ধরা পড়ে প্রহৃত হয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করে। প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মদেব ভট্টই তাকে নিমগাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলেছিলেন ধীবরপল্লীর লোক দিয়ে। তারপর এসেছিল উতঙ্ক। উতঙ্কই একা একা মেরে ফেলে লোকটাকে যন্ত্রণা দিয়ে। সেই মৃত্যুযন্ত্রণা বহুলোক প্রত্যক্ষ করেছিল। শূদ্রপল্লীর মানুষজন গন্ধবতীর তীরে দাঁড়িয়ে শুনেছিল মৃত্যুকান্না। লোকটা শূদ্রপল্লী থেকেই এসেছিল। তারপর থেকে মন্দির নিরুপদ্রবে আছে। মন্দিরের সম্পদ তো কম নয়। সমস্ত অলঙ্কার, ধনরত্ন যথাস্থানে

গচ্ছিত আছে। সেই স্থানের কথা জানেন প্রধান পুরোহিত। জানেন সুভগ দত্ত। তাঁকে বলেছেন ব্রহ্মদেব। রাজাকে তিনি বলতে বাধ্য, কিন্তু রাজার কোনো কৌতূহল নেই। মহাকাল দানস্বরূপ যা পান, সব প্রকারান্তরে প্রধান পুরোহিতেরই সম্পত্তি।

ব্রহ্মদেব উঠলেন। তাঁর মনে হলো তস্কর না হলে ওভাবে কুকুর কাঁদে কেন? কী অমঙ্গলের ক্রন্দন ধ্বনি! আবার কি হুন আক্রমণ হবে? ব্রহ্মদেব উঠে তাঁর জায়গায় বসেই ডাক দিলেন, ললিতারে, ললিতা—।

সাড়া পেলেন না তিনি। সাড়া না পেয়ে ক্রুদ্ধ হলেন প্রধান পুরোহিত। তাঁর ভয় করছিল। কুকুরের কান্না ক্রমশ থেমে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু তা যে রেশটি ছড়িয়ে দিয়েছিল অন্ধকারে তা ব্রহ্মদেবের গায়ের রোম খাড়া করে দিয়েছিল। তাঁর ভয় বাড়ছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল সত্যিই হয়ত শত্রু ঢুকেছে নগরে। হুন জাতি যদি আবার প্রবেশ করে, প্রথমে তো আসবে মন্দিরে। মন্দির লুঠ করে পাবে সোনা, রূপা, হীরা, মুক্তা, সঙ্গে যুবতী দেবদাসী। পুরোহিত হাঁক দিলেন, অ্যাই ললিতা, মাগি তুই কোথায় গেলি? শুনে যা।

ললিতা এল না। প্রধান পুরোহিত চুপ করে বসে থাকলেন। আবার হাঁক দিলেন। অবশেষে নূপুর বাজল অন্ধকারে। ললিতার কানে গিয়েছিল ব্রহ্মদেবের ডাক। সে ত্রস্ত পায়ে হেঁটে আসছে। প্রদীপ নিল এক কুলুঙ্গি থেকে। তারপর দরজায় এসে দাঁড়াতেই প্রধান পুরোহিত ক্রোধে আগুন হয়ে উঠলেন, ছিলি কোথায়?

ললিতা বলল, মহাকাল।

মহাকাল মানে?

ললিতা বলল, প্রভু, আমি মহাকালকে পেয়েছি।

ব্রহ্মদেব অবাক হলেন, তার মানে?

মহাকাল এসেছিলেন, আমার নিকটে, সত্য প্রভু।

ব্রহ্মদেব ভট্ট ডাকলেন ললিতাকে ভিতরে, ললিতা প্রদীপটি দেওয়ালের ধারে রেখে প্রধান পুরোহিতের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে তাঁরে পায়ের পাতা দু'হাতে ধরে অস্ফুট গলায় বলে, সত্য বলছি প্রভু।

সারমেয় কাঁদে কেন?

জানিনা প্রভু।

কবে এলেন মহাকাল? প্রধান পুরোহিত তাঁর একটি পা ললিতার কাঁধে তুলে দেন, অন্য পা-টি বুকে স্থাপন করেন, তোর কাছে আসবেন কেন তিনি?

ললিতা বলে, ওই সত্য প্রভু।

ওইজন্য সারমেয় কাঁদে, মাগি তুই কী বলছিস সে খেয়াল আছে?

ললিতা কেঁদে ফেলে বুকে আঘাত পেয়ে। সে ছিটকে সরে গিয়ে বলে, সারমেয় কাঁদে কেন সারমেয় জানে, হে প্রভু সুভদ্রা আমার সর্বস্ব হরণ করেছে, বিহিত করুন।

বাইশ

সুভগ দত্ত বললেন, এই অলঙ্কার রাজার।

সে কী! হাতের মুঠি খুলে গেল প্রধান পুরোহিতের।

হ্যাঁ, রাজার গলা থেকে আপনার হাতে এসে পড়েছে।

আপনি ঠিক বলছেন?

হ্যাঁ। সুভগ দত্ত হাত বাড়িয়ে প্রধান পুরোহিতের মুঠি থেকে হারছড়া নিয়ে এহাত ওহাত করতে করতে বললেন, যখন রাজার অভিষেক হয়, তিনি যখন উজ্জয়িনীর সিংহাসনে বসেন এই হার দিয়েছিল নগরের শ্রেষ্ঠী, আমি দিয়েছিলাম, আমি চিনি, আপনার কাছে এল কী করে?

তখন প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মদেব ধীরে ধীরে ললিতা, সুভদ্রার কথা বললেন। সুভদ্রা যে হারছড়া ছিনিয়ে নিয়েছিল ললিতার কাছ থেকে তাও বললেন। সুভগ দত্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন,

প্রধান পুরোহিত জবাব দিতে লাগলেন। শুনতে শুনতে দুই দেবদাসীকে ডাকতে বললেন সুভগ দত্ত। ব্রহ্মদেব ঘন্টা বাজালেন। এল ললিতা। দরজায় পাগলিনী প্রায় ললিতাকে দেখে চমকে উঠলেন সুভগ দত্ত। বেশবাস অসম্বৃত, চুল আলুলায়িত, মুখখানিতে চোখের জলের দাগ। প্রধান পুরোহিত তাকে দিয়েই সুভদ্রাকে ডাকলেন। ললিতা চলে গেল।

সুভগ দত্ত এসেছেন। তাঁকে খবর পাঠিয়েছিলেন প্রধান পুরোহিত। তিনি যে আন্দাজ করেছিলেন তা সত্য হলো। ঠিক আন্দাজ নয়, তাঁর চেনা মনে হয়েছিল সোনার হারটিকে। মহাকালের মন্দিরের প্রধান পুরোহিত নিজে তো জানেন মহাকাল আসতে পারে না। তিনি ললিতার একটি কথাও বিশ্বাস করেন নি, সুভদ্রার কথাও না। সুভদ্রা অতি বুদ্ধিমতী, ধরা পড়ে গিয়ে বলেছে, এই অলঙ্কার দেবতারই দান। সে গর্ভগৃহে মহাকালেশ্বরের কণ্ঠ থেকে শুনেছে তা। ললিতার কথা প্রতিটি অক্ষর সত্য। এছাড়া ললিতাকে এবং নিজেকে রক্ষা করার উপায় জানা ছিল না সুভদ্রার। সে কেঁদে বলেছে, মহাকাল অতি জাগ্রত, মহাকাল দিয়ে গেছেন ললিতাকে। সুভদ্রার কথায় ললিতা নিশ্চুপ। সে নিশ্চুপ, নিঃঝুম হয়ে আছে ক'দিন ধরে। প্রধান পুরোহিত বুঝতে পারছেন দুই দেবদাসী একসঙ্গে অসত্য বলছে। তিনি নিজে জানেন দেবতা কত জাগ্রত। দেবতা কীভাবে বেরিয়ে আসেন গর্ভগৃহ থেকে।

সুভদ্রাকে নিয়ে ললিতা ফিরে এল। সুভদ্রা দুয়ারে দাঁড়িয়ে, তার পিছনে অন্যজন। সুভগ দত্ত দেখলেন সুভদ্রাকে কাছ থেকে। এর আগে সেই যে দেখেছিলেন আগুনের শিখার মতো দুলছিল এই কন্যা মহাকালেশ্বরের সম্মুখে সন্ধ্যারতির সময়। সুভদ্রা দেখছে শ্রেষ্ঠীকে। বুক টিপটিপ করছিল তার। ভয় করছিল। এই মানুষকে কি দেখেছিল সে ধূপের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে? ঘন্টাধ্বনির ভিতরে এই দেবতাই কি জেগে উঠেছিল তার সত্তায়? ললিতার কাছে শুনেছে শ্রেষ্ঠী এসেছেন। শ্রেষ্ঠী তার মহাকাল। মহাকালের মতোই শ্রেষ্ঠী তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবেন। শ্রেষ্ঠীকে ভোলেনি সে। মনে মনে রচনা করেছে অনেক দুর্লভ মুহূর্ত। এখন দেখছে শ্রেষ্ঠীর হাতে সেই কণ্ঠহার। শ্রেষ্ঠীর মুখখানি ধূর্ত। শ্রেষ্ঠীর পাশে বৃদ্ধ প্রধান পুরোহিত। দুটি মুখ পরস্পরের ভিতর মিশে গেছে যেন।

শ্রেষ্ঠী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন সুভদ্রা দাসীকে। নবীন যৌবন। মুখখানি বড় সুন্দর। চোখ দুটি কী মায়াবী, মাথায় কত চুল! চুল এলিয়ে আছে পিঠে। স্নান সারা হয়েছে সকালে। দেবদাসী সাজতে বসবে দ্বিপ্রহর গেলে। তার অভিসার সন্ধ্যায়, দিনমণি অস্তে গেলে। এমন বেশে শ্রেষ্ঠী এই কন্যাদের দ্যাখেননি তেমন। শ্রেষ্ঠী বললেন, সত্য বলবে?

সুভদ্রা মাথা কাত করে। হায়, এই মানুষটি কেন প্রধান পুরোহিতের সংস্পর্শে এসে তাঁরই মতো হয়ে গেল। সুভদ্রার চোখে জল এসে যাচ্ছে। হায় মহাকাল! হে শ্রেষ্ঠ পুরুষ! তুমিই আমার মহাকাল! কিন্তু তুমি যে ক্রমে জরাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছ প্রাণের দেবতা। তোমাকে সত্য বলতে পারি, কিন্তু তা এখানে নয়। এখানে প্রধান পুরোহিত আছেন। তাকে কিছুতেই সত্য বলা যাবে না। এখন সত্য বললে আগে মিথ্যা বলার দায়ে প্রধান পুরোহিত তাকে হেনস্থা করবেন। হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠবেন।

সুভগ দত্ত খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী করে পেয়েছ বলো দেখি।

মুখ তুলল সুভদ্রা, ললিতার কাছ থেকে।

নাকি তুমিই পেয়েছ, ললিতা পায়নি?

সত্য বলছি, ললিতা লুকিয়ে রেখেছিল, এ হার দেবতার দেওয়া।

সুভগ দত্ত বললেন, ভাল করে ভেবে দ্যাখো, এই দেবমন্দিরে অসত্য উচ্চারণ পাপ, সেই পাপে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

সুভদ্রা বলল একই কথা। সুভগ দত্ত আবার জিজ্ঞেস করলেন একই কথা। সুভদ্রা বারবার একই উচ্চারণ করলে শ্রেষ্ঠী বোঝেন অসত্য বলছে না সে। কিন্তু তারপর সুভদ্রা বলল, দেবতা ওই হার ফিরিয়ে দিতে বলেছেন ললিতাকে। সে শুনেছে তা গর্ভগৃহে বসে সেই রাত্রেই। শুনে জ্ঞানহারা হয়ে গিয়েছিল। মহাকালই দিয়ে গেছেন ললিতাকে।

শ্রেষ্ঠী আবার জিজ্ঞেস করলেন, ভেবে দ্যাখো।

আমি যা শুনেছি তাই বলছি।

এ জগতে ভগবান মহাকালের চেয়ে শক্তিমান আর কেউ নেই, এতবড় মন্দির আর কোথাও নেই,

অবন্তী দেশ, বৎস দেশ, সৌরাষ্ট্র, কোশল, মগধ, যেখানে যাও কোথাও নেই।

সুভদ্রা এসব নাম শোনেনি। চুপ করে থাকে। তার পায়ের পাতা শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিল কর্কশ পাথুরে মেঝে। সে কান পেতে শ্রেষ্ঠীর কণ্ঠস্বর কানে ধরে রাখছিল। মধুর লাগছে। হে শ্রেষ্ঠজন। দেবদাসী সুভদ্রা তোমার পথ চেয়ে বসেছিল যে। মনে মনে উচ্চারণ করে সুভদ্রা, দেবসেবা আমার সার্থক হবে যদি তোমাকে পাই। কী নরম, বাতাসের মতো স্বরধ্বনি! কী মোলায়েম দু'চোখের চাহনি!

সুভগ দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, স্বকর্ণে শুনেছো?

হ্যাঁ ভদ্র! মুখ তুলল সুভদ্রা, আয়ত চোখদুটি মেলে ধরল শ্রেষ্ঠীর চোখে। তার চোখে জল এসে যাচ্ছে। এই দেবমন্দির থেকে কবে তাকে নিয়ে যাবেন তার দেবতা? শ্রেষ্ঠী কি জানেন না সুভদ্রা কেন চেয়ে আছে তার দিকে।

সুভগদত্ত জিজ্ঞেস করলেন, স্বপ্নে শুনেছিলে?

না প্রভু, জাগরণে।

প্রধান পুরোহিত গরগর করে উঠলেন, সব অসত্য বলছে, মাগিটা ভাল ছিল, কী যে হয়েছে ওর এক কথা বলে যাচ্ছে, ওকে মন্দির থেকে দূর করে দেব যদি সত্যি কথা না বলে।

আহ্! শ্রেষ্ঠী হাত তুলে থামালেন বৃদ্ধ পুরোহিতকে। শ্রেষ্ঠীর চোখদুটি জহুরির চোখ তো বটে। তাঁর চোখে আসল নকলে মিলিয়ে দেওয়ার কোনো উপায় নেই। কোনটা সোনা কোনটা তামা তাতো খালি চোখেই ধরা যায়। কিন্তু শুধু সোনা? সোনা চিনতে হলে নিকষ পাষাণ দরকার হয় না শ্রেষ্ঠীর। শ্রেষ্ঠী মানুষ চেনেন। তিনি দেবদাসীর অভিভূত ভাবটা টের পাচ্ছেন যেন, বললেন, অনেক সময় স্বপ্ন আর জাগরণে তফাৎ করতে পারে না মানুষ, তেমন হয়নি তো, মনে হয় তেমন হয়েছে, সত্যি করে বলো দেখি।

সত্য উচ্চারণ করতে পারে সুভদ্রা। তা শুধু শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্তর কাছেই। বৃদ্ধ পুরোহিতের সম্মুখ নয়। তবু সে বলল, হতে পারে, তবে জাগরণেই মনে হয়।

শ্রেষ্ঠী বললেন, স্বপ্ন আর জাগরণে কীই বা তফাৎ, মহাকাল যদি আদেশ করেন তা স্বপনে যেমন সত্য, জাগরণেও।

হ্যাঁ প্রভু! মুখ তুলল আবার দেবদাসী সুভদ্রা। তার প্রভুকে দেখল যেন প্রাণ ভরে। বুক দপদপ করছে। হে প্রভু যদি মনের বাসনা প্রকাশ করতে পারতাম! প্রভু কি জানেন না? শ্রেষ্ঠী এবার ডাকলেন ললিতাকে। ললিতা এগিয়ে এলে সুভদ্রা তার পিছনে তাকে ছুঁয়ে দাঁড়াল। সুভগ দত্ত বললেন, ভেবে দ্যাখো দেখি এ হার কী করে এল তোমার হাতে?

ললিতা দাসী বলল সেই হিমেল রাত্রির কথা। সুভগ দত্ত জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, ললিতা জবাব দিতে লাগল। কিন্তু তার জবাবে সব উত্তর তো পেলেন না শ্রেষ্ঠী। গভীর অন্ধকারে দেবতার মুখ দেখতে পায়নি ললিতা, কাঁদতে কাঁদতে তা বলতে লাগল সে। শ্রেষ্ঠী অবাক হয়ে শুনতে লাগলেন। তাঁর চোখ পড়ছিল ললিতার পিছনে দাঁড়ান সুভদ্রার আকুল নয়নে। চেয়েই আছে সে। তারও দু'চোখ দিয়ে জল ঝরে যাচ্ছে। শ্রেষ্ঠী শুনতে চাইছিলেন সেই হিম রাত্রির প্রতিটি মুহূর্তের কথা। ললিতার গলা বুঁজে যাচ্ছিল। সে গুটিয়ে যাচ্ছিল লজ্জায়। কিন্তু শ্রেষ্ঠী তো ললিতার প্রতি মুহূর্তের বিবরণ নিয়ে নিশ্চিত হতে চাইছিলেন তাঁর অনুমাণে।

সুভগ দত্ত বললেন, সব বল, বাদ দিসনে কিছু।

প্রভু! গলা বুঁজে যায় ললিতার, কথা থেমে যায়। সেই পরম মিলনের মুহূর্ত তাঁর একান্ত নিজস্ব। সেই কথা তো সুভদ্রাকেও বলতে পারেনি সে। আর একটি পুরুষ মানুষকে বলে কী করে? মরে গেলেও বলতে পারবে না সে।

কী হলো চুপ করে আছিস যে। কর্কশ শোনালো সুভগ দত্তর কণ্ঠস্বর।

প্রভু সে কথা তো বলা যায় না। পিছন থেকে সুভদ্রা বলল।

আহ্! বিরক্ত হলেন সুভগ দত্ত। তুই কথা বলছিস কেন? বল কী হয়েছিল, কী করে সে তোকে ধরল, ঘুমিয়েছিলি না জেগে, আগে থেকে জানতিস যে সে আসবে? বল, সত্যি করে বল।

প্রভু সব ভগবানের লীলা। বলে ওঠে সুভদ্রা।

গর্জন করে ওঠেন শ্রেষ্ঠী, তোকে বলতে বলেছে কে, চোপ! মন্দিরে থেকে লীলা হবে আর তা ভগবানের নামে চলে যাবে বল ভগবান আর মানুষ কি এক? এই ললিতা বল।

ললিতা টের পাচ্ছিল সুভগ দত্তর মুখ থেকে নরম আবরণটি খসে পড়ছে। সুভদ্রা কেমন গুটিয়ে যাচ্ছিল। এই প্রভুর কথা কি সে মনে মনে ভাবে? সেই মানুষ আর এই মানুষ কি এক?

কী হলো বললি না, ভগবান আর মানুষ এক কিনা। এই সুভদ্রা তুই বল।

না প্রভু।

ভগবান এসেছিল না পুরুষমানুষ?

পুরুষের বেশে ভগবান। সুভদ্রা বলল।

রক্তমাংসের পুরুষ, এই ললিতা তুই তো শুয়েছিলি তার সঙ্গে, বল সে কি পুরুষ মানুষের মতো পুরুষ ছিল, না ভগবানের মতো?

ললিতা কাঁপছিল, জবাব দিতে পারে না।

পুরুষমানুষ যা করে, তাই করেছিল?

মাথা নামায় ললিতা, অস্ফুটস্বরে বলে, হ্যাঁ প্রভু।

তবে ভগবান জানলি কী করে, সে কি তোকে বলেছিল যে সে ভগবান?

মাথা নাড়ে ললিতা।

তবে ভগবান বললি কেন? গর্জন করে ওঠেন শ্রেষ্ঠী, ফিরলেন প্রধান পুরোহিতের দিকে, ভগবান নয়, কোনো পাপী। মন্দির অপবিত্র করে গেছে, মেয়ে দুটোকে কোনো পাষণ্ডের হাতে দিন। ঠিক বের করে আনবে কে এসেছিল রাত্রে। আমিও জানি কে এসেছিল? এ তো ভীষণ পাপ, মহাকালের মন্দিরে এসে তাঁর দেবদাসীকে তস্করের মতো ভোগ করে যাচ্ছে। দেবদাসী শঠতা করছে দেবতার নামে। মেয়ে দুটোকে উতঙ্কের হাতে দেব?

আর্তনাদ করে সুভদ্রা দেওয়ালে ঢলে পড়ে। তাকে ধরে ললিতা। সুভগ দত্ত গর্জে যাচ্ছিলেন। তাঁর ভৃত্য উতঙ্কের হাতে পড়লে ঠিক শিক্ষা হবে মেয়েমানুষ দুটোর। ছেনালি ঘুচিয়ে দেবে সে।

প্রধান পুরোহিত বললেন, এখন কী কর্তব্য?

আচমকা শান্ত হলেন সুভগ দত্ত। এখন কিছু নয়। এরা যেমন আছে থাকুক, এই হারের মালিককে আমি চিনি, এদের লাগবে তাঁকে অভিযুক্ত করার জন্য।

উতঙ্ক?

থাকুক এরা, পরে দেখব! খোঁজ নিতে হবে মহাকালের নামে ওসব বলতে কে শিখিয়েছিল ওদের। এই তোরা যা।

সুভদ্রাকে ধরে ললিতা চলে যেতেই সুভগদত্ত দরজা বন্ধ করেন। উত্তেজনায় তাঁর সর্ব অঙ্গ কাঁপছে। বললেন, রাজা এসে ধর্ষণ করে গেছেন দেবদাসীকে রাতের অন্ধকারে। ঘুমন্ত দেবদাসীকে ধর্ষণ করে গেছেন উজ্জয়িনীর রাজা। এমন পাপ অবন্তীদেশকে আর কখনো স্পর্শ করেনি, ওহ্! কী ভয়ানক, আকাশ ভেঙে পড়বে মাথায়।

আপনি নিশ্চিত?

হ্যাঁ, রাজাই। এ তো রাজারই গলায় ছিল। দেবদাসী যদি সত্য কথা বলে রাজা কী করে অস্বীকার করবেন?

তাহলে!

সুভগ দত্ত বললেন, পরামর্শ করতে হবে। রাজার কোনো সন্তান নেই, অথচ তিনি কিনা তুচ্ছ দেবদাসীকে ঘুমন্ত অবস্থায়...।

দু'কানে আঙুল দেওয়ার ভাণ করলেন বৃদ্ধ পুরোহিত, আবার জিজ্ঞেস করলেন, এবার তাহলে কী হবে?

দেবদত্তার কাছে একথা পৌঁছে দিতে হবে।

সে তো আপনার দাসী।

না রাজার, মেয়েমানুষটা উজ্জয়িনীর রাজাকে ছাড়া আর কোনো পুরুষমানুষকে চেনে না, ওর গুমর

ভাঙতে হবে।

তাহলে কী হবে? আবার জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ পুরোহিত।

রাজার কীর্তি সবাই জেনে যাবে।

ঢোল সহরৎ হবে?

সুভগ দত্ত বললেন, ঢোলের শব্দের চেয়েও আরো জোরে কথা ছুটে যাবে এদিক-ওদিক, দ্বিজদেব আমি কি এগোব?

আপনার ইচ্ছা।

আপনি তো পাশে আছেন?

আছি! আচমকা আর্তনাদ করে ওঠেন বৃদ্ধ পুরোহিত। কী ভয়ানক অপমান! কী ভীষণ পাপ। ঘুমন্ত নারীকে ধর্ষণ! নরকেও স্থান নেই অবন্তীর রাজার। মহাকাল মন্দিরের চুড়োর সোনার মুকুট কালো হয়ে যাবে যে এই পাপে। আমি যে এখন কী করি।

তেইশ

চৈত্র ধু ধু করছে। বাতাসে এখন ঘূর্ণী। ঘূর্ণী বাতাসের মতো রাজার কলঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছিল এদিক-ওদিক। ফিসফাস হচ্ছিল, কানাকানি হচ্ছিল, মুখে মুখে কথা ছড়িয়ে যাচ্ছিল নগর পেরিয়ে আরো অনেক দূরে।

রাজার গায়ে কলঙ্ক লাগে না। তবু লাগছিল। চাঁদে কি কলঙ্ক নেই? কলঙ্ক নিয়েই চাঁদ সুন্দর। কিন্তু রাজার কলঙ্ক রাজাকে সুন্দর করেনি। পাপ! পাপ ঘিরে ধরেছে এই নগরকে, এই অবন্তী দেশকে।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা গিয়ে কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হয়ে গেছে। শীত এবার আগেই ফুরিয়েছিল। তবে কিনা চৈত্ররাতেও হিমভাব থাকে অন্ধকারে। এবার তা একবিন্দুও নেই। মেঘবাহী যে বাতাস মাঘ থেকে চৈত্র পর্যন্ত যে-কোনো সময়ে ফেরে হিমালয় থেকে, যায় অপরাসাগরের দিকে, যাত্রা পথে বৃষ্টি নামায়, তা দু-এক ফোঁটা হলেও নামায়, সেই বাতাসের দেখা নেই এবার। বাতাস ফিরছে না উত্তর-পুব থেকে। ফিরবে কী করে? বাতাস তো আষাঢ়-শ্রাবণে মেঘ নিয়ে যায়নি অপরাসাগর কিংবা দক্ষিণ-পশ্চিমের আম্রকুট পর্বত থেকে হিমালয়ে। যে বাতাস যায়নি, সেই বাতাস ফিরছে না। মাঘ-ফাল্গুনেও বৃষ্টির ছিটেফোঁটা পেল না অবন্তীর মাটি ও মানুষ।

অন্ধকার রাত্রি ভ্যাপসা। দিনমানের প্রকৃতিও দমচাপা। এর ভিতরে ছড়িয়ে যাচ্ছিল কলঙ্ককথা। উজ্জয়িনীর বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছিল রাজার পাপ। মহাকাল মন্দিরে ধর্ষিতা হয়েছে এক দেবদাসী।.ধরা পড়েনি ধর্ষক। কিন্তু তার পরিচয় গোপন থাকেনি। ধর্ষিতা দেবদাসী অন্ধকারে নিপীড়কের কণ্ঠহার ছিনিয়ে নিয়েছে। সন্তানহীন রাজা শেষ পর্যন্ত মহাকাল মন্দিরকে অপবিত্র করেছেন।

কথাটা এইভাবে যখন রটে যাচ্ছিল, কেউ মাথা ঘামাচ্ছিল না। লোকে জানছিল রাজা এক দেবদাসীর যৌবন লুট করেছেন। লোকজনের মনে হচ্ছিল উজ্জয়িনীর রাজার এমন সাজে না। তিনি তো এই পুণ্যভূমির রাজা। রাজা সবই পারেন। সুন্দরী নারী, যুবতী যাএগ্রা করলেই তাঁর দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াবে। রাজার কী অভাব আছে? এই অবন্তীর আকাশের নীচে যা আছে, স্থাবর, অস্থাবর সবই তাঁর। তবে কেন তিনি তস্করের মতো মহাকালের দেবদাসীকে ধর্ষণ করবেন? কামুক, লম্পটের মতো কেন হবে তাঁর আচরণ? এসব প্রশ্ন কারো কারো ভিতরে জেগেছে। তারপর সে ভেবেছে তিনি তো রাজা, রাজা কোনো অন্যায় করতে পারেন না। রাজার পাপ হয় না। কোনো পাপ রাজাকে স্পর্শ করতে পারে না। রাজা সূর্যের মতো নিষ্কলঙ্ক। কোনো কলঙ্কই কলঙ্ক নয় তাঁর কাছে। কথাটা ফিসফাস হচ্ছিল এইভাবে। কলঙ্কের কথা ভাবতে পারছিল না কেউ। রাজা সকলের অধীশ্বর। তাঁর কলঙ্ক হয় কীভাবে?

কিন্তু দেবদাসী তো মহাকালের অধীন, মহাকালের ভোগ্যা। মহাকাল সবার উপরে। মন্দির চূড়ায় চোখ ফেললে অনুমান করা যায় মহাকাল কত বড়। মহাকাল কত মহিমময়। রাজপ্রাসাদ শীর্ষ তো মহাকাল মন্দিরের শীর্ষের কাছে নতজানু। রাজা কেন দেবতার দাসীকে ভোগ করবেন? তাও তো এক প্রশ্ন। এইরকম নানা জিজ্ঞাসা মানুষের মনের ভিতরে ঘূর্ণীপাক দিয়ে উড়ছিল।

মহাকালেশ্বর শিব হলেন সর্বশক্তিমান। এই উজ্জয়িনী নগরকে তিনিই মুক্ত করেন ত্রিপুরাসুরের

দানবীয় বন্ধন থেকে। রাজা নিজে মহাকালেশ্বরের উপাসক। তিনি কী করে মহাকালে নিবেদিতা দাসীকে ভোগ করেন? দেবদাসী কেঁদেছিল রাজার দ্বারা ধর্ষিতা হতে হতে। দেবদাসী বলেছিল মহাকাল ভগবান ছাড়া আর কারোর কথা ভাবতে পারে না। ভগবানের প্রতি নিবেদন করেছে সে নিজেকে। তাকে পীড়ন থেকে মুক্তি দিন রাজা। রাজা শোনেননি। তাকে বলপূর্বক ভোগ করেছেন। এই ঘটনা কি পাপ নয়? পাপ তাহলে কী?

পাপ কী করে হবে? রাজা তো ভোগ করেছেন একটি যুবতীকে। দেবদাসী তো যুবতী নারী মাত্র। যুবতী নারী আর শূদ্রতে বলপ্রয়োগ তো বিধেয়। নারী এবং শূদ্রের ইচ্ছা অনিচ্ছার দাম কী? শূদ্রের জন্ম যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের দাসত্ব করতে নারী জন্ম তো পুরুষের ভোগ্যা হতে। সমস্ত নারীই যেন শূদ্রাণী। শূদ্রকে স্পর্শ করা যেমন অশৌচ কর্ম, শূদ্রাণীকে ভোগ করা তা নয়। দেবদাসী তো শূদ্রাণীর মতোই এক নারী। তার ভাগ্য ভাল রাজা তাকে ভোগ করেছেন মাত্র। শিয়াল কুকুর দিয়ে ভক্ষণ করাননি। মহাকাল অরণ্যে নিক্ষেপ করেননি তার প্রাণহীন দেহ। যুবতী যদি রাজার কণ্ঠহার ছিনিয়ে নিয়ে থাকে, তবে সে অন্যায় করেছে। কে সেই দেবদাসী যে এই কাজ করেছে? দেবদাসীকে ভোগ করা তো রাজারই অধিকার। এ নিয়ে প্রশ্ন তোলে কে?

কিন্তু রাজা মহাকাল-পরিচয়ে দেবদাসীর ঘুম ভাঙিয়েছিলেন। কথা একটু একটু করে বেরিয়ে আসছে মহাকাল মন্দির থেকে। রাজা অন্ধকারে নিজে মহাকাল পরিচয়ে দেবদাসীর অনুমোদন চেয়েছিলেন প্রবৃত্তি নিবারণে। দেবদাসী তাকে হয়ত চিনতে পেরেছিল, অথবা না চিনেও টের পেয়ে গিয়েছিল মহাকাল পরিচয়টি সত্য নয়। সত্য হবে কী করে? মহাকাল ভগবান তো পরমেশ্বর শিব। তিনি তো পার্বতী ব্যতীত অন্য কোনো নারীকে ভোগ করতে পারেন না। দেবতা কেন সামান্য দাসীকে ভোগ করবেন? শঙ্কর আর পার্বতীর একশত রাত্রির লীলার কথা কে না জানে? শঙ্কর কেন পার্বতীকে ত্যাগ করে সামান্য দেবদাসীকে লুণ্ঠন করবেন? তিনি যে বহুগামী তা কোনো শাস্ত্রে লেখেনি। তিনি এই জগৎ সংসারের অধীশ্বর। কে কবে শুনেছে কাম নিবৃত্তির জন্য অনন্ত যৌবনা পার্বতীকে ছেড়ে মহাকাল শঙ্কর দেবদাসীতে উপগত হবেন? এ হলো রাজার পাপ। রাজা দেবমন্দির অপবিত্র করেছেন মহাকাল পরিচয়ে দেবদাসীকে ভোগ করে।

রাজার পাপের কথা একদল বলছিল। আর একদল তা বিশ্বাস করছিল না। কেউ কেউ বলছিল রাজার পাপের চিহ্ন ফুটে উঠছে চারদিকে। কেউ বলছিল রাজা পাপ করতে পারেন না। প্রজার ক্ষেত্রে যা পাপ, রাজার ক্ষেত্রে তা নয়। রাজা ভর্তৃহরি মানুষ। মানুষকে যদিও পাপ স্পর্শ করে থাকে, রাজাকে করেনি। আবার কেউ কেউ এও বলছে, মৈথুনে কোনো পাপ হয় না। পদ্ম রক্তবর্ণ। প্রকৃতি তাকে রক্তবর্ণ করেছে বলেই, তবুও ভ্রমর তার কাছে ঘোরাফেরা করে। দেবদাসী হলেও সে যুবতী। যুবতী নারীর ভিতরে অমৃতও নেই, হলাহলও নেই। মৈথুনে, মিলনে সে অমৃত। বিরূপ হলে সেই তীব্র হলাহল। হায়! রাজা যেন দেবদাসীকে ভোগ করতে গিয়ে হলাহল পান করে এসেছেন। দেবদাসী হলেও সে তো যুবতী নারী। তাকে ভোগ করায় অন্যায় কোথায়?

কথাগুলি শূদ্রপল্লী থেকে রাজপ্রাসাদে পৌঁছে গিয়েছিল। উজ্জয়িনীর পথে পথে শোনা যাচ্ছিল। বারাঙ্গনা পল্লীতেও ফিসফিস করে এ ওকে শুনিয়ে দিচ্ছিল।

শূদ্রপল্লীতে এখন সমস্ত দিন মানুষই থাকে না প্রায়। অভাবের দিন শুরু হয়ে গেছে। কাজের খোঁজে মেয়েপুরুষ ঘর ছেড়ে বেরোচ্ছে রোজই। মাঠ জমিতে সবার কাজ থাকে না বটে, কিন্তু অভাবও থাকে না। একটু হিসেব করে চললে অভাব শুরু হতে সেই আষাঢ় শেষ। ক'দিন আগে গম, যব, কলায়, সর্ষপ জমি থেকে যেটুকু ঘরে আসার কথা ছিল তা আসেইনি প্রায়। অনাবৃষ্টিতে মাঠ জমি সব খটখটে। প্রোষ্ঠপদে বোনা ফসল জমিতেই মরেছে। শূদ্রপল্লীর মানুষজন এখন ঘুরছে ঘূর্ণীর বাতাসের মতো। বনে, ঘুরছে, পথে ঘুরছে, নগরে ঘুরছে, শ্রেষ্ঠীগৃহের ধারকাছে চক্কর মারছে দিনভর।

এমন চৈত্র সায়াহ্নে শ্রেষ্ঠীর রথ আবার এসেছে রত্নাকর সাগর ধারে। তখন মানুষজন ফিরছে। বেলা এখন বড় হয়েছে। দিনমণি আকাশে থাকেন বহু সময়। শ্রেষ্ঠীর রথ ঘিরে আছে প্রায় শূদ্র পল্লীর মানুষজন। শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত রত্নাকর সাগরের জলহীন রূপের দিকে তাকিয়ে। একবিন্দুও জল নেই সাগরে। যেন কেউ শুষে নিয়েছে।

শ্রেষ্ঠী বললেন, তোমরা সব শুনেছ?

ঘাড় কাত করে পরাশর। বুড়ো শুনেছে বটে কিন্তু কোনো কথা বিশ্বাস করেনি।

রত্নাকর সাগর জলহীন হলো কেন?

শুকিয়ে গেছে, সুয্যি ঠাকুর টেনে নিয়েছে। বলে বুড়ো পরাশর পশ্চিমে নত হলো, খুব তেজ এবার রোদে, এত তেজ হয়নি আগে। দু'বছর জল নেই।

মন্দিরের খবর জান?

না প্রভু! বুড়ো বিড়বিড় করে, আমরা নীচ জাতি, শুদ্দুর।

শ্রেষ্ঠী বললেন, বৃষ্টি নেই কত কাল, কেন জানো?

মাথা নাড়ে পরাশর, তারপর ফিসফিসিয়ে বলে, মহাকাল জানেন।

মহাকাল ছারখার করে দেবেন সব।

ভীত মুখে নানা বয়সের জীর্ণদেহী মানুষগুলি শ্রেষ্ঠীর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা ভয় পেয়েছে, কিন্তু কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। সেই যে শীতের এক দুপুরে,পৌষমাসে শ্রেষ্ঠী এসে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে গিয়েছিলেন তারপর এই এলেন। কেন আসছেন শ্রেষ্ঠী? শূদ্র বসতিতে এঁর মতো মানুষের তো আবার আসার কথা নয়। বুড়োর মনে পড়ে যাচ্ছিল সেই দুপুরের কথা। পৌষমাস, এই সরোবর তখন প্রায় জলশূন্য, শুধু তলানি কর্দমাক্ত জল দেখে তারা ভাবত আচমকা বৃষ্টিতে ভরে উঠবে সাগর। শ্রেষ্ঠী বলেছিলেন, কেন জল শুকোচ্ছে, কেন পদ্ম নেই সেই খোঁজ করতে। রাজসভায় যেতে। শূদ্র কখনো রাজার কাছে পৌঁছতে পারে? সেই সরোবর নিয়েই দিনপাত করছে বুড়ো পরাশর। ভয় পাচ্ছে শ্রেষ্ঠীর কথায়। শ্রেষ্ঠী কী ভয়ানক কথাই না বলছেন।

শ্রেষ্ঠী বললেন, মহাকাল বিরূপ হয়েছেন, মন্দিরে অনাচার, ছারখার হয়ে যাবে সব।

হে প্রভু! পরাশর জোড়হাতে কাঁপতে থাকে।

বৃষ্টি আর হবে না যে তা টের পাচ্ছ?

পরাশর ভীত মুখে চুপচাপ। শ্রেষ্ঠী বলছেন, সূর্যদেব জলপান করে আরো তেজী হবেন, আগুন জ্বলবে, আগুনে সব জ্বলে যাবে।

প্রভু!

শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত পায়চারি করছেন। মানুষজন দেখছিল শ্রেষ্ঠীর দীর্ঘদেহখানি আরো দীর্ঘ হয়ে উঠছে যেন। পূর্বগামিনী ছায়া ঢেকে দিচ্ছে চারদিকের আলো। ছায়ার ভিতরে ঢুকে পড়ে শূদ্রজনেরা কুঁকড়ে যেতে থাকে। শ্রেষ্ঠীর ভৃত্য, রথ-সারথি উতঙ্ক রথের সামনে নিঃস্পন্দ দাঁড়িয়ে। উতঙ্ক কথা বলে না বড় একটা। উতঙ্কর চোখমুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই, কিন্তু তার দিকে তাকালে বুক হিম হয়ে যায় যেন। শ্রেষ্ঠী বললেন, মহাকাল কেন বিরূপ?

শূদ্রজন নিশ্চুপ। জবাব না দিয়ে অপরাধীর মতো মাথা নামিয়ে বসে থাকে।

শ্রেষ্ঠী বললেন, পাপের ছায়া ঢেকে ফেলেছে নগর, এর ফল বিষম।

হে প্রভু!

পাপীর পাপের ভার কি পাপী নেয়?

প্রভু!

শ্রেষ্ঠী বলছেন, অনাচার, পাপ তো একজনের, কিন্তু রত্নাকর সাগরে জল নেই, রত্নাকর সাগর কাদের?

আমাদের প্রভু।

পাপী কি তোমরা?

না প্রভু।

পাপের ভার কে নেয়?

শেষ কথাটায় ভয় করতে লাগল সকলের। চোখের সামনে থেকে আলো মুছে যেতে লাগল যেন। শ্রেষ্ঠী বলছেন, পাপ কে করেছে, কার অনাচারে সাগর শুকিয়ে যাচ্ছে তা কে না জানে, কিন্তু এর জন্য কষ্ট পাচ্ছে কারা? ফসল মরলে কাদের ক্ষতি? মহাজনের পাপের ভার নেয় কে? কারা?

কারা প্রভু?

শ্রেষ্ঠী হাসলেন, মহাকালের রোষ কাদের উপরে পড়ছে?

বুড়ো পরাশর বলল, প্রভু! আমরা অজ্ঞান।

শ্রেষ্ঠী বললেন, কিন্তু সমস্ত পাপের ভার তো তোমাদের মাথায়। যতো অনাচার, তত পাপ, যত পাপ ততই তার ভার। সেই ভার নেবে নীচ জাতি, শূদ্র জাতি, ভগবানের এই তো বিধান।

হে প্রভু! বুড়ো পরাশরের চোখ দিয়ে জল ঝরছে, হে প্রভু, আমাদের কী অপরাধ আমরা কোন পাপ করেছি?

শ্রেষ্ঠী বললেন, পাপ না করলেও তার ভার তো নিতে হবে, সাগরে আর কখনো পদ্মফুল ফুটবে না, কুয়োয় জল থাকবে না, শিপ্রা নদী, গন্ধবতী নদী শুকিয়ে যাবে, গোধুম, যব ক্ষেতেই মরে যাবে, এতে কী হবে?

প্রভু আমরা বাঁচব কী করে?

বাঁচবে না, পাপীর বিপক্ষে দাঁড়ালে বাঁচবে।

বুড়ো পরাশর চমকে ওঠে। পাপীর বিপক্ষে মানে রাজার বিপক্ষে। রাজার বিপক্ষে কথা বলছে শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত। নাকি শ্রেষ্ঠীর কথা সে বুঝতে পারছে না। ধনী ব্যক্তি, নগরের সবচেয়ে শক্তিমান ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠী কেন রাজার বিপক্ষে কথা বলবেন? তাহলে কি অনাচারী অন্য কেউ? চারদিকে যে কথা রটছে তা কি সত্যি নয়। সত্য তো নয়ই। রাজা কোনো অন্যায় করেন না, রাজা কোনো পাপ করেন না। তাহলে পাপী কে? কার পাপের ভার নিয়ে শূদ্র পল্লীতে হাহাকার উঠেছে? কার পাপে রত্নাকর সাগর শুকিয়ে গেছে? কার পাপে ফসল মরে গেছে জমিতেই?

শ্রেষ্ঠী বললেন, মহাকালের রোষ আরো কঠোর হবে, কী যে হবে! হায় মহাকাল, কার পাপের ভারে কে মরে! নীচ জাতিকে তুমি রক্ষা করো ভগবান।

বুড়ো পরাশরের চোখে জল এসে যায়। সে দ্যাখে তার আশপাশের সকলে ভয়ে কাঁপছে। অন্ধকার হয়ে এল প্রায়। শ্রেষ্ঠী ধীর পায়ে রথের দিকে এগোলেন। তাঁকে অনুসরণ করছে শূদ্রপল্লীর মানুষজন। শ্রেষ্ঠী রথের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, পাপীর বিপক্ষে গেলে ভগবানের রোষ কমবে।

কে পাপী হে প্রভু? জিজ্ঞেস করল বুড়ো পরাশর।

শ্রেষ্ঠী থমকে গেলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গ্রাম বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। মানুষটাকে যেন অভিসন্ধিপরায়ণ মনে হয়। তাঁর মুখে রাজার নাম শুনতে চাইছে। শুনতে চাইছে শ্রেষ্ঠী বলুন পাপীর নাম। তিনি বললেন, পাপী কে তা জান না?

না প্রভু, কার পাপ?

কান পাতো শুনতে পাবে, নগরের ভিতরে যাও শুনতে পাবে। বলতে বলতে শ্রেষ্ঠী রথে উঠলেন। উতঙ্কের প্রহরণ ঘোড়ার পিঠে নেমে আসছে দেখে সভয়ে মানুষগুলো সরে গেল। কশাঘাতে ঘোড়া ডেকে উঠল চিঁহি চিঁহি করে। ছুটল। উতঙ্কের প্রহরণ সাঁই সাঁই করে শূন্যে আছড়ে পড়ল। তার প্রান্তভাগ ছুঁয়ে গেল একজনের বাহুপাশ। আর্তনাদ করে লোকটা মাটিতে বসে পড়ল। রথ চলে যেতে অন্ধকার নেমে এল। আকাশে তারা ফুটল। বুড়ো পরাশর বসে থাকল রত্নাকর সাগর তীরে। তার মনে পড়ছিল ধ্রুবপুত্রের কথা। ধ্রুবপুত্রই না রত্নাকর দস্যুর কথা বলেছিল। রত্নাকর দস্যুর পাপের ভার তার পরিবারের কেউ নেয়নি বলে রত্নাকর বাল্মিকী হয়ে গেল। ধ্রুবপুত্র বলত রত্নাকর যেন তাদেরই পূর্বপুরুষ। কিন্তু এখন কেন মহাজনের পাপ তাদের নিতে হয়? ধ্রুবপুত্র থাকলে জবাব দিতে পারত। পরাশর উত্তর আকাশের ধ্রুবতারার দিকে তাকিয়ে ডাকল যেন নিরুদ্দিষ্ট সেই সুজনকে, হে ধ্রুবপুত্র, তুমি ছাড়া একথার জবাব দেবে কে?

চব্বিশ

রানী ভানুমতি আর্তনাদ করে উঠলেন দরজায় অবন্তীর সেনাপতি কুমার বিক্রমকে দেখে, রাজপুত্র এ কি শুনছি, সব সত্য?

রাজার বৈমাত্রেয় অনুজ ভিতরে প্রবেশ করলেন। অন্তঃপুরের ডাক পেয়ে তিনি এই দ্বিপ্রহরেই চলে

এসেছেন রানীর কাছে। এই ঘরটি রানীর একান্ত নিজস্ব। এই ঘরে তিনি প্রসাধন সারেন। দাসী নিপুণিকা ব্যতীত আর কেউ এই ঘরে ঢোকেনা কখনো। রাজা আসতেন এক সময়। তাঁর ব্যাঘ্রচর্মাসনটি রয়েছে। রাজপুত্র সেই আসনে বসলেন। সামনে মস্ত দর্পণ। দ্বিপ্রহর, কিন্তু ঘরের ভিতরটা আলো আঁধারী। মস্ত প্রদীপ জ্বলছে। এখনো সূর্যদেব পশ্চিম আকাশে নেমে আসেননি। আর একটু বাদে কিছু সময়ের জন্য পশ্চিমের আলো ঢুকবে পশ্চিমের জানলা দিয়ে। সেনাপতি ব্যাঘ্রচর্মে হাত ঘষলেন, বললেন, সব সত্য, আমার অনুচর খবর এনেছে।

দর্পণের দিকে পিঠ রেখে রাজপুত্রের মুখোমুখি বসেছেন রানী ভানুমতি। আজ তাঁর সাজসজ্জা নেই। যেটুকু ছিল, সেটুকুও নষ্ট হয়ে গেছে। কান্নার জলে ধুয়ে গেছে তা। রানী আবার কাঁদলেন, এ তুমি কী বলছ রাজপুত্র?

রাজপুত্র, কুমার বিক্রম বললেন, প্রতিটি বর্ণ সত্য।

কে সেই দেবদাসী?

মন্দিরে রয়েছে, দেখে আসতে পার।

রানী কপালে হাত দিলেন, এখনো রয়েছে, সে মরেনি?

কে মারবে?

কেন তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছ এখনো? রানী উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। কুমার দেখলেন দর্পণেও রানীর অবয়ব কাঁপছে। নাকি দর্পণই কাঁপছে। রানী এমন সুন্দর যে তাঁকে ধরে রেখে অন্তঃপুরের দর্পণও ধন্য হয়। কুমার রানীকে দেখছিলেন। ঘোর নিঃশ্বাসে তাঁর বুক থরথর করছে। নাকের পাটায় ঘামের বিন্দু। দুটি চোখে ঘূর্ণন দেখতে পান অবন্তীর সেনাপতি। রানী ভানুমতি কী সুন্দর। এই সুন্দরকে ছেড়ে রাজা কিনা দেবদাসীকে...। অপমানে নুয়ে গেছে সুন্দরী। কাঁদছে আবার। সেনাপতি তাঁর হাত রাখলেন রানীর হাতে, বললেন, শান্ত হও, তুমি অবন্তীর রানী, সামান্য দেবদাসী তোমার ক্রোধ, ঈর্ষা, শোকের কারণ হতে পারে না।

তাই তো হয়েছে, রাজার কী রুচি! গরগর করে উঠলেন রানী।

সেনাপতি বললেন, আমি প্রথমে বিশ্বাস করিনি, কিন্তু সবই সত্য, আমি নিজেও গিয়েছিলাম পুরোহিতের কাছে।

রানী গর্জন করে উঠলেন, বেশ্য মাগিটাকে শিয়াল কুকুর দিয়ে খাওয়াও, এতবড় স্পর্ধা।

তার কী অপরাধ? সেনাপতি জিজ্ঞেস করলেন।

অপরাধ! অবাক হয়ে রানী তাকিয়েছিলেন রাজপুত্রের দিকে। দীর্ঘদেহী, গৌরবর্ণ সুপুরুষ রাজপুত্র যেন রাজহংসেরই মতো রূপবান। বিন্দু বিন্দু ঘাম রাজপুত্রের গলার কাছে। রাজপুত্রতে কবে থেকে তাঁর মুগ্ধতা তা মনে নেই আর। কবে থেকে রাজা ভর্তৃহরি সরে যেতে লাগলেন, অনুজ বিক্রমের ছায়া তাঁকে ঢেকে দিতে লাগল ভুলে গেছেন রানী। তাঁর দু'চোখে বিহ্বলতা এল।

কুমার বিক্রম বললেন, সে তো সামান্য দেবদাসী, কীট পতঙ্গের মতো, তাকে হত্যা করলেই করা যায়, কিন্তু তার তো সাধ্যই নেই অপরাধ করে।

রানী বললেন, অপরাধী কে?

তুমি জানো অপরাধী কে, ঢাকা যাচ্ছে না পাপ।

পাপ!

হ্যাঁ, মহাকালের দাসীকে তাঁর মন্দিরে ধর্ষণ করা পাপই তো, দেবদাসীকে মেরে ফেললে পাপ যাবে না, আরো চেপে বসবে।

রানী কেঁদে ফেললেন, দাসী নিপুণিকে যখন এসে নগরের কথা বলে মাথা তুলতে পারি না কুমার, রাজার অপমান, রাজার পাপ কি রানীর অপমান, রানীর পাপও নয়?

মাথা নাড়তে লাগলেন সেনাপতি, তা কেন হবে, যার পাপ তার, যার অপমান তার, তোমার জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে, নগরের মানুষের মমতা তোমার দিকে, নগরের মানুষ তোমার জন্য দুঃখ করছে।

অবন্তীর রানী কি উজ্জয়িনীর মানুষের করুণা প্রত্যাশী?

হাসলেন সেনাপতি। বুকের উত্তরীয় নামিয়ে দিলেন। চওড়া বুকে ঘামের বিন্দু। ফুঁ দিতে লাগলেন।

রানী এগিয়ে এলেন। নিজের উত্তরীয় দিয়ে হাওয়া দিতে লাগলেন সেনাপতির বুকে, বললেন, দাসীকে ডাকি, বাতাস্ দেবে।

না থাক, বলছি, নগরে তো ঢি ঢি পড়ে গেছে।

নগরের মানুষ জানল কী করে?

জানিনা, কিন্তু এখন মানুষের মুখে শুধু ওই কথা।

কপালে করাঘাত করলেন রানী, এতে তো আমারও অসম্মান।

তা কেন হবে?

রাজাকে আমি বেঁধে রাখতে পারিনি।

সেনাপতি বললেন, অমন নিম্নরুচির মানুষকে বাঁধা তো কষ্ট।

দু'হাতে কান চাপলেন রানী ভানুমতি। পতি নিন্দা শোনা স্ত্রীধর্ম নয়। কিন্তু কুমার বিক্রম তো থামলেন না, বলছেন, রাজার কি মতিভ্রম হয়েছে, কুকুরও তো ঘুমন্ত কুক্কুরীর সঙ্গে মিলিত হয় না, পুরুষ মানুষ না মনুষ্যেতর প্রাণী আমাদের রাজা? কেউ কখনো শুনেছে ঘুমন্ত নারীতে উপগত হচ্ছে পুরুষ মানুষ।

কথাটা ঠিক যুক্তিসঙ্গত হল না। কিন্তু মনে করলেই তা যুক্তিপূর্ণ তাই চুপ করে আছেন রানী। আর ওতো সত্য যা রটেছে তা ঘটে থাকলে, রাজার আচরণ রাজার মতো হয়নি। রানী বিপন্ন বোধ করছেন। তাঁর রূপ যৌবন সবই যেন ব্যর্থ মনে হচ্ছে। রাজার কাছে হেরে গেছেন ভানুমতি। রাজাকে তিনি অবহেলা করেছেন, শয্যায় ডাকেননি, প্রত্যাখ্যান করেছেন, কিন্তু রাজার প্রত্যাখ্যান যে এত কঠিন হবে তা কী করে বুঝবেন তিনি? কবির মনেও প্রত্যাখ্যান ছিল তা কোনদিনই টের পাননি রানী ভানুমতি। দাসী বলছে, রানীর যৌবনের চেয়ে, রূপের চেয়ে সামান্য দেবদাসীর রূপ, যৌবন নিশ্চিত ভাবে অনেক আকর্ষণীয় হয়েছিল রাজার কাছে, তাই শেষ পর্যন্ত তার কাছেই নিজেকে সমর্পণ করেছেন অবন্তীর অধীশ্বর। আর দেবদাসী ঘুমন্ত ছিল, না রাজার জন্য প্রদীপ জ্বেলে বসেছিল তা বলবে কে? কী হয়েছিল তা জানে সেই মেয়েমানুষ আর রাজা ভর্তৃহরি।

রানী বললেন, সেই দেবদাসীকে আমি দেখতে চাই।

কেন?

কেন তা বলতে পারলেন না রানী ভানুমতি। দেবদাসীকে দেখে কি তিনি যাচাই করবেন কে বেশি রূপবতী, কার যৌবন কতো মধুর, কেন মধুর? তাতে হেরে গেলে কি তার মন শান্ত হবে? নাকি জিতে গেলে? তিনি যে অনেক সুন্দর তা তো বলেই এই রাজপুত্র, রাজার সেনাপতি। তিনি যে নগরের সেরা সুন্দরী তা বলে দাসী নিপুণিকা। সব চেয়ে সুন্দর হয়ে অসুন্দরের কাছে হেরে গেছেন রানী। দাসী তো বলেছে সে একেবারে হতশ্রী। শুধু যৌবনকাল বলেই যতটুকু না হলে নয় ততটুকু রূপ আছে তার নানা অঙ্গে। তবে দেখে কী করবেন? জিতে সুখ নেই, হেরে তো নেইই। অসুন্দরের কাছে সুন্দরের পরাজয় হলে সুন্দরই অসুন্দর হয়ে যায়।

রানী বিড়বিড় করলেন, আমি এখন কী করব কুমার?

কী করবে?

আমাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে রাজা। আমার বুক ভেঙে গেছে, মুখ দেখাব কোথায়, লোকে যে বলছে আমি অক্ষম বলে রাজা অন্য নারীতে গেছেন, পুরুষ মানুষের কি পাপ হয় কুমার?

সেনাপতি চুপ করে থাকলেন। আজন্ম লালন করা সংস্কার তাকে বলতে দিল না পাপীর নারী-পুরুষ ভেদ নেই, পুরুষেরও হয়, যেমন নারীর হয়ে থাকে।

রানী ভানুমতি বললেন, নগরের মানুষ কী বলছে?

রাজ নিন্দায় ছেয়ে গেছে নগর।

বলছে, রানী পারেনি তাই রাজা মন্দিরের দেবদাসীর দিকে চোখ দিয়েছেন, রানীর রূপ কী জন্য যদি রাজাই মুগ্ধ না হন।

কুমার বিক্রম হাত বাড়িয়ে রানীর থুতনি স্পর্শ করলেন, মুখখানি হাতের তালুতে রাখলেন, খুব নরম অথচ চাপা স্বরে বললেন, রানীর রূপ কার জন্য তা রানী নিজেই জানে না, নগরও না।

মুখখানি সরিয়ে নিলেন ভানুমতি। ঝুঁকে পড়লেন রাজা গন্ধর্ব সেনের পুত্রর বুকের কাছে, গরম

নিঃশ্বাস ফেললেন সেনাপতির প্রশস্ত বুকে। ফিসফিস করে বললেন, আমি জানি, কিন্তু আমি এখন কী করব কুমার, তুমি ওই সর্বনাশীকে অন্ধ কূপে নিক্ষেপ করো।

হাসলেন কুমার, তাতে তুমি শান্ত হবে?

হবো।

কিন্তু সে তো নিরপরাধী, ঘুমিয়েছিল মন্দিরের আশ্রয়ে।

রানী বললেন, আমি রাজাকে চিনি, জোর করা তাঁর অভ্যাস নয়, তিনি পারেন না।

সেনাপতি বললেন, তুমি তো আড়াল করতে চাইছো রাজার অপরাধ।

রানী বললেন, আড়াল করছি না, কিন্তু দেবদাসী সত্য বলছে না, ধরা পড়ে গিয়ে রাজার বিপক্ষে অভিযোগ এনেছে, সর্বনাশীর সাহস খুব।

কুমার বিক্রম চুপচাপ। তাঁর মনের ভিতরে দু'রকম সম্ভাবনা খেলা করল। এই অন্তঃপুর খুব সহজ নয়। অন্তঃপুরের মতোই জটিল অন্তঃপুরবাসিনী ভানুমতি। ভানুমতি কি রাজার কলঙ্ক মোচনে সেনাপতির সাহায্য চায়? সেনাপতির আকাঙ্ক্ষা জেনেও ভানুমতি কি অনুমান করতে পারছে না রাজা ভর্তৃহরি কেন কলঙ্কিত হয়ে পড়েছেন অবন্তীবাসীর কাছে। সেনাপতি চাইলে দেবদাসীকে দিয়েই রাজাকে নিষ্কলঙ্ক করে তোলা যায়। কত সময় লাগে তাতে?

রানী বললেন, সেকি আর্তনাদ করেছিল?

কেন?

নিঃশব্দে ধর্ষিতা হলো সর্বনাশী মেয়েমানুষ, কেউ জানল না?

কুমার বিক্রম বললেন, পুরোহিত জেনেছিলেন।

সত্য বলছ?

অসত্য বলব কেন, কিন্তু বৃদ্ধ ভয়ে চুপ করেছিলেন, রাজা অন্ধকারে বললেন তিনিই মহাকাল, কণ্ঠস্বরে চেনা গিয়েছিল তাঁকে।

মাথা নাড়তে লাগলেন রানী, এ কথা বিশ্বাস করা যায়?

সেনাপতি বললেন, আমি তাহলে যাই।

এখনই?

আমাকে অবিশ্বাস করলে আমি থাকি কী করে?

রানী বললেন, মিথ্যা বলছে পুরোহিত আর দেবদাসী, দেবদাসীকে অন্ধকূপে দাও, পুরোহিতকে সাবধান করো।

সে তো রাজা করবেন।

রাজা বিপন্ন হয়েছেন, তুমি তোমার অগ্রজকে চেন না কুমার, সে কখনো কঠোর হতে পারে? যে কঠোরই হতে পারে না, স্ত্রী যাকে শয্যায় না ডাকলে বিষণ্ণ হয়ে সমস্ত রাত জানালার কোণে বসে থাকে, সে কি ধর্ষণ করতে পারে? নগরের মানুষ না চিনুক তুমি তো চেন রাজাকে।

তুমি কী চাও? কুমার চোখ রাখলেন রানীর চোখে।

উজ্জয়িনীর সিংহাসনে যেন দাগ না লাগে।

এ দাগ মুছে যাবে সময়ে, সিংহাসন তো অনাদিকালের, রাজা কত দিনের?

কথাটায় চমকে ওঠেননি রানী, কিন্তু ভয় পেয়েছেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন বাতাস দমচাপা, ঝড় উঠতে পারে। এই অবস্থা ক্রমশ ঘনীভূত, আরো ঘনীভূত হচ্ছে। বুক ধকধক করছিল ভানুমতির। কথা বলতে সাহসই হচ্ছিল না।

কুমার বললেন, উজ্জয়িনীর সিংহাসনে বসে অনাচার চলে না।

তুমি থামো, আমার ভয় করছে।

সিংহাসনের মর্যাদাতেই রাজার মর্যাদা, তিনি যদি তা না রাখতে পারেন!

থামো, মনের কথা মনে রাখো। রানী ফিসফিস করে উঠলেন, তারপর বললেন, উজ্জয়িনীর মানুষ তো রাজাকে চেনে, তুমি ক্লান্ত হবে কুমার।

উঠে দাঁড়ালেন সেনাপতি, তুমি স্পষ্ট করে বলো, কী চাও?

আমি জানি না। কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে মাথা ঠুকলেন রানী, আমি যে কী চাই তা বুঝতে পারছি না, রাজার জন্য খুব মায়া হচ্ছে কুমার, আগে যাঁকে সহ্য করতে পারতাম না, এখন করুণা হচ্ছে তাঁর জন্য, তিনি খুব নরম মানুষ, তিনি কি এমন কাজ করতে পারেন! কিন্তু কথাটা রটে যাচ্ছে যে কেন?

কেন তুমি জান না?

উঠে দাঁড়ালেন রানী, জানি কিন্তু মায়ায় আমার মন ভরে যাচ্ছে যে, তোমরা ক্ষান্ত হও, থামো, এসব বন্ধ করো।

কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দুই থাবায় রানীর কাঁধ ধরলেন অবন্তীর সেনাপতি কুমার বিক্রম, প্রশস্ত বুকের উপর আঁছড়ে ফেললেন রানী ভানুমতিকে, বললেন, করুণা করো, তোমার করুণায় রাজা শুদ্ধ হন, কিন্তু নগরের মানুষ তো বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, মানুষের সুকৃতির কথা না ভুলেও তাকে ঘৃণা করতে তো অসুবিধে নেই।

হায় রাজা! রানী সরে গেলেন। তাঁর কানে যেন বহুদূরের পদশব্দ ভেসে আসছিল। রাজপুত্র হাসলেন, রানীর হাহাকার শুনে বললেন, তোমারও পিছনে ফেরার উপায় নেই, রাজা কি তোমার ভালবাসা পায়?

রানী চুপ করে আছেন। মাথা নিচু হয়ে গেল তাঁর। সেনাপতি তাঁর কাঁধ ছুঁয়েছেন আবার, সেনাপতি বলছেন, তোমার প্রশ্রয়েই না এতদূর এগোন গেছে, নাহলে অবন্তীর রানীর ঘরে কবে এসেছে অন্য পুরুষ?

থামো।

রাজপুত্র চলতে লাগলেন। রানী দুয়ার থেকে বেরিয়ে এলেন বাইরের দীর্ঘ অলিন্দে। সেনাপতি চলে যাচ্ছেন। কী স্বাস্থ্য, কী রূপ! রানী মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতে থাকতে চাপা গলায় ডাকলেন, রাজপুত্র।

ঘুরে দাঁড়ালেন কুমার বিক্রম। রাজহংসের মতো দর্পিত ভঙ্গিমায় মাথা তুলে তাকালেন, টানা চোখ দুটি চকচক করছে চোখেরই আলোয়। ফিরে আসতে লাগলেন তিনি রাজহংসীর মতো রূপবতী কনখল পুত্রীর কাছে। শরীর ঘামছে। শরীর দপদপ করছে নিহিত আগুনে।

পঁচিশ

চৈত্র যায়। সামনে পূর্ণিমা। তারপর কদিন বাদেই বৈশাখের শুরু। পূর্ব দিগন্তে বিশাখা নক্ষত্র উদয়ের রাত এসে গেল। চিত্রা নক্ষত্র আছেন এই চৈত্রে। উত্তর আকাশে সপ্তঋষিরা ধ্যানমগ্ন, অগস্ত্য নক্ষত্র আছেন দক্ষিণে। ওই দক্ষিণ কতদূরে! অগস্ত্য নক্ষত্র উদয়ের দেশে এক নদী আছে, নদীর নাম কাবেরী। আছে মলয় পর্বত, চন্দনবন—সবই ধ্রুবপুত্রের কাছে শোনা। এখন মনে পড়ছে গন্ধবতীর।

মা মেয়ে বসে আছে দাওয়ায়। সন্ধ্যা নামল ধীরে। চারদিক খুব চুপচাপ। মা মেয়ে আকাশ দেখছিল। চিত্রা, স্বাতী, উত্তরফাল্গুনী, পূর্বফাল্গুনী, লুব্ধক, রোহিণী, আর্দ্রা...। এইসব তারারা কেউ কেউ নিরুদ্দেশে গিয়েছিল, যেমন এখনো নিরুদ্দেশে আছে ধ্রুবপুত্র, নিরুদ্দেশে আছে বিশাখা। ফিরে আসবে নিরুদ্দিষ্ট তারারা, যেমন ফিরবে বিশাখা। ধ্রুবপুত্রেরও তো ফেরার কথা। চৈত্র আকাশে যেই সব তারাদের রেখে গিয়েছিল ধ্রুবপুত্র, প্রতি চৈত্রেই তারা ফিরবে, সে কি ফিরবে না? পূর্ণিমার রাতেও না? মদনোৎসবের দিনেও না? মনে পড়ে যায়, সেই পূর্ণিমার রাতে গম্ভীরা নদী, বেত বন, চরাচর জ্যোৎস্নায় ঢেকে গিয়েছিল নদী বেয়ে চলেছিল আলোরই স্রোত, শুধুই আলো। আলোও তাহলে আড়াল করতে পারে? ধ্রুবপুত্রকে যে করল। আলোয় হারিয়ে গেল যে সেই মহাজ্ঞানী, বিপথগামী।

রেবা জিজ্ঞেস করল, কবে আসবে সে?

কেউ জানে না মা।

তোকে বলে যায়নি?

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে গন্ধবতী। মা রেবা তখন দেখতে পায় গন্ধবতীর মনের ছবি। রেবা হাসল বলল, দশার্ণ দেশের সেই জ্যোতির্বিদের কথা বলছি।

গন্ধবতী বলল, আমাকে তো বলে যায়নি মা।

সে কিন্তু পারবে।

গন্ধবতী চুপ করে থাকে। মনে হয় পারবে হয়ত তাম্রধ্বজ। সত্যিই তো অনেকদিন হলো সে আসেনি।

সে কি চলে গেল বিদিশার পথে? বৃষ্টিহীনতা মানুষকে অস্থির করেছে। এই তো ঠাকুরদা বলছিলেন, কোন দেশ থেকে যেন একজন মানুষ সাতদিন, সাতরাত হেঁটে উজ্জয়িনীতে এসেছে। তাদের দেশেও বৃষ্টি নেই। তারা ভেবেছিল, এদিকে হয়ত অন্ন আছে। অনাবৃষ্টি যে অন্নহীন করেছে তাদের। ঠাকুরদা বলছিলেন, এমন হলে মানুষ দিশাহারা হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। শুধু যায় আর আসে। অবন্তী দেশের মানুষ ওই একই আকাঙ্ক্ষায় চলে যায় দশার্ণের দিকে। যাওয়া আসা চলছেই। তাম্রধ্বজ কিসেই বিভ্রমে পড়ে চলে গেল নিজের দেশে? দশার্ণ দেশ থেকে কি খবর এল কোনো? না হলে কেন আসছে না সে?

অন্ধকারে ভেসে আসছিল কণ্ঠস্বর। মা মেয়ে দু'জনেই শুনল। শুনে চকিতা হরিণীর মতো সিধে হয়ে বসল। তাহলে এল দশার্ণ দেশীয় সেই জ্যোতির্বিদ? গণনা সম্পূর্ণ হয়েছে কি? হওয়ার তো কথা নয়। কেননা সে তো সব শোনেনি এখানো। গন্ধবতী সেই পূর্ণিমা রাতের কথা তো বলতে পারেনি তাম্রধ্বজকে। বলবে বলে পথ চেয়ে বসে আছে। সমস্ত কথা শোনার পর তাম্রধ্বজ হিসাব সম্পূর্ণ করবে। কোন দিশায় আছে ধ্রুবপুত্র, কোন দিশায় কার্তিককুমার।

রেবা বলল, কেউ আসছে।

একজন না, দু'জন?

একজন তো তোর ঠাকুর্দা, পিতা আসছেন, কিন্তু আর একটি কণ্ঠস্বর অন্য কারোর।

আর একজন কে?

রেবা বলল, বোধহয় সেই তাম্রধ্বজ, সে তো সন্ধ্যাতেই আসে।

গন্ধবতী চঞ্চল হয়ে ওঠে, মা অনেকদূর থেকে আসছেন উনি।

জানি।

ক্ষুধার্ত হতো পারেন, আশ্রমে স্বপাকে খান। গন্ধবতী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

হ্যাঁ, আমি দুধ ফোটাব তো? রেবা মৃদুস্বরে বলল।

গন্ধবতী মাথা নামায়। তার চঞ্চলতার জন্য আচমকা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। সে নিজে শিহরিত হয়ে উঠল কেন? ওই মানুষ ধ্রুবপুত্রের সংবাদ দেবে, তাই! ধ্রুবপুত্রের কথাগুলি অবিকল উচ্চারণ করবে তাই! ওই মানুষকে তো এখন শোনাতে হবে চৈত্র পূর্ণিমার গভীর রাতের কথা, সেই মহানিষ্ক্রমণের কথা। গন্ধবতীর মনে হয় তাম্রধ্বজ সব জানে। সব। সেই রাত, গম্ভীরা নদী, আত্মহননের পথে যাত্রা করা ধ্রুবপুত্রের কথা জানে তাম্রধ্বজ। তারপর? নদী থেকে উঠে চাঁদের আলোয় যেন ভেসে গেল মানুষটা। তাও জানে। কী করে যে জানে?

গন্ধবতী বলল, জলচৌকি দেব উঠোনে?

রেবা চুপচাপ। গন্ধবতী উৎকর্ণ হলো। সে দেখল মাও যেন কণ্ঠস্বর আন্দাজ করতে চাইছে। যে অচেনা কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে তা তো তাম্রধ্বজের নয়। তাহলে কে? কেঁপে উঠল গন্ধবতী। চেনা যাচ্ছে, চিনতে পেরেছে সে। মা দীপ জ্বালতে বলল। গন্ধবতী বলল, মা এ যে সেই দুর্বৃত্ত।

কে? আর্তনাদ করে ওঠে রেবা।

তখন অন্ধকারে দ্রুত পায়ে আঙিনায় চলে এসেছে শিবনাথ। এই প্রথম তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, না, না, আপনি চলে যান, চলে যাও তুমি উদ্ধব, আমার পৌত্রী বরং অনূঢ়াই থেকে যাবে।

গন্ধবতী আর রেবা দাওয়ার দেওয়ালে পিঠ দিয়ে অন্ধকারে সতর্ক নিঃশ্বাস ফেলছে। তারা লুকিয়েই পড়েছে। আঙিনায় উদ্ধবনারায়ণ দাঁড়িয়ে। তার সামনে নতজানু হয়েছে বৃদ্ধ শিবনাথ।

উদ্ধনারায়ণ বলল, আপনি অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন মশায়, এই উদ্ধবনারায়ণ যে কণ্ঠহারটি এনেছে, এটি মহালতার তুল্য প্রায়, এই কণ্ঠহার কখনো ছুঁয়েও দেখার সৌভাগ্য হবে না আপনার পৌত্রীর।

থাক, আপনি ফিরে যান, তাকে আপনার হাতে দিতে পারব না।

উদ্ধব গর্জন করে ওঠে অন্ধকারে, পারতেই হবে, দেখুন এই কণ্ঠহার রানীর গলায় শোভা পেতে পারে, নগরের সেরা গণিকার গলায় এটি মানায়, আমি এটি সংগ্রহ করেছি গন্ধবতীর জন্য, তার কি কোনো দাম নেই? উদ্ধবনারায়ণ যা বলে তাই করে, আপনার সাধ্যকী আমাকে আটকাবেন।

শিবনাথ হাঁটু ভেঙে উঠোনের ধুলোয় নিচু হয়েছে। চৈত্রের বাতাস আরম্ভ হলো। উদ্ধবনারায়ণ

পায়চারি করছে শিবনাথের সামনে। অন্ধকারে তার ধড়াচুড়ো ঝলমল করছে। সে ইতিউতি তাকাচ্ছে, দেখতে চাইছে কোথায় আছে গন্ধবতী। ঈষৎ পান করেছে উদ্ধবনারায়ণ। আগের বার গন্ধবতী পালিয়ে বেঁচেছিল, উদ্ধবও ছেড়ে দিয়েছিল ভীতা হরিণীকে। ব্যাধেরও ভুল হয় কখনো সখনো, কিন্তু সেই মায়াতেই সুযোগ নষ্ট। আজ আর কোনো ক্ষমা নেই, মায়া নেই। কথা নিয়ে ফিরবে সে। বৈশাখেই গন্ধবতীর পানি গ্রহণ করবে। মনোমত একটি যুবতীকে যদি অধিকার না করতে পারল উদ্ধব, তাহলে সে কেমন রাজ-সত্রি। রাজ সভার মানুষ যদি সামান্য গ্রামবাসীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে সে প্রত্যাখ্যান তো রাজাকেই স্পর্শ করে। এই যে উদ্ধব দাবি করছে সৈনিকের পুত্রীকে, কোন জোরে? না, রাজার জোরে। সে রাজসভার মানুষ মানে রাজ-আশ্রিত, তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না নিরুদ্দিষ্ট সৈনিক পরিবারের কেউ।

উদ্ধব বলল, দেখুন মশায়, এ আপনাদের সৌভাগ্য যে এই উদ্ধব আপনাদের সহায় হয়ে উঠতে চাইছে, হেলায় সুযোগ হারাবেন না।

গন্ধবতী, রেবা দু'জনেই শুনতে পাচ্ছিল উদ্ধবের কণ্ঠস্বর। গন্ধবতী তেতে উঠছিল। তার মনে হচ্ছিল এখানেই চিৎকার করে প্রতিবাদ জানায়। ইস। বুড়ো ঠাকুর্দা কীভাবে হাতজোড় করে আছে দুর্বৃত্তের সামনে। অন্ধকারে ও যেন ঠাকুর্দার অসহায় মুখ দেখতে পাচ্ছে গন্ধবতী।

শিবনাথ বলল, তুমি সীমা ছাড়াচ্ছো উদ্ধব, রাজসভায় কাজ পাওয়ার আগে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরতে, আমিও তোমাকে রাজার কাছে যেতে বলেছিলাম, তার ফল যে এই হবে তা কে জানত।

উদ্ধব মাটিতে পদাঘাত করে ধুলো উড়োয়, বলল, ওসব পুরোন কথা তুলে লাভ নেই, তোমার পৌত্রীকে আমার চাই, তার জন্য আমি বারবার আসছি, যদি এ ব্যাপারে মত না দাও, বলপ্রয়োগ করব, তুলে নিয়ে যাব, অপহরণ করে বলপূর্বক বিবাহ করব রাক্ষস মতে, আজই তুলে নিয়ে যাব, কেউ আমাকে নিবৃত্ত করতে পারবে না, অবন্তীর রাজা কিনা মহাকালের দেবদাসীকে গোপনে ভোগ করে আসে, তখন সত্রি তো গন্ধবতীকে অধিকার করবেই, কে আটকাবে দেখি, এ হলো রাজার আদেশ লুটেপুটে খাও।

হা ঈশ্বর! হে মহাকাল! আর্তনাদ করে ওঠে শিবনাথ, তারপর বলে, এই মেয়ের পিতা যুদ্ধে নিরুদ্দেশ, গন্ধবতী সৈনিকের পুত্রী, অবন্তী দেশের জন্য, মাতৃভুমির জন্য ত্যাগ করেছে আমার পরিবার।

কথা শেষ করতে দিল না উদ্ধব, হা হা করে হাসতে লাগল, দুর বুড়ো, এবার রাজা মশায়কে বলব গণশ্রাদ্ধ করতে, যারা ফেরেনি সবাই পরলোকে গেছে ধরে নিয়ে পিন্ডদান করা হবে, যা বলছি কর বুড়া, ডাক গন্ধবতীকে, সেদিন ছেড়ে দিয়েছি, আজ ছাড়ব না, আমার কাছে অস্ত্র আছে বাধা দিতে এলে বিপদ হবে, এই গন্ধবতী এই যে সুকন্যা গন্ধবতী, তোমার জন্য কে এসেছে দ্যাখো, এসো গন্ধবতী তোমায় নিতে এসেছি আমি...।

উদ্ধব জড়ানো গলায় ডাকতে থাকে গন্ধবতীকে। উদ্ধব যে সুরা পান করে এসেছে তা স্পষ্ট ধরা যাচ্ছে। তার নেশা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। বিভ্রম প্রবল হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। উদ্ধব টলতে থাকে। টলতে টলতে বৃদ্ধ শিবনাথকে ঘিরে পাক খেতে থাকে। শিবনাথ দু'হাত কানে দিয়েছে। আকাশের দিকে চেয়ে মনে মনে বলছে, হে মহাকাল, আমাকে বধির করে দাও, হে ভগবান, এ কোন যুগ এল, শৃগালের শাসন শুরু হয়ে গেল নাকি?

উদ্ধব হাততালি দিতে থাকে, গন্ধবতী, গন্ধবতী তোর সেই নাগরের শ্রাদ্ধও হবে এবার, সে কিনা দেবদত্তার প্রেমিক হয়ে গিয়েছিল, বামন হয়ে চন্দ্র স্পর্শ। সেই দুর্বৃত্ত নগরে ফিরলেই কোমরে রশি বেঁধে কারাগারে ঢুকিয়ে দেব, পদাঘাতে তার প্রাণহরণ করবে উদ্ধব কী সাহস, সে কিনা গন্ধবতীর দিকেও হাত বাড়ায়, জানে না গন্ধবতী উদ্ধবের? কোথায় সেই ধ্রুবপুত্তুর, তার একদিন না হয় আমার একদিন, আজ আমি তাকে বধ করব, শিয়াল শকুন দিয়ে খাওয়াবো ওর দেহ, মহাভোজ হবে—আয়, আয়, দুটো মড়া আছে পিন্ড খাবি, আয় আয় রাজার আদেশ কে খন্ডন করবে? আয় গন্ধবতী আয়।

আর পারলে না রেবা। অনেকক্ষণ সে মেয়ের মুখ চেপে কাঠ কাঠ হয়ে অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল। চিৎকার করে সে উঠোনে লাফ দিয়ে পড়ে, উন্মাদিনীর মতো গর্জন করে ওঠে, থামবে, তুমি চুপ করো।

তুমি কে গন্ধবতী? উদ্ধব নিমীলিত চোখে অন্ধকারে তাকায়।

না, আমি তার মা।

হি হি করে হাসে উদ্ধব, সৈনিকের বিধবা, বিধবাকেও নগরে নিয়ে যাব আমি, অন্ন বস্ত্র, দিয়ে দুটো

মেয়েমানুষ পুষব, অয়ি, অ বিধবে, তোমার পুত্রী কোথায় ডাক তাকে, শ্রীমুখ দর্শন করে যাই, এই মহালতা তার গলায় নিজে পরিয়ে দেব আমি, পায়ের নুপুরও আছে, সোনার নুপুর, ডাকো গন্ধবতীকে, এসে দেখুক মহামূল্যবান কোন গহনা এনেছে তার স্বামী উদ্ধবনারায়ণ।

রেবা টের পায় রাজ কর্মচারী উদ্ধবনারায়ণ ক্রমশ অধিকার করে নিচ্ছে এই উঠোন, বসতবাটি। কী একটা বিশ্রী গন্ধ অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ছে। নাকে এল তার। সমস্তদিন তো গন্ধটা ছিল না। এই এখন পাওয়া গেল। সন্ধ্যার দখিনা বাতাস বোধহয় বয়ে আনছে। কোনো প্রাণী মরেছে ধারে কাছে, দূরেও হতে পারে। উদ্ধবের প্রলাপে সে ভয় পেল। অন্ধকারে বারবার 'বিধবা' সম্বোধনে ভয় গভীর হলো। সে গুটিয়ে গেল। উদ্ধব অন্ধকারে কেমন হাত পা ছুঁড়ছে। এখন কী হবে? যে পুরুষ মানুষের আশ্রয়ে তারা আছে, তিনি যে ক্রমশ অশক্ত হয়ে পড়ছেন তা বোঝা গেল। নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের জন্য শোক, অনাবৃষ্টি ফসলহীনতা, প্রিয় সখা ধ্রুবের পুত্রের অবন্তী দেশ থেকে বিদায় মানুষটির সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছে। মাথা নামিয়ে উবু হয়ে বসে আছে গন্ধবতীর ঠাকুরদা। কী করবে এবার রেবা?

উদ্ধব বলল, তোমারও নাগর জুটিয়ে দেব বিধবে, তুমি একা থাকবে না, কাঁচা বয়স, এই বুড়ো পড়ে থাক এখানে, চলো তোমাদের দু'জনকে নিয়ে চলে যাই, একটা না একটা না, দুটা—হা হা হা, অবন্তীর রাজার কাছে মাকে সমর্পণ করব, মেয়ে আমার, রাজাদেশ সেইরকম।

তখন গন্ধবতী নিঃশব্দ পায়ে নামছিল দাওয়া থেকে। সে বুঝতে পারছিল নেশা যেভাবে চড়ে যাচ্ছে, এরপর উদ্ধবকে নিবৃত্ত করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। রাজকর্মচারীর জোর তো আছেই। রাজকর্মচারী বলেই কেউ তাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে ওর বিপক্ষে সাক্ষী হবে না। সে আস্তে আস্তে মায়ের পাশে দাঁড়ায়। মা আঁচলে মুখ চেপে কাঁদছিল। গন্ধবতী বলল, মা কেঁদোনা, প্রলাপ কি সত্য হয়?

উদ্ধব নেশার ভিতরেও আশা হারিয়েছিল গন্ধবতীর। ভাবছিল গন্ধবতী অন্ধকারে কোথাও লুকিয়েছে। তাই তো হয়ে থাকে। নিজেকে বাঁচাতে সে নিশ্চিত বনের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে, অথবা কোনো প্রতিবেশীর গৃহে আশ্রয় নিয়েছে। গন্ধবতী যে তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াবে তা কে ভেবেছিল? গন্ধবতী বলল, কী এনেছ দিয়ে যাও।

তুমি নেবে?

হ্যাঁ নেব, দিয়ে চলে যাও, পরে ঠাকুরদা সব ব্যবস্থা করবেন।

উদ্ধব হতবাক। এত সহজে যে কার্যসিদ্ধি হবে কে ভেবেছিল? সে হাতের কণ্ঠহারটি গন্ধবতীর হাতে ফেলে দিল। পেটিকাটি এগিয়ে দিল, পেটিকায় নুপুর আছে। দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো উদ্ধব। এবার আর গন্ধবতীকে অধিকার করতে কোনো অসুবিধে হবে না।

গন্ধবতী বলল, এবার বিদায় হও।

উদ্ধব সরে গেল আঙিনার ও প্রান্তে। সে ভাবছিল আর কী? এবার যে কোনো দিন না হয় এসে বলবে, গন্ধর্বমতে বিবাহ হোক। সে রাজার সত্রি। রাজার মতোই অবন্তী দেশের সব তার অধিকারে, নখদর্পণে। উদ্ধব অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

ছাব্বিশ

উজ্জয়িনীতে সুভগ দত্তর গৃহ খুঁজে বের করতে কোনো অসুবিধেই হয়নি শিবনাথের। কে না চেনে শ্রেষ্ঠীকে? শ্রেষ্ঠীর ভৃত্য, রথের সারথি উতঙ্ক কে? কী ভয়ানক তার দৃষ্টি! কী গতিময় তার রথচক্র! কতদূর থেকে শোনা যায় চক্রের ঘর্ঘর শব্দ, অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, প্রহরণের সাঁই সাঁই। যখন রথাশ্বরা নিজ ছন্দে ছুটে চলে, উতঙ্ক বাতাসে প্রহরণ ঘোরায় বনবন। আকাশচেরা বিদ্যুৎরেখার মতো তীব্র সেই প্রহরণের গতি। মনে হয় উতঙ্কর কোনো গোপন রোষ আছে, সেই রোষে অদৃশ্য কাউকে কশাঘাতে রক্তাক্ত করতে চায়। উতঙ্কের তো ক্রোধ আছেই। এ নিয়ে কথা আছে কত!

শিবনাথ যখন শ্রেষ্ঠীর গৃহতোরণে পৌঁছল, সূর্য গনগনে হয়ে উঠেছে। শিবনাথের গায়ের পট্টবস্ত্রের আড়ালে রেশম পেটিকার ভিতরে সোনার গহনা। সমস্ত রাত সে ঘুমোতে পারেনি। সে কেন, রেবা, গন্ধবতীও ঘুমোয়নি। তাদের চাপা কণ্ঠস্বর শুনেছে শিবনাথ সব প্রহরেই। দূরে সারমেয়র ক্রন্দন শুনেছে, গর্জন শুনছে অন্ধকারে। আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে তখন; এই বুঝি শোনা যায় টাঙ্গন অশ্বের ক্ষুরের শব্দ। উদ্ধবনারায়ণ এল বুঝি আবার। অবন্তী দেশের যা অবস্থা, অপহরণ করে নিয়ে যায় যদি, কী করবে

বৃদ্ধ? তার ওই ভয় হচ্ছে। এরপর গন্ধবতীকে জোর করে তুলে নিয়ে যাবে দুর্বৃত্ত, রাক্ষস-বিবাহ তো অসিদ্ধ নয়। উদ্ধবের কামনা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। আরো দুর্বিনীতি হয়ে উঠছে ওই যুবক রাজকর্মচারী। তা শুধু উদ্ধব কেন, সমস্ত রাজকর্মচারীর লোভ আর সাহস দুই-ই বাড়ছে। রাজার যেসব খবর বাতাসে উড়ছে, তাতে রাজ-সিংহাসনেই কলঙ্ক লেগেছে বোধহয়। হায়! এসব যদি জানত ধ্রুবপুত্র?

শ্রেষ্ঠীগৃহের তোরণে উতঙ্কের সঙ্গেই দেখা হয়েছে শিবনাথের। হাড় হিম করা দৃষ্টি। মানুষটি তার দিকে চেয়েই আছে। শিবনাথ মাথা নামিয়ে বলল, শ্রেষ্ঠীর কাছে এসেছি, আমি বিপন্ন মানুষ।

লোকটি তার কথা বুঝল কি না ধরা গেল না। নিঃস্পন্দ দৃষ্টি দিয়ে বিদ্ধ করছে। শিবনাথ হাসতে চেষ্টা করল। লোকটি হাসে না। শিবনাথের ভয় ভয় করে। এভাবে চেয়ে আছে কেন? কী নিঃঝুম শ্রেষ্ঠী গৃহ। তাহলে তিনি কি নেই? না থাকলে কোথায় কার কাছে যাবে শিবনাথ? এই অলঙ্কার শ্রেষ্ঠীর হাতে তুলে দিয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করবে ঠিক করে এসেছে। এ ছাড়া উপায় নেই। শ্রেষ্ঠীই বাঁচাতে পারেন গন্ধবতীকে। শ্রেষ্ঠীই নিবৃত্ত করতে পারেন উদ্ধবনারায়ণকে। অভিজ্ঞতা বলে, রাজকর্মচারীর বিপক্ষে রাজসভায় গিয়ে দাঁড়ালে কোনো লাভ হয় না। নিজ অনুগত কর্মচারীর স্বার্থই দেখেন রাজা কিংবা রাজকর্মচারী। রাজশক্তির কী ক্ষমতা তা উদ্ধবকে দেখেই বুঝতে পেরেছে শিবনাথ। ছিল তো পথের ভিখারি, তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করত রাজসভায় প্রবেশের আগে। তার এখন...। এখন সুভগ দত্তই আশ্রয় দিতে পারেন বিপন্ন এই পরিবারকে। রাজশক্তির বিপরীতে দাঁড়াতে পারে ধনসম্পত্তিতে বলীয়ান মানুষ। উন্মুক্ত তরবারী, বর্শাফলক কিংবা ভল্লকে শান্ত করতে পারে হিরে, মানিক, সোনা, রূপা।

শিবনাথ বলল, শ্রেষ্ঠী আমাকে জানেন।

লোকটি যেন পাথর। চোখের মণিতে কাঁপনও নেই। শিবনাথ চুপ করে তার প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু কোনো জবাবই পায় না।

শিবনাথ জানে না উতঙ্ক যদি জবাব না দেয় তবে ধরে নিতে হবে প্রস্তাবে তার সায় নেই। টের পাচ্ছিল বৃদ্ধ, রাজকর্মচারীর চেয়েও এ আরো ভয়ানক। আবার মাথা নোয়াল সে, আমাদের জীবন বিপন্ন, শ্রেষ্ঠী ছাড়া কে বাঁচাবে?

উতঙ্ক স্থির। তার মাথার উপরে একটি আমগাছ ছায়া ফেলেছিল। অনেকটা ছায়ার ভিতরে সে একা দাঁড়িয়েছিল। শিবনাথ রোদে পুড়ছে। তার ইচ্ছে হচ্ছিল ওই ছায়ার ভিতরে দাঁড়ায়। কিন্তু সাহস হচ্ছিল না। উতঙ্ক নড়ছিল না, তাই শিবনাথও নড়তে পারছিল না। মাথা তুলে শিবনাথ গাছটিকে দেখল। আম মুকুলের চিহ্ন নেই। এ তো নবীন বৃক্ষ। এ বছরে নিষ্ফলা? নাকি বন্ধ্যা হয়ে গেল? এতক্ষণে মনে পড়ল তার। এই যে এতটা পথ হেঁটে এল, বাতাসে কোনো সুগন্ধ নেই। গতবছরও তো এমন বসন্ত ছিল না। এই অনাবৃষ্টির ভিতরেও। এবার বসন্তে কি ফুলই ফোটেনি? আম, নিম কোথাও ফুল আসেনি। কই পথে তো মঞ্জরী চোখে পড়েনি। বকুলফুল! এমন কি হয়েছে এ জীবনে? গন্ধহীন বসন্ত, ভ্রমরহীন বসন্ত এসেছে এই অবন্তী দেশে, উজ্জয়িনী নগরে? হায়! এখন আকাশের শকুনই ভ্রমর হয়েছে। শবদেহেই যার আসক্তি সে কিনা মধুলোভে ফুলে ফুলে ডানা ঝাপটে বেড়াচ্ছে। শিবনাথ আবার বলল, আমি শ্রেষ্ঠীর দর্শন প্রার্থী, বৃদ্ধ মানুষ।

উতঙ্ক নিশ্চল। তার উন্মুক্ত বক্ষদেশ রোমহীন, মসৃণ, ধবল বর্ণের। মাথার চুল ঈষৎ লালচে। দেহটি পেশী বহুল। শ্বাস-প্রশ্বাসে সর্বাঙ্গ কাঁপছে। দুই চোখ অতি ক্ষুদ্র কীটের মতো মুখমন্ডলে ছুঁয়ে আছে। শিবনাথ বুঝতে পারছিল শ্রেষ্ঠীর এই উত্তরপূর্বদেশীয় দাসটি তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেবে না। দাস হলেও উতঙ্ক হলো শ্রেষ্ঠীর দেহরক্ষী। শিবনাথ শুনেছে এই দাসটি অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির। ধ্রুবপুত্রই বলেছিল তাকে। কারণে অকারণে মানুষের উপর অত্যাচার করে সুখ পায়। শ্রেষ্ঠী তার জন্য তাকে তিরস্কারও করেন না। তাঁর প্রশ্রয়েই উতঙ্ক এমন। আর শ্রেষ্ঠীর যদি প্রশ্রয় থাকে, তবে সে প্রশ্রয় তো রাজশক্তির অনুমোদনও পায়। শিবনাথের ভয় করতে লাগল। বিপন্নতা বাড়ল যেন। এতদূর এসে ফিরে যেতে হবে? শ্রেষ্ঠী ছাড়া কার কাছে যাবে? শ্রেষ্ঠীর হাতে অলঙ্কারগুলো তুলে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতো সে। এই অলঙ্কার হাতে রাখা মানে উদ্ধবনারায়ণের দাবী মেনে নেওয়া। ওই কামুক পাষন্ডের হাতে পৌত্রীটিকে সমর্পণ করা। এক পা এগিয়ে ছায়ার সীমানায় দাঁড়িয়ে মাথা নত করে সে ডেকে উঠল, হে উতঙ্ক, হে প্রভু উতঙ্ক, আমার পুত্র দশপুরার যুদ্ধে হারিয়ে গেছে, আমি ভীষণ বিপদে পড়ে শ্রেষ্ঠীর

শরণাপন্ন হয়েছি।

উতঙ্কের ভিতরে স্পন্দন এল যেন। অবাক হয়ে বৃদ্ধর দিকে তাকিয়ে আছে সে। শিবনাথ হাঁটুমুড়ে বসে পড়েছে তার সামনে। পট্টবস্ত্রের আড়াল থেকে হাতটি সরাচ্ছে না সে। রেশম পেটিকার জন্য ভয়ে আছে। শিবনাথ মাথা নত করল রৌদ্রের ভিতরে। যেন সে ধুলায় মিশে যাবে এমনই ভাব। আবার ডেকে উঠল, হে প্রভু, হে উতঙ্ক, শ্রেষ্ঠী আমাকে বাঁচাতে পারেন দুর্বৃত্তের রোষ থেকে।

মাথা তুলল শিবনাথ। তাকে ডাকছিল উতঙ্ক। ইঙ্গিত করল ভিতরে যেতে । উঠে চোখের কোল কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুছতে মুছতে হাঁটতে লাগল শিবনাথ। তৃণের মতো হয়ে গেছে সে। ধুলো হয়ে গেছে। ধুঁকতে ধুঁকতে সে ভিতরে প্রবেশ করল। তোরণের পর অনেকখানি জমি জুড়ে প্রাঙ্গণ। দু'পাশে বাগান। বাগানে ফুল নেই। কেমন হতশ্রী চেহারা। হাঁটতে হাঁটতে শ্রেষ্ঠীর প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল সে। মানুষজন নেই কেন? চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল সে।

শিবনাথের সমস্ত বোধই ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দিয়েছে উতঙ্ক। সে দুই হাতে রেশম পেটিকা ধরে প্রায় কেঁদে উঠল, হে প্রভু, আমি বিপন্ন, আমাকে রক্ষা করুন, আমি আসছি গম্ভীরা থেকে, ধ্রুবদাস ছিল আমার বয়স্য, আমি শিবনাথ, প্রভু কি আছেন, হে শ্রেষ্ঠী।

ভিতর থেকে একটি যুবতী দাসী বেরিয়ে এল শিবনাথের উঁচু গলার কান্নায়। সে অবাক হয়ে দেখল ক্রন্দনরত বৃদ্ধকে। হায় হায়, বুড়ো মানুষটা কাঁদে কেন? একী কান্ড! কান্নার কী হলো? উতঙ্ক কোথায়? প্রহরীরা কোথায়? আজ তো প্রভুর বিশ্রামের দিন। আজ প্রভু দীনহীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না। আজ তো অন্নও দেওয়া হবে না দীনজনকে। তবে কেন উতঙ্ক একে প্রবেশ করতে দিল?

যুবতী দাসীর চিৎকারে ভিতর থেকে এক বৃদ্ধা দাসীও বেরিয়ে এল। সেও অবাক। এ কে? কোথা থেকে এল লোকটা? কোন গাঁয়ে ঘর, কাঁদো কেন, প্রভু আছেন, কিন্তু প্রভু তো আজ দান করবেন না। আজ তো দরিদ্র দীনজনের সেবার দিন না। আর প্রভু ওসব করবেন না তা ঠিকই করে ফেলেছেন। ওসব রাজার কাজ। রাজসভায় যাও বাবা। রাজার কাছে যাও। শ্রেষ্ঠী এখন বিশ্রামে আছেন।

শিবনাথ বলল, আমি বিপন্ন, প্রভু আমাকে বাঁচাবেন।

দুই দাসী পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। তারপর তাদের খেয়াল হয় শিবনাথের হাতে ঝোলান রেশম পেটিকাটিকে। শিবনাথ আত্মবিস্মৃত হয়ে কান্নার সময় পেটিকাটি পট্টবস্ত্রের আড়াল থেকে বের করে এনেছে। যুবতী দাসী বলে ওঠে, ওতে কী আছে?

ভয় পেয়ে শিবনাথ পেটিকা আবার পট্টবস্ত্রের আড়ালে লুকোতে যায়। তা দেখে দুই দাসীর কৌতূহল বাড়ে। তারা যেন অলঙ্কারের অস্তিত্বই টের পেয়ে গেছে। যুবতী নেমে আসে প্রাঙ্গণে, কী আছে পেটিকায়? চেনা লাগে যেন পেটিকাটি।

শিবনাথ আবার উচ্চ স্বরে ডেকে ওঠে শ্রেষ্ঠীকে, হে প্রভু সুভগ দত্ত...।

যুবতী ঝপ করে শিবনাথের মুখ চেপে ধরেছে, কী আছে বলো, আরে প্রভু আছেন অন্তঃপুরে, তোমার কণ্ঠস্বর অতদূর পৌঁছবে না, তুমি কে গা, এস ভিতরে এস। বলতে বলতে যুবতী শিবনাথের হাতের রেশম পেটিকা চেপে ধরেছে পট্টবস্ত্রের উপর থেকে, সোনার গয়না আছে নাকি, এ পেটিকা তো আমার চেনা, তোমার মতো মানুষের হাতে গেল কী করে?

শিবনাথ আরো ভয় পেয়ে সরে যেতে চায়। কিন্তু পারে না। যুবতীর দৈহিক শক্তি অনেক বেশি। আর যুবতী নির্লজ্জও। তাকে জাপটে ধরেছে, চলো, ভিতরে চলো।

শিবনাথ চিৎকার করতে চায়। মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করতে থাকে। না পেরে এক ঝটকা মেরে সরে যায়। ডেকে ওঠে, হে শ্রেষ্ঠী, হে উতঙ্ক, আমাকে প্রভুর কাছে নিয়ে চলো, প্রভু সুভগ দত্ত...।

শিবনাথের চিৎকারে যুবতী দাসী ভয় পেয়ে সরে যায়। বৃদ্ধা ঢুকে গেছে ভিতরে। কিন্তু ভিতর থেকে আরো কয়েকজন দাস দাসী বেরিয়ে এসেছে। তোরণ থেকে উতঙ্ক নিঃশব্দে হেঁটে আসছে। শিবনাথ মাটিতে বসে পড়ে হাঁপাচ্ছে। উতঙ্ক এগিয়ে এসে তাকে দেখল। তারপর ঢুকে গেল ভিতরে। উতঙ্ককে আসতে দেখে অন্য দাস দাসীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তারা যেন উতঙ্কের নির্বাক ইঙ্গিতেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। যে যুবতী শিবনাথকে ধরেছিল সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন প্রাঙ্গণে রোদের ভিতরে বৃদ্ধ একা। বুকের উপর চেপে আছে অলঙ্কার ভর্তি রেশম পেটিকা। রোদে তার বেঁকে যাওয়া দেহ পুড়ছিল। উত্তাপ যেন মেরুদন্ড ছুঁয়ে ফেলছিল। দেহের লোল চর্ম আরো শিথিল হয়ে যাচ্ছিল।

তার কানে কোনো শব্দ আসছিল না। সে যেন বধির হয়ে গেছে। তার চোখে কোনো দৃশ্য ফুটছিল না। সে যেন অন্ধ হয়ে গেছে। দেহতে শুধু কম্পন ছিল মৃদু, কিন্তু আন্দোলন ছিল না কোনো। অচল হয়ে গেছে যেন তার দেহ।

বহু সময় বাদে হয়ত, সময়ের কোনো ঠিক ছিল না, ঘোরের ভিতরে পড়েছিল সে, কে একজন এসে তার পিঠে হাত রেখেছে। এই ছোঁয়ায় সচল হয়ে ওঠে তার সর্ব অঙ্গ। চোখে দৃষ্টি ফিরে এল, বধিরতা দূর হলো। শিবনাথ শুনল কে যেন তাকে ডাকছে, ভাল মানুষ, ও বাপ ভয় নেই ওঠো, তোমার ডাক হয়েছে।

শিবনাথ দেখল প্রৌঢ়া দাসী। মুখখানিতে শান্তভাব। অবাক হয়ে তাকে দেখছে বুড়ি। সে উঠে দাঁড়ায়। ভয় করল। অলঙ্কার লুণ্ঠনের এও কি আর একজন? সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে চায় কোথায় উতঙ্ক। উতঙ্ক তার প্রভু। উতঙ্ক তার রক্ষাকর্তা। উতঙ্ক তার অধিকারী। সমুদ্রপারের আরবদেশীয় বণিকরা বলে 'মালিক'। যিনি প্রভু তিনিই মালিক। কথাটা ধ্রুবসখা শিখে এসেছিল বারুগাজা বন্দর থেকে। আচমকা তার মনে পড়ে যায়। সে দেখল তার মালিক প্রাঙ্গণের প্রান্তে রৌদ্রের ভিতরে দাঁড়িয়ে এদিকে চেয়ে আছে নিশ্চল। অশোক গাছের ছায়া তাকে ঈষৎ ছুঁয়ে আছে। অশোকই তো। কিন্তু ফুল কই? অশোক মঞ্জরী? সত্যিই তো! এতটা পথ যে হেঁটে এল সে গম্ভীরা থেকে উজ্জয়িনী, ঝরা ফুল তো দেখেনি পথে। শিবনাথ উতঙ্কের চোখের সামনেই যখন বুড়ি দাসী তাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে, তাহলে সত্যিই ডাক হয়েছে। চলল শিবনাথ।

শ্রেষ্ঠীগৃহ অনেক বড়। প্রাসাদ বলে কিনা একে তা জানে না শিবনাথ। একবার এসেছিল ধ্রুবপুত্রকে নিয়ে, মনে পড়ে যাচ্ছে সব। আগে চলেছে দাসী, তারপর ধ্রুবপুত্র, তারপর সে। চলেছে তো চলেছেই দীর্ঘ অলিন্দ বেয়ে। দাসদাসীরা দ্রুত ত্রস্ত পদসঞ্চরণে অভ্যস্ত। তাদের কাজের ধারা এমনই। ফলে তাদের দু'জনকে, বিশেষত তাকে অনভ্যস্ত দ্রুততায় প্রায় ধাবিত হতে হচ্ছিল। সঙ্কীর্ণ অলিন্দে দাসীকে দেখতে পাচ্ছিল না সে। দেখছিল ধ্রুবপুত্রের রেশমী চুল, দীর্ঘ শরীর। দু'পাশে কত ঘর। কোনোটির দুয়ার রুদ্ধ ছিল, কোনোটি উন্মুক্ত। কোনোটির ভিতর থেকে এ মশল্লার গন্ধ, দারুচিনির গন্ধ, কোনোটি থেকে চন্দনের গন্ধ, কোনোটি থেকে পুষ্প গন্ধ বেরিয়ে ভরে তুলেছিল আধো অন্ধকার অলিন্দ। শোনা যায় শ্রেষ্ঠীর গৃহ এদিক থেকে আরম্ভ হয়ে পশ্চিমে ক্রমাগত বেড়ে গেছে। এদিকটা যখন তৈরি হয়, শ্রেষ্ঠী তখন সামান্য বণিক। পুরোন মায়া ত্যাগ করতে পারেননি। সব রেখে দিয়েছেন। বরং গৃহের এই অংশই তাঁকে লক্ষীমন্ত করে তুলেছে। তাই যেমন ছিল তেমনি আছে। কিন্তু সেই দামী মশল্লার গন্ধ, দারুচিনির গন্ধ, চন্দনের গন্ধ, পুষ্পগন্ধ যে এখন নেই। গুমোট একটা বাতাস ভারী হয়ে ভেসে আছে দীর্ঘ অলিন্দে। সেবার কোকিলের ডাক শুনেছিল দূরে। সেও তো এমন এক বসন্ত ছিল। এবার সব নিঃঝুম। সেবার শুনেছিল বীণা বাদন। দেখতে পায়নি কে বাজাচ্ছিল, কিন্তু কানে এসেছিল। পরে শুনেছিল, শ্রেষ্ঠীগৃহে অবিরাম বীণা বাদন শোনা যায়। বীণা বাদনেই টের পাওয়া যায় শ্রেষ্ঠী গৃহে আছেন কি না। এবার কী হলো? অবন্তী দেশের মাঠ নদী যেমন হয়েছে, এই গৃহও তেমনি? নাকি সেবার ধ্রুবসখার পুত্রটি ছিল বলে বাতাসে সুগন্ধ ছিল, অন্ধকারে বীণার ঝঙ্কার কানে এসেছিল।

বুড়ি দাসী থেমেছে, বলল, এই ঘরে ঢোক, প্রভু আছেন।

শিবনাথ দাঁড়িয়েই আছে। বুক ধকধক করছে। বুড়িকে সঙ্গে নিয়েই প্রবেশ করলে হতো। কত বাঁক ঘুরে এদিকে এসেছে সে। ফিরবে কীভাবে?

বুড়ি দাসী বলল, যাও বাপ, ভয় নাই, উতঙ্ক তোমার পক্ষে আছে, উতঙ্ক যখন খবর দিয়েছে কোনো ভয় নাই, প্রভু দয়াবানল কৃপাময়।

সাতাশ

ধ্রুবসখার পুত্রটি ছিল অকৃতজ্ঞ। দুর্বিনীত অহঙ্কারী। এই নগর থেকে সে নির্বাসিত। ধ্রুবপুত্রের অপরাধের কোনো সীমা নেই। সেই অপরাধীর হয়ে কথা বলতে এল নাকি ধ্রুবের বয়স্য শিবনাথ? ফিরে আসতে চায় নাকি সেই যুবক? দেবদত্তার অনুরাগী সেই জ্ঞানন্বেষী? যে নির্বাসনে গেছে, ফিরে এলে তার স্থান হবে কারাগারে। শ্রেষ্ঠী শিবনাথকে দেখতে দেখতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগলেন। মনে পড়ে গেল সব। ধ্রুবপুত্র কি জানত না শ্রেষ্ঠীর মন কোথায় পড়ে আছে? গণিকা দেবদত্তার জন্য সুভগ

দত্ত তাঁর এত বছরে অর্জিত সর্বস্ব ত্যাগ করে একবস্ত্রে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন তাঁর কাছে। কী সুন্দর সে। দেবদত্তার মুখখানি মনে পড়লে তাঁর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সেই সুন্দরীর এত নীরবতাতেও। পরামর্শদাতারা তাঁকে বলেছে অপেক্ষা করতে। শ্রেষ্ঠী নিজেও জানেন অপেক্ষার কোনো বিকল্প নেই। দেবদত্তা একদিন তাঁর প্রেমের মূল্য বুঝতে পেরে তাঁর কাছে এসেই দাঁড়াবে ভালবাসা নিয়ে।

শিবনাথ তাঁর সামনে হাঁটুমুড়ে বসল। শ্রেষ্ঠী ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। কী বলতে এসেছে ধ্রুবের বয়স্য? জেনে রাখুক সে এলে তাকে হত্যা করা হবে। একটি মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে আর কত ক্ষমতা লাগে? ধ্রুবপুত্রকে তিনি নিজেই পাঠিয়েছিলেন ওই গণিকার কাছে চৌষট্টি কলার পাঠ নিতে। শিখে নিক বীণ-বাদনের রহস্য, শিখে নিক নৃত্যের মুদ্রা, চিনে নিক শত পুষ্প, আকাশের কয়েকটি তারা, শিখে নিক কামকলা, স্ত্রী-পুরুষের মিলনের সূত্রগুলি। দেবদত্তার মায়ের কাছে রাজা ভর্তৃহরির শিক্ষা। এই সমস্ত কলাবিদ্যায় আগ্রহ ছিল ধ্রুবপুত্রের। ধ্রুবপুত্রের মাধ্যমেই গণিকা দেবদত্তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছিল। ওই ছলে উপঢৌকন পাঠিয়ে নিজের অনুরাগ প্রকাশ করছিলেন শ্রেষ্ঠী। কী আগ্রহেই না তিনি দেবদত্তার সমস্ত সংবাদ ধ্রুবপুত্রর কাছ থেকে সংগ্রহ করতেন। কিন্তু কী অকৃতজ্ঞই না ছিল সে?

সুভগ দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, সে কোথায়?

কার কথা বলছেন প্রভু?

শিবনাথ পট্টবস্ত্রের ভিতর থেকে রেশম পেটিকা বের করে সামনে উপুড় করে দিয়ে বলল, আমি বিপন্ন, হে শ্রেষ্ঠী আমাকে রক্ষা করুন।

শ্রেষ্ঠী শিবনাথের কথা শোনেন নি। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন ওই রেশম পেটিকা তাঁর চেনা। ঝপ করে তিনি পেটিকা টেনে নিতেই অলঙ্কারগুলি ছড়িয়ে গেল অনেকখানি জায়গায়। চমকে উঠে শ্রেষ্ঠী পিছনে তাকালেন। কেন কে জানে? সব অলঙ্কার তাঁর চেনা। এই নগরে যে কী হচ্ছে এখন তার কোনো হিসাব নেই। শ্রেষ্ঠীর মনে হচ্ছিল তাঁর ঠিক পিছনেই যেন আছে সেই নির্বাসিত যুবক। দেবদত্তাকে অঘ্রান পূর্ণিমায় দেওয়া উপহার না হলে এইভাবে ফিরে আসে?

ঘরে স্বল্প আলো ছিল দিনের। গবাক্ষটি ততো প্রশস্ত নয়। আরো আলোর জন্য বড় একটি প্রদীপ জ্বালানো ছিল একধারে। প্রদীপের স্বর্ণবর্ণের আলোয় মহালতা, চন্দ্রহার, বাজুবন্ধ, স্বর্ণতিলক, নুপুর, স্বর্ণবলয়—সমস্ত সোনার অলঙ্কার যেন দীপ শিখার মতো জ্বলে উঠল। আলোয় ঘর ভরে উঠল। আগুন যেন অলঙ্কারের গা থেকে ঠিকরে বেরোতে লাগল। সেই আগুন শ্রেষ্ঠীর মুখমন্ডল স্পর্শ করল। তাঁর চোখ জ্বলে উঠল। ক্রোধ হয়ে উঠল আগুনের মতো। কী অপমান। এভাবে কেউ গণিকার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়? এর কারণ ওই ধ্রুবপুত্র। ধ্রুবপুত্র যদি দেবদত্তার জীবনে প্রবেশ না করত তবে তো তাঁর জয় হতো নিশ্চয়। তিনি যৌবনের কাছে হেরে গেছেন। দেবদত্তা রাজ-অনুরাগিনী, আবার ওই যুবকেরও। যুবক নিশ্চয় লুকিয়ে আছে এই নগরে। তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে দেবদত্তার। না হলে এই অলঙ্কার শিবনাথের হাতে পৌঁছল কী করে?

সুভগ দত্ত জিজ্ঞেস করলেন আবার, সে কোথায়?

কে, কার কথা বলছেন ভদ্র?

কার কথা বলছি বুঝতে পারছ না? ধ্রুবপুত্রের, সেই দুরাচারী পাষন্ড, সে তো তোমাকে বিপন্নই করেছে, এই অলঙ্কার চুরির দায়ে তোমাকে কারাগারে যেতে হবে।

শিবনাথ ভয়ে মাথা ঠুকতে থাকে কর্কশ পাথুরে মেঝেয়। কাঁদতে কাঁদতে বলে, হে প্রভু রাজসত্রি দিয়েছে, ধ্রুবপুত্র কোথায় তা জানিনা, অবধান করুন ভদ্র, আমি এক সৈনিকের পিতা, আমার পুত্র নিরুদ্দেশে, যুদ্ধ থেকে ফেরেনি, হুন বিজয় হলো, উৎসব হলো কিন্তু তার কোনো খবর নেই, আমার পৌত্রী গন্ধবতী সৈনিক কার্তিককুমারের পুত্রী, হে প্রভু আমার কথা শুনুন।

শুনতে শুনতে সুভগ দত্ত আবার জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু সেই পাষন্ড কোথায়, অকৃতজ্ঞ?

সে তো অবন্তী দেশেই নেই।

তুমি তার কাছ থেকে আসনি?

না ভদ্র। মুখ তুলল শিবনাথ। পট্টবস্ত্রের কোণ দিয়ে চোখ মুছতে থাকে।

গণিকা পাঠিয়েছে, দেবদত্তা?

না প্রভু, আমি সামান্য মানুষ, গণিকা চিনিনা।

তবে এ অলঙ্কার কে দিল? অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়ে আছেন সুভগ দত্ত শিবনাথের দিকে। তিনি বুঝতে পারছেন না কীভাবে দেবদত্তাকে দেওয়া উপহার ধ্রুবপুত্রের পালকপিতার হাতে গিয়ে পৌঁছয়। গণিকা এতই নিষ্ঠুর, অলঙ্কার তাঁরই কাছে এভাবে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। শিবনাথের কথা শুনছিলেন শ্রেষ্ঠী। সত্রি উদ্ধবনারায়ণের কথা শুনলেন। বিশ্বাস করলেন না। গম্ভীর গলায় বললেন, রাজকর্মচারীর নামে মিথ্যা রটনা করলে পরিণাম ভাল হয় না, জিভ ছিঁড়ে নেবে সে।

না প্রভু, এইই সত্য, উদ্ধবনারায়ণ বলপূর্বক অধিকার করতে চায় গন্ধবতীকে, সে যুবতী হয়ে যাচ্ছে সবে, অন্যের অনুরাগিণী, সে যদি না ফিরে আসে অনূঢ়া থেকে যাবে হয়ত।

উদ্ধবনারায়ণ এই অলঙ্কার পেয়েছে কীভাবে?

জানিনা, প্রভু গত অপরাহ্নে মত্ত উদ্ধব আমার গৃহ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে ওই গহনা দিয়ে বিবাহ প্রস্তাব রেখে গেছে, সে অতিশয় দুর্বৃত্ত প্রকৃতির, আমি কার কাছে যাব ভদ্র, কে আমাদের রক্ষা করবে?

শুনতে শুনতে সুভগ দত্ত লক্ষ্য করছিলেন শিবনাথ তাকে প্রভু সম্বোধনে সম্মানিত করছে। শিবনাথের বাচনভঙ্গী অতি নম্র। শ্রেষ্ঠী মানুষ চেনেন। মানুষটি যে অসত্য বলছে তা মনে হচ্ছে না। এই ধরনের মানুষ অসত্য বলতে ভয় পায়। অসত্য কথা তো তৈরি করতে হয়। সে ক্ষমতা এর আছে বলে মনে হয় না। তবু তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সত্য বলছ?

হ্যাঁ, প্রভু সত্য।

ধ্রুবপুত্রের সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি তো?

না প্রভু, আমার পৌত্রী তার অপেক্ষায় বসে আছে।

অবাক হলেন শ্রেষ্ঠী। সদ্য বালিকা বয়স অতিক্রান্ত একটি কন্যার ভিতরে প্রেমের উন্মেষ হয়েছে ধ্রুবপুত্রকে ঘিরে। ধ্রুবপুত্র গণিকায় আসক্ত। গণিকা রাজ-অনুরাগিণী। রাজা চান রানী তাঁর কথাই ভাবুন। তাঁর সন্তান ধারণ করুন। রাজার দিকে ফিরেও তাকান না রানী ভানুমতি। তিনি কুমার বিক্রমে মুগ্ধা। এর ভিতরে শ্রেষ্ঠী, তিনি কে? তিনি গণিকার প্রেমে বিভোর। গণিকা তাঁকে চিনতেই পারে না বোধহয়। তাঁর মুখখানি মনেও রাখেনি দেবদত্তা। এত ধনসম্পদ তাঁর। হীরা, মুক্তা, সোনা, রূপা, কোনো কিছুরই অভাব নেই, কিন্তু তাঁর জন্য কি কেউ বিনিদ্র রজনী যাপন করে এই নগরে? এই অবন্তী দেশে?

সত্য বলছ এসব অলঙ্কার উদ্ধবনারায়ণ দিয়েছে?

হ্যাঁ প্রভু, গন্ধবতীকে সে অপহরণ করবে বলে গেছে, এই গহনাতেই নাকি তার প্রস্তাব পাকা হয়ে গেছে, আমরা কী করব প্রভু, ওই দুর্বৃত্ত কি ফুলের মতো কন্যাটিকে অপহরণ করবে? অবন্তী দেশে এমন হয়েছে কখনো?

সুভগ দত্ত বিষণ্ণ। তিনি চুপ করে ভাবছিলেন যে-ই দিক, অলঙ্কার দেবদত্তা রাখেনি নিজের কাছে। দেবদত্তাকে কেন তিনি অঘ্রান পূর্ণিমায় এত অলঙ্কারে সাজিয়ে দিয়েছিলেন তা কি সে জানে না? জানে না কি কেন তাঁর অত রোষ ধ্রুবপুত্রের প্রতি? ধ্রুবপুত্র তার মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিল। প্রেম-বিভোরতা জানিয়েছিল, তাই। দেবদত্তা রাজ অনুরাগিনী, যেন সেই কারণেই রাজার প্রতি তাঁর বিদ্বেষ বাড়ছে। রাজা তো গণিকার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন কতবার, রাজা দেবদত্তাতে মুগ্ধ নন এতটুকু, তবু কিনা সেই পরমাসুন্দরী রাজার জন্যই বসে থাকে? উদ্ধবনারায়ণকে রাজ সভায় তিনিই সুযোগ করে দিয়েছেন। উদ্ধব ছিল তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থী। এখনো তাই। সেই উদ্ধব কি দেবদত্তার গৃহে যায়? এত স্পর্ধা তার? গণিকা কি শেষ পর্যন্ত উদ্ধবের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে। অতিবড় সুন্দরী সে, যোগ্য পুরুষের অভাব ঘটল এই নগরে? বিষণ্ণ শ্রেষ্ঠী মাথা নিচু করে বসেছিলেন।

শিবনাথ ডাকল, প্রভু আপনি যদি সতর্ক করেন, উদ্ধব থামবে।

বিবাহ তো হতেই পারে, রাজকর্মচারী, কত শক্তি ধরে, ক্রমশ উচ্চপদে উঠে যাবে সে, প্রস্তাব তো খারাপ নয়।

না প্রভু, সে যে ধ্রুবপুত্রের জন্য বসে আছে।

সে কি ফিরবে এ দেশে?

ফিরবে না? আর্তনাদ করে উঠল যেন শিবনাথ।

ফিরলে তো কারাগারে যাবে, ওই উদ্ধব সেই ব্যবস্থা করবে।

ভদ্র, আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন, তরুণ বয়স, এই বয়স তো ভুল.করার, ভুল করেছিল সে, বুঝতে পেরে উজ্জয়িনী ছেড়ে চলে গেছে।

সে কি তাহলে ফিরেছে গম্ভীরায়?

না, না।

তবে কেন এসব কথা বলছ?

ফেরেনি, ফিরবে নিশ্চয়।

বলে গেছে? মনে মনে যেন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন সুভগ দত্ত। অথচ ধ্রুবপুত্র যদি ফেরেও, তাঁর কী ক্ষতি হবে? ধ্রুবপুত্রের অবর্তমানে দেবদত্তা কি তাঁকে গ্রহণ করেছে? কোনো অনুরাগ প্রকাশ করেছে? তবুও তিনি ধ্রুবপুত্রকে এই নগরে পা রাখতে দেবেন না। অবন্তী দেশ চিরকালের মতো ত্যাগ করেছে তাকে। অবন্তীতে ফিরলেই তার স্থান হবে অন্ধকূপে। প্রয়োজনে তার দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন করে দেওয়া হবে। হিংসায় তাঁর দুই চোখ আরো রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তিনি। তার শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। অথচ সে-ই কি না তাঁর সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় আঁচড় কেটে দিল।

ধ্রুবপুত্র তো অনাচারী, গণিকা আসক্ত, তার কাছে কেন কন্যা সম্প্রদান করবে?

শিবনাথ বলল, ভুল করছে সে, প্রভু উদ্ধবের হাত থেকে রক্ষা করুন, মদিরা পান করে সেই গৃহস্থের আঙিনায় ঢুকে যুবতী কন্যাকে আকর্ষণ করতে চায়, অবন্তী দেশে এ ঘটনা কখনো ঘটেনা, ঘটেনি আগে।

নরম হলেন বোধহয় সুভগ দত্ত। আবার বিষণ্ণ হলেন। উদ্ধব যদি ও ঘটনা ঘটিয়ে থাকে তবে তো অন্যায় নিশ্চয়। রাজকর্মচারীই যদি দুর্বৃত্ত হয়ে ওঠে, তবে মানুষ কার কাছে গিয়ে প্রতিবিধান চাইবে? রাজশক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিক কীভাবে দাঁড়াবে? রাজা যদি দুর্বল হন, এমন ঘটে থাকে। মন্দিরে ধর্ষিতা হয় দেবদাসী, গৃহস্থের আঙিনায় প্রবেশ করে দুর্বৃত্ত। দুর্বৃত্ত তো নিশ্চয়, না হলে গণিকা দেবদত্তার অলঙ্কার আত্মসাৎ করে সে কিনা আর একজনকে উপঢৌকন দেয়? সে ওই অলঙ্কার গ্রহণ করার সময় কি খোঁজ নেয়নি কে দিয়েছিল তা গণিকাকে? নিশ্চয়ই জেনেছে সে। ভাবতেই পারেনি অলঙ্কার নিয়ে এই মানুষটি চলে আসবে শ্রেষ্ঠীর কাছে প্রতিবিধান চাইতে।

প্রভু সুভগ দত্ত। ডেকে উঠল শিবনাথ।

সুভগ দত্ত বললেন, ধ্রুবপুত্র তোমার পৌত্রীকে গ্রহণ করবে?

করবে প্রভু।

তাহলে সে কেন গণিকায় মজেছিল?

গ্রহের ফের, সে নেই বলেই এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে।

হয়ত! অস্ফুট উচ্চারণ করলেন শ্রেষ্ঠী। ধ্রুবপুত্র যদি থাকত এবং গণিকায় মুগ্ধ না হতো তাহলে উদ্ধব নিশ্চয় এমন সাহসী হয়ে উঠতে পারত না। ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন সুভগ দত্ত। উদ্ধব কিনা গণিকা দেবদত্তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে! এত সাহস তার! সব বদলে যাচ্ছে। প্রকৃতি, মানুষ সব। উদ্ধব ছিল তাঁর কৃপাপ্রার্থী। উদ্ধব এখনো তাঁর কৃপা প্রার্থনা করে। ওসব তাহলে ছল। খুব চাতুরী শিখেছে রাজসভায় ঢুকে। অথচ এই উদ্ধবই না খবর দিয়েছিল দেবদত্তা আর ধ্রুবপুত্র প্রেমে মজেছে। অর্গল রুদ্ধ করে বসে থাকে। ধ্রুবপুত্রকে সামনে বসিয়ে রেখে বীণায় নতুন সুর তোলে রসমঞ্জরীর কন্যা। নৃত্যের নতুন মুদ্রা সৃষ্টি করছে সে ধ্রুবপুত্রের জন্য। শৃঙ্গার কাব্য পাঠ হয় দু'জনে। শৃঙ্গারে মেতেছে গণিকা তরুণ ধ্রুবপুত্রকে নিয়ে। ধ্রুবপুত্রকে সে শেখাচ্ছে কামকলা, শৃঙ্গারের রীতি, কৌশল। শুনে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিলেন সুভগ দত্ত। ধ্রুবপুত্রকে জিজ্ঞাসা করায় সে তার মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিল। প্রেম বিহ্বলতা জানিয়েছিল পিতৃসখাকে।

এখন মনে হচ্ছে দেবদত্তা চায় নতুন পৌরুষ। অনাঘ্রাত পুরুষ ধ্রুবপুত্রকে সে মোহমুগ্ধ করেছিল, এখন করেছে সামান্য রাজকর্মচারী উদ্ধবনারায়ণকে। শরীর আর মন যখন চায়, প্রভু ভৃত্যে ভেদ থাকে না।

প্রভু আমি কী করব?

ফিরে যাও।

উদ্ধবনারায়ণ?

আমি দেখছি। বিষণ্ণ সুভগ দত্ত মাথা নামালেন।

শিবনাথ চলে গেল। শ্রেষ্ঠী এবার একা হলেন। মেঝেয় পড়ে আছে মহালতা, চন্দ্রহার, বাজুবন্ধ, স্বর্ণতিলক। কী সুন্দর হয়েছিল দেবদত্তা এই অলঙ্কারে সেজে। স্বর্ণকারকে নির্দেশ দিয়ে গড়ানো হয়েছিল। শ্রেষ্ঠী গবাক্ষপথে আকাশ দেখছেন। আকাশ রোদ ঝাঁ ঝাঁ হয়ে কেমন বক্রভাব ধারণ করেছে। বহু উঁচুতে গৃধিনীর যূথ চক্রাকারে উড়ছে। সুভগ দত্ত সরে এলেন। আচমকা হেঁকে উঠলেন, উতঙ্ক, উতঙ্ক হে।

শ্রেষ্ঠীর কণ্ঠস্বর ঘর থেকে অলিন্দে পৌঁছল। অলিন্দ থেকে সেই ডাক বয়ে নিয়ে চলল ত্রস্ত পায়ের দাসী। উতঙ্ক, উতঙ্ক হে, বাপ উতঙ্ক, প্রভু ডাকেন তোমাকে। ডাক শুনে প্রাঙ্গণ থেকে উতঙ্ক দ্রুত পায়ে হেঁটে আসে। প্রভুর ডাকে কীভাব জড়িয়ে আছে তা দাসীর কণ্ঠস্বরেই টের পাওয়া যায়। উদ্বিগ্ন উতঙ্ক ছুটে যায় অলিন্দ বেয়ে। অলিন্দে তখন চলে ফিসফাস, প্রভু ক্রুদ্ধ হয়েছেন, ওই যে প্রভুর ডাক শোনা যায় আবার, গর্জন করছেন শ্রেষ্ঠী, উতঙ্ক আয়, মাগিটাকে আজ দেখে নেব, রাজা বাঁচাবে না ওকে, আয় উতঙ্ক।

আঠাশ

উতঙ্কের চাহনিতে হিম বর্ষণ হয় যেন। উতঙ্কর রথটিও তেমনই। ভয় উদ্রেক করে রাজপথে সব সময়। উতঙ্কর রথ কেনা চেনে এই নগরে? পথের সারমেয় কুল সবচেয়ে ভাল চেনে। প্রভুকে নিয়ে উতঙ্কের রথ যখন রাজপথে আচমকা নেমে আসে ঘূর্ণীবায়ুর মতো, সারমেয় দল আর্তনাদ করতে করতে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে ধাবমান হয় এদিক-ওদিকে। তারা যেন রথ এসে পড়ার আগেই টের পায় আসছে সিন্ধু দেশের ঘোড়া আর তার সারথি, ঘূর্ণমান চাকা। ওই রথ যে কত সারমেয়কে পঙ্গু করেছে। সুভগ দত্ত রথে এই গতি পছন্দ করেন। রাজার রথও এমন গতিময় হয় না। চলমান রথে বসে নিজ শ্রেষ্ঠত্ব অনুভবে যে আনন্দ শ্রেষ্ঠীর তা আজ নেই, তিনি অস্পষ্ট স্বরে নিবৃত্ত করলেন সারথিকে, উতঙ্ক ধীরে।

সিন্ধু দেশের অশ্বের মতোই উতঙ্ক গ্রীবা বাঁকিয়ে প্রভুর দিকে তাকায়। তিনি ঘাড় হেঁট করে বসে আছেন। প্রভু বিমর্ষ। যে ক্রোধে তিনি ডাক দিয়েছিলেন উতঙ্ককে তা এখন আর নেই। উতঙ্ক ঠিক ধরতে পারছে না কী হয়েছে এমন যে ক্রোধ আর অবসন্নতা দুইই ছেয়ে থাকবে প্রভুকে। হাটুরে মানুষটি চলে যাওয়ার পর এমন হলো। প্রভু বলেননি তাই সে ওই বৃদ্ধকে আটক করেনি। আর মানুষটি অতি নিরীহ, ওকে চেনে উতঙ্ক। সে ধ্রুবপুত্রকে যে চিনত। লোকটি চলে যাওয়ার পর অস্থির হয়ে গেছেন প্রভু সুভগ দত্ত। যেন আরো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। অলঙ্কারগুলি কার, কেন এনেছিল লোকটি? উতঙ্ক দেখল শ্রেষ্ঠী ঝুঁকে বসে আছেন।

সুভগ দত্ত নিশ্চুপ। তাঁর মাথার উপর পীতবর্ণের চাঁদোয়া। বস্ত্রটির চারদিকে সূক্ষ্মতন্তুর ঝালর। চাঁদোয়ার উপর চৈত্রের ধারালো রোদ। সূক্ষ্মতন্তু আড়াল করতে পারছে না উত্তাপকে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে তাপ নামছে শ্রেষ্ঠীর দেহে। পীতবর্ণের আলো ছেয়ে আছে তাঁকে। প্রভুর বিষণ্ণ মুখখানিতে বিমর্ষ হলো উতঙ্ক। প্রভুকে এমন তো দ্যাখেনা সে সচরাচর। কতদিন বাণিজ্যে যাননি প্রভু। বাণিজ্যে গেলে উতঙ্ক সঙ্গে থাকে। কত লোকজন, গো শকট, জিনিসপত্র, খাঁচায় কবুতর, ময়ূর, দাস-দাসী নিয়ে প্রভু চলেন বাণিজ্য পথে। বাণিজ্য করতে গিয়েই উতঙ্ককে তিনি নিয়ে এসেছিলেন উত্তর-পূর্ব দেশ থেকে। আবছা মনে পড়ে উতঙ্কর। শীতের সময় তুষার ছেয়ে থাকত চারদিক। আকাশে শাদা মেঘের পুঞ্জ দেখলে সেই দেশের কথা মনে পড়ে তার। তাকে সংগ্রহ করে কত দেশ না ঘুরে উজ্জয়িনীতে এসে থেমেছিলেন সুভগ দত্ত। পথে নেমেছিল ঘোর বর্ষা। বর্ষারম্ভের পূর্বেই পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল। হয়নি। প্রভুর কি বাণিজ্যের কথা মনে নেই? মনে নেই পূর্ব সমুদ্রের কথা? সেই দেশের মাটি কোমল, গাছগাছালি ঘন বনানীতে পরিপূর্ণ সব। ওই দেশ থেকে নারিকেল আর ধান্য আনা হয়েছিল। প্রভু কেন বাণিজ্য ভুলে নিতান্ত এক বালক ধ্রুবপুত্রের সঙ্গে মেতে উঠলেন প্রেমের দ্বন্দ্বে। প্রভু যদি ইচ্ছা করেন কোন নারী তাঁকে এড়িয়ে থাকতে পারে? দেবদত্তাকে গণিকালয় থেকে অপহরণ করে প্রভু গৃহে নিয়ে আসতে কত সময়? প্রভু আদেশ করুন।

উতঙ্কর চোখের মণিতে প্রভুর দুঃখ ছায়া ফেলল। শ্রেষ্ঠীর কাছে তার বেড়ে ওঠা, শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে

কত দেশ না ঘুরেছে সে। সে তাঁর অনুগত দাস। তিনি কখন শ্বাস নেবেন, কখন নিঃশ্বাস ফেলবেন সেই খোঁজ রাখাও যেন তার কর্তব্য। সে তা পালন করে।

ঘোড়া দুটির রাশ টেনে ধরল উতঙ্ক। এই রথটি পারিযানিক হলেও আসলে এটি যুদ্ধেরই রথ। দশ পুরুষ উচ্চ এবং বার পুরুষ বিস্তৃত এই রথ যুদ্ধেরই উপযোগী। উতঙ্কর খুব পছন্দ এইটি। রথের সুবৃহৎ দুটি চাকার ঘূর্ণনে, ঘর্ষণে উদ্ভূত শব্দে উতঙ্ক যেন আরো তেজময় হয়ে ওঠে। রাশে ঝাপটা দিয়ে সিন্ধু দেশের ঘোড়ার পিঠে তখন মৃদু কশাঘাত এবং বাতাসে কশ চালনার সাঁইসাঁই শব্দ রথকে গতিময় করে। যেন বা শত্রু শিবির সম্মুখে। তছনছ করে দেবে সব। এই যে ঘোড়ার গতি আবার নেমে এল রাশ টানতেই। উতঙ্ক রথ আবার থামিয়ে দিল।

সুভগ দত্ত বললেন, দেবদত্তার কাছে যেতে হবে, গণিকালয়ে।

উতঙ্ক দেখল প্রভুর দুটি চোখ রক্তবর্ণ। সে রাশে ঝাপটা মেরে ঘোড়া দুটিকে চঞ্চল করে তুলল। ঘোড়ার পৃষ্ঠে কশাঘাতে গতি তুলল রথের চাকায়। রথ চলল বটে, গতি মন্থর, উদ্দামতা নেই। সুভগ দত্ত এবার জিজ্ঞেস করলেন বিশ্বাসঘাতিনীর শাস্তি কী?

উতঙ্ক পুনরায় গ্রীবা বাঁকিয়ে তাকায়। তার ক্ষুদ্র দুটি চোখের কোলে কাজল টানা। কী গভীর মায়াবী চাহনি। প্রভুর বেদনা বুঝি তাকে ছুঁয়েছে। বিষণ্ণতা তার মুখমন্ডলে যেন সঞ্চারিত হচ্ছে। সুভগ দত্ত ধীরে ধীরে অলঙ্কারগুলির হাত বদলের কথা বলছেন। বলতে বলতে তিনি নিজেই টের পেলেন দেবদত্তা তার অনুরাগিনী হবে না কোনোদিন। দেবদত্তা তাঁর প্রতি মুগ্ধ নয়। বলপ্রয়োগেও কারোর প্রতি কারোর মুগ্ধতা তৈরী করা যায় না। হায়! অস্ফুট বেদনা নিঃসরণ হলো শ্রেষ্ঠীর কণ্ঠ থেকে। তিনি থেমে গেছেন।

শ্রেষ্ঠী থেমে যেতেই উতঙ্ক চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার প্রভু এই নগরের শ্রেষ্ঠ মানুষ। তিনি কিনা এক গণিকার জন্য হা-হুতাশ করেন! আবার বাণিজ্যে চলুন প্রভু। মনে মনে এই কথা উচ্চারণ করে উতঙ্ক। সে জানে বাণিজ্য যাত্রাই প্রভুকে শান্ত করতে পারে। তখন কাকে দেওয়া অলঙ্কার কার হাত দিয়ে কীভাবে ফিরে এল, কে কাকে ভালবাসে, ভালবাসে না—সব অবান্তর হয়ে যাবে। উতঙ্ক জানে রমণী ভোগ্যপণ্য। তার জন্য বিমর্ষ হওয়া, বিষণ্ণ হওয়া, অবসাদগ্রস্ত হওয়া অপৌরুষের লক্ষণ। ইতরজন যেমন অন্ন বস্ত্রের জন্য হা-হুতাশ করে প্রভু করছেন এক নারীর জন্য। নারী তো নারীই মাত্র। তাকে অধিকার করা কী এমন কঠিন! রাজা ধর্ষণ করে আসতে পারেন দেবদাসীকে, শ্রেষ্ঠী পারেন না বলপূর্বক অধিকার করতে ওই গণিকাকে? হলোই বা সে প্রধান গণিকা, শ্রেষ্ঠীও তো প্রধান পুরুষ। রাজা তো রাজাই, তার প্রভুর করায়ত্ত যে অতুল বৈভব।

শ্রেষ্ঠী তাঁর ভৃত্যকে কোনোদিন তার অবস্থান থেকে উপরে উঠতে দেননি। উতঙ্কর সঙ্গে কখনো ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলাপ করেননি। দাস কি এসব শোনার যোগ্য? কিন্তু মনের ভিতরের ঝড় থামাতে উতঙ্ককেই অবলম্বন করলেন শ্রেষ্ঠী। তিনি জানেন উতঙ্ক আর ওই সিন্ধুদেশীয় তুরঙ্গমে কোনো তফাৎ নেই। কোনো কথাই কোথাও ছড়িয়ে যাবে না। এমন বিশ্বাসী, এমন নিষ্ঠুর দাস এই নগরে আর কোনো গৃহে নেই।

শ্রেষ্ঠী বললেন, উদ্ধববেটার এত সাহস! কীটের জীবনযাপন করত দুর্বৃত্তটা।

উতঙ্ক শুনছে। প্রভুর কথার প্রত্যুত্তর দেওয়া তার অভ্যেস নয়। এখন প্রভু তাঁর মনের ভার লাঘব করছেন। তবু উদ্ধবের নাম শুনে তপ্ত হয়ে উঠে উতঙ্ক ঘোড়ার পৃষ্ঠে মৃদু কশাঘাত করল। বাতাসে সাঁই সাঁই শব্দ তুলল। অদৃশ্য কাকে যেন প্রহার করল সপাং সপাং শব্দে। ঘোড়া ছুটল। চাকার ঘর্ষণ তীব্র হলো। ধুলো উড়ল রথের চাকায়। উদ্ধব মরুক। কীটস্য কীট। আবার কশাঘাত করল ঘোড়ার পৃষ্ঠে। ঘোড়াদুটি বেগবান হল। পুনঃ পুনঃ কশাঘাত করতে লাগল উতঙ্ক। তখন শ্রেষ্ঠী বললেন, ধীরে উতঙ্ক।

বেগবান ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল সে। টানতেই ঘোড়া দুটির গতিরুদ্ধ হলো। সামনের দুটি পা তুলে চিঁহি চিঁহি রব তুলল। রথ টাল খেতেই অভিজ্ঞ সারথি উতঙ্ক ঘোড়া দুটিকে সামলে নিতে থাকে। হ্রেষাধ্বনি বন্ধ হয় না। পথের দু'পাশে মানুষজন দাঁড়িয়ে গেছে। ওই যে দাঁড়িয়ে আছে তালঢ্যাঙা, শীর্ণকায়,কৃষ্ণবর্ণের একটি মানুষ। বীট মহাপার্শ্ব ঝুঁকে পড়েছে যেন। ভীত চোখে শ্রেষ্ঠীর রথ দেখতে দেখতে চোখ মুছতে লাগল মানুষটা। কাকে যেন অস্ফুটস্বরে বলল, ক্ষেপেছে লোকটা, ক্ষেপেছে উতঙ্ক! ওফ্ এখন পিটিয়ে রক্ত বের করে দেবে ঘোড়া দুটোর, গর্দভ করে দেবে, দুষ্ট একদিন আমাকে মেরেছিল,

উতঙ্ক ক্ষেপলে রক্ষা নেই।

পথচারী অন্যজন বলল, উতঙ্ক না, রথের ঘোড়া, এ জীব উন্মাদ হলে রক্ষা নেই।

উঁহু, উতঙ্ক, এমন আচরণ করে উতঙ্ক যেন সে উন্মাদ, উন্মাদের মতো কশাঘাত করে।

উন্মাদকে থামাতে কশাঘাত প্রয়োজন।

তাহলে তো উতঙ্কই কশাঘাতের যোগ্য। বীট মহাপার্শ্ব অস্ফুট গলায় বলল।

ভুল বলছ, ঘোড়া দুটি উন্মাদ, আমি উন্মাদ ঘোড়া দেখেছি, তুমি দ্যাখোনি?

উঁহু, তুমি উন্মাদ পুরুষ দ্যাখোনি।

পথচারী বলল, তুমিই দেখছি উন্মাদ ঘোড়া দেখে বুঝতে পারনা।

তুমি দেখছি উতঙ্কর অনুরাগী, ওই নিষ্ঠুর দাসের দাস যেনবা। মহাপার্শ্ব বিরক্তির সঙ্গে কথাটা বলতেই পথচারী ক্ষেপে গেল। ঝপ করে তালঢ্যাঙা মহাপার্শ্বর অঙ্গবস্ত্র টেনে ধরল, তুমি এখানে কেন, গণিকালয়ে যাও।

কেন যাব, পথ কি তোমার?

লোকটি তখন বলল, চিৎকার করে উতঙ্ককে সব কহে দিচ্ছি, আগে বলো ঘোড়াই উন্মাদ, বলো বলছি।

বীট এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, তুমি উন্মাদ।

তা শুনে পথচারী আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল মহাপার্শ্বর উপর, কী বললে তুমি দুষ্ট, আমি উন্মাদ? আমি যদি উন্মাদ হই রথের ঘোড়া পা তুলে ডাক ছাড়ে?

হই হই লেগে গেল। তখন উদ্ধব কোথায়, উদ্ধব কোথায় করতে করতে শ্রেষ্ঠীর রথ এগিয়ে গেল। শ্রেষ্ঠী বলছেন, যদি গম্ভীরার শিবনাথ সত্য কথা বলে থাকে তো উদ্ধব অন্যায়ই করেছে। প্রথম অন্যায় দেবদত্তাকে দেওয়া শ্রেষ্ঠীর অলঙ্কার স্পর্শ করে, দ্বিতীয় অন্যায় গৃহস্থের যুবতী কন্যা অপহরণ করার, রাজ্যে কোনো ন্যায়নীতি বজায় থাকছে না, ন্যায়নীতি যত বিসর্জিত হবে, যত অনাচার হবে রাজা পথে বসবেন।

উতঙ্ক নির্বাক। প্রভুর কথায় কথাবলা তার অভ্যাস নয়। সফল, শ্রেষ্ঠ, ধনবান পুরুষরা নিজেদের সর্বোত্তম মনে করে। নিজেদের কথাই শেষ কথা মনে করে। নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল থাকে। উতঙ্ক এসব জানে বলেই সে দাস শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠীর প্রিয় দাস, ক্ষমতা তার অনেক। সে শ্রেষ্ঠীর কথা শুনছে চুপচাপ। রথ ধীরে ধীরে চলছে। শ্রেষ্ঠী বলছেন, গৃহস্থের কন্যা অপহরণ হবে, ফসল লুণ্ঠন হবে, বৃষ্টিহীন দেশ জলশূন্য হবে, পথে পথে তস্কর, দুর্বৃত্তরা ঘুরে বেড়াবে, নগর সেই পথে যাচ্ছে।

উতঙ্ক গ্রীবা বাঁকিয়ে দেখল শ্রেষ্ঠীর পায়ের কাছে অলঙ্কার ভরা রেশম পেটিকা পড়ে আছে। শ্রেষ্ঠী তা তুলছেন না। মনে খুব দুঃখ পেয়েছেন তার প্রভু। উতঙ্ক রাশ-ঝাপটা দিয়ে ঘোড়ার গতি বাড়ায়। শ্রেষ্ঠী বলছেন, রাজার শাসন না থাকলে রাজকর্মচারী দুর্বৃত্ত হয়ে দাঁড়ায়, এসবের দায় রাজারই, কন্যা অপহরণ হলে, লুণ্ঠন হলে, বলাৎকার হলে রাজারই পাপের ভার বাড়বে, বাড়ুক, উদ্ধব যা করার করুক, উদ্ধবকে টিপে মারতে কতক্ষণ, কিন্তু রাজার দায়ভার কঠিন হয়ে উঠুক, রাজগণিকাও কিনা রাজাকে ছেড়ে রাজকর্মচারীকে অবলম্বন করেছে, এদেশ নিম্নগামিনী।

ধাবমান রথ আচমকা দাঁড়িয়ে যায়। ওই যে উদ্ধব। টাঙ্গন ঘোড়ার পিঠে চেপে দুলে দুলে চলেছে। উদ্ধবের মুখে গুনগুন। কী যেন সুর ভাঁজছে দুষ্ট? গাঁয়ের চাষা ছিল তো। সে আবার এমন চাষা যার নিজেরই জমি ছিল না এক ফোঁটা। সেই হা-ঘরের মাথায় রেশমি শিরস্ত্রাণ, গায়ে রেশমবস্ত্র, গলায় মুক্তোহার, ঘোড়ায় চেপে চলেছে সে নগর সঙ্কীর্তনে যেন বা। কিন্তু রাজকর্মচারী হোক সে যতবড়, গাঁয়ের গন্ধ তো যায়নি। তাই মেঠো গান ভাঁজছে। বেশ শোনা যাচ্ছে তার ফূর্তির কণ্ঠধ্বনি। ...পক্ক বিল্বজোড়া অতি মনোহর...কলসখানি তার চেয়ে আরো মনোহর...আহা বিল্বফলে কী যে মধু...

শ্রেষ্ঠী গর্জন করে উঠলেন, উতঙ্ক ও কোথায় যায়, কী বলে?

শ্রেষ্ঠীর গর্জন শুনেই খোলা সমেত পক্ক বিল্বফল গিলেই ফেলল উদ্ধবনারায়ণ। বেশ খুশিতে ছিল সে। সব উধাও। লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে শ্রেষ্ঠীর অগ্নিময় চক্ষু দুটি দেখে ভীত হল। সে বলল, প্রভু ক্ষমা করবেন, চলেছি গম্ভীরা, নিজ গ্রামে, আগামী কল্য আপনার শ্রীচরণ স্পর্শ করব।

উদ্ধবের অতি বিনয়ে শ্রেষ্ঠী বিরক্ত হলেন। তিনি আবার গর্জন করলেন, উতঙ্ক, ও কেন যায় গৃহস্থের কন্যা অপহরণে?

এই কথায় উদ্ধব কুঁকড়ে যায়। তার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসতে লাগল। রাজার চেয়েও শ্রেষ্ঠীকে সে ভয় পায় বেশি। রাজার সাক্ষাৎ তার ইহ জীবনে হয়নি। সামান্য সত্রি। কী করে হবে? আর এখন তো সব বিশৃঙ্খল। নগরে কত কথা উড়ছে। এখন সে প্রায় স্বাধীন রাজকর্মচারী। কোনো ন্যায় নীতির ধার ধারে না। গণিকালয়ে তার অবাধ গমন। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, সেনাপতি, রথাধ্যক্ষ, পণ্যাধ্যক্ষ, সুবর্ণাধ্যক্ষ, ভূমিঅধ্যক্ষ প্রভৃতিরা যেমন আচরণ করে তেমনই করতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। বিনা পারিশ্রমিকে গণিকা ভোগ করছে, রাজার প্রাসাদ থেকে বিনামূল্যে এটা ওটা সংগ্রহ করছে, বিপণি থেকে পছন্দ মতো পণ্য তুলে নিচ্ছে—কী সুখেরই না জীবন!

উত্তর দেয় না কেন, ও অলঙ্কার পেল কোথা থেকে?

উদ্ধব ভয়ে নুয়ে গেল। তার খর্বাকার দেহ আরো খর্ব হয়ে গেল। মুখখানিতে এমনিতেই রাত্রি জাগরণ ও অমিতাচারের ছায়া ঘন। এখন তার সঙ্গে মিশেছে উদ্বেগ, দুঃশ্চিন্তা। ভীত উদ্ধবনারায়ণ বলল, প্রভু মেয়েছেলেটা সেই দুর্বৃত্ত ধ্রুবপুত্রের প্রতি...।

কথা শেষ করতে দিলেন না শ্রেষ্ঠী, বললেন, উতঙ্ক ওই চাষাটাকে আমার গৃহে আসতে বলে দে, রথ ঘোরা উতঙ্ক, অলঙ্কার কী করে পেল ও জানতে চাই।

মুহূর্তে পথ বদল করে নিল উতঙ্ক। সে জানে এবার তার কর্তব্য কী? দ্রুত ফিরে যাওয়া। প্রভু আদেশ দিয়েছেন। দ্রুত রথ ঘোরাতে লাগল উতঙ্ক। অনেকটা পথ বৃত্তাকারে পাক দিয়ে রথ ঘুরিয়ে ঝড়ের মতো ছুটিয়ে দিল উতঙ্ক। পথের বাঁক ঘুরে তা ক্রমে অদৃশ্য।

উদ্ধব দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। সত্যি, এবার সে কী করে? যেতে হবে শ্রেষ্ঠী গৃহে। যবে না, এমন বুকের জোর নেই উদ্ধবের। ইস্! কেন যে দেখা হলো শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে? না হলে সে কী চমৎকার চলে যেতে পারত গম্ভীরা। আয়েশ করে বসত গন্ধবতীর আঙিনায়। ওই কন্যাটির জন্য সে পাগল হয়ে উঠেছে প্রায়। এখন তো তার অধিকার জন্মে গেছে। অত অলঙ্কার দিয়ে এসেছে যখন, সালঙ্কারা কন্যাটিকে পেতে কতক্ষণ? কিন্তু অলঙ্কারের কথাই যে বললেন শ্রেষ্ঠী। কী সব্বোনাশ। কীভাবে যে কী হয়ে যাচ্ছে তা জানে না সে। ঘোড়ায় না চেপে ঘোড়ার পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছে উদ্ধব। হাঁটতে হাঁটতে দেখল মাটিতে চিত হয়ে পড়ে আছে বীট মহাপার্শ্ব, তার বুকের উপরে এক পথচারী। উদ্ধবকে দেখে পথচারী লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বীটও উঠল হাসতে হাসতে, গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে। এগিয়ে এসে মাথা নামিয়ে বলল, পয়দলে যাচ্ছেন যে সত্রি মশায়, ঘোড়ার কী হলো?

উদ্ধব তার মনের ভাব গোপন করল, পথচারীর দিকে চোখ কটমট করে তাকায়, কী ব্যাপার, পথের ভিতরে মল্লযুদ্ধ হচ্ছিল?

বীট হাসল, ছেড়ে দিন সত্রিমশায়, উন্মাদ, উন্মাদে কী না করে?

উদ্ধবের ধড়ে প্রাণ এসেছে যেন। বীট মহাপার্শ্ব খুব চতুর, কত ফন্দিফিকির না জানে। সে গম্ভীর হয়ে ডাকল তাকে, সঙ্গে এসো দেখি।

বীট হাত তুলল, যা উন্মাদ ঘরে যা, এরপর বন্দি হয়ে যাবি, ইনি রাজসত্রি।

পথচারী হনহন করে হেঁটে গেল। প্রায় পালিয়েই গেল যেন। এখন একটি ক্ষুদ্রাকার টাঙ্গন ঘোড়া, খর্বাকার রাজসত্রি এবং অতিদীর্ঘ বীট মহাপার্শ্ব রাজপথের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছে ধীরে ধীরে। উদ্ধব গলা খাঁকারি দিল।

কয়েক পা হেঁটে বীট মহাপার্শ্ব বলল, উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে?

না, উঁহু তা হবে কেন? ঢোক গিলতে গিলতে বলল উদ্ধব।

শ্রেষ্ঠী আবার ঘুরে গেলেন, কেন বলুন দেখি? মহাপার্শ্ব হিসেব করে খুঁজে বের করতে চাইছিল কার্যকারণ সূত্র। শ্রেষ্ঠী ফিরে গেলেন, তারপরই দেখা যাচ্ছে ঘোড়া হাঁটিয়ে আসছে উদ্ধব। ঘোড়াটা কি খোঁড়া হয়েছে? তালঢ্যাঙা মহাপার্শ্ব নীচু হয়ে দেখল, কই নাতো। তাহলে হেঁটে আসার কারণ কী? ঘোড়া থেকে নেমেছেই বা কেন সত্রিমশায়? যাচ্ছেনই বা কোথায়?

উদ্ধব বলল, শ্রেষ্ঠী গৃহে।

কী ব্যাপার বলুন দেখি।

উদ্ধব বুঝতে পারছে গণিকালয়ের এই প্রহরী টের পাচ্ছে কিছু। খুব চতুর মানুষ তো। রাস্তায় মল্লযুদ্ধে মেতেছিল কেন তাও যেন ধরতে পারে উদ্ধব। পারবেই তো, কেননা সেও তো কম চতুর নয়। তার মাথায় কম ফন্দি খেলা করে না। উদ্ধবের মনে হলো পরামর্শ চেয়ে নেয় বীটের কাছ থেকে। মেয়েমানুষ যুবতী হোক বা বৃদ্ধা হোক, গৃহবাসী হোক আর গণিকালয়বাসী হোক মহাপার্শ্ব তাদের সব বোঝে। তখন উদ্ধব ধীরে ধীরে বলতে লাগল গন্ধবতীর কথা। না বলে উপায় নেই। এ সমস্যা ঘোড়ার কাছে বললে তো ফল মিলবে না, বুকের ভারও কমবে না, শ্রেষ্ঠীর রোষও কমবে না।

শুনতে শুনতে মহাপার্শ্ব বলল, আপনি কি কুমারীকন্যা অপহরণ করেছেন, গম্ভীরার মেয়েমানুষটাকে?

না তো।

ধরে নিয়ে আসুন গণিকালয়ে, শ্রেষ্ঠীকে আমন্ত্রণ জানান, তিনি চোখে দেখুন।

এসব কী কথা?

মহাপার্শ্ব খ্যা খ্যা করে হাসল, বলল, শ্রেষ্ঠী আপনার ভাগ্য গড়ে দিয়েছেন, শ্রেষ্ঠীকে আপনি দিতে পারবেন না? এত অকৃতজ্ঞ! শ্রেষ্ঠী আপনাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে দিয়েছে, এবার যদি ঘোড়া আর উষ্ণীষ কেড়ে নেন উনি?

কথাগুলো খুব ধারালো। ক্রোধের সঞ্চার হচ্ছিল উদ্ধবের মনে। মনে হচ্ছিল বীটের পেটে গুপ্ত ছুরিকা বসিয়ে দেয়। পেট ফাঁসিয়ে নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলে রেখে যায় রাজপথে। কিন্তু কথার সত্যতা অস্বীকার করে কী করে সে?

মহাপার্শ্ব বলল, খোঁজ নিয়ে দেখুন শ্রেষ্ঠী হয়ত মেয়েছেলেটাকে দেখেছে, আর সেই কারণেই ধ্রুবপুত্রকে বিতাড়িত করেছে নগর থেকে, বয়স হলে কচি মেয়েমানুষে ঝোঁক হয়, নিয়ে আসুন, আমাদের পাড়ায় নতুন নতুন চাই, এমন একটা হলে সেই লোভে নতুন ভ্রমর আসবে, দিনকাল খুব খারাপ, গণিকারা সব সাজিয়ে বসে আছে, লোক নেই, বণিকরা তো আসছে না, পথে লুটপাট হচ্ছে।

হুঁ। উদ্ধব অন্যকথা ভাবছিল। গন্ধবতীকে কি সত্যিই দেখেছেন শ্রেষ্ঠী? না হলে অলঙ্কারের কথা, তার কথা জানবেন কীভাবে? নিশ্চয়ই খবর এসেছে। হায়রে! কোথায় হাত দিয়েছে সে? এখন কীভাবে রক্ষা পাবে?

মহাপার্শ্ব বলল, শ্রেষ্ঠীর মন যেমন চায় তেমন কাজ করুন।

কী চায় বুঝব কীভাবে?

হে হে করে হাসল মহাপার্শ্ব, ঔষধ ওইটাই, ভোগ দিন প্রভুকে, আপনার কি মেয়েমানুষের অভাব!

কী জানি! উদ্ধব চিন্তিত মনে ঘোড়ায় উঠতে যাবে তো তাকে ধরল বীট, দাঁড়ান, কিছু অর্থ দিয়ে যান সত্রিমশায়।

অর্থ, কেন?

অর্থাভাবে আছি যে, খরিদ্দার নেই, পথে পথে ঘুরছি, মিলছে না উপযুক্ত লোক, আপনাকে তো পরামর্শ দিলাম বটে।

উদ্ধব কঠিন চোখে তাকায়, বলল, আমি যাচ্ছি শ্রেষ্ঠীর কাছে, বিব্রত করো না, যা বলেছি তা সত্য নয়, শ্রেষ্ঠী কি এমন মানুষ! তাঁর আছেন প্রধানা গণিকা দেবদত্তা, তুমি তাঁর নামে কুকথা বলো কোন সাহসে হে, গন্ধবতীকে আমি বিবাহ করব।

এক পা পিছিয়ে গেল মহাপার্শ্ব। ছলই বটে উদ্ধবনারায়ণ। ছল না হলে রাজসত্রি হতে পারে? সত্যিই তো তার সাহস যে সীমাহীন, রাজসত্রির কাছে অর্থ দাবী করে? তাঁরই তো অর্থ পাওয়ার কথা মহাপার্শ্বর কাছ থেকে। কে না অর্থ যোগান দেয় সত্রিকে? না দিলে সমূহ বিপদ! দুটি হাত জোড় করল মহাপার্শ্ব, ঠিক আছে প্রভু আপনি যান, আসলে বড় অভাব যাচ্ছে তো, অভাবে মাথা ঠিক থাকছে না, যা বলেছি ভুল বলেছি প্রভু, ভুলে যাবেন সব।

উদ্ধব ঘোড়া ছুটিয়ে নিয়ে চলে গেল। মহাপার্শ্ব দাঁড়িয়ে থাকল কিছু সময়। তারপর মাটিতে আচমকা পদাঘাত করে বিপরীত দিকে চলতে আরম্ভ করল। আজ উদ্ধবের দিন যে খারাপ এটুকু তো জানা গেছে।

বিনাশ্রমে চতুরিকার দেহটি দখল করে রাখবে সে? আজ শ্রেষ্ঠীর কাছে হাল খারাপ হবে সত্রির। নিশ্চয়ই হবে। শ্রেষ্ঠী যেমন রেগে আছেন। নির্বোধ উদ্ধব। যা শ্রেষ্ঠীর গৃহে। থুহ্! থুতু ফেলতে ফেলতে বীট হাঁটতে লাগল। বীটকে ঠকালে কারোর রেহাই নেই। মহাকালই যা করার করবেন। শোনা যায় দেবতার রোষে গন্ধর্বদের মানবজন্ম বীট হয়ে। এই জন্মের পর আবার সে রূপবান গন্ধর্ব হয়ে যাবে। কত রূপবতী নারী তার সঙ্গিনী হবে। অপ্সরাদের নিঃশ্বাস গায়ে মেখে বসে থাকবে সর্বক্ষণ। গান গেয়ে গেয়ে অন্তরীক্ষে ভেসে বেড়াবে। আমার চেয়ে সুন্দর আর কেউ নেই মর্ত্যে, অমর্ত্যে। বীট মহাপার্শ্ব হাঁটতে হাঁটতে ঝুঁকে পড়তে লাগল। খিদের জ্বালা খুব। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। একটি নিমগাছের গায়ে ঠেস দিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ে ঝাপসা চোখে রাজপথে চেয়ে থাকল।

উনত্রিশ

উজ্জয়িনী ফেরার পথটি তো কম নয়। যেন যেতে যত যোজন, ফিরতে তার চেয়ে অনেক অনেক যোজন বেশি। শরীরে ক্লান্তি ছিল, ছিল মনেও ক্লান্তি। দুর্ভাবনা কিছুটা কমেছিল অলঙ্কারগুলি শ্রেষ্ঠীকে হস্তান্তরের পর। কিন্তু মন যে নিঃস্ব হয়ে গেছে তা হাটতে হাঁটতে টের পেয়েছিল প্রৌঢ়। ভেবে এসেছিল একরকম, হলো অন্যরকম। কিছু তো সেভাবে বলতেই পারেনি। অভিযোগের সমস্তটাই রয়ে গেছে মনের ভিতরে। ভেবেছিল শ্রেষ্ঠীকে বলবে কার্তিককুমারের কথা। যুদ্ধ থেকে না ফেরা সৈনিকের পুত্রীকে রক্ষা করার দায় তো রাজারই। রাজকর্মচারী তাকে অপহরণ করতে চায়, এর কি কোনো প্রতিবিধান নেই অবন্তী দেশে? তার পুত্রটি যে অবন্তী দেশের জন্য যুদ্ধে গিয়ে নিরুদ্দিষ্ট, এই কথা রাজার কানে কি পৌঁছেছে? খোঁজ হবে না কার্তিককুমারের?

বলতে পারেনি বেশির ভাগটাই। অলঙ্কার দেখে শ্রেষ্ঠী এমন আগুন হয়ে উঠলেন। ফিরতে ফিরতে শিবনাথ সত্যিই যেন ভেঙে পড়তে লাগল। মনে পড়ে যাচ্ছিল শ্রেষ্ঠীর দাস উতঙ্কের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে 'প্রভু' সম্বোধন। ধ্রুবের বয়স্য সুভগ দত্তকে 'প্রভু' ডেকে অভিবাদন। এ জীবনে এমন কখনো হয়নি। মন ভেঙে গেছে। যদি থাকত কার্তিককুমার, যদি থাকত ধ্রুবপুত্র, এমন দুর্বিষহ কি হতো এ জীবন? হায়! সে ধনবান না হতে পারে, জীবন তো পূর্ণই ছিল। আজ জীবনের সব পূর্ণতা হারিয়ে নিঃস্ব পিতামহ ফিরছে, তা কি জানে গন্ধবতী? এমন নিঃস্বতা এ জীবনে আর কখনো অনুভব করেনি প্রৌঢ়।

শিপ্রাতীরে মঙ্গলনাথের মন্দিরের কাছে পৌঁছে থেমেছিল সে। সূর্যদেব তখন গগনমন্ডলের পশ্চিমে ঢলেছেন মাত্র। তাঁর তেজ, দীপ্তি অতীব প্রখর। রৌদ্রে যেন সর্ব অঙ্গ ভস্ম হয়ে যাবে, এমনই ছিল সেই সূর্যের রোষ! সে বসেছিল নদীতীরে। দেহটি ছেড়ে দিয়েছিল পিপুল গাছের ছায়ায়। দু' চোখে তখন শুধুই শূন্যভাব। উরু, হাঁটু ভেঙে তার ভিতরে মুখখানি রেখে চেয়েছিল নদীর শূন্যতায়। জলের চিহ্ন অনেক দূরে। শুধু বালি আর বালি। সকালে দেখেছিল গ্রামবধূরা বালি খুঁড়ে জল সংগ্রহ করছে এখন তারা কেউ নেই। রোদে পুড়ছে নদীর বুক। দেখে মন হু হু করে উঠেছিল। অবন্তী দেশ নিঃস্ব হয়ে গেছে। কার্তিককুমার নেই, নেই ধ্রুবপুত্র। মেঘ নেই, ফসল নেই, মানুষের মনে ভালবাসা নেই, চোখে মায়া নেই আছে শুধু আগুন। শ্রেষ্ঠী কেমন জ্বলে উঠলেন অলঙ্কারগুলি দেখে! শিবনাথের চোখে জল এসে গেল। সে বীর কার্তিককুমারের পিতা। ধ্রুবপুত্রকেও পালন করেছে সে। সমস্তজীবন কঠোর পরিশ্রম করেছে। নিজ হাতে ফসল কেটেছে। নিজ হাতে ফসল রোপণ করেছে, বীজ বুনেছে। কোনোদিন কারো দুয়ারে দাঁড়ায়নি দু' মুঠি অন্নের জন্যও। সেই কিনা 'প্রভু উতঙ্ক' বলে সম্বোধন করল শ্রেষ্ঠীর দাসটিকে। দাসী কিনা তাকে প্রহার করল প্রায়। ধ্রুবের বয়স্যর কাছে মাথা নামাতে হলো 'প্রভু' ডেকে। কাঁদছিল শিবনাথ। হু হু কান্নায় বুক ভিজে যাচ্ছিল প্রৌঢ়ের। কতদিনের কান্না যে জমা হয়ে আছে তার বুকের ভিতরে। এই অশ্রুপাত তো গৃহে সম্ভব নয়। সেখানে সে যেন বটবৃক্ষের ছায়ায় ঢেকে রেখেছে পুত্রবধূ আর পৌত্রীকে। রেবা তো কাঁদেই গোপনে। তা কি সে বোঝে না? গন্ধবতীও কাঁদে নিঃশব্দে, আড়ালে, গম্ভীরার শরবনে গিয়ে এ খবর কি তার অজানা? অজানা ছিল তার নিজের কান্নার খবর। শিবনাথ জানতই না সে কত কান্না ধরে রেখেছে গোপনে। মানতই না কান্না আছে অকালপ্রয়াত ধ্রুবসখার জন্য, হারিয়ে যাওয়া পুত্রের জন্য, নির্বাসিত ধ্রুবপুত্রের জন্য, ফসলহীন জমির জন্য, জলশূন্য শিপ্রানদীর জন্য, পুড়ে যাওয়া মাটি, আকাশ, পৃথিবীর জন্য, কুয়োর জলের জন্য, বসন্তের ফুলের জন্য, বাতাসে ভেসে

বেড়াত যে ফুলের গন্ধ তার জন্য, হারিয়ে যাওয়া ভ্রমর, মৌমাছির জন্য, বহুদিন না দেখা মেঘের জন্য, দুর্বৃত্ত উদ্ধবনারায়ণের বাসনার জন্য।

সব শ্রীহীন হয়ে গেছে। অবন্তী দেশ আজ রূপহীন। শিবনাথের দু'চোখ দিয়ে নিঃশব্দে জল ঝরে যেতেই থাকে। ধ্রুবপুত্রের কথা মনে পড়ে যায়। কার্তিককুমারের কথা মনে পড়ে যায়। এ জীবন যে এমন হয়ে যাবে কে জানত? শ্রেষ্ঠীর দাসকে প্রভু সম্বোধন করতে হবে। নদীতীরে বসে একা কেঁদেই যাচ্ছিল। কতক্ষণ বসেছিল এইভাবে তা তার খেয়াল ছিল না। এর মধ্যে কি ছায়া বড় হয়েছে পূর্বদিকে? সূর্যদেব পশ্চিমে আরো নেমে গেছেন? কে জানে? তার পিঠে হাত পড়তেই সে চমকে উঠেছে, কে এল? সেই উতঙ্ক? নাকি উদ্ধব? উদ্ধব কি আবার চলেছে গন্ধবতীর উদ্দেশে? ফিরতেই দেখল দশার্ণ দেশীয় সেই যুবক।

তাম্রধ্বজ বিষণ্ণ হয়েছে শিবনাথকে কাঁদতে দেখে, জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?

আপনি?

এই তো আচার্যের আশ্রম, সন্নিকটে, এই নদীঘাটেই না একদিন দেখা হয়েছিল আপনার সঙ্গে, মনে নেই?

শিবনাথ চুপ করে থাকল। অনেকদিন তাম্রধ্বজ গম্ভীরা যায়নি। তার গণনা কি শেষ হলো? মাঘের শেষের পর ফাল্গুন গেল, চৈত্রও ফুরিয়ে এল প্রায়। সম্পূর্ণ জানা গেছে কি কারা কোথায় আছে?

তাম্রধ্বজ বলল, গন্ধবতী এবং মা রেবার কুশল তো?

শিবনাথ ভেবেছিল উদ্ধবের কথা বলবে কিনা। তাম্রধ্বজের কী ক্ষমতা যে রাজকর্মচারীকে নিবৃত্ত করবে? আর এসব তো বহুজনকে জানানোর কথা নয়। সে জবাব দিল না।

তাম্রধ্বজ বলল, আমি যাব যাব ভাবছিলাম।

খুঁজে পেয়েছেন তাদের?

তাম্রধ্বজ বলল, আপনি কি ফিরবেন?

ফিরছি।

চলুন, আজ না গেলে হবে না, আপনি কাঁদছিলেন কেন?

শিবনাথ বিষণ্ণ মুখে হাসল, তারা তো কেউ ফিরল না।

দশার্ণ দেশীয় জ্যোতির্বিদকে নিয়ে ফিরে আসছিল শিবনাথ। তাম্রধ্বজকে পেয়ে একটু নিশ্চিন্তও হয়েছে যেন। হোক সে জ্যোতির্বিদ, অনাত্মীয়, স্বল্প পরিচিত এবং ভিনদেশী, তবু তো সে যুবক। উদ্ধবনারায়ণ তার সামনে একটু সামলে নেবে নিজেকে। তাম্রধ্বজ খুব স্বাস্থ্যবান পুরুষ নয় বটে, শিবনাথ ঘাড় বেঁকিয়ে দেখল, কিন্তু বলহীন বলে তো মনে হয় না। গায়ের উত্তরীয় সম্পূর্ণ আবৃত করে নেই তার ঊর্ধ্বাঙ্গ, প্রথম দর্শনে শীর্ণকায় মনে হলেও ভাল করে দেখলে বোঝা যায় শক্তপোক্ত দেহ। পেশীগুলি প্রকট না হলেও, নবীনতা আছে তার আভাসে। তাম্রধ্বজ যতটা কৃষ্ণকায় বলে ধারণা ছিল শিবনাথের, এখন তা মনে হচ্ছে না। তামাটে বর্ণের পুরুষ। পুরুষ কৃষ্ণবর্ণের হোক, আর গৌরবর্ণের হোক, কী যায় আসে? তার স্বাস্থ্য, শৌর্য, তার জ্ঞানই তাকে বিশিষ্ট করে তোলে। নিষাদের মতো কুঞ্চিত কেশ কত ঘন। চক্ষু দুটি কেমন উজ্জ্বল। আহা এ কে? মহাকাল একেবারে অনাথ করেন না কাউকে। কার্তিককুমার, ধ্রুবপুত্র কেউ নেই, কিন্তু এই যুবক তো আছে। এই যুবক ক্রমশ তাদের সহায় হয়ে উঠছে যেন। শিবনাথ ভাবছিল উদ্ধবের কথাটা প্রকাশ করবে কিনা। আচার্য বৃষভানু কি বলতে পারেন না রাজাকে? তাম্রধ্বজ কি পারে না? রাজা কি আসেন না বৃষভানুর আশ্রমে?

শিবনাথ বলল, সকালে গিয়েছিলাম উজ্জয়িনী, এই ফিরছি।

সে কী! আপনার খাওয়া হয়েছে কি?

সূর্যাস্তের আগেই পৌঁছে যাব গম্ভীরা।

তাম্রধ্বজ বলল, আশ্রম থেকে অনেকটা চলে এসেছি, ইস, আমিই ভুল করেছি, সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করতে পারতাম, আপনি কাঁদছিলেন কেন?

শিবনাথ মৃদু গলায় বলল, একা হলে মানুষ কাঁদে না?

তা কেন হবে, মানুষ নিবিষ্ট হয়।

যার কান্না থাকে বুকের ভিতরে?

আমি তো সেই কথাই জিজ্ঞেস করছি, আচ্ছা থাক, আপনি ক্ষুধার্ত অথচ আমি তা জানতে পারলাম না, খুবই অন্যায় হয়েছে এটি, না জানতে পারা আমার অক্ষমতা মশায়। মাথা ঝাঁকাতে লাগল তাম্রধ্বজ, ছি, ছি, আমি নিরুদ্দিষ্ট গ্রহ তারার কথা জানতে চাই, মানুষের ক্ষুধা, তৃষ্ণা অনুধাবন করতে পারি না।

শিবনাথ আবেগাকুল হয়ে ওঠে তাম্রধ্বজের কথায়। তারা পথের ধারে একটি আমগাছের নীচে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। গাছটিতে মুকুল ধরেছিল, কিন্তু ঝরে পড়ে গেছে ধুলোয়। শিবনাথ তা দেখতে দেখতে তাম্রধ্বজের হাত চেপে ধরল, এমন কথা কেউ বলেনা। চারধারে সব দুর্বৃত্ত, আমার অভ্যাস আছে, গৃহে ফিরে যা পারি খেয়ে নেব, আর উজ্জয়িনী থেকে ফেরার সময়ে একটি গৃহদ্বারে দাঁড়িয়েছিলাম জলের জন্য, কে জানে কেন একবাটি পরমান্ন দিল আমাকে।

কথাটা সত্য বলল না শিবনাথ। কিন্তু অসত্য না বললে তো এই তাম্রধ্বজ শান্ত হবে না। মনে মনে পীড়িত হতেই থাকবে। অথচ তাম্রধ্বজ যেভাবে তাকিয়ে আছে তাতে তার মনে যে সন্দেহ জেগেছে, তা বোঝা যায়। শিবনাথ প্রসঙ্গ বদলে নিতে চায়, বলল, আপনি কি এই পথে কোনো অশ্বারোহীকে যেতে দেখেছেন?

কখন?

সকাল থেকে এখন পর্যন্ত।

কার যাওয়ার কথা?

কথা নেই কোনো, মশায় সত্য বলি, রাজসত্রিকে চেনেন?

রাজসত্রিকে কে না চেনে? আর সে তো এই পথেই বিচিত্র বেশে গম্ভীরার দিকে চলে যায় ক্ষুদ্র ঘোড়াটিতে চেপে, ফিরেও আসে। অবাক লাগে লোকটাকে দেখলে। মাঝেমধ্যে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়ও থাকে মনে হয়। তাম্রধ্বজ কোনোদিন তার কাছাকাছি যায়নি। যেতে প্রবৃত্তি হয়নি তার।

তার কি যাওয়ার কথা ছিল? আবার জিজ্ঞেস করে তাম্রধ্বজ।

না, না, গেছে কিনা জিজ্ঞেস করছি। শিবনাথ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। আসলে এই প্রসঙ্গ অবতারণার ঔচিত্য বোধ নিয়ে তার ভিতরে সংশয় তৈরি হয়ে যাচ্ছে। তাম্রধ্বজও অতি সুভদ্র। কিছুটা আন্দাজ করে সেও কোনো কৌতূহল প্রকাশ করে না। যদি ইনি তার উপর নির্ভর করেন, তবে নিজে থেকেই সমস্ত কথা বলবেন, তেমন কিছু বলার থাকলে। কৌতূহল প্রকাশে এঁকে বিব্রত করা হবে শুধু শুধু।

হাঁটতে হাঁটতে অবসন্ন হয়ে পড়ছিল শিবনাথ। এই বয়সেও শরীর যে যথেষ্ট পোক্ত তা ধরা যাচ্ছে, কিন্তু ক্ষুধার ঘুম ভাঙছে ভিতরে ভিতরে। এর হাত থেকে রেহাই পেতে একে ভুলতে হবে। না ভুললে ক্ষুধা তাকে যাতনা দেবে। অধিকার করে নিয়ে নিশ্চল করে দেবে। শিবনাথ মৃদুস্বরে বলল, শুনেছি সূর্যই মেঘের স্রষ্টা, মেঘ জলপূর্ণ করে ধরিত্রী; সূর্য আবার সেই জল শোষণ করে জলহীন করে দেয় জগৎ সংসার।

এইই তো সত্য।

যে জল গ্রহণ করেছেন সূর্যদেব, তা মেঘ হয়ে অবন্তীর আকাশে তো আসবে?

আসাই তো স্বাভাবিক।

স্বাভাবিক ঘটনা তো ঘটছে না, যা ঘটছে তা ঘটার কথা নয়।

জানি। তাম্রধ্বজ ফিসফিস করল, উজ্জয়িনীর সিংহাসনে নাকি দাগ পড়েছে?

সত্য? শুনেছি একথা।

অস্বাভাবিক ঘটনার তো সত্য হতে বাধা নেই।

শিবনাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, দেশ যদি অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে, আকাশে মেঘ এলেও বৃষ্টি হয় না, বজ্রপাত হবে, গর্জন শোনা যাবে মেঘের, কিন্তু রাজার অবর্তমানে বৃষ্টি নামবে না আকাশ থেকে।

কে বলেছে?

শুনেছি আমি, আর মনেও হয় এসব যেন সত্য, রাজা যদি সিংহাসনের মর্যাদা না রাখেন, রাজা যদি না থাকেন রাজার মতো, মানীর মান থাকে না, ভৃত্যকে তখন প্রভু সম্ভাষণ করতে হয়, নবীনের কাছে প্রবীণ হেয় হয়।

তাম্রধ্বজ তাকায়, কী হয়েছে আপনার? কেন গিয়েছিলেন নগরে?

শিবনাথ বলে, রাজা না থাকলে মানুষের মনে আনন্দ থাকে না, উদ্যানে ফুল থাকে না, বসন্তে কোকিল ডাকে না, ভ্রমর দেখা যায় না ফুলে ফুলে।

হতে পারে তা, কিন্তু রাজা তো আছেন এদেশে।

রাজা থাকলে কি রাজকর্মচারী..। শিবনাথ থেমে যায়। তার চোখে তাম্রধ্বজের চোখ। তাম্রধ্বজ যেন টের পেয়ে গেছে কী বলতে চায় শিবনাথ। রাজকর্মচারী মানে সেই উদ্ধব। উদ্ধবের কথাই তো জিজ্ঞেস করছিল গন্ধবতীর পিতামহ। কী করেছে সে?

শিবনাথ বলল, রাজকর্মচারী স্বাধীন হয়ে যায়, অত্যাচার শুরু করে।

সে তো রাজা থাকলেও হয়।

হলে প্রতিবিধান চাওয়া যায়।

এখন কি তা হয় না, আপনি যাবেন রাজা ভর্তৃহরির কাছে?

শিবনাথের চোখে আবার জল এসে গেল। মনে পড়ে গেল প্রভু উতঙ্কের সামনে হাঁটুমুড়ে বসে এক প্রৌঢ়। প্রভু সুভগ দত্তের সামনে মাথা নত করে এক প্রৌঢ়। এরপর হয়ত উদ্ধবের পা ধরতে হবে তাকে। দেশে রাজা থাকলে এমন হতো না। রাজা না থাকলে মানুষ এমন অসহায় হয়ে যায়। রাজা যদি থাকে এদেশে ধ্রুবপুত্র কেন নির্বাসিত হবে উজ্জয়িনী থেকে? কার্তিককুমারের কেন খোঁজ হবে না?

তাম্রধ্বজ আবার জিজ্ঞেস করে কী হয়েছে?

শিবনাথ বিড়বিড় করে, রাজা না থাকলে নদী জলহীন হয়, কূপ জলহীন হয়, আকাশ জলহীন হয় হৃদয় অনার্দ্র হয়, উদ্ধবকে আমিই পাঠিয়েছিলাম নগরে, শ্রেষ্ঠীর শরণাপন্ন হতে আমিই পরামর্শ দিয়েছিলাম একদিন।

তাম্রধ্বজ দুটি হাত বাড়িয়ে প্রৌঢ়ের দুই স্কন্ধ স্পর্শ করল, গর্জন করে ওঠে, কী হয়েছিল বলুন, বলুন আমাকে।

আপনি জানেন না, জলহীন নদী, তৃণহীন অরণ্য, মেষহীন মেষপালক, আলোহীন দুটি চক্ষু—এসবই দেখা যায় রাজার অবর্তমানে, শুনুন জ্যোতির্বিদ, আপনি ধ্রুবপুত্রর সন্ধান দিন আমাকে, না হলে গন্ধবতী মা-র সব্বোনাশ হয়ে যাবে।

তিরিশ

গম্ভীরায় প্রবেশ করে তাম্রধ্বজ বলল, আমি নদী থেকে ঘুরে আসি, আপনি একা গৃহে ফিরুন, যা জেনেছি তা আমি বলব না গন্ধবতী বা রেবা মাকে, ওঁরা কষ্ট পাবেন।

শিবনাথ মুগ্ধ হলো। যুবকটি বড় বিবেচক। সত্যিই তো, ওরা যদি জানতে পারে শিবনাথকে শ্রেষ্ঠীর পোষাভৃত্যের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে প্রভু সম্বোধন করতে হয়েছে, নিঃশব্দ কান্নায় ভেসে যাবে রাত্রি। ওরা যদি টের পায় উদ্ধবের অনাচারের কথা জেনেছে তাম্রধ্বজ, তাতেও দুঃখ পাবে। নিজেদের অপমানের কথা কে জানাতে চায় কাকে? বলার পর কীভাবে নিষেধ করবে তাম্রধ্বজকে তা ভেবে উঠতে পারছিল না শিবনাথ। মনে হচ্ছিল কথাগুলো না বললেই হতো। কিন্তু না বলেই বা সে পারে কী করে? নিজের কথা কাউকে না কাউকে তো বলতে হয়। অসহায় মানুষ কারোর না কারোর সাহায্য তো নেয়ই। তাম্রধ্বজের সাহায্য দরকার এখন।

তাম্রধ্বজেরে সাহায্য প্রয়োজন, কেন না সে যুবক। বয়সই তার শক্তি। তাম্রধ্বজ জ্ঞানী। জ্ঞানই তার শৌর্য। উদ্ধবনারায়ণও যুবক, কিন্তু জ্ঞানী নয়। উদ্ধবনারায়ণ রাজকর্মচারী। তার শক্তি হলো রাজার শক্তি। রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে জ্ঞানীরাই। একথা বলত ধ্রুবপুত্র।

তাম্রধ্বজ একা গেল নদীর দিকে। এই গ্রামে সে যতবার এসেছে, নদীটিকে দেখে গেছে। নদী হলো মায়ের মতো, তেমনই মনে হয় তাম্রধ্বজের। তার মা বেঁচে নেই। অনেকদিন আগে বেত্রবতীর ধারের শ্মশানে দাহনের পর জলে দেহভস্ম ভাসিয়ে দেওয়ার সময়, মনে হয়েছিল সমস্ত নদীর জলই যেন মায়ের চোখ। চেয়ে আছে মা। শিপ্রা, গন্ধবতী, রেবা, বেত্রবতী আর গম্ভীরা বা বিদিশার সন্নিকটে নীচৈঃ পাহাড়ের কাছ দিয়ে বয়ে যাওয়া বননদীটি—সর্বত্র যেন সে তার মায়ের সজল চোখ দুটি দ্যাখে। দুটি

চোখ মিলেমিশে নদীর মতো ব্যাপ্ত হয়ে গেছে বোধহয়।

তাম্রধ্বজ ভেবে রেখেছিল আর আসবে না গম্ভীরায়। সেই মাঘের সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে, শীতের বাতাসে উথলে ওঠা দুধের গন্ধ ভাসছে আঙিনায়, গন্ধবতীর মুখখানিতে ধ্রুবনক্ষত্রের আলো, সে তাকে শুনিয়েছিল আকাশে যত মেঘ আসে সব মেঘের পরিচয়। সব মিলেমিশে যে কী হয়ে গিয়েছিল। গণনা তার শেষ হয়নি। গণনা শেষ হবে কী করে, যাঁকে নির্ভর করে সে কথা দিয়েছিল সেই আচার্য বৃষভানুই তো কেমন জবুথুবু হয়ে যাচ্ছেন। গতরাতে আকাশে তাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সন্ধ্যাবেলাতেই। যারা নিরুদ্দিষ্ট, তারা যদি বেঁচে থাকে, জীবনের টানেই ফিরে আসবে প্রিয়জনের কাছে। এই সত্য তাম্রধ্বজ জানে। অগস্ত্য নক্ষত্র যেমন ফেরে ফাল্গুনের আকাশে তেমনি ফিরবে। অগস্ত্য নক্ষত্র যেমন জ্যৈষ্ঠে আকাশ থেকে অন্তর্হিত হয়, তেমনি হয়ত অদৃশ্য হয়ে আছে ধ্রুবপুত্র।

গম্ভীরার তীরের শরবন এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন। আকাশ খা খা করছে। কত পাখি না ওড়ে আকাশে, একটিও নেই। বহু উঁচুতে চক্রাকারে ঘুরছে গৃধিনীর দল। ওই যে জল জল করে আকাশ ভেদ করে গেল চাতক। কোথায় চকোর, চকোরী? তাম্রধ্বজ পাখি খুঁজে বেড়াচ্ছিল আকাশে। পাখি আর মেঘ। মেঘও তো পাখি, তবে ও পাখির ডানা নেই। ডানা নেই তবু উড়ে যায়। তাম্রধ্বজ দেখছিল নদীর বুক শুকনো। বালি উড়ছে হু হু বাতাসে। নদীর এই ধারে তিরতিরে স্রোত। কতটুকু আর জল! সে তাকিয়েছিল নদীর বুকে। মায়ের চোখটি এখানেও ঘুমিয়ে আছে। তাম্রধ্বজের নিজের চোখ ছলছল করে ওঠে।

বেলা পড়ে এল। তাম্রধ্বজ ফিরবে এবার গন্ধবতীর আঙিনায়। কেন যে ঘুরে ঘুরে গন্ধবতীর নামটি মনের ভিতরে উচ্চারিত হচ্ছে! তাম্রধ্বজ ধীরে ধীরে ফিরছিল। নদীতীরে, পথের উপরে যখন সন্ধ্যা নেমে আসে হৃদয় দিশাহারা হয়। তা সে নদী বেত্রবতী হোক, শিপ্রা বা গম্ভীরা হোক। আচার্য বলেন, উত্তর ভূম্যর্ধ হোক আর দক্ষিণ ভূম্যর্ধ হোক, সূর্য অস্ত গেলে দিন প্রবেশ করে রাত্রির ভিতরে। আর সূর্যোদয় হলে রাত্রি জলমধ্যে আবিষ্ট হয়। রাত্রি জলের ভিতরে ডুবে যায় বলে দিনমানে জল রাত্রির বর্ণ ধারণ করে, তাম্রভাব থাকে তাতে, অথবা নীলবরণ। আর রাত্রিমধ্যে দিন প্রবেশ করে বলে রাত্রিকালে জল শাদা ভাস্বরাকারে দেখায়। আচার্য কি জানেন যদি পৃথিবী জলশূন্য হয়ে যায় তবে দিনমানে রাত্রি কোথায় যায়? আর রাত্রিকালেই বা দিন যায় কোথায়?

তাম্রধ্বজের জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল মা-মেয়ে। শিবনাথ বিশ্রাম নিচ্ছেন দাওয়ায়। সমস্তদিন হেঁটে এখন শরীর ছেড়ে দিয়েছে। ক্লান্তিতে দু'চোখ বুঁজে এসেছে গন্ধবতীর পিতামহর। মা-মেয়ে জানত না তাম্রধ্বজ এসেছে গম্ভীরায়। শিবনাথ কিছুই বলেনি তাদের। তবু তারা যেন তাম্রধ্বজের জন্যই অপেক্ষা করছিল। আজ যেন তার আসার কথা।

রেবা বলল, এস, কষ্ট হলো খুব।

না মা, এই তো পথ, কতটা আর।

রেবা অবাক হয়ে গোধূলি আলোয় দাঁড়ানো মধ্যম উচ্চতার যুবকটিকে দেখছে। দেখে তো মনেই হয় পৌরুষ ছেয়ে আছে দশার্ণ দেশীয় এই যুবকটিকে। আজ এর কথাই মনে পড়ছিল সমস্তদিন। বিপদের দিনে যার কথা মনে পড়ে, তাকেই যেন নির্ভর করে মানুষ। রেবা দেখল গন্ধবতী জলচৌকি এনে দিল। ঘটিভরা জল দিল। এই জল গম্ভীরার বালি খুঁড়ে আনা। তাম্রধ্বজ বসল। জলের ঘটি তুলে একঢোক জল খেয়ে বলল, অনেকদিন তো আসিনি, আজ হঠাৎ মনে পড়ল।

আমরাও তোমার কথা ভাবছিলাম। রেবা বলল।

গন্ধবতী নিশ্চুপ। সে তার জিজ্ঞাসাগুলি মনের ভিতরে সাজিয়ে নিচ্ছিল। আজই জেনে নিতে হবে ধ্রুবপুত্রর খবর দিতে পারবে কিনা তাম্রধ্বজ। নাহলে অন্য কোথাও যেতে হবে। কোথায় এক নেড়ি সন্ন্যাসিনী, যোগিনী এসেছে নাকি, ভূত ভবিষ্যৎ সব তার কাছে জলের মতো—সেখানে যেতে হবে মাকে নিয়ে।

গন্ধবতী বলল, আপনার কাজটা কি আপনি ভুলে গেলেন?

না। স্মিত হাসল তাম্রধ্বজ। পরিপূর্ণ চোখে তাকায় গন্ধবতীর দিকে। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। সেই চুড়ো ঘিরে বনফুলের মালা। গন্ধবতীর গলায়ও সেই মালা। এর আগে কখনো ফুল-অলঙ্কার দ্যাখেনি

তাম্রধ্বজ গন্ধবতীর গায়ে। কাল এইসময় এসেছিল সেই দুর্বৃত্ত। আজ কার জন্য সেজেছে ধ্রুবপুত্রের অনুরাগিণী?

গন্ধবতী বলল, আপনি যে আসবেন তা জানতাম।

কে বলেছিল?

কেউ না।

তবে কী করে বুঝলে, তুমি কি গণনা জানো?

গন্ধবতী বলল, ধ্রুবপুত্র যে ঘর ছেড়ে চলে যাবে তাও আমি জানতাম।

সে কি বলেছিল?

না তার দুয়ার তো বন্ধ ছিল সমস্ত দিন, কামদেবের মন্দির থেকে ফিরলাম সে দুয়ার খোলেনি, আপনি জানেন না সেদিনের কথা?

আগের দিন কথাতো অসম্পূর্ণ ছিল।

হ্যাঁ তাই। গন্ধবতী অস্ফুট স্বরে বলল। তার মা এখন কাছে নেই। ওই যে বসে আছে দাওয়ার অন্য ধারে। প্রদীপ জ্বালছে চকমকি ঠুকে। গন্ধবতী যেন নিশ্চিন্ত হলো। কেন কে জানে? ধ্রুবপুত্রের অন্তর্ধানের কথা বলবে তাই? সে কথা তো মাও জানে। জানে কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারে না কেন চলে গেল ধ্রুবপুত্র পূর্ব দিগন্তের দিকে? এখনো চোখের সামনে দৃশ্যটি ভাসে। হেঁটে যাচ্ছে ধ্রুবপুত্র জ্যোৎস্নাময় নদীতীর ধরে। গন্ধবতী অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তার গমনপথে। যেন সে অন্য কাউকে দেখেছিল। অচেনা কেউ অবন্তী দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে আরো অচেনা কোনোখানে।

তাম্রধ্বজ বলল, ধ্রুবপুত্রের সব খবর যদি না জানি, কী করে গণনা সম্পূর্ণ করব?

গন্ধবতী বলল, সে কথা বলা যাবে, তার আগে পূর্বদিনের কথা শেষ হোক।

কোন কথা অসম্পূর্ণ ছিল?

মেঘের পরিচয়।

কোন পর্যন্ত বলেছিলাম?

হেমকূট পর্বত যেন কোথায়? গন্ধবতী জিজ্ঞেস করে।

তুমি মনে করো।

গন্ধবতী বলল, হিমালয়ের উত্তরে, সুমেরুর দক্ষিণে...।

তাম্রধ্বজ বলল, শীত ঋতুর বৃষ্টির কথা বলেছিলাম, শোনো গন্ধবতী মেঘের যে পরিচয় পেয়েছি তাইই সত্য, আমি এবার বৃষ্টির কথা বলি। দেশ অগ্নিময় হয়ে উঠেছে, কোথাও জলের চিহ্ন নেই প্রায়, এখন বৃষ্টির কথা না জানলে জীবন আরো শুকিয়ে যাবে।

গন্ধবতী অবাক হয়ে তাম্রধ্বজের মুখের দিকে চেয়ে আছে। চোখ দুটিতে আকাশের অচেনা দুই তারা দূরে প্রদীপ জ্বালিয়ে মা রেবা বসে আছে। রেবা শুনছে তাম্রধ্বজ আর গন্ধবতীর কথোপকথন। তাম্রধ্বজ বলছে, সূর্যই প্রকৃতপক্ষে বৃষ্টির স্রষ্টা, সূর্য থেকেই বর্ষণ, আর বাতাসে সেই বর্ষণের বিরতি। সূর্যের তাপ সমুদ্র, নদী, সরোবর থেকে জল আকর্ষণ করে। জল তখন ধোঁয়া হয়ে আকাশে ওঠে। তাতেই মেঘের উৎপত্তি।

গন্ধবতী বলল, জানি, কে না জানে।

মেঘের জল জগতের মঙ্গলের জন্য আকাশ থেকে নীচে নেমে আসে।

জানি, আপনি সূর্যের কথা বলুন, অগ্নির কথা।

মেঘের জন্য জল শোষণ করে অগ্নিই তো বৃষ্টির সূচনা করেন।

জানি, অগ্নির পরিচয় কী? গন্ধবতী জিজ্ঞেস করে।

তখন তাম্রধ্বজ অন্ধকারে তাকিয়ে থাকল। অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর এক সময় তাম্রধ্বজ বলতে থাকে সেই মহারাত্রির কথা। গভীর অন্ধকারে সর্বলোক তখন আচ্ছন্ন। সৃষ্টিকাল আরম্ভই হয়নি যে সময়, তখনই অগ্নির আত্মপ্রকাশ। আলো হয়ে এল আগুন। সেই অগ্নি পার্থিব অগ্নি। যে আগুন সূর্যে আছে সূর্যের তাপ যে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি হয়, সেই আগুন শুচি অগ্নি। এই অগ্নিই বৈদ্যুৎঅগ্নি। অগ্নি সবসময় জলগর্ভ। যে আগুনে অবন্তী দেশ পুড়ছে, সেই আগুনও জলগর্ভ।

গন্ধবতী বলল, জলগর্ভই যদি হবে আগুনে এত কষ্ট কেন, জল তো শীতল।

তাম্রধ্বজ বলল, তাহলে শোনো অগ্নির আসল রূপ কী, অগ্নি সহস্রপাদ, কুম্ভের মতো বৃত্তাকার। অগ্নির শতসহস্র রশ্মি। সেই রশ্মি দিয়ে চারদিক থেকে, সমুদ্র, নদী, সরোবর, কূপ, গাছ-গাছালি, প্রাণ—সমস্ত কিছু থেকেই জল শুষে নেয়, যত জল গ্রহণ করে অগ্নি, তার শত শত গুণ গ্রহণের ক্ষমতা ধারণ করে সে—জলগর্ভ কেন বুঝলে?

রেবা অবাক। এ কার কথা শুনছে? গন্ধবতী কার সঙ্গে আলাপে বসেছে? এমন দৃশ্য তো তার চেনা। খুব চেনা। রেবা অন্ধকারে তাকিয়ে নিজের বিভ্রম-দূর করতে চায়। এসে গেছে নাকি ধ্রুবপুত্র? ধ্রুবপুত্রের সঙ্গে গন্ধবতীর এই আলাপ কত কালের। কত জন্মেরও বা। হায় ধ্রুবপুত্র। সবই ভুলে গেলি তুই।

গন্ধবতী বলল, তারপর? কথা তো শেষ হয়নি।

তাম্রধ্বজ বলল, সূর্য হিরণ্ময়। সূর্যের জন্যই জগতের যত উষ্ণতা, যত শৈত্য, যত বর্ষণ। সূর্য তার কিরণ দিয়ে পৃথিবীকে তাপিত করে, শীতার্ত করে, বর্ষণে প্লাবিত করে। সূর্য কিরণের সংখ্যা সহস্র, অগ্নি তাই সহস্রপাদ।

গন্ধবতী মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছে তাম্রধ্বজের দিকে। তার দৃষ্টি শূন্য হয়ে গেছে। সে যেন অনুভব করছে এই পৃথিবীতে কোনো কিছু ফুরানোর নয়। এমনই কথা তো শোনা যেত ধ্রুবপুত্রের মুখে। কী আশ্চর্য, এসব কথা ধ্রুবপুত্রই তো জানে। এই মানুষটা জানল কীভাবে?

তাম্রধ্বজ বলল, শোনো গন্ধবতী কথা এখনো শেষ হয়নি।

গন্ধবতী মনে মনে বলল, কথা শেষ হওয়ার কথা নয় সখা।

তাম্রধ্বজ বলল, সূর্য, অগ্নি, মেঘ, জল, এই ভূমন্ডলের মতোই ব্যাপ্ত, এদের সম্বন্ধে একদিনে দুইদিনে সব জানা যায় না, সমস্ত জীবন ধরে সূর্য, অগ্নি এবং মেঘের কথা বললেও তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তবু বলি, সূর্যের সহস্রকিরণের মধ্যে হিমবর্ষী কিরণ তিনশ, এই কিরণগুলি পীতাভ, এদের প্রসিদ্ধি মেধ্য, বাহ্য, হ্লাদন, চন্দ্র এইসব নামে। আবার শুক্ল বর্ণের যে তিনশ কিরণ বর্ষণ করেন সূর্য তা থেকেই উত্তপ্ত হয় জগৎ। উষ্ণতা সঞ্চারী এইসব কিরণ বিশ্বভৃত, ককুভ, শুক্ল—ইত্যাদি নামে খ্যাত। শুক্লবর্ণের এই কিরণ দিয়ে সূর্য পিতৃলোক, দেবলোক এবং মনুষ্যলোককে লালন করেন। সূর্যকিরণ পিতৃলোকে জল বর্ষণে তাঁদের তৃষ্ণা নিবারণ করে যেমন, দেবলোকে অমৃত দান করে, আর মনুষ্যলোকে ওষধি, এইভাবে তাপিত হয় সর্বলোক।

গন্ধবতী মনে মনে বলল, এত জান সখা তুমি, তোমার কথাও তো ফুরোবে না সমস্ত জীবনে, যেমন ফুরোয় না মেঘ আর অগ্নি আর সূর্যের পরিচয়।

তাম্রধ্বজ বলল, আরো আছে গন্ধবতী, এবার বলি বর্ষার কথা, চারশ বিচিত্র বর্ণের কিরণ দিয়ে সূর্য পৃথিবীকে প্লাবিত করেন বর্ষণে। বর্ষণকারী সেই সমস্ত সূর্যকিরণের নাম বন্দন, বন্দ্য, ঋতশ, নূতন, অমৃত এইসব।

গন্ধবতী বলল, সেইসব কিরণ কোথায় বন্দন, ঋতশ...?

তা যদি জানা যেত অবন্তী, দশার্ণ, দেশ কি তাপিতই হতো শুধু, সূর্য বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে তিনশ কিরণে উত্তাপ বর্ষণ করেন, বর্ষা ও শরতে চারশ কিরণে জল দেন, হেমন্ত ও শিশিরকালে তিনশ কিরণে হিমবর্ষণ করেন।

গন্ধবতী বলল, আপনাকে কি দুধ দেব, আপনি ক্ষুধার্ত নন?

না তুমি স্থির হও।

গন্ধবতী মাথা নিচু করে বসে আছে। গতকাল সন্ধ্যায়, এই সময়ে দুর্বৃত্ত উদ্ধব এই আঙিনায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। ভয়ে মা ও মেয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল। পিতামহ-ই বা কেমন হয়ে গিয়েছিল। অথচ আজ কি না তাঁরা অনুমান করলেও আসেনি সেই দুর্বৃত্ত। বদলে এসেছে যে সে যেন এই খরার দিনে মেঘের মতো। কী শীতল, মোহময় তাম্রধ্বজের উপস্থিতি। গন্ধবতী ফিসফিস করল তুমি যেন ঠিক সেই ধ্রুবসখার মতো।

কানে গেল কি তাম্রধ্বজের? সে বলল, তুমি এবার ধ্রুবপুত্রের অন্তর্ধানের কথাটি বলো।

গন্ধবতী ফিসফিস করল, কী আর বলি, কতবার আর বলি, আমি আর পারিনা বলতে, তুমি সখা শুনে নিও মায়ের কাছে।

তাম্রধ্বজ স্থির চোখে গন্ধবতীকে দেখছিল। তখন দীপ হাতে এগিয়ে এল রেবা। দীপদান সমেত দীপটি রাখল গন্ধবতী আর তাম্রধ্বজের মধ্যে। গন্ধবতী উঠে দাঁড়াল, বলল, মা তুমি এঁকে সেই চৈত্র পূর্ণিমার কথা বলো।

মা বলল, তুই না বললে কথা সম্পূর্ণ হবে না।

গন্ধবতীর সমস্ত শরীর ছেয়ে আসছে আশ্চর্য এক অনুরণন। তাম্রধ্বজ না এ অন্য কেউ? সে কেঁপে উঠল। মনে মনে উচ্চারণ করল, হায় ধ্রুবপুত্র তুমি এ কোন বেশে এলে? গন্ধবতী তাম্রধ্বজের ভিতরে ধ্রুবপুত্রকে দেখতে পেল। নিরুদ্দিষ্ট ধ্রুবপুত্রকে তাহলে ফিরিয়ে আনল দশার্ণ দেশের জ্যোতির্বিদ?

গন্ধবতী ফিসফিস করল, ধ্রুবপুত্র।

তাম্রধ্বজ আকাশে তাকিয়ে আছে। দু'টি চোখে তারার আলো প্রতিবিম্বিত। তাম্রধ্বজকে স্পর্শ করল গন্ধবতী। তাম্রধ্বজ মাথা নামায়। ঘুরে তাকায়। দু'জনে পরস্পরকে চিনে নিচ্ছে, যেন অভিশপ্ত হয়েছিল তারা এতদিনে। পরস্পরকে বিস্মৃত হয়েছিল বহুযুগ।

তাম্রধ্বজ বলল, বর্ষার কথা মনে পড়ে?

পড়ে।

মেঘের কথা?

হ্যাঁ।

কদম্ববন?

হ্যাঁ।

গম্ভীরা নদী, বেতস বন?

হ্যাঁ সখা। গন্ধবতীর দু'চোখ দিয়ে জল ঝরে যাচ্ছে। অন্ধকারে নিঃশব্দ অশ্রুপাত দেখছে তাম্রধ্বজ।

একত্রিশ

গন্ধবতী বলল, সেদিন ছিল চৈত্র পূর্ণিমা, কামদেবের মন্দিরে গিয়েছিলাম আমি।

জানি তা। তাম্রধ্বজ বলে শুনেছি।

সেদিনই ফিরেছিল ধ্রুবপুত্র উজ্জয়িনী থেকে, তুমিই তো জান মা, তুমি বলো। গন্ধবতী তার মাকে বলল। অন্ধকারে মা মেয়ে বসে আছে পাশাপাশি। দীপের আলোয় তাদের মুখ দেখতে পাচ্ছে তাম্রধ্বজ। গন্ধবতীর চোখদুটি যেন নদীর মতো। চকচক করছে জল। রেবা মায়ের চোখ দুটিও তাই। কিন্তু সে নদী জলহীন হয়েছে নিদারুণ তাপে।

চৈত্র পূর্ণিমা কেন আগে কোনো পূর্ণিমাতেই গম্ভীরার বাইরে থাকত না ধ্রুবপুত্র। নদীর ওপারে যখন সোনার থালার মতো চাঁদ ভেসে উঠত, ধ্রুবপুত্র তখন সেখানে। কিন্তু আগের দু'বছর আশ্বিনের পূর্ণিমা, কার্তিকের পূর্ণিমা, মাঘীপূর্ণিমা, ফাল্গুনীপূর্ণিমাতে সে ফেরেনি গৃহে। তার কথা এসে শোনাত উদ্ধবনারায়ণ। গণিকাপল্লীতেই পড়ে থাকে ধ্রুবপুত্র। চরম ভোগে মেতেছে। তার জ্ঞানার্জন মিথ্যে হয়ে গেছে। নগরে টি টি পড়ে গেছে। ওইরকম দুঃশ্চরিত্র পুরুষ অবন্তীদেশে আর একটিও নেই।

খবর এনেছিল শিবনাথ, উদ্ধবের কথা অসত্য নয়, নগরে ওইকথাই রটেছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কপালে হাত দিয়েছিল গন্ধবতীর ঠাকুর্দা। রেবা আর তার মেয়ে মুখ অন্ধকার করে শুনেছিল। শুনেছিল ধ্রুবপুত্রের নামে কত আকথা, কুকথা। বুড়ি পার্বতী এসে বলে যেত আরো কত কথা। উদ্ধবের কথার চেয়ে তার কথার ধার ছিল বেশি। উদ্ধবের দূতী হয়ে আসত সে এই বাড়িতে। এখনো সেই দূতী হাল ছাড়েনি। আজ সকালেও এসেছিল।

চৈত্রমাসের সেই শুক্লাচতুর্দশীর রাতে ঘুম হয়নি গন্ধবতীর। তার মন বলছিল ফিরবে ধ্রুবপুত্র। চৈত্র পূর্ণিমাটি কাটাবে গম্ভীরায়। গম্ভীরায় চাঁদ ওঠা দেখবে ধ্রুবপুত্র। জ্যোৎস্নারাতে উঠোনে বসে উদয়ন বাসবসত্তার কাহিনী শোনাবে সে আবার। শোনাবে রেবা নদীর কথা, মলয় পর্বতের কথা, অগ্যস্ত নক্ষত্র যে দেশে উদয় হয় সেই দেশের কথা।

গন্ধবতী নিজে জানে তার অনুমান কখনো কখনো মিলে যায়। যা ভাবে তাই হয়ে যায়। যেমন আজ এই সমস্তদিন পথের দিকে চেয়েছিল। বারবার আঙিনার ধারে গিয়ে পথের প্রান্তে তাকিয়েছে, আচার্য বৃষভানুর শিষ্য, দশার্ণ দেশীয় জ্যোতির্বিদ তাম্রধ্বজ আসতে পারে এমন মনে হচ্ছিল তার। তাম্রধ্বজ না এলে আসবে সেই রাজকর্মচারী, দুরাচারী উদ্ধবনারায়ণ। আজ এলে তাকে যদি অপহরণ করে— ভয়ে নিজে নিজেই গুটিয়ে যাচ্ছিল সে। অপহরণ করে রাক্ষস-বিবাহে বাধ্য করবে উদ্ধব। তার মনের কথা মিলে গেছে। এমনই মিলেছিল সেই দিন। পূর্ণিমার ভোরে ফিরেছিল ধ্রুবপুত্র। চতুর্দশীর চাঁদের আলোয় উজ্জয়িনী থেকে হেঁটে এসেছে একা একা। পালিয়ে এসেছিল, এখন তাইই মনে হয়। শেষরাতে যখন সে উঠোনে পা দিল, পথের চেনা কুকুরটি দুবার ভুকভুক করে থেমে গেল। গন্ধবতী দুয়ারের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখেছিল ধূলিধূসর শরীর। পরমরূপবান ধ্রুবপুত্র মলিন হয়ে ফিরেছে। অযত্ন লালিত চুল, দেহ, নীল চোখের কোলে কলঙ্করেখাও যেন দেখেছিল গন্ধবতী। ফিরে সে নিজের কুটীরখানিতে ঢুকে গিয়েছিল। ওই যে দুয়ার টেনে বন্ধ করা আছে সেই কুটীর। গন্ধবতী নিজে পরিষ্কার করে প্রতিদিন। সে না করলে রেবা করে।

গন্ধবতী বলল, ধ্রুবপুত্র ফিরতে আমি কামদেবের মন্দিরে গেলাম, যাওয়া স্থির ছিল, সঙ্গী ছিল পার্বতী বুড়ি, যাওয়ার আগে গবাক্ষপথে দেখলাম মাটিতে শুয়ে আছে ধ্রুবপুত্র, লুটিয়ে আছে। শয্যা এলোমেলো।

থাকুক সে ঘুমিয়ে। ওই ঘুম কত রাত্রি জাগরণের তাই বা কে জানে। দুপুরে ফিরেছিল পুজো দিয়ে। দেখেছিল দুয়ার তেমনই বন্ধ। রেবা ডেকেছিল, কয়েকবার টোকা দিয়েছিল দরজায়। সাড়া দেয়নি ধ্রুবপুত্র।

তারপর! সন্ধ্যায় দ্বার খুলল। বাইরে এল ধ্রুবপুত্র। উঠোনে বসে থাকল অনেক সময় তার সামনে ক্ষীর-তক্র আর জল রেখে এল গন্ধবতী। দুধ ফোটাল রেবা। পাথরের বাটিতে দুধ এনে রেখে দিল সামনে। কলা একজোড়া। ধ্রুবপুত্র নিশ্চুপ বসেছিল। সে ছিল ঘোরের ভিতরে। রেবা যখন তার সামনে এসে দাঁড়াল, নিম্নস্বরে ডাকল, ধ্রুবপুত্র সমস্তদিন কিছুই খাওনি, তুমি ক্ষুধার্ত নিশ্চয়, আজ পূর্ণিমা, চাঁদ উঠে গেছে ওই দ্যাখো, না খেলে গৃহস্থের অকল্যাণ হবে।

ধ্রুবপুত্র তখন ক্ষীরতক্তি ভেঙে মুখে দিয়েছিল। জলগ্রহণ করে আবার নিশ্চুপ। নিঃঝুম। শিবনাথ তখন দূরথেকে ডেকেছিল, এ তোমার কী হয়েছে সোনার বরণ কালি হয়েছে ধ্রুবপুত্র! তুমি শান্ত হও।

সে স্থির হয়ে বসেছিল। তার অনাবৃত শরীর থেকে চাঁদের আলো গড়িয়ে পড়ছিল। অনেকক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়েছিল, ফিরে গিয়েছিল নিজ কুটীরে। ওই সেই কুটীর। অন্ধকার হয়ে আছে।

তাম্রধ্বজ বলল, দীপ ওখানে রেখে এস গন্ধবতী।

গন্ধবতী দীপ হাতে উঠে গেল। মুগ্ধ চোখে দেখল তাম্রধ্বজ ধ্রুবপুত্রের অনুরাগিনীকে। দীপ নিয়ে মন্দচরণে গন্ধবতী হেঁটে যাচ্ছে। রেবা দেখল দশার্ণ দেশীয় জ্যোতির্বিদের মোহাচ্ছন্ন চোখ দুটি। কেমন চেয়ে আছে। একী হলো! রেবা যে ওই চোখ চেনে। ওই চোখের ভাষা জানে। হায় ধ্রুবপুত্র। অগ্নি আর ঘৃত মুখোমুখি হয়েছে। কী হয়ে যাবে কে জানে! তাম্রধ্বজ কি জেনেও গোপন রেখেছে ধ্রুবপুত্রের সংবাদ?

রেবা নৈঃশব্দ ভাঙল, আমার মেয়েটির হয়েছে জ্বালা, অনন্ত আগুনে পুড়ছে যেন সুগন্ধা আমার, ধ্রুবপুত্র ব্যতীত সে যে কাউকেই দ্যাখেনা এ জগতে।

হাসল তাম্রধ্বজ, আমি জানি মা।

উদ্ধবনারায়ণ কী ভয়ানক, সে কী করেছে তা জান তুমি?

জানি মা।

কে বলেছে?

তাম্রধ্বজ বলল, আমি সব জানি, যা জানি না তাও জানতে চাই, তুমি বলো এবার ধ্রুবপুত্রের কথা।

ওইতো ফিরে আসছে মেয়ে, ওই বলুক।

ফিরে এল গন্ধবতী। মায়ের পাশে বসল। ধ্রুবপুত্রের অন্ধকার কুটীরে দীপ জ্বলে আছে। একটি একাকী নক্ষত্র যেন। ধ্রুবপুত্র কুটীরে প্রবেশ করলে শিবনাথ বলেছিল, অনুশোচনায় ভুগছে ও, একা থাকুক, ধীরে ধীরে মুক্ত হবে, ওর তুল্য জ্ঞানী, শুদ্ধ পুরুষ এই অবন্তী দেশে আর নেই।

শিবনাথ আরো কিছু বলেছিল গন্ধবতী আর রেবাকে। জ্ঞান হলো দিনমানের মতো। আর অজ্ঞানতা হলো গভীর অমানিশা। অজ্ঞানতা সব সময় জ্ঞানকে অধিকার করতে চায়। পারে কি? পারে না। ধ্রুবপুত্র মুক্ত হচ্ছে। জ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন হচ্ছে একটু একটু করে। আমাদের কারোর কোনো উদ্বেগের কারণ নেই।

ধ্রুবপুত্র ঘরেই থাকল। রাত বাড়তে লাগল। সকলে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে গেল। গন্ধবতীর কাছে চৈত্র পূর্ণিমাটি মলিন। নিরানন্দময়। দূরে নিষাদ বনচারীরা দুন্দুভি নিসান বাজিয়ে আনন্দ করছিল। তার শব্দ কানে আসছিল। বাইরে দুধের মতো আলো যেন উথলে পড়ছিল। গবাক্ষপথে সেই আলো এসে পড়েছিল ঘরে। গন্ধবতী ঘুমোতে পারেনি। একটু বাদে উঠে অর্গল খুলে বেরিয়েছিল। ধ্রুবপুত্রের কুটীরের সামনে দাঁড়িয়েছিল। তারপর ঘুরে গবাক্ষ পথে তাকিয়ে দ্যাখে সে যেন ধ্যানস্থ। ফিরে এসেছিল গন্ধবতী।

গন্ধবতী বলল, এরপর আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম ভেঙে গেল আচমকা।

কী হলো? তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করে।

ঘুম ভাঙার পরই গন্ধবতী শুনেছিল দূরে দ্বার খোলার শব্দ। ওই শব্দে ঘুম ভেঙেছিল, না ঘুম ভাঙার পর ওই শব্দ শুনেছিল তা বলতে পারবেনা সে। তার মনে হয়ত কোনো আশঙ্কা গোপনে লালিত ছিল। সে টের পেয়েছিল ধ্রুবপুত্র ভীষণ অশান্ত, মনে মনে ভীষণ অস্থির। শয্যা ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ার অন্ধকারে এসে বসেছিল গন্ধবতী। তখন ধ্রুবপুত্র দুয়ার খুলে বেরিয়ে এসেছিল। দাওয়ায় বসে গন্ধবতী অবাক হয়ে দেখেছিল উঠোনে নেমেছে ধ্রুবপুত্র। উত্তর আকাশে তাকাল। গায়ের উত্তরীয় খানি মলিন, তার একটি কোণ ধুলোয় লুটোচ্ছিল। ধ্রুবপুত্র যে আবার চলে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে সখা? আবার কি উজ্জয়িনীতে? আবার সেই গণিকালয়ে? উন্মাদ হয়ে গেল ধ্রুবপুত্র। তার সমস্ত জ্ঞানার্জন মিথ্যে হয়ে গেল! নিঃশেষ হয়ে গেছে সব! সে কিছুতেই ধ্রুবপুত্রকে উজ্জয়িনী যেতে দেবেনা।

গন্ধবতী দুয়ার নিঃশব্দে টেনে দিয়ে ধ্রুবপুত্রকে অনুসরণ করতে থাকে। সে যেতে দেবে না সখাকে। উজ্জয়িনী নগরই শেষ করেছে ধ্রুবপুত্রকে। উঠোন পার হয়ে পথে নামল গন্ধবতী। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় পথঘাট সব দিনমানের মতো স্পষ্ট। গন্ধবতী দেখছিল তার আগে আগে একটি পদচিহ্ন এগিয়ে গেছে। ওই পদচিহ্ন ধ্রুবপুত্রের। চেনে গন্ধবতী। এই ধুলোয় কতদিন ওই চিহ্ন অনুসরণ করে ধ্রুবপুত্রকে খুঁজে বের করেছে সে।

বাইরে বেরিয়ে ঘুরে তাকায় গন্ধবতী। ওই পথ গেছে উজ্জয়িনীর দিকে। কই কেউ তো নেই। পথ অনেকদূর সোজা চলে গেছে। শূন্যপথে জ্যোৎস্নায় ধুলো উড়ছিল চৈত্র বাতাসে। এর ভিতরে কতদূর যেতে পারে সে? পিছনে পিছনেই তো এল গন্ধবতী। তাহলে কি তার ভুল হলো? মাটিতে তাকায় গন্ধবতী। না, সেই পথে তো যায়নি ধ্রুবপুত্রের পদচিহ্ন। ঘুরে দক্ষিণ পুবে তাকায় গন্ধবতী। ওই দিকেই তো গেছে সখা। বুকটা কেঁপে ওঠে। ওই যে দূর, বহুদূরে, গম্ভীরা নদীর পথে ছায়া হেঁটে যায়। চলে যায় ধ্রুবপুত্র। তার উত্তরীয় পড়ে গেছে ধুলোয়। উড়ছে তা চৈত্রবাতাসে। ধুলো উড়িয়ে হাঁটে গন্ধবতী।

কী আশ্চর্য! সেই রাতে পথের কুকুরগুলির কেউ ধারে কাছে ছিল না। ডিম ডিম করছিল জ্যোৎস্না আর নৈঃশব্দ। দূর থেকে ডেকে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নেয় গন্ধবতী। তার কণ্ঠস্বরে গ্রামের মানুষ জেগে যেতে পারে। সে ভারি লজ্জার হবে।

হাঁটতে হাঁটতে গম্ভীরার তীর। কী দ্রুতই না হেঁটেছে ধ্রুবপুত্র? গন্ধবতীর সাধ্য কি তাকে ধরে। চৈত্ররাতে উথাল পাথাল বাতাস ছিল, তবুও উত্তেজনায় ঘর্মাক্ত হয়ে গিয়েছিল গন্ধবতীর সর্বাঙ্গ। প্রায় ছুটতে ছুটতে নদীর বাঁকে এসে দ্যাখে ধ্রুবপুত্র নেমে যাচ্ছে নদীর ভিতরে। জলে।

নদীটি যেন ঘুমিয়েছিল সেই রাত্রে। জ্যোৎস্নাও তাকে আবৃত করে ঘুমিয়ে ছিল যেন। মনে পড়ে যায় গন্ধবতীর। একদিন, সে কতদিন আগে ধ্রুবপুত্র এক সন্ধ্যায়, চাঁদের আলোর ভিতরে দাঁড়িয়ে আকাশমন্ডল, নক্ষত্র, নদী, প্রান্তর দেখিয়ে বলেছিল, সুগন্ধা জেনে নাও, এই হলো জ্ঞান।

একদিন বলেছিল, বলো দেখি কোথায় কালপুরুষ?

বলো দেখি শতভিষা নক্ষত্রটি জেগেছে কিনা, ওই দ্যাখো গন্ধবতী, ধ্রুব নক্ষত্র, ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় ওই নক্ষত্র থেকে শিশির বিন্দুর মতো কি নেমে এসেছিল মানুষের প্রাণ? মানুষের প্রাণ কি নক্ষত্রের জল? শুনেছি স্বাতী নক্ষত্রের জল নাকি মুক্তো হয়ে ঝরে পড়ে সমুদ্রে...।

গন্ধবতী অস্ফুট স্বরে বলল, সত্যি কি মানুষ নক্ষত্রের সন্তান?

তাই-ই তো সবিতা নক্ষত্র আমাদের বাঁচিয়ে রাখে গন্ধবতী। বলল তাম্রধ্বজ। সে চেয়ে আছে গন্ধবতীর দিকে। রেবা কখন উঠে গেছে জানেনা কেউ।

গন্ধবতী ফিসফিসিয়ে বলল, আমাদের না হোক, তাঁর প্রাণ ধ্রুবতারার জল।

জানি তা, তারপর কী হলো?

কী হলো? সব যে ভুলে যাচ্ছে গন্ধবতী। সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল এই ভেবে যে সখা উজ্জয়িনী যায়নি। ধ্রুবপুত্র অবগাহনে এসেছে গম্ভীরায়। ঠাকুর্দার কথাই ঠিক। কলুষমুক্ত হচ্ছে ধ্রুবপুত্র। শুদ্ধ হয়ে আবার আরম্ভ করবে জীবন। বেতসকুঞ্জে দাঁড়িয়েছিল গন্ধবতী। বাঁকানো বেত্রপত্রের ছায়া পড়েছিল আলপনার মতো। বেত্রপত্র দিয়ে জ্যোৎস্না গড়িয়ে পড়ছিল নদীতে। সে বছর তো এমন অনাবৃষ্টি ছিল না। গম্ভীরাতীর ছিল সুন্দর। নদী ছিল তখনো, সেই চৈত্রেও জলপূর্ণ প্রায়। বাঁকটিতে ছিল গভীরতা অনেক। নদীর জলে চাঁদ ভেসে ছিল।

জলে নেমে ধ্রুবপুত্র নদীর বাঁকের দিকে সরে যেতে থাকে। ওই দহে দু'একবার মানুষ ডুবেছে। গন্ধবতীর মনে হয়েছিল ধ্রুবপুত্র বেভুল হয়ে গেছে যেন। সে দেখেছিল ধ্রুবপুত্র দহে নেমে গেছে। ডুবে যাচ্ছে নাকি? ওই যে ডুবে যাচ্ছে। ওই যে উঠছে। গন্ধবতী নেমে পড়েছিল নদীতে। পা ডোবা তিরতিরে জল পার হয়ে মধ্যিখানের বালিচর বেয়ে ছুটে গিয়েছিল দহের সমান্তরালে। দুটি হাত তুলে কেঁদে উঠেছিল, ডেকে উঠেছিল, 'ধ্রুবপুত্র, তুমি বেভুল হয়ে গেছ, উঠে এস ধ্রুবপুত্র, হে সখা এ তুমি কী করছ?'

ভয়ে কাঁপছিল গন্ধবতী। বেভুল হয়নি ধ্রুবপুত্র? মরতে এসেছে। আত্মহননে এসেছে গম্ভীরায়। সে তখন কেঁদে উঠেছিল, উঠে এস ধ্রুবপুত্র, এই নদী, এই আকাশ, চাঁদের আলো, এই সমস্তই জ্ঞান, তুমিই তা শিখিয়েছ ধ্রুবপুত্র, উঠে এস, ফিরে যাও নগরে।

শুনতে পেয়েছিল সে? জিজ্ঞেস করল তাম্রধ্বজ।

জানি না। অস্ফুটস্বরে বলল গন্ধবতী।

তারপর কী হয়েছিল?

উঠে এসেছিল সে, হ্যাঁ উঠে এসেছিল। বালিচরে দাঁড়াল আমার কয়েক হাত দূরে। সমস্তশরীর থেকে ঝরে পড়ছিল জ্যোৎস্নার জল। কী দ্যুতিময় চোখদুটি! অত বিস্ময় কোনো কালে আমি দেখিনি কারো চোখে।

তাম্রধ্বজ উঠে দাঁড়ায়, শোনা হলো।

কিন্তু সে কোথায়? গন্ধবতীও উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে।

তাম্রধ্বজ বলল, এইটুকু তো আমার জানা ছিল না।

বাকিটা তো বলতে পারিনি এখনো।

সে তো চলে গেল?

হ্যাঁ, আমার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল নদীতীরে, উঠল, তারপর উত্তরপুবদিকে চলতে লাগল, আমি ভেবেছিলাম সে ফিরবে ঘরে, কিন্তু ওই ভেজা কাপড়েই চলে গেল একা একা, আমি ডাকতে পারলাম না।

কেন?

গন্ধবতী বলল, অচেনা মনে হচ্ছিল যেন।

সত্যি?

হ্যাঁ, ধ্রুবপুত্র যেন অন্য কোনো মানুষ, আমি কেন যে পথ রোধ করে দাঁড়াতে পারিনি সেদিন?

তাম্রধ্বজ বলল, চাঁদ উঠে গেছে, আমি আসি।

আবার কতদিন অপেক্ষা করব?

কেন?

গণনা সম্পূর্ণ করে ধ্রুবপুত্রের খোঁজটা তো আনবেন।

আনব। তাম্রধ্বজ হাঁটতে আরম্ভ করল। অন্ধকার প্রাঙ্গণ পার হয়ে গেল।

বত্রিশ

সুভগদত্ত বললেন, নগর ছারখার হয়ে যাক, এ দেশ জ্বলে পুড়ে যাক।

মহাকালের অভিপ্রায় যদি তাই হয় হবে। প্রধান পুরোহিত বললেন।

আমি বাণিজ্যে যাব, কিন্তু তার আগে সিংহাসন নিষ্কন্টক হোক।

শ্রেষ্ঠী তো সিংহাসন যাঞ্ঝা করেন না। প্রধান পুরোহিত হাসলেন।

রাজা যদি সিংহাসন থেকে নেমে যান, ওই মেয়েমানুষটার সমস্ত গুমর ভাঙবে, গণিকা দেবদত্তাকে নিয়েই যাব আমি সঙ্গে।

শান্ত হন, আপনি এ দেশের শ্রেষ্ঠ ধনবান মানুষ, সামান্য গণিকার অবহেলায় উন্মাদ হলেন।

সুভগদত্ত বললেন, আমার শ্রেষ্ঠত্ব ধুলোয় লুটিয়ে গেছে, আমার দেওয়া অলঙ্কার সে চতুরিকা নামের এক কুরূপা বারাঙ্গনাকে দান করেছে।

প্রধান পুরোহিত বললেন, আপনি খোঁজ নিয়েছেন?

নিয়েছি।

মহাকালের কি এই অভিপ্রায়?

সুভগ দত্ত পাথুরে মেঝেতে পদাঘাত করলেন। ক্রোধে তাঁর সর্বশরীর কাঁপছিল। তিনি রাজসন্ত্রি উদ্ধবকে দিয়েই খবর এনেছেন। তারপর নিজে গিয়েছিলেন দেবদত্তার গৃহে। সেখানেই ডেকেছিলেন চতুরিকাকে। চতুরিকা সমস্তটা স্বীকার করে শ্রেষ্ঠীর পায়ে মাথা রেখেছিল উদ্ধবের আদেশে। দেবদত্তা ছিল নিশ্চুপ। এতই নিশ্চুপ তার শ্বাসপ্রশ্বাসও যেন বইছিল না। চোখের পাতাও যেন পড়ছিল না। কী অহঙ্কার! কোনো কথার জবাবই দিল না ভাল করে। ওই অহঙ্কার ভাঙতে পারে রাজার সিংহাসন টলে গেলে। কী সাহস তার, ধীরে ধীরে বলেই দিল, রাজা ব্যতীত কারোর কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করতে চায় না সে, তার মা রসমঞ্জরীর শিক্ষা তাই।

প্রধান পুরোহিত বললেন, একটা মেয়েমানুষের জন্য রাজার সিংহাসন যাবে?

যাবে, না গেলে আমি কেন শ্রেষ্ঠ?

তবুও তো মেয়ে মানুষই বটে, শ্রেষ্ঠী যদি চান কত মেয়ে মানুষ পেতে পারেন, মেয়েমানুষ কি অলভ্য হয়েছে অবন্তীদেশে?

রাজা তো ধর্ষক, দেবদাসীকে সম্ভোগ করেছেন মন্দিরে, সিংহাসন যাবে তো সেইজন্যও, গণিকা দেবদত্তা বসে আছে রাজার জন্য, আর রাজা ভোগ করে যাচ্ছেন দেবদাসী ললিতাকে।

সামান্য দেবদাসীর জন্য সিংহাসন যাবে? বৃদ্ধ পুরোহিত জিজ্ঞেস করলেন।

যাবে, যাবে, যাবে।

এতে সামান্য নারী, ভোগের মেয়েমানুষ বড় হয়ে উঠবে কিনা?

থমকে গেলেন সুভগ দত্ত, অবাক হয়ে তাকালেন বৃদ্ধ পুরোহিতের দিকে, কী বলতে চায় চতুর ওই ব্রাহ্মণ? তাহলে কি রাজার সঙ্গে গোপন সন্ধি হয়ে গেছে ওর? ঘামছেন শ্রেষ্ঠী। কী বলবেন ঠিক করতে পারছেন না। তখন প্রধান পুরোহিত হাসলেন, বললেন, মেয়েমানুষ ভোগ্যা। তা সে শূদ্রানী হোক আর ব্রাহ্মণী হোক, এ ব্যাপারে আমার দ্বিমত নেই, আপনি কি অন্যমত পোষণ করেন?

না, কিন্তু আমি তো বলছি অন্য কথা।

দেবদত্তাকে বলপূর্বক নিজগৃহে নিয়ে যান, বলপ্রয়োগ করুন।

তা কী করে হয় প্রধান গণিকা, রাজ-অনুরাগিনী।

হাসলেন প্রধান পুরোহিত ভোঁতা, রক্তাভ, দন্তহীন মাড়ি দেখা গেল, বললেন, রাজা তো তার অনুরাগী নন, রাজা তো দেবদাসী নষ্ট করে বেড়ান, নিম্নরুচির, রানী ও রাজার অনুরাগিনী নন, এখবর আমার জানা, নগরে টি টি পড়ে গেছে তাও কি জানা নেই আপনার? রাজা রানী দু'জনেই নিন্দিত হচ্ছেন নগরে।

সেনাপতি জানেন?

বিক্রম? কেন জানবেন না?

রানী ভানুমতি সম্পর্কে যা রটেছে তা জানেন না? বিক্রম আর ভানুমতির সম্পর্ক তো আর লুকোন নেই।

হ্যাঁ, তাতে তাঁর কী, তিনি তো পুরুষমানুষ, কলঙ্ক তাঁকে ছোঁয় না।

শ্রেষ্ঠী বললেন, কিন্তু এতে তো রাজা তার সিংহাসন ত্যাগ করবেন না।

বৃদ্ধ পুরোহিত বললেন, দেশে অনাবৃষ্টি, ফসল নেই, অনাচার চলছে, তার ভিতরে আরো অনাচার বিশৃঙ্খলা হোক, রাজা দিশাহারা হয়ে যাবেন।

বিক্রম কী বলেন? জিজ্ঞেস করলেন শ্রেষ্ঠী।

আপনি কথা বলে নেবেন, দেখুন রানী সম্পর্কে রটনায় তাঁর দ্বিধা ছিল, কিন্তু আমি বলেছি লক্ষ্য তো সিংহাসন। সিংহাসনের দিকে যাওয়ার পথ নিরঙ্কুশ করতে রানীকেও পথে নামাতে হবে। আর রানী ভানুমতি বা তাঁর কে? ভ্রাতৃবধূ, অনাচারী তো নিশ্চয়, না হলে স্বামী সঙ্গ ত্যাগ করে দেবরের সঙ্গে সম্পর্ক পাতান তিনি? তিনি একটি মেয়েমানুষ তো বটে, মেয়েমানুষের দাসীই বা কী রানীই বা কী।

বৃদ্ধ পুরোহিতের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন শ্রেষ্ঠী। যে পরিকল্পনা তাঁর নিজের মাথায় এসেছিল তা রূপায়ণের দায় যেন প্রধান পুরোহিতেরই। কিন্তু রাজার সিংহাসন গেলে গণিকা দেবদত্তা তাঁর সম্পূর্ণ অধিকারে আসবে তো? তাঁর মনে এক সন্দেহও আছে রাজার কলঙ্ক, রানীর কলঙ্ক কি সেনাপতির সিংহাসন দখলের পথ প্রশস্ত করবে? কতটা করবে?

বৃদ্ধ পুরোহিত যেন তাঁর মনের কথা ধরে ফেললেন। বললেন, দেশ ক্রমশ অনাচারে ভরে যাচ্ছে, এসব হচ্ছে রাজার পাপে, আপনি শূদ্রপল্লীতে আগুন লাগান।

কী বলছেন?

হ্যাঁ, এসবও করতে হবে, রসালো অনাচারের কাহিনী তো মানুষকে বিদ্রোহী করে তুলবে না, সেনাবাহিনীর শক্তিই তো শূদ্রজাতি।

শ্রেষ্ঠী বললেন, ওরা কী দোষ করল?

আপনি কি চান প্রধান গণিকা আপনার দখলে আসুক?

চাই।

রাজা বদল হোক অবন্তীদেশে?

শ্রেষ্ঠী বললেন, বারবার একই কথা বলছেন কেন, রাজার কানে চলে যাবে, কোথায় কে আছে শুনে নেওয়ার জন্য, দেওয়ালেরও কান আছে।

বৃদ্ধ হাসলেন, সেনাপতির সঙ্গে সব কথা হয়েছে আমার।

তবু, এখনো তো ভর্তৃহরিই এদেশের রাজা।

আহ্! বিরক্ত হলেন পুরোহিত, আপনিই তো এসে বললেন জ্বলে যাক অবন্তী দেশ, পুড়ো ছারখার হোক, আপনি আপনার দাসকে পাঠান অগ্নিসংযোগ করতে, কোনো সরোবরে জল নেই, নিরাশ্রয় শূদ্রজাতির পাশে দাঁড়াবেন তখন শ্রেষ্ঠী এবং সেনাপতি, আর কোনো ভয় থাকবেনা।

শ্রেষ্ঠী বুঝলেন, এই বৃদ্ধ মন্ত্রণায় শ্রেষ্ঠ। মহাকাল মন্দিরের পরিবর্তে এর অধিষ্ঠান হওয়া উচিত ছিল রাজসভায়। উদ্বেগে, অপমানে, ব্যর্থতায় গণিকার অবহেলার জ্বালায় শ্রেষ্ঠী নিজে দিশাহারা হয়ে ঘুরছেন এখন। এসেছিলেন অগ্নিকুন্ড হয়ে, এখন সে আগুনের তেজ আচমকা নিভেই গেছে যেন। শূদ্রপল্লী তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। আগুনের একটি ফুলকি সব ছাই করে দেবে এমন ঘন সন্নিবদ্ধ ওই পল্লীর গৃহগুলি। জল নেই সরোবরে। কূপের জল প্রায় অন্তর্হিত। কী করে নেভাবে আগুন? মানুষ, পশু সব একসঙ্গে মরবে যে।

প্রধান পুরোহিত বললেন, যত মরবে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি বেঁচে থাকবে।

অকারণে প্রাণ নেব?

বিরক্ত হলেন বৃদ্ধ, অকারণ কেন হবে, রাজা ভর্তৃহরিকে সিংহাসন থেকে নামাতে।

দুর্বল বোধ করছেন যেন শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত। কাঁপছেন কি? কী যে হলো তাঁর! দেবদত্তার প্রত্যাখ্যান তাঁর মনের সমস্ত জোর যেন শেষ করে দিয়েছে। আত্মবিশ্বাস আর নেই। তিনি বিড়বিড় করলেন, শুধু শুধু এতগুলো মানুষ আশ্রয়হীন হবে, কিছু মরবে?

প্রধান পুরোহিত নির্বিকার, উদাসীন গলায় বললেন, শূদ্র মনুষ্য নয়, পশুবধে যেমন পাপ নেই শূদ্র বধেও তাই, সিংহাসন দখলের জন্য সমস্ত পথই গ্রহণযোগ্য। আগুন লাগাবেন গোপনে, গভীর অন্ধকারে

লোক পাঠাবেন, রাজা যেমন মহাকালের রূপ ধরে ভোগ করে গেছেন দেবদাসীকে, তেমনি মহাকাল হয়েই আগুন লাগাবে আপনার দাস, শূদ্রপল্লীর হাহাকার শোনা যাবে নগরের বাতাসে, রাজার পাপে প্রজার সর্বনাশ হবে, দিশাহারা হয়ে পড়বেন রাজা ভর্তৃহরি।

শ্রেষ্ঠী এতক্ষণে যেন ফিরে পাচ্ছেন নিজস্ব বিশ্বাস। ধীরে ধীরে তাঁর দেহের তাপও ফিরে আসছে। হ্যাঁ, এমনই তো হওয়ার দরকার। দিনমানে নগরের রাজপথে শৃগাল হেঁটে যাক, শকুন নেমে আসুক, লুটপাট হোক, গৃহস্থের স্ত্রী কন্যা অপহরণ করুক দুর্বৃত্ত, রাজকর্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করে নির্দোষ ব্যক্তির উপর অত্যাচার করুক, আগুনে পুড়ে যাক শূদ্রপল্লী, তখন রাজা ভর্তৃহরির অবনমন ত্বরায় হবে, রাজার সিংহাসন গেলে গণিকা দেবদত্তা তাঁরই হবে, তার সমস্ত অহঙ্কার ধুলো হয়ে যাবে। শ্রেষ্ঠীর নিঃশ্বাস গরম হয়ে উঠল। ভিতরে কামভাব জেগে উঠল। চোখের সামনে দেবদত্তার দেহখানি ফুটে উঠল। বক্ষদেশ, নিতম্ব দেশ, সুচারু বাহু, ওষ্ঠাধর...। তিনি চাপা গর্জন করে ওঠেন, লাগবে আগুন।

পুরোহিত নির্বিকার, সে তো লাগবেই, আমার সঙ্গে কথা হয়েছে বিক্রম সেনাপতির, আগুন লাগুক, পরের কাজ আমার, দৈববানী হবে নগরে।

শ্রেষ্ঠী বললেন, আপনার সেই দেবদাসী কোথায়, রাজার দ্বারা ধর্ষিতা?

সে এখন অন্ধকারে আছে।

অন্ধকারে কেন?

অশুচি হয়েছে, ঋতুমতী অশুচি নারীকে আমার ঘেন্না লাগে।

সুভগদত্ত বললেন, সে গর্ভবতী হয়নি?

না তো, কেন?

রাজা তাকে সমস্ত রাত ধরে ভোগ করলেন, গর্ভবতী হয়নি কেন?

পুরোহিতের দুচোখ ঝিকিয়ে ওঠে, হলে কি ভাল হত?

হতোই তো, রাজপথে দাঁড় করিয়ে দিতাম গাভীন মেয়েমানুষটাকে, রাজার মান তখন কোথায় যেত, কোথায় মুখ লুকোতেন রাজা ভর্তৃহরি?

প্রধান পুরোহিত বললেন, একথা আগে বলেননি কেন?

কী বলব, আমি তো জানি তাইই হবে, গর্ভলক্ষণ ফুঠে উঠলে তবে না তাকে জনসমক্ষে নিয়ে যাওয়া হবে, এ কেমন হলো?

প্রধান পুরোহিত হাসলেন, আপনি যে শিশুর মতো কথা বলছেন, এতে প্রমাণ হলো রাজার সেই ক্ষমতা নেই, একজন অক্ষম পুরুষ বসে আছেন উজ্জয়িনীর সিংহাসনে, রাজার যদি সন্তান সৃজনের ক্ষমতা না থাকে, ফসল হবে কেন, বৃষ্টিই বা নামবে কেন, রানী যতবার গর্ভবতী হবেন, ততবার সম্পদে ভরে উঠবে দেশ, রাজা সিংহাসনে থাকতে আর বৃষ্টি হবে না এদেশে।

কে বলেছে একথা?

শাস্ত্রে লেখা আছে।

কিন্তু রাজা কি সত্যিই ভোগ করেছিলেন আপনার সেই দাসীকে?

আমার নয়, মহাকালের দাসী সে।

শ্রেষ্ঠী বললেন, অক্ষম নপুংসক রাজার তো সিংহাসনে থাকার অধিকার নেই।

নেই।

রাজা যে অক্ষম এই কথা তো নগর জানে, সন্তানহীনা হয়ে আছেন রানী।

প্রধান পুরোহিত বললেন, নগর জানে রানী অক্ষম।

ললিতার দ্বারা প্রমাণ হলো রাজা অক্ষম।

হ্যাঁ, বারবার একই কথা বলছেন কেন? বিরক্ত হলেন প্রধান পুরোহিত।

এই কথাটি গণিকা দেবদত্তার কানে পৌছবেনা?

গণিকা যদি দেবমন্দিরে আসে আমার আশীর্বাদ নিতে, আমিই জানিয়ে দেব।

শ্রেষ্ঠী উত্তেজিত হয়েছেন, অক্ষমপুরুষের অনুরাগিনী হবে কেন রসমঞ্জরীর কন্যা, দ্বিজদেব কীভাবে কথাগুলো দেবদত্তার কাছে পৌছনো যায়?

প্রধান পুরোহিতচুপ করে থাকলেন। উত্তেজিত শ্রেষ্ঠী পায়চারী করছেন অপরিসর কক্ষটিতে। পুরোহিত অতীব ধূর্ত মানুষ। আগে পুরোহিতকে এতটা চিনতেন না শ্রেষ্ঠী। এখন মনে হচ্ছে নতজানু হয়ে থাকেন সব সময়। পুরোহিত একটু সময় নিলেন, তারপর বললেন, আপনার দেওয়া অলঙ্কার তো দেবদত্তা দান করে দিয়েছে গণিকা চতুরিকাকে।

হ্যাঁ, চতুরিকাই তো দিয়েছিল উদ্ধবনারায়ণকে।

নাকি অপহরণ করেছিল উদ্ধব?

হয়ত তাই।

চতুরিকাই পারে রাজার কথা গণিকা দেবদত্তার কানে পৌঁছে দিতে।

বাহ্! শ্রেষ্ঠী যেন সমাধান পেয়ে গেছেন। যেন চতুরিকা কথাটি পৌঁছে দিলেই দেবদত্তা তাঁর অধিকারে চলে আসবে। শ্রেষ্ঠীর বয়সটি বড় ভয়ঙ্কর, এই বয়সে আর অপেক্ষা করা যায় না। যৌবন অস্তগামী, ভোগের কাল সীমিত হয়ে আসছে। তাই ব্যর্থতা সহ্য হয়না। তিনি বললেন, আমি যাই।

যাবেন, কিন্তু দেবদত্তা যদি প্রশ্ন করে রাজা যে অক্ষম তার প্রমাণ?

প্রমাণ তো ললিতাদাসী।

আপনিই তো বললেন রাজা যে তাকে সত্যিকারের ভোগ করেছিল তারই বা প্রমাণ কী, এই প্রশ্ন যদি দেবদত্তা তোলে?

শ্রেষ্ঠী হাসলেন, রাজার কণ্ঠহার ললিতার গলায়।

কিন্তু সে তো কত কারণে হয়।

তাহলে! বুক ধকধক করতে লাগল সুভগ দত্তর।

আপনি কি ভাবছেন রাজা অক্ষম এই কথাটি দেবদত্তা জেনে গেলেই সে আপনার অধিকারে চলে আসবে? প্রধান পুরোহিত জিজ্ঞেস করলেন।

আসবে, নপুংসকের কাছে কোন রমণী যেতে চায়?

হাসলেন প্রধান পুরোহিত, দেবদত্তার প্রেম তো এক তরফা, রাজা ভর্তৃহরির প্রেমের ক্ষমতাই নেই, প্রতিদান দিতে পারবেন না বলেই না দেবদত্তার কাছাকাছি হননা তিনি, দেবদাসীকে ভোগ করে ক্ষমতা জেনে নিতে চেয়েছিলেন।

তাহলে চতুরিকা জানাবেনা?

জানাবে, কিন্তু তাতে লাভ বিশেষ হবে না আপনার নিজের, তবে কিনা রাজা নপুংসক তা রটে গেলে আমাদের পথ আরো মসৃণ হবে।

তাহলে আমি কী করব?

শূদ্রর ঘরে আগুন লাগান আগুন, আগুন। আগুন ছাড়া কোনো উপায় নেই, পুড়িয়ে দিন শূদ্রপল্লী, হা হা রবে ভরে যাক নগর...।

হাহাকার তাড়া করতে লাগল শ্রেষ্ঠী সুভগদত্ত কে। তিনি এগোলেন।

তেত্রিশ

উদ্ধবের দূতী হয়ে চতুরিকা এসেছে প্রধান গণিকা দেবদত্তার গৃহে। চতুরিকা নিজে দেবদত্তার অনুরাগিনী, দেবদত্তা তাকে সখীর মান দেয়, এই গৃহে তার অবারিতদ্বার, কিন্তু আজ এই আসা আর অন্যদিনের আসায় তফাৎ তো আছেই। সে আজ এসেছে দেবদত্তার মন ভাঙাতে, মন জেনে নিতে। শ্রেষ্ঠীর কথা সাতকাহন করে শুনিয়ে তাঁর অনুরাগিনী করে তুলতে হবে দেবদত্তাকে। অধীর হয়ে উঠেছেন সুভগ দত্ত। সময়ও দিতে চাননা। তাঁর এতধন সম্পদ, তবু কিনা এত দুঃখ। মেয়েমানুষের দাম তার চেয়েও বেশি। আশ্চর্য! এত হীরামানিক দিয়েও তিনি দেবদত্তার মন জয় করতে পারছেন না।

গৃহদ্বারে প্রহরী নেই। থাকে না প্রায়ই। বীট মুখপোড়া সৌরাষ্ট্র দেশীয়, কোমরে একটি খর্বাকার তলোয়ার ঝুলিয়ে লোকটা যে কত রোষ দেখায়। মোটা একটি গোঁফ, লাল দুটি চোখ, মদিরা সেবন করে আছে প্রায় সবসময়। লোকটার কাজ থাকার কথা নয়, কিন্তু তার আশ্রয়দাত্রী যে স্বয়ং দেবদত্তা। সৌরাষ্ট্রেদেশীয় মানুষের উপর তার দুর্বলতা আছে। চতুরিকার এক একদিন মনে হয় লোকটা সৌরাষ্ট্রের নয়, দেবদত্তার মন পেতে ওই রকম প্রচার করেছে। আসলে ও বোধহয় ধারকাছের কোনো গাঁয়ের।

কিন্তু তাই বা কী করে হবে? এক একদিন মদিরা সেবিত হয়ে এই বাগানে বসে কেমন গানজোড়ে। এই গান এদিকের নয়। কী অদ্ভুত তার সুর, তাল! সৌরাষ্ট্রের যদি না হবে ওই গান পেল কোথা থেকে?

ভিতরে ঢুকে চতুরিকা দেখল গৃহখানি অতি শান্ত। এমনি চুপচাপ থাকে, কিন্তু হয়ত বীণাবাদন শোনা যায়, কিংবা নূপুরের শব্দ। ডাকাডাকির শব্দ। আবার এসব যে সবদিন থাকেও তা বলা যায় না, এমন নিঃঝুমও থাকে, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে অন্যরকম। দুয়ারে যদি প্রহরী থাকত, তাহলেও তা মনে হত। আসলে ক'দিন ধরে তার নিজের মনে হচ্ছে সব বদলে যাচ্ছে। নগর কেমন চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে। মানুষের মনে ফূর্তি নেই। উদ্ধব বলছিল বৃষ্টি নেই অনেকদিন। তাই তো! সত্যিই যে বৃষ্টি হয়নি দুটি বর্ষাকালে। তারপরেও কতদিন কাটল, বৃষ্টি হয়নি। জানা ছিল, কিন্তু গণিকাপল্লীতে হল্লা উঠছেনা, কেন না বৃষ্টি নেই তাই লোকের মনে আনন্দও নেই। নিরানন্দের ভাবটি নগরে ছেয়ে গেছে। এই গৃহেও।

এই যে পথ, কাঁকর বিছানো, পথের দুপাশে বাগান। এই বাগান কি এমন শ্রীহীন ছিল কোনো কালে? পথটি সোজা গৃহের ভিতরে চলে গেছে। চতুরিকা একটু এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এই কি সেই বাগান, যে বাগানে গণিকা রসমঞ্জরী দোলনায় দুলতেন, তাঁকে দোলাতেন মহারাজা গন্ধর্ব সেন, বাগানে ময়ূর, ময়ূরী খেলে বেড়াত, রাজহংস, রাজহংসী গলা তুলে রসমঞ্জরীর দিকে চেয়ে থাকত, কোকিল ডেকেই যেত অশোক গাছটির অন্ধকার থেকে। কতরকম ফুল, কতরকম গাছ, লতাপাতা যে আছে এই বাগানে। গাছগুলি প্রায় পত্রহীন, শীতে তার পত্র ঝরেছে, এখনো মরে যাচ্ছে, অথচ বসন্তের নবীন পত্র এলনা যে। অশোক গাছে ফুল আছে বটে, কিন্তু রঙ ফোটেনি যেন ভাল করে। এসে গেল চৈত্র পূর্ণিমা, ঋতুরাজ বসন্ত পরিপূর্ণ হলো না এখনো। কাল মাঝরাতে গবাক্ষখুলে চতুরিকা চাঁদ দেখেছিল উদ্ধবনারায়ণ অচেতন হয়ে পড়তে। কত আলো ছিল। কিন্তু এই বাগান দেখে কে বলবে বসন্ত এসে গেছে। চতুরিকা দেখছে বাগানের লতাপাতার কিয়দংশ হলুদ, বাকিটা পুড়ে তামাটে। মনে পড়ল তার, একদিন দেবদত্তা তাকে সব লতা, সব গাছের নাম বলেছিল, চিনিয়েছিল ঘুরে ঘুরে। তার মা তাকে শিখিয়ে দিয়ে গেছে। চতুরিকা সব নাম ভুলে গেছে। যদি মনেই থাকত সেই তো হয়ে যেত প্রধান গণিকা, উদ্ধব তার আদেশ মান্য করত। তখন চতুরিকা শ্রেষ্ঠীর দিকে মন দিত। অনুরাগ নাই বা থাকল, কপট ভালবাসায় মুগ্ধ করত। গণিকারা তো এসব করেই। অথচ দেবদত্তার ধনুকভাঙা পণ। কেন ভালবাসা, প্রেমের ছলনা করতে পারিসনা তুই? তাতেই শ্রেষ্ঠী বশ। ঘড়া ঘড়া মোহর, ধনরত্ন, হীরে মানিক সব এসে যেত ঘরে।

চতুরিকার মনে পড়ল এই বাগানে ময়ূর দেখেছে সেও। সেই যে যখন এল নীলচোখের তরুণ ধ্রুবপুত্র, সেই সময়। এক একদিন দেবদত্তা তাকে নিয়ে নেমে আসত বাগানে, তমাল গাছটির নীচে বসে বীণা বাজাত সে। মুগ্ধ হয়ে তার দিকে চেয়ে আছে ধ্রুবপুত্র, ময়ূর ময়ূরী ওই দূরে ঠোঁটে ঠোঁট ঘষছে। তাদের মৃত্যু সংবাদ তো শোনেনি চতুরিকা। তাহলে কি হতভাগা সৌরাষ্ট্র দেশীয় প্রহরী বঙ্কুল তাকে কেটে খেয়ে নিল? দেবদত্তা খোঁজও করে না? দেবদত্তা কি এই বাগান দ্যাখেনা? এমন শ্রীহীন বাগান, পুষ্পহীন লতাগুল্ম, গাছগাছালি কি দেবদত্তার গৃহে থাকতে পারে? সে না উজ্জয়িনী নগরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। শ্রেষ্ঠী, ধনীব্যক্তিরা তার জন্য নিদ্রাহীন রাত যাপন করেন একা একা।

দেবদত্তার যেন মন নেই এই গৃহে। কত পাখি ছিল এই বাগানে? টিয়া, চন্দনা, বুলবুলি, ময়না, চকোর, চকোরী, শুক সারী-সব। কোথায় তারা? আছে তো এক ভুষন্ডী কালো দাঁড়কাক। ওই যে দাড়িম্ব গাছটির ডালে একা বসে টুকটুকে লাল চোখে দেখছে চতুরিকাকে। ঠিক যেন সৌরাষ্ট্র দেশীয় মানুষটা। লোকটা আধময়লা রঙের। যবন দেশে একরকম মানুষ আছে, যাদের রং রাত্রির মতো কালো, এই দাঁড় কাকের মতো কালো। দাঁড়কাকটি কি আসলে বঙ্কুল? সেই কি দাঁড় কাকের রূপ ধরে পাহারা দিচ্ছে এই গৃহ। হতেই পারে। ওইসব দেশে ঐন্দ্রজালিক আছে। তারা মানুষকে দাঁড়কাক করে দিতে পারদর্শী। কিন্তু একটি খটকা থেকেই যাচ্ছে, লোকটি তো খারাপ নয়, তাকে দাঁড়কাক হয়ে যেতে হবে কেন ঐন্দ্রজালিকর রোষে? আর উজ্জয়িনীতে ঐন্দ্রজালিক কোথায়? তার ঘরে তো কোনোদিন আসেনি।

চতুরিকা হুস হুস করল, যাহ্! অলক্ষুণে কাক যা।

কাকটি বড় গম্ভীর। তার গায়ের কালিবর্ণ যেন ছড়িয়ে পড়ছে বাগানে। মনটা খারাপ হয়ে গেল চতুরিকার। এ কেমন বসন্ত। এই অশোকগাছে যে কোকিলটি বাস করে বারো মাসই ডেকে যায় দূরের কোকিলাকে, সে কোথায়?

চতুরিকা জানে উদ্ধব বড় বিপদে পড়েছে। যেমন কর্ম তেমনি ফল। ভগবান আছেন। আছেন বলেই না অত গয়না কেড়ে নিয়ে উদ্ধব ধরা পড়ে গেল। ওই সত্রি তার কাছ থেকে সমস্ত গয়না কেড়ে নিয়ে জোর করে তা দিয়েছিল কোন গাঁয়ের মেয়ের হাতে। তার নাম গন্ধবতী। তার ঠাকুর্দা ভয় পেয়ে সব গয়না নিয়ে চলে এল শ্রেষ্ঠীর কাছে, শ্রেষ্ঠী গয়না দেখে চিনলেন সব। ওইসত্রি মশায়কে এখন চালাচ্ছে সে। কথা দিয়েছে দেবদত্তাকে রাজী করাবে। তা যদি হয় তবে উদ্ধব তাকে এই পাপপুরী থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবে। চতুরিকা জানে উদ্ধবের কথা সত্য নয়। নিজের স্বার্থছাড়া কোনো কিছুই বোঝেনা সে। তবু আশা তো রাখতে হয়। দরকারে সে দেবদত্তাকে দিয়ে শ্রেষ্ঠীকে বলাবে। দাসীর কাজ করবে শ্রেষ্ঠীগৃহে, দেবদত্তার দাসী হবে, তবু উদ্ধবের হাত থেকে মুক্তি চাই।

উদ্ধব কী ভয়ই না পেয়েছিল। প্রথমদিন এসে তো তার উপরে চোটপাট করল। কে দিয়েছে অলঙ্কার তা বলেনি কেন চতুরিকা? তার যদি কোনো ক্ষতি হয় সে ছাড়বেনা চতুরিকাকেও। দেবদত্তার গয়না সে চুরি করেছে এই অভিযোগে গলায় পাথর ঝুলিয়ে শিপ্রা নদীতে ডুবিয়ে মারবে। এখন অবশ্য অনেকটা শান্ত হয়েছে উদ্ধব। চতুরিকা উদ্ধব মারফত শ্রেষ্ঠীরই দূতী। উদ্ধবের সাহস নেই শ্রেষ্ঠীর প্রস্তাব দেবদত্তার কাছে নিয়ে যায়। যদি রাজার কানে যায় তার পদাবনতি ঘটে যাবে তা জানে উদ্ধব। প্রধান গণিকা শুধুমাত্র রাজারই মনোরঞ্জন করতে পারে তা কি জানে না উদ্ধব? এর ব্যতিক্রম ঘটাতে চায় যে সে তো রাজার অনুশাসনই লঙঘন করে। হুস হুস করল আবার চতুরিকা। দাঁড়কাকটি যেন শুনতে পায়নি, চুপচাপ, বড় গম্ভীর। মনে হয় ওর ভয়েই কোকিল পালিয়েছে এই গৃহ ছেড়ে।

বাগানের চাঁপা, চন্দন, আম, খেজুর, তমাল, কদম্ব, দাড়িম্ব সব যেন ছায়াবিহীন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাছগুলি যেন অন্নহীনের মতো ধুঁকছে। আমমঞ্জরীর চিহ্ন নেই। ক'বছর আগে দেখেছিল এই বাগানে আমমঞ্জরীর কী সুগন্ধ। বসন্তের কী সমারোহ। দেবদত্তা যেসব লতাপাতার নাম বলেছিল, তার কিছু কিছু তো মনে পড়ে যাচ্ছে চতুরিকার, অথচ কোনটা কোন লতা, কোন গাছ তা চেনেনা সে। দ্রাক্ষালতা চেনে, কিন্তু কোথায় তা? খুঁজেই পাওয়া যায়না। মনে পড়ে যাচ্ছে, একদিন গত বসন্তের আগের বসন্তে চতুরিকা দেখেছিল তমালগাছটিতে লতিয়ে ওঠা দ্রাক্ষালতা থেকে দ্রাক্ষা তুলে নিয়ে ধ্রুবপুত্রের হাতে সমর্পণ করছে দেবদত্তা। ভারী সুন্দর ছিল সে। যদি রাজারই অনুরাগিনী হয় দেবদত্তা, তবে সেই তরুণের কথায় এখনো চঞ্চল হয়ে ওঠে কেন? মেয়েমানুষের মন। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল চতুরিকা। অতসী ফুলের ঝাড়টি কেউ যেন দলে দিয়ে গেছে দু'পা দিয়ে। হায়রে। আচমকা চতুরিকার মনভার হলো সেই গৌরবর্ণের পুরুষটির জন্য, নীল দুটি চোখের জন্য, তার মায়াবী চাহনির জন্য, তার অপরূপ কণ্ঠস্বরের জন্য—হায় ধ্রুবপুত্র! তুমি কি জানো উজ্জয়িনী ছেড়ে গেছে বসন্ত?

দেবদত্তা চুপ করে বসেছিল মহাকাল মন্দিরের সুবর্ণ শিখরের দিকে চেয়ে। চতুরিকা দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল, সখী আমি এসেছি।

না ফিরে দেবদত্তা ডাকল, আয় চতুরিকে।

চতুরিকা দেখল সখীর মেলানো পা দুটিতে অলক্তের চিহ্ন নেই, চুল এলো করা, বেশবাস মলিন, রঙের চিহ্ন কম। পাশে বসল সে। সখীর মুখখানিতে যেন রাত্রি জাগরণের চিহ্ন। এমন তো হয়েই থাকে। কিন্তু দেবদত্তা তো তেমন গণিকা নয় যে সমস্তরাত তাকে মনোরঞ্জন করতে হবে অতিথির। কে এসেছিল তার গৃহে? রাজা? কই শোনেনি তো। সেনাপতি? আসবে না। শ্রেষ্ঠী? চতুরিকা জিজ্ঞেস করল, সখীর রাত কি নিদ্রাহীন গেছে?

হ্যাঁ, কী ভয়ানক যন্ত্রণা এই অনিদ্রার।

কে এসেছিল?

কে আসবে? দেবদত্তা আকাশে চোখ মেলেছে।

কেন শ্রেষ্ঠী, যে তোমার জন্য নিদ্রাহীন, সর্বস্ব দিতে চায়।

দিতে চায় দিয়ে যাক, তুই নিয়ে যাবি।

সখী আবার সেই সব্বোনাশ হবে, উদ্ধব আমার কোনো কিছুতেই অধিকার মানতে চায়না, সে আমার যম, যমকাকের মতো পাহারা দেয় আমাকে।

দেবদত্তা ফিরে তাকায়, কী করবি তাহলে?

কী করব?

ধনসম্পত্তি রাখবি কোথায়?

কী আমার আছে?

আমি যা দেব।

খিলখিল করে হাসল চতুরিকা, উদ্ধবের কাছে গচ্ছিত থাকবে।

যদি এই গৃহ, আমার অর্জিত সব দিই?

কেন দেবে? চতুরিকা আশঙ্কিত হয়ে ওঠে।

কেন, আমার ইচ্ছে, ইচ্ছে সর্বস্ব তোকে দিয়ে ভিখারিনী হয়ে যাই।

কোথায় যাবে, তুমি শ্রেষ্ঠীর নয়নের মণি, ভিখারিনী হবে কেন? চতুরিকা বলল।

থাম তুই। আগুন চোখে দেবদত্তা চতুরিকার দিকে তাকায়, তুই কি তার দূতী?

একী বলো সখী, তাহলে আমি যাই।

না, যাবি কেন, ওই বৃদ্ধর কথা আমার সামনে উচ্চারণ করবিনা, ও আমার নিদ্রাহরণ করেছে ওর পাপ দিয়ে, লোকটা কী হিংস্র, ধ্রবপুত্রকে নগর থেকে তাড়িয়ে দিল, এই নগর কি ওই শ্রেষ্ঠীর?

চতুরিকা বলল, যার ধনসম্পত্তি তারই তো সব।

লোকটার নাম শুনলে যেন শরীর অপবিত্র হয়ে যায়।

চতুরিকা বোঝে শ্রেষ্ঠীর কথা বলে লাভ নেই। শ্রেষ্ঠীর সুনাম করলে সে দেবদত্তার সন্দেহ ভাজন হয়ে উঠবে। কী কঠিন দায়িত্ব না তাকে দিয়েছে উদ্ধব। পালন না করতে পারলে তারই সব্বোনাশ। সে উত্তরীয়র কোণ পাকাতে পাকাতে নিম্নস্বরে বলল, আর একজনের দুর্নামে যে নগর ছেয়ে গেছে।

কে তিনি? চমকে উঠল দেবদত্তা।

তুমি জাননা সখী? রাজার কথা জাননা?

দেবদত্তা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, থাক রাজার নিন্দা করতে নেই।

নিন্দা করব কেন, দেবদাসীর সংবাদ তোমার শোনা তো?

তাহলে আবার তুলছিস কেন ওকথা?

বলছি তুমি কি জান সখী, রাজার পৌরুষ নেই? বলেই সরে যায় চতুরিকা। নিজের মনেই বুঝল এই পথই শ্রেষ্ঠপথ। রাজার উপর থেকে দেবদত্তার মন সরিয়ে আনতে পারলে অনেকটা কাজ হয়। হায়! সে কী কাজেই না নেমেছে! এর চেয়ে চতুরিকা এখন দেবদত্তার কাছে পুষ্পসজ্জা শিখতে পারত, বীণাবাদন।

দেবদত্তা বলল, চতুরিকে তুই কী কথা বলতে এলি, অভ্যাস করবিনে নৃত্য?

চতুরিকা বলল, সখী, এখন কি তুমি আনন্দে আছ যে আমি বলব?

তাহলে চুপ করে থাক।

আমি তো চুপ করেই, কিন্তু রাজার কথাটা কি তোমার জানা নেই? তুমি না রাজার আদরের গণিকা, তোমার মা যেমন ছিলেন।

দেবদত্তা সন্দেহভরা চোখে চতুরিকাকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে, তারপর বলে তোকে কি তোর উদ্ধব পাঠিয়েছে?

উদ্ধব আমার নয়, সে বড় খল প্রকৃতির।

তাহলে কে পাঠিয়েছে বল, নিশ্চয়ই তুই শ্রেষ্ঠীর দূতী হয়ে এসেছিস, না হলে তোর মুখে রাজ নিন্দা, শ্রেষ্ঠীর প্রশংসা কেন, রাজা যেমন হন তিনি রাজাই, তার নিন্দায় জিভ খসে যায়, বল চতুরিকে সত্যি কথা বল।

চতুরিকা ভেঙে পড়ছিল। নিজেকে তার সামলাতে পারছিল না। প্রখর বুদ্ধি ধরে দেবদত্তা, চতুরিকার মুখের ভাবেই ধরে ফেলেছে তার গোপন উদ্দেশ্য। চতুরিকা কেঁদে ফেলল, সখী, উদ্ধব শয়তান যে আমাকে স্থির থাকতে দেয়না।

দেবদত্তা বলল, চারদিকে কেমন ভয়ের ভার যেন, এমন আমি দেখিনি কোনোদিন, তুই উদ্ধবকে বল সময় লাগবে, সময় চেয়ে নে, আমি অপেক্ষা করি যদি সে আসে ফিরে।

কে, কার কথা বলো?

কেন ধ্রুবপুত্র।

তাহলে রাজা, রাজার অনুরাগিনী যে তুমি?

শ্রেষ্ঠীর হাত থেকে বাঁচতে রাজাই আশ্রয় রে চতুরিকে, কত কৌশল করেই না মেয়েমানুষের রক্ষা পেতে হয় দুষ্টের হাত থেকে, আমি ভালবাসি হারিয়ে যাওয়া ধ্রুবপুত্রকে, তার জন্য বসে আছি।

চতুরিকা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল দেবদত্তার দিকে। এও কি এক কৌশল, যে কৌশলে স্ত্রীজাতি নিজেকে রক্ষা করে? রাজার কলঙ্ক কথা এখন মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে। রাজা পাপ করেছেন। দেবদাসীকে ধর্ষণ করেছেন মহাকাল মন্দিরে। রাজার পাপেই অনাবৃষ্টির কাল বয়ে যাচ্ছে অবন্তীদেশে। ফসল হয়নি। জল নেই সাত সরোবরের কোথাও। বসন্ত আসেনি। ফুল ফোটেনি। দুর্বৃত্তরা শক্তিমান হয়ে উঠছে দিনে দিনে। এমন সময়ে রাজার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করাও যে পাপ। তাই কি ধ্রুবপুত্রের কথা বলা? যতই বলুক দেবদত্তা, রাজনিন্দা গর্হিত অপরাধ, সে তো মনে মনে জেনেছে রাজা এখন নিন্দার যোগ্য হয়ে উঠেছেন। এখন তাঁর নিন্দায় জিভ খসে যাবে না? কিন্তু ধ্রুবপুত্রের কথা বলে দেবদত্তা কী ভাবে দূরে রাখবে শ্রেষ্ঠীকে? ধ্রুবপুত্রকে নির্বাসন দিয়েছেন তিনি দেবদত্তাকে অধিকার করার জন্য। এখন যদি শোনেন সে বসে আছে ধ্রুবপুত্রের জন্য, কী অনর্থই না বাঁধবে।

দেবদত্তা যেন আন্দাজ করল চতুরিকার মনের ভাব, বলল, তোর বিশ্বাস হয়নি?

তুমি তো কোনোদিন বলোনি একথা?

বলেছি, তুই বুঝতে পারিসনি।

চতুরিকা বলল, সখী তোমার জন্য শ্রেষ্ঠী উন্মাদ, তিনি এই নগরের শ্রেষ্ঠ ধনবান, কত মনিমাণিক্য তাঁর ঘরে, এখন যদি তিনি শোনেন তাঁরই আশ্রিতের জন্য বসে আছ তুমি, সব্বোনাশ হয়ে যাবে।

কে কার আশ্রিত?

ধ্রুবপুত্র শ্রেষ্ঠীর দয়ায় ছিল এই নগরে।

তার পিতা ছিলেন শ্রেষ্ঠীর অন্তরঙ্গ বয়স্য, দুজনে বাণিজ্যে গিয়েছিলেন তাঁরা, শ্রেষ্ঠীর ধনসম্পদে ধ্রুবপুত্রের অধিকার আছে।

কে বলেছে, সে? চতুরিকা জিজ্ঞেস করে।

না আমি জেনেছি, ধ্রুবপুত্রকে আশ্রয় দেবে সে শক্তিই নেই শ্রেষ্ঠীর, এই মহাপৃথিবী তার আশ্রয়।

চতুরিকা দেখছে দেবদত্তার দুচোখ চকচক করছে জলে। ধ্রুবপুত্রের কথা ওঠায় কি কান্না এল ওর মনে? দেবদত্তা কি সত্যিই তার জন্য বসে আছে, নাকি শ্রেষ্ঠীকে ভয়ানক আঘাত করতে ওই কথা বানানো? দেবদত্তা মাথা নামিয়ে আছে নিশ্চুপ। চতুরিকার মাথাটিও কোলের কাছে নেমে এল যেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলল চতুরিকা। হে মহাকাল। মানুষ কত অসহায়। শ্রেষ্ঠী ধনপতি হয়েও হেরে যাচ্ছেন যার কাছে সে তাঁর আশ্রয়েই ছিল বটে, প্রায় ভূমিশূন্য মানুষ, কানাকড়িও নিজের নেই।

চতুরিকা বলল, কী বলব উদ্ধবকে?

বলবি ধ্রুবপুত্রের কথা, সে না ফিরলে ব্রত উদযাপন হবে না।

কী ভয়ানক কথা বলছ তুমি, শ্রেষ্ঠীর কানে গেলে কী যে হবে!

মহাকাল আছেন। অস্ফুট উচ্চারণ করল দেবদত্তা।

চতুরিকা বলল, আমি এর ভিতরে নেই, আমার মুখে ধ্রুবপুত্রের কথা শুনলে শ্রেষ্ঠী আগুন হয়ে যাবেন, যা বলার তুমিই বলো, হ্যাঁ শোনো, যদি পার ধ্রুবপুত্রের কথা গোপনই রেখ।

কেন?

ধনপতির মান বাঁচাতে।

দেবদত্তা ভাবতে লাগল। কিন্তু ধনপতি শ্রেষ্ঠীর প্রতি তার কোনো মায়াই নেই, বরং আছে গোপন ঘৃণা। শ্রেষ্ঠীকে আঘাত সে দেবেই। মান বাঁচাবেনা।

চৌত্রিশ

চৈত্র পূর্ণিমা এসেছিল বৈশাখের আরম্ভে। তারপর ক'দিন বাদে কৃষ্ণপক্ষের ঘোর অন্ধকারে জ্বলে উঠল শূদ্রপল্লী। আগুন মুহূর্তে খেয়ে নিল পর্ণকুটিরগুলিকে। শুকনো গাছগাছালিও জ্বলে উঠল আগুনের ছোঁয়ায়। আর্তনাদে, বিলাপে নগরের আকাশ ভরে উঠল। আগুনের লকলকে জিভ আকাশ ছুঁয়ে ফেলল

যেন। আকাশেও যেন আগুন ধরে গেল। ওই আকাশ কতদিন জলহীন, শুষ্ক, ভেসে আছে অবন্তীর উপরে। আগুন তাকেও পুড়িয়েছিল।

আগুন যে নেভাবে সে উপায়ও নেই। কোথায় জল? লেলিহান আগুন নিজে নিজেই জ্বলল, শেষে নিজে নিজেই থামল। এর ভিতরে যে পারল মুরগি, শূকর, গাধা, মহিষ, মেষগুলিকে ছেড়ে দিল অন্ধকারে। তারা পালিয়ে বাঁচল। কিছু বাঁচল, কিছু বাঁচল না। আগুনে পুড়ল। মানুষও কিছু মরল। চলনশক্তি রহিত এক বুড়ি পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেল। তার মরণ কান্না শুনল বুড়ো পরাশর। কেউ এগোতেই পারল না।

এমন আগুন কেউ দ্যাখেনি আগে। আগুন যেন একসঙ্গেই ঘরে ঘরে জ্বলে উঠেছিল। শূদ্রপল্লী তখন ঘুমিয়েই ছিল প্রায়। কৃষ্ণা নবমী তিথি। চাঁদ তখন পুব আকাশে অগ্নিবর্ণ হয়ে জেগে উঠছে মাত্র।

শেষ রাত্রে এলেন শ্রেষ্ঠী। তাঁর পিছু পিছু ঘোড়ায় চেপে আসছেন সেনাপতি। কথা আছে সেইরকম। রত্নাকর সাগরের পাড়ে বসে বিলাপ করছিল মানুষজন। দূরে ধিকিধিকি জ্বলছে সব। শিমূল গাছটির ডালে ডালে আগুন। আগুনের বিন্দু ফোটা ফোটা পড়ছিল পোড়া ঘাসের উপর। ধোঁয়ার গন্ধ ছেয়ে ছিল চারদিকে।

শ্রেষ্ঠীর রথের শব্দে জানা গেল তিনিই আসছেন। রথে দাঁড়িয়ে শেষ রাতের অন্ধকারে শ্রেষ্ঠী হাঁক দিলেন, উতঙ্ক হে, খোঁজ নে কেন আগুন লাগল।

অন্ধকারে উতঙ্কর হাতের প্রহরণ সাঁই সাঁই করে ঘুরল। ম্রিয়মান জ্যোৎস্নায় ধিকিধিকি জ্বলা আগুনের আলোয় দেখা গেল শ্রেষ্ঠী নামছেন। তাঁকে দেখে শূদ্রপল্লীর শতেক মানুষজন কেঁদে উঠল, উতঙ্ক, উতঙ্ক এল! হে প্রভু, এক ফোটাও জল নেই যে আগুনে দেব।

শ্রেষ্ঠী বললেন, এমন আগুন শতযোজন দূর থেকেও দেখা গেছে।

কাঁদতে কাঁদতে কে যেন বলল, এমন কখনো হয়নি এ জীবনে।

তবে হলো কেন?

প্রভু! কে আছে কে নেই জানিনা, মানুষ কত মরল। আমরা ভিখিরি হয়ে গেলাম, সর্বস্ব গেল।

কেন হলো?

কে যেন আগুন দিয়ে গেল। অন্ধকারে শোনা গেল এইকথা। কথাটা উঠতেই শ্রেষ্ঠী সতর্ক হলেন। তিনি বললেন, কে বলছে ওকথা?

আর জবাব এল না। জবাব এলনা মানে যে বলেছে কথাটা সে সতর্ক হয়েছে। এই সতর্কতার অর্থ সে এমন কিছু জেনেছে বা দেখেছে যা বলতে তার ভয় করছে। শ্রেষ্ঠী ডাকলেন, পরাশর, পরাশর কোথায়?

আছি অন্ধকারে।

পরাশর আগুন লাগল কেন?

জানিনা প্রভু।

আগুন কি আকাশ থেকে নামল?

জানিনা প্রভু।

অন্ধকারে কেউ বলল, আকাশ থেকেই নামল প্রভু।

সেই কণ্ঠস্বরই, যে কণ্ঠস্বর একটু আগে বলেছে কারোর আগুন লাগিয়ে দেওয়ার কথা। শ্রেষ্ঠী টের পেলেন হয়ত উতঙ্ক কোনো একজনের কাছে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেনি। তা যদি হয়ে থাকে, তাহলে সেই লোকটিকে শনাক্ত করা প্রয়োজন। অন্ধকারে কত মানুষ। সবাই কথা বলছে, বিলাপ করছে। মানুষের গুঞ্জনে দগ্ধরাত্রি ছেয়ে আছে। এর ভিতর থেকে লোকটাকে আলাদা করে চেনা যাবে কীভাবে? শ্রেষ্ঠী ডাকলেন, কে বলছ, এগিয়ে এস।

এগিয়ে এলনা কেউ। শ্রেষ্ঠীও চুপ করে গেলেন। অপেক্ষা করা প্রয়োজন। হয়ত কথাটা আর নাও উঠতে পারে। সেনাপতি কুমার বিক্রম আসছেন। কাল সকাল থেকে অন্নসত্র বসে যাবে এখানে। তারপর সাহায্য করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে নেমে আসা অগ্নির কথা ছড়িয়ে দিতে হবে। ছড়িয়ে যাবে আপনা আপনিই।

বুড়ো পরাশর বলল, দাঁড়িয়ে দেখতে হলো, কী আগুন! জল ঢালা হলো কূপ থেকে তুলে কয়েক

কলসি, ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেছে আগুনের কিছু হয়নি, প্রভু কীভাবে হলো কেন হলো, আমরা তো আপনারই অনুগত।

শ্রেষ্ঠী ঠোঁট দাঁতে চাপলেন। আবার সন্দেহটা চাগাড় দিচ্ছে। উতঙ্ককে কি দেখে ফেলেছে কেউ? উতঙ্ক কথা বলেনা, কিন্তু তার উপস্থিতিও তো ভয়ানক। কী সব্বোনাশ। শ্রেষ্ঠী ডাকলেন, উতঙ্ক, উতঙ্ক হে, আবার কি নিদ্রা গেলি, উতঙ্ক সন্ধ্যা থেকেই নিদ্রিত ছিল, রাত্রে বের হতে চায়না, অন্ধকারে ও নাকি কম দ্যাখে।

অন্ধকারে কেনা কম দ্যাখে। জবাব এল গুঞ্জন থেকে।

শ্রেষ্ঠী বললেন, আমি গবাক্ষ থেকেই দেখেছি আকাশ লাল, আমি তখনই টের পেয়েছি তোমাদের এখানে আগুন লেগেছে, দাসীকে পাঠালাম উতঙ্ককে ডাকতে, উতঙ্ক ওঠেই না, আমি জানি রাতের অন্ধকারকে ও ভয় পায়।

কে যেন বলল, সকলেই ভয় পায় শুধু নিশাচর ছাড়া।

শ্রেষ্ঠী বললেন, কী আগুন! আসছেন সেনাপতি, তাঁর কাছে খবর পাঠালাম আমি, কিন্তু উতঙ্ক কি আবার ঘুমোল, কোথায় উতঙ্ক, উতঙ্ক হে, এদিকে আয়।

থাক, যদি ঘুমায় ঘুমাক, ওকে দেখলে শরীর কাঁপে। বুড়ো পরাশর বলল।

থাক উতঙ্ক, উতঙ্ক রথেই থাক, রাত ফুরোলে উতঙ্ক তোমাদের সঙ্গে হাত লাগাবে, হ্যাঁ বলো দেখি কীভাবে লাগল আগুন।

অন্ধকার নীরব, পোড়া গন্ধ ভারী হয়ে উড়ছে। বৈশাখের পশ্চিমা বাতাস পোড়াগন্ধ পুবের দিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চাঁদের অগ্নিবর্ণ এখন রূপালী হয়েছে। আকাশের তারাগুলি একসময় চোখের আড়ালে চলে গিয়েছিল ধোঁয়া ধুলো আর বিলাপে। এখন সব চোখে পড়ছে। মেয়েপুরুষ শিশু, বৃদ্ধরা সবাই সরোবরের চারদিক ঘিরে বসে আছে। মধ্যিখানে অতল গহ্বর। সরোবরে জল নেই যে তা ধরা যাচ্ছে সরোবরে কোনো গ্রহ তারার ছায়া নেই, চাঁদের ছায়া নেই, যা জলের উপর সমস্ত রাত ভেসে থাকে। সরোবরের ভিতরে অন্ধকার, যেন ছাইপোড়া হয়ে পড়ে আছে নিশ্চল। সকলে অপেক্ষা করছিল রাত পোহানোর। রাত না পোহালে যাওয়া যাবে না ওই অগ্নি কুণ্ডের দিকে। এখন শ্মশানের চিতার মতো জ্বলে যাচ্ছে সব।

শ্রেষ্ঠী বললেন, আমি আর থাকতে পারিনি, আমি তো তোমাদের পালক নই, রাজাও নই এ দেশের, কিন্তু আমার বুক হু হু করে উঠল, তোমার মুখটা মনে পড়ল পরাশর, সেনাপতি আসছেন, তোমরা তাঁর সৈনিক।

কে যেন বলল, আমাদের ঘরে দীপ জ্বলে না প্রভু, চাঁদের আলো থাকলে সেই আলোয় কাজ সারি, না হলে দিনের আলোয় সব হয়, আগুনের চিহ্ন ছিল না কোনো ঘরে, কী করে আগুন লাগবে কেউ যদি না পোড়ায়।

কে আগুন জ্বেলেছিল তা কে জানবে? ভৎর্সনা করে ওঠে পরাশর।

শ্রেষ্ঠী বললেন, এ আগুন আপনা আপনি জ্বলে উঠতেও পারে।

হ্যাঁ হ্যাঁ পারে। বুড়ো পরাশর যেন দিশা খুঁজে পেল, আমি দেখেছিলাম এরকম, দক্ষিণ দেশের মলয় পর্বতের কোলের জঙ্গলে, এমনিতে আগুন লেগে গিয়েছিল সেখানে।

কিন্তু প্রভু যে ঘরে আগুন লেগেছিল প্রথমে, সে ঘরে কোনো মানুষ থাকে না, ভেড়া ছিল, ভেড়ারা তো আগুন জ্বলতে পারে না, ইতর প্রাণী।

শ্রেষ্ঠী টের পেলেন যে বলছে সে তার মত থেকে সরে যেতে চাইছে না। তার মানে সে জেনে গেছে উতঙ্কর কথা বা কোনো মানুষের কথা। কিন্তু আগুনের স্বয়ং জ্বলে ওঠার কথাটাই তো ছড়িয়ে যাওয়া দরকার। কে যেন বিলাপ আরম্ভ করল ওই দূরে। এখন চাঁদের আলোয় সামনের মানুষকে দেখা যাচ্ছে। তিনি দেখছেন মাটিতে বসে, হাঁটুর উপর মুখ রেখে বুড়ো পরাশর ভীত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে। সেনাপতি আসছেন না কেন এখনো? সেনাপতি এলেই সবাই আগুনের কথা থেকে সরে যাবে, কীভাবে আগুন লেগেছে তা বুঝে নেওয়ার চেয়ে বাঁচার রসদ প্রার্থনা করে তার ব্যবস্থা করা অনেক জরুরি হয়ে উঠবে।

শ্রেষ্ঠী বললেন, সেনাপতি আসছেন।

আসুন প্রভু! এসে দেখে যান আমাদের কী হলো, কোন পাপে সব ছাই হয়ে গেল, আমরাও যদি ছাই হয়ে যেতাম, বেঁচে যেতাম।

কে যেন কার জন্য কাঁদতে আরম্ভ করল। অন্ধকারে যারা এখানে আসতে পারেনি, তারা আগুনের ভিতরে থেকে গেছে। শ্রেষ্ঠী পায়চারি করতে করতে বললেন, আমি দেখেছি ভয়ানক আগুন নেমে আসতে।

প্রভু! অস্ফুট ধ্বনি শুনলেন শ্রেষ্ঠী।

পাপের ভার সম্পূর্ণ হলে আগুন এইভাবেই নামে।

প্রভু!

শ্রেষ্ঠী বললেন, অর্থ দেব আমি, কোনো ভয় নেই, যা গেছে তা আবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

প্রভু কী বলছেন?

শ্রেষ্ঠী ফিরতে লাগলেন, কেননা আবার কে যেন বলতে শুরু করেছে আগুনটা কেউ লাগাল,আগুন আপনা আপনি জ্বলেনি...।

শ্রেষ্ঠীর পিছনে পিছনে পরাশর আসছে। পরাশর বলছে, ওসব কথা মনে নেবেন না প্রভু, মহাকালের রোষ এসব।

না!-বলল কে যেন। শুনলেন শ্রেষ্ঠী, কিন্তু কে বলেছে তা দেখতে পেলেন না। ধন্ধ হলো, কেউ কি সত্যিই না বলল, নাকি তিনি শব্দের বিভ্রমে পড়েছেন। ওই যে অন্ধকারে অঙ্গার হয়ে যাওয়া পল্লীর দিক থেকে বিদেহীর মতো মানুষজন আসছে, আবার যাচ্ছেও সেদিকে। এখনো জ্বলছে মাটি। শ্রেষ্ঠী ডাকলেন, উতঙ্ক!

উতঙ্ক কই? ওই তো রথ। রথের ভিতরে গুঁড়ি মেরে বসে আছে সে। শ্রেষ্ঠী চাঁদের আবছা আলোয় দেখলেন উতঙ্কর মুখখানিতে ভয়ের ছায়া যেনবা। নাকি তা নেই, তিনি নিজেই এসব ভেবে নিচ্ছেন।

পরাশর কাছে এল, প্রভু! উতঙ্ক যেন আর না আসে।

কেন?

কেন তা জানিনা, উতঙ্ককে বড় ভয় করে।

শ্রেষ্ঠী গর্জন করে উঠলেন নিজের সমস্ত সংকোচ ফেলে রেখে, জল যে কারণে ফুরিয়েছে সরোবরে, সেই কারণেই আগুন লেগেছে, উতঙ্ক হে আবার ঘুমোলি নাকি, রাত পোহায়ে যায় যে।

উতঙ্ক তার রক্তশূন্য মুখ তুলল। যেন ভয়ই পেয়েছে উতঙ্ক। নাকি চাঁদের পান্ডুর আলোয় সবকিছু পান্ডুর। শ্রেষ্ঠী ঘুরে তাকালেন। বুড়ো পরাশর এসেছে। ঠিক তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে। সরোবরের ধার থেকে কান্না ভেসে আসছে।

উতঙ্ক ফিরে চল। শ্রেষ্ঠী ডাকলেন।

উতঙ্ক রথ থেকে নেমে এল। ঘোড়ার রাশ ধরতেই চিঁহি চিঁহি ডেকে উঠল ঘোড়া দুটি। এতক্ষণে তারাও যেন ভয়পেল। শ্রেষ্ঠী উঠবেন তো পরাশর বলল, প্রভু একে নিয়ে আর আসবেন না, ওহ্ হো, কী ভয় না করে, আমাদের সব্বোনাশ হলো এতে কার পুণ্য হলো!

কেন, কেন হে।

বলতে পারবনা প্রভু! চাপা গলায় আর্তনাদ করল যেন পরাশর, কী পাপে আমাদের সব ছাই হয়ে গেল, আমরা তো কোনোদিন মাথা তুলে কথা বলিনা প্রভু।

প্রভু সুভগ দত্তর গা হিম হলো আচমকা। এখন মনে হচ্ছে উতঙ্ককে এরা চিনে ফেলেছিল যে তা উতঙ্কও জানে। খুব সাহসী, নিষ্ঠুর উতঙ্ক এবার ভেঙে পড়ছে যেন। উতঙ্কর চাপা কান্না শোনা যাচ্ছে কি? কাঁদছে সে? কোনোদিন তো তার কান্না দ্যাখেননি শ্রেষ্ঠী। কিন্তু এরা তো উতঙ্কর নাম করেনি। উতঙ্ককে কোনো অভিশাপ দেয়নি। শুধু বলছে সে যেন আর না আসে। তাতেই ভেঙে পড়ল নিষ্ঠুর। উতঙ্ক ফিরেছিল পরম উল্লাস নিয়ে। উতঙ্কই শ্রেষ্ঠীকে আগুন দেখিয়েছিল গবাক্ষ থেকে। দুজনে দাঁড়িয়ে ছিলেন বহু সময়। আগুনের জিহ্বা আকাশ চেটে নিচ্ছিল। শ্রেষ্ঠীর মনে হচ্ছিল যদি লুকোনো মেঘও থাকে আকাশের কোথাও এককণা তা খেয়ে নিয়েছে আগুন। শ্রেষ্ঠী আসতে চাননি রাতে। কিন্তু উতঙ্কর

উৎসাহ বেশি। সে দেখতে চায় কতটা পুড়ল। নিজে কী করে এসেছে তা চোখে না দেখে তৃপ্তি হচ্ছিল না উতঙ্কর।

পরাশর বলল, চিন্তা নেই, আমাদের সাধ্য কী আগুনের কথা বলি, কিন্তু ওই উতঙ্ক যেন না আসে, ওকে দেখলে মাথা ঠিক রাখতে পারবে না মানুষ।

কেন, কেন হে।

প্রভু সব উতঙ্ক জানে! ফিসফিস করে বলল বুড়ো পরাশর, ওর কাছে জেনে নিয়ো প্রভু যদি না জানা থাকে, হায় হায়! কবে এ দেশে এমন দিন এসেছে, ওহে উতঙ্ক, যাও চলে যাও প্রভুকে নিয়ে।

উতঙ্ক রথে উঠেই রাশ আলগা করে প্রহরণ ঘোরায় দুই ঘোড়ার পিঠে। অশ্বের হ্রেষাধ্বনিতে অন্ধকার কেঁপে ওঠে। উতঙ্কের চাবুক এসে পড়ল বুড়ো পরাশরের পিঠে। চাপা আর্তনাদ করে ছিটকে গেল বুড়ো। উতঙ্ক শোধ নিয়েছে। দাঁতে দাঁত ঘষে চাঁদের আলোয় ছুটিয়ে দিল রথ।

শূদ্রপল্লী পিছনে পড়ে থাকল। বিলাপ, ক্রন্দন ক্রমশ দূরে সরে গেল। পোড়া গন্ধ সরে গেল চারপাশ থেকে। শ্রেষ্ঠীর গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে। কিন্তু উদ্বিগ্ন শ্রেষ্ঠীর কোনোদিকে মন নেই, দুচোখ বন্ধ করার উপায়ও নেই। তিনি চাপা গলায় ডেকে উঠলেন, তোকে দেখতে পেয়েছিল?

প্রভু হ্যাঁ। উতঙ্কর গোঙানি শুনলেন শ্রেষ্ঠী।

কে দেখেছিল পরাশর?

প্রভু হ্যাঁ। উতঙ্ক প্রহরণ আঘাত হানে ঘোড়া দুটির পিঠে।

আর কেউ?

প্রভু হ্যাঁ। উতঙ্কর হিংস্র গলা শুনলেন শ্রেষ্ঠী, যে দেখেছে তাকে মেরে ফেলবে উতঙ্ক, প্রভু যদি অনুমতি করেন।

প্রভু সুভগ দত্ত ভয় পেলেন, তুই কী সব্বোনাশ করলি উতঙ্ক, এখন তোর কী হবে! রাজার কানে গেলে, সেনাপতির কানে গেলে, উতঙ্ক হে, তোকে চিনে ফেলেছিল সবাই?'

উতঙ্ক জবাব দিল না।

পঁয়ত্রিশ

শূদ্র, নারী এবং দাস বিশ্বাসের উপযুক্ত নয়। উতঙ্ক সর্বনাশ করে দিয়েছে এই অবন্তীদেশের। অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল সিংহাসন অধিকারের, জেনে বুঝে শূদ্ররা রাজার বিপক্ষে যাবে কেন? প্রধান পুরোহিত বলছিলেন উতঙ্কের ভিতরে দানব লুকিয়ে আছে। উতঙ্ককে তিনিও ভয় করেন। কেন যে ভয় হয় তাঁর তা জানেন না। উতঙ্ককে দেখলেই গা হিম হয়ে আসে কেন? ওর ভিতরের দানবটিকে তিনি দেখতে পান মনঃচক্ষুতে।

আছেন এখন সেনাপতি বিক্রম এবং প্রধান পুরোহিত। শ্রেষ্ঠীর আসার কথা, এখনো আসেননি। দুজনে শ্রেষ্ঠীর পদশব্দের জন্য কান পেতে আছেন। পূর্ণিমার পর এখন বৈশাখের কৃষ্ণপক্ষ ব্যাপ্ত। ঘরে দীপ জলছে। দীপের আলোয় দুটি মানুষের ছায়া মস্ত হয়ে কাঁপছে পাথরের দেওয়ালে। বাতাস নেই আজ কোথাও। গুমোটে এই ঘর দমবন্ধ অবস্থায় আছে যেন।

বিক্রম বললেন, শূদ্র পল্লীর সকলে জানে উতঙ্কই আগুন দিয়ে গেছে, রাজার পাপে তাদের যে এই সর্বনাশ, সে কথা কেউ বলছে না, আমার কাছে ভেঙে পড়েছে সবাই, ভয়ে তারা উতঙ্ককে কিছু বলতে পারেনি, শ্রেষ্ঠীর দাসটি অতি নিষ্ঠুর।

হ্যাঁ, সে কথা কে না জানে, শ্রেষ্ঠী তাকে ওই ভাবে তৈরি করেছেন। বললেন পুরোহিত।

কেন?

ধনরত্ন রক্ষা করতে হলে অমন দাসই প্রয়োজন হয়।

তাহলে। আমাদের সামনে থেকে সুযোগ চলে যাচ্ছে দ্বিজদেব.....। কথা বলতে বলতে থামলেন সেনাপতি। পায়ের শব্দ পাচ্ছেন তিনি। শ্রেষ্ঠীই আসছেন। দেবদাসী তো নূপুরের শব্দ শোনায়। অনুমান ভুল হল না। এলেন শ্রেষ্ঠী। তার মুখখানি উদ্বিগ্ন, চিন্তাক্লিষ্ট। নগরে এও রটেছে তা জানতেন না শ্রেষ্ঠী। জানতেন না তাই উতঙ্ককে নিয়েই ছুটে গিয়েছিলেন রত্নাকর সাগর ধারে। শ্রেষ্ঠী তাঁর আসন গ্রহণ করে

দেখলেন প্রধান পুরোহিত এবং সেনাপতি বিক্রমের কপালে চিন্তার ভাঁজ। তিনি দুটি রেশম পেটিকা রাখলেন মেঝেতে। অস্ফুট গলায় বললেন, আপনারা গ্রহণ করুন।

নেওয়া যাবে কিন্তু একী করেছে উতঙ্ক? প্রধান পুরোহিত বললেন।

জানিনা সত্যিই ওরা তাকে দেখেছিল, না শোধ নিতে উতঙ্কর কথা বলে বেড়াচ্ছে, উতঙ্ক তো নিষ্ঠুর, উতঙ্কর প্রহারে কত জন রক্তাক্ত হয়েছে! শূদ্রপল্লী সুযোগ পেয়েছে এইটি।

নাকি এও এক নিষ্ঠুরতা? ধীরে ধীরে বললেন সেনাপতি বিক্রম, সকলের সম্মুখে অগ্নি সংযোগে হিংস্রতা শিখরে উঠেছে, উতঙ্ক তাইই করেছে, সকলকে জানিয়ে তাদের সর্বস্ব পুড়িয়ে দিয়েছে, এই রকম নির্দেশ ছিল?

কেন থাকবে এমন নির্দেশ? শ্রেষ্ঠী বিব্রত এবং বিরক্তও।

তারপরেও উতঙ্ক নিয়ে গেছে আপনাকে, সে নিজে দেখতে চেয়েছিল তার নিষ্ঠুরতার ফলাফল, আপনাকে দেখাতেও চেয়েছিল।

চুপ করে আছেন শ্রেষ্ঠী। তাঁর মনে পড়ছিল আগুন দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে ফিরে এল উতঙ্ক। ভয়ানক উল্লাসে সে কাঁপছিল। সে আর দেরি করতে চাইছিল না। রথে ঘোড়া জুতে অপেক্ষা করছিল। বুড়ি দাসীকে বারবার পাঠাচ্ছিল প্রভুর কাছে। প্রভু চাঁদের আলোয় রত্নাকর সাগর ধারে যাবেন। তখন ওই দিকের আকাশ লাল।

সেনাপতি বিক্রম বলছিলেন সুযোগটা চলে যাচ্ছে। এই একটি ঘটনা রাজার পক্ষে চলে যাচ্ছে। এত যে বৃষ্টিহীনতা, খরা, জলহীনতা, ফসলহানি, দেবদাসী ধর্ষণ, পথেঘাটে লুণ্ঠন, রাজার সন্তানহীন জীবন, কুশাসন—সবই মুছে গেছে উতঙ্কর নিষ্ঠুরতায়। সবাই এখন উতঙ্কর কথা বলছে। কেউ বলছে না রাজার পাপে এই ঘটনা ঘটছে। শ্রেষ্ঠীর নিষ্ঠুর দাস কত নিষ্ঠুর তা বলতে গিয়ে নগরবাসী বলছে সেই রাতেই দগ্ধ শূদ্রপল্লী দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল সে শ্রেষ্ঠীকে। শ্রেষ্ঠী জানতেন না। শ্রেষ্ঠী যদি একা যেতেন উতঙ্কর কথা শুনতে পেতেন। পরে ওইরাত্রে উতঙ্ককে আবার দেখে ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল শূদ্রজনেরা। উতঙ্ক যেন মূর্তিমান ভয়। নিরীহ শূদ্ররা বুঝে উঠতেই পারছে না উতঙ্ক এমন কেন? তার রথের ধারে কোনো দরিদ্রজন, শূদ্র বালকও এসে গেলে প্রহরণ এসে পড়ে পথচারীর গায়ে। উতঙ্ক কেন আগুন দিল তাদের কুটিরে?

শ্রেষ্ঠীর গায়ে লাগছিল তাঁর নিজ হাতে তৈরি দাসের নিন্দা। সেনাপতি বলছেন, শূদ্ররা যদি তাঁর কাছে বিচার না পেয়ে রাজার কাছে যায়, সে এক ভয়ানক ঘটনা হবে। রাজার কাছে সুবিচার পেলে তারা রাজাকে রক্ষা করবে প্রাণ দিয়ে। হীন জাতিহলেও শূদ্রজাতি অবিশ্বাসী নয়, বিশ্বাসঘাতক নয়, প্রভুকে তারা ঈশ্বরের মতো দ্যাখে। এরপর কি আর সিংহাসন অধিকার করা যাবে নগরবাসী যদি রাজার পাশে থাকে সেনাধ্যক্ষকে ছেড়ে?

শ্রেষ্ঠী বললেন, তাহলে কী উপায়?

উতঙ্ক এত নিষ্ঠুর কেন? জিজ্ঞেস করলেন প্রধান পুরোহিত।

এ প্রশ্ন অবান্তর, আমার মনে হয় ওরা কোনো সত্য খুঁজে না পেয়ে উতঙ্ককেই শেষ করে দিতে চায় এই অজুহাতে। উতঙ্ক কেন সকলের সামনে আগুন দেবে? দিলে তাকে ধরবে না কেন শূদ্রজনেরা, আর যদি না ধরতেই পারে, আমি যখন গেছি তাকে নিয়ে তারা তো কোনো কথাই বলেনি।

সেনাপতি বিক্রম বললেন, এর ব্যাখ্যা তো দিয়েছি, এখন ওই নিষ্ঠুর দাসের শাস্তি না হলে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে যাবে।

শ্রেষ্ঠী বললেন, অবন্তী দেশের কল্যাণের জন্য আমি উতঙ্ককে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারি, এখন সে গৃহবন্দী রয়েছে, তাকে দেখে বুঝতে পারবেন সে কতটা নির্দোষ, যত নিষ্ঠুর মনে হয় ততো নিষ্ঠুর নয়, সেই রাতের পর থেকে কখনো কাঁদছে, কখনো মৌন হয়ে থাকছে, আঘাতে ব্যক্তিবিশেষকে রক্তাক্ত করা আর একটি পল্লীতে অগ্নিসংযোগ এক বিষয় নয়, আগুন দিয়ে উতঙ্ক ভয় পেয়ে গেছে, সে ভাবতে পারেনি আগুন এভাবে সব কিছুকে ধ্বংস করে দিতে পারে, নির্বোধ দাস, জানত না আগুনের শক্তি এমন।

আপনি কী বলতে চান?

কিছুই বলছি না, বলছি যারা উতঙ্ককে শেষ করে দিতে চায় তারা শূদ্র, শূদ্রের কথা কি সত্য হবে? এরপর তারা যে দাবি করবে তাইই মেনে নিতে হবে।

পুরোহিত জিজ্ঞেস করলেন, উতঙ্ক কি শূদ্র নয়?

পাহাড়িয়া।

পাহাড়িয়ারা কি শূদ্র নয়, শূদ্রই, সে যখন দাস, সে শূদ্রই, শূদ্রর কথা শোনা হবে কেন, শূদ্রপল্লী পুড়েছে, তারা সব রত্নাকর সাগরের ধারে বসে আছে, তাদের সর্বস্ব গেছে, এখন শূদ্র উতঙ্কর প্রাণ যাক অবন্তী দেশের সেনাপতির সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য,উতঙ্ক শ্রেষ্ঠীর দাস, তার যদি মৃত্যু হয় তবে অবন্তীর কল্যাণ হবে, কল্যাণ হবে।

প্রধান পুরোহিতের কথায় গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। শ্রেষ্ঠী কেঁপে উঠেছেন। তিনি ভাবতে পারেননি উতঙ্কর মৃত্যুদণ্ডের কথা উচ্চারণ করতে পারবেন দ্বিজদেব। তাঁর আদেশেই উতঙ্ক গিয়েছিল শূদ্রপল্লীতে আগুন দিতে। কথা ছিল সে লুকিয়ে আগুন দিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু তা পারেনি। সে এখন বিপন্ন। বিপন্ন হয়েছে এই তিনজনের পরিকল্পনা রূপায়ণে। তাকে কি রক্ষা করার দায়িত্ব এই তিনজনের নয়?

প্রধান পুরোহিত হয়ত অনুমান করেছেন শ্রেষ্ঠীর মনের ভাব। তিনি মৃদু স্বরে বললেন, আপনি হয়ত দুঃখ পাবেন, দাসটি আপনার অনুগত, সাহসী এবং মনোমত নিষ্ঠুরও, কিন্তু শূদ্রপল্লীতে আগুন জ্বালানোর কথা ছিল রাজার পাপের ভার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, আগুন আকাশ থেকে নেমেছে, সন্তানহীন ধর্ষক রাজা মহাকাল মন্দির অপবিত্র করেছেন, আর রক্ষা নেই, মহাকালের রোষে ছারখার হয়ে যাচ্ছে অবন্তী দেশ—এই সত্য কি প্রতিষ্ঠা করা গেছে?

উতঙ্কর মৃত্যুতে তা হবে?

না হোক, উতঙ্ক যে উন্মাদ হয়ে এ কাজ করেছে তা জেনে যাবে শূদ্রজন, আর জেনে যাবে সেনাপতি বিক্রম কত সুশাসক, তাঁর বিচারে শ্রেষ্ঠীর দাসও রেহাই পাবে না, এতে সেনাপতি এবং শ্রেষ্ঠী দুইজনের সুনাম বৃদ্ধি পাবে, ধন্য ধন্য করবে নগর, ওর মৃত্যুই হোক, আগুনে পুড়িয়ে মারা হোক ওকে।

শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত মাথা নামিয়ে বসেছিলেন। আজ পর্যন্ত উতঙ্ক তাঁর কোনো কথাই অমান্য করেনি। কোনো প্রশ্ন তোলেনি। প্রভু যা বলবেন, তাই-ই সত্য। উতঙ্ককে তিনি যদি বলে দিতেন নিজেকে লুকিয়ে অগ্নিসংযোগ করে আসতে, উতঙ্ক তাই-ই করত। তিনি সে নির্দেশ দেননি, স্বাভাবিক ভাবে সেই প্রয়োজন বোধ করেননি, তাই উতঙ্কও আগুন দেওয়ার হিংস্র আনন্দে নিজেকে আড়াল করতে পারেনি। প্রভুর ইচ্ছাপূরণ করছে সে। প্রভু যখন বলেছেন শূদ্রপল্লী পুড়িয়ে দিতে, সেই ইচ্ছায় যেন ওই পল্লীর মানুষজনেরও সায় আছে। এমনই ধারণা ছিল উতঙ্কর। বিষণ্ণতা ছেয়ে ফেলছিল শ্রেষ্ঠীকে। উতঙ্ককে তিনি নিজের মতো করে নির্মাণ করেছেন। মনে পড়ে যাচ্ছে দরিদ্র পাহাড়িয়া মা বাবার কোল থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে এসেছিলেন তিনি শিশু উতঙ্ককে।

শ্রেষ্ঠী বললেন, উতঙ্ক যদি নগর ছেড়ে চলে যায়?

না, সর্বসমক্ষে মৃত্যু, শূদ্রপল্লী তখন শান্ত হবে, অগ্নিতে মৃত্যুই এক্ষেত্রে বিধি।

শূদ্ররা কি দাবি করেছে তা?

সেনাপতি বললেন, না, সে সাহস তাদের নেই যে শ্রেষ্ঠীর দাসের মৃত্যু দাবি করবে, কিন্তু সুশাসন, সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন উতঙ্কর মৃত্যু।

চুপ করে থাকলেন শ্রেষ্ঠী। একজন মানুষকে যতটা নিষ্ঠুর করে তোলা যায়, উতঙ্ককে সেই ভাবে তৈরি করেছেন তিনি। শিশুকাল থেকেই হিংস্রতার শিক্ষা দিয়েছেন। তাকে কাঁচা মাংস খাওয়ানোর অভ্যেস করিয়েছিলেন শ্রেষ্ঠী। উতঙ্কর এমন প্রভু ভক্তি যে নিজেকেও হত্যা করতে পারে সে প্রভুর কথায়। শ্রেষ্ঠীর চোখ চকচক করে ওঠে। মনে পড়ে শিশু উতঙ্কর কী রোষ! পাহাড়িয়া শিশু জন্মসূত্রেই প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করার শক্তি অর্জন করে থাকে। প্রতিকূল পরিবেশ সব সময়ই তাদের সঙ্গী। অন্নের অভাব তো আছেই। তবু শিশু উতঙ্ক প্রায় পক্ষকাল না খেয়ে ছিল ওকে ওর মা-বাবার কোল থেকে কেড়ে আনার পর। কেড়েই এনেছিলেন তিনি। দরিদ্র পাহাড়িয়া মা কিছুতেই ছাড়তে চায়নি শিশুটিকে। তার বাবাকে বশীভূত করেছিলেন নানা দ্রব্যে, মণিমুক্তোয় এবং মদিরায়। সেই মদিরা ছিল দ্রাক্ষারস থেকে প্রস্তুত, কপিশা নদীতীরের এক বণিক তাঁকে উপহার দিয়েছিল। মনে পড়ে যাচ্ছে সব। সুরা, মদিরাই জুটত

না সেই পুরুষটির। সে গৃহকর্ম করত, তার স্ত্রী, উতঙ্কর পাহাড়িয়া মা পরিশ্রম করে অন্ন সংস্থান করত। ওই দেশে ওই রীতিই ছিল। তিনি যদি উতঙ্ককে না নিয়ে আসতেন, উতঙ্কও ওইরূপ হয়ে যেত। স্ত্রীলোকের অর্জন করা অন্নে বেঁচে থাকত। শিশুটিকে নিয়ে আসার পর কতদিন দ্বিপ্রহরে বা মধ্যরাতে আচমকা অবোধ্য পাহাড়িয়া ভাষায় মা-বাবার জন্য কাঁদত চিৎকার করে। দাসী তাঁকে বলেছে, ঘুমের ঘোরেও নাকি শিশুটি কাঁদত। সেই উতঙ্ক এখন সব ভুলে পরিপূর্ণ পুরুষ। সাহসী। সাহসীরাই তো নিষ্ঠুর হয়। উতঙ্কর ভয়ে শ্রেষ্ঠী গৃহে কোনোদিন তস্করের ছায়া পড়েনি। একবার পদাঘাতে একটি সারমেয়র জীবনান্ত ঘটিয়েছিল সে।

শ্রেষ্ঠী ভেঙে পড়ছেন, বললেন, উতঙ্কর উপর আমার এত যে মায়া তা জানতাম না।

প্রধান পুরোহিত বললেন, আর একটি পাহাড়িয়া নিয়ে আসুন।

এখন আর গড়ে তোলার বয়স নেই।

প্রধান পুরোহিত বললেন, অবন্তী দেশের জন্য এইটুকু ত্যাগ করতেই হবে।

শ্রেষ্ঠী যেন বিলাপ করলেন, ওকে যদি বলে দিতাম গোপনে আগুন দিয়ে আসতে-! হায়।

প্রধান পুরোহিত এবার বিচলিত হলেন, পাহাড়িয়া, কিন্তু শূদ্রই তো বটে।, শূদ্রের জন্য এত হা হুতাশ কেন? আপনি এই নগরের গৌরব, এই ঘটনায় কুমার বিক্রমের গৌরব যেমন বৃদ্ধি পাবে, আপনারও, আর তাতে ওই প্রধান গণিকা দেবদত্তাকে অধিকার করা সহজ হয়ে উঠবে।

শ্রেষ্ঠী বললেন, সত্য, কিন্তু শূদ্রজাতিকে সন্তুষ্ট করার জন্য উতঙ্ককে আগুনে পুড়িয়ে মারা কি সুবিচার হবে, ভেবে দেখুন।

আপনি অনর্থক যুক্তির জাল বিস্তৃত করতে চাইছেন, উতঙ্ককে মরতেই হবে, সে না মরলে মহাকাল বিরূপ হবেন। গমগম করে উঠল প্রধান পুরোহিতের কণ্ঠস্বর, মহাকাল মন্দির অপবিত্র করেছেন রাজা ভর্তৃহরি, তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য, আর তা করতে উতঙ্কর মৃত্যু চাই-ই, শূদ্রর প্রাণ নিবেদন করব যেন আমরা ভগবান মহাকালকে, মহাকাল দেবেন সিংহাসন, সেই সিংহাসনে বসবেন বিক্রম।

শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত ঘাড় নিচু করে আছেন। উতঙ্ক নিজেকে ঘরবন্দী করে রেখেছে। শ্রেষ্ঠী তেমন নির্দেশ দিয়েছেন। অগ্নিকাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর পাঁচদিন পার হয়েছে। নগরে রটনা হয়ে গেছে শ্রেষ্ঠীর দাস উতঙ্কই ঘটিয়েছে তা। কিন্তু শুধুই উতঙ্কর নামে রটেছে, শ্রেষ্ঠীর কথা কেউ বলছে না। বরং বলছে শ্রেষ্ঠী আহার নিদ্রা ত্যাগ করে সেই রাতেই ছুটে গিয়েছিলেন বিপন্ন মানুষের পাশে। ধনবানের নামে অভিযোগের আঙুল ওঠে না, তাই ওঠেনি। দাস উতঙ্ককে কত ঘৃণা করত মানুষ তা এই রটনায় টের পাওয়া যাচ্ছে।

শ্রেষ্ঠী বললেন, আপনাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলাম, আপনারা যা চাইছেন তা হোক, তবে ওকে যেন মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ না করতে হয়, অন্য ভাবে মারা হোক।

প্রধান পুরোহিত হাসলেন, এই অপরাধের দণ্ড ওই-ই, আপনি কি প্রত্যক্ষ করবেন না দণ্ড?

না।

কিন্তু শোকও করবেন না, উতঙ্কর শোকহীন মৃত্যু আপনাকে মহৎ করে তুলবে নগরের মানুষের মনে

প্রধান পুরোহিতের কোনো কথাই শুনতে পাচ্ছিলেন না শ্রেষ্ঠী। তাঁর পিঠে সেনাপতির কর স্পর্শ করল।

ছত্রিশ

উতঙ্ক বন্দি হয়েছে। তাকে সমর্পণ করেছেন প্রভু সুভগ দত্ত। এই সংবাদ নগরে শোনা যাচ্ছিল। শূদ্রপল্লীর অগ্নিকাণ্ড, তারপর উতঙ্কের বন্দিত্ব নগরে চাঞ্চল্য ফেলেছিল। কিন্তু নগরবাসী কত বিষয়েই না চঞ্চল হয়, আবার তা ভুলেও যায়—উতঙ্কর বন্দিত্ব তাদের খুশি করেছিল ; তবে বিশ্বাস ছিল না কারোর যে উতঙ্কর শাস্তি হতে পারে। সকলেই যেন অপেক্ষা করছিল সেইদিনের, যেদিন উতঙ্কর রথ বায়ুবেগে আবার ছুটে যাবে রাজপথ দিয়ে। বাতাসে সাঁই সাঁই করে ছুটবে তার প্রহরণ। রক্তাক্ত হবে

পথচারী। নগরের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির দাস উতঙ্কর যে শাস্তি হতে পারে, লোকে তা বিশ্বাসই করে না।

একদিন ভোর বেলায় শঙ্খধ্বনিতে ঘুম ভাঙল নগরবাসীর। ভেরির দিমিদিমি শব্দে কেউ কেউ ঘর ছেড়ে বেরল পথের ধারে, কোনো কোনো গৃহের জানালা খুলে গেল। জানালায় পুরনারীরা এসে দাঁড়াল। শঙ্খ ও ভেরির ক্রমাগত ধ্বনিময়তা সব পুরুষমানুষকে অর্গল খুলে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করল,সমস্ত গৃহবধু, যুবতী, পৌঢ়া নারীদের দাঁড় করিয়ে দিল জানালার আলোয়। ওইসব পুরুষরা সকলে সদ্য নিদ্রোত্থিত, রমণীদের চোখের কোলে, গণ্ডদেশে ঘুম, জাগরণ, আনন্দ বিষাদের চিহ্ন সব ছড়িয়ে। তারা অবাক হয়ে ধ্বনিময় নগরের রাজপথে চেয়ে ছিল।

বেজে যাচ্ছে শঙ্খ, তারপর ভেরি, কখনো দুইটিই একসঙ্গে, অবশেষে শঙ্খ ও ভেরি নিঃশব্দ হলে শোনা যেতে লাগল ঘোষকের কণ্ঠস্বর। শঙ্খবাদক, ভেরিবাদক এবং ঘোষকের মূর্তি অদ্ভুত। মনে হয় শূদ্রই হবে। নিষাদ অরণ্যচারীও হতে পারে। দেহ কৃষ্ণবর্ণের, কোমরে পশুচর্মের আবরণ, বাকি অংশ অনাবৃত, মাথায় ঘন কুঞ্চিত কেশ। হ্যাঁ, নিষাদই হবে। নিষাদ ব্যতীত কার সাধ্য এমন গম্ভীর স্বরে মৃত্যুর কথা ঘোষণা করতে করতে হেঁটে যায়। ঘোষকের হাতে ছিল মহিষের বিষাণনির্মিত একটি ক্ষুদ্রকায় খড়্গ। খড়্গটি আকাশে তুলে সে বলে যাচ্ছিল দাস উতঙ্কর অপরাধের বিবরণ। নিষ্ঠুর দাস শূদ্রপল্লী দাহন করেছে। তার মৃত্যু অগ্নিদাহনেই। প্রধান সেনাপতি, কুমার বিক্রমের বিচারে মৃত্যুদণ্ড হয়েছে উতঙ্কর। আগামী কৃষ্ণা চতুর্দশীর প্রত্যুষে নগরের উপান্তে, শূদ্র পল্লীর সন্নিকটে অগ্নিদগ্ধ করে দাসের প্রাণ হরণ করা হবে। নগরবাসী অবগত হউন।

ঘোষণার পর, কয়েক মুহূর্তের নৈঃশব্দের পর আবার বেজে উঠছিল শঙ্খ। অতি তীব্র, কর্ণপটহ বিদীর্ণকারী। শঙ্খধ্বনিতে নগরবাসীর আলস্য ভাঙছিল। ভেরির দিমি দিমি ধ্বনিতে নগরবাসী গা ঝাড়া দিয়ে উঠছিল। কতদিন বাদে এমন ধ্বনিতে নগর জেগে উঠল। মনে পড়ে গেল দশপুরার যুদ্ধের কথা। যুদ্ধে গিয়েছিল সেনাবাহিনী এমন শঙ্খ-ভেরি বাজিয়ে। ফিরেছিল শঙ্খধনিতে নগরের ঘুম ভাঙিয়ে। পুরনারীদের মনে পড়ে যাচ্ছিল পুষ্পবর্ষণের কথা। শেষরাতে তাদের ঘুম ভেঙেছিল দূরাগত শঙ্খধ্বনিতে, দুন্দুভির ডাকে। তারা হিমনীলাভ আকাশে তাকিয়ে অনুমান করেছিল রাত ফুরোতে আর কত বাকী, হিসেব করেছিল ওই শঙ্খধ্বনি নগরে প্রবেশ করতেই বা আর কত সময় লাগতে পারে। শঙ্খধ্বনিতে বিজয়ীর উল্লাস শুনতে পেয়েছিল তারা। ফলে পুষ্প চয়ন করে জানালা খুলে অপেক্ষা করেছিল বিজয়ী সেনাবাহিনীর জন্য। তারপর হাতি এল দুলতে দুলতে। হাতির পরে এল অশ্বারোহীর দল, এল পদাতিক বাহিনী, রথারোহী বীরের দল। তারা গান গাইছিল, আকাশে তুলে ধরছিল খোলা তলোয়ার, ভল্ল, বর্শা, খড়্গ। ভোরের আলোয় তা ঝকমক করে উঠছিল। নতুন রোদ প্রতিফলিত হচ্ছিল সেই সব আকাশমুখীন অস্ত্রের গা থেকে। অস্ত্রের দিকে পুষ্পবর্ষণ শুরু হয়েছিল প্রথমে। তারপর যুবতীরা, গৃহবধূরা, জননীরা অবাক হয়ে দেখছিল বিজয়ীদের। উন্মুক্ত গাত্র, সুদেহী, সুঠাম সৈনিকদের দেখে তারা অভিভূত হয়ে আরো পুষ্প বর্ষণ করেছিল। যুবতীরা দেখেছিল রাজা ভর্তৃহরি যাচ্ছেন রথে, সেনাধ্যক্ষ বিক্রম আছেন অশ্বে। সেই অশ্ব ছিল শ্বেতকায়, বনায়ুদেশের, শৌর্যদীপ্ত। দুই পুরুষই পরমরূপবান। তাঁদের দেখে যুবতীরা উদ্দীপ্ত হয়েছিল, উল্লাস প্রকাশ করে একে অন্যকে অবলম্বন করেছিল হাসতে হাসতে। দুহাতে ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছিল গবাক্ষ থেকে। সে ছিল বসন্ত। সেই বসন্তে ঋতুরাজ তাঁর সমস্ত রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলেন অবন্তীর আকাশে, বাতাসে। বাতাসে ছিল পুষ্প গন্ধ। যুবতীরা কতরকম ফুলই না চয়ন করেছিল, অশোককলি, কুরুবক, অপরাজিতা, বকুল, কমলকলি, মন্দার, বনযুথিকা, আরো কত সব জানা অজানা বনের ফুল। দুন্দুভি, মৃদঙ্গের শব্দে, ভেরির গম্ভীর দিমি দিমি ধ্বনিতে কামদীপ্ত যুবতীরা অবগুণ্ঠন সরিয়ে ফেলেছিল মুখ থেকে। তাদের বক্ষবাস যেন খসে যাচ্ছিল গোপনে।

সেই সব রমণীদের ভিতর যারা ছিল জননী, তারা সমস্ত পুরুষ যোদ্ধাদের ভিতরই দেখছিল সন্তানের ছায়া। বাৎসল্য রস জেগে উঠছিল প্রাচীনাদের ভিতরে। পদাতিক বাহিনীর উপর পুষ্প বর্ষণ করছিল তারাই। পদাতিক বাহিনী ছিল শূদ্র যোদ্ধাদের। তারা সবল সুঠাম বটে, রূপবান কিন্তু ছিল না। কিন্তু জননীরা তাদেরই মনে মনে বরণ করছিল সন্তানের মতো ভেবে।

কতদিন আগের কথা এ সব! তারপর বহুদিন কোনো শঙ্খধ্বনি শোনেনি তারা। বহুদিন ভেরি,

মৃদঙ্গর ডাকে জানলা খুলে দাঁড়ায়নি। দুন্দুভির ধ্বনিতে আলুথালু ছুটে আসেনি জানালায়। যে শঙ্খধ্বনি আজ তাদের ডেকে এনেছে, সেই শঙ্খধ্বনির কোনো খবর নেই তাদের কাছে। যুদ্ধযাত্রার কথা শোনেনি যখন, যুদ্ধে জিতে ফিরবে কারা? তবু যারা এসেছে গবাক্ষে তাদের বেশ আলুথালু, চুল খোলা, গতরাতের সাজসজ্জার রেশ ছড়িয়েছিল তাদের এখানে ওখানে। আর ছিল শয্যার সুরভি। বধূদের গায়ে পুরুষের ঘামের গন্ধ তখনো লিপ্ত ছিল, বিলীন হয়নি। অনূঢ়া যুবতীদের গায়ে ছিল কল্পনার সুগন্ধ। প্রাচীনাদের গায়ে ছিল গন্ধহীন উদাসীনতা ছেয়ে। তারা শুনল মৃত্যুদণ্ডের কথা। এই বসন্তে যখন ভালবাসা আর নতুন প্রাণ আসার কথা অবন্তী দেশে উজ্জয়িনী নগরে, যখন ঘোষকের বলার কথা বসন্ত এল, গৃহবাসী শোনো এল বসন্ত—এই বাক্যবন্ধ, তখন কিনা সে ঘোষণা করছে মৃত্যুদণ্ড। জাগরণ যে উল্লাস এনেছিল রমণীদের ভিতরে, সেই উল্লাস অন্তর্হিত হলো। জেগে উঠল ভয়, বিষাদ। এই স্নিগ্ধ বিহানবেলায় কে শোনায় মৃত্যুর কথা, কেন শোনায়? হায় মহাকাল। তোমার সোনার উজ্জয়িনীর কী হলো? বসন্তে ভ্রমর নেই, পুষ্প গন্ধ নেই, বসন্তে প্রাণের কথা উচ্চারণ নেই কোথাও, মৃত্যুর কথা বলে যাচ্ছে কে? কতকাল এই নগরে বৃষ্টি হয়নি, জলহীন শুষ্ক নগর বুঝি হরণ করেছে মানুষের হৃদয়সুষমা, তাই মৃত্যু সংবাদ শুনে ওই যে ওই পুরুষরা, যাদের ভিতরে আছে গবাক্ষের সমস্ত নারীদের পিতা, পুত্র, স্বামী, স্বজন, সুজন, সবাই উল্লাস করছে।

যতবার ঘোষক আকাশের দিকে চেয়ে মৃত্যুদণ্ডের কথা উচ্চারণ করে, সমবেত পুরুষেরা উল্লসিত হয়ে উঠতে থাকে। কার মৃত্যু দণ্ড? না উতঙ্কের। উতঙ্ক মানে শ্রেষ্ঠীর নিষ্ঠুর দাস। সত্য? নাকি অন্য কোনো মানুষ যার নামও উতঙ্ক? নিষ্ঠুর উতঙ্কর মৃত্যুদণ্ড হয়েছে শূদ্র পল্লীতে আগুন লাগানোর অপরাধে। এ কি সত্য হতে পারে? বিশ্বাস করা যায়?

পুরুষরা তখন ঘোষক বা বাজনদারদের ডাক দেয়, ওহে শোনো, শুনে যাও, দশপণ দেব, দুটো কথা বলে যাও, অঙ্গবস্ত্র দেব, কার মৃত্যুদণ্ড?

ভেরি বেজে ওঠে ভীষণ গম্ভীরতায়। ভেরির শব্দে আবার আকাশে পাক দিতে লাগল গৃহবাসী কবুতরেরা। ভীত কবুতর একটি ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে দূরের দিকে চলে গেল। ভেরির শব্দ থামলে ঘোষক জবাব দিল উচ্চকণ্ঠে, শ্রেষ্ঠীর দাস উতঙ্কর মৃত্যুদণ্ড।

মানুষজন আরো নিশ্চিন্ত হতে খোঁজ নেয়, কোন শ্রেষ্ঠী?

শ্রেষ্ঠী, কোন শ্রেষ্ঠী তা তো জানা নেই।

শ্রেষ্ঠী কি সুভগ দত্ত? একজন জিজ্ঞেস করে, না জিজ্ঞেস করলে যেন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না। এই নগরে কি আর কোনো উতঙ্ক আছে? সেও কি কোনো এক শ্রেষ্ঠীর দাস? শ্রেষ্ঠী বলতেই লোকে তো চেনে সুভগ দত্তকে, তাহলে এত খোঁজ নেওয়া কেন? খোঁজ নেওয়ার ভিতরে বারবার ওই একই কথা, মৃত্যুদণ্ডর কথা শোনার বাসনা লুকিয়ে আছে নগরবাসীর মনে। উতঙ্কর মৃত্যু সংবাদ তাদের কাছে যেন মঙ্গলধ্বনি। তাই নানা প্রশ্ন করে তারা বারবার ওই একই কথা শুনতে চাইছিল। কী নিষ্ঠুরই না ছিল উতঙ্ক, কতজনের গায়ে এখনো প্রহারের চিহ্ন রয়ে গেছে। কতজনের পায়ের উপর দিয়ে চলে গেছে ওই রথের চাকা। হাতে লাঠি নিয়ে তারাও এসে দাঁড়িয়েছিল পথে।

একজন জিজ্ঞেস করল, ওহে কেন মৃত্যুদণ্ড?

শূদ্রপল্লী দাহনের জন্য।

কে করেছিল তা, উতঙ্ক?

যে এইসব প্রশ্ন করে ঘোষকের অগ্রগমন স্তব্ধ করে দিচ্ছিল, সে সবই জানে। কিন্তু যমরাজের অনুচরের মতো ওই ঘোষকের কণ্ঠ নিঃসৃত শব্দ বাক্য বারবার শুনে তার অবদমিত ক্রোধে নিঃস্ব দেহকে তৃপ্ত করতে চাইছিল সে। এবার জিজ্ঞেস করল, ওহে, বলে যাও, কী করে মারা হবে।

আগুনে পোড়ানো হবে জীবন্ত দাসকে। বলতে বলতে কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলে লোকটি সকলকে শোনাতে লাগল, সে যেমন পুড়িয়েছিল, তাকে তেমন পোড়ানো হবে-এ-এ। ঘোষকের কথা শেষ হতেই শঙ্খ বেজে উঠল, ভেরিতে আবার গম্ভীর আঘাত পড়ল-দ্দাম্! দ্দাম্!

সমবেত মানুষজন এবার 'আহা' উচ্চারণে সমবেদনা প্রকাশ করল একসঙ্গে। কিন্তু তাদের চোখমুখে কোনো বেদনা ছিল না। তারা একে অন্যকে বলছিল, আহা পুড়িয়ে না মারলেই হতো, ওতে খুব কষ্ট!

.....না, না, অগ্নিদাহনের শাস্তি অগ্নিদাহনই বটে।

.....শূলে চাপিয়ে মারা যেতে পারত।

.....তাতেও খুব কষ্ট।

.....মৃত্যু তো কষ্টেরই, ওহে, কী বললে যেন আগুনে পোড়াবে, জীবন্ত?

তখন গৃহগুলির অপরিসর জানালায় যারা ছিল, পুরনারীরা, তারা মৃত্যু সংবাদ শুনে দু-হাত দিয়ে কর্ণকুহর রুদ্ধ করেছিল। মৃত্যুদণ্ড ঘোষণাকারীর কণ্ঠ, তার সঙ্গে বেজে ওঠা শঙ্খ, দুন্দুভি, ভেরির শব্দ কানে আসা মঙ্গলজনক নয়। তারা স্বামী নিয়ে, সন্তান নিয়ে, পরিজন নিয়ে সংসার করে, মঙ্গল-অমঙ্গলের ভয় তাদের ভিতরে প্রবল। তাছাড়া বহুদিন পরে যে শঙ্খধ্বনি তাদের জাগিয়েছিল, তা মঙ্গল সংবাদই দেবে, এমন অনুমান ছিল। বারবার মৃত্যু-সংবাদ শুনে আর নিজেদের উদাসীন রাখতে পারে না নারীরা। তারা কেঁদে ওঠে। একটি নারীর চোখে প্রথমে জল আসে, তা দেখে অন্য নারীদের চোখও ভিজে যেতে থাকে বেদনায়। কান্না ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বন্ধ হয়ে যেতে থাকে প্রতি গৃহের জানালার কপাট, পরপর। সশব্দে। বন্ধ জানালার আড়ালে রমণীরা কান্নায় ভেঙে পড়তে থাকে। এ কেমন সকাল এল, সকালে উঠেই নগরে বেজে উঠল মৃত্যুদণ্ডের ভেরি। এই সোনার নগরে তো মৃত্যুদণ্ড হয় না কখনো। রাজা ভর্তৃহরি কেন, তাঁর পিতার আমলেও তো মৃত্যুদণ্ড হয়নি কারোর।

মহিষের বিষাণ নির্মিত খড়্গাগুলি দোলাতে দোলাতে ঘোষক অবাক হয়ে দেখতে থাকে জানালাগুলির বন্ধ হয়ে যাওয়া। তার হাত থেকে খড়্গা পড়ে যায় মাটিতে। তাতেও সে আরো অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। খড়্গা তুলে নিতে নিতে ভাবল, নগরের নারীরা তার প্রতি বিমুখ হয়েছে। প্রতিটি জানালায় ঘুমভাঙা নারীমুখ ছিল। সেই মুখ কত সুন্দর, সেই মুখে কত না অনুরাগের চিহ্ন, দ্যুতিময় চোখগুলিতে ছিল প্রেমময় চাহনি। নিষাদ দেখেছে নারীরা যে পুরুষের দিকেই দৃষ্টিপাত করুক, দৃষ্টিতে থাকে সম্মোহনী ভাব, তা সেই নারী অন্য যে পুরুষের অনুরাগিনীই হোক না কেন। জানালায় নারীমুখ দেখে ঘোষক মৃত্যুর কথা ঘোষণা করতে উৎসাহ পাচ্ছিল বেশি। এখন সে কেমন নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। তার মনে হয় জানালাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে নারীমুখগুলিতে তার প্রতি ঘৃণার ভাব জেগে উঠতে দেখেছিল যেন।

পুরুষরা হাঁক মারে, থামলে কেন, বলো, বলে যাও।

......বলে যাও, বলে যাও, আকাশ বাতাসে উতঙ্কর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ুক।

ঘোষক চুপ করে বন্ধ কপাটের দিকে চেয়েছিল। তার কানে অস্পষ্ট কান্নার শব্দ ভেসে আসছিল। সে বুঝতে পারছিল নারীরা কপাট বন্ধ করে গৃহমধ্যে রোদন করছে। হায়রে বসন্ত! আকাশে তাকায় ঘোষক। এ কেমন চৈত্রদিন, বসন্ত ভরে উঠেছে রোদনে। সে নিষাদ, অন্নের বিনিময়ে এই কাজে সম্মত হয়েছিল। সে বুঝতে পারছিল তার ঘোষণা দুঃখ এনেছে নারীদের মনে।

এক পুরুষ একটি ক্ষুদ্র পেটিকা নিয়ে ছুটে আসে ঘোষকের দিকে, এই নাও, দশপণ আছে এতে, তোমরা ভাগ করে নিয়ো, তিনপণ করে নিয়ে একপণ ওই উতঙ্ককে দিয়ো হা হা হা, বলো, বলে যাও কোথায় মারা হবে শয়তানটাকে, শোনো হে, ও ছিল পাপী, শূদ্র মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপী, নিষাদের চেয়েও পাপী, ওর মৃত্যুদণ্ড যতনা দুঃখের, তার চেয়ে আনন্দের বেশি।

ঘোষক অবাক হয়ে দেখছিল প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে পুরুষরা হর্ষধ্বনি করে উঠছে, পাপের ফল এই, পাপের শেষ মৃত্যুতে, মহাকাল আছেন।

.....শ্রেষ্ঠী মহানুভব, জানতে পেরেই সমর্পণ করেছেন দাসটিকে।

......শোনা যাচ্ছে সেনাপতিই এই দণ্ডাদেশ দিয়েছেন, রাজার নিকটে উতঙ্ককে নিয়েই যাওয়া হয়নি, দাসের অপরাধ বিচার রাজার না করাই শ্রেয়, দাসের মৃত্যুদণ্ড সামান্য রাজকর্মচারীই দিয়ে দিতে পারে।

......ওহে, আর একবার বলো, একশো ঘা প্রহার করবে না নগরবাসী?

আগে তো হাতদুটি ছিন্ন করা যেত, তারপরে জীবন্ত দাহন করা হতো না হয়।

ওহে, দণ্ডাদেশ রদ হয়ে যাবে না তো?

লোকটি ছিল ভয়ানক, ভয়ানকের মৃত্যু সুন্দর হয়, সকলে দেখতে যাব আমরা, ওহে বলো, বলে যাও।

আশ্চর্য! একটি মৃত্যুসংবাদ একজনকে উল্লসিত করেছে, অন্যজনকে করেছে শোকার্ত। যে স্বামীটি বলে যাচ্ছিল ভয়ানকের মৃত্যু সুন্দর হয়, তার বধূটি ঘরের অন্ধকারে কাঁদতে কাঁদতে বিলাপ করছিল, অগ্নিদাহনে মরণ হবে যার, তার কতনা কষ্ট হবে, হায় কী বসন্ত এল অবন্তীদেশে এবার!

কান্নার ক্ষীণ শব্দ ঘোষকের বুকের ভিতরে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছিল যেন। সে পুড়তে আরম্ভ করেছিল নিজে নিজে, সংগোপনে। এই নিষাদ বয়সে নবীন, এই নিষাদের চোখে মনে এখন রং লেগেছে আপনা আপনি, সেই রং ঢেকে যাচ্ছিল রোদনে। একসঙ্গে এত নারীর প্রত্যাখ্যানে সে টের পাচ্ছিল মৃত্যুদণ্ডাদেশ ঘোষণা প্রেমের বিপরীত। যখন রমণীরা জানালা খুলে দাঁড়িয়েছিল, ঘোষক দেখেছিল তার নবীন দেহের দিকে সকলে চেয়ে আছে বিস্ময়ে, যেন এমন পুরুষ দ্যাখেনি তারা কোনোদিন। পরে সেই বিস্ময় অন্তর্হিত হলো, জেগে উঠল শোক, জেগে উঠল ঘৃণা। অগ্নিবর্ষণ করে জানালা বন্ধ করে দিল শেষ যুবতীটি। বিষণ্ণ ঘোষক ইঙ্গিত করল ভেরিবাদককে, বাজাও।

মুহুর্মুহু বাজতে থাকে ভেরি। ভেরির দিমি দিমি শব্দে পুরুষদের হর্ষধ্বনি আর রমণীদের রোদন চাপা পড়ে যেতে থাকে। মৃত্যুসংবাদ শোনা যায় না। ভেরি বাজাতে বাজাতে ভেরিবাদক এগিয়ে যায়। শঙ্খবাদক তার আগে পা বাড়ায়। দুই-এর মধ্যিখানে থাকে ঘোষক। দশপণ মুদ্রার পেটিকাটি পড়ে থাকে রাজপথে।

তখন কোনো এক গৃহে এক প্রাচীনা জিজ্ঞেস করছিল পুত্রবধূকে, কী বলে গেল?

মা তুমি শোনোনি?

বৃদ্ধা বলল, বধির হয়ে গেছি, মহাকাল দিয়েছিলেন শ্রবণ শক্তি, তিনিই নিয়েছেন তা, কী বলে গেল আমার কানে কানে বলে দে।

বধূটি নিঃশব্দে কাঁদল, তুমি কত ভাগ্যবতী মা।

কারা এসেছিল, কে এসেছিল বলে দে, মহাকাল দিয়েছিলেন দৃষ্টি, তিনি তা ফিরিয়ে নিয়েছেন, কানে কানে বলে দে।

বধূটি দু-হাতে মুখ চাপল, মহাকাল তোমার প্রতি সদয়, তুমি কত কত পুণ্যবতী মা, মানুষ জীবন্ত পুড়বে, দেখতে হবে না।

কানে মুখ নিয়ে আয়, বলে দে শেষবারের মতো, মরণ এসে গেল প্রায়, ক'দিনই বা বাঁচব আর, শুনে নিই কী হলো অবন্তীদেশে।

বিষণ্ণ বধূটি মুখ নামিয়ে আছে, মনে মনে বলছে, তুমি সৌভাগ্যবতী, তোমার স্বামী মানুষের জীবন্ত দাহনে আনন্দ করবে না, তুমি এসব না জেনেই দু চোখ বুঁজবে মা, শোনো মা শোনো....।

বধূ তার শাশুড়ির কানে মুখ নিয়ে এল, কাঁদতে কাঁদতে ভেজা গলায় বলতে লাগল, উজ্জয়িনীতে বসন্ত এলনা এবার।

....কে এলনা?

.....ঋতুরাজ বসন্ত, এল মরণের দূত।

.....কী বলিস?

.....বসন্ত নেই মরণ আছে বসন্ত দিনে।

বৃদ্ধা হাসল, তাতে হলো কী?

.....মাগো শোনো, এই বসন্তে আনন্দ নেই।

.....কে আনন্দ?

.....বসন্তে মরণের ডাক এল গৃহদ্বারে।

.....কী হলো তাতে, কী হলোরে মেয়ে কী হলো? বৃদ্ধা বিড়বিড় করে, তোর স্বামী কই, পুরুষটা, তার কি মরণ হলো রে?

বধূ কেঁদে ওঠে, মা তুমি কী বলো মা, সে তো তোমারই সন্তান।

বৃদ্ধা বিড়বিড় করছিল, মহাকাল যা যা দিয়েছিলেন, সব নিয়ে নিলেন, কে পুত্র, কে জামাতা, কে কন্যা, কে বধূ, মরণই বা কে, বসন্তই বা কে, কিছুই মনে থাকে না যে, হায় মহাকাল! নিলেই যদি সব, দিয়েছিলে কেন?

সাঁইত্রিশ

মরণ কী ভয়ানক! মরণের নাড়ি ছেঁড়া আর্তনাদ যেন এখনো আচ্ছন্ন করে রেখেছে সুভগ দত্তকে। একটি পরিত্যক্ত পর্ণকুটিরে শৃঙ্খলিত করে, তাতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে উতঙ্ককে। বহু মানুষ এসেছিল সেই মৃত্যু দেখতে। শ্রেষ্ঠী জানতেন না তাঁর দাস কত ঘৃণার মানুষ ছিল। কেউ শোক করেনি। করছেও না। সকলে যেন একটি ইতরপ্রাণীর মৃত্যু দেখছে, এই ভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল নিষ্কম্প। বরাহ যেমন মৃত্যুকালীন আর্তনাদে দশদিকের নৈঃশব্দ চূর্ণ করে, তেমনি ছিল উতঙ্কর আর্তনাদ। বরাহর মরণ কান্নায় যেমন মানুষ উদাসীনই থাকে, তেমনই উদাসীন ছিল মানুষ উতঙ্কর মৃত্যুকালে তার নিকটে দাঁড়িয়ে। সুভগ দত্ত যেন শুনেছিলেন সেই পাহাড়িয়া শিশুর মায়ের জন্য কান্না। মনে পড়ে গিয়েছিল সব।

নগরে ধন্য ধন্য রব উঠেছে। শ্রেষ্ঠী তাঁর প্রিয় দাসকে তার অপরাধের জন্য ক্ষমা করেননি। অপরাধ লুকোতে চাননি, বরং উতঙ্ককে ধরিয়ে দিয়েছেন তিনিই। তিনিই নাকি প্রথম বুঝতে পারেন নিষ্ঠুর উতঙ্ক যেমন অকারণ নিষ্ঠুরতায় আনন্দ পেত, তেমন এক আনন্দের জন্যই শূদ্রপল্লীতে অগ্নিসংযোগ করে রাতের অন্ধকারে। নগরের মানুষ শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত এবং সেনাপতি বিক্রমের গুণকীর্তন করছে। শ্রেষ্ঠী এবং সেনাপতি কত মহৎ। শূদ্রজাতির পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা। শূদ্রর ঘর পুড়িয়েছে আর এক শূদ্র, সেই শূদ্র প্রাণও দিল ওই অপরাধে। ধন্য সুভগ দত্ত। উতঙ্কর মৃত্যু এই নগরকে নিঃশ্বাস ফেলতে দিচ্ছে আবার। শ্রেষ্ঠী তো জানতেন না কত নিষ্ঠুর ছিল তাঁর পোষা দাসটি, আগে জানলে আগেই তাকে মেরে ফেলা হত নিশ্চিত। এতদিনে উজ্জয়িনীর পথঘাট নিরাপদ হলো। আচমকা উতঙ্কর রথের প্রহরণ গায়ে এসে পড়বে না, রথের চাকায় প্রাণ যাবে না, বিকলাঙ্গ হয়ে বাঁচতে হবে না।

তিনদিন হলো উতঙ্ক পুড়ে মরেছে, শ্রেষ্ঠী নিজেকে স্বেচ্ছাবন্দী রেখেছেন। নিজের গোপন শোক নিয়ে তিনি যাপন করছেন নিদ্রাহীন দিন-রাত্রি। নিজের লোভই নিরপরাধ দাসের প্রাণ নিল। তেমনই যেন মনে হচ্ছে শ্রেষ্ঠীর। নগরে যে তাঁর নাম সম্ভ্রমের সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে এই সংবাদে যেন আরো ম্রিয়মান তিনি। ঘরে বসে সব খবর পাচ্ছেন সুভগ দত্ত।

খবর পাঠিয়েছিলেন রাজা ভর্তৃহরি। সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন শ্রেষ্ঠী। শুনেছেন রাজা বিরূপ হননি কেননা নগরের মানুষ বিরূপ হয়নি, আনন্দ করছে, তাই। সকলে আনন্দ করছে, যেমন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত। রাজকর্মচারী থেকে বীট মহাপার্শ্ব পর্যন্ত। এতটা ধারণার অতীত ছিল শ্রেষ্ঠীর।

এখন তাঁর মনে হচ্ছে উতঙ্কের মৃত্যু যেন তাঁকে রক্ষা করেছে। উতঙ্কর জন্যই তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের বিরূপতা বাড়ছিল ক্রমাগত। উতঙ্ক মরেছে বলে নগরের মানুষ আসছে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে, আশীর্বাদ করতে। লোকে বলে যাচ্ছে সুভগ দত্ত হয়ত পাপমুক্ত হলেন। না জেনে একটি দানবকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন তিনি। উতঙ্ককে লালন করাই ছিল শ্রেষ্ঠীর পাপ। উতঙ্কর মৃত্যু সেই পাপ সঙ্গে নিয়ে গেছে। মহাপাপী উতঙ্ক শূদ্রপল্লীতে আগুন দিয়ে মানুষের বিলাপ শুনতে গিয়েছিল। উতঙ্ককে আগুনই গিলে খেয়েছে যেন। এক পাপে শূদ্রপল্লী পুড়েছে, অন্য পাপে উতঙ্ক মরেছে।

এখন অবন্তী দেশ অগ্নিময়। অগ্নিই এখানে সর্বশক্তিমান। এই নগরে, এই অবন্তীদেশে অগ্নির মুখোমুখি হতে পারে এমন কেউ নেই। অগ্নির বিপক্ষেই এখানে কেউ নেই। মেঘ নেই, ছায়া নেই—সব যেন অগ্নির হাঁমুখে প্রবেশ করেছে। সমস্ত দিন অগ্নিময় হয়ে থাকে প্রকৃতি যখন, শূদ্রপল্লী তো অগ্নিই গ্রাস করবে। উতঙ্ক হয়ত অগ্নির নির্দেশেই এই কাজ করেছিল। আর তাই তাকে অগ্নিই হরণ করেছে। পাপী উতঙ্ক, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন উতঙ্কর ভবিতব্য এমনই ছিল, পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়া।

মহাকাল মন্দির থেকে ডাক এসেছিল, শ্রেষ্ঠী যাননি। সেনাপতি বিক্রমের দূত এসে দেখে গেছে স্বেচ্ছা নির্বাসনে রয়েছেন শোকার্ত সুভগ দত্ত। মানুষের জন্য মানুষের এত মায়াও জন্মায়। তিনি নিজে তো নিষ্ঠুর হতে পারেন না, রক্ত দেখতে পারেন না, অথচ তিনিই বা কী করে নিষ্পাপ পাহাড়িয়া বালককে এত নিষ্ঠুর করে গড়ে তুলেছিলেন?

এখন রাত অনেক। শ্রেষ্ঠীর চোখে ঘুম নেই। সমস্ত পুরী নিঃঝুম, ঘুমিয়ে আছে সবাই। দাস দাসীরা জেগে নেই কেউ। সুভগ দত্ত এসে দাঁড়িয়েছেন খোলা প্রাঙ্গণে। মাথার উপরে বৈশাখের আকাশ। নিদ্রাহীন গ্রহনক্ষত্রের দল। মাথার উপর উত্তরআকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল পশ্চিম ঘেঁষে উত্তর থেকে দক্ষিণে নেমে এসেছে ছায়াপথ। আলোর পথ—আকাশগঙ্গা। উত্তর দিকে আকাশগঙ্গার গা ঘেঁষে ব্রহ্মহৃদয় নক্ষত্রটি জ্বলজ্বল

করছে। নক্ষত্র দলের দিকে তাকিয়ে নিঃসঙ্গ ধনপতি কেঁদে উঠলেন। উতঙ্কর মৃত্যু তাঁকে যেন নির্বান্ধব করে দিয়েছে এই বিশ্বসংসারে। উতঙ্ক ছিল দাস। দাস যে এত আপনার হয়ে উঠেছিল তা তিনি জানতেন না। পাহাড়িয়া, শূদ্র যে ধনপতি বৈশ্যর প্রিয়জন হতে পারে তা শ্রেষ্ঠী কোনোদিন ভাবেননি।

উতঙ্ক নেই। এই পুরীতে যেন কেউ নেই। এই যে তিনি জেগে আছেন, আর সকলে ঘুমিয়ে, উতঙ্ক বেঁচে থাকতে এমন কখনো হয়নি যে সে জানবে না তার প্রভু নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করছেন। এই প্রাঙ্গনে তিনি একা দাঁড়িয়ে থাকবেন, অথচ নিকটেই দাঁড়িয়ে থাকবে না উতঙ্ক, এমন কখনো হয়নি। শিকারী কুকুরের মতো ছিল উতঙ্কর ঘ্রাণ। সে ঠিক টের পেয়ে যেত সব।

উতঙ্ক, উতঙ্ক হে। কেঁদে উঠলেন ধনপতি সওদাগর আবার।

প্রভু। নীল অন্ধকার যেন সাড়া দিল।

মরণে খুব বেদনা উতঙ্ক?

প্রভু যা চেয়েছেন!

আগুন তোকে খেয়ে নিল উতঙ্ক?

প্রভু হে, মরণে খুব ব্যথা।

খুব ব্যথা। খুউব?

প্রভু। বরাহর মরণে কত কষ্ট, তেমন!

মার কথা মনে পড়েছিল উতঙ্ক? ফিসফিস করলেন সুভগ দত্ত।

প্রভু! প্রভু হে, আমি মরলাম কেন?

সুভগদত্ত নিশ্চুপ। তাঁর বিহ্বল দুটি চোখ অন্ধকারের এদিক ওদিকে দেখতে চাইছিল। তিনি আবার ডাকলেন, উতঙ্ক, উতঙ্ক হে?

প্রভু আমি মরলাম কেন?

আগুন দিলি শূদ্রঘরে?

শূদ্রঘরে আগুন দিলে কী হয় প্রভু?

সুভগ দত্ত চুপ করে থাকলেন। শূদ্র ঘরে আগুন দিলে শূদ্রই মরে। মরেছে তাই উতঙ্ক। উতঙ্ক হে, আগুন থেকে বেরিয়ে আসতে পারলি নে?

উতঙ্ক ডাকল, প্রভু, প্রভু হে, আমি কেন মরলাম?

সুভগ দত্ত বললেন, অবন্তীদেশের জন্য, অবন্তীর কল্যাণের জন্য।

শূদ্রপল্লী পোড়ালাম কেন প্রভু?

অবন্তীর কল্যাণের জন্য।

আমার মরণে লোকে আনন্দ করে কেন প্রভু?

সুভগ দত্ত বললেন, সেও অবন্তীর কল্যাণের জন্য।

সুভগ দত্ত শুনলেন, অবন্তীর কল্যাণ হোক, রাজার মঙ্গল হোক।

রাজার মঙ্গলে অবন্তীর অকল্যাণ।

তাহলে রাজার অমঙ্গলে অবন্তীর কল্যাণ, প্রভু এই কি সত্য?

সত্য। ধনপতি বণিক কুঁকড়ে যাচ্ছিলেন, উতঙ্ক তোর মরণে আমি কষ্ট পাই।

নগরের মানুষ আনন্দ করে, তুমি কেন কষ্ট পাও প্রভু?

উতঙ্ক হে, তোর মরণে আমিই আগুনে পুড়ি।

কেউ পোড়েনা, তুমি পোড় কেন প্রভু, আমাকে মরণে পাঠালে তুমিই।

সুভগ দত্ত দুহাতে মুখ ঢাকলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল পিঠের কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে উতঙ্ক। উতঙ্কর ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন তিনি। উতঙ্ক ঘুরে এল তাঁর সম্মুখে, বলল, কতদিন বাদে উত্তরের পাহাড়ে গেলাম প্রভু!

কী দেখলি উতঙ্ক, এখন কি বরফে ঢেকে আছে?

না প্রভু, জল হয়ে নেমে গেছে নদী, ভয়ানক আগুনে নদীর জল উড়ে গেছে আকাশে, জলাশয়, দহ, নদী, নালা, সরোবর কোথাও জল নাই প্রভু, আমার মাও নাই, বাবাও নাই।

তারা কোথায়?

দুঃখে কোনদেশে চলে গেছে মা আমার, বাবা মরে গেছে দুঃখে দুঃখে, না খেয়ে খেয়ে।

উতঙ্ক হে, আমার বড় ব্যথা লেগেছে তোর মরণে।

এসব সত্য নয় প্রভু, এমন মরণের জন্যই আমাকে এনেছিলে তুমি পাহাড় থেকে, সেই পাহাড়ে মা নাই, দুঃখে কোন দেশে চলে গেছে, বাবা মরে গেছে ছেলের জন্য কষ্ট পেয়ে পেয়ে।

থাক উতঙ্ক, আবার কেন বলা?

না প্রভু। মা যদি শোনে এমন মরণের সংবাদ, মা আমার আরো দূরে চলে যাবে, আরো আরো দূরে, বাবা আমার আবার মরে যাবে, আবার আবার, মরণ ছাড়া তার আর কেউ থাকবে না।

উতঙ্ক হে, গণিকা যদি ভালবাসত এমন হত না।

তা তুমি জান প্রভু?

জানি, কিন্তু গণিকার ভালবাসা আমার আর চাইনে, সেনাপতি সিংহাসন চায়।

ধনপতি চায় প্রধান গণিকাকে।

তুই মরেছিস সেইজন্য উতঙ্ক।

এ তুমি জেনেছ প্রভু?

জেনেছি, উতঙ্ক হে, তোর মতো মরণ যেন আর কারোর না হয়।

প্রতিদিন কত মরে এমন। প্রভু হে, তুমি বাণিজ্যে যাও।

যাব বাণিজ্যে, যাব।

তুমি বণিক, নগরে আছো বলে উতঙ্কর মরণ দেখলে, যদি যেতে বাণিজ্যে, উতঙ্ক বেঁচে থাকত, প্রভু হে বাণিজ্যে না গিয়ে তুমি উতঙ্ককে নিষ্ঠুর করলে, উতঙ্ককে পুড়িয়ে মারলে।

ধনপতি সুভগ দত্ত মাথা নামিয়ে ছিলেন। তিনি টের পাচ্ছিলেন এই নগরে থাকা তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠবে দিনদিন। এই নগরে উতঙ্কের রথ দাপিয়ে বেড়াত। সেই রথখানি পড়ে আছে রথশালায়। নতুন সারথী ওই রথ চালাবে না। সে অন্য এক পারিযানিক রথে মন্দগতিতে চলবে রাজপথ দিয়ে। উতঙ্কর রথের ঘোড়া দুটি বনায়ু দেশের। তারা কত শান্ত হয়ে গেছে। উতঙ্কর ক্রমাগত আঘাতে ঘোড়া দুটি উন্মাদের মতো হয়ে গিয়েছিল যেন। বিশ্রামে থাকতে থাকতেও আচমকা তীব্র হ্রেষা ধ্বনিতে রাতের অন্ধকার ভেঙে দিত। সুভগ দত্ত বুঝতে পারছিলেন তাঁকে বেরোতেই হবে। থাকুক গণিকা। এখন বুঝতে পারছেন ভুল হয়ে গেছে খুব। দেবদত্তার জন্য তিনি উতঙ্ককে হারালেন। প্রধান পুরোহিত বলেন, শূদ্র এবং নারী, দুই-ই পরিত্যজ্য। প্রধান পুরোহিতের সমস্ত কথা সত্য জেনেও নারী বিনে তো থাকতে পারেননি। রমণীবিহীন পুরুষমানুষ বাঁচে কী করে? জীবনের যত আস্বাদ সবই তো স্ত্রীলোকে। তাঁর নিজের স্ত্রী আছে, সন্তান আছে, কিন্তু দেবদত্তা ব্যতীত এজীবন যেন রোদে পুড়ে যায়, অঙ্গার হয়ে যায় পুড়ে পুড়ে। অথচ স্ত্রীলোকই যে ধ্বংসের কারণ তা টের পাওয়া যাচ্ছে এখন। দেবদত্তার জন্য ধ্রুবপুত্রকে তিনি দূর নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। হায় ধ্রুবপুত্র! হে ধ্রুবসখা! তোমার সন্তানটিকেও আমি রক্ষা করতে পারিনি হে, যত্ন করে বাঁচতে দিইনি। সে বেঁচে আছে না মরে গেছে, কোনো খবর নেই। সব ওই গণিকার জন্য। রূপে পোড়ায় যে আমাকে দিনরাত্রি।

প্রভু! বাণিজ্যে যাও, নগরে থাকলে তুমি গণিকার দাস হয়ে যাবে।

কী বলছিস উতঙ্ক?

সত্য বলি প্রভু, এখনই তো মনে মনে তার দাস হয়েই আছ, ওই মেয়েমানুষের হাত থেকে রেহাই পাবেনা নগর না ছাড়লে।

সত্য না উতঙ্ক, আমি কারো দাস নই। সুভগ দত্ত বললেন।

তুমি দেবদত্তার দাস, দাস বলে উতঙ্ককে দিয়ে পাপ করালে, পাপ করিয়ে পুড়িয়ে মারলে উতঙ্ককে, উতঙ্ক তো শূদ্রপল্লীতে আগুন দিতে যায়নি, তুমি বলেছিলে, সে আদেশ শিরোধার্য করেছিল, দেবদত্তার জন্য এমন হলো বটে, কিন্তু সে নারী এসবের কিছুই জানেনা।

সুভগ দত্ত বললেন, দেবদত্তা আমাকে চায় না।

তবু তুমি তার দাস, যেমন সেনাপতি দাস হয়েছে রানীর, রানী ভানুমতির জন্য সেনাপতি সিংহাসন

চায়, সিংহাসন আর নারী এক হয়ে যায় প্রভু, তুমি যত শীঘ্রই পারো উজ্জয়িনী থেকে বেরিয়ে পড়ো, বাণিজ্যে চলো প্রভু, উতঙ্ককে পোড়ালে, নগরে থাকলে আরো কত কী পোড়াবে প্রভু, নিজেকে আর পুড়িয়ো না।

সুভগ দত্ত বললেন, যাব বাণিজ্যে।

তাই যাও, কত দেশ দ্যাখোনি তুমি। যাও প্রভু বাণিজ্যে যাও, খুঁজে আনো ধ্রুবপুত্রকে, উতঙ্ক তবে জ্বলন থেকে বাঁচবে, জ্বলছি আমি।

সুভগ দত্ত অন্ধকারে বসে পড়েছেন প্রাঙ্গণের পোড়া ঘাসের উপর। দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছেন। উতঙ্ক তার সামনে আঁধার হয়ে বসে আছে, ফিসফিস করছে, কাঁদো প্রভু, কেঁদে আগুন নিভাও, আমিও কাঁদি প্রভু, কেঁদে ব্যথা কমাই, প্রভু হে, মানুষ উতঙ্করে তুমি মানুষ করে গড়োনি, এখন তার মরণে তাই মানুষ আনন্দ করে, যেন এক বন্য বরাহ পুড়েছে আগুনে, শিয়াল মরেছে, বাঘ মরেছে, যেন এক উন্মাদ কুকুর মরেছে, প্রভু মানুষ যত বলে বেশ হয়েছে উতঙ্ক মরেছে, মানুষ যত ধন্য ধন্য করে, আমি জ্বলে যাই, পুড়ে যাই, আগুন নেভেনি প্রভু, জল নাই, মেঘ নাই বুক শুকায়ে মরে যাই, কেন তুমি নিষ্ঠুর করেছিলে আমারে, মন কেন পাথর করে ছিলে প্রভু?

সুভগ দত্ত বললেন, ক্ষমা কর উতঙ্ক।

ক্ষমায় কি জ্বলন যায়, এখন বুঝি মানুষের উপর কোনো মায়া ছিল না, রক্তদর্শনে সুখ হতো, আর্তনাদে সুখ হতো, প্রভু সেই সুখ কি তোমারও হতো?

না, উতঙ্ক না।

হতো প্রভু, না হলে কোনোদিন তো নিষেধ করনি, আমাকে থামাওনি।

চুপ কর উতঙ্ক।

উতঙ্ক বলে, দয়া আর মায়া কী তা শিখাওনি তুমি, মরণের পর জেনেছি তা, তোমার জন্য মায়া হয় প্রভু, গণিকার জন্য ধ্রুবপুত্রকে নির্বাসন দিলে, মারলে উতঙ্ককে, তোমার কোনো মায়া নেই, তুমি বাণিজ্যে যাও প্রভু, তবে মায়া জানবে, দয়া জানবে, নতুবা তোমার মরণেও মানুষ আনন্দ করবে, আনন্দ করবে।

দুটি হাত তুলে সুভগ দত্ত আর্তনাদ করে উঠলেন, থাম উতঙ্ক থাম! তোর আগুন আমাকে ঘিরে নিল উতঙ্ক, তোর মনে কি মায়া নেই, আমি তোর প্রভু তো।

নিশ্চুপ হয়ে গেল পৃথিবী এরপর।

আটত্রিশ

আচার্য বৃষভানুর কাছে যাচ্ছেন রাজা ভর্তৃহরি। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর এখন। নগর নিঃঝুম। আর দেবপথ দিয়ে বেরিয়ে শিপ্রানদীর তীর ধরে মঙ্গলনাথের মন্দির, বৃষভানুর আশ্রম পর্যন্ত পথটি এমনিই নিরালা, এখন পথের কুকুরও যেন জেগে নেই। কৃষ্ণা চতুর্দশী আজ। আকাশে চাঁদ নেই, আকাশগঙ্গার আলোটি যেন পথটিকে চিনিয়ে দিচ্ছে। তারার আলোয় পথ দেখছেন রাজা। হাতের দীপটি রেখে এসেছেন দেবপথের আড়ালে। এখন কোনোকিছুতে বিশ্বাস নেই। দিনদিন চূর্ণ হয়ে যাচ্ছেন যেন উজ্জয়িনীর রাজা।

সেই কবে গিয়েছিলেন আচার্য বৃষভানুর আশ্রমে। যতদূর মনে পড়ে কার্তিক পূর্ণিমার রাতে। তারপর পাঁচটি পূর্ণিমা চলে গেছে। এতদিনেও আচার্য কিছুই জানাতে পারেননি, কেন এই অনাবৃষ্টি তা বলে দেবেন তো তিনিই। রাজা ভর্তৃহরির নিজেকে এখন কেমন বিপন্ন মনে হচ্ছে। আগে তিনি সব কিছু অনুমান করতে পারতেন, একটি কথায় বুঝে নিতে পারতেন প্রিয়জন বা পারিষদবর্গের মনের ভাব, এখন অনুমান করতে পারছেন না কিছুই। অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে অনেক কিছু। চেনা মানুষকে অচেনা মনে হচ্ছে। রানী ভানুমতিকে মনে হচ্ছে কত দূরের কেউ যেন। অনুজ বিক্রমকে বুঝে উঠতে পারছেন না। শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্তকে এক এক সময় এক এক রকম মনে হয়। সব চেয়ে বড় ব্যাপার হলো তাঁর নিজের জীবনে যা ঘটে যাচ্ছে, এই নগরে যা ঘটে যাচ্ছে তারও কোনো ব্যাখ্যা পাচ্ছেন না তিনি। আচার্য কি কিছুই জানাতে পারবেন না? এ ও তো অতি বিস্ময়ের। আকাশ যাঁর করতলের মতো প্রায়, তিনি আকাশ

থেকে কিছুই পড়ে নিতে পারছেন না? তাহলে এই নগর, এই দেশের কী হবে? উজ্জয়িনীর নরম মানুষগুলির জীবন কোন দিকে বয়ে যাবে?

অনাবৃষ্টিতে নগর পুড়ে যাচ্ছে, কেন? আচার্য বলেছিলেন জেনে নেবেন ওই আকাশ থেকে। সপ্তর্ষি, অরুন্ধতী, ব্রহ্মাহৃদয়, বিশাখা নক্ষত্রের কাছে থেকে। রাশিগুলির তারা থেকে। জেনেছেন কি? তিনি নিজে বেরিয়েছিলেন আচার্য বৃষভানুর উদ্দেশে। কিন্তু সেই শীতের রাতে কোন ভবিতব্য তাঁকে নিয়ে গেল মহাকাল মন্দিরে? মহাকাল মন্দিরে গিয়ে প্রধান পুরোহিতের কাছে পৌঁছনোর আগেই দেবদাসী তাকে থামালো। রোমাঞ্চ জাগে এইজন্য সেই রাত্রের কথা মনে এলে। কে সেই দেবদাসী? মুখখানিও ভাল করে দ্যাখেননি তিনি সেই রাতে। জীবনের অপূর্ণ স্বাদ পূর্ণ হয়েছিল যেন। কিন্তু সেই ঘটনাই তো এখন নগরে রটে গেছে। কে বলল? দেবদাসী? সে তো তাঁকে রাজা বলে শনাক্ত করতেই পারেনি। মহাকালকে ধারণ করেছিল পৃথিবীর মতো সেই নারী। এখনো মনে পড়ে তার কণ্ঠের অস্ফুট ধ্বনি। সে যদি আবার অন্ধকারে ডাকে মহাকালকে, তিনি তাকে চিনতে পারবেন?

আশ্চর্য লাগছে! কী করে সেই না চেনা, না দেখা রমণীতে উপগত হলেন তিনি? কীভাবেই বা সে তাকে মহাকাল রূপে চিনেছিল? রাজাকে অন্ধকারেও কি চেনা কঠিন? এমন ঘটনা এ জীবনে আর কখনো হয়নি। কখনো মনে হচ্ছে তিনি যেন দুরাচারীর মতো ধর্ষণ করে এসেছেন এক সহায়হীনা যুবতীকে। এই ঘটনা তাঁর প্রকৃতির বিপক্ষে। প্রকৃতি বিরূপ, আকাশ মেঘহীন, নদী সরোবর জলহীন হলে কি এমন হয়? মহাপ্রকৃতি অন্যরকম হয়ে গেছে বলে, তাঁর নিজের প্রকৃতিও কি অমন অবোধ্য আচরণ করেছে? নিজেকে যেন অচেনা মনে হচ্ছে ওই ঘটনার পর। কিন্তু জীবনের অন্য সত্য হলো এই, অমন পূর্ণতা যেন আর কখনো অনুভব করেননি তিনি। জীবন কী বিচিত্র। জীবনে কত বিস্ময়। ভবিতব্য কত আঁধার কুয়াশায় ছাওয়া। তাঁর কি নারীর অভাব? উজ্জয়িনীর সেরা সুন্দরী, প্রধান গণিকা দেবদত্তা তাঁকে শুধুই ডাকে, তিনি প্রত্যাখ্যানেই স্বস্তি পান। অথচ দেবদত্তার রূপ কি তাঁকে মুগ্ধ করেনা? আবার রানী ভানুমতি তাঁর দিকে ফিরেও তাকান না এখন। কেন এমন হয় এক জীবনে?

সেনাপতি বিক্রম ক'দিন আগে অগ্নিদগ্ধ করে মেরেছে শ্রেষ্ঠীর দাসকে। শ্রেষ্ঠী নাকি ওই মরণ যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উতঙ্ককে দেখেছেন। উতঙ্ক ছিল শ্রেষ্ঠীর সবচেয়ে অনুগত দাস। উতঙ্কর ইতিহাস তাঁর অজানা নয়। শোনা যাচ্ছে তার ক'দিন আগে শূদ্রপল্লীর অগ্নিকান্ড নাকি উতঙ্করই ঘটানো। কেন ঘটিয়েছিল সে ওই ঘটনা? নিজের ইচ্ছায়? সে কি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল? কোনো কারণ ব্যতীতই আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল শূদ্রবসতিতে? তা কি হয়? নাকি সে ঘটায়নি ওই ঘটনা। এই প্রবল অগ্নিময় দিনে যে কোনোভাবে ঘটে গেছে তা। মানুষের অসাবধানতায় এই সমস্ত অগ্নিকান্ড ঘটে। ভেবেছিলেন নগর কোটালকে দিয়ে খুঁজে বের করবেন ঘটনার উৎস। কিন্তু তাঁর আগেই তো জানা গেছে সব। উতঙ্কর মৃত্যুও হয়েছে। সব অস্পষ্ট লাগছে তাঁর। শ্রেষ্ঠীই তাঁর দাসকে তুলে দিয়েছেন বিক্রমের হাতে—অবাক লাগছে শুনে। পুড়েছে তো শূদ্র বসতি। তার জন্য শ্রেষ্ঠী তাঁর দাসকে দায়ী করলেন কেন? শূদ্রজাতির প্রতি তাঁর এত মায়া! এ কি বিশ্বাস্য? শ্রেষ্ঠী কি শ্রেষ্ঠীর মতো কাজ করেছেন?

কেউ তার নিজের মতো কাজ করছে না। সেনাপতি বিক্রমও নয়, রানী ভানুমতিও নয়। শূদ্রজাতি সেনাবাহিনীর শক্তি। সত্য তা। কিন্তু ওই অগ্নিকান্ডের পর দ্রুত অপরাধী সনাক্ত করে তাকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা—এও যেন স্বাভাবিক নয়। রানী তো রাজার পাশে থাকেন। অবোধ্য লাগে ভানুমতিকে। কেন হচ্ছে এমন? এ সবই কি অনাবৃষ্টিজনিত ঘটনা? অনাবৃষ্টিতে এমন ঘটেই থাকে। এই বিশ্বসংসার, সমস্ত প্রাণীকূল আকাশের মেঘ, বৃষ্টি, রোদ, শীত, কুয়াশা, আলো, অন্ধকারে সজীব থাকে। প্রকৃতি বিরূপ হলে মানুষের আচরণে কি এমন অসঙ্গতিই দেখা যায়? কী আশ্চর্য! শোনা যাচ্ছে উতঙ্কর মৃত্যুতে প্রত্যক্ষদর্শীরা উল্লাস প্রকাশ করেছে। নগরের কোনো মানুষের নাকি শোক নেই উতঙ্কর জন্য। শোনার পর তিনি নিজেই তো শোকার্ত হচ্ছেন। উতঙ্ক নাকি খুব কষ্ট পেয়ে মরেছে। মানুষের মন থেকে দয়া মায়া কি অন্তর্হিত হলো? এও কি প্রকৃতিরই রোষ।

উজ্জয়িনীর মানুষ তো এমন ছিল না। কেন হলো এমন? এসব তিনি জানতে চাইবেন আচার্য বৃষভানুর কাছে। তিনি ছাড়া কেই বা বলতে পারেন এসব? দেবদাসীর কোনো খোঁজ নেননি তিনি। তার নামটিও জেনে নেননি সেদিন। এখন তো জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে সেই রাতের কথা

নগরের সব মানুষের কানে গেছে। তিনি কেমন গুটিয়ে যাচ্ছেন তা জানার পর। ভবিতব্য যে কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছে তাঁকে?

বাঁ দিকে শিপ্রানদী। এখন ওই নদী অন্ধকার ধারণ করে আছে। মনে পড়ে, এমন গভীর কৃষ্ণপক্ষে ওই নদীর জলে আকাশের তারাদের ছায়া দেখেছিলেন তিনি! কতদিন আগের কথা তা। এখন আকাশ ভরে আছে তারায় তারায়, নদীর বুক তার ছায়া ধারণ করতে অপারগ।

অন্ধকারে আচার্য বৃষভানুর আশ্রমের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। আজ এক বিন্দু বাতাস নেই। আশ্রম দ্বারে দেখা হলো তাম্রধ্বজের সঙ্গে। দীপ হাতে সে রাজাকে দেখে মাথা নোয়াল, আশ্রমে স্বাগত জানাই।

আচার্য?

আছেন, ওই যে বসে আছেন অন্ধকারে। দীপ তুলে প্রাঙ্গণ আলোকিত করল তাম্রধ্বজ। রাজা এগিয়ে গেলেন।

আচার্য বৃষভানু কি ঘুমিয়ে আছেন? এমন স্তব্ধ নিশ্চল তিনি। রাজা ঘুরে তাকান। তাম্রধ্বজ বলল, ধ্যানে আছেন আচার্য।

কখন জেগে উঠবেন?

উঠবেন, মহারাজ আপনি এদিকে এসে বিশ্রাম নিন, আশ্রমের ভিতরে যাবেন?

না। রাজা ধীর পায়ে হেঁটে গেলেন শিপ্রার বাঁধানো ঘাটের দিকে। দীপ হাতে তাঁকে অনুসরণ করল তাম্রধ্বজ। রাজা মাটিতে বসলেন, তাম্রধ্বজ দীপ একটু দূরে রেখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। রাজাও কেমন নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। আকাশের আলোর বিন্দুগুলির দিকে তাকিয়ে আছেন উজ্জয়িনীর রাজা। তাম্রধ্বজ রাজাকে দেখতে লাগল।

একটু বাদে রাজা ভর্তৃহরির সম্বিত ফিরল। আচার্যর শিষ্যটি আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ফিরলেন তার দিকে। যুবকটিকে দেখে ধীমান মনে হয়েছিল আগের বার। তিনি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন অম্রধ্বজের পরিচয়। তাম্রধ্বজ মাথা নামিয়ে আত্মপরিচয় দিতে, রাজার তাঁকে ভাল লাগল, বললেন, দাঁড়িয়ে কেন, বসো।

তাম্রধ্বজ হাঁটু মুড়ে বসল রাজার সামনে। অন্ধকারে বহুক্ষণ থাকলে চোখের আলোয় তা স্বচ্ছ হয়ে যায়। তাম্রধ্বজ দেখতে পাচ্ছে নদীর জলহীন তলদেশ পর্যন্ত, সে বলল, মহারাজ, আমার দেশে বেত্রবতী নদীও শুকিয়ে গেছে প্রায়।

জানি, সংবাদ এসেছে।

তাম্রধ্বজ বলল, এমন অনাবৃষ্টি নাকি আগে কখনো হয়নি?

আমি দেখিনি, অস্ফুট স্বরে বললেন রাজা ভর্তৃহরি, আচার্যকে নিবেদন করেছিলাম অনাবৃষ্টির কারণটি অনুসন্ধান করতে।

তাম্রধ্বজ চুপ করে থাকল। সে কিছু বলতে চায়, কিন্তু বাধো বাধো ঠেকছে। বলতে চাইছে ধ্রুবপুত্রের কথা। তাকে কি জানেন মহারাজ?

রাজা অবাক হলেন, কার কথা বলছ?

ধ্রুবপুত্র, ধ্রুবদাস ছিলেন শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্তর সখা।

রাজা বললেন, মনে পড়ে না তো।

আপনার মনে থাকার কথা নয় তো, এ বহুদিন আগের কথা, পুত্রর যখন বয়স এক বৎসর, ধ্রুবদাস মারা যান, পুত্রটির জন্মের সময় তার মাও মারা যান, অনাথ শিশুটিকে মানুষ করেন গম্ভীরা গ্রামের এক গৃহস্থ।

তারপর?

ধ্রুবপুত্র ছিল জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠী তাঁর শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন...। বলতে লাগল তাম্রধ্বজ। রাজা অবাক হয়ে শুনতে লাগলেন। তাম্রধ্বজ ধীরে ধীরে ধ্রুবপুত্রকে বর্ণনা করছিল গন্ধবতীর বর্ণনা মতো, তারপর আচমকা বলল, সে নির্বাসনে যাওয়ার পর থেকে এই দেশে বৃষ্টি নেই।

তা কী করে হয়, তোমার দশার্ণ দেশেও তো অনাবৃষ্টি।

দশার্ণ, উজ্জয়িনী—সব এক আকাশ মহারাজ।

সমস্ত পৃথিবীই তো এক আকাশ।

সমস্ত পৃথিবীর কথা জানি না, তবে কোথাও যে বৃষ্টি হয়েছে, এ সংবাদ শুনিনি।

কোনো দেশে মেঘ নেই?

না মহারাজ, একদল মানুষ চলে গেল পুবের দিকে, তারা মনে করেছে পুবদিকে বৃষ্টি হয়েছে, একদল মানুষ এল পুব থেকে এই দিকে, তারা মনে করেছিল এই দিকে বৃষ্টি হয়েছিল, এইরকম উত্তরের মানুষ দক্ষিণে যাচ্ছে, দক্ষিণের মানুষ উত্তরে, মানুষ চঞ্চল হয়েছে মহারাজ, অস্থির মানুষ দাঁড়াতে চাইছে না কোথাও।

রাজা বললেন, আমি বোধহয় ওসবের কিছুই জানি না।

তাম্রধ্বজ বলল, জানেন, কোনো কিছুই তো অজানা থাকার কথা নয়, আপনি রাজা।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাম্রধ্বজকে দেখলেন রাজা। যুবকটির কণ্ঠস্বরের দার্ঢ্যকে তিনি অস্বীকার করতে পারছিলেন না। তাঁর একবার মনে হলো জিজ্ঞেস করেন ধ্রুবপুত্রর আরো কথা। নামটি তাঁর শোনা হতে পারে, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু যেভাবে তার কথা বর্ণনা করল তাম্রধ্বজ, মনে হচ্ছে ধ্রুবপুত্রর কথা তাঁর আরো বেশি করে শোনা উচিত। কিন্তু কী হবে? অস্থির হয়ে উঠেছে মন। কোথাও বসতে চাইছে না। তাম্রধ্বজের কথা তাঁর কানে আসছে। সে বলছে, সমস্ত রাত পথে মানুষ চলে, যদি দেখতে চান রাজা পথে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন।

রাজা আচমকা উঠে দাঁড়ালেন, আচার্য কি জেগে উঠলেন?

উনি তো জেগেই আছেন।

মনে হয় না, মনে হয় উনি ঘুমিয়ে।

তাম্রধ্বজ একটু সংকুচিত হয়ে গেল। কথাটা যে তার মনেও ঘোরে না তা নয়। কিন্তু ভাবতেই ভয় করে। ধ্যানমগ্ন আচার্য ঘুমিয়ে আছেন? রাজা উঠেছেন। আশ্রমের দিকে পা বাড়িয়েছেন। তাম্রধ্বজ রাজাকে অনুসরণ করছে। এগোতে এগোতে রাজা আচমকা দাঁড়ালেন, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন, তুমি এক আশ্চর্য কথা বলেছ।

কী কথা? তাম্রধ্বজ অবাক হলো।

আমার মনে হচ্ছে ধ্রুবপুত্রকে আমি দেখেছিলাম।

হতে পারে। অস্ফুট কণ্ঠে জবাব দিল তাম্রধ্বজ।

রাজা বললেন, মানুষের মন মায়ায় পূর্ণ, মায়ার বিনে জগৎ বাঁচেনা, পুবের লোক ভাবে পশ্চিমে বৃষ্টি, ফসল, সুখ; পশ্চিমের লোক ভাবে পুবেই সব, রাজা ভাবেন প্রজার জীবন সুখের, আর প্রজারা ভাবে রাজার জীবনেই সমস্ত সুখ।

তাম্রধ্বজ বললেন, মহারাজ এ তো পুরনো কথা, পুরনো প্রবাদ, সকলেই জানে।

রাজা বললেন, মন বড় অস্থির হয়েছে, মন অস্থির হলে পুবের মানুষের আর পুবে মন বসে না, পশ্চিমে যায়, ওহে আচার্যর ঘুম ভাঙাও।

তাম্রধ্বজ বলল, উনি ধ্যানে।

আমি অস্থির হয়ে আছি, আচার্য আর কত সময় নেবেন? অবন্তীদেশ যে পুড়ে যায়, জ্বলে যায়, আমি আজই জবাব নিয়ে ফিরব। বলতে বলতে দীর্ঘ পদক্ষেপে রাজা এগিয়ে গেলেন। ধ্যানমগ্ন আচার্য বৃষভানুর সামনে দাঁড়ালেন। তারার আলো পড়েছে ধ্যানমগ্ন জ্যোতির্বিদের মুখের উপর। চোখ দুটি বুঁজে আছে। অস্থির রাজা হাঁটুমুড়ে বসে আচার্যর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা তাম্রধ্বজকে বললেন, গ্রহ তারা তো গণনার বিষয়, ধ্যানে কী হয়?

মহারাজ এটি আচার্য জানেন, ধ্যানে সব হয়, গণনা যখন দিশাহীন হয়, তখন ধ্যানই পথ দেখাতে পারে।

রাজা ডেকে উঠলেন, আচার্য!

গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলেন রাজা। ঘুমন্ত মানুষই এমন নিঃশ্বাস ফেলে থাকে।

রাজা ডাকলেন, আচার্য আমি উজ্জয়িনীর রাজা, আমি আপনার গণনার ফল জেনে নিতে এসেছি,

বহুদিন এদেশ বৃষ্টিহীন হয়ে আছে।

ধ্যানমগ্ন আচার্যর ভিতরে কোনো ব্যত্যয় নেই। রাজা তাকিয়ে আছেন। এ তো ঘুমন্ত মানুষেরই চেহারা। তাঁর অনুমানে কোনো ভুল হয়নি। তিনি হাত বাড়ালেন, স্পর্শ করলেন আচার্য বৃষভানুর বক্ষ-দেশ, তখন যেন ভূমি কেঁপে উঠল। আন্দোলিত হয়ে উঠল বৃষভানুর স্থির দেহটি। চমকে চোখ মেললেন তিনি। চোখ মেলেই দেখলেন রাজাকে। দু চোখ বিস্ফারিত হলো। বিস্ফারিত চোখে বিপন্নভাব ফুটে উঠল। তিনি মনে মনে টের পাচ্ছিলেন রাজা আসবেন। রাজার না এসে উপায় নেই। অবন্তীদেশে এখনো বৃষ্টি নামেনি। নগর জ্বলছে, গ্রাম জ্বলছে। মাটি ফেটে যাচ্ছে। রাজার বিশ্বাস আচার্য জানতে পারবেন প্রকৃতির এই রোষের কারণ? এ দেশে মেঘ না এলে বিপন্ন রাজা আরো বিপন্ন হবেন। রাজার সম্পর্কে যে কথা ভাসছে নগরের বাতাসে তা কানে গেছে তাঁর। রাজাকে এখন রক্ষা করতে পারে আকাশের মেঘ। সুবৃষ্টি যে রাজার পুণ্যে হয় তা মনে করে লোকে। সুবৃষ্টি হলে রাজার সমস্ত পাপ ধুয়ে যেতে পারে। ধুয়ে যায়, ধুয়ে যাবে। সিংহাসন নিরাপদ থাকবে। না হলে আকথা কুকথা আরো রটে যাবে। রাজার সমস্ত সুকৃতি পুড়ে যাবে রোদের তাপে।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, সঙ্কট মোচনের উপায় খুঁজে পেলেন আচার্য?

আচার্য বৃষভানু মাথা নাড়লেন। ক্লিষ্ট মুখে হাসলেন, বললেন, জানিনা।

জানেন না? আর্তনাদ করে উঠলেন রাজা, এতদিনেও খুঁজে পাননি আকাশের কোনো গ্রহ তারা যার কারণে অবন্তীদেশে বৃষ্টি নেই।

বৃষভানু বললেন, না।

যদি আচার্য বৃষভানু না পারেন, কে পারবে?

জানিনা। বৃদ্ধ জ্যোতির্বিদ মাথা নুয়ে বসে আছেন, ফিসফিস করে বললেন, আপনার আনন্দের মতো কোনো সংবাদ নেই মহারাজ।

তাহলে আমি কী করব, নগরে যদি বৃষ্টিই না নামে শিপ্রা, গন্ধবতী শুকিয়ে যাবে। সপ্ত সরোবর তো শুকিয়েই গেল প্রায়, নগর ছেড়ে চলে যাবে মানুষ, কী ভয়ঙ্কর কথা বলছেন আচার্য।

আচার্য বৃষভানু ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গেলেন অন্ধকারে। দুটি হাত তুলে আকাশের দিকে তাকালেন,ভাঙা গলায় বলতে লাগলেন, এই পৃথিবী এখন আমার কাছে নিরানন্দের হয়ে গেছে মহারাজ, আপনি কার কাছে এলেন! আমার এই চোখে আকাশ বঙ্কিম লাগে, মৃত্তিকার মতো ফেটে গেছে আকাশ!

রাজা এগিয়ে এলেন, কী বলছেন আচার্য!

আচার্য ডাকলেন তাম্রধ্বজকে, এদিকে এস।

তাম্রধ্বজ এল, গম্ভীর গলায় বলল, আপনাকে বিপন্ন মনে হচ্ছে আচার্য!

বৃষভানু বললেন, আকাশে তাকাও, উত্তর আকাশে।

তাম্রধ্বজ উত্তর আকাশে সপ্তর্ষিমন্ডলকে দেখতে পায়। বুনোলতার আঁকশির মতো সাতটি তারা আকাশ বিদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তর পূর্ব দিগন্তের কাছাকাছি সাতটি তারার দ্বিতীয়টি বশিষ্ঠ। আচার্য বললেন, বশিষ্ঠ আছে?

আছে আচার্য। বলেই তাম্রধ্বজ শিহরিত হলো। এই প্রশ্ন কেন? উনিও তো দেখছেন। তাম্রধ্বজ কি সপ্তঋষিকে চেনেনা? তখন আচার্য ডাকলেন, তাম্রধ্বজ, বশিষ্ঠর পাশে অরুন্ধতী?

অরুন্ধতীকে দেখে তাম্রধ্বজের মনে পড়ল গন্ধবতীর কথা। সে তাকিয়ে আছে ক্ষুদ্র তারাটিতে। আকাশে যেন গন্ধবতীর মুখ দেখতে পায় তাম্রধ্বজ। তখন কানে এল আচের্যর ডাক, দেখতে পাচ্ছ অরুন্ধতীকে?

হ্যাঁ। আকাশে তাকিয়েই জবাব দেয় তাম্রধ্বজ।

মহারাজ দেখতে পাচ্ছেন?

হ্যাঁ আচার্য। উত্তর দিতে রাজা দেখলেন আচার্যর সমস্ত মুখখানি যেন ভয়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এই অন্ধকারেও তা স্পষ্ট দেখা যায়। স্পষ্ট দেখলেন রাজা।

ঊনচল্লিশ

রাজা দেখতে পাচ্ছিলেন ভয়ার্ত আচার্য মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন। রাজা ঘুরে গিয়ে আবার বৃষভানুর মুখোমুখি হলেন। দেখলেন প্রবীন জ্যোতির্বিদের দুটি চোখ বিস্ফারিত। রাজা বুঝতে পারছিলেন বৃষভানু কাঁপছেন। কারণটি ধরতে পারছেন না তিনি। কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন বৃষভানুর সম্মুখে। তখন এগিয়ে এল তাম্রধ্বজ। সে বোধহয় আন্দাজ করেছিল আচার্য পড়ে যাচ্ছেন। ধরে ফেলল সে, আঁকড়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, কী হলো আচার্য, অসুস্থ বোধ করছেন?

আচার্য মাথা নামালেন, মাথা নাড়তে লাগলেন।

আপনি বরং বিশ্রাম নিন। বললেন রাজা।

আচার্য বৃষভানু ভাঙা গলায় বললেন, আমি তো অরুন্ধতীকে দেখতে পাই না।

চমকে ওঠে তাম্রধ্বজ, শিহরিত হন রাজা, দুজনে একসঙ্গে যেন বলে ওঠেন, কী বলছেন আচার্য, একি সত্য না হতাশা থেকে উদ্ভুত কল্পনা?

আচার্যর ঘাড় হেঁট হয়ে গেছে, তিনি ফিসফিস করে বলছেন, আমার দু'চোখ থেকে অরুন্ধতী সরে গেছেন, আমি আকাশটাকে দেখছি যেন ঢেউ, সে ঢেউ যেন অন্ধকারের নদীর, কোনোদিন তো এমন দেখিনি, এ কেমন সত্য?

তাম্রধ্বজ ভয় পায়, আর্তনাদ করে ওঠে, কী বলছেন প্রভু? এ কি সত্য?

সত্য।

এ কেমন সত্য, এ যে ভয়ানক কথা!

আচার্য ফিসফিস করে বলেন, গত দুটি মাস ধরে আমি আর অরুন্ধতীকে খুঁজে পাচ্ছি না তাম্রধ্বজ, প্রতিটি রাত ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে চোখে, শেষে নিদ্রার কাছে সমর্পণ করেছি নিজেকে, নিদ্রার বশীভূত হয়ে গেছি আমি, আকাশ অচেনা হয়ে গেছে হে। বলতে বলতে মাটিতে বসে পড়েন প্রবীণ জ্যোতির্বিদ।

রাজা বললেন, আমি একথা বিশ্বাস করি না।

তাতে সত্য তো বদলাবে না, মহারাজ আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন বশিষ্টের পাশে ক্ষুদ্র তারাটিকে?

রাজা ঘাড় কাত করলেন। তখন বৃষভানু ধীরে ধীরে বললেন, অবন্তীর দুর্ভাগ্যের কারণ সন্ধান করতে গিয়ে আমি জেনে গেছি আমার মৃত্যু আসন্ন, মহারাজ অরুন্ধতী তারা যার চোখের সামনে থেকে সরে যায়, তার আয়ু ফুরিয়ে গেছে ধরতে হবে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মরণ জেগে উঠেছে আমার সত্তার ভিতরে।

প্রভু শান্ত হন, তাম্রধ্বজ বলে।

উঠে দাঁড়ালেন বৃষভানু। তাঁর চোখ দুটির আলো যেন সত্যিই মৃতপ্রায়। অন্ধের মতোই তাকিয়ে আছেন প্রধান জ্যোতির্বিদ, বলতে লাগলেন, আমি অবন্তী ত্যাগ করে চলে যাব, আমার মৃত্যুকে আমি প্রত্যক্ষ করতে পারছি মহারাজ।

তাম্রধ্বজ বলল, প্রভু শান্ত হন, আমার দশার্ণ দেশে বেত্রবতী নদীর কুলে একটি লতা জন্মায় তার রস চোখে দিলে অন্ধত্ব কেটে যায় অনেক, দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়, আমি যাব নিয়ে আসতে।

বৃষভানু মাথা নাড়তে লাগলেন, তা আর হওয়ার নয়।

কেন প্রভু?

ওই লতা শিপ্রার ওপারে বনমধ্যে পাওয়া যায়, আমি কি চেষ্টা করিনি, অনাবৃষ্টি আমার চোখের আলো নিয়েছে, তাম্রধ্বজ তুমি আমার পুঁথিগুলি নিয়ে এস।

পুঁথি আর কী হবে? জিজ্ঞেস করলেন ভর্তৃহরি। নিষ্ঠুর শোনাল যেন তাঁর কণ্ঠস্বর।

সঙ্গে নিয়ে যাব।

সঙ্গে নিয়ে কী হবে?

জানিনা, সত্য কথাটি বলি মহারাজ, যদি কোনো আশ্চর্য ঘটনা ঘটে!

আশ্চর্য ঘটনা?

হ্যাঁ, যদি এমন কারো সঙ্গে দেখা হয়, যে পারবে দুই চোখের আলো ফিরিয়ে দিতে, আমি আবার দেখতে পাব অরুন্ধতীকে।

রাজা চুপ করে থাকলেন। এমন কি হতে পারে? এমন কেউ থাকতে পারে যে এই বার্ধক্যকে বিনষ্ট করতে পারবে? তাম্রধ্বজ চলে গেছে পুঁথির পেটিকা আনতে। আকাশের নীচে রাজা আর প্রায় অন্ধ জ্যোতির্বিদ মুখোমুখি। রাজা অবাক হয়ে দেখছিলেন আচার্যর মুখখানি। ধীরে ধীরে বললেন, এমন অত্যাশ্চর্য ঘটনা কি ঘটে?

ঘটতে পারে, জগতের সব কিছু কি আমরা জানি, নাকি সমস্ত মানুষকে আমরা চিনি?

রাজা বিড়বিড় করলেন, সদ্ধর্মের মানুষদের এমন ক্ষমতা আছে শুনেছি।

বৃষভানু মাথা নিচু করলেন।

আপনি কি সদ্ধর্মীতান্ত্রিকের খোঁজে যাচ্ছেন?

বৃষভানু মাথা তুললেন না।

তারা কি সত্যিই পারে, তাদের কি এমন ক্ষমতা আছে?

বৃষভানু মাথা তুললেন, আমারও তো শোনা।

তারা কি বৃষ্টি নামাতে পারে?

কী জানি হয়ত পারে।

আপনি কি শুনেছেন তেমন কিছু?

কল্পনা করতে পারি, আশা করতে পারি, সেই আশায় আমি চলে যাচ্ছি নগর ছেড়ে পথে, গ্রাম নগরে কোথাও কি এমন কাউকে পাব না, সদ্ধর্মী হোক বা না হোক, ব্রাহ্মণ হোক, শূদ্র হোক, যে এমন কিছু উপায় জানে যা আমার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেবে, মহারাজ আমি যাচ্ছি, যদি এমন কাউকে খুঁজে পাই যে বৃষ্টিও আনতে পারে, মেঘের সন্ধান জানে, তাকে এই নগরে নিয়ে ফিরব।

তাম্রধ্বজ সমস্ত কিছু শুনছিল। সে পুঁথির ছোট পেটিকাটি তুলে দিল বৃদ্ধ বৃষভানুর হাতে। কিন্তু বৃষভানু সেই পুঁথিগুলি বুকের কাছে আগলে স্খলিত পায়ে রওনা হলেই তাম্রধ্বজ আর পারে না, আচার্যকে আটকাতে গেল দু হাত বাড়িয়ে, তখন রাজা তাকে নিবৃত্ত করেন, তিষ্ঠ।

উনি কি সত্যই চলে যাচ্ছেন?

যেতে দাও।

উনি তো সত্যিই অন্ধ, অন্ধকে কি পথে একা ছেড়ে দেব? আচার্যদেব দাঁড়ান। আর্তস্বরে ডেকে ওঠে তাম্রধ্বজ, কোথায় যাবেন প্রভু?

রাজা আবার নিবৃত্ত করেন তাম্রধ্বজকে, বললেন, উনি এমন কিছুর সন্ধানে চলেছেন যা ওঁর চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবে, উনি দৃষ্টি ফিরে পাবেন, এই দেশের অনাবৃষ্টির কাল শেষ হবে।

তাম্রধ্বজ চাপা গলায় বলল, আপনি এত নিষ্ঠুর!

নিষ্ঠুরতা কোথায় দেখলে যুবক?

আপনি ভেবেছেন অলৌকিক উপায় বৃষ্টি আসবে, আচার্য কোনো অলৌকিক শক্তিধারী মানুষকে নিয়ে ফিরবেন, তা কি সত্যি হবে?

সত্যি হতেও তো পারে, উনি যদি তেমন কাউকে খুঁজে পান যিনি অন্ধের চোখে দৃষ্টি ফেরাতে পারেন, আকাশে মেঘ এনে বৃষ্টি নামাতে পারেন, এতে ওঁর কল্যাণ, উজ্জয়িনীর কল্যাণ, অবন্তীদেশের কল্যাণ।

মহারাজ এমন মানুষ কি আছে সত্যি?

থাকতেও তো পারে, শোনা তো যায়।

এত চক্ষুষ্মাণ থাকতে শেষ পর্যন্ত অন্ধের উপর নির্ভর করলেন মহারাজ, এত যৌবন থাকতে বার্ধক্যই কিনা আপনার আশ্রয় হলো। বলতে বলতে তাম্রধ্বজ টের পায় তার কথাগুলি রাজার সম্মুখে উচ্চারণের উপযুক্ত হচ্ছে না। সে মাথা নিচু করে। রাজা তার পিঠে হাত রাখলেন, ফিসফিসিয়ে বললেন, তুমি তো আচার্যর শিষ্য।

হ্যাঁ মহারাজ।

তুমি কি গণনা জানো?

কিছুটা, তবে অনাবৃষ্টির রহস্য আমার আয়ত্বে নেই?

রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, আচার্য বৃষভানু আমাকে কথা দিয়েছিলেন, ওঁর উপর নির্ভর করেছিলাম, কিন্তু উনি যে এমন হয়ে গেছেন এরই ভিতরে, তা জানতাম না।

তাম্রধ্বজ বলল, আচার্য যে এই অন্ধকারে কোথায় গেলেন?

আমার বিশ্বাস উনি ফিরবেন, অনাবৃষ্টিই কি ওঁর অন্ধত্বের কারণ?

হতে পারে, অনাবৃষ্টি এই দেশে অন্ধত্ব আনছে, চোখে না হোক মনে তো নিশ্চয়।

রাজা ভর্তৃহরি অবাক হয়ে তাম্রধ্বজকে দেখলেন। কথাটি তাঁর মনে ধরেছে। তিনি বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। ব্যাপ্ত আকাশের দিকে তাকালেন। উদাস হয়ে গেলেন আকাশের দিকে তাকিয়ে। রানীর কথা মনে পড়ল। দেবদাসীর কথা মনে পড়ল। কী নাম যেন তাঁর? ললিতা দাসী। রাজার মনে পড়ল গণিকা দেবদত্তার কথা। তারপর কারোর কথা মনে পড়ল না। সবাইকে ভুলে তিনি আকাশ পানে চেয়ে থাকলেন। চোখে জল চলে এল। ওফ্ কী একা! অন্ধের মতো নিঃসঙ্গ আর কেউ হয় না। সে আকাশ দেখতে পায় না, আলো দেখতে পায় না, কোনো প্রিয়জনকে দেখতে পায় না। রাজার মনে হলো এই মহাব্রহ্মাণ্ডে তিনি একা। আর কেউ নেই এই চরাচরে। তিনি থরথর করে কাঁপতে লাগলেন।

অনেকসময় নিঃস্তব্ধ হয়েছিলেন রাজা এবং তাম্রধ্বজ। দুইজনের মধ্যে কাল যেন বহমান হয়ে যায় কালান্তরে। অপরিসীম নৈঃশব্দ্য ঘিরে রেখেছিল দুইজনকে। বহুক্ষণ বাদে তাম্রধ্বজ ডাক দেয়, মহারাজ, চুপ করে আছেন কেন?

রাজা মাথা নামালেন আকাশ থেকে, অস্ফুটস্বরে বললেন, অরুন্ধতীকে দেখছিলাম।

তাম্রধ্বজ বলল, অন্ধ আচার্য একা একা নদীতীর ধরে চলে গেলেন, আপনি রাজা, আপনি তাকে নিবৃত্ত করলেন না এক অলীক আকাঙ্ক্ষায়, কিন্তু রাজার ধর্ম কি এই?

রাজা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাম্রধ্বজকে দেখলেন। কথা বললেন না।

তাম্রধ্বজ বলল, অন্ধ আতুরকে তো রক্ষা করেন রাজা, রাজার কাছে অন্ধ আর চক্ষুমাণ, ধনী আর দরিদ্র, জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী, সুন্দর আর অসুন্দর সবই তো সমান।

রাজা একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, রাজ্যের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষায় আমি আচার্যকে যেতে দিয়েছি, যখন রাজ্য পোড়ে অনাবৃষ্টির আগুনে তখন রাজা পক্ষপাতশূন্য হয়ে থাকতে পারেন না, বিচার করতে হয় কে অন্ধ কে চক্ষুষ্মাণ, যুদ্ধের কালে যেমন সবল সুস্থ পুরুষ প্রয়োজন, তারই দিকে রাজার পক্ষপাতিত্ব, তেমনি এই ভয়ানক প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে চক্ষুষ্মাণ ব্যক্তিই রাজার আশ্রয় হবেন।

তাম্রধ্বজ বলল, এই দুর্বিপাক কি প্রাকৃতিক?

প্রকৃতি যখন বিরূপ।

মহারাজ মানুষ ভাবছে এ হলো ভগবান মহাকালের রোষ।

রাজা বললেন, এই প্রকৃতিই মহাকালেশ্বর, আমি আশা করছি ফিরে আসবেন আচার্য বৃষভানু, তখন তাঁর দুই চোখ আবার দীপ্যমান হয়ে উঠবে, উজ্জয়িনীর আকাশ ছেয়ে যাবে মেঘে।

দুর্বিপাক যখন প্রাকৃতিক, প্রকৃতি ছাড়া কে দেবে মেঘ?

রাজা চুপ করে থাকলেন, মাথা নাড়তে লাগলেন, তারপর বললেন, তবুও তো মানুষ বিস্ময়ের অপেক্ষায় থাকে, আচমকা এমন কিছু ঘটে যায় যা এ জীবনে মানুষ আগে কখনো ভাবেনি, তেমনই তো হতে পারে।

তাম্রধ্বজ বলল, বিস্ময়ের কোনো ঘটনার অপেক্ষায় থাকা মানে মানুষের নিজের কোনো কিছু সম্পাদনের দায় থাকে না।

রাজা চুপ করে থাকলেন। তাম্রধ্বজ বুঝতে পারছিল নিজের ভিতরের দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন উজ্জয়িনীর রাজা। ইনি কোমলমতি। বিপন্ন রাজা ভর্তৃহরি অন্ধ জ্যোতির্বিদকে রওনা করিয়ে দিলেন বন্ধুর পথে এমন একজনের খোঁজে যার অস্তিত্ব এই পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। কে নামাবে বৃষ্টি? প্রকৃতি ব্যতীত কার সেই ক্ষমতা আছে? তাম্রধ্বজ বুঝতে পারছিল চারদিক থেকে বিপর্যস্ত রাজা এখন কী করবেন, কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। সে আবার জিজ্ঞেস করে, আচার্যর নিষ্ক্রমণে কি উজ্জয়িনীর কল্যাণ হবে, এমন ধারণা করেছেন আপনি, নাকি সত্যিই ভেবেছেন আচার্য কোনো ঐন্দ্রজালিককে নিয়ে ফিরবেন?

রাজা চমকে উঠলেন। অন্ধকারের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে তিনি মাথা নামালেন, ধীরে ধীরে বললেন, জানি না কিসে কী হয়, অনাবৃষ্টি ক্রমশ মরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে উজ্জয়িনীকে, অনাবৃষ্টিই মৃত্যু, আচার্য বললেন তিনি অন্ধ হয়ে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করছেন যেন, অন্ধতাই তো জ্যোতির্বিদের মৃত্যু, মনে হলো উনি ওঁর মৃত্যুকে সঙ্গে করে নগর ছেড়ে গেলে নগর বৃষ্টির মুখ দেখবে, প্রাণের চিহ্ন ফুটে উঠবে সবদিকে।

তাম্রধ্বজ টের পায় রাজা এক নিমজ্জিত মানুষ। কী করছেন, কী ভাবছেন নিজেই উপলব্ধি করতে পারছেন না। রাজা তো জ্ঞানী। আশ্চর্য! জ্ঞানী হয়েও তিনি বুঝতে পারছেন না ব্যর্থ মানুষের নিষ্ক্রমণে গাছের পাতাটিও কাঁপে না, ধুলো ওড়ে না পথে। বৃষভানুর নিষ্ক্রমণ হোক বা না হোক তাতে উজ্জয়িনীর কিছুই পরিবর্তন হবে না। তাহলে কেন অসহায় মানুষটিকে যেতে দেওয়া? হয়ত আচার্য তাঁর ব্যর্থতা ঢাকতে অন্ধতার কথা বলেছেন। তাঁর গণনায় কিছুই তিনি খুঁজে পাননি তাই অন্ধ হয়ে নগর থেকে নিষ্ক্রমণ। সেই নিষ্ক্রমণের কারণটি পোক্ত করতে এক ঐন্দ্রজালিকের কল্পনা যে কিনা তাঁকে চক্ষুষ্মাণ করবে, আকাশে মেঘ আনবে অলৌকিক ক্ষমতায়। তাম্রধ্বজ চেয়ে থাকে অন্ধকারে। আচার্য নদীতীর ধরে মিলিয়ে গেছেন, এই পথেই গিয়েছিল ধ্রুবপুত্র। পূর্বদিকে। তাম্রধ্বজ ধীরে ধীরে বলল কথাটা, এইভাবে না হোক, ওই পূর্বপথেই চলে গিয়েছিল আর একজন, ধ্রুবপুত্র।

কে ধ্রুবপুত্র, তার কথা কেন?

সে নগরে নেই, সে চলে যাওয়ার পরে অবন্তীর আকাশ নির্মেঘ হয়ে গেছে।

সে তো কত মানুষ গেছে, আবার কতজন এসেছে, যাওয়া আসা চলেছেই, তার সঙ্গে অনাবৃষ্টির কী সম্পর্ক?

কথাটা খুব পরিষ্কার। তবুও তাম্রধ্বজ বলে, আমি খুঁজে খুঁজে এইটুকু জানতে পেরেছি মহারাজ, অনাবৃষ্টি যদি মৃত্যু হয়, বৃষ্টির দিন তাহলে জন্ম, আমার তো মনে হয় বৃষ্টি শুধু জন্ম নয় বৃষ্টিই হলো জ্ঞান, অনাবৃষ্টি হলো অজ্ঞানতা, ধ্রুবপুত্র ছিল প্রকৃত জ্ঞানী।

রাজা বললেন, অবিশ্বাস্য। এই নগরথেকে জ্ঞান অন্তর্হিত হয়েছে?

হয়েছে মহারাজ, দেখলেন তো আচার্যকে, তিনি তাঁর সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে জরাগ্রস্থ হয়ে যাচ্ছেন, মহারাজ আপনি সমস্তদিকে তাকিয়ে দেখুন, আপনি ভেবে দেখুন, অজ্ঞানতা না হলে নগরে এই সমস্ত ঘটনা ঘটে যায়।

কোন ঘটনা?

আপনি মনে করে দেখুন।

রাজা বললেন, কিন্তু তুমি কে?

আমি তো দশার্ণ দেশীয়... বলেছি তো মহারাজ।

রাজা অদ্ভুত চোখে দেখলেন তাম্রধ্বজকে। তাঁর যেন চেনা মনে হয় এই যুবকটিকে। দেখেছিলেন কি আগে কখনো? কবে কোথায় তা মনে করতে পারলেন না রাজা ভর্তৃহরি। ইদানীং এই হয়েছে। স্মৃতিবিভ্রম ঘটে যাচ্ছে প্রায়শ।

চল্লিশ

অবন্তীর বণিক শ্রেষ্ঠ, ধনপতি সুভগ দত্ত যাবেন বাণিজ্যে। নগরে এই রব উঠেছে। সুভগ দত্ত শেষ বার কবে সার্থবাহ নিয়ে দূর দেশে গিয়েছিলেন তা মনে করতে পারেনা উজ্জয়িনীর মানুষ। দীর্ঘদিনের অনাবৃষ্টিই যেন বিস্মরণের কারণ।

সুভগ দত্ত যাবেন দূর উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বতমালার কোলে বাহ্লিক দেশে। বাহ্লিক দেশ পুরুষপুর, গান্ধার পেরিয়ে ওইখানে, নাকি মদ্র দেশের পঞ্চনদ ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্তী কোনো জায়গায় তা নিয়ে সংশয় আছে সুভগ দত্তর। নানাজনে নানা কথা বলে। এই নগরে এমন কেউ নেই যে দেশে গেছে, ওই দেশের খবর রাখে। সান্দীপনি আশ্রমের আচার্য বৃষভানু নিরুদ্দেশে গেছেন, যদিও তিনি আকাশের খবর রাখতেন, আকাশের খবর যে রাখে সে কি মাটির খবর বলতে পারে না? বাহ্লিক দেশটি কোথায় তা হয়ত আচার্য জানতেন। বৃষভানুর নিরুদ্দেশ সংবাদ উজ্জয়িনী নগরকে সচকিত করে তুলেছে।

আকাশ যাঁর কাছে ছিল হাতের তালুর মতো, সর্বজ্ঞান ছিল যাঁর অধীগত, তিনি যদি নগর ছেড়ে চলে যান, নগর তো অন্ধকার হয়ে থাকবে। অজ্ঞানতার যুগই হয়ত শুরু হয়ে গেছে। উজ্জয়িনীর গৌরব যেন অস্তমিত। এই নগরে আর মেঘ আসবে না। চিরদিন বয়ে যাবে অনাবৃষ্টির শুকনো হাওয়া। বণিক শ্রেষ্ঠ বহুদিন বাণিজ্যে যাননি, এখন যাচ্ছেন, তিনি কি চিরকালের মতো চলে যাচ্ছেন উজ্জয়িনীর সমস্ত সম্পদ, ঐশ্বর্য নিয়ে! অবন্তী দেশ ঐশ্বর্যহীন হয়ে পড়ে থাকবে পোড়া আকাশ মাথায় নিয়ে।

সুভগ দত্ত বললেন, আমার বহুদিনের সাধ বাহ্লিক দেশের পীতবর্ণের রেশম নিয়ে আসি ওই দেশ থেকে, বয়স ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে মহারাজ, এরপর আর হয়ত সম্ভব হবে না, ইচ্ছেই মরে যাবে।

রাজার কানে গিয়েছিল বণিকের বাণিজ্যে যাওয়ার খবর। রাজা ডেকে পাঠিয়েছিলেন ধনপতি সুভগ দত্তকে। সুভগ দত্ত বলছেন, কবে তিনি শুনেছিলেন ওই দেশের বিবরণ, যবন গ্রিক বণিকের কাছে। সে ছিল এক আশ্চর্য কথা। হিন্দুকুশ পর্বতমালার কোলে ওই দেশে মহাবীর আলেকজান্ডার তাঁর অধিকার বিস্তৃত করেছিলেন। এর ফলে ওই দেশে থেকে যান গ্রিসদেশের অনেক মানুষ। বাহ্লিক গ্রিস দেশই বটে, কিন্তু তা গ্রিক নারী পুরুষের আদিভূমি নয়। সে দেশ বহুদূরে, সাগর পেরিয়ে, দ্রাক্ষাকুঞ্জে ভরা। এসবও তাঁর শোনা। বণিকরা সব জানে। তারাই সব খবর আনে। ধনপতি সুভগ দত্ত বললেন, তাঁকে এসব কথা আরো একজন বলেছিল, সে হলো ধ্রুবপুত্র।

চমকে উঠলেন রাজা ভর্তৃহরি, কে ধ্রুবপুত্র?

আমার সখাপুত্র।

সে কোথায়?

নেই এ নগরে, সে ছিল বিদ্বান, জ্ঞানী। বলতে বলতে মাথা নিচু করলেন সুভগ দত্ত। তাঁর গলা ভার হয়ে যাচ্ছিল। উতঙ্কর মৃত্যুর পর নিজেকে গৃহে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এখন বেরিয়েছেন মাসাধিক কাল পরে। বাণিজ্যে যাবেন। দূর বাহ্লিক দেশে যাবেন। রাজার মনে পড়ে যাচ্ছিল তাম্রধ্বজের কথা। তার মুখেই তো ধ্রুবপুত্রের কথা শুনেছেন তিনি, বললেন, সে কি আপনার আশ্রিত ছিল?

সত্য মহারাজ।

তাকে আমি কি কখনো দেখেছি?

সুভগ দত্ত বললেন, সে যদি নিজে এসে থাকে আমি জানি না, আমি তো সঙ্গে করে নিয়ে আসিনি।

সে কি সুন্দর ছিল?

সুভগ দত্ত নিশ্চুপ। একটু সময় নিয়ে বললেন, পূর্ণ যৌবন ছিল তার, যৌবন তো সুন্দর, আর সে ছিল জ্ঞানী, জ্ঞানও তো সুন্দর।

এমন মানুষ তো উজ্জয়িনীর গৌরব হতে পারত।

সুভগ দত্ত চুপ করে থাকলেন। কী জবাব দেবেন? তবে কিনা সমস্ত কিছু জেনেও, পিতার বয়স্য, ধনপতি সুভগ দত্ত যে প্রধান গণিকা দেবদত্তার অনুরাগী, তা জেনেও সে কিনা ওই নারীর প্রেমে পড়ে! অকৃতজ্ঞ তো নিশ্চয়ই। তাকে তো প্রতিপালনই করেছিলেন তিনি। গম্ভীরায় পড়ে থাকলে সে বড়জোর রাজার কর্মচারী, গ্রামরক্ষী, সৈনিক এই রকম কোনো পদের অধিকারী হতো। সাধারণ সৈনিক হলে শিবনাথের পুত্র কার্তিককুমারের মতো হারিয়েই যেত। সুভগ দত্তর মনটি আবার বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল।

রাজা বললেন, ধ্রুবপুত্র থাকলে আপনার সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারত।

সুভগ দত্ত কোনো কথা বললেন না। হয়ত রাজার কথা সত্য। আবার সত্য না হতেও তো পারত। ধ্রুবপুত্রর জন্য উজ্জয়িনীতে এমন কিছু ঘটনা ঘটে গেল তা অভিপ্রেত ছিল না। ধ্রুবপুত্রর জন্যই গণিকা দেবদত্তা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এখন যে গণিকা বলে সে রাজঅনুরাগিনী, সব অসত্য। আসলে সে ধ্রুবপুত্রের অপেক্ষাতেই আছে। ধনপতি সুভগ দত্তকে নিবৃত্ত করার জন্য রাজঅনুরাগিনীর ভান করে থাকে দেবদত্তা। এ তাঁর বেঁচে থাকার কূট কৌশল। সুভগ দত্ত তা টের পেয়ে গেছেন। কিন্তু গণিকা যদি সত্যিই রাজার অনুরাগিনী হতো, রাজা কি মহাকাল মন্দিরকে গোপনে অপবিত্র করে আসতেন? মহাকাল দেবতার নাম নিয়ে উপগত হতেন নিরীহ দেবদাসীতে? এই ঘটনা ঘটেছে শুধু গণিকা রাজাকে নিজের মোহমুগ্ধ করে তুলতে না পারার জন্য। এই কাজ তারই ছিল। হয়নি ধ্রুবপুত্রের জন্য। ধ্রুবপুত্র যদি দেবদত্তাকে মোহাবিষ্টা না করত, তা হলে দেবদত্তার প্রতি তিনি নিজেও তাঁর অধিকার প্রয়োগ করতে

পারতেন। তা যদি হতো রাজার অনুজ, সেনাপতি বিক্রমের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে হত না তাঁকে। শূদ্রপল্লী দাহন এবং উতঙ্কের মৃত্যুও ঘটাতে হত না। সমস্ত কিছুর মূলেই গণিকার প্রত্যাখ্যান। তার মূলে ধ্রুবপুত্রের অদৃশ্য প্রভাব, অদৃশ্য উপস্থিতি। এখন সেই ভয়ানক মৃত্যু দর্শনের পর ধনপতি সুভগ দত্তর আর মনে পড়ে না দেবদত্তার মুখ। কোনো নারীই তাঁর এই শোককে নিবারণ করতে পারবে না। পৃথিবীর কোনো নারী, স্বর্গের অপ্সরা, কেউই না। কোনো হীরকখণ্ড, মণিমুক্তোর বদলে তিনি এই শোক থেকে মুক্ত হতে পারবেন না। উতঙ্ককে তিনি নিজহাতে তৈরি করেছিলেন। গড়েছিলেন। নিজের নিষ্ঠুরতা দান করেছিলেন ওই পাহাড়িয়া প্রাণীটির ভিতরে। শিশু উতঙ্ককে মাতৃকোল থেকে কেড়ে এনেছিলেন। এখনো তাঁর মরণ কান্না তাঁর কানে ভাসছে। এ সমস্তই হয়েছে দেবদত্তার জন্য। নারীর প্রতি অধিকার স্থাপন করতে সুভগ দত্ত নিজের জীবনকে করে তুলেছেন বিষাদাচ্ছন্ন। ধ্রুবপুত্রই সেই বিষাদের অদৃশ্য কারণ।

রাজা বললেন, নগর পুড়ছে, মেঘ আর বৃষ্টির চিহ্ন নেই কত কাল, বিপদের দিনে এই নগর ছেড়ে চলে যাবেন ধনপতি, না গেলে হত না?

মাথা নাড়লেন সুভগ দত্ত। তাঁকে যেতে হবে। যাওয়ার আয়োজনও হয়ে গেল প্রায়। তিনি কত কাল আগে উত্তরদেশে, হিমালয়ে গিয়েছিলেন, নিয়ে এসেছিলেন উতঙ্ককে। তারপর গেছেন পুব দিকে, পাটুলিপুত্র পর্যন্ত, দক্ষিণ পশ্চিমে বারুগাজা, সোপারা বন্দরে তো যাওয়া আসা ছিলই, দশার্ণ গেছেন, বৎস্য দেশ গেছেন, কিন্তু উত্তর-পশ্চিমে যাননি, সিন্ধু পার হয়ে পুরুষপুর, গান্ধার, বাহ্লিক দেশ পীতবর্ণের রেশমের দেশ। তিনি তাঁর মনোবাসনার কথা ব্যক্ত করার পর উজ্জয়িনীর ছোট বড় বণিকের দল তাঁর সঙ্গী হবে বলে জানিয়েছে। তারা নেবে উজ্জয়িনী, অবন্তীদেশের পণ্যসামগ্রী, সূক্ষ্ম মসলিন, মিহি ও মোটা কাপাসবস্ত্র, সেই বস্ত্র রঙীন আর শাদা, দুই রকমেরই। তারা নেবে মণিমাণিক্য, ময়ূর, কবুতর থেকে আরো নানারকম পাখি, আখ, চন্দন এইসব। যাত্রার সময়ও ঘনিয়ে এল প্রায়, এখন রাজা আর কীভাবে নিবৃত্ত করবেন তাঁকে? এই নগরে গভীররাত্রে ধনপতি সুভগ দত্ত শুনতে পান উতঙ্কের মরণকান্না। আরো গভীর রাত্রে উতঙ্ক এসে দাঁড়ায় তাঁর সামনে। এই নগরের বাতাসে এখন মানুষের মাংস পোড়ার গন্ধ পান সুভগ দত্ত। এই নগরে এখন আর শান্তির আশ্রয় নেই। এই নগরে আর নেই সেই প্রাচীন সৌরভ, স্নিগ্ধতা। চতুর্দিকে দাহনের চিহ্ন।

রাজা বললেন, বাণিজ্যযাত্রার সময় তো নয় এখন।

জানি।

যদি পথের ভিতরে বর্ষা নেমে আসে, আপনাকে ফিরে আসতে হবে।

জানি।

তবে এখন যাচ্ছেন কেন?

সুভগ দত্ত বললেন, মহারাজ আমি পীড়িত, আমি গত একটি মাস প্রায় নিদ্রাহীন রাত কাটাচ্ছি, আমাকে এখন বেরোতে হবে এই নগর ছেড়ে।

রাজা বললেন, তা কি আপনার সেই পাহাড়িয়া ভৃত্যের মৃত্যুর কারণে?

সুভগ দত্ত বললেন, আপনার কাছে তো কোনো কিছুই অজ্ঞাত থাকার কথা নয়।

অজ্ঞাত তো ছিলই সব, কেন তার মৃত্যুদণ্ড হলো জানি না তো।

শূদ্রপল্লীর আগুনের কথা কি মহারাজ শোনেননি?

দেখেছিলাম সেই রাত্রে, অনাবৃষ্টির কালে এমন তো হয়ে থাকে।

সেই আগুন দিয়েছিল উতঙ্ক নিজে।

কেন?

জানি না মহারাজ।

শ্রেষ্ঠীর দাস মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা পেল, শ্রেষ্ঠী তাকে মুক্ত করতে চাননি কেন, সেনাধ্যক্ষ না করলে রাজা তো তাকে ক্ষমা করে দিতেনই।

চুপ করে আছেন ধনপতি সুভগ দত্ত। রাজা তাঁর কথার জবাব না পেয়ে আবার বললেন, এই বিচারের কিছুই আমি জানি না।

সুভগ দত্ত বললেন, যা হওয়ার হয়ে গেছে মহারাজ, উতঙ্ক তো আর জীবিত ফিরবে না, সুতরাং

আমাকে যেতেই হবে বাণিজ্যে।

রাজা বললেন, এত দ্রুত বিচারের কাজ শেষ হলো, মৃত্যুদণ্ড হলো, তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হলো, রাজা কিছুই জানলেন না, কেন এমন হলো?

সুভগ দত্ত চুপ করে থাকলেন। বিচার তিনি করেননি, করেছেন সেনাধ্যক্ষ বিক্রম। বিচার সেনাধ্যক্ষ করতেই পারেন। সেই অধিকার তাঁর আছে। কিন্তু বিষয়টা তো রাজা আর সেনাধ্যক্ষর ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকার কথা। বিচার এবং মৃত্যুদণ্ডর কথা রাজার অজ্ঞাতে কেন করা হলো তা রাজা জিজ্ঞাসা করবেন সেনাধ্যক্ষকে। শ্রেষ্ঠীকে কেন? তিনি তো রাজ্য শাসন করেন না। রাজা তাঁকে কোনো ভারই তো দেননি। দেওয়ার কথাও নয়। রাষ্ট্রক্ষমতা ভোগ করেন রাজা, সেনাধ্যক্ষ থেকে উদ্ধবনারায়ণ পর্যন্ত। শ্রেষ্ঠীর সমস্ত ক্ষমতা তাঁর ধন সম্পদে। সেই সম্পদেই তিনি শাসনক্ষমতার একটু একটু অংশ ক্রয় করে থাকেন। উদ্ধবনারায়ণ ওই লোভেই তো তাঁর পদলেহন করে থাকে। সেনাধ্যক্ষ সিংহাসনের অধিকার নিতে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে অন্যভাষায়। আর ধন সম্পদের জোরেই না তিনি প্রধান গণিকার সাহচর্য ক্রয় করতে চান। কিন্তু বিচারের কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন কেন রাজা? তাঁরই অনুগত, পালিত, পোষা মানুষটিই তো মারা গেছে। তিনিই তো শোকার্ত।

রাজা বললেন, ঘটনায় আমি বিস্মিত হয়েছি, ঘটনাটা আমার ভাল লাগেনি।

চুপ করে আছেন সুভগ দত্ত। তাঁর অস্পষ্টভাবে মনে হচ্ছে রাজা হয়ত কিছু জানেন। শূদ্রপল্লীতে আগুন লাগা, উতঙ্কের মৃত্যুদণ্ড যে রাজার বিপক্ষেই এক ষড়যন্ত্রের অংশমাত্র, তা হয়ত রাজা টের পেয়ে গেছেন। ভাবতেই সুভগ দত্ত ঘামতে লাগলেন। যে দাসী তাঁকে হাওয়া করছিল তালপত্রের পাখাটি দিয়ে সেও যেন বুঝতে পেরে হাওয়ার বেগ বাড়িয়ে দিল।

রাজা বললেন, নগরের উপান্তে শূদ্রপল্লী বিনা কারণে, অহেতুক পুড়িয়ে দেওয়া হবে, আর তারপরই অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড হয়ে যাবে দ্রুত, এসবের কিছু জানবেন না রাজা, তা কেন হবে?

সুভগ দত্ত মাথা নিচু করলেন। তিনি যেন বুঝতে পারছিলেন রাজা সব জেনে ফেলেই তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁর বাণিজ্য যাত্রায় রাজার কোনো কৌতূহল নেই, কিন্তু উতঙ্কের মৃত্যুদণ্ড রাজাকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছে। সেনাধ্যক্ষর গুণগান করছে নগরের মানুষ, তার সঙ্গে শ্রেষ্ঠীরও গুণগান করছে। সেনাধ্যক্ষ দ্রুত অপরাধীকে শনাক্ত করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, আর শ্রেষ্ঠী তাঁর অনুগত দাসটিকে রক্ষা করেননি যেহেতু সে ছিল অপরাধী। এই সব কথা নগর থেকে ভেসে আসায় রাজা ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। রাজা বহু পুঁথি পাঠ করেছেন, রাজার অনুমান শক্তি প্রখর, তা যেন ঘ্রাণশক্তির মতো তীব্র। রাজা সন্দেহবশত সুভগ দত্তকে ডেকে জেরা করছেন। আর এও তো সত্য, রাজার অনুচর কি নগরে ছড়িয়ে নেই। রাজা হয়ত সব জেনে বসে আছেন। একটি মার্জার যে ভাবে মৃত প্রায় মুষিককে নিয়ে খেলা করে, রাজা কি তেমন ভাবে খেলছেন ধনপতি সুভগ দত্তকে নিয়ে? রাজার প্রতিরোধ কি গোপনে শুরু হয়ে গেছে? উজ্জয়িনীর সিংহাসন কি সহজে দিয়ে দেবেন রাজা ভর্তৃহরি? এসব মাথার ভিতরে খেলছিল। মনে মনে শঙ্কিত হচ্ছিলেন সুভগ দত্ত। তাঁর প্রভূত ধনসম্পদ আছে, মণিমাণিক্যের কোনো অভাব নেই। এই রাজ্যে যত সম্পদ, তাঁর নিজেরও প্রায় ততই সম্পদ। কিন্তু তিনি তো রাজা নন। রাজার আদেশে যে কোনো সৈনিক তরবারি উন্মুক্ত করবে। তিনি তো সেই শক্তি ধারণ করেন না। সুভগ দত্ত স্বস্তিতে ছিলেন না।

সুভগ দত্ত বহুদিন বাদে অনুভব করছিলেন তিনি যেন অপরা সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। যৌবনকালে সমুদ্রের তীরে বসে কাটত ধ্রুবসখার সঙ্গে। সমুদ্রের মুখোমুখি হয়ে নিজেদের যেন বিন্দুর মতো মনে হতো। সুভগ দত্তর মনে হতে লাগল তিনি যেন রাত্রির নক্ষত্রময় আকাশের নীচে বসে আছেন আকাশের দিকে চেয়ে। তাঁর চতুর্দিকে সীমাহীন প্রান্তরের স্তব্ধতা। ধ্রুবসখা ছিল আশ্চর্য মানুষ। আকাশের দিকে চেয়ে বলত, মানুষ তো এই মহাবিশ্বে ধুলোর মতো, ধূলিকণার মতো মনে হয় না আকাশের দিকে চেয়ে থাকলে? সুভগ দত্ত রাজার সামনে সেই সত্যে ফিরে যাচ্ছিলেন যেন। যতই সম্পদ থাক তাঁর, রাজার আছে সিংহাসন। উজ্জয়িনী নগর, অবন্তীদেশে রাজা ভর্তৃহরি তো দেবাদিদেব মহাদেব, ভগবান মহাকালেশ্বরের প্রতিনিধি। মহাদেবই তো এই নগরকে মুক্ত করেছিলেন। এই নগর স্বর্গের বাইরে আর এক স্বর্গ। স্বর্গতুল্য।

রাজা বললেন, শুনেছি, উতঙ্ক অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল।

শ্রেষ্ঠী যেন এবার খড়কুটো খুঁজে পেলেন নিমজ্জমান মানুষের অবলম্বনের মতো, বললেন, হ্যাঁ মহারাজ, ওর নিষ্ঠুর প্রকৃতিই শূদ্রপল্লীতে আগুন লাগানোর কারণ।

আচমকা কেন আগুন লাগাবে?

মাথা নাড়লেন সুভগ দত্ত, তিনি জানেন না।

শূদ্রপল্লীতে অগ্নি সংযোগ এবং মৃত্যুদণ্ড, দুইই রহস্যময়, রাজার অবর্তমানে সেনাধ্যক্ষ বিচার করলে বোঝা যেত, আমি তো নগরেই আছি।

চুপ করে আছেন শ্রেষ্ঠী। তিনি টের পাচ্ছিলেন রাজা ভর্তৃহরির নিকটে কোনো সত্যই আর লুকিয়ে নেই। সমস্ত কিছু অবগত হয়ে রাজা তাঁকে ডেকে এনেছেন। তিনি আর রাজার চোখে চোখ রাখতে পারছিলেন না।

রাজা বললেন, উতঙ্ক তো পাহাড়িয়া, আরণ্যক মানুষ ছিল।

হ্যাঁ মহারাজ।

তারা তো অমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয় না।

উতঙ্ক অমনই ছিল, ব্যতিক্রম। বললেন শ্রেষ্ঠী।

কিন্তু আগুন লাগাবে কেন?

জানি না মহারাজ। উঠে দাঁড়ালেন শ্রেষ্ঠী। তাঁর বড় ছোট লাগছিল নিজেকে। রাজার কণ্ঠস্বর, রাজার শক্তি পেতে হলে তাঁকে সিংহাসনেই বসতে হবে। তা তিনি পারবেন না। বরং তাঁর সম্মতিটুকু থাকতে পারে সিংহাসনের অধিকারীর প্রতি। সেনাধ্যক্ষ বিক্রমের প্রতি। সেই সম্মতি তো রাজা ভর্তৃহরির প্রতিও ছিল। রাজাকে কত স্বর্ণমুদ্রাই না তিনি দান করেছেন। রাজাকে নিবেদন করেছেন কত মূল্যবান সামগ্রী। যে রত্নহার দেবদাসীর গলায় পরিয়ে দিয়েছেন রাজা, তাঁরই তো দেওয়া রাজাকে। কিন্তু এইসব দান তো রাজশক্তি ক্রয়ের প্রচেষ্টা মাত্র। রাজার শক্তি সম্পূর্ণত এতে পাওয়া যায় না।

রাজা বললেন, আপনি সত্যই বাণিজ্যে যাবেন?

যাব মহারাজ, আমার কাছে সব অসহ্য হয়ে উঠেছে, উতঙ্ককে আমিই তো মানুষ করেছিলাম, শিশু উতঙ্ককে নিয়ে এসেছিলাম ওর মায়ের কোল থেকে।

তাকে নিষ্ঠুর করে গড়ে তুলেছিলেন কেন?

চমকে উঠলেন সুভগ দত্ত, সে তো ওইভাবেই বেড়ে উঠেছিল।

তার চারদিকে কি নিষ্ঠুরতা ছিল?

না মহারাজ, চারদিকে তো এই নগর ছিল।

রাজা ভর্তৃহরি বিষণ্ণ হলেন, তিনি জানালা দিয়ে দূরের আকাশের দিকে তাকালেন। সব শূন্য, শুধু গৃধিনীর ডানা কালো বিন্দুর মতো, চলমান। রাজা বললেন, এই শিপ্রা নদী, গন্ধবতী নদী, মহাকাল মন্দির, সপ্তসাগর, জ্ঞানচর্চা, গীতবাদ্য, এসবের ভিতরে যে বড় হয়, সে কি নিষ্ঠুর হতে পারে?

হয়েছিল তো।

আপনি জানতেন না?

জানতাম, সুভগ দত্ত ফিসফিসিয়ে বললেন, ভাবিনি এমন হবে।

কী ভাবেন নি?

ওকে ওই জন্য পুড়ে মরতে হবে।

রাজা জানালার দিকে চেয়েই কথা বলছিলেন, বললেন, ওর মৃত্যুতে আপনি শোকার্ত?

হ্যাঁ মহারাজ।

ওর প্রাণভিক্ষা করলে ও বেঁচে যেত, তা করেননি তো।

বুঝতে পারিনি এভাবে আচ্ছন্ন করবে ওর মৃত্যু, আমি অপরাধীর শাস্তি চেয়েছিলাম।

রাজা বললেন, গৃহের সম্মুখে যে সারমেয়টি শুয়ে থাকে, তার অনিষ্ট হলেও মানুষ উদ্বিগ্ন হয়, তাকে রক্ষা করতে চায়, আপনি তো আমার নিকটে আসতে পারতেন, আপনি এই নগরের শ্রেষ্ঠ বণিক, আপনার ন্যায় ধনপতি এই নগরে আর নেই, আপনি চাইলে কি সেনাধ্যক্ষ না করতেন?

চুপ করে আছেন শ্রেষ্ঠী। তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি ধরা পড়ে গেছেন। উতঙ্ক কেন নিষ্ঠুর ছিল? উতঙ্ক

কেন মরল শূদ্রপল্লীতে আগুন দিয়ে—এসব নিয়ে অনুসন্ধান করলেই রাজা সব জেনে যাবেন। রাজা জানবেন উতঙ্ক তাঁর আদেশেই প্রহরণ ঘোরাত রথে বসে। উতঙ্কর নিষ্ঠুরতাও ছিল তাঁর অভিপ্রায়। শ্রেষ্ঠী মাথা নামিয়ে আছেন।

রাজা বললেন, শূদ্রপল্লীতে অগ্নি সংযোগ এবং মৃত্যু—এর পিছনে কী আছে, নগরের মানুষ কী বলছে?

শ্রেষ্ঠী দাঁড়িয়েই আছেন। তিনি অপেক্ষা করছিলেন রাজার মুখ থেকে পরম সত্যটি শুনবেন বলে। রাজা নিশ্চিত জেনে গেছেন পুরোহিত, শ্রেষ্ঠী এবং সেনাধ্যক্ষের অভিপ্রায়।

রাজা বললেন, আপনি যেতে পারেন মান্যবর, আপনি অসময়ে বাণিজ্যে যাচ্ছেন, অবন্তী দেশে বৃষ্টি নেই বলে সিন্ধুতীর, পুরুষপুরে কি বৃষ্টি থাকবে না? আপনি যখন নগর ত্যাগ করছেন তখন নগরবাসী বিপন্ন, এমন অনাবৃষ্টি এই নগর কখনো দ্যাখেনি, আপনি যান, বাণিজ্য যাত্রা করুন, নগরের ভার আমার উপর, এই অনাবৃষ্টির শেষ দেখে আমিও.......। কথা শেষ করলেন না রাজা ভর্তৃহরি।

শ্রেষ্ঠীর মাথা আরো নিচু হয়ে যাচ্ছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন মাথা তুলে বাঁচতে হলে তাঁকে বাণিজ্যেই যেতে হবে। রাজার ইচ্ছায় বাণিজ্য যাত্রা স্থগিত রাখলে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কি থাকবে?

একচল্লিশ

অনাবৃষ্টির কাল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ আচার্য বৃষভানু উজ্জয়িনী ছেড়ে চলে গেছেন। কেউ বলছে তিনি পুবে গেছেন শিপ্রাতীর ধরে, কেউ বলছে তিনি গেছেন পশ্চিমে। কেউ কেউ এমন কথাও বলছে যে সে ভোর রাতে দেখেছিল আচার্য শিপ্রানদী পার হয়ে ওপারের মাঠ ধরে যেতে যেতে শূন্যে মিলিয়ে গেছেন যেমন দিনের আলোয় মিলিয়ে যায় রাতের আকাশের তারা। বৃষভানুর শিষ্য তাম্রধ্বজও তারপর যেন কোথায় গেছে। সে কি চলে গেছে বিদিশা নগরে, নিজ দেশে, নাকি আচার্যের পথই তার পথ, গোপনে অনুসরণ করছে তাঁকে। তাম্রধ্বজ অবশ্য আচার্যর মহানিষ্ক্রমণের পরও ছিল আশ্রমে। তারপর ক'দিন বাদে সেও নিরুদ্দিষ্ট। নগরবাসী আচার্যর নিরুদ্দেশযাত্রা নিয়ে নানা কথা বলছে। অনুমান করতে চাইছে, কল্পনা করতে চাইছে।

আচার্য বৃষভানুর নিষ্ক্রমণের পর শোনা যাচ্ছে ধনপতি সুভগ দত্ত বাণিজ্যযাত্রা করবেন। তাঁর সঙ্গী হবে উজ্জয়িনীর ছোটবড় বণিক ক'জন। সুভগ দত্তর বাণিজ্যযাত্রা নিয়েও নানা অনুমান, কল্পনা করা হচ্ছে। নানা কথা উড়ছে নগরে। নগরবাসী ভাবছে ধনপতি চিরকালের মতো ছেড়ে যাচ্ছেন এই নগর। আচার্য গেছেন, সুভগ দত্ত যাবেন, নগর কি ক্রমশ শূন্য হয়ে যাবে? এই সমস্ত মানুষের জন্যই তো উজ্জয়িনী আলোকিত হয়ে ছিল, এঁরা যদি চলে যান, উজ্জয়িনীর গৌরবগাথা কাদের নিয়ে রচিত হবে? কী হবে এই নগরের যদি সত্যিই বর্ষার মেঘ না আসে?

বৈশাখ শেষ হল প্রায়। দিন যাচ্ছে প্রবল দাবদাহে পুড়তে পুড়তে। রাতের আয়ু, এই সময় দীর্ঘ হয় না, তাই রৌদ্র-জ্বলনের সময়ও থাকে অনেক। দিনমান রৌদ্রদহনে আতঙ্কের হয়ে উঠেছে। রাত্রিকাল যদিও শীতল, কিন্তু তার ব্যাপ্তি আর কতটুকু? আরম্ভ হতে হতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। এখন দিবা ও রাত্রিতে নানারকম কথা উড়ছে নগরে, নানারকম কথা তৈরি হয়ে উড়ে যাচ্ছে মানুষের কাছে, মানুষও সেই কথা ধরে আরো কথা বানিয়ে তুলছে। কেউ বলছে উজ্জয়িনীর সোনার দিন শেষ। এই যে দীর্ঘকাল ধরে প্রবাহিত হচ্ছে অনাবৃষ্টির বাতাস, এর অর্থ গভীর, গভীরতর। এই অনাবৃষ্টি নাকি অনন্তকাল ধরে চলতে থাকা এক মহাপ্রলয়েরই ইঙ্গিত। কীসে কী হয় কে বলতে পারে? কতদিন এভাবে পুড়বে নগর তা কেউ বলতে পারছে না। আচার্য বৃষভানু চলে গেছেন, অন্য জ্যোতির্বিদরা কিছুই ধরতে পারছেন না।

এক নগরবাসী বলল, বরুণদেব অপ্রসন্ন হয়েছেন, তাই এমন হচ্ছে।

বরুণদেবের কথা বলো দেখি, মুক্তা বিপণির অধিকারী এক প্রৌঢ় জিজ্ঞেস করল তাকে। নগরেরই পথের ধারে দুজনে মুখোমুখি হয়েছিল গোধূলিবেলায়। সেই সময় পার হয়ে এখন অন্ধকার নেমেছে। মধ্যগগনে চাঁদ। কয়েকদিন বাদেই পূর্ণিমা। বৈশাখের ওই পূর্ণিমাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভগবান বুদ্ধ। তিনি নাকি ভগবান বিষ্ণুরই অবতার, তাই শুনেছে তারা। কিন্তু তাঁর পথে যারা গেছে তারা এখনও

ব্রাত্য। নেড়ানেড়ির দলকে সন্দেহের চোখে দ্যাখে নগরের মানুষ, ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা।

প্রাজ্ঞ নগরবাসী বলল, বরুণদেব অপ্রসন্ন হলে কোনো উপায় নেই, তিনিই তো বৃষ্টির দেবতা, দশজন দিকপালের অন্যতম হলেন বরুণদেব, সূর্য তাঁর চক্ষু, সুবর্ণরথে তিনি চলাফেরা করেন, তিনি থাকেন আকাশ যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে মিলেছে সেই রেখায়।

সমুদ্র দেখেছ তুমি? জিজ্ঞেস করল প্রৌঢ়।

মাথা নাড়ে প্রাজ্ঞ নগরবাসী, বলল, দেখিনি, শুনেছি সমুদ্রের কথা, শুনেছি সমুদ্র নীলবর্ণের, সমুদ্র জলময়, তার আরম্ভ নেই, শেষ নেই।

উজ্জয়িনীর সপ্তসাগর তো জলহীন হয়ে গেছে, তবে সমুদ্রের কী হয়েছে?

সমুদ্রও নাকি জলহীন হয়ে যেত যদি তা অবন্তী দেশে থাকত।

সমুদ্র কোথায় আছে?

আছে, সৌরাষ্ট্র পার হয়ে ওদিকে কোথায়।

কতদূর তা?

তিন সহস্র যোজন দূরে হতে পারে, সমুদ্র সব দিকেই আছে, যেমন আমাদের পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র দেশ, সেদিকে আছে, আবার আছে পূর্বদিকেও, দক্ষিণ দিকেও, উত্তরে আছে হয়তো, জানি না, থাকলেও থাকতে পারে।

উত্তরে শুনেছি নানা পর্বত, তুষারময় দেশ।

তা পেরিয়ে আছে হয়তো, সমুদ্রের উপরে আকাশ উপুড় হয়ে থাকে।

কে বলল?

বণিকেরা বলেছে এসব।

সমুদ্রের কথা নিয়ে আলাপ চলতে থাকে। চলতে চলতে একসময় এই সিদ্ধান্তে আসা হয় যে দশদিকেই সমুদ্র আছে, যেমন উর্ধ্বে, আকাশই সমুদ্র। আকাশ যে সমুদ্র তার প্রমাণ আকাশ থেকেই অঝোরে জল নেমে আসে পৃথিবীতে, আর আকাশের রং যে নীল তা কে না জানে। উর্ধ্বে যেমন আকাশ সমুদ্র রয়েছে, তেমনি পাতালেও সমুদ্র আছে। না হলে পাতাল থেকে জল বেরিয়ে আসে কী করে? মাটি খুঁড়লেই জল আসে কী করে, নদীগুলি পাতালের জলে সমৃদ্ধ হয় যেমন, তেমনি কূপের জলও তো পাতালসমুদ্র থেকে ওঠে।

প্রৌঢ়মানুষটি বলে, কূপ তো শুকিয়ে গেছে অধিকাংশ, তার মানে কি পাতালসমুদ্রের জল ফুরিয়ে গেল অনাবৃষ্টিতে?

প্রাজ্ঞমানুষটি বলে, তাহলে নদীর বালি খুঁড়ে জল পাওয়া যাচ্ছে কীভাবে?

ঠিকই, প্রৌঢ় মাথা নাড়ে, তারপর জিজ্ঞেস করে, আকাশ সমুদ্র কি শুকিয়ে গেছে?

জানি না, হতে পারে হয়তো।

সেই জল গেল কোথায়?

শুকিয়ে গেছে, উত্তাপে তার মরণ হয়েছে।

কী ভয়ানক ঘটনা! বিড়বিড় করে প্রৌঢ়, বলল, আমাদের অজ্ঞাতে এইসব ঘটে যাচ্ছে, আমরা কিছুই জানতে পারছি না।

প্রাজ্ঞজন মাথা দোলায়, মানুষ সব জানতে পারে না, শুধু তার ফল ভোগ করে।

এর কোনো বিহিত নেই?

কী বিহিতের কথা বলো?

মানুষ সব জানবে, সতর্ক হবে তাহলে।

মানুষ অতি ক্ষুদ্র, মহাপ্রকৃতি, সমুদ্র, পাহাড়, নদী, বায়ু, গ্রহ, তারা সব মানুষের চেয়ে অনেক অনেক বড়, মহাপ্রকৃতির সমস্তটাই আমাদের কাছে দুর্জ্ঞেয়।

প্রৌঢ় মাথা দোলায়, ঠিক বলেছ, মানুষ মানুষের কথাই জানতে পারে না।

ঠিকই বলেছ, তবে কিনা ভালবাসা, প্রেম থাকলে মানুষ জ্ঞানী হতে পারে।

কথাটা বুঝতে পারল না প্রৌঢ়। সে অপরাহ্ন থেকেই নগরের পথে পথে ঘুরছে। এই রকম অনেকেই

ঘুরছে। রোদ পড়ে গেলেই সকলে যেন মেঘের সন্ধানে, বর্ষার আর কত দেরি, কেন অনাবৃষ্টি এই সব সন্ধান করতে বেরোয়। সেও বেরিয়েছিল পথে। কিন্তু তার ভিতরে আরও অনেক জিজ্ঞাসা, অনেক কথা। কীভাবে বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। সে রাতের আকাশে তাকায়। কী পরিষ্কার! কী নীলভাব চন্দ্রালোকিত আকাশে! সে চেয়েই থাকল। বুঝতে চেষ্টা করছিল জ্ঞানবান মানুষটির শেষ কথাটি।

প্রাজ্ঞব্যক্তিটি বলল, জলময় আকাশ এখন শুধুই স্মৃতি মনে হয়, সাতটি সমুদ্রই জলহীন হয়ে গেছে হয়তো।

উজ্জয়িনীতে তো দেখা যাচ্ছে তাই, সাতটি সরোবরের কোনোটিতেই জলের চিহ্ন নেই।

হ্যাঁ, এখন আমার তেমনই মনে হচ্ছে, উজ্জয়িনীর সাতসাগর জলহীন যদি হয়ে যায়, পৃথিবীর সাতসাগর জলময় থাকবে কীভাবে?

সেই সমুদ্র তো অবন্তী দেশে নেই, তুমি তো বললে সেখানে জল আছে নীলবর্ণের।

বলেছি বটে, কিন্তু সেই অনুমানে এখন সন্দেহ হচ্ছে, কেননা এদেশ মহাকালের আশীর্বাদ পুষ্ট, এদেশ যদি নির্জলা হয়ে যায়, এখানে যদি রত্নাকর সাগর, বিষ্ণুসাগর সব সাগর শুকায়ে যায়, তবে অন্য জায়গার সাগরও তো শুকানোর কথা।

চুপ করে থাকল প্রৌঢ়। সে আবার শুনছে বরুণদেবের কথা। বরুণদেব অন্য সময় আকাশ সমুদ্রের মিলনরেখায় দাঁড়িয়ে সূর্যের পথ ঢেকে দেন, এখন তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন তাই মেঘের কোনো চিহ্ন নেই কোথাও। কী ভয়ানক অবস্থা হয়েছে এই নগরের, এই দেশের। মহাকাল অরণ্যে জল নেই তাই বন্য পশুরা মরতে আরম্ভ করেছে। তৃষ্ণার্ত পশুরা অরণ্য ছেড়ে বেরিয়ে আসছে রাত্রে, দিনে। বেরোলেই নিষাদের হাতে মরছে। মহাকাল অরণ্যের দিকে মৃতপশু ইতস্তত পড়ে আছে। আকাশ থেকে গৃধিনীর পাল নেমে আসছে ক্রমাগত। রোদে মানুষ ও পশু উভয়েই মরছে। এক নিষাদ নাকি মরে পড়েছিল শিপ্রানদীর ওপারে। এইরকম কত কিছু যে ঘটছে ভয় উদ্রেককারী।

কী হবে এরপর?

প্রাজ্ঞ নগরবাসী বলল, আকাশ সমুদ্র নিশ্চিত জলহীন হয়ে গেছে, রোদের তাপে আকাশ বেঁকে যাচ্ছে একটু একটু করে, এরপর মাটি ফাটার মতো করে আকাশও ফেটে যাবে একটু একটু করে।

কই দেখতে তো পাচ্ছি না?

আমি দেখেছি। প্রাজ্ঞজন নিজের বুকে হাত দিয়ে অবলীলায় বলে, আকাশ ফেটে গেলে সেই ফাটলের ভিতর দিয়ে আগুন ঝরতে থাকবে একটু একটু করে, দিনমানে তাই ঘটছে, মনে হয় না আকাশ থেকে আগুন ঝরছে যেভাবে বর্ষার দিনে অবিরাম জল ঝরে পড়ত?

কথাটা সত্য, তেমনই মনে হয়। বিড়বিড় করে বলল প্রৌঢ় মানুষটি।

বলো দেখি আচার্য বৃষভানু কেন নগর ছাড়লেন?

কেন?

কেন আবার, তিনি জানতে পেরেছিলেন এই সমস্ত কথা, আকাশের বক্রভাব তিনি ছাড়া কে জানবে আগে? তিনি টের পেয়েছিলেন উজ্জয়িনী ভয়ানক এক মৃত্যুপুরী হয়ে উঠছে।

কী ভয়ানক কথা! শুনতে শুনতে প্রৌঢ়র গা ছমছম করে। কী শুনছে সে? না, আচার্য ছিলেন পিপীলিকার মতো। পিপীলিকা যেমন বর্ষা আরম্ভের ইঙ্গিত পেয়ে যায় সবার আগে, তেমনি তিনিও দীর্ঘকালের অনাবৃষ্টির খবর জানতে পেরেছিলেন বলেই ছেড়ে গেছেন নগর। তিনি জানতে পেরেছিলেন বর্ষা শুধুই অতীতের স্মৃতি। ভবিষ্যতের গর্ভে বর্ষার মেঘ নেই, তাই তাঁর নিষ্ক্রমণ।

আচার্য কি সত্যিই জানতে পেরেছিলেন?

হ্যাঁ, তাইই সত্য, অনেক অনেক বছর বৃষ্টি হবে না এই দেশে।

তারপর? প্রৌঢ় জিজ্ঞেস করল।

তারপরও বৃষ্টি হবে না, সব শুকিয়ে জলশূন্য হয়ে যাবে।

তারপর?

তারপরও বৃষ্টি হবে না, মাটি, বৃক্ষ জলহীন হবে, নদী, সরোবর, কূপ পুষ্করিণী তো জলহীন হয়েই গেছে দেখতে পাচ্ছি।

তারপর কী হবে?

তারপর মানুষ জলহীন হবে, তৃষ্ণার জল পাবে না তো সত্য, কিন্তু মানুষের দেহের সমস্ত রস, রক্তমজ্জা সব শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

তারপর কী হবে?

চোখের জলও ঝরে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

কী ভয়ানক কথা, এই সবই কি জানতে পেরেছিলেন আচার্য বৃষভানু?

মনে হয়, কোথাও কোনো জলবিন্দু থাকবে না যে তাইই সত্য।

তারপর?

তারপর পৃথিবী অগ্নিময় হয়ে কঙ্কাল হবে, মানুষ যখন শুকিয়ে যাবে সবই ফুরিয়ে যাবে, সব শূন্য হয়ে যাবে।

শূন্যের পর কী হবে?

তখন অনন্ত বর্ষণ শুরু হবে, বৃষ্টি ঝরেই যাবে, থামবে না।

সত্যি বলছ, তার আর কত দেরি?

অনেক অনেক সহস্র বছর হয়তো, কিন্তু সেই বর্ষণ সুখের হবে না।

এমন অনাবৃষ্টি তো শেষ হবে।

হবে, কিন্তু পুরাকালের মতো বর্ষণ শুরু হবে, প্রতিটি কল্পের শেষে পুষ্করাবর্ত মেঘ বর্ষণ শুরু করে থামে না, চলতেই থাকে সেই অবিরাম বর্ষণের কাল ...।

তোমাকে এইসব কথা কে বলল?

আমি জানি। সেই প্রাজ্ঞ নগরবাসী নিজের বুকে হাত দিল, বিড়বিড় করল, অনাবৃষ্টির কাল সম্পূর্ণ না হলে বৃষ্টি শুরু হবে না, অনাবৃষ্টির কাল শেষ হবে কল্পের শেষে।

সে তো তুমি বলছ, কল্প কবে শেষ হবে?

এক কল্প হল ব্রহ্মার এক অহোরাত্রি, দিনমান কেটেছে এখন রাত্রিকাল শেষ হয় হয়।

কবে শেষ হবে? প্রৌঢ় নগরবাসী আবার জিজ্ঞেস করল।

শেষ হবে, সেদিন বৃষ্টি আরম্ভ হবে, সেই বৃষ্টি আর থামবে না। প্রাজ্ঞজন বললেন।

না থামুক, হোক, উফ, সব যে শুকিয়ে খাক হয়ে গেল।

বৃষ্টি চলতেই থাকবে।

চলুক, একদিন তো থামবে?

উঁহু, দিনমণি মেঘের আড়ালে থাকবেন।

প্রৌঢ় নগরবাসী বলল, তাহলে পৃথিবীতে মেঘের ছায়া থাকবে শুধু?

তাইই থাকবে। প্রাজ্ঞজন বললেন।

তাহলে রোদ থাকবে না?

না থাকবে না, কিন্তু আলোও তো প্রায় থাকবে না, যুগান্তকাল পর্যন্ত বৃষ্টি হয়ে যাবে, হয়েই যাবে।

আহা সে কী সুন্দর হবে! প্রৌঢ় নগরবাসী আকাশে তাকায়, বলল, তখন কদম্ব বিকশিত হবে?

হবে আবার অতিবৃষ্টিতে নতুন পুষ্পেই পচন ধরবে।

বলাকারা গর্ভবতী হবে মেঘের দ্বারা?

হতে পারে, তবে বলাকারা ছেড়ে যাবে এই দেশ।

কে বলেছে?

তারা তো আশ্রয়হীন হবে, বৃক্ষরা শিকড় থেকে উৎপাটিত হয়ে ভূপতিত হবে, সে ভয়ানক দিন হবে, জলমগ্ন হবে সব।

প্রৌঢ় বলল, গৃহতে আশ্রয় নিয়ে থাকব।

জলমগ্ন হবে গৃহগুলিও।

প্রৌঢ় দীর্ঘশ্বাস ফেলল, হোক, তবু তো এই উত্তাপের হাত থেকে বাঁচা যাবে, কবে এই কল্পের শেষ হবে?

হবে, কতদিন, কত সহস্র বৎসর, কত কোটি বৎসর লাগবে তা বলতে পারি না, কতদিন পার হয়েছে কল্পের, আর কতদিন রয়েছে বাকি কে জানে, এই জন্ম হয়তো শেষ হয়ে যাবে।

তবুও কতদিন বাকি মনে হয়?

বিড়বিড় করল প্রাজ্ঞ নগরবাসী, বাকি তো আছেই, অনাবৃষ্টির সমস্ত লক্ষণ ফুটে তো ওঠেনি এখনও, সবে তার চিহ্ন নজরে পড়ছে, সমস্ত রস তো জগৎ থেকে এখনও নিশ্চিহ্ন হয়নি, এখনও তো আমরা বেঁচে আছি, আছি কিনা?

বিয়াল্লিশ

আলাপ চলছিল। প্রতিদিন। প্রতি গোধূলি বেলায়। প্রতি সন্ধ্যায়। রাত্রিকালে নগরময় আলাপের কোলাহল বাড়ছিল।

একদিন মুক্তা বিপণির অধিকারী সেই প্রৌঢ়জন বলল, সবই তো শেষ, তৃণের গোড়ায় রস নেই, গাছগাছালি কত শুকিয়ে যাচ্ছে বলো দেখি, আর ক'দিন এমন চললে সব মরে যাবে।

প্রৌঢ়জনের এই কথায় প্রাজ্ঞ নগরবাসী বলল, এখনও কত বাকি, মাটির রস না হয় নিঃশেষ হলো, মানুষের মনের রস, দয়ামায়া স্নেহ?

বোঝা যাচ্ছে না, তার সঙ্গে অনাবৃষ্টির সম্পর্ক কী?

সম্পর্ক গভীর, দয়াময়া স্নেহ-ভালবাসা সবই তো রসের মতো, জলের মতো, তা ফুরোতে আরম্ভ করেছে সবে, দেখতে পাচ্ছ, এরপর জ্ঞানের অভাবও ঘটবে এই নগরে।

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি কেমন যেন হয়ে গেল এই কথায়, বলল, বুঝতে পারছি না তবুও।

ভেবে দ্যাখো দেখি তুমি কি আর আগের মতো ভালবাসতে পারো?

কাকে ভালবাসব? প্রৌঢ় বিড়বিড় করে, সহধর্মিণী গত হয়েছে দুবছর আগে, মৃত্যুর আগে সে খুব কষ্ট পেয়েছিল, কালান্তক ব্যাধি তাকে আশ্রয় করেছিল.....।

তার কথা মনে পড়ে?

মনে পড়ে ব্যাধিগ্রস্ত এক বিকটদর্শন মেয়েমানুষের কথা, তার কিন্তু রূপ ছিল একসময়, কীভাবে যে তা ধ্বংস হয়ে গেল! প্রথমজীবনে তাকে ভালবেসেছিলাম, পরে কি ভালবাসা ছিল? নাকি করুণাই শুধু করেছি। প্রৌঢ়ের চোখে জল এসে গেল।

তখন প্রাজ্ঞ নগরবাসী বলল, এই যে তুমি কাঁদছ, তার মানে এখনওঁ হয়তো মনে দয়ামায়া রয়েছে, এই সব যখন অন্তর্হিত হবে, তখনই কল্পের শেষ হবে, মানে রোদে পুড়ে পুড়ে পৃথিবী ছাই হবে, আগুন আর রোদ অনন্ত হবে।

শুনল প্রৌঢ় নগরবাসী, উত্তরীয় দিয়ে চোখ মুছল ধীরে। তারপর আপনা আপনিই কঠিন হয়ে উঠতে লাগল, বলল, না আমার দয়ামায়া নেই, আমার জীবন মরুভূমি।

আবার বিবাহ করলে না কেন, নারীই পারে পুরুষের জীবন শান্ত করতে।

করেছি, কিন্তু ভুল হয়ে গেছে।

কী ভুল হল?

সে এক তরুণী, আমার সন্দেহ সে অন্য কাউকে মনে মনে ভালবাসে, তার মনের নাগাল পাই না, তার দেহের নাগালও পাই না আমি।

সত্য বলছ?

সত্য, তার যৌবন আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, কী যে হল তার?

সে কী বলে, প্রেমালাপ করে?

কিছুই বলে না, নীরব থাকে প্রায় সবসময়।

সহবাস তো করো, কী বলে?

কিছুই না, শয্যায় শান্ত।

রতিক্রিয়ায় পারঙ্গম? প্রাজ্ঞজন জিজ্ঞেস করল।

বুঝতে পারি না, সে কখনই উদ্দীপ্ত হয় না।

তুমি রতিক্রিয়ায় এখনও সমর্থ?

জানি না। প্রৌঢ় অন্যদিকে মুখ ঘোরায়, স্ত্রীলোক যদি উদ্দীপ্ত না করে, রতিক্রিয়া হয় কীভাবে?

মনে করে দ্যাখো।

প্রৌঢ় বলল, কামার্ত তো হই, কিন্তু সে থাকে পাথরের মতো নিশ্চল।

অনাবৃষ্টির কারণে এই রকম হয়ে গেছে হয়তো।

সত্য বলছ? প্রৌঢ় জিজ্ঞেস করল।

সত্যই, সেই তরুণী বধূর মন থেকে সমস্ত রস নিঃশেষিত হয়েছে হয়তো, মানুষের মনের প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, করুণার সমস্ত আবরণ যেন চূর্ণ হয়ে গেছে, দয়ামায়া প্রেম আর নেই।

প্রৌঢ় মানুষটি বিষণ্ণ হল, বলল, কেন এই অনাবৃষ্টি?

মাথা নাড়ে প্রাজ্ঞ মানুষটি, বিড়বিড় করল, বলতে লাগল, তা জানি না, তবে কারণ তো নিশ্চয়ই আছে, শোনা যাচ্ছে সূর্যদেবের রথের চাকা বসে যাচ্ছে, দিন শেষ হবে না।

থাক, ও কথা থাক। প্রৌঢ় ভয় পায়।

সূর্যদেব ক্রোধের আগুনেই শেষ করে দেবেন সব, রথ তো চলচ্ছক্তি হারাবে, রাজা যদি বিলাস আর ফুর্তিতে দিন যাপন করেন রাজত্ব বাঁচে কীভাবে? আচার্য বৃষভানুর নিষ্ক্রমণ এই কারণে।

প্রৌঢ় মাথা নাড়তে থাকে, বিড়বিড় করে, আমি তোমার সঙ্গে একমত নই, রাজা কোনো অন্যায় করতে পারেন না, রাজার পাপ হয় না, রাজা শুদ্ধ পুরুষ....। বলতে বলতে লোকটি হাঁটল চন্দ্রালোকিত রাজপথ ধরে। এই রাত্রিটিও কত দুঃসহ। একটুও বাতাস নেই, অসহ্য গুমোট। রাজপথ প্রস্তর নির্মিত। এখনও তা শীতল হয়নি। মাটি সমস্ত দিন যে উত্তাপ ধারণ করেছে তা ধীরে ধীরে ত্যাগ করছে। পথের দুপাশের মাটি থেকে যেন আগুনের ভাপ উঠছিল। লোকটি হাঁটতে হাঁটতে নিজগৃহে পৌঁছয়। তরুণী বধূটি বিষণ্ণ মুখে খোলা জানালা পথে আকাশের চন্দ্রমার দিকে চেয়ে ছিল নির্নিমেষ। বধূকে ডাকল প্রৌঢ়, বলল, কী দেখছিলে আকাশে?

চাঁদ।

দেখে নাও, যদি সূর্যের রথের চাকা বসে যায়, তবে তো রাত থাকবে না, চাঁদও উঠবে না, শুধু দ্বিপ্রহর থেকে যাবে জগতে, বিষণ্ণ কেন?

বধূ বলল, কতদিন মেঘ দেখিনি আকাশে।

মেঘ না থাকলেই বা কী?

তরুণী জবাব দিল না। আনত মুখে দাঁড়িয়ে থাকল প্রৌঢ় স্বামীর সম্মুখে। স্বামী পুরুষটি জবাব না পেয়ে অসন্তুষ্ট হল, বলল, গৃহবধূর জানালায় দাঁড়ানো শোভন নয়।

চুপ করে থাকে বধূ। তাকে নিশ্চুপ দেখে প্রৌঢ় স্বামী কুপিত হয় ধীরে ধীরে, বলল, পরপুরুষ দ্যাখো জানালায় দাঁড়িয়ে, সন্ধ্যায় দুরাচারীরা পথে নামে।

না প্রভু, আমি এসব জানি না।

যখনই গৃহে ফিরি তুমি ওই স্থানে দাঁড়িয়ে থাক কেন?

আপনি ফিরছেন কিনা তা দেখি, এই তো দাঁড়িয়েছি। মিথ্যা বলল তরুণী।

পথচারীরা আমার পত্নীকে লক্ষ্য করে, দৃষ্টি দেয়, তাদের কথা আমি শুনেছি।

তরুণী নিশ্চুপ। তার ভয় করছিল। দিনদিন প্রৌঢ় স্বামীর চোখ মুখ বদলে যাচ্ছে। মুখের ভাবে নিষ্ঠুরতা ফুটে উঠছে যে তা সে লক্ষ্য করছে। জানালায় দাঁড়িয়ে পথচারী, রথারোহী, অশ্বারোহী, রাজপুরুষ থেকে নিষাদ, সকলকে দেখতে তার ভাল লাগে। এই গৃহটি বড় অন্ধকার, নিঃঝুম, কথা বলার মানুষও তেমন নেই। আছে এক দাসী, সে বিগত যৌবনা। সেই দাসী শুধু তার যৌবনকালের কথা বলে, বলে তার স্বামী মানুষটি কবে কীভাবে তার প্রতি মনযোগ দিয়েছিলেন। তার কথা যে সত্য তা প্রমাণ করতে স্বামী তাঁর যৌবনকালে শয্যায় কীরকম আচরণ করতেন সেই বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ দিয়ে যায়। তখন যে সমস্ত শরীরে কী হয়! নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল না খুঁজে পেয়ে কী বিষণ্ণতা এসে ছেয়ে যায় সবদিকে। এই গৃহটিতে সেই বিষাদ নিয়ে বাস করে সে। জানালায় দাঁড়িয়ে আকাশ, পথ, মানুষ দেখলে সে যেন বাঁচে।

স্বামী বলল, আকাশে মেঘ এলে তা জানালায় না দাঁড়িয়েও টের পাওয়া যায়।

হ্যাঁ প্রভু।

মেঘের গর্জন শোনা যায়, বাতাস শীতল হয়।

হ্যাঁ প্রভু।

যদি বৃষ্টি হয়, ধুলোমাটি ভিজলেই তার গন্ধ পাওয়া যায়—শয্যায় শুয়ে, অলিন্দে বসে।

হ্যাঁ প্রভু।

যদি বৃষ্টি নামে তার শব্দ শোনা যায়, যায় তো?

যায়।

তবে তুমি পোড়া আকাশে তাকিয়ে কী দ্যাখো, উড়ন্ত গৃধিনী?

না, গৃধিনী তো দেখি না। ভয়ার্ত হয়ে উঠে তরুণী তার স্বামীর রুক্ষ কণ্ঠস্বরে।

পথে শৃগাল দ্যাখো, যে পুরুষ যৌবনশালী সে তো শৃগালের মতো।

কথা বলে না তরুণী। তার গা ছমছম করে। স্বামীর ঘোলাটে চোখদুটি যেন ধকধক করছে। দৃষ্টিতে ক্রূরতা ফুটে উঠছে। কেন এমন হচ্ছে? তার চোখে জল এসে গেল। পতি সেবায় সে কি কখনও অবহেলা করেছে? বৃদ্ধ স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তো তার দৃষ্টি সবসময়। স্বামী যখন যেমন চান, সে তা পালন করে। তবে কেন এমন আচরণ করছেন উনি?

প্রৌঢ় বলল, যৌবনকাল ঘৃণ্য, আমি ওই কাল পার হয়ে এসে বুঝেছি।

প্রভু। কেঁদে ফেলেছে তরুণী বধূ।

স্ত্রীলোক যদি তার স্বামীর সঙ্গে কপট আচরণ করে, স্বচ্ছ না হয়ে থাকে, তবে এই অনাবৃষ্টির কাল আরও দীর্ঘ হবে, তুমি যৌবনের অহংকারে ভেবনা যৌবন অক্ষয় হয়ে তাকে।

যুবতী স্ত্রী ভয় পেয়ে দুর্মুখ স্বামীর পা দুটি জড়িয়ে ধরল, কী বলছেন প্রভু?

নগরের মানুষ বলছে দ্বিচারিণী স্ত্রীলোকের পাপে এই অনাবৃষ্টি, আকাশ নাকি ভাঙতে শুরু করেছে সূর্যের তাপে, ভেঙে পড়লে তখন তুমি সব টের পাবে।

স্ত্রীর মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল তীব্রভাবে। তা দেখে প্রৌঢ় স্বামী আরো উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তার মুখে ভয়ানক হাসির রেখা ফুটে উঠল। প্রতি রাতেই স্ত্রীর নিকট থেকে শীতল ব্যবহার পেয়ে থাকে সে। মনের বাসনা চরিতার্থ করতে সে যুবতী বধূটিকে সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু তার শরীর সামর্থ্য হারিয়েছে রতিক্রিয়ায়। সে মনে করছে বধূর নিরুত্তাপ আচরণে এমন হচ্ছে। স্ত্রীর মুখে ভয়ার্ত ভাব দেখে প্রৌঢ় বলল, আকাশ এবার ভেঙে পড়বে উজ্জয়িনীর মাটিতে, দ্বিচারিণী স্ত্রীলোক গৃধিনীর খাদ্য হবে, তার সর্ব অঙ্গে রোগ ফুটে উঠবে, যৌবন কাল ঘৃণার কাল।

এ কী বলছেন প্রভু! কেঁদে উঠেছে সরল যুবতী। সে বুঝতে পারছিল না দিনদিন স্বামী কেন তাকে ভয়ার্ত করে তুলছেন? স্বামী কেন বদলে যাচ্ছেন? প্রৌঢ় স্বামী কেন তাকে সন্দেহ করছেন? সে জানালায় দাঁড়ালেও যৌবনদীপ্ত পুরুষ দেখলে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে ভয়ে, যদি স্বামীর চোখে পড়ে যায়। সে কাঁদতে চাইছিল। ভয়ে কাঁদতে পারছিল না। তার বুকের গভীর থেকে উদ্গত কান্না বিস্ফোরিত হয়ে ফেটে পড়ছিল যেন। প্রৌঢ়র মনের ভিতরে তখন হিংস্রতা জাগল আরও। এই যুবতীর মহার্ঘ অঙ্গ সে স্পর্শই করতে পারে প্রথমে, তারপর দুর্বল দেহে দলিত করতে পারে, কিন্তু স্ত্রী এতটুকুও সক্রিয় হয় না। কেন? স্ত্রী নিশ্চয়ই যৌবনশালী পুরুষ চায়। ভাবতেই আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল সে, বলল, এরপর যদি জানালায় দেখি, পরপুরুষ দেখতে দেখি, তোমার শাস্তি হবে, জনমেও নরকবাস, মরণেও।

স্ত্রী নিঃশব্দে কাঁদছিল। কিন্তু তার চোখে জল আসছিল না। সব যেন শুকিয়ে গেছে। তার স্বামী তাকে পায়ে ঠেলে সরিয়ে দিল, তারপর সরাসরি বলল, তুই শয্যায় কার কথা ভাবিস?

না প্রভু, মিথ্যা।

কোন শৃগালের কথা? গৃধিনী তুই, শূকরী!

মাথা নিচু করে থাকল বধূ। বুঝতে পারছিল প্রৌঢ় স্বামীর মাথার ঠিক নেই। সে কী করবে? তার কিছুই করার থাকে না শয্যায়। কখনও কোনো মুহূর্তে, অনেক পরে সক্রিয় হয়ে ওঠার সময় প্রৌঢ় ক্লান্ত হয়ে ঘুমোয়। তখন যে কী মায়া লাগে!

প্রৌঢ় বলল, আমার শরীর অশক্ত হল তোর সংস্পর্শে এসে, তুই ডাকিনী, নিশ্চয়ই ইন্দ্রজাল জানিস নেড়িদের মতো, তোকে আমি শেষ করে দেব, সাবধান মাগি।

অশ্রাব্য ভাষায় প্রৌঢ় পুরুষ ভর্ৎসনা করতে লাগল তরুণী স্ত্রীকে। ভর্ৎসনা করতে করতে তার দেহে এক ধরণের সুখ জন্মায়। তরুণী বধূর অঙ্গগুলির নিন্দা করতে করতে, তরুণী বধূকে ক্রমাগত ঘৃণার কথা বলতে বলতে তার মুখ দিয়ে লালা ঝরতে লাগল।

বধূ ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিল অনাবৃষ্টির কাল দীর্ঘ হলে এমন হয়ে থাকে। বর্ষা এলে তার প্রৌঢ় স্বামী হয়তো বদলে যাবে। আবার হয়ে উঠবে স্নেহময়। তারপর? সে দুচোখ বন্ধ করে। কবে মরণ হবে এই জনের? তখনই যেন সে বাঁচবে। বর্ষা আসবে তখনই।

প্রৌঢ় আচমকা জিজ্ঞেস করল, তুই আমার মরণ কামনা করিস?

চমকে ওঠে তরুণী, তার মনের কথাটি কী করে জানতে পারল স্বামী? সে নীরব হয়ে থাকল, আর তাতেই প্রৌঢ় বলল, কালান্তক ব্যাধি তোকে অধিকার করবে, তোর যৌবন শেষ হয়ে যাবে ক'দিনেই, তখন কী করবি তুই? কাকে নিয়ে বাঁচবি?

তরুণী কাঁদছিল। কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা করছিল, মেঘ আসুক, বহুদিন বাদে হলেও বৃষ্টি নামুক, কদম্ব বিকশিত হোক, ময়ূর পেখম মেলুক। সে প্রৌঢ় স্বামীর পা দুটি আঁকড়ে ধরে তার কাছেই প্রার্থনা জানাল, প্রভু, অনাবৃষ্টির কাল শেষ হোক, বর্ষা আসুক, প্রভু মেঘ নিয়ে আসুন উজ্জয়িনীর আকাশে, হে প্রভু আপনিই পারেন, হ্যাঁ আপনিই পারেন মেঘের ডাক শোনাতে, প্রভু আমার সর্বস্ব আমি আপনাকে নিবেদন করলাম, শুধু অনাবৃষ্টির কাল ধ্বংস করুন আপনি।

প্রৌঢ় দুর্মুখ শান্ত হল সাময়িক। তার মনে হতে লাগল সে নিজেই বরুণদেব। সে হয়তো পারে। দেবতার মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, করুণাহীন হয়ে উঠতে লাগল সে ধীরে ধীরে। করুণাহীন না হলে দেবতা হয়ে ওঠা কঠিন। দেবতার করুণার চেয়ে ক্রোধের সঙ্গে মানুষের পরিচয় নিবিড়। সেই পরিচয় আরও নিবিড় করে তুলতে চায় প্রৌঢ় স্বামী, ধীরে ধীরে বলল, আমি আর ক'দিন, আয়ু তো ফুরিয়ে গেল প্রায়, তোর তো যৌবনকাল, যৌবনেই বার্ধক্য দেখে যাবি তুই, বুড়ি হ, বুড়ি হয়ে যা।

তরুণী মাথা নিচু করে থাকল।

সূর্যদেব আকাশে যদি দাঁড়িয়ে যান, রথের চাকা যদি বসে যায়, তুই আরও জ্বলে মরবি, বুড়ি হয়ে মরে পড়ে থাকবি।

প্রভু শান্ত হন।

তরুণী বধূর আকুল প্রার্থনা জ্যোৎস্নারাত্রিতে ছড়িয়ে গেল। সেই রাতে উজ্জয়িনীর মানুষ মেঘের স্বপ্ন দেখল। এই স্বপ্নও দ্যাখেনি তারা বহুদিন। স্বপ্ন যদি এসে থাকে, তা সত্যও তো হয়ে উঠতে পারে। মানুষের স্বপ্নই তো বাস্তবতার জন্মদাত্রী।

তেতাল্লিশ

প্রৌঢ় মানুষটি গৃহে গমন করলে প্রাজ্ঞ-পুরুষটি একা হয়ে গেল। একা হয়ে কী করবে বুঝতে পারছিল না। কোথায় যাবে এখন? সে হাঁটতে লাগল উদ্দেশ্যহীন হয়ে। পথ চন্দ্রালোকিত, বাতাস ছিল না, কিন্তু সন্ধ্যার পর অনেকটা সময় কেটে যাওয়ায় প্রকৃতি ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। সে ধীরে ধীরে গণিকালয়ের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। গণিকা চতুরিকা তখন গৃহদ্বারে অপেক্ষায় ছিল। মধ্যবয়সী মানুষটিকে দুয়ারে দেখে তাকেই আহ্বান করল,

প্রভু আসুন, বিশ্রাম নিন গণিকা চতুরিকার গৃহে।

মানুষটি দাঁড়ায়। চতুরিকাকে নিরীক্ষণ করে কী মনে হতে তার ডাক শুনে ভিতরে প্রবেশ করে।

আঙিনায় পদপ্রক্ষালন করে সে চতুরিকার সহায়তায়। তারপর ঘাড়ে মাথায় জল দিয়ে আকাশের দিকেই তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

চতুরিকা ডাকে, প্রভু কি এখানে বসবেন, না ভিতরে প্রবেশ করবেন?

মানুষটি জবাব দেয় না, নিজমনে বিড়বিড় করতে থাকে কী যেন। ধরা যায় না কথাগুলি। তখন চতুরিকা জিজ্ঞেস করে, প্রভু কি ভিনদেশ থেকে এলেন?

কেন, কী প্রয়োজন?

ওই দেশে কি বৃষ্টি হয়েছে, জানেন, পথে কোথাও মেঘ দেখেছেন?

মাথা নাড়তে নাড়তে মানুষটি বলল, হে রসময়ী, তোমার দেহ মনে এখনো রস রয়েছে? তুমি কি মনে আনন্দ অনুভব করো?

বুঝতে পারে না চতুরিকা, বলল, কী বলছেন প্রভু?

আমাকে তুমি চেননা?

মাথা নেড়েছে চতুরিকা, না প্রভু।

জীবনে এই প্রথম গণিকা গৃহে এলাম, অনাবৃষ্টি কী ভয়ানক তা উপলব্ধি করতে পারছি, এই নগর এখন ধ্বংসের মুখে, তোমরা কি সেই খবর পেয়েছ?

চতুরিকা অবাক হলো, কিন্তু ভয় পায় না। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অতিথিকে লক্ষ্য করে। স্বাভাবিক তো নয় কথা। উন্মাদ নাকি? চোখমুখ যেন তেমনই। না হলে গণিকা গৃহে এসে এই কথা কে বলে? গাঁটের কড়ি ব্যয় করে এমন কথা বলতে কে আসে?

মানুষটি বলল, এই যে বর্ষা নেই। মেঘ নেই বহুদিন, কেন?

জানিনা। বিড়বিড় করল চতুরিকা, বলল, এ বছর বৈশাখী ঝঞ্ঝাও হয়নি, শিলাবৃষ্টিও হয়নি, হলে তাপ কমত।

তুমি কতদিন আগে বৃষ্টি দেখেছ গণিকে?

চতুরিকা ভাবল। মনে করতে পারল না। তারপর ভাবল যখন সে ঘুমিয়ে থাকে তখনও যদি বৃষ্টি হয়ে যায়, ঘুম থেকে উঠে কি টের পেতনা সে? তবে টের না পেতেও তো পারে। অস্ফুটস্বরে বলল, বৃষ্টি হয়েছিল নিশ্চয়ই, কবে তা জানিনা।

তুমি কি সত্য বলছ?

চতুরিকা বুকের উত্তরীয় খসিয়ে দিল, ধুস! নাগর কি তাহলে সত্যিই নগরের নও, গাঁয়ের চাষা? বলেই সতর্ক হলো। তার তো ভুল হতে পারে। লোকটি কোনো বণিক বা সওদাগরও তো হতে পারে। এক একজনের শৃঙ্গারপূর্ব আলাপ এক এক রকমের হয়ে থাকে। কার কোনপথে মনের ও দেহের তৃপ্তি হয় কে বলতে পারে?

লোকটি বলল, তুমি শান্ত হও গণিকে, উজ্জয়িনীতে বহু বছর বৃষ্টি নেই।

কত বছর?

লোকটি বলল, বহুসহস্র বছর।

খিলখিল করে হাসল চতুরিকা, বলল, বীণাবাদন শুনবে তুমি কর্তা?

কেন, বীণাবাদনের কথা কেন?

চতুরিকা বলল, আমি তো বিংশতি বর্ষীয়া, বিশ বছর মাত্তর আমার, কত বিষ্টি দেখেছি, তুমি বলছ সহস্র বছর, তুমি কে গা?

তখন নগরবাসী গম্ভীর হলো, বলল, সেই বৃষ্টি আমিও দেখেছি, আমি বলছি ভবিষ্যতের কথা। ভবিষ্যতে কেউ একদিন এমনই সময়ে এই গণিকা গৃহে এসে বলবে সহস্র বছর অনাবৃষ্টি চলেছে।

চতুরিকা আবার ভাবল এক একজন এক এক রকমে রস আহরণ করতে পারে। এক একজনের রসের কথা এক একরকমের হয়। সে তার স্খলিত উত্তরীয় বুকে মেলে ধরল আবার, বলল, প্রভু, সহস্র বছর বাদে কি আমি বেঁচে থাকব?

তুমি না থাকো আর একজন থাকবে।

আপনি বেঁচে থাকবেন প্রভু?

আমি না থাকি আর কেউ, হয়ত সে আমিই, পরজন্মে সে এই আয়ুপুত্র।

চতুরিকা অবাক, প্রভু কি আয়ুপুত্র?

হ্যাঁ, নহুষ শর্মেণ, আমার বৈদ্যবংশ।

প্রভু যে বললেন, আয়ুপুত্র?

হাসল লোকটি, পুরাণ জানো গণিকে, উর্বসীও পুরুরবার পুত্র ছিলেন আয়ু, আয়ুপুত্র হলেন রাজা

নহুষ, তিনি শত সহস্র বছর দেবরাজ্য শাসনও করেছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুর বধ করে নিজেই অচেতন হয়ে পড়েছিলেন সেই সময়ে।

চতুরিকা হাত জোড় করল, অভিভূত কণ্ঠে বলল, প্রভু আপনি কে?

আমি নহুষ শর্মণ, বাবা ছিলেন বৈদ্য, আমিও বৈদ্য, কিন্তু একবার চিকিৎসা করতে গিয়ে একটি বালককে মেরে ফেলি।

প্রভু! চতুরিকার চোখে জল চলে এল।

সেই বালক আমারই সন্তান, অতঃপর আমি আমার খল, নুড়ি, গাছগাছড়া, লতাপাতা, শিকড়বাকড় সব আঁস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছি, গণিকে সম্মুখের দিন বড় ভয়ানক, তুমি পালাও।

কেন প্রভু, কী হবে?

সহস্র বৎসর অনাবৃষ্টি চলবে।

গণিকা চতুরিকা বুঝল উন্মাদের প্রলাপ, বলল, নগরে তো মানুষ আছে, তারা যদি বাঁচে আমিও বাঁচব প্রভু।

কেউ বাঁচবে না, আচার্য বৃষভানুর নাম জানো?

ঘাড় কাত করল চতুরিকা পরম শ্রদ্ধায়, বলল, জানি প্রভু, আমি মঙ্গলনাথের মন্দিরে ক'বার গিয়েছি, আশ্রমের সম্মুখেও গিয়েছি, আচার্যকে প্রণাম করেছি আশ্রমের বাইরে দাঁড়িয়ে।

নহুষ শর্মণ বললেন, আচার্য ছেড়ে গেছেন এই নগর, এবার যাচ্ছেন ধনপতি সুভগ দত্ত।

গণিকা চতুরিকা মনে মনে বলল, বাঁচা গেল, ধনপতি বিদায় হলে দেবদত্তা বাঁচে। মুখে কপট বিস্ময় ফুটিয়ে চেয়ে থাকল বৈদ্য নহুষ শর্মণের দিকে, বলল, শুনেছি ওঁর সেই দাস, নিষ্ঠুর উতঙ্ককে পুড়িয়ে মারা হয়েছে।

ঠিকই শুনেছ।

নগরের মানুষ বেঁচেছে। বিড়বিড়িয়ে বলল চতুরিকা, তারপর বলল, প্রভু, আপনাকে কি লাস্য নৃত্য দেখাব? আপনার দাসী নৃত্য শিখেছে, বীণাবাদনও।

প্রৌঢ় নহুষ শর্মণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এখন কি নৃত্য আর বীণাবাদনের সময়? বলি হে গণিকে, সম্ভব হলে নগর ত্যাগ করো, ধনপতি সুভগ দত্ত পর্যন্ত চলে যাচ্ছেন, জান না?

চতুরিকা এবার বুঝল এই মানুষটি তার কাছে আসেনি, যে কোনো গণিকার কাছে ভয়ের কথাটি পৌঁছে দিতে এসেছে। সে বলল, মরি মরব, মহাকালের পায়ের তলায় মরব, প্রভু আপনি এবার যেতে পারেন।

এই কথায় প্রৌঢ়ের মুখমণ্ডল দপদপ করতে লাগল, বলল, গণিকাবৃত্তিই করে গেলি তুই মেয়ে, জগতের কোনো খবরই রাখলিনে, এই অনাবৃষ্টি ভয়ানক বৃষ্টির ইঙ্গিত, কী বুঝলি?

গণিকা চতুরিকা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। হাঁক মারতে লাগল, ও মহাপার্শ্ব, মহাপার্শ্ব ভাই, কোথায় আছ, ঘরে একটা উন্মাদ ঢুকেছে গো।

বীট মহাপার্শ্বকে আসতে হল না। কথাটা মানুষটার কানে যেতে সে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে প্রাঙ্গণে দাঁড়ানো চতুরিকার হাতটি ধরে ফেলে, তুই মাগি হাঁক পাড়ছিস, আমি তোকে ভাল কথা বলতে এলাম, বণিকরা যাচ্ছে বাহ্লিক দেশে, তাদের সেবা করতে করতে চলে যাবি, বাঁচবি তাহলে, ওরে অশুচি নারী, তুই যা ওদের সঙ্গে, গেলে বাঁচবি।

কোন দেশে যাবে? ভ্রুকুটি করে চতুরিকা চেয়ে থাকল প্রৌঢ়র মুখের দিকে। প্রৌঢ়র মুখখানি চাঁদের আলোয় বড় করুণ লাগল কেন কে জানে। চতুরিকা তার সামনে নত হলো, কোন দেশে যাবেন সুভগ দত্ত?

বাহ্লিক দেশে, সে বহুদূর, সিন্ধুনদ, পুরুষপুর, গান্ধার সব পার হয়ে, অনেক অনেক দূর, পীত বর্ণের রেশম মেলে সেই দেশে।

আমার জন্য ওই রেশম বস্ত্র আনবেন প্রভু?

কে আনবে?

কেন আপনি, আপনি যাবেন না?

আমি, আমি কেন যাব?

সবাই চলে যাবে আপনি যাবেন না? চতুরিকা জিজ্ঞেস করে।

প্রৌঢ় নহুষ শর্মণ মাথা ঝাঁকাতে থাকে, তারপর আবার বলে, তুই যা ওদের সঙ্গে, উজ্জয়িনীতে এরপর একদিন বৃষ্টি নামবে, সেই বৃষ্টি আর থামবে না।

কবে বৃষ্টি নামবে প্রভু?

শত সহস্র বৎসর অনাবৃষ্টি, তারপর শত সহস্র বৎসর বৃষ্টি—হায় হায়, যাকে বলি সেই বোঝে না, কেন যে বোঝে না, আচার্য বৃষভানু তাহলে গেলেন কেন নগর ছেড়ে, কেন বণিকরা সবাই চলে যাচ্ছে হে?

লোকটি মাথা নাড়তে নাড়তে চন্দ্রালোকিত প্রাঙ্গণ ছেড়ে এগোয়। চতুরিকা বলল, দাঁড়ান প্রভু, দীপ নিয়ে আসি।

না, যা বললাম কর গণিকে, চলে যা বাহ্লিক দেশে, এখেনেও পুরুষ মানুষের সেবা করিস, বণিকদের সেবা করতে করতে যাবি, তারা যে যাবে, নারী তো পথে চাইই, তোকে সমাদরে নেবে, এখন কাঁচা বয়স! নারী বিনে কত দিন কাটাতে পারবে সোমত্ত পুরুষ মানুষগুলো?

চতুরিকার মনে হলো, লোকটি কি তাহলে সুভগ দত্ত ও অন্য বণিকদের প্রেরিত? দেবদত্তার আশা ত্যাগ করে এখন ধনপতি কি চতুরিকাকে যাঞা করছেন? কে জানে? এতে চতুরিকার যেমন উল্লাস হলো, তেমনি আশঙ্কাও জাগল মনের ভিতরে। সে বলল, প্রভু কি যাবেন এবার?

যাব বলেই তো এসেছি, তোর কাছে ফূর্তি করতে তো আসিনি মাগি, বলছি চলে যা নগর ছেড়ে, এই নগর শেষ, এরপর কী হবে আমি স্পষ্ট সব দেখতে পাচ্ছি।

কী হবে প্রভু?

চাতক পাখি! নগরের সবাই চাতক পাখি হয়ে জল জল করে সমস্ত দিন ছুটে বেড়াবে, জল পাবে শুধু রাজা রানী, আর সেনাপতি, ধনপতিরা, বাকি সব শুকনো দেহ নিয়ে চাতক, চাতক, চাতক! বলতে বলতে প্রৌঢ় নহুষ শর্মণ হেঁটে প্রাঙ্গণ পার হয়ে গেল। চতুরিকা বসে পড়ল প্রাঙ্গণে।

আজ সমস্তদিন কোনো পুরুষ মানুষ আসেনি। উদ্ধবনারায়ণের আসার সময় হয়নি এখনো। যে লোকটি এল, সেও তো হয় উন্মাদ না হয় বণিকের চর। সুভগ দত্ত তাহলে দেবদত্তাকে ছেড়ে তাকে চাইছেন! চতুরিকা শিহরিত হলো। তাহলে তার কপাল ফিরল! সে মুক্তি পাবে ওই কুচক্রী বিকৃত রুচির পুরুষ উদ্ধবনারায়ণের হাত থেকে। হে মহাকাল! পশ্চিমদিকে ফিরে অদৃশ্য মহাকাল মন্দিরকে প্রণাম করল চতুরিকা। হে প্রভু, তাই যেন হয়। যেন বণিক সুভগ দত্ত তাকে নিয়ে যান ওই দেশে। ওই দেশের নামটা কী? 'বাহ্লিক, বাহ্লিক! চতুরিকা উচ্চারণ করতে লাগল মনে রাখার জন্য। কিন্তু নহুষ শর্মণ নামের বৈদ্য যে চলে গেল! তাকে তো সে 'হ্যাঁ' বলেনি, 'না'ও বলেনি। তাহলে কী হবে? নহুষ শর্মণ ফিরে গিয়ে কি বলে দেবে গণিকা চতুরিকা অরাজী? সে উঠে দাঁড়াল। এখনই চাই লোকটাকে। না সে এই নগরে আর থাকবে না। উদ্ধবনারায়ণের হাতে প্রহৃত হতে এখানে থাকবে না। এই খারাপজীবন থেকে অনেক ভাল ধনপতি সুভগ দত্তর সেবাদাসী হয়ে তাঁর বাণিজ্যযাত্রার সঙ্গী হওয়া। দেবদত্তা মূঢ়। মূঢ় বলেই না সেই অর্বাচীন ধ্রুবপুত্রের জন্য বসে আছে নগরে। সে কি আর ফিরবে? ফিরবেই না। হয়ত এতদিনে বেঁচেই নেই। হয়ত হুন রাজ্যেই গিয়েছে সে। অবন্তীর শত্রু দেশে গিয়ে কি আবার অবন্তীতে ফিরতে পারে? দেবদত্তার অনন্ত যৌবন শুধুই ক্ষয় হচ্ছে আপনা আপনি। চতুরিকা উদ্দীপ্ত হয়ে পথে ছুটে গেল। পথ শূন্য। শূন্য রাজপথে একটি অশ্বর ক্ষুরধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আর শোনা যাচ্ছে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। চন্দ্রালোকিত পথ ধরে মাথায় উত্তরীয়টি দিয়ে মুখ ঢেকে এগোতে এগোতে দেখল যা ভেবেছিল তাই, ছোট টাঙ্গন অশ্বটির পিঠে চেপে গান গাইতে গাইতে আসছে উদ্ধবনারায়ণ। সুরা পানে ঈষৎ মত্ত। পথের ধারে মুখ ঢেকে দাঁড়াল চতুরিকা। ভয়ে হিম হয়ে যাচ্ছিল সে। তাকে যেন না চিনতে পারে উদ্ধব! তা হলে তো ভয়ানক বিপদ। কিন্তু আশা পূরণ হলো না। প্রায় নিভৃন্ত মশাল হাতে থেকে লাফ দিয়ে নামল রাজসত্রি। জড়ান গলায় বলে উঠল, পথের ধারে কে গো তুমি অভিসারিকা, রাতে পথে তুই কে রে মাগি? ঝপ করে হাতটি ধরে ফেলল উদ্ধব।

চুয়াল্লিশ

চতুরিকা বলেই দিল সে যাচ্ছে শ্রেষ্ঠীগৃহে। কথা হয়ত সত্য নয়, তবে অসত্যও তো নয়। পথে যখন বেরিয়েছে বৈদ্যরাজ নহুষ শর্মণকে খুঁজতে খুঁজতে সে শ্রেষ্ঠীগৃহ অবধি চলে যেত হয়ত। শ্রেষ্ঠীগৃহ তাকে টানছে। নহুষ শর্মণ এই নগরের কোথায় থাকেন তা জানে না সে, কিন্তু শ্রেষ্ঠীগৃহ তো চেনা। নহুষ শর্মণ হয়ত ওখানে গেছেন। না গেলেও কল্পনা করতে অসুবিধে কোথায়? সেই কল্পনাই তো শ্রেষ্ঠীগৃহে যাওয়ার পথটি দেখিয়ে দিত তাকে। শ্রেষ্ঠীর বার্তা নিয়েই তো তিনি এসেছিলেন চতুরিকার কাছে, এখন চতুরিকার সংবাদ নিয়ে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠীর কাছে তাঁর ফিরে যাওয়ার কথা। উদ্ধবনারায়ণ যদি পথরোধ না করত, চতুরিকা অনেকখানি পথ এগিয়ে যেতে পারত।

চতুরিকার কথায় উদ্ধব নারায়ণ তার ফণা নামিয়ে নিল। ধীরে ধীরে মাটি ঘষটে যেমন গর্তের দিকে ফিরে যায় শান্ত হয়ে যাওয়া কালসর্প, উদ্ধবনারায়ণ প্রায় সেইভাবেই টলতে টলতে অশ্বের অন্য ধারে গিয়ে দাঁড়াল। এখন গণিকা এবং রাজসত্রির মধ্যিখানে নিশ্চুপ ঘোড়াটি মাথা নামিয়ে। সব থেমে আছে। বেগবানের বেগ মুছে গেছে, চাঁদের আলো নিশ্চল, মানুষ দুটিও। উদ্ধব চোখ পিটপিট করে দেখছে চতুরিকাকে। একি সেই গণিকা, না অন্য কেউ? তার কি ভ্রম হচ্ছে? নেশায় তো ভ্রম হতেই পারে। দিগ্‌ভ্রম হতে পারে, মানুষকেও ঠিকমতো চেনা না যেতে পারে। এ কি চতুরিকা নয়? অন্য কোনো নারী, সম্ভ্রান্ত পরিবারের কেউ? নাকি গণিকা দেবদত্তা? মুখখানি তো একবারই দেখেছে সে, ভুল দেখেছে? এখন তো আবার মাথা মুখ ঢেকে নিয়েছে রমণী তার উত্তরীয় দিয়ে। হায় হায়! সে নিজের সর্বনাশ নিজে করল। শ্রেষ্ঠীর অভিসারিকাকে পথে নিগ্রহ করেছে, কথা শ্রেষ্ঠীর কানে গেলে উতঙ্কের দশা হবে তার। শ্রেষ্ঠী তাঁর প্রিয়তম দাসকে যখন অগ্নিদাহন থেকে বাঁচালেন না, শাস্তি মকুব করালেন না, উদ্ধব কী করে ছাড় পাবে? উতঙ্কর মরণ দেখেছে উদ্ধব। গা হিম হয়ে যেতে লাগল উদ্ধবের। পথ নির্জন। ঘুম ঘুম জ্যোৎস্না পড়ে আছে পথের উপর। অনেকটা দূরে যেন আগুনে পোড়া উতঙ্ক এসে দাঁড়াল। সে দুহাতে মুখ ঢাকল।

কী হলো? চতুরিকা জিজ্ঞেস করল।

কণ্ঠস্বরে চিনল উদ্ধব আবার। মুখ থেকে হাত সরাল। অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করল, চতুরিকে?

কেন চেনা যায় না নেশা করলে?

কী বললে, কোথায় চলেছ? দু-হাতে চোখ ডলতে ডলতে জিজ্ঞেস করে উদ্ধব।

শ্রেষ্ঠীর গৃহে, তিনি আমাকে ডাক দিয়েছেন।

সত্যি! উদ্ধবের দু'চোখ বিস্ফারিত, সত্যি বলছ?

খিলখিল করে হাসে চতুরিকা। জবাব দিল না সরাসরি, বলল, তুমি দেখছি নেশায় ভূত হয়ে গেছ সত্রি মশায়।

অভিসারে যাচ্ছো?

তাই-ই তো, শ্রেষ্ঠী ডেকেছেন, চাপা গলায় বলল, চতুরিকা। বলার সময় তার সমস্ত শরীর শিহরিত হলো। আহা, কথাটা যেন সত্য হয়।

উদ্ধব চেয়ে থাকল আবার। তার মাথায় কিছু ঢুকছে না। মাথায় কিছু খেলছে না। অথচ মাথাটি তো নিরেট নয়। সর্বসময় সচল। কতরকম কূটবুদ্ধি, ফন্দি ফিকির তার মাথায় সর্বক্ষণ খেলে বেড়ায়, অথচ এই ঘটনাটি সে ঠিক মতো মেলাতে পারছে না। তারই সেবাদাসী, তারই ভোগ্যা সামান্য গণিকা কিনা শ্রেষ্ঠী গৃহে যাচ্ছে অভিসারে। নাকি তার সত্যিই ভুল হচ্ছে? এইজন চতুরিকা নয়, অন্য কেউ, কোনো সম্ভ্রান্ত নারী, কুলবধূ, ধরা পড়ে গিয়ে চতুরিকার বেশ ধরেছে। তার মাথায় ঘোর। কাকে দেখতে কাকে দেখছে সে? কার কণ্ঠস্বর শুনতে কারটা শুনছে তারও ঠিক নেই। যেই হোক এই নারী, আসলে এ শ্রেষ্ঠীরই অভিসারিকা। সে মশাল ফেলে যুক্তকরে মাথা নত করল, বিড়বিড় করে বলল, আপনি চলুন, আমি আপনাকে শ্রেষ্ঠীগৃহে পৌঁছে দিয়ে আসি, নির্জন পথ, কত রকম বিপদ হতে পারে।

চতুরিকা খিলখিল করে হাসে আবার, বিপদ তো তোমার কাছ থেকেই আসে সতরি মশায়।

একেবারে চতুরিকার গলা, কিন্তু চতুরিকা নয়। অভিসারিকারা পারে এমন। উদ্ধব শুনেছে অভিসারিকারা যোগ বলে নানারূপ ধরতে পারে, অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে ইন্দ্রজাল বিদ্যার প্রভাবে।

উদ্ধব আরো নত হলো, বলল, আমি তো ভুল ভেবে আপনার পথ রোধ করেছি মহাশয়া।

চতুরিকা বলল, তুমি যে পথে যাচ্ছিলে যাও।

আমি তো যাচ্ছি গণিকালয়ে।

গণিকা তো যাচ্ছে শ্রেষ্ঠী গৃহে।

উদ্ধব বলে, সে কেন যাবে, আপনি কোনো সম্ভ্রান্ত নারী।

চতুরিকা বলে, তোমার নেশা খুব চড়েছে সতরিমশায়।

উদ্ধব আবার শুনল, একেবারে চতুরিকার কণ্ঠস্বর। কিন্তু এ তার শ্রবণ বিভ্রম। সে কথা না বলে অসহায়ের মতো চেয়ে থাকে চন্দ্রালোকিত পথের নির্জনতায় মশাল নিভে গেছে। গা ছমছম করছে। হয়ত এ কোনো অভিসারিকা নয়, আরো কিছু। ডাকিনী বিদ্যায় পারঙ্গম কোনো দুষ্ট নারী। তার পাল্লায় পড়েছে সে। হায়রে! এতদিন ধরে রাত্রিকালে চলাফেরা করে সে, কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো ঘোড়ায়। জ্যোৎস্নায় অশ্বারূঢ় হয়ে চলাচলে শৌর্য আসে দেহে মনে। আজ তাই এসেছিল। তাই অনায়াসে সে অভিসারিকার পথ রোধ করেছে। এমন ঘটনা ঘটানো আজই তো প্রথম নয়। প্রায়ই তো এক একজনকে ধরে ফেলে সে রাজসত্রি না হলে, নগরে রাত্রিকালে চলাফেরা না করলে সে জানতেই পারত না, কোন ঘরের বউ অভিসারে কোন পুরুষের কাছে যায়, কোন যুবতী মেয়ে গোপন অভিসারে কার সঙ্গে মত্ত হয়। অভিসারিকারা যে গৃহে যায় তা কতটা সম্ভ্রান্ত বা অভিসারিকা কতটা সম্ভ্রান্ত গৃহের কন্যা বা কুলনারী, তা জেনেই উদ্ধবের রূপ বদল হয়। এই নগরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঘরে যে কত গুপ্ত ঘটনা ঘটে যায় প্রতিদিন, রাজসত্রি হিসেবে তার কিছু খোঁজ রাখে সে। আর রাত্রিকালে কত যুবতী যে ধরা পড়ে তার কাছে। সেও সুযোগ নেয়। পথিমধ্যে পান করে নেয় যৌবনের মধু। কখনো গলা থেকে খুলে নেয় সোনার হার, আঙুল থেকে সোনার অঙ্গুরীয়। অভিসারিকারা এই নিগ্রহের কথা না পারে জানাতে, না পারে কাঁদতে। কপালের ফের বলে মেনে নেয়। তবে হ্যাঁ, খুব নিশ্চিন্ত না হয়ে উদ্ধব এসব করে না।

চতুরিকা বলে, চুপ হয়ে গেলে যে।?

তুমি কি সত্যিই চতুরিকে, গণিকালয়ের চতুরিকে?

তবে আমি কে?

উদ্ধব মাথা ঝাঁকাতে থাকে। সে বুঝতে পারছে তার সঙ্গে ছল করছে কোনো অভিসারিকা কুহকিনী। কুহকিনী না হলে সুভগ দত্তর গৃহে অভিসারে যেতে পারে?

উদ্ধব বলল, কে জানবে, কেউ না।

সবাই জানবে, তুমি বলে দেবে।

না, না, না।

বলবেই, শুঁড়িখানায় বসে দশজনকে শুনিয়ে দেবে এই কথা।

তাহলে তো আমার ধড়ে মাথা থাকবে না।

থাকবে নাইতো। চতুরিকা ক্রমশ সাহসী হয়ে উঠছিল। সে বুঝতে পারছিল উদ্ধবের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার এইই উপায়। না হলে ওই মাতাল তার দুর্গন্ধযুক্ত দেহ নিয়ে তাকে শয্যায় টানবে। ওই মাতালের সেবা করতে হবে তাকে সমস্ত রাত্রি ধরে। বমি করে ঘর নষ্ট করবে উদ্ধব। ধুস! এখন ভাবতেই ঘেন্না লাগছে। বমনের কথা ভাবতেই ঘৃণায় রি-রি করছে চতুরিকার সমস্ত দেহ। এই ঘৃণার অনুভূতি আজ এই মুহূর্তে প্রথম টের পেল চতুরিকা। আজ নহুষ শর্মণের কথা শুনে যা মনে হয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে তা সত্য। সত্যই। সুভগ দত্ত তাকে যাঞা না করলে কেনই বা বৈদ্যরাজ তার গৃহে ঢুকবে, কেনই বা বারবার বলবে সুভগ দত্তর বাণিজ্যযাত্রায় তাঁর সাথী হতে। এই কথা সত্য হলে উদ্ধবনারায়ণকে ভয় পাবে কেন চতুরিকা? ভয় থেকে ভক্তি হয়। ভয় যখন নেই, ভক্তিও নেই। ভক্তি নেই যখন, আছে ঘৃণা। এতদিন ধরে উদ্ধবের বমিতে নষ্ট হওয়া ঘর পরিস্কার করেছে সে বিনাবাক্যে, ওটাই তার কাজ এই ধারণায়। আজ ভাবতেই ঘৃণায় গা জড়িয়ে আসছে।

চতুরিকা বলল, তুমি যেখানে যাচ্ছিলে যাও।

আমি তো গণিকালয়ে....।

না, তুমি নিজগৃহে যাও।

গণিকালয় তো আমার গৃহ প্রায়। উদ্ধব আবার দুটি হাত জোড় করল।

চতুরিকা বলল, উঁহু, আমি তো ফিরব না।

তুমি কি সত্যিই চতুরিকে?

তবে আমি কে?

তুমি অন্য কেউ নও?

চতুরিকা হাসল, শ্রেষ্ঠীকে বলতে হবে সত্তরি মশায়ের কথা, নেশা করলে লোকটা চোখে ভুল দ্যাখে।

উদ্ধব দেখল চতুরিকাই বটে। তার গণিকা চতুরিকা। কী আশ্চর্য! কী ভয়ানক কথা। চতুরিকা কিনা যায় শ্রেষ্ঠীগৃহে? নাকি অন্য কোথাও? মিথ্যা কথা বলছে ধরা পড়ে গিয়ে। মাথাটা এই বার পরিস্কার হচ্ছে উদ্ধবের। ফন্দিফিকিরগুলো খেলতে শুরু করেছে। উদ্ধবের ভোগ্যা গণিকা কেন শ্রেষ্ঠীর ডাক পাবে? সে গম্ভীর গলায় বলল, চলো শ্রেষ্ঠী গৃহে দিয়ে আসি।

না, শ্রেষ্ঠী কুপিত হবেন, অভিসারিকা অভিসারে একাই যায়।

নাকি অন্য কোথাও যাচ্ছিলে?

চতুরিকা টের পায় উদ্ধব সন্দেহ করতে শুরু করেছে, মানে ওর নেশা কমছে। উদ্ধব ভয়ানক সন্দেহ পরায়ণ মানুষ, এখন যদি সত্যিই তাকে টেনে নিয়ে যায় শ্রেষ্ঠীগৃহে, তখন? নহুষ শর্মণের কথা সত্য যেমন হতে পারে, অসত্যও তো না হওয়ার কারণ তেমন নেই। অসত্য হলে কী ভয়ানক ঘটনাই না ঘটে যাবে। তাহলে?

উদ্ধব বলল, তুমি নিশ্চয়ই নাগর জুটিয়েছো আর কোনো।

আহ্! চতুরিকা বুঝতে পারে এখনই উদ্ধবের রাশ টেনে না ধরতে পারলে, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে দুর্বৃত্ত। সে এগিয়ে এসে বলল, নিয়ে চলো শ্রেষ্ঠীগৃহে, আমাকে ঘোড়ায় তোলো, দেরি হয়ে গেছে, এতক্ষণে তিনি বোধহয় নিদ্রা গেলেন।

কোথায়? উদ্ধবের যুগল ভ্রূ কুঁচকে যায়।

শ্রেষ্ঠীগৃহে, আমি গিয়ে বলি সব।

কী বলবে?

বলব উদ্ধবের জন্যই দেরি।

তাহলে সত্যি। উদ্ধব বিড়বিড় করে। এ তো ভয়ানক সমস্যা। চতুরিকার কথা সত্য হতে পারে, আবার অসত্যও। অসত্য হলে বাঁচে উদ্ধব, সে চতুরিকাকে অসত্য বলার শাস্তি দিতে পারে কিন্তু যদি সত্য হয় ওর কথা? সে যে কী ভয়ানক বিপদ হবে? শ্রেষ্ঠী তাকে পুড়িয়ে মেরে দেবেন। উদ্ধব দুটি হাত তার ঘোড়ার পিঠে রাখল, বিড়বিড় করল, এখন আমি কী করি?

কথা শুনতে পায় চতুরিকা, বলল, আমাকে নিয়ে চলো শ্রেষ্ঠীগৃহে, তোমার সন্দেহ ঘুঁচিয়ে দেই।

চতুরিকা বুঝতে পেরেছিল এ ব্যতীত অন্য কোনো পথ নেই। নিয়ে যায় উদ্ধব নিয়ে যাবে, নহুষ শর্মণের কথা সত্য হলে উদ্ধবের উপর প্রতিশোধও নিতে পারবে সে। না হলে মরবে। মরেই তো আছে।

উদ্ধব বলল, না চতুরিকে, তুমি একাই যাও।

একা যাব কী করে, দেরি হয়ে গেছে, ওই দ্যাখো চাঁদ ঢলতে শুরু করেছে, শ্রেষ্ঠী আমার অপেক্ষায় পথ চেয়ে শূন্যশয্যায় ফিরে গেলেন জানালা থেকে, ঘোড়ায় গেলে সময় কিছুটা বাঁচবে।

উদ্ধব ভয় পায়, না আমি যাব না, তুমি যাও।

তুমি না গেলে আমিও যাব না।

সে কি শ্রেষ্ঠীর ডাকে যাবে না?

না। চতুরিকা হনহন করে উল্টোদিকে হাঁটতে আরম্ভ করল, গলা তুলে বলতে লাগল, তুমি যদি পথ রোধ করো এভাবে, নগরে অভিসার বন্ধ হয়ে যাবে, এমন কথনো হয়েছে?

উদ্ধব ঘোড়ার পিঠে না উঠে, তার রাশ ধরে টানতে টানতে অনুসরণ করল চতুরিকাকে, ডাকল, এস চতুরিকে, ফিরো না।

না ফিরব না, মিনষে তুমি পথ আটকালে আমার।

আর হবে না।

যা হয়েছে তার হ্যাপা বোঝো, এখনই হয়ত নহুষ শর্মণ আবার আসবে খবর নিতে।

কে?

চতুরিকা তাকায়। তার মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। শিহরণ এল ভয়ের। দুর্বৃত্ত হয়ত বৈদ্যরাজের বাড়ি ছুটতে পারে ঘোড়া নিয়ে। বিশ্বাস নেই। নামটা কি শুনতে পেয়েছে উদ্ধব?

উদ্ধব জিজ্ঞেস করে, কে এসেছিল দূত হয়ে?

চতুরিকা বলল, দূত নয় দূতী।

সে কে?

তা তুমি জানবে কেন, আজ ঘরে এসো না, শ্রেষ্ঠী চলেও আসতে পারেন, তিনি আমাকে বাণিজ্যে নিয়ে যাবেন সহচরী করে।

উদ্ধব দাঁড়ায়। চতুরিকা দ্রুত পায়ে নির্জন পথের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে গণিকালয়ের দিকে। তাহলে চতুরিকার কথাই সত্য। কী করে জানা যাবে সত্য না অসত্য? কার কাছে খোঁজ নেবে সে? ভাবতে ভাবতে বুড়ো ঘোড়াটিকে বোঝার মতো টানতে টানতে এগোতে থাকে উদ্ধব।

পঁয়তাল্লিশ

পরের দুটো দিন প্রায় আত্মগোপন করে থাকল চতুরিকা। নিশ্চুপে ঘরে বসে অপেক্ষা করল শ্রেষ্ঠীর দূতের জন্য। ঘর ছেড়ে যেতে ভরসা হলো না কখনোই, যদি এসে ফিরে যায় সেই বৈদ্যরাজ নহুষ শর্মণ বা অন্য কেউ। ডাক এসেছিল দেবদত্তার কাছ থেকেও, সে বলেছিল পীড়িত হয়ে আছে, পরে যাবে।

দেবদত্তার পাঠানো দাসী তো অবাক, পীড়ার চিহ্ন তো নেই চোখমুখে।

চতুরিকা ঘরের দেওয়ালের কোণে বসে হাসল, আছে, তুই টের পাবিনে।

দাসী চলে যেতে চতুরিকার মনে হলো কথাটা দেবদত্তা জানলে হয়ত খুশি হতো। দেবদত্তাকে জানাতে পারলে ভাল হতো। সে অনেকবুদ্ধি ধরে, শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্তকে ঘৃণাও করে। দেবদত্তা পরামর্শ দিতে পারত কীভাবে চতুরিকা শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত হতে পারবে।

কিন্তু দেবদত্তা ঘৃণা করবে কেন শ্রেষ্ঠীকে? ঘৃণ্য মানুষ কি সুভগ দত্ত? তিনি কি শূদ্র জাতির চেয়েও অধম? নগরের সবচেয়ে ধনবান ব্যক্তি, রাজা, মন্ত্রী যাঁর কাছে বাধিত, তাঁকে কিনা ঘৃণা করে দেবদত্তা? এত সাহস তার হয় কী করে? প্রধান গণিকা হলেও সে তো নিতান্ত এক মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষের এত দর্প কি ভাল? মহাকালের বিচারে যে দুঃখ পাবে দেবদত্তা। কিন্তু এও তো ঠিক, শ্রেষ্ঠীতে মনোযোগী নয় দেবদত্তা, তাই শ্রেষ্ঠী দৃষ্টি দিয়েছেন সামান্য গণিকা চতুরিকার দিকে। সবই তো জানে চতুরিকা।

নহুষ শর্মণের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে কেমন পাগল পাগল লাগছে নিজেকে। কোনো কিছুতে মন নেই। মন রাখতে পারছে না কোনো বিষয়েই। মাথার উপর মহাকাল আছেন, তাই জীবনে এমন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল। এই পরিণতির কথা তো কল্পনাও করেনি চতুরিকা। সে নিজে থেকে এগোয়নি শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্তর নিকটে, অথচ তিনিই কিনা তাকে ডাকছেন। মহাকাল তার কথা ভেবেছেন বলে এমন হলো।

সেই বৈদ্যরাজ খবর দিয়ে যে চলে গেল আর তো আসেনা। অন্য কোনো দূতও না। কিন্তু আরো মনে রাখার মতো ঘটনা হলো উদ্ধবও আসছে না। তার মানে উদ্ধব জেনে গেছে যে সত্যি সত্যিই সে শ্রেষ্ঠীর অভিসারিকার পথ আটকেছিল। ভয়েই আর আসছে না উদ্ধব। ভয় তো পাবেই। তার গা থেকে অলঙ্কার খুলে নিয়ে কি শিক্ষা পায়নি উদ্ধব? শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে যে তার যোগ আছে ওই অলঙ্কারেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে। তখনই চতুরিকার আন্দাজ করা উচিত ছিল শ্রেষ্ঠীর ধন শ্রেষ্ঠীর কাছে ফিরে গেল কীভাবে। মাথায় কিছু ঢুকছে না। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি দেবদত্তা সব জানে? জেনে মেয়েমানুষী ঈর্ষায় তাকে বলেনি কিছুই। প্রত্যাখ্যাত দেবদত্তা নিজের জ্বালা মেটাতেই কি শ্রেষ্ঠীকে ঘৃণা করে? তাইই তো হবে। নগরের শ্রেষ্ঠজন যখন সেরা সুন্দরী, গুণবতী গণিকার কাছ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে তার অনুগামী অন্যজনের দিকে ঘুরে তাকায়, তখন অপমান ভোলার জন্য ঘৃণা ছাড়া আর কী অবলম্বন করতে পারে রূপবতী দেবদত্তা? শ্রেষ্ঠীর কামনা চতুরিকায় তা জেনে মহালতা, চন্দ্রহার,

বাজুবন্ধ, নূপুর, সুবর্ণবলয় তাকেই দিয়ে গেল দেবদত্তা। হয়ত শ্রেষ্ঠীর আজ্ঞাতেই দিয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্য! এমন ঘটনা কি ঘটতে পারে? মানুষ কিনা ডানা পেয়ে গেল আকাশে ওড়ার জন্য। চতুরিকা আকাশপাতাল ভাবতে থাকে। বুঝতে পারে সে সরলমতি, স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্না বলে বুঝতে পারেনি কিছুই। সরলমতি যুবতী বলে চিনতে পারেনি প্রেমাস্পদকে। এখন ধরা যাচ্ছে সুন্দরী, গুণবতী দেবদত্তা কেন হৃদয় সঁপেছে ভবঘুরে ধ্রুবপুত্রকে। ধ্রুবপুত্রের কী আছে? কিছুই নেই, না আছে অর্থ না আছে কৌলীন্য। সে রাজবংশজাতও নয়। তার মতো পুরুষমানুষ উজ্জয়িনীর পথে ঘাটে এমনিই ঘুরে বেড়ায়। শিপ্রা, গন্ধবতীর তীরে গেলে দেখা যাবে অপরাহ্ণ বেলায় কতজন উদাসী আকাশপানে চেয়ে বসে আছে। এখন তো মনে হচ্ছে ধ্রুবপুত্রর চেয়ে উদ্ধবনারায়ণ অনেক যোগ্য। রাজসভার ভিতরের মানুষ। রাজশক্তি তার সঙ্গে। কেমন দাপিয়ে বেড়ায় এই নগরে। দেবদত্তা যদি উদ্ধবকেও হৃদয় দিত। হায় দেবদত্তা। চতুরিকার চোখে জল এল দেবদত্তার ভাগ্য বিড়ম্বনার কথা ভেবে এবং নিজের সৌভাগ্যের আনন্দে। চৌষট্টিকলা বিদ্যা জেনেও দেবদত্তার ভাগ্যে জুটল ওই ভবঘুরে প্রায় সর্বহারা পিতৃমাতৃহীন ধ্রুবপুত্র। দেবদত্তা নিশ্চয়ই জানে শ্রেষ্ঠী কোন নারীকে যাচ্ঞা করেন, জেনেই সে নিজেকে লুকোতে, হতাশা গোপন করতে নিরুদ্দিষ্ট ধ্রুবপুত্রের জন্য শোকে কালাতিপাত করছে।

সংক্রান্তি পার হয়ে গেছে। আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিন। ঘরের বাইরে এসেছে চতুরিকা। চুল এলো করে দুয়ারে দাঁড়িয়ে বীট মহাপার্শ্বকে খুঁজছে। বীটই এখন ভরসা। শ্রেষ্ঠী তাঁর খবর পাঠিয়েছেন, এখন কর্তব্যকর্ম যা সব চতুরিকার নিজের। বীট কি খবর আনতে পারবেনা শ্রেষ্ঠী কবে যাবেন বাণিজ্যে। বীট বরং খুঁজে আনুক বৈদ্যরাজ নহুষ শর্মণ লোকটিকে। তাঁর কাছেই সব জেনে নেবে চতুরিকা। তাঁকেই বলবে তিনি খবর নিয়ে যান শ্রেষ্ঠীর কাছে, চতুরিকা তাঁর দাসী হবে, চতুরিকা তাঁর সহচরী হবে। চতুরিকা হবে তাঁর অভিসারিকা। কবে কখন কোথায় শ্রেষ্ঠী থাকবেন এই খবরটুকু নিয়ে আসুন বৈদ্যরাজ। বৈদ্যরাজ এলেন যেন ঝড়ো বাতাসের মতো, দমকা হাওয়ার মতো, এসেই মিলিয়ে গেলেন চতুরিকার মনে ঝড় তুলে। এখন যে চতুরিকা কী করে? সে কি উদ্ধবকে খবর দেবে বীটকে দিয়ে? উদ্ধবই তো পারে সমস্ত খবর নিয়ে আসতে। হয়ত উদ্ধব জানে সব। রাজার সত্রি, তার কি কোনো কিছু জানতে বাকি থাকে? উদ্ধব তো নিজেই বলে কোন যুবতী কোন দিন প্রথম রজঃস্বলা হয়েছিল সেই সংবাদও ইচ্ছে করলে জেনে নিতে পারে সে। এখন চতুরিকা বুঝতে পারছে দেবদত্তা যেমন শ্রেষ্ঠীর থেকে মন সরিয়ে ধ্রুবপুত্রতে মনে মনে মজেছে, উদ্ধবও তেমনি অন্য নারী খুঁজছে সব খবর জেনে গিয়ে। সে নির্বোধ তাই কিছুই টের পায়নি।

সমস্ত দিন ঘর-বার করল। না বীট, না উদ্ধব, কারোর দেখা নেই। রোদে গনগণ করছে সমস্ত নগর। চতুরিকার গৃহখানিও যেন অগ্নিকুণ্ড। আকাশে তাকায় চতুরিকা। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সব পুড়ছে। গরম বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ কানে আসে। আগুনের স্রোত বয়ে যাচ্ছে উজ্জয়িনী নগর দিয়ে। পথের ধারে একটি নিমগাছ, তার ডালে মস্ত এক দাঁড়কাক। মাঝে মধ্যে ডেকে উঠছে। চতুরিকা দুহাতে চোখ বন্ধ করল, কাকটাকে দেখবে না। ওই কাকের গম্ভীর কাঁ ডাক যেন মরণের ডাক। ওই কাক অলক্ষুণে। হুস হুস করতে লাগল চতুরিকা। কাক নড়েও বসে না। বরং আরো উচ্চৈঃস্বরে ডাক ছাড়ে। চতুরিকা ভয়ে ঘরে ঢুকে যায়। গা ছমছম করে তার। কত বড় দুপুর! দুপুরে কোনো মানুষের গলার স্বর শোনা যায় না। চারদিকে গভীর স্তব্ধতা। তার ভিতরে দাঁড়কাকটি ডেকেই যাচ্ছে।

দুপুর আর পার হয় না। স্তব্ধতা ভাঙে না। ঘোরের ভিতর ঝিমিয়ে থাকল চতুরিকা। বিকেল পার করে সন্ধের আগে আগে মহাপার্শ্বকে ফিরতে দেখল চতুরিকা। রোদ পোড়া মানুষটার চেহারার কী হালই না হয়েছে। ঢ্যাঙা শরীর বেঁকে গেছে আধপোড়া শবদেহের মতো। চিতা থেকে যেন উঠে এসেছে বীট মহাপার্শ্ব। চোখ দুটো গর্তে ঢোকা, মাথার লালচে চুল খাড়া খাড়া, কোমরের কাপড়খানি ময়লা, ছেঁড়া খোড়া। গায়ের ময়লা উত্তরীয়টি গলায় পাক দিয়ে রাখা, যেন রজ্জুর বন্ধনী। হনহন করে হেঁটে আসছিল মহাপার্শ্ব। চতুরিকার ঘর অতিক্রম করে চলেই যাচ্ছিল, দাঁড়াল তার ডাকে।

দিনকাল খারাপ চতুরিকা, তোর দুয়ারে বসাই সার।

কী হলো, দাঁড়াও মহাপার্শ্বভাই।

মহাপার্শ্ব দাঁড়ায়, আকাশে তাকায়, বলল, অন্ধকার হয়ে গেল, চাঁদ উঠতে দেরি আছে, আমি আবার

রাতকানারে চতুরিকে।

মোটেও রাতে কানা নও, ঠিক আছে চাঁদ উঠলে যেও, নগরের খবর কী?

মহাপার্শ্ব উবু হয়ে বসল, মাথা নাড়তে লাগল, খবর ভাল না, নগর ছেড়ে পালাতে হবে চতুরিকে, ভীষণ ভয়ের দিন সুমুখে।

চতুরিকা হাসে, বলল, শ্রেষ্ঠী তো এরই ভিতর বাণিজ্যে যাচ্ছেন।

অ্যাঁ। চমকে যায় মহাপার্শ্ব, অবাক হয়ে দ্যাখে গণিকাকে। কার মুখে কার কথা? শ্রেষ্ঠী বাণিজ্যে যাবেন কি না যাবেন তাতে চতুরিকার কী? সে বলল, ওই ধনপতির বাণিজ্যে নির্ধন মানষির দরকার কী?

চতুরিকা বলল, বাহরে, কতকাল বাদে তিনি বাণিজ্যে চলেছেন।

খ্যা খ্যা করে হাসে মহাপার্শ্ব, তা যান, কিন্তু এদিকের বাণিজ্য যে শেষ চতুরিকে, কোথাও কোনো লোক নাই যে মেয়েমানুষ যাঞা করে, এমন কখনো এ নগরে হয় নাই, পালা এদেশ ছেড়ে, না খেয়ে জ্বলে পুড়ে মরবি।

যাব তো! চাপা গলায় যেন গরগর করে চতুরিকা।

মাথা নাড়ে মহাপার্শ্ব, যাবি তো কিন্তু যাবিই বা কোথায়, চারদিক থেকে শুধু খারাপ সংবাদ আসছে, রোদে পুড়ে সব শেষ, ভিক্ষান্ন মিলবে না এরপর।

চতুরিকা যেন কথাটা শুনলই না, বলল, মহাপার্শ্ব ভাই, তুমি কি নহুষ শর্মণ নামের বৈদ্যকে চেন, বৈদ্যরাজ?

মহাপার্শ্ব দেখল অন্ধকার হয়ে গেল। আহ! গা গতর ঠাণ্ডা হবে এবার। সে আবার শুনল নহুষ শর্মণের নাম। ঘুরে তাকিয়ে দেখল চতুরিকার মুখ। মহাপার্শ্বর চোখ মুখে সন্দেহ জেগে ওঠে, সে যেন কিছুর সঙ্গে কিছু মেলাতে চায়, জিজ্ঞেস করে, কেন?

আমার দরকার আছে।

দরকার কেন?

সে সব পরে জানবে, আচ্ছা মহাপার্শ্বভাই তুমি কি জান কবে যাবেন শ্রেষ্ঠী?

মহাপার্শ্ব গালে হাত দিল, সে ঠিক ধরতে পারছে না চতুরিকার জিজ্ঞাস্য কোনটা, বলল, কার খবর চাও চতুরিকে, নহুষ শর্মণ নাকি শ্রেষ্ঠী।

চতুরিকা সাবধান হলো। এই মহাপার্শ্ব বীট ভয়ানক চতুর, তিলকে তাল করতে অতি পারঙ্গম, সে ধীরে ধীরে বলে, নহুষ শর্মণকে ডেকে আনতে পারো মহাপার্শ্ব ভাই আমার খুব দরকার।

কার কথা বলছো?

নহুষ শর্মণ, বৈদ্যরাজ।

মহাপার্শ্ব হাসল, তারে চিনলি কী করে চতুরিকে?

তুমি চেন মহাপার্শ্বভাই?

খ্যা খ্যা করে হাসল মহাপার্শ্ব, পাগলটা ক'দিন আগে তোর এখানে এসেছিল মনে হয়, তুমিই না আমাকে ডাক দিয়েছিলে চতুরিকে?

মহাপার্শ্বর মুখের কথা এমনই। সম্বোধনের মাত্রা বারবার বদলে যায়। চতুরিকা ধীরে ধীরে বলল, হ্যাঁ মহাপার্শ্বভাই, তাঁকেই আমার দরকার।

কী হলো? মহাপার্শ্ব সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে, ওই বৈদ্যকে কী দরকার?

আছে, তিনি একটা সংবাদ এনেছিলেন।

রোগ হলো নাকি চতুরিকে? আচমকা উঠে দাঁড়ায় মহাপার্শ্ব, চোখ ছোট ছোট করে এক পা পিছিয়ে যায়। ভয় পেল চতুরিকা, এসব কী বলছ?

আমাকে লুকিয়ে লাভ নেই, কী হয়েছে বল দেখি।

চতুরিকা বলল, ওঁর সঙ্গে আমার দরকার আছে বলছিতো।

সমিদ্ধি 'পাগলা বৈদ্য' ও কী করে এসব রোগের চিকিচ্ছে করবে, চতুরিকে কতটা কী হয়েছে বল আমারে, দেখার ভার আমার, শেষে না আমি দোষী হয়ে পড়ি।

চতুরিকা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে, কী বলছো তুমি মহাপার্শ্বভাই, বৈদ্যরাজ একটা সংবাদ এনেছিলেন,

ওই সংবাদই আবার শুনতে চাই।

মহাপার্শ্ব মাথা দোলাতে লাগল। সে বিশ্বাস করছে না চতুরিকার কথা। তার সন্দেহ গাঢ় হচ্ছে ক্রমশ। মেয়েমানুষের যে সব রোগ হয় এই গণিকালয়ে তা অতি ভয়ানক। তেমন রোগের কথা শোনা গেলেই গণিকালয় থেকে তাকে দূর করে দিতে হবে, না হলে রোগ ছড়াবে। রোগ নেয় যেন মরণ। মহাপার্শ্বর জননীও তো ওই রোগে মরেছিল। জননীর মৃত্যুজর্জর মুখখানির কথা মনে পড়ল মহাপার্শ্বর। তখন সে বছরদশের বালকমাত্র। লোকে বলে এ এক গলিত রোগ। সমস্ত দেহের রক্ত যখন দূষিত হয়ে যায়, রোগের এক বিন্দুও লুকোন যায় না। দেহের গোপন অঙ্গ থেকে রোগ সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মুখের উপরেও রোগের চিহ্ন ফুটে ওঠে। মহাপার্শ্বর মনে পড়ে যায় মায়ের মুখ ফেটে যেন রক্ত বেরিয়ে আসছিল। মাকে নগরের উপান্তে ঘর বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে মা জননী যে কোথায় চলে গিয়েছিল। শোনা যায় মহাকাল অরণ্যে প্রবেশ করেছিল মা জননী। মহাকাল অরণ্যে মৃত্যু দেবতার বাস। বন্যপ্রাণী মায়ের রোগজর্জর দেহ ভক্ষণ করেছিল।

মহাপার্শ্ব বলল, আমাকে লুকিয়ে কোনো লাভ নেই চতুরিকে।

চতুরিকা এবার ভয় পায়, কী বলছো তুমি মহাপার্শ্বভাই, বৈদ্যরাজ একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন।

মহাপার্শ্ব বলল, কে বৈদ্যরাজ, ও তো পাগলা, ওর হাতে একটি ভয়ানক মৃত্যু ঘটেছিল, সাত বছরের বালক ওর দেওয়া ঔষধেই মরেছিল ও তো চিকিচ্ছে করাই ছেড়ে দিয়েছে শুনেছি।

না, চিকিচ্ছের জন্য নয়।

মহাপার্শ্ব হাসে, তবে কেন বৈদ্যকে খুঁজবে গণিকা, আমার কাছে যা খবর আছে পাগলা বৈদ্য গোপনে রোগী দেখে বেড়ায়, সে যে এখানেও এসে গেছে তা তো জানতাম না চতুরিকে, কে দিল রোগ?

চতুরিকা এবার সত্যি সত্যি ভয় পায়। কথাটা যদি বীট অন্য কাউকে বলে ফেলে, তবে তো ভয়ানক বিপদ। মিথ্যে কথাটা ছড়িয়ে যাবে, ছড়িয়ে গেলে কেউ আর যাচাইও করবে না সত্যি মিথ্যা। নগরের মানুষ এই রকম। কোনো একটা রসাল বিষয় পেলেই হলো, তা নিয়েই সমস্তদিন কথা চালাবে। তখন কী হবে। চতুরিকার চোখের সামনে ঘন হলো ভয়ের অন্ধকার। এই মহাপার্শ্ব পারে না এমন কাজ নেই। হয়ত সমস্ত দিন নগরের পথে পথে কথাটা একে ওকে বলে বেড়াবে। অথচ অনুমানটা তো তার নিজেরই। চতুরিকা শুধু খোঁজ করেছে বৈদ্যরাজ নহুষ শর্মণের।

মহাপার্শ্ব এবার জিজ্ঞেস করে, এই তো বয়স, ঢলো ঢলো কাঁচা যৌবন, তোকে কে দিল রোগটা, উদ্ধব সতরি জানে?

চতুরিকা ঝপ করে বীটের হাত ধরে ফেলে, ও কথা বলিনি আমি।

কী বলিসনি?

রোগের কথা।

বীট এবার রেগে ওঠে, তবে কি আমি বলেছি, রোগ হবে তোর, আর বলব আমি, কেউ বিশ্বাস করবে?

চতুরিকা বলে, মহাপার্শ্বভাই আমার কোনো অসুখ হয়নি।

মহাপার্শ্বর বাঁকা দেহ সিধে হয় মাটিতে পদাঘাত করে, অসুখ হয়েছে কিনা তা বৈদ্যই বলবে, এ রোগ চাপা যায় না, আমার মা জননী মরেছিল এ রোগে, তোকে তো জঙ্গলে দিয়ে আসবে উদ্ধব সতরি।

চতুরিকা বুঝল বিপদ একেবারে সম্মুখে। মহাপার্শ্ব তাকে খেলাচ্ছে। মহাপার্শ্ব ভয়ানক চতুর, সমস্তদিন উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়ায়, আর সুযোগ পেলেই ফণা তোলে। চতুরিকা বলল, তুমি ভাল করে জানো আমার কিছু হয়নি, তুমি যদি আবার একথা বলো আমি শ্রেষ্ঠীর কাছে যাব, শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত।

খ্যা খ্যা করে হাসে মহাপার্শ্ব, আহারে শেঠীর দাসী তুই! শেঠীর ঘরে পৌঁছতে পারবি, তার আগে উদ্ধব তোকে জঙ্গলে দিয়ে আসবে, তোদের অসুখ হলে নগরের সবার বিপদ।

চতুরিকা নুয়ে গেল, বলল, তুমি কী চাও মহাপার্শ্বভাই?

কী দেবে তুমি চতুরিকে?

যা সাধ্য তাই দেব মহাপার্শ্বভাই।

মহাপার্শ্ব বলল, তোর যৌবনে আমার লোভ নাই, মেয়েমানুষ দেখে আমার ঘেন্না হয়ে গেছে, তার

উপর যদি তোর রোগ থাকে তবে তো আমাকেও জঙ্গলে যেতে হবে।

রোগ আমার নাই। চতুরিকা এবার কেঁদে ওঠে, তুমি কী চাও বলো মহাপার্শ্বভাই, ওকথা আর মুখে এননা, তাহলে আমায় মরতে হবে।

মহাপার্শ্ব বলে, তোর কী আছে, ঘরে কি সোনা আছে?

আছে একটুখানি।

রূপা আছে?

আছে যৎসামান্য।

মণিমাণিক্য আছে?

কী করে থাকবে বলো, আমার সব তো নিয়ে যায় সতরি। বলতে বলতে গালে হাত দিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল চতুরিকা। এখন সন্ধ্যা। আলো নেই। আলোর সমস্ত চিহ্ন মরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। চতুরিকা কাঁদতে কাঁদতে টের পায় এই লোক তাকে ছাড়বেনা। মার্জার যেমন মুষিক নিয়ে খেলা করে, তেমনই এর খেলার ধরণ। অথচ মহাপার্শ্বর জন্ম এই গণিকালয়ে। গণিকালয় এমন হৃদয়হীন করে তোলে।

মহাপার্শ্ব বলল, একটা কাজ কর, সাতদিন ধরে যতজন আসবে তোর ঘরে, তারা যা দেবে সব আমার।

সতরি তো নিয়ে যায় কিছুটা, ওর চোখে ফাঁকি দেব কী করে? বলতে বলতে চোখ মোছে চতুরিকা।

যা থাকবে তাই আমার।

চতুরিকা অবাক হয়ে মহাপার্শ্বকে দ্যাখে। উদ্ধব সত্রি নিয়ে গেলে আর থাকে কী যে নেবে মহাপার্শ্ব? যা থাকবে তা তার অন্ন। তাই নেবে? মহাপার্শ্ব যেন তার মনের কথাটা টের পায়, বলল, তাই বলে তুই উপোস থাকবি তাতো হবে না, তা বাদেও যা থাকবে তা আমার।

চতুরিকা নিশ্চিন্তে এবার শ্বাস নিল, বলল, তারপরে আর কী থাকে?

যা থাকে, উচ্ছিষ্ট ভোগীই তো আমি, কাল প্রাতঃকালে আমার সঙ্গে যাবি, নিয়ে যাব নহুষ শর্মণ নামের সেই পাগলা বৈদ্যর কাছে।

চতুরিকার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল কৃতজ্ঞতায়। বীট মহাপার্শ্ব উবু হয়ে আবার বসল দোর গোড়ায়, বলল, রোদে ঘুরে ঘুরে মাথার ঠিক থাকে না, এক একবার মনে হয় লোকের সব্বোনাশ করি, লোকে মরুক আর আমি তাই দেখে ফূর্তি মারি, শেঠীর দাস যেমন মরল আগুনে পুড়ে, বরাহর মতো আর্তনাদ করতে করতে, তেমনি করে মরুক সবাই, আমার মা জননী যেমন কষ্ট পেয়েছিল, নিজে নিজে জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছিল, তেমনি সবাই যাক কিন্তু পরে মনে হয় তাতে আমার কী লাভ? নগরে মড়ক লাগলে আমিও কি মরবনা মড়কে? কী ভীষণ রোদ! শুনা যাচ্ছে এরপর দিন আর ফুরোবে না। দিন রাত্তির দিনই চলবে। শুধু রোদ! আগে তো তেমনই ছিল।

কেমন ছিল? চতুরিকা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

ছেচল্লিশ

এ এক ভয়ানক প্রাতঃকাল। প্রাতঃকাল নয়, এ যেন দ্বিপ্রহর, উত্তাপ এমনই। রাতের অন্ধকার কাটিতে না কাটতেই ভয়ানক দ্বিপ্রহর শুরু হয়ে গেছে বুঝিবা। রাত আর কতটুকু, দিবাভাগ বিস্তৃত। দিবাভাগ ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে বীট মহাপার্শ্ব বলে, এরপর সেই কাল আসছে, যখন আর রাত থাকবেনা।

কী বলো মহাপার্শ্বভাই? বেটপট্যাঙা বীটের লম্বা লম্বা দুটি পা এক এক পদক্ষেপে অনেকটা যাওয়ায় চতুরিকাকে তার পিছনে প্রায় ধাবিত হতে হয়। সেই অবস্থায় সে মহাপার্শ্বর সঙ্গে কথার আদানপ্রদান করে। মাঝে মধ্যে হাঁটার গতি কমিয়ে মহাপার্শ্ব চতুরিকার সমান্তরাল হয়ে যায়। দেহটা বাঁকিয়ে চাপা গলায় বলে, হ্যাঁরে চতুরিকে, সেই দিকে যাচ্ছে দিনমণি?

কোন দিকে?

দুটি হাত জোড় করে কপালে ছোঁয়ায় মহাপার্শ্ব, সব জানেন মহাকাল, তাঁর অভিপ্রায়ে সব হয়, দ্যাখ চতুরিকে মন্দির অপবিত্র হয়েচে, তাই আকাশ শুকনা, জল না পেয়ে পেয়ে আকাশ বেঁকে গেছে।

চতুরিকা এক ঝলক আকাশ দেখে নেয়। বীটের কথার মর্ম বোঝেনা। সে এখন যাচ্ছে বৈদ্যরাজ নহুষ শর্মণের কাছে। বীট মহাপার্শ্ব জানে কোথায় থাকেন তিনি। মহাপার্শ্বর সন্দেহ যে সম্পূর্ণ নিরসন হয়েছে তা সে নিজেও বলতে পারবে না বুকে হাত দিয়ে, তবে কিনা এতকাল, এই মধ্যবয়স পর্যন্ত মেয়েমানুষ, পুরুষমানুষ দেখে দেখে সত্য-মিথ্যাটা কিছু আন্দাজ করতে পারে। তাই চতুরিকাকে সঙ্গে নিয়েছে। কখনো মনে হচ্ছে সত্য বলছে গণিকা, কখনো মনে হচ্ছে গণিকা ছল করছে। গণিকা যখন গোপনে বৈদ্যর শরণাপন্ন হয়, তার কারণ তো একটাই। কোন বৈদ্য, না নহুষ শর্মণ। তাকে কেউ বৈদ্য বলে মানেই না। খলনুড়ি ফেলে দিয়ে সে এখন দিবারাত্র পথবাসী—পাগলা। পাগলা বটে, কিন্তু তার নিদান নাকি এখনো অব্যর্থ, এমন এমন ঔষধির সন্ধান জানে লোকটা—বিদ্যাটা কাজেই লাগাল না, জলে ভাসিয়ে দিল একটা ভুলে।

চতুরিকাকে ডাকে মহাপার্শ্ব, আসছিস চতুরিকে?

আসছি তো। পিছনে ছুটতে ছুটতে জবাব দেয় গণিকা, বলে একটু ধীরে হাঁটো না গো মহাপার্শ্বভাই, তোমার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া বড় কঠিন।

মহাপার্শ্ব তার মুখখানি পিছনে ঘোরায়, লালচে দাঁতে হাসে, বলে, রোদের তাত বাড়লে নহুষ শর্মণ যে কোথায় ভেগে যাবে ঠিক নাই।

কী বলো মহাপার্শ্বভাই?

হ্যাঁ তাই, রোদ বাড়লে ওর মাথা আরো গরম হয়ে যায়, পাগলামি বেড়ে যায়, তখন কোনো কথাই মনে থাকে না ওর, জোরে হাঁট।

হাঁটি। অস্ফুট গলায় বলে চতুরিকা, তারপর চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, শ্রেষ্ঠীর দূত ওই মানুষটা?

কথাটা কানে গেল না, মহাপার্শ্ব হাঁটতে হাঁটতে আবার আকাশ দেখল। পশ্চিম আকাশ তার চোখের সামনে। এখন ঠিক ধরা যাচ্ছে না, আর সে নিজে মূর্খ, অজ্ঞানী মানুষ বলে ধরতে পারছে না, দেখতেও পাচ্ছে না যে আকাশ বেঁকে যাচ্ছে রোদের তাপে। দুমড়ে যাচ্ছে, সত্যি। কথাটা বাতাসে ভাসছে। কানাকানি হচ্ছে শুঁড়িখানায়, পথে ঘাটে, নদীধারে। সত্যি না হলে কথাটা এল কোথা থেকে? কী যে হবে এরপর? যদি সূর্য না ডোবে? রাত যে ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। নগর শীতল হতে না হতেই অন্ধকার ফুরিয়ে যায়। এরপর নাকি রাত মিশে যাবে দিনের সঙ্গে। এই কথাটাও বাতাসে ভাসছে। আর রাত হবে না, সমস্তটাই দিনমান। রাত না থাকলে ব্যবসা বাণিজ্য সব উচ্ছন্নে যাবে, গণিকালয়ে দিনমানে কে আসে? দিনমানে কে কোথায় লুকোবে? মুখ লুকোনর উপায় না থাকলে গণিকালয়ে আসতে ভরসা হবে মানুষের? মহাপার্শ্ব মাথা নাড়তে নাড়তে এগোতে থাকে।

চতুরিকা দেখছিল প্রাতঃকালে নগর কেমন স্তব্ধ, ঠিক যেমন হয় গণিকালয়ে। তার মনে হচ্ছে সমস্তরাত জেগে নগর এখন ঘুমিয়েছে। ঝিম ঝিম নগর ঘুমের দিকে চলেছে। পথের ধারের গাছগাছালি প্রায় পত্রহীন, মাটির ঘাস পুড়ে লাল হয়ে গেছে। পথের ধারে অবহেলাতেও ফুটে থাকে কত রকম ফুল, জুঁই, টগর, বেলি, চাঁপা, অপরাজিতা, কুরুবক—কোনো চিহ্নই নেই তার। নগর যেন পুষ্পহীন হয়ে গেছে। মুখ অন্ধকার হলো গণিকার।

তারা দুজনে এখন পৌঁছে গেছে উজ্জয়িনীর হাটে। প্রাতঃকালে হাটে যে হাঁকডাক, হৈ হৈ থাকে, সমস্ত রাত বিশ্রামের পর যেভাবে ঘুম ভাঙে নতুন হাটের তা নেই। এতক্ষণে তো সমস্ত বিপনি খুলে যাওয়ার কথা। কিন্তু কোনোটা খুলছে, কোনোটার অর্গলরুদ্ধ, কোনোটা খুলবে খুলবে করছে। যে বিপনি খুলেছে, তার মালিক এমন নিশ্চল ভাবে বসে আছে, মৃত পশুর চোখে স্থির তাকিয়ে থাকার মতো করে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে যেন তার বেচাকেনা শেষ হয়ে গেছে, সমস্ত লেনদেন ফুরিয়ে গেছে, এখন বিপনি বন্ধ করে গৃহ অভিমুখে রওনা হলেই হয়। পথে মানুষজন তেমন নেই। মানুষজনের তেমন উৎসাহই নেই কেনাকাটার, তো বিপনিগুলি কার জন্য খুলবে? কী জন্য খুলবে?

মহাপার্শ্ব বলল, যত খদ্দের তার বড় অংশ ভিনদিশী বণিক, তারা আসছে না তো বিপনির কেনাবেচা হবে কী করে?

আসছে না কেন মহাপার্শ্বভাই?

মহাপার্শ্ব বলে, উজ্জয়িনীতে নাকি এরপর সূর্য অস্ত যাবে না, সমস্তটা দিনমান, বেলা দুপুর হয়ে থাকবে।

কে বলল?

আচায্য বিবভানু ওই জন্য তো নগর ছেড়ে চলে গেছেন চতুরিকে, তিনি এই খবর দিয়ে গেছেন।

কী বলো তুমি! চতুরিকা উদ্বিগ্ন হলো, রাত হবে তো?

না হবে না।

চতুরিকা আচমকা হিহি করে হাসে, তা কী করে হবে, রাত না হলে নাগর কখন আসবে নাগরীর ঘরে?

সে তারা জানে, জোরে হাঁট।

চতুরিকা দাঁড়ায়। মহাপার্শ্বর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া খুব সহজ নয়। হাঁপিয়ে উঠেছে সে। শরীর আনচান করছে। তা ছাড়া এইভাবে হাঁটার অভ্যেস তো নেই। প্রাতঃকাল হলেও রোদের নরম ভাবটি নেই। তেজটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এখন তার গভীর ঘুমের সময়। রাতে তার ঘরে কেউ না কেউ থাকেই। কেউ না থাকলে দুর্বৃত্ত উদ্ধব সুরায় মাতাল হয়ে তার দুয়ারে এসে পড়ে। তখন তাকে ঘরে তুলতে হয়। ঘরে অন্য মানুষ থাকলে চতুরিকার ঘুমই হয় না, যদিও মানুষটা সুরার প্রভাবে অচেতন হয়ে পড়ে থাকে, তবে হ্যাঁ, যেই থাকুক, সে ফূর্তি করতে আসা কোনো ধনবানের পুত্র হোক, বাণিজ্যে আসা দূর দেশের বণিক হোক, ভোর ভোর তারা বেরিয়ে যায়। উদ্ধবও তাই যায়। চতুরিকা দাঁড়িয়ে নিঃস্তব্ধ নগর দেখছিল। শব্দহীন বিপণিপল্লী দেখছিল।

মহাপার্শ্ব বলে, দাঁড়ালি কেন চতুরিকে?

একটু দেখি, ওফ্ তুমি কী রকম বড় পায়ে হাঁটো!

দেরি করলে আরো কষ্ট হবে, রোদ বেড়ে যাবে, পাগলা বৈদ্য যে তখন কোথা থেকে কোথায় চলে যাবে তার ঠিক নাই।

চতুরিকা বলে, বিপণিগুলো এখনো বন্ধ!

হ্যাঁ, কীরকম যেন লাগছে, এ সময় বিপণিগুলি গমগম করে, কামারশাল, কাঁসারির ঘর, শাঁখারির ঘর থেকে কত রকম শব্দ বেরিয়ে আসে, ওই দ্যাখ সব বন্ধ।

চতুরিকা জিজ্ঞেস করে, মুক্তোবিপণি?

হি হি করে হাসে মহাপার্শ্ব, কী হবে তোর জেনে?

পুষ্প বিপণি?

মালিনীরা তো পথে কত বসে, সকালে এদিকে তো বারবার চক্কোর মারি চতুরিকে, এমন দেখি নাই, ওই যে একজন মাত্তর ফুল নিয়ে বসেছে।

রোদে চতুরিকার মাথা চিড়বিড় করছে। মাথায় তার অঢেল চুল। চুল খুললে কোমর ছাপিয়ে যায়। সেই চুল এখন মুড়িয়ে খোপা করা। ক'দিনের উদ্বেগে চুলে তেল পড়েনি তেমন করে, কাঁকই দিয়ে তেমন ভাবে পরিপাটিও করা হয়নি। সে দুটি হাত মাথায় দিয়ে দশ আঙুল চালাতে লাগল।

মহাপার্শ্ব বলে, শুঁড়িখানার দরজাও খোলেনি, তবে শুঁড়িখানা তো এত তাড়াতাড়ি খোলেও না।

যত না খোলে ততো মঙ্গল, মহাপার্শ্বভাই জুঁই, বেলি কিংবা টগর ফুল যদি থাকে, নিতেম কিছু, মালা গাঁথতাম।

মহাপার্শ্ব বড় পায়ে হেঁটে গেল বুড়ি মালিনীর দিকে। ফিরেও এল চোখের ঝলক দেখে। এসে মাথা নাড়তে লাগল, বলল, সব বাসিফুল, কোন আঁস্তাকুড় থেকে তুলে এনেছে।

চতুরিকা মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, বাসি কেন হবে?

ফুল কেনার লোকই নেই, বলি তোদের ঘরে পুরুষমানুষ হচ্ছে?

চতুরিকা জবাব না দিয়ে বলে, চলো মহাপার্শ্বভাই, দাঁড়ালে গা মাথা যেন জ্বলছে, ওফ এমন সুড়সুড় করছে মাথার উপরটা।

মহাপার্শ্ব বলল, উকুন।

উকুন মানে?

তোর মাথায় উকুন?

চতুরিকা বলে, ক্ষারে মাথা ঘষবো, রোদ পেয়ে সব যেন রক্তখাকী হয়ে উঠেছে। বলতে বলতে

সে তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে টিপে কীট ধরে এনে নখের উপরে রেখে মারতে থাকে।

মহাপার্শ্ব বলে, কে উকুন দিল, ওই বৈদ্যরাজ?

কী বলো তুমি?

ওকি তোর ঘরে ছিল কোনোদিন চতুরিকে?

মাথা নাড়ে চতুরিকা। মহাপার্শ্ব ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে। তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে গণিকা। রোদে মাথার চুলের অন্ধকারে বাস করা কীটগুলি এত চঞ্চল হয়ে গেছে, চতুরিকার মনে হয় খোপা ভেঙে চুল এলো করে দেয়। শুকনো চুল ঝেড়ে ফেলে দেয় কীটগুলি।

মহাপার্শ্ব বলে, বৈদ্যরাজ উকুনের ওষুধ দেবে?

চতুরিকা বলল, না, উনি হলেন দূত।

কথাটা শোনার কথা, কিন্তু মহাপার্শ্ব যেন শুনতেই পায়নি। হাঁটতে হাঁটতে তারা বিপণিগুলি ছাড়িয়ে লোকালয়ের ভিতর দিয়ে আরো পশ্চিমে চলে। চতুরিকা দ্যাখে কিছু মানুষ শূন্য জলপাত্র নিয়ে নদীর দিকে চলেছে। তাদের আগে আগে কেউ, পিছনেও কেউ কেউ। তারাও যাবে নদীর ধারে তারপর গন্ধবতীর কূল ধরে আরো পশ্চিমে হাঁটবে নহুষ শর্মণের উদ্দেশে।

চতুরিকা ডাক দেয়, মহাপার্শ্বভাই শুনলে?

কী শুনব?

নহুষ শর্মণ বৈদ্যরাজের কথা?

মহাপার্শ্ব বলে, তার কাছে গেলেই জানা যাবে কবে নাগাদ এ জন্মের মতো রাত ফুরিয়ে যাবে, দিনই চলতে থাকবে।

তা হয় নাকি?

হচ্ছে তো, এমন কোনোকালে দেখেছিস যে উজ্জয়িনীতে দোকানপাট বসেনি, বণিক আসেনি, তারাও এখবর পেয়ে গেছে।

চতুরিকা বলে, এই সময়ে রাত তো ছোটই হয়।

মহাপার্শ্ব নিজের মাথার চুল টানে, তার মাথায়ও উকুন চঞ্চল হয়েছে বোধহয়, মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে, এতো ছোট হয় না, আর কে বলেছে রাত ছোট হয়, রাত রাতের মতোই থাকে।

চতুরিকা কথা বলে না। তার মনে হতে থাকে হয়ত বীট মহাপার্শ্বর কথাই সত্য। রাত রাতের মতোই থাকে, এবছর তা ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে। রোদ ক্রমশ কঠিন যে তা টের পায় চতুরিকা। তার পিঠ পুড়ছে। প্রাতঃকালের যে সুষমাটুকু থাকে চারদিকে, তা নেই কোথাও। মাটি এর ভিতরেই তেতে গেছে। মাটি থেকে আগুনের ভাপ উঠছে। কী আশ্চর্য। পাখিরা কই? পাখির কলকাকলিতে তো এই প্রাতঃকাল ভরে থাকার কথা। নেই তো। চতুরিকা উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে এদিক ওদিক দ্যাখে। শেষে আকাশে দূর বহুদূরে কালোবিন্দুর মতো শকুন পাখির উড়াল দেখতে পায়।

বীট মহাপার্শ্ব আপনমনে বকবক করতে করতে চলেছে। বলছে সকালে কতরকম মানুষনা দেখার কথা, তাদের নিয়ে কত রঙ্গ-রসিকতা চলে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। হবার উপায় নেই। কিন্তু তা যদি না হয়, তবে এ সকাল কোন সকাল? গণিকার ঘর থেকে লুকিয়ে ফেরা নাগরটিকে পথে ধরে মহাপার্শ্ব তো দুচার কড়ি পেয়ে থাকে। সমস্ত রাত্রির প্রমত্ততার পর তারা শরীর টেনে টেনে, ক্লান্তি বয়ে বয়ে গৃহে ফেরে, তখন যাএা করলেই প্রাপ্তি যোগ। ধুস! বীট মাটিতে পদাঘাত করে, বলে উজ্জয়িনীর গণিকা, বেশ্যার রূপ ঝরে গেছে বিষ্টি নাই বলে, নগরের যদি এই হাল হয়, অমন নীলবরণ আকাশ, মেঘবরণ আকাশ, তারা ঝলমলে আকাশ যদি দুমড়ে যায় রোদের তাপে, আকাশে যদি বার্ধক্য আসে তো মেয়ে মানুষেও তো আসবে। বুড়ি মেয়েমানুষে ভরে গেছে উজ্জয়িনীর সব গণিকালয়। তাই বণিকের দল আসছে না। গৃহস্থ মানুষও যাচ্ছে না লুকিয়ে চুরিয়ে। যাচ্ছে না বলেই রাত ছোট হয়ে আসছে।

চতুরিকা বলে, এসব তুমি কী বলছ মহাপার্শ্বভাই?

মহাপার্শ্ব ঘুরে তাকায় না। দুটি হাত নাড়তে থাকে ঢ্যাঙা শরীর বাঁকিয়ে। এক হাতে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে, মেয়েমানুষে যদি আকর্ষণ কমে যায় পুরুষ লোকের তবে সে দোষ কার, পুরুষের?

দিনকাল খারাপ।

দিনকাল তো খারাপই হয়, তখন আরো ছলাকলা করতে হয়, উকুন ভরা মাথা নিয়ে দুয়ারে বসে থাকলে তোর ঘরে কে যাবে চতুরিকে?

চতুরিকা বলে, যাবে।

কে? ঘুরে তাকায় মহাপার্শ্ব।

জানতে পারবে, তুমি আমাকে বৈদ্যরাজের কাছে নিয়ে চলো।

নিয়ে তো যাচ্ছি; কিন্তু সত্যি কি তোর রোগ নাই?

বলছি তো নাই, কতবার বলব বলো। চতুরিকা মাথার সমস্ত চুল টেনে বুকের উপর ফেলে, তারপর বলে, সবটা হয়ে যাক মহাপার্শ্বভাই, তুমিও পুরস্কৃত হবে, তোমাকেও আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।

মহাপার্শ্ব অবাক। কিছু না বুঝে আরো দ্রুত হাঁটতে থাকে।

সাতচল্লিশ

গন্ধবতীর তীরে, মহাকাল মন্দির থেকে পশ্চিমে, নহুষ শর্মণ, বৈদ্যরাজকে পাওয়া গেল। নদী পার হয়ে মহাকাল অরণ্য। বৈদ্যরাজ সেই অরণ্যে প্রবেশের কথা ভাবতে ভাবতে নদীতে নেমেছিলেন, পার হয়ে চলে যাবেন এই নগর ছেড়ে। তখনই উপস্থিত হলো মহাপার্শ্ব ও চতুরিকা। বৃদ্ধ বৈদ্যরাজ নদীতটে নেমে গিয়েছিলেন লম্বা লম্বা পা ফেলে, প্রায় দৌড়ে মহাপার্শ্ব তাকে ধরল, কোথায় যাচ্ছেন বৈদ্যরাজ, আপনার জন্য কখন রওনা হয়েছি আমরা, রোদে মাথা ঝিমঝিম করছে, এই যে আপনার শরণাগত এই মেয়েমানুষটি।

চতুরিকা দেখছিল নদী জলহীন, পড়ে আছে আধমরা সাপের মতো। নদী গন্ধবতী এমনিই শীর্ণা, এখন নিঃস্রোতা প্রায়। রোদে বালি যেন ছুরির ফলার মতো ঝকঝক করছে। তাকিয়ে থাকা যায় না। মনে হয় নদী থেকে তাপ উঠে এসে ঝলসে দেবে মুখমন্ডল। নদীর পুবে, যেদিকে মহাকাল মন্দির সেইদিকে একটু নুয়ে প্রণাম করল চতুরিকা, হে মহাকাল, দাসীকে বাঁচাও। চতুরিকা কাঁপছিল বৈদ্যরাজকে খুঁজে পেয়ে, দেখতে পেয়ে। এবার খবর পাবে শ্রেষ্ঠীর, উজ্জয়িনীর বণিক শ্রেষ্ঠ কি সত্যিই তাকে ডেকেছেন?

বৈদ্যরাজ নহুষ শর্মণ দু' হাতে ঠেলে দিল মহাপার্শ্বকে, তুই কে, ওই বা কে, আমি অবন্তী ছেড়ে চলে যাব।

কোথায় যাবেন মশায়?

যেদিকে সমুদ্দুর আছে, সাগর দেখেছিস কভু?

মহাপার্শ্ব বলল, কোনো সাগরেই জল নেই, উজ্জয়িনীর সাতটা সাগর শুকিয়ে গেছে, আপনি কোন সাগরে যাচ্ছেন?

নীল সাগর যবন বণিকে কহেছিল।

মহাপার্শ্ব বলল, থির হয়ে থাকেন মশায়, আপনি চলে গেলে কে বাঁচাবে অনাথা মেয়েমানুষগুলোকে, এই যে চতুরিকে, এ আপনার কাছে এল বাঁচার জন্য, কী হয়েছে বল চতুরিকে।

চতুরিকা মুখ নামিয়ে নদীতট থেকে উঠে আসছিল। তার আগে আগে মহাপার্শ্ব এবং নহুষ শর্মণ। নদীতীরে বটের ছায়ায় এসে হাঁপাচ্ছিল বৃদ্ধ বৈদ্যরাজ। ঘোলাটে চোখে দেখছিল চতুরিকাকে। তার চোখের মণি ঘুরছিল, আচমকা যেন মনে পড়ল, চিনি মনে হয় ভদ্রে, কোথায় দেখেছি কহো দেখি।

চতুরিকাকে জবাব দিতে হল না, তার আগেই মহাপার্শ্ব তার পরিচয় দিল রাজার সত্রি উদ্ধব দাসের বাঁধা মেয়েমানুষ বলে। তারপর উদ্ধব দাসের পরিচয় দিতে লাগল সে। কত শক্তি ধরে উদ্ধব, ক্ষমতার রাজসভায় তার অবস্থান কোন জায়গায়। উদ্ধবের ইচ্ছায় বৈদ্যরাজ যে রাজসভায় প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই মহাপার্শ্বর। শুধু উদ্ধবের এই মেয়েমানুষটার গোপন রোগ সারিয়ে দেবেন বৈদ্যরাজ।

কথা শুনতে শুনতে চতুরিকা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে, কী বলো তুমি মহাপার্শ্বভাই!

বলি তোর কপালের কথা, গণিকা বৃত্তির যেমন সুখ আছে তেমনি এই সব ব্যাপারও আছে, গোপন রোগ যদি হয়, তবে মেয়েমানুষের সব গেল, আমি তো জানি তা, আমার মতো কেউ জানে না, দগ্ধে

দগ্ধে মরবি রে!

চতুরিকা দাসী এবার ফোঁস করল মিথ্যের হাত থেকে বাঁচতে, আমি তোমাকে বলেছি রোগের কথা? খবদ্দার মহাপার্শ্ব, আমাকে বণিক শ্রেষ্ঠ সুভগ দত্ত যাঞ্চা করেছে, তুমি থামো।

কথাটা শুনতে শুনতে দু'হাত তুলে যেন আত্মরক্ষা করল বীট মহাপার্শ্ব। বুঝতে পারল না সবটা। কিছুই যে মেলে না। বণিক ডেকেছেন চতুরিকাকে? কেন বণিকের কি মেয়েমানুষের অভাব, না উজ্জয়িনী নগরে আকাল পড়েছে নারীরত্নের? কী যে হচ্ছে সব! অবন্তীর রাজা কিনা এক দেবদাসীকে মন্দিরের চাতালে ভোগ করে এল তস্করের মতো। রাজার কি নারীর অভাব পড়েছিল? রানীর অমন রূপ, রয়েছে গণিকা দেবদত্তা, রয়েছে কত যুবতী, রূপবতী, নগরের ধনীঘরের কন্যারা সব। রাজা যাঞ্চা করলেই তারা অভিসারে যাবে আঁচলে প্রদীপ ঢেকে প্রায়, দু পায়ের নূপুর আঁচলের কোণায় বেঁধে। এখন কিনা উদ্ধবের মেয়েমানুষ গণিকা চতুরিকা বলে শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত ডাক দিয়েছেন তাকে। হাসি পেল মহাপার্শ্বর। এই তো রূপ। যৌবন একটু ঢলে গেলেই কেউ ফিরে তাকাবে না! একেই কিনা যাঞ্চা করেন শ্রেষ্ঠী? রাজার ভোগ্য যদি সামান্য দেবদাসী হয়, তবে বণিকের ভোগ্যা তো হতেই পারে চতুরিকা। মহাপার্শ্বর মনে হলো কথাটা সত্য হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। সত্য মিথ্যা যা হোক, যেদিকে সুবিধা হবে, সেই দিকেই থাকবে সে।

চতুরিকার কথা আর সেই প্রসঙ্গে উদ্ধবের এত ভাবনার সঙ্গে কিন্তু বৈদ্যরাজ নহুষ শর্মণের আচার আচরণের কোনো মিল নেই। বৃদ্ধ সন্দেহভরা চোখে মহাপার্শ্ব এবং চতুরিকাকে পর্যবেক্ষণ করছিল। করতে করতে আচমকা দু হাতে নিজের জটপাকানো মাথার চুল টেনে ধরল, ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, কী হলো বলুন দেখি?

কী হবে?

এরপরে আর রাতই হবে না, কাল আমি সমস্ত রাত ঘুমোইনি।

কেন? চতুরিকা জিজ্ঞেস করে।

সূর্যের আলো নাকি আর নিববে না, বিকেল হবে না, সকালও হবে না, কী ভয়ানক দিন সামনে, তুমি পালাও ভদ্রে।

মহাপার্শ্ব বলে, আর আমি?

তুই কোথায় যাবি, তোরে কেউ নেবে না, তোরে আমি চিনি, ভদ্রে তোমারে আমি চিনেছি।

প্রভু! চতুরিকা আবেগে মাটিতে মাথা নোয়ায়, প্রভু আপনার কাছে সেই খবরই শুনতে এলাম।

বৃদ্ধ বৈদ্যরাজ খ্যা খ্যা করে হেসে ওঠে আচমকা, বলে, আমি কে? আমার খলনুড়ি আঁস্তাকুড়ে, আচার্য বৃষভানু পালিয়েছে নগর ছেড়ে, আর কী শুনতে চাস নারী?

প্রভু যাব কোথায়? চতুরিকার বুক ঢিপ ঢিপ করে ওঠে, ফিসফিস করে বলে, বণিক শ্রেষ্ঠ, ধনপতি সুভগ দত্ত কি শিবিকা পাঠাবেন না আমার গৃহে?

কথাটা কান পেতে শুনল মহাপার্শ্ব। এখন মনে হচ্ছে চতুরিকার আচরণ খুব সন্দেহজনক। চতুরিকা তলে তলে কার সঙ্গে গাটছড়া বাঁধছে? সুভগ দত্ত? সিরসির করে উঠল গা। ছমছম করে উঠল সর্বাঙ্গ। তাহলে কি চতুরিকার অসুখ হয়নি? এই বৈদ্যরাজ লোকটা আসলে কে? এর কাছে এসে শ্রেষ্ঠীর কথা জিজ্ঞেস করছে কেন চতুরিকা? এই পাগলা বৈদ্য কি শ্রেষ্ঠীর দূত? কই, কেউ জানে না তো? সে নিজে তো সমস্তদিন নগরে ঘুরে বেড়ায়। অপরাহ্ন থেকে গণিকালয়ের কাছাকাছি থাকে, গণিকালয়ের দুয়ারে থাকে। কে আসে কে যায় সব তার নখদর্পণে। কে যেন নখদর্পণের কথা বলেছিল? এক ভিনদেশী নেড়ি সাধ্বী, তন্ত্রমন্ত্র সিদ্ধা। মন্ত্রটা শেখায়নি মহাপার্শ্বকে। এখন আফশোস হচ্ছে। নখের দিকে তাকিয়েই সব জানা যেত। সেই নেড়িকে পেলেই হয়ে যেত। কিন্তু সে তো এক সন্ধেই ছিল নগরের উপান্তে। তার খবর যদি মহাকাল মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের কানে যেত, আগুনে পুড়িয়ে মারত না। মহাপার্শ্বর নানারকম মনে হতে লাগল। মনে হওয়ার পর একটা সিদ্ধান্তে সে আসে যে কথাটা উদ্ধবনারায়ণের জানা উচিত। সে রাজার সত্রি। তার অন্তর্গত নগরের এক গণিকা শ্রেষ্ঠীর ঘরে যাবে তাই কি কখনো হয়?

বৈদ্যরাজ বলল, তুই তো পালাবি গণিকে, হ্যাঁ এতক্ষণে মনে পড়ল, সেদিন সন্ধ্যায় দেখা হলো,

এখনো বসে আছিস কার জন্য?

প্রভু, শ্রেষ্ঠীর জন্য।

শ্রেষ্ঠীকে পথে ধরিস, সে তো যাবে পশ্চিমদিকে, সিন্ধু পার হয় পুরুষপুর, গান্ধার, তার ওপরে আকসুনদী, বাহ্লিক দেশ, তুই সেই পথে হাঁট, পথে দেখা হয়ে যাবে।

চতুরিকা বলে, প্রভু শ্রেষ্ঠী তো যাঞ্চা করেন এই দাসীকে।

শ্রেষ্ঠী কী করেন তা তোর জেনে দরকার নেই, এরপর বেলা ছোট হবে না, বেলা বড়ও হবে না, রোদ নরম হবে না, নরম রোদও উঠবে না, সূর্যদেব ক্রমশ এক জায়গায় বসে যাচ্ছে, তাঁর রথের চাকা বসে যাচ্ছে, কী যে ভয়ানক দিন আসছে, পালা গণিকে।

মহাপার্শ্ব বলল, এ খবর কে দিল?

কে দিল তা তুই বুঝবি কী করে, আমি তো নদী পার হচ্ছি, নদী পার হয়ে রওনা হয়ে গিয়েছিলাম, তোরা টেনে আনলি ফের।

মহাপার্শ্ব জিজ্ঞেস করে, শ্রেষ্ঠী কাকে যাঞ্চা করেন চতুরিকে?

চতুরিকা মাথা নামিয়ে থাকে। জবাব দেয় না দেখে মহাপার্শ্ব বলে, সমস্তটা তো উদ্ধবের জানা প্রয়োজন, সে কিনা রাজার সতরি, তুই তারই মেয়েমানুষ, শ্রেষ্ঠীর নস।

সে মানুষ তো জানে। বিড়বিড় করল চতুরিকা।

জানে! ওফ! সেও জানে আর আমি জানি না, শ্রেষ্ঠী তোকে যাঞ্চা করেন, ওহ্‌! নগরে কী না ঘটে যাচ্ছে, একেই বলে কলির শেষ। শ্রেষ্ঠীর মেয়েমানুষ কম পড়ল। মহাপার্শ্ব মাথার চুল দুইহাতে টেনে ধরে, তারপর বলে, আমার পাওনা দিয়ে যাস গণিকে, সোনার হার চাই, রেশমি উত্তরীয় চাই, কতদিনের সাধ গোলাপি রঙের উত্তরীয় গায়ে রাখব, মাথায় দেব হলুদ রঙের শিরস্ত্রাণ।

মহাপার্শ্বর কথা শুনতে শুনতে চতুরিকার ছিরি ছাদহীন মুখখানি সুন্দর হয়ে উঠতে লাগল। কটা চক্ষুমণিতে যেন হারিয়ে যাওয়া মেঘের ছায়া পড়ল, কালো হয়ে উঠল চোখদুটি, গায়ের রং হয়ে উঠতে লাগল দেবদত্তার মতো, শরীরের যেখানে যেখানে অপূর্ণতা ছিল সব যেন ভরে উঠতে লাগল। এতদিনে বোঝা গেল যেন সে কত অসুন্দর ছিল, কত সুন্দর হয়ে উঠতে পারে একটুখানিতেই, উদ্ধবনারায়ণের হাত থেকে শ্রেষ্ঠীর ঘরে যেতে পারলেই সে জেনে যাবে চৌষট্টিকলার সবগুলি, কামকলার সব রীতি, মিলনের সমস্ত ভঙ্গী, নৃত্যের সমস্ত মুদ্রা, রচনা করতে পারবে নতুন নৃত্যছন্দও। শ্রেষ্ঠীগৃহের প্রাঙ্গণ একাই সে তার অধীনে নিয়ে নেবে, তার দুই পায়ের বিভঙ্গে, দুটি হাতের সঞ্চালনে প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। পূর্ণিমার রাতে সে তার নৃত্য আরম্ভ করবে দেবাদিদেব নীলকণ্ঠ মহেশ্বরকে স্মরণ করে। নৃত্যে মোহিত হয়ে শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত তারই আজ্ঞাবহ হয়ে যাবে। তখন চতুরিকা উদ্ধবনারায়ণকে রাজসভা থেকে দূর করে দেবে। শ্রেষ্ঠী ইচ্ছা করলেই তা হয়ে যাবে। আর তার ইচ্ছাই তো শ্রেষ্ঠীর ইচ্ছা। ভাবতে ভাবতে চতুরিকার দু'চোখ জলে ভরে এল যেন। সে মুখ নিচু করে নিজের বুক থেকে প্রসারিত উরু, দুটি বাহু, দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে ভাবল, চুলে সুগন্ধি দিতে হবে, চন্দনচূর্ণ মেখে স্নান করতে হবে, বহু সময় ধরে, পায়ের পাতা ঘষে ঘষে ময়লা তুলতে হবে। স্নানের পর চুল শুকিয়ে নিতে হবে ছায়ায় বসে, ধূপের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়, কত কী করতে হবে। জেনে নিতে হবে দেবদত্তার কাছে।

মহাপার্শ্ব বলল, প্রভু বৈদ্যরাজ, সূর্যের রথের চাকা বসে যাচ্ছে নাকি সত্যি, যা বলছেন তা সত্যি?

সত্যি কিনা হলে বুঝো, একথা নগরের কে না জানে।

আমি তো জানি না।

তুই মূর্খ তাই জানিসনে, বল দেখি সূর্যের রথে ক'টা ঘোড়া?

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মহাপার্শ্ব। সে জানে না। জানবার প্রয়োজন হয়নি এতদিন। হবেই বা কী করে, আগে তো কোনোদিন এমন ঘটনা ঘটেনি। সূর্যদেব রথে চেপে আকাশ পার হয়ে পুব থেকে পশ্চিমে যান এটি সে ভাসা ভাসা জানে, কোনোদিন তো দ্যাখেনি সূর্যদেবের রথ। তার মতো পাপী তাপী মানুষ দেখবেই বা কী করে? তার সে চোখই নেই, অর্ন্তদৃষ্টিও নেই। আর সে কোনোদিন দেখার কথা ভাবেওনি। অত সময়ই নেই। ভোরবেলায় পথে বেরিয়ে দেখেছে কতজন পুবদিকে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে সূর্য প্রণাম করছে। মন্ত্র পড়ছে আকাশে সদ্য ভেসে ওঠা টকটকে সূর্যদেবের দিকে তাকিয়ে। তার তো নিজের কখনো

মনে হয়নি মন্ত্রটা কী। সূর্যকে বন্দনা করার অর্থই বা কী তা জানে? মনেই হয় ওসব করা উচিত, বা করা যায়। সে ঘুরে চতুরিকাকে জিজ্ঞেস করল, কটা ঘোড়া, ও চতুরিকে?

চতুরিকার মুখখানি ম্লান হয়ে গেল। সে জানেনা। দেবদত্তা হয়ত জানে। দেবদত্তা কত কিছুই না জানে, আকসু নদী, বাহ্লিক দেশ। ওসব নাম তো সে দেবদত্তার কাছেই শুনেছে প্রথম। এটা শোনেনি। কথা ওঠেনি তাই শোনেনি, কথা উঠলে ঠিক শুনে নিত। এখন শ্রেষ্ঠী যদি তাকে জিজ্ঞেস করেন, সে কী বলবে? আজই গিয়ে জেনে নিতে হবে সব। কিন্তু এমন তো হতে পারে, শ্রেষ্ঠী এই কথা জিজ্ঞেস না করে অন্য কথা জিজ্ঞেস করলেন, তখন কী হবে? তখন সে কার কাছে জানতে যাবে? দেবদত্তা? ইস! শ্রেষ্ঠী নাকি দেবদত্তারই অনুরাগী ছিলেন শোনা যায়, তারপর তাঁর মন এই হতভাগিনী চতুরিকা দাসীর দিকে ঢলেছে। সে জানেনা বলে কি শ্রেষ্ঠী তাকে ত্যাগ করবেন? তা কেন হবে? ওসব তো পণ্ডিতে জানে, এই বুড়ো বৈদ্যরাজ জানে। তাহলে শ্রেষ্ঠী তাঁর ঘরে বুড়ো বৈদ্যরাজকে ডাকুন। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল, চতুরিকা ভাবল সে তার যৌবন অর্ঘ্য দেবে শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্তকে। যৌবন পেলে কি সুভগ দত্ত ওসব কথা জিজ্ঞেস করবেন? সূর্যের দিকে কি তাকানো যায় যে তার ক'টি ঘোড়া জানা যাবে? চোখ ঝলসে যাবে না? চতুরিকা ওই কথাই বলল মহাপার্শ্বকে। শুনে মহাপার্শ্ব খুব খুশি, বলল, ঠিকই তো, সূর্যের দিকে তো তাকানো যায় না প্রভু বৈদ্যরাজ!

মূর্খ! বৈদ্যরাজ নহুষ শর্মণ বলে উঠলেন, তারপর বললেন, সাতটি ঘোড়া।

সাতটি, এক দুই তিন করে সাত?

তাই তো হয়! শুনবি সে কথা?

কোন কথা বৈদ্যরাজ?

সূর্যের ঘোড়ার কথা, রথের কথা।

আজ্ঞে, শ্রেষ্ঠীর কথাটি হয়ে যাক। চতুরিকা বলল।

শ্রেষ্ঠীর আবার কথা কী, সে তার ধনসম্পত্তি অর্জনে বাহ্লিক যাচ্ছে, কোন আকসুনদীর ধারে, সেখানে নাকি যবন বণিকের রাজত্ব সব।

আজ্ঞে শ্রেষ্ঠী আমাকে কখন ডাকবেন?

সে তিনি জানেন ডাকবেন কি ডাকবেন না, মেয়েমানুষ নিয়ে যাবেন সঙ্গে, নাকি পথ থেকে নিয়ে নেবেন, জগতে সবকিছুর অভাব হতে পারে, মেয়েমানুষের অভাব কি কখনো হবে, দরকারেই পাওয়া যাবে, কী বলিস মহাপার্শ্ব?

মহাপার্শ্ব বুঝতে পারছিল না। সে ঘাড় নাড়তে লাগল। কিন্তু কেন যে নাড়ছিল তাও ধরতে পারছিল না সে। এই তো চতুরিকা বলল, শ্রেষ্ঠী তাকে কামনা করেন, আবার বৈদ্যরাজ শোনাচ্ছে সার কথা, মেয়েমানুষের অভাব? সত্যিই তো জগতে কত মেয়েমানুষ! শ্রেষ্ঠী চাইলেই পাবেন, তাহলে চতুরিকা কেন? কেনই বা রাজা গিয়েছিল দেবদাসী ললিতার কাছে?

আটচল্লিশ

বৈদ্যরাজ নহুষ শর্মণ বললেন, অবন্তীদেশ, উজ্জয়িনীনগর অন্ধ, সূর্যের রথ যিনি দেখতে পেতেন তিনিই তো পালিয়েছেন নগর ছেড়ে, আচার্য বৃষভানু চলে যাওয়ার পর কেউ কিছু দেখতে পায় না।

আঁজ্ঞে? মহাপার্শ্ব না বুঝে জিজ্ঞেস করে।

আচার্যর চোখ দিয়ে তো আকাশ দেখা হতো, খবর হয়েছে সূর্যের রথের চাকা বসে যাচ্ছে, সাত ঘোড়া বুড়ো হয়ে গেছে, টানলেও চাকা উঠছে না।

কী বলেন মশায়? মহাপার্শ্ব আকাশ দেখে নিয়ে সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে।

যা বলি ঠিক বলি, আকাশ দেখে কী হবে, তুমি কি দেখতে পারে রথের চাকা, তুমি তো অন্ধ, কী সব্বোনেশে কাণ্ড যে ঘটে যাচ্ছে অবন্তীদেশে!

মহাপার্শ্ব দু'চোখ রগড়ে নদী, নদীর ওপার, বটতলা, রৌদ্রপীড়িত প্রান্তর সব দেখে নিল। কী সে কী হয়ে যাচ্ছে ধরা যাচ্ছে না। বৈদ্যরাজ বলছেন সে অন্ধ, কিন্তু চোখে তো ভালই দেখছে। বৈদ্যরাজের সব কথা যে ধরতে হবে না তা মহাপার্শ্ব জানে। তবে এও তো ঠিক বৈদ্যরাজের সব কথা ফেলে দেওয়ার

নয়। আচার্য বৃষভানু তো নগর ছেড়ে চলে গেছেন কাউকে না জানিয়ে, কেন গেছেন? গেছেন যখন, গূঢ় কারণ কিছু আছে। নগরে যা ঘটার কথা ছিল না, তেমন ঘটনাই তো ঘটছে। রাজার কি সামান্য দেবদাসীকে ভোগ করার কথা? শ্রেষ্ঠীর যোগ্য হলো কি এই চতুরিকা? চতুরিকার কী আছে? না আছে জ্ঞান, বুদ্ধি, না আছে নয়ন ভোলানো রূপ। মেয়েমানুষের ছলাকলা আর যৌবনেই শ্রেষ্ঠী ভুলে গেল সব। ছি ছি ছি, অবন্তীদেশের মান থাকল না। রাজা, শ্রেষ্ঠী সকলের মাথা বিগড়েছে। আকাশ বহুদিন নির্জলা থাকলে, মাটিতে বহুদিন আকাশের জল না পড়লে বোধহয় এমনই হয়ে থাকে। মহাপার্শ্ব ভাবছিল এসব। ভাবছিল ওই যে বৈদ্যরাজ তাকে অন্ধ বললেন, কেন বললেন? ওই যে বললেন আচার্য চলে যাওয়ার পর সবাই অন্ধ, কেন বললেন? ও কথার মানে কী? এ কি এমনি বললেন? খলনুড়ি ফেলে দিয়ে পাগলা হয়ে গেছেন নহুষ শর্মণ, কথাগুলো কি পাগলের প্রলাপ? সে ভাবতে ভাবতে চতুরিকাকে জিজ্ঞেস করে, সব চোখে দেখছিস চতুরিকা?

কী? চমকে ওঠে চতুরিকা। সে ঈষৎ বিষণ্ণ, যেমন কল্পনা করেছিল তেমন তো হচ্ছে না।

সবাই অন্ধ, একথার মানে কী?

চতুরিকা মাথা নাড়ে। সে আরো পরিষ্কার করে জিজ্ঞেস করতে চায় আয়ুপুত্র বৈদ্যরাজ নহুষ শর্মণকে। কিন্তু পারছে না সঙ্কোচে, আর সঙ্গে যে রয়েছে এই মর্কট বীট মহাপার্শ্ব। এ সঙ্গে না এলেই যেন ভাল হতো। বৈদ্যরাজকে নিয়ে সে চলে যেত শ্রেষ্ঠীর কাছে।

জবাব না পেয়ে মহাপার্শ্ব আবার ভাবতে আরম্ভ করল সূর্যের রথের চাকা যে বসে গেছে, বুড়ো সাত ঘোড়া যে টানতে পারছে না সেই রথ এই কথা জানা গেল কী করে? আর ওই কথাটার মানে আসলে কী? সে ঘোরের ভিতরে পড়ে সব দেখতে থাকে। রোদ চচ্চড়িয়ে বেড়ে যাচ্ছে। তাপ বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। গনগনে চুল্লির তাপ ছড়িয়ে পড়ছে যেন সবদিকে।

বৈদ্যরাজ নহুষ শর্মণ বললেন, এমনদিন আসছে যখন আর রাত আসবে না।

মাথা কাত করল মহাপার্শ্ব, বলল, শুনা যাচ্ছে তা, আমিও শুনেছি।

বল দেখি সূর্যের রথ কত বড়? জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ।

জানা নাই। জবাব দিল মহাপার্শ্ব।

তুই জানিস? চতুরিকাকে জিজ্ঞেস করলেন বৈদ্যরাজ।

মাথা নাড়ে চতুরিকা, তার যে কোনো জ্ঞানই নেই।

দুটি হাত দুইদিকে প্রসারিত করে বৃদ্ধ বললেন, দশ হাজার যোজন বিস্তার তার, সপ্তাশ্বর নাম জানা আছে?

আজ্ঞে না, বলেন দেখি। মহাপার্শ্ব ঝুঁকে পড়ে। কী অদ্ভুত। এই সব না জেনে তো দিব্যি জীবন চলে যাচ্ছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে জেনে ফেললেও লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। জানা থাকলে মনের আরাম, কী রকম যেন সুখ। না জেনে যেন কিছুই নেই তার, এমন মনে হচ্ছে।

বৃদ্ধ নহুষ শর্মণ খলখল করে হাসছেন, অজ্ঞান হয়ে আছে সব, অন্ধ, লোকে ধরতেই পারছে না কী দিন সামনে! সপ্তাশ্ব হলো সাতটি ছন্দ, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ, অনষ্টুপ, জগতী, পঙক্তি, বৃহতী, উষ্ণিক....।

মহাপার্শ্ব অবাক। তার সমস্ত গায়ে যেন শিহরণ জাগে। কী আশ্চর্য কথা বলছে বুড়ো বৈদ্যরাজ। এসব সত্য, নাকি সত্যিই পাগলের প্রলাপ? কিন্তু সত্যই তো মনে হচ্ছে? সে বিড়বিড় করে, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ, অনষ্টুপ...... তারপর কী বৈদ্যরাজ প্রভু?

জানতে হবে না, আর জানতে হবে না, জেনে কী হবে, পুড়ে যাবে সব, সর্বক্ষণ দিনের আলো থাকবে, কিন্তু মানুষ থাকবে অন্ধ, মানুষ দেখতে পাবে না কিছুই।

আজ্ঞে?

মরণও দেখবে না, জনমও দেখবে না কেউ, মানুষ ঠিকই করতে পারবে না সে কোন বেলায় আছে, কখন কী হবে, কখন কী হয়েছিল।

মহাপার্শ্ব দুহাতে মাথার চুল আঁকড়ে ধরে বিড়বিড় করে, গায়ত্রী, জগতী, অনষ্টুপ ..., সে নিচু হয়ে বৈদ্যরাজের পা স্পর্শ করে, আবার বলুন।

বৃদ্ধ বললেন, অবন্তীদেশে বর্ষাও থাকবে না, বসন্তও থাকবে না, হেমন্তকাল থাকবে না, শরৎকালও থাকবে না।

তারপর? এতক্ষণে যেন চতুরিকার খেয়াল হয় কথার মাত্রা, কথা কোন দিকে যাচ্ছে, তার মুখে ভয়ের চিহ্ন ফোটে, সে ধরতে পারছে বুড়ো বৈদ্যরাজের সেদিনের কথাটা তার পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। আস্তে আস্তে সমস্ত উন্মোচন হচ্ছে। শ্রেষ্ঠীকে নিয়ে তার যত কল্পনা তা আসলে সত্য নয়। সত্য না হোক সে যে গোপনে শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্তর প্রণয়বিলাসী হয়ে উঠেছে। জগতে তো কত কিছু ঘটে যা হয়ত ঘটার কথা ছিল না। কত আশ্চর্য ব্যাপার না দেখা যায়। এই যে বর্ষা নেই, মেঘ নেই অনেকদিন, এমন তো হয় না, কিন্তু হচ্ছে। নগর ছেড়ে চলে গেছেন সবচেয়ে জ্ঞানীমানুষ আচার্য বৃষভানু, রূপবতী গণিকা দেবদত্তা কিনা কোন এক হাঘরে ধ্রুবপুত্রর জন্য শ্রেষ্ঠীর ডাকে সাড়া দেয়নি। রাজা তাঁর পরমরূপবতী রানীকে ছেড়ে, গণিকা দেবদত্তাকে ছেড়ে এক দেবদাসীর কাছে গেলেন অন্ধকারে। এই সমস্ত ঘটনা যদি সত্যি হয়, তবে তার স্বপ্নও সত্যি হতে পারে। তার কল্পনা বাস্তব হয়ে উঠতে পারে। পৃথিবীতে আশ্চর্য ঘটনার কি কোনো অভাব আছে? আগুনে পুড়িয়ে মারা হলো শ্রেষ্ঠীর ভয়ানক দাসটিকে, কেউ কি এমন হবে ভেবেছিল? সে যে শ্রেষ্ঠীকে কল্পনায় কামনা করতে পারবে, তা কি সেও কখনো ভেবেছিল আগে? ভয় পেত তো! তার কামনা যদি সত্যি হয়, শ্রেষ্ঠী তাকে বাণিজ্যযাত্রায় নিয়ে যাবেনই হয়ত। পথেই ভালবাসা হবে। তার প্রণয় কল্পনা সত্য হবে। এই বুড়ো বৈদ্যরাজ তার কল্পনার দুয়ার খুলে দিয়েছেন। সে তো উদ্ধবের দাসী হয়েই বেঁচে ছিল। উদ্ধবের ধর্ষণে ধর্ষণে ক্ষয়ে যাচ্ছিল প্রতিদিন একটু একটু করে। চতুরিকার আচমকা মনে পড়ে গেল, একদিন দেবদত্তাই না বলেছিল কুমারবিক্রম বা শ্রেষ্ঠী তার অনুরাগী হবেন কোনো এক সময়ে। সত্যি হয়ে উঠছে দেবদত্তার অনুমান। কাঁপতে লাগল চতুরিকা। দেবদত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে গেল।

মহাপার্শ্ব ডাকল, শুনছিস কথাগুলো?

কোনো কথাই কানে যাচ্ছে না তার। চতুরিকা রয়েছে ঘোরের ভিতর। সে ভাবছিল প্রণয়ে কী না হয়। সেই সত্যটি জানে বলেই দেবদত্তা অমন কথা বলেছিল। সে যদি শ্রেষ্ঠীর কথা ভাবে, শ্রেষ্ঠীরও মনে পড়বে তার কথা। কিন্তু কী করে? ধন্ধে পড়ল চতুরিকা। ধনপতি সুভগ দত্ত কি চেনেন তাকে? কী করে চিনলেন? কবে চিনলেন? হয়ত সে জানে না, তার অজ্ঞাতেই তাকে দেখে মনে রেখেছেন শ্রেষ্ঠী। উদ্ধব যে তাকে দূতী করে পাঠিয়েছিল দেবদত্তার কাছে, সে তো শ্রেষ্ঠীরই কথায়। তাহলে কেন মনে রাখবেন না শ্রেষ্ঠী? কার কীভাবে মজে মন, কে বলতে পারে?

কথা বলিস নে কেন? মহাপার্শ্ব জিজ্ঞেস করে চতুরিকাকে।

চতুরিকা বলল, এবার তো ফিরতে হয়।

ফিরবি কোথায়?

কেন নিজের বাড়ি।

গণিকালয়ে ফিরবি চতুরিকে, এদিকে যে বৈদ্যরাজ বলছেন সব ছারখার হয়ে যাবে, পুড়ে শেষ হয়ে যাবে সব, রাত্তির থাকবে না, রথের চাকা বসলে যেমন হয়, সূর্য দাঁড়িয়ে থাকবে এক জায়গায়।

চতুরিকা শুনল আবার। আগেও তো শুনেছে, কিন্তু কিছুই মনে হচ্ছেনা তার। মনে যে ভালবাসা জন্ম নিয়েছে। প্রেম। প্রেমই তাকে করে তুলেছে ভীষণ সাহসী। সে শ্রেষ্ঠী ব্যতীত আর কোনো কথা ভাবতে পারছে না এখন।

মহাপার্শ্ব বলল, নগর কিন্তু ছেড়ে যেতে হবে।

এখন তো ফিরে চল! চতুরিকা উঠে দাঁড়ায়। সে অধৈর্য হয়ে উঠছিল। যদি শ্রেষ্ঠীর দূত আসে শিবিকা নিয়ে গণিকালয়ে? তাকে না পেলে হয়ত ভেবে নিতে পারে পালিয়েছে চতুরিকা। নগর থেকে কেউ কেউ যেমন চলে যাচ্ছে তেমনি সেও। সে ডাকল, মহাপার্শ্ব ভাই, রোদ চড়া হয়ে যাচ্ছে, চলো।

মহাপার্শ্ব বলল, আর একটু বসি।

বসে কী হবে, আমার কোনো দরকার নেই, আমার দরকারে তো এলে।

মহাপার্শ্ব বলল, আর যদি কিছু বলেন বৈদ্যরাজ।

মাথা নাড়ে চতুরিকা, তুমি না গেলে আমি একা একা ফিরে যাব।

মহাপার্শ্ব বলে, কথাটা কিন্তু সত্যি, সকালও হবে না, বিকেলও হবে না, সমস্তক্ষণ দুপুর হয়ে থাকবে, বেলা উঠবে না, পড়বেও না।

চতুরিকা বলে, হোক, এখন তো ফিরি।

তখন কী হবে চতুরিকে?

চতুরিকা হাঁটতে আরম্ভ করল। এই বুড়ো বৈদ্যরাজের সামনে বসে থেকে ওই সব কথা শুনে গা ছমছম করছে। যতই সে শ্রেষ্ঠীর কথা ভাবুক, বৈদ্যরাজের কথাগুলোও তো ঢুকছে মাথার ভিতরে। ভয় করছে। এখানে থাকলে ভয় বাড়বে বই কমবে না। তাছাড়া মন তো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মনের ভিতরে অন্য বাতাস বইছে। এই বৈদ্যরাজ যেমন তার মনের আগল খুলে দিয়ে তাকে নির্ভয় করেছেন, তেমনি আবার ভয়ের কথাও বলছেন। তার মনে নতুন করে বেঁচে ওঠার সাধ যেমন জাগিয়েছেন, তেমনি মরণের ভয়ও ছড়াচ্ছেন ইনি। চতুরিকা ঘুরে তাকায় বুড়োর দিকে। বটের ছায়ায় বসে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। চতুরিকা বলল, যাই বৈদ্যরাজ!

থাকবে না? বৈদ্যরাজ ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন।

কোথায় থাকব? চতুরিকা জিজ্ঞেস করে।

যাবে না?

কোথায় যাব?

বুড়ো বৈদ্যরাজ বললেন, আমার সঙ্গে নদীর ওপারে।

মাথা নাড়ে চতুরিকা, বলল, ঘরে অতিথি আসবে প্রভু।

অতিথি অনেক নিয়েছিস গণিকা, এবার নিজে বাঁচ। বলল মহাপার্শ্ব।

চতুরিকা বলল, তুমি যদি বৈদ্যরাজের সঙ্গে থাকো, থেকে যাও মহাপার্শ্ব ভাই, আমাকে তো যেতে হবেই, শিবিকা অপেক্ষা করছে হয়ত।

মহাপার্শ্ব কিছু বুঝতে পারল না, তার মনে হলো সূর্যের রথের চাকা বসে গেলে এই রকমই হয়। হয়ে থাকে। এই অতি সাধারণ গণিকার জন্য শিবিকা পাঠাবে কে? কেনই বা পাঠাবে? শ্রেষ্ঠী! হা হা করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করছে। তার চেয়ে মরণের হাত থেকে বাঁচাই তো ভাল। সে উঠে গিয়ে চতুরিকার হাত ধরল, সব মিথ্যে।

কী মিথ্যে?

কেউ পাঠাবে না শিবিকা, তার চেয়ে তুই আমাদের সঙ্গে নদীর ওপারে চ চতুরিকে, আমাদের সঙ্গে থাক।

না। চতুরিকা হাত ছাড়িয়ে নিল।

না তো, তোর সঙ্গে আমাকে ফিরতে হয়।

কেন তুমিই যাও বুড়োর সঙ্গে ওপারে।

না। মহাপার্শ্ব আবার স্পর্শ করল চতুরিকার হাত, তুই না গেলে আমি যাব না।

কেন?

জানিনে চতুরিকে, উদ্ধবের ভয়ে তোর ঘরের সামনে গিয়েও কোনোদিন ঢুকতে পারিনি, চ, নদীর ওপারে চ, উদ্ধব থাকবে না সেখানে।

চতুরিকা অবাক হয়ে মহাপার্শ্বকে দেখছে। কী বলছে মর্কট বীট, মেয়েমানুষের ভৃত্য? বলছে উদ্ধবের ভয়ে......? কী আশ্চর্য! এমন ঘটনাও তাহলে ঘটে! বীট মহাপার্শ্বর মনে এও ছিল? মর্কটটার তাহলে মন আছে? মর্কটটার বুকের ভিতরে হলুদ কুসুম আছে? এ যদি সত্য হয় তবে তার দুয়ারে শ্রেষ্ঠীর শিবিকা আসতে বাঁধা কোথায়? আসতে পারে। বীট মহাপার্শ্ব যদি গোপনে তার প্রতি প্রণয়াসক্ত হতে পারে, তবে সেও শ্রেষ্ঠীর প্রণয় সম্ভাষণের জন্য বসে থাকতে পারে।

চতুরিকা বলল, আমি ঘরেই ফিরব মহাপার্শ্ব, এখনো সময় হয়নি তো নদীর ওপারে যাওয়ার।

নগরে যে উদ্ধব রয়েছে।

থাকুক, তুমি তারে যদি ভয়ই করো, তবে এই বুড়োর কাছে থেকে মরণের কথা শোনো। চাপা গলায় হিস হিস করে ওঠে চতুরিকা, আর থাকতে চাইছে না, নগরের দিকে ছুটে চলে যেতে চাইছে সে।

মহাপার্শ্ব বলল, আমার কথা কি তোর বিশ্বাস হয়নি চতুরিকে?

চতুরিকা বলল, হয়েছে, সূর্যের রথের চাকা বসে গেলে এমন হয়।

কেমন হয়?

অনেক রকম হয়, তুমি আমার পিছু পিছু এস মহাপার্শ্ব, আয় মর্কট আমার ছায়া ধরে ধরে আয়।

মাথা নামিয়ে মহাপার্শ্ব বলে, যাই।

আর ফিরবিনে ওই বুড়োর দিকে।

ঠিক আছে। চতুরিকার পিছনে পিছনে চলতে আরম্ভ করল মহাপার্শ্ব। দুজনে চলে যাচ্ছে দেখে উঠে দাঁড়াল বুড়ো নহুষ শর্মণ, কোথায় যাচ্ছিস?

কেউ জবাব দিল না। তখন বুড়ো বটের ছায়া আঁকড়ে দুহাতে তার নিজের মুখ ঢাকল। চতুরিকা আর মহাপার্শ্ব নদী পিছনে রেখে এগোল অনেকটা। যেতে যেতে মহাপার্শ্ব ডাকে, শোন চতুরিকে?

শুনেছি তো তোর কথা?

বুড়ো বৈদ্য মরণের কথা বলছে বটে, নগরের লোকও বলছে শুধু দিন থাকবে, রাত হবে না, তবে বুড়ো যে বলল সাতঘোড়ার কথা, ওই কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হলো উদ্ধবের ভয়ে আমি তোর কাছে যেতে পারিনে, শুনছিস চতুরিকে, আমার মনের কথা এতদিনে বুঝতে পেরে বলতে সাহস পেলাম সাতঘোড়ার সাতনাম শুনে।

চতুরিকা হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে বলল, বুঝেছি, আমার জন্য শিপ্রা থেকে জল এনে দিস আজ, দিবি তো মহাপার্শ্ব?

উনপঞ্চাশ

উজ্জয়িনীর সবচেয়ে জ্ঞানবান মানুষটি দু'বছর আগে চৈত্র পূর্ণিমার রাতে এই নগর ছেড়ে, এই দেশ ছেড়ে, এই শিপ্রা, গম্ভীরা নদী, মহাকাল মন্দির, সপ্তসাগর—সাতটি মনোরম সরোবর ছেড়ে, সোনার দেশ ছেড়ে চলে গেছে নিরুদ্দেশে। চিনত পরাশর সেই রূপবান যুবক ধ্রুবপুত্রকে। শোনা যায় ধ্রুবপুত্র নাকি গণিকা দেবদত্তার প্রেমে আবিষ্ট হয়েছিল, তাতেই হিংস্র হয়ে উঠেছিলেন শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত। রাজগণিকা দেবদত্তার প্রতি গোপন অনুরাগ আছে শ্রেষ্ঠীর। অথচ গণিকা দেবদত্তা রাজা ভর্তৃহরি ব্যতীত কারোর কথা ভাবে না, কিন্তু রাজার তো মন নেই এই সেরা সুন্দরীতে। মতিভ্রম হয়েছে রাজার। রাজা ভর্তৃহরি এক সামান্য দেবদাসী ললিতার সঙ্গে গভীর নিশীথে মিলিত হয়েছিলেন মহাকাল মন্দির প্রাঙ্গণে। কী ভয়ানক ঘটনা এটি। আগে কখনো হয়নি। মহাকাল মন্দির এভাবে কি রাজপুরুষের দ্বারা অপবিত্র হয়েছে কখনো? রাজা ছিলেন কোমল মনের মানুষ। অন্তরটি দয়ামায়ায় পরিপূর্ণ। কখনো শোনা যায়নি তিনি কামাসক্ত। কিন্তু এখন সব জানা যাচ্ছে। কথা শূদ্রপল্লীতেও এসে পৌঁছচ্ছে। রাজা রানী নিঃসন্তান। নিঃসন্তান পুরুষ যদি সিংহাসনে থাকেন, তবে সে দেশের সমস্ত সৃজন প্রক্রিয়াই বিনষ্ট হয়ে যায়। ফসল হানি হয়, সরোবর জলহীন হয়, মানুষের মনে প্রেমের অভাব হয়, মানুষ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।

কী সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে পরপর। উজ্জয়িনীর বণিক শ্রেষ্ঠ সুভগ দত্তর প্রিয়তম দাস উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল শোনা যায়। উন্মাদ না হলে উতঙ্ক শুধু শুধু শূদ্রপল্লীতে অগ্নি সংযোগ করতে আসবে কেন অন্ধকারে? কিন্তু এর চেয়েও আশ্চর্য ঘটনা হলো দাস উতঙ্কের মৃত্যু। এই দেশে আগে এমন কখনো হয়নি যে শূদ্রজাতির উপর অত্যাচারের কারণে শ্রেষ্ঠীর দাসকে অভিযুক্ত করা গেছে, শ্রেষ্ঠী, উচ্চকোটির মানুষ শূদ্র জাতির পক্ষে দাঁড়িয়েছে। দাস উতঙ্কর মৃত্যু দণ্ড হলো। কিন্তু সেই মৃত্যুদণ্ডই তো এখন এক ভয়ানক স্মৃতিই হয়ে পীড়িত করছে বৃদ্ধ সৈনিক পরাশরকে। কী ভয়ানক ছিল সেই মৃত্যুটি। মৃত্যুর আর্তনাদ, বেঁচে থাকার আর্তি। এখনো ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্নের ভেতরে হানা দেয় উতঙ্ক। সমস্ত দেহ অগ্নি দগ্ধ। পোড়া কাঠের মতো ধিকি ধিকি জ্বলছে আগুন। মাংস পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে সব দিকে। কেন যে প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল সেই মৃত্যু? নিষাদ ঘোষণা করেছিল দণ্ডের কথা, নিষাদের সেই ঘোষণাতেই তো আদেশ ছিল মৃত্যুদণ্ড প্রত্যক্ষ করার। বুড়ো পরাশর তার যৌবনে, যখন সে সৈনিক হয়ে রাজার বাহিনীর সঙ্গে গেছে দূরদূরান্তে, সেই সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত, হূনদের সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রামে, তখনো এমন কঠিন মৃত্যু দ্যাখেনি। কত মৃত্যু দেখেছে সে রণক্ষেত্রে, কিন্তু এত কষ্ট পায়নি কখনো।

বুড়ো পরাশর বলছিল, সেই যে ধ্রুবপুত্র গেল নগর ছেড়ে, তারপর এমন হতে লাগল, আকাশের মেঘ উধাও হলো।

মেঘ কি এভাবে আর কখনো উধাও হয়নি?

মাথা নাড়ছিল পরাশর, তার এই জীবনে সে বোধহয় কখনো এমন প্রকৃতি দ্যাখেনি, নগরের এমন হতশ্রী অবস্থা দ্যাখেনি।

হতশ্রী নগর ছেড়ে চলে যাচ্ছে শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত। এই কি বাণিজ্যযাত্রার সময়? কিন্তু শ্রেষ্ঠী তাঁর বণিককুলকে নিয়ে বাহ্লিক দেশে যাচ্ছেন। সবাই চলে যাচ্ছে নগর ছেড়ে, গেছেন আচার্য বৃষভানু। বুড়ো পরাশর সন্ধ্যায় রত্নাকরসাগরের জলহীন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বুক চাপড়াচ্ছিল, আচার্য পর্যন্ত চলে গেলেন। অবন্তীদেশ এভাবে কখনো নিঃস্ব হয়নি।

বুড়ো পরাশরের ক'দিন ধরে মনে পড়ছিল ধ্রুবপুত্রকে। ধ্রুবপুত্র থাকলে হয়ত ব্যাখ্যা দিতে পারত এই নির্জলা দিনগুলির। এই বিপন্নতা থেকে উদ্ধার পাওয়া যেত হয়ত ধ্রুবপুত্রের পরামর্শে। আসলে মানুষ যখন দিশাহীন হয়, যখন মানুষ নিজের ক্ষমতায় বাঁচার সাহস হারিয়ে ফেলতে থাকে, তখন তো অন্য কাউকে প্রয়োজন হয়। ধ্রুবপুত্র সমস্ত রীতি ভেঙে এই রত্নাকরসাগরতীরে এসে বসত পরাশরের সঙ্গে কথা বলার জন্য। পরাশর স্পষ্ট মনে করতে পারে, ওই যে বসে আছে রূপবান পুরুষটি। কী নরম, কী মায়া মমতায় ভরা ছিল তার হৃদয়। না হলে নগরের সবচেয়ে বড়মানুষ, জ্ঞানীমানুষ কেন শূদ্রপল্লীতে এসে দাঁড়াবে নিত্যি এমন কখনো ঘটেনি, ঘটেও না যা ঘটেছিল ধ্রুবপুত্রর ক্ষেত্রে।

পরাশর বলল, ধ্রুবপুত্র থাকলে এমন হত না।

একজন বলল, কিন্তু সেই তো আগে ছেড়েছে উজ্জয়িনী।

পরাশর বলল, সে যদি না ছেড়ে যেত অবন্তী, তাহলে এমন কিছু ঘটতই না, যেমন ছিল উজ্জয়িনী, তেমন থাকত।

আর একজন বলল, হয়ত সে বুঝতে পেরেছিল এমন হতে যাচ্ছে, তাই আগে গেছে এ দেশ ছেড়ে।

মাথা নাড়ে পরাশর, না, অপমানিত হয়ে, লাঞ্ছিত হয়ে সে উজ্জয়িনী ছেড়ে গেছে, তার মতো জ্ঞানীমানুষ কি উজ্জয়িনীতে আর একজনও ছিল, আছে?

সবাই চুপ করে থাকল। জ্ঞান সম্পর্কে তাদের ধারণা খুবই সামান্য। তারা জানেই না জ্ঞান কী? ধ্রুবপুত্রকে দেখতে তাদের ভাল লাগত, প্রায় সোনালি চুল, গৌরবর্ণ, নীলচোখ—ঠিক যেন উজ্জয়িনীর হাটে, বিপনিতে আসা যবন গ্রিক বণিকদের মতো মনে হয়। নাকি তেমন নয়? নীল চোখ ছিল কি ধ্রুবপুত্রের? চুলটি কি সোনালি ছিল, নাকি অবহেলায় রোদে পুড়ে পুড়ে তা লালচে হয়ে গিয়েছিল? গ্রিক পুরুষদের মতো অমন গৌরবর্ণ কি ছিল সত্যি ধ্রুবপুত্রের? নাকি ঈষৎ তামাটে বর্ণের ছিল সে? রোদে পুড়ে পুড়ে সেই তাম্রবর্ণ কালো হয়ে গিয়েছিল মনে হয়। কিন্তু সেই রূপটিও কম সুন্দর মনে হত না। রোদের ভিতরে হেঁটে হেঁটে ধ্রুবপুত্র এই নগর, এই নগরের চতুর্দিক পরিক্রমা করত। প্রখর দ্বিপ্রহরে সে মাঠ ভেঙে এদিকে আসছে দেখা যেত। এসে বড় পিপুল গাছটির ছায়ায় বিশ্রাম নিত। সেই গাছটি এখন আগুনে আধপোড়া, উতঙ্ক পুড়িয়েছিল। যদি সন্ধ্যায় আসত কখনো, অথবা অপরাহ্ন বেলায়, এসে বসত এই রত্নাকর সাগর তীরে। তখন সাগরে জল থাকত, বাতাস ঠাণ্ডা থাকত। কতজন ভীড় করে থাকত ধ্রুবপুত্রের এদিক-ওদিক। কিন্তু যতই সে ভাল হোক, উদার হৃদয়ের হোক, সে কী করে শ্রেষ্ঠজ্ঞানী হয়, রাজার জ্ঞান কি কম?

পরাশর বলল, আমি ওভাবে বলতে পারব না, তবে সে ছিল মহাজ্ঞানী।

কী করে বুঝতে?

বোঝা যায়, জ্ঞানের আলো থাকে একরকম?

সে কী?

ধ্রুবপুত্রের চারপাশে তা যেন ছিল।

তখন সকলে ভাবতে লাগল ধ্রুবপুত্রের চারপাশে কেমন আলো ছিল। কারোর কারোর এমনও মনে হলো সত্যি যেন তা দেখা যেত। সেই গ্রীষ্মের আগুনে বাতাস ভেঙে, আগুন হয়ে ওঠা মাঠ ভেঙে ধ্রুবপুত্র যখন এসে পৌঁছত এই শূদ্রপল্লীতে, দুটি পা ধূলিধূসর, মাথার চুলে খড়কুটো, শুকনো পাতা। মুখখানি রোদের তাপে লাল—আর? মাথার পিছনে কি আলোর বলয়? কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, ধ্রুবপুত্র কি খুব ফর্সা ছিল, গৌর?

তুমি দ্যাখোনি? জিজ্ঞেস করল পরাশর।

মনে নেই, এখন সব ভুলে যাই।

অন্য আর একজন তখন জিজ্ঞেস করল, জ্ঞান কী?

কী বলছ?

বলছি, কেউ যে জ্ঞানী তা কী করে বোঝা যাবে?

পরাশর চুপ করে থাকল। সে ভাবছিল কী ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যায় জ্ঞানীর রূপটিকে? একটু ভেবে বলল, যিনি জ্ঞানী তিনি সব জানেন।

ধ্রুবপুত্র কি তাই জানত?

আমার তেমন মনে হয়, নাহলে সে আমাদের এখানে আসত কেন?

আমাদের এই পল্লীতে, এই নিচু মানুষদের কাছে আসত সে, সুতরাং জ্ঞানী?

পরাশর বলল, জ্ঞানী না হলে আসবে কেন?

জ্ঞানী হলেও বা আসবে কেন?

পরাশর চুপ করে থাকল। অন্ধকারে লোকটির দিকে তাকিয়ে ভাবল, সে কি ধ্রুবপুত্র সম্পর্কে বিরূপ? না হলে এত প্রশ্ন তুলছে কেন? লোকটি একটু দূরে বসে আছে। তার সামনে বসে আছে তার একজন, ফলে লোকটিকে সে খুব ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু কণ্ঠস্বর ধরতে পারছে কে হতে পারে। যার কথা মনে হচ্ছে পরাশরের, সে হতে পারে, তার পুত্র কিংবা পৌত্র। আবার যদি পৌত্র হয়, তবে সেও হতে পারে, তার পিতা কিংবা পিতামহ। আবার যদি মধ্যমজনের কথা মনে হয়, তবে তার পিতা, কিংবা পুত্রও হতে পারে। অনেক রকম সম্ভাবনার কথা মনে হয় পরাশরের। সে তবু বলল, তুমি কি ধ্রুবপুত্রের কথা শোনোনি?

শুনেছি, তখন তো মনে হতো না অন্য কিছু?

ধ্রুবপুত্র কি অন্যরকম কথা বলত না?

বলত, তাতেও কি প্রমাণ হয় যে সে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী?

পরাশর বলল, সে যদি উজ্জয়িনী ছেড়ে না যেত...?

এতো তোমার কথা, কিন্তু সে তো সবার আগে চলে গেছে, তার মানে সে তো সবার আগে ভয় পেয়েছিল।

পরাশর বলল, হতে পারে, না হতে পারে, আমি আমার জীবনে এমন একটি মানুষ আর দেখিনি, তার সঙ্গে কথা বলে আমার দুচোখ খুলে গিয়েছিল, জেনেছিলাম অনেক।

কী জেনেছিলে?

যা জেনেছিলাম তা এখন ভুলে যাচ্ছি, আমার তো মনে হয় জ্ঞানীব্যক্তি লাঞ্ছিত হলে, অপমানিত হলে জ্ঞানই শেষ হয়ে যায়, তাইই হচ্ছে চারদিকে।

অন্ধকার থেকে লোকটি বলল, একথার অর্থ কী?

বুড়ো পরাশর না পেরে বলল, সবই জানত ধ্রুবপুত্র, তাকে মনে পড়ে না তোমাদের?

কেউ কেউ 'হ্যাঁ' বলল। কেউ কেউ চুপ করে থাকল। যারা চুপ করে থাকল তাদেরই একজন কিছু সময় বাদে বলল, ধ্রুবপুত্র কী বলত?

ভুলে গেছ? আর একজন তাকে জিজ্ঞেস করল।

তোমার মনে আছে?

সে মনে করতে গিয়ে বুঝল ঠিকভাবে মনের ভিতরে সাজিয়ে নিতে পারছে না ধ্রুবপুত্রের কথাগুলিকে। সে তখন পরাশরকে জিজ্ঞেস করল, কী বলত সে?

পরাশর বলল, সব কি আর মনে আছে?

আচ্ছা ধ্রুবপুত্র কেমন ছিল বলো দেখি।

তোমার মনে নেই? পরাশর জিজ্ঞেস করে।

তখন যারা একটু আগে ধ্রুবপুত্রের রূপের কথা যেভাবে ভেবেছিল যবনপুরুষদের মতো করে, তারা তেমন বলল, কিন্তু অন্যরা বলল না তেমন নয়। অন্যরকম। সম্পূর্ণ অন্যরকম। কেউ বলল আবার

গৌরবর্ণ, নীল নয়ন, সোনালি কেশের কথা, কেউ বলল তাম্রবর্ণ, লালচে চুল, কালো চোখের কথা। আবার একজন বলল, না, না, যতদূর মনে পড়ে সে ছিল শ্যামবর্ণের, মাথায় ছিল ঘনকালো চুল, সেই চুল ঈষৎ কুঞ্চিত, নিষাদের যেমন হয়। কেউ বলল, সে ছিল মধ্যম উচ্চতার, কেউ বলল, দীর্ঘদেহী। কেউ বলল তার কণ্ঠস্বর ছিল গম্ভীর। মেঘের ডাকের মতো, কেউ বলল, না তেমন নয়, ঈষৎ সুরেলা, আচমকা নারীকণ্ঠ বলে ভ্রম হতে পারে, তবে সেই নারীসুলভ মোলায়েম কণ্ঠস্বরেও ছিল দার্ঢ্য। শুনতে বড় ভাল লাগত। জ্ঞানীমানুষেরা এমনই হয়। তাদের কথা এইভাবেই মনে থাকে।

পরাশর অবাক হচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল উভয়ের কথাই সত্য। সমস্ত কথাই সত্য। ধ্রুবপুত্র গৌরবর্ণের যেমন হতে পারে, তাম্রবর্ণেরও। আবার শ্যামবর্ণেরই বা কেন নয়? নিষাদের মতো হতেও পারে সে। আবার না হতেও পারে। তার কণ্ঠস্বর গম্ভীর, পুরুষালি হতে পারে আবার সুরেলা মায়াময় হতেও পারে। সবই যেন সত্য। কবে কতদিন আগে আসত ধ্রুবপুত্র এখানে, তারপর চলে গেল উজ্জয়িনী ছেড়ে। তাকে যেন কোনোদিন নিজ চোখে দ্যাখেনি পরাশর, তার কথাই শুনেছে শুধু। ধ্রুবপুত্রের কথা অন্যজনের কাছে শোনা, যেমন সে ধ্রুবপুত্রের মুখেই শুনত গ্রহতারাদের কথা, সমুদ্র, মরুভূমির কথা, মহাকবি ভাসের কথা, বৎসরাজ উদয়ন আর উজ্জয়িনীর রাজকন্যা বাসবদত্তার প্রেমের কথা, রাজা দুষ্মন্ত আর কন্বমুনির আশ্রমে পালিতা কন্যা শকুন্তলার কথা....। ধ্রুবপুত্রর কাছেই কি ধ্রুবপুত্রর গাত্রবর্ণ, কেশবর্ণ, চক্ষুমণির কথা, কণ্ঠস্বরের কথা শুনেছিল পরাশর? পরাশর একরকম শুনেছিল, অন্যজনেরা অন্যরকম শুনেছিল? তারা কি ধ্রুবপুত্রকে তাহলে দেখতে পেত না, তার কথা কানে শুনে শুনে একরকম আন্দাজ করে নিয়েছিল? তা হতে পারে? হয়ত সত্য, না হয়ত অসত্য।

পরাশর বলল, কে যেন জ্ঞানের কথা জিজ্ঞেস করছিলে?

আমি, আমরা, অন্ধকার থেকে সাড়া এল।

তখন পরাশর বলল, আমার ভুল হতে পারে, তবে আমি তো তার সঙ্গে অনেক কথা বলেছি, তার মুখের কথা শুনেছি, সমস্ত দিন সমস্ত রাত, জ্যোৎস্নায়, অমাবস্যায়, মেঘের নীচে, রোদের ভিতর, ছায়ার ভিতর....।

ঠিক আছে, বলো কী শুনেছিলে?

মনে হয়, জ্ঞান হলো সত্য।

সত্য কী?

সত্য যদি ধ্বংস না হয়, তবে এই রত্নাকরসাগর পরিপূর্ণ থাকবে জলে।

এখন তো বহুদিন জল নেই এই সরোবরে।

তার অর্থ এখানে সত্য নেই।

তুমি ঠিক জানো?

মনে হয় তা, সে যেন এই রকমই বলত, যদি সত্য থাকে, জ্ঞান থাকে ; জ্ঞান থাকলে জ্ঞানবান মানুষ থাকে, আর তারা থাকলে সরোবর জলপূর্ণ থাকে ভয়ানক গ্রীষ্মেও, আকাশে মেঘ থাকে, সেই মেঘের ছায়াও থাকে এই মাটিতে, জমিতে ফসল থাকে, সময়ে বৃষ্টি নামে.....।

কী আশ্চর্য কথা! এতো বেশ ধরা যাচ্ছে।

পরাশর নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছে নিজের কথায়। সে যা বলছে তা তো সে নিজেই জানত না। সে নিজে এভাবে কোনোদিন ভাবেনি। ভাবেনি অথচ বলতে পারছে। কী ভাবে তা হলো? অথচ তার মনে হচ্ছে কথাগুলো সত্য। পরাশর বলতে লাগল, সত্যই জ্ঞান, জ্ঞান থাকলে আমাদের শূদ্রপল্লীতে আগুন লাগত না, কী লাভ হলো উতঙ্কর? কেন সে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল আমাদের ঘরবাড়ি? আমাদের সঙ্গে তার তো কোনো বিরোধ ছিল না।।

এর অর্থ অজ্ঞানতা, অসত্যতা। কে যেন বলল।

হ্যাঁ, অজ্ঞানতা অধিকার করে ফেলেছিল তাকে, তাই সে ওই রকম কাজে প্রবৃত্ত হয়ে প্রাণ হারালো, বিড়বিড় করে বলতে থাকে পরাশর, তারপর খুব কোমল গলায় বলল, আর তাকে যেভাবে মারা হলো, হত্যা করা হলো তাও তো সত্য প্রতিষ্ঠা করেনি, অজ্ঞানতাকে সরিয়ে দিতে পারেনি।

অবাক হয়ে যাচ্ছি! একজনের কণ্ঠে বিস্ময়, বলল, আমার ও তো তেমন মনে হয়েছে, মানুষকে

আগুনে পুড়িয়ে মারলে কি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হলো, উজ্জয়িনীর বিচার তো জগতের শ্রেষ্ঠ বিচার, তেমন শুনেছি বহুজনের কাছে, এখানে অন্যায় নেই, ছিল না কখনো।

পরাশর বলল, ধ্রুবপুত্র নেই, উজ্জয়িনীতে কিছুই নেই, নিঃস্ব হয়ে গেছে সব, মেঘ নেই, অপরাধী মানুষ পুড়ে মরছে, সেই অপরাধীর মৃত্যু যন্ত্রণা এখনো আমাকে ঘুমোতে দেয় না, আমার বারবার মনে হচ্ছে ধ্রুবপুত্র ফিরে আসুক, সে ফিরে এলে হয়ত সব আগের মতো হয়ে যাবে।

তারা এই রকম নানাকথা বলছিল। তারা জানে এ ব্যতীত অন্য কোনো কথা তারা ভাবতে পারবে না। ভাবার উপায় নেই। তারা জানে শুধু ধ্রুবপুত্রের কথা। ধ্রুবপুত্র ফিরে এলে সব আবার আগের মতো হয়ে যেতে পারে এই ভাবনার ভিতরে তাদের শ্বাসপ্রশ্বাস। তখন অনেক দূর থেকে হাঁটতে হাঁটতে একজন এসে পৌঁছল রত্নাকরসাগর তীরে। মধ্যবয়স্ক মানুষটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল, শুনেছো তোমরা, সূর্যের রথের চাকা বসে যাচ্ছে, এই কথা শুনেছো কি?

সে কী কথা। সমস্ত মানুষ দাঁড়িয়ে পড়েছে। আর্তনাদ করে উঠেছে, কোথায় শুনলে একথা, কে বলেছে? হায় মহাকাল। এ কী শুনছি আমরা?

মধ্যবয়সী মানুষটি বলল, নগরে এই কথা ভাসছে, নগর থেকে কথাটি দূরে চলে গেছে, দূরের মানুষও জেনে গেছে, শূদ্রপল্লীর মানুষ জানে না কেন?

সবাই চুপ করে থাকল। লোকটি বলে যাচ্ছিল সূর্যের রথের চাকা যদি বসেই যায় সত্যি, দিনমান আর ফুরোবে না, এই রাত্রিই হবে শেষরাত্রি.....।

শুনতে শুনতে সবাই ভয় পেল। একজন আচমকা দৌড়ল আর্তনাদ করতে করতে, পালাতে হবে। সবাই পালিয়ে যাচ্ছে নগর ছেড়ে, এখানে থাকলে রোদে পুড়ে পুড়ে মরে যেতে হবে।

একজন বিড়বিড় করে বলতে থাকে, অন্য দেশে এমন হবে না ঠিক, সেখেনে মেঘ আছে, পানি আছে, যৌবনবতী মেয়েমানুষ আছে, সব আছে, ঠিক, আমি সেই দেশে চলে যাব, সেখেনে নদীতে জল আছে, ঢেউ আছে, আমি পালাব, না হলে ছেলে কোলে করে বউ পিছু নেবে।

গুঞ্জন উঠল, আর কেউ একজন বলল, যদি এইটি শেষ রাত্রি হয়, তবে তো রাত থাকতে থাকতে যতদূর পারা যায় চলে যাওয়া ভাল, হতেই পারে সত্য, আজ দুপুরে একটা ময়ূর মাঠের ভিতরে মরে যাচ্ছিল, তখনই মনে হয়েছিল খারাপ কিছু হচ্ছে।

ময়ূরটা কার?

কার কে জানে, একা একা পাক খাচ্ছিল মাঠের ভিতর।

ময়ূরটা কি জঙ্গলের?

হতে পারে।

ছোট ময়ূর না বড়?

অত মনে নেই, আমি পালাই বউ বাচ্চা নিয়ে, আমরা অনাথ হয়ে গেছি, কেউ দেখছে না আমাদের, এতদিন মেঘ নেই, সরোবরে জল নেই, রাজা তো কিছু করতে পারতেন, করছেন না।

আমাদের কেউ নেই! কে যেন কেঁদে উঠল অন্ধকারে, যদি রাত্রি না থাকে, শুধুই রোদ থাকে ওই রকম ভয়ানক হয়ে, আমরা কেউ বাঁচব না, রাতটুকুতে তবু বেঁচে উঠি সব দিক ঠাণ্ডা হলে!

আমাদের সত্যি কেউ নেই, রাজা আমাদের কথা ভাবছেন না।

রাজা আর কবে রাজা থাকবেন, সবাই তো ছেড়ে যাচ্ছে নগর!

হায়! বুক চাপড়ায় পরাশর, যেদিন চলে গেল ধ্রুবপুত্র, আমি ভেবেছিলাম ভাল হল না, তা সত্যি হয়ে গেল......।

বহুদিন বর্ষা না হলে, ফসলহানি হলে, সরোবরে জল শুকোলে, আকাশে মেঘের চিহ্ন না খুঁজে পাওয়া গেলে, রোদ ভীষণ হয়ে উঠলে মানুষ কোনো কিছুই ঠিকঠাক ভেবে উঠতে পারে না। মানুষ ভয় পায়। সেই ভয় আরো ভয়ানক হয়ে উঠতে থাকে সূর্যের রথের চাকার কাহিনী কানে কানে ছড়িয়ে গেল। উজ্জয়িনী নগর শূন্য হতে লাগল। শূদ্রপল্লীর মানুষ ভাবতে লাগল নগর ছেড়ে না গেলে বেঁচে থাকা অসম্ভব। সেদিন রাত্রিকালেই কেউ কেউ গেল। কেউ কেউ থেকে গেল পরের দিনটি দেখার জন্য। পরের দিনেও আবার ভয়ের কথা শুনে রাত্রি নামলে সেও ত্যাগ করে নগর। এইভাবে চলে যেতে

থাকে অনেকজন। শুধু বুড়ো পরাশর ভাবছিল অশক্ত শরীরে সে আর কতটা হাঁটবে, কতদূর যাবে? তার চেয়ে দিনমান না ফুরোবে যখন, তখন সে আধপোড়া পিপুল গাছটির আধপোড়া ছায়ায় বসে বসে অপেক্ষা করবে ধ্রুবপুত্রের। তার জীবনের অভিজ্ঞতা বলে এই জগতে কোনো কিছুই একভাবে যায় না, ব্যত্যয় ঘটেই। তখন কি ধ্রুবপুত্র ফিরবে না? পরাশর এই রকম ভাবতে লাগল রাতের অন্ধকারে রত্নাকরসাগর তীরে বসে। কে যেন রটিয়েছে অন্য দেশে মেঘ পানি সব আছে, তাই কেউ কেউ একা একা পালিয়ে যাচ্ছে! কী করে সে রক্ষা করবে শূদ্রপল্লীকে?

পঞ্চাশ

গেল বসন্তে, চৈত্র শেষে এসেছিল তাম্রধ্বজ। তারপর অনেকদিন তার দেখা নেই। এখনো কি শেষ হয়নি গণনা? এদিকে যে আকাশ পুড়ে পুড়ে কালো হয়ে গেছে প্রায়। বৃক্ষাদি পত্রশূন্য হয়ে পড়ছে দিনে দিনে। মাটির অন্তঃস্থলের রসও যেন টেনে নিচ্ছে সূর্যের আগুন। মনে হয় সব মরে যাবে। মানুষও শুকিয়ে শুকিয়ে মরা গাছের মতো হয়ে যাবে। মেয়েটা কী রোগা হয়ে গেছে! মেয়ের গায়ে হাত দেয় রেবা। শরীর এইসময় রসবতী হয়ে ওঠে, গন্ধবতী যেন জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

রেবা বলল, তুই নিজেকে দেখিস?

মাথা নাড়ে গন্ধবতী, কী দেখব মা?

তোর দেহখানি কী হচ্ছে?

আমি কী করব মা?

রেবার চোখে জল এসে গেল। অন্নাভাব শুরু হয়ে গেছে। একটি ময়ূর চলে এসেছিল কোথা থেকে। বনের ময়ূরই হবে। গন্ধবতী তাকে আশ্রয় দিয়েছিল তার ছায়ায়। দু'দিন বাদে ময়ূরটি মরে গেল দুপুরে মাঠের ভিতরে পাক খেয়ে খেয়ে। ও! সে কী দিন! রোদ যেন ধারালো তরবারির মতো খণ্ডখণ্ড করে দিচ্ছিল সমস্ত শরীর। সেদিন কী কান্নাই না কেঁদেছিল গন্ধবতী। সমস্ত রাত্তির ধরে কেঁদেছিল। রাত আর কতটুকু। তবু যেটুকু, সেইটুকুতেও দুচোখের পাতা এক করেনি মেয়ে।

গন্ধবতী বলল, আমাকে বলছ মা, তুমি নিজেকে দেখেছ?

রেবা চুপ করে থাকে। দেখেছে সে। হাড় সর্বস্ব হয়ে যাচ্ছে শরীরখানি। কোথাও এতটুকু রস নেই। মনে হয় শরীরের সমস্ত রক্ত বোধহয় জল হয়ে উঠে যাচ্ছে খরতাপে। শরীর দুর্বল হয়ে গেছে। আর বইতে পারে না নিজেকে রেবা। কী যে হবে? চিন্তায় তার দুচোখের পাতা কখনোই এক হয় না। ঘুম এলেও ঘুমের ভিতরে আসে অদ্ভুত সমস্ত স্বপ্ন। ভয়াল। স্বপ্নে একদিন যেন এসেছিল তৃষ্ণার্ত ধ্রুবপুত্র, কী অদ্ভুত সেই স্বপ্ন! ঘুম ভেঙে গেলে মনে হয়েছিল সত্যিই যেন কেউ চলে যাচ্ছে জল চেয়ে চেয়ে না পেয়ে। কই একদিন ও তো স্বপ্নের ভিতরে বৃষ্টি এল না। গতকাল রাতে সে স্বপ্নের ভিতরে বালুকাময় গম্ভীরানদীকে দেখেছিল। বালি খুঁড়েই যাচ্ছে, খুঁড়ে যাচ্ছে, কিন্তু জলের কোনো চিহ্ন নেই। সে দুই হাতে নদীর বালি সরিয়ে যাচ্ছে। কী ভয় লেগেছে তারপর! স্বপ্নটা ছিল ভোরের। ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্য হয়। তা যদি হয়, তখন? এখন যে গম্ভীরার বালিই ভরসা। বেলা পড়লেও বালি খুঁড়ে খুঁড়ে জল স্তর বের করে সেই জল ছেঁকে ঘরে আনা হয়। আর যাওয়া হয় ভোরের বেলা। তাই নদীর তল যদি সত্যি সত্যি শুকিয়ে যায়, সমস্ত দিন বালি সরিয়েও যদিনা পাওয়া যায় জল, তখন!

বুড়ি পার্বতী এল। উদ্ধবের দূতী বুড়িও পোড়াকাঠের মতো হয়ে গেছে। ন্যুব্জ হয়ে লাঠি ধরেছে বুড়ি। মাথার সব চুল শাদা, সেই চুল রোদে পুড়ে সবসময় উড়ছে। চুলে রশিটিও বাঁধে না বুড়ি। এখন আর উদ্ধবের কথা বলছে না বুড়ি। সে বলছে না, কারণ উদ্ধব তাকে বলতে বলছে না। সে হলো রাজসভার কর্মচারী, তার কি আর মেয়েমানুষের অভাব ঘটার কথা? গন্ধবতীর চেয়ে ভাল পেয়ে গেছে হয়ত। উজ্জয়িনীর গণিকালয়ে কত রকম মেয়েমানুষ আছে, তাদের রূপগুণের কাছে গন্ধবতী তো ধুলো। রূপ আর যৌবনটুকু ছাড়া গন্ধবতীর কী আছে? ছলাকলা জানে? তা রূপযৌবনও তো খসে যাচ্ছে দিনদিন। এরপর যখন সমস্ত দিন সূর্যের আলো থাকবে, সমস্ত রাতই দিন হয়ে থাকবে, তখন যে কী হবে? একদিনেই পুড়ে শেষ হয়ে যাবে পৃথিবী। বুড়ি ডাকে, ও রেবা শুনেছিস?

রেবা চুপ করে আছে। তার কৌতূহল এখন কমছে। এখন যেন মনেই পড়ে না কার্তিককুমারের কথা, ধ্রুবপুত্রের কথা। তাদের সম্পর্কে হতাশ হয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে রেবা। স্বামী কি সত্যিই ফিরবে?

নাকি দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হলে সে বৈধব্য নেবে? বৈধব্য নেওয়া আর না নেওয়ায় কীই বা তফাৎ। এখন সে কোন সুখে আছে?

বুড়ি লাঠিতে ভর দিয়ে মা মেয়েকে দেখেছে, জিভ আর ঠোঁট দিয়ে চুকচুক শব্দ করল, আহা, অমন রম্ভা মেনকার মতন রূপ, গেল কোথায়?

গন্ধবতী ঝাঁঝিয়ে ওঠে, চুপ করো দেখি, কথা বলো না।

পথে চেয়ে আছিস?

গন্ধবতী জবাব দিল না। জবাব না পেয়ে রোদের মধ্যে উঠোনে পাক খেল বুড়ি পার্বতীদাসী, তারপর লাঠিটিকে দাওয়ার গায়ে হেলিয়ে রেখে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে দাওয়ার ছায়ায় উঠল। বসে জিভ বের করে হাঁপাতে লাগল। জিভ দিয়ে জল ঝরতে লাগল বুড়ির মলিন ঘাগরাটির উপর।

রেবা জিজ্ঞেস করল মেয়েকে, কোথায় সেই দশার্ণ দেশের জ্যোতির্বিদ?

কী করে জানব?

কী বলে গিয়েছিল?

ফিরবে তো।

কারা ফিরবে?

গন্ধবতী নিজেকে সম্বরণ করে, বলতে গিয়েছিল তাম্রধ্বজ ফিরবে, বলল, বাবা আর ধ্রুবপুত্র।

গণনা শেষ হয়েছিল বলিসনি তো।

তখনো শেষ হয়নি।

তাহলে কী করে বলেছে তারা ফিরবে?

আমার মনে হলো মা, তেমন যেন বলেছিল, সে আবার আসুক, এইবার নিশ্চয় সঠিক বার্তা নিয়ে আসবে, আসবে না মা?

মেয়েকে দেখল রেবা। ধ্রুবপুত্র, কার্তিককুমারের খোঁজের চেয়ে তাম্রধ্বজের আসা না আসা নিয়ে যেন গন্ধবতীর আকুলতা বেশি। কথাটা মনে হতেই চমকে ওঠে রেবা। তাম্রধ্বজের জন্য আকুল হবে কেন গন্ধবতী? তাম্রধ্বজের গণনা শেষ হলে ধ্রুবপুত্রের খোঁজ আসবে তাই? কিন্তু বহুদিন যে আসেনি তাম্রধ্বজ। গণনা শেষ হয়নি, কিন্তু এমনিও তো আসতে পারে। গন্ধবতীর জন্য। কী যে ভাবছে সে? গন্ধবতী যে ধ্রুবপুত্রের জন্য বসে আছে, তা জেনেও কেন আসবে তাম্রধ্বজ? দশার্ণদেশীয় যুবক কি তাই আসা ছেড়েছে? সে তো জানত ধ্রুবপুত্র আর গন্ধবতীর কথা। কোনো কথা গোপন করা হয়নি তার কাছে। তাহলে কী হলো? ওই যে গন্ধবতী নির্নিমেষ চেয়ে আছে রৌদ্রদগ্ধ, ধুলোওড়া পথের দিকে। তাম্রধ্বজের জন্য কি? নাকি ধ্রুবপুত্রের আশায়? কিন্তু এখন যে ধ্রুবপুত্রের চেয়ে তাম্রধ্বজের ফেরার সম্ভাবনাই অধিক।

পার্বতীবুড়ি পা ছড়িয়ে বসে দুহাতে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, কে আসবে, কার কথা বলছিস তোরা?

জবাব না পেয়ে বুড়ি বলল, এদেশ ছেড়ে লোকে পালাচ্ছে, তারা আসবে কেন, ভিনদেশে তারা হয়ত সংসারই পেতে বসেছে।

শিহরিত হলো রেবা, আর্তনাদ করে ওঠে, কী বলছ?

পুরুষমানুষের প্রকৃতি তো এমনি।

না, ওর বাবা কেমন ছিল জান না?

তাহলে ফিরছে না কেন?

সেই জানে, হূনরাজ্যে বন্দী হয়ে আছে কিনা কে জানে।

ওসব ভেবে মন শান্ত কর, পুরুষমানুষ ক'টা দেখেছিস তুই, জানবি কী করে তারা কেমন, নতুন মেয়েমানুষ পেলে সব ভুলে যায়, ভুলে যাওয়াই তাদের ধম্মো।

থাক। গন্ধবতী বলল, থাক দাদিমা।

বুড়ি মাথার ভিতরে আন্দাজে আন্দাজে উকুন বাছে, তারপর ডাকে গন্ধবতীকে তার নিজের কাছে, এদিকে আয়।

কেন? গন্ধবতী মনে মনে ভয় করে বুড়িকে, কানে মুখ দিয়ে কী আবার কুকথা শোনাবে বুড়ি দাদি? শুনতে যে গা কাঁপে খুব।

বুড়ি পার্বতী বলল, আয় উকুন বেছে দিই।

গন্ধবতী বলল, উকুন তো নেই মাথায়।

সে কী, নেই!

রেবা এবার কঠিন হলো, ঈষৎ কর্কশ কণ্ঠে বলল, বলল, পিসি, তুমি অলক্ষুণে কথা শোনাও কেন, উকুন হওয়া কি ভাল?

ভালটা কোথায় হচ্ছে বল দেখি, তখন উদ্ধব চেয়েছিল, যদি রাজি হত মেয়ে বেঁচে যেত, এখন আর উদ্ধবের দরকার নেই।

বেঁচেছি আমরা। বলল রেবা।

ওফ্! কী যন্তন্না। বুড়ি দুটি হাতের দশ আঙুলে মাথার চুলের অভ্যন্তর থেকে উকুন খুঁজে বের করতে থাকে আন্দাজে আন্দাজে, বিড়বিড় করে, আমার মাথায় তো বিজবিজ করছে, তোদেরও আছে, অনেক সময় ধরা যায় না, মন যদি সব সময় পুরুষ মানুষের চিন্তায় বিভোর থাকে, টের পাওয়া যায় না।

রেবা ভাবছিল বুড়িকে বলে চলে যেতে। কিন্তু তাহলে আর এক অনর্থ। বুড়ি চিৎকার করে পাঁচজনকে জোগাড় করবে। অকথা কুকথা বলে বেড়াবে। তার চেয়ে চুপ করে থাকা অনেক ভাল।

বুড়ি বলল, তোদের ধরা বনের ময়ুর মরেছে, অমঙ্গল শুরু হয়ে গেছে মা, তোদের মাথায় উকুন নেই তা কি হতে পারে?

তোমার মাথায় কেন?

আমার মাথায় ওরা থাকে, কিন্তু এবার যে যন্তন্না দিচ্ছে খুব। বলতে বলতে বুড়ি চুলের ভিতর থেকে দুই আঙুলে টিপে উকুন বের করে আনে। দুই নখের মধ্যে টিপে মারতে মারতে ফোকলা গালে মুখ বিকৃত করে বলে, গরমে, রোদের তাতে ওরা চঞ্চল হয়ে আছে সবসময়, কুরে কুরে মাথাটা খাচ্ছে যেন, চুলের গোড়া দিয়ে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে।

মাগো। গন্ধবতী অস্ফুট আর্তনাদ করল।

তোরও হবে। সময়ে পুরুষ মানুষ না জুটলে ভাতার উকুন এসে জোটে।

কী বলছ, পিসি, কাকে বলছ, তুমি?

বলছি ওই মেয়েকে, উকুনে ধরলে একেবারে খেয়ে নেবে সব, রাতে ঘুমুতে দেয়না, ঘুমুলে ভয়ের স্বপন দেখায়।

রেবার মনে পড়ল বালি সরানর দৃশ্যটি। থমথমে হয়ে গেল সে। বুড়ির দিকে চেয়ে থাকল। বুড়ি মাথার উকুন মারতে মারতে বলল, দু দিন বাদে অমানিশি, এরপর আর পুন্নিমে, অমানিশি আসবে কিনা কে জানে?

কেন?

তোরা শুনিস নি?

রেবা আর গন্ধবতী পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। শুনেছে বটে। শিবনাথ এসে বলেছিল একদিন, কিন্তু বিশ্বাস করার কথা নয় বলে বিশ্বাস করেনি। এখন বুড়ি যে ওই কথাই বলছে। দুহাত জোড় করে আকাশকে প্রণাম করে বুড়ি বলছে সূর্যদেবের রথের চাকা বসে যাওয়ার কথা। তখন যে বুড়ির কী হবে, যদি দিনের আলো না নেভে তবে উকুনগুলো রোদে তাপে দাপাদাপি করবে অস্থির হয়ে।

বুড়ি বলল, আমি মাথা মুন্ডন করে নেব ক্ষৌরকার ডেকে।

গন্ধবতী হেসে ফেলে, নেড়ি হয়ে যাবে?

এছাড়া উকুনের বংশ মারার উপায় নেই।

গন্ধবতী বলল, তাই হও আমি দেখব।

বুড়ি পার্বতী বলল, তোদেরও নেড়ি হতে হবে, এছাড়া উপায় নাই।

গন্ধবতী কল্পনা করতে থাকে মুণ্ডিত মস্তক বুড়িকে কেমন দেখাবে। যৌবনকালে নাকি এই বুড়িই বেশ সুন্দরী ছিল। মা বলে তাই। মা নিজে দ্যাখেনি, শুনেছিল বাবার কাছে। বাবা নাকি শুনেছিল নিজের

মায়ের কাছে। রূপ যে ছিল তা বোঝা যায় একটু একটু। রোদে পুড়ে সেই ভাবটুকু এখন প্রায় মুছে গেছে। গেল শীতে বুড়ি তো প্রায় যায় যায় হয়েছিল। কুঁকড়েমুকড়ে পড়েছিল ঘরের ভিতরে। শীত যেতে উঠে দাঁড়িয়েছে আবার।

পার্বতী বুড়ি বলল, এবার মহাকাল শেষ করে দেবেন সব।

বলো না, ভয় করে। রেবা বিড় বিড় করে।

এটাই তো সত্য, উদ্ধব বলে গেছে, কালই তো ফিরছিল নগরে।

এসেছিল নাকি?

আসে তো, তবে ওর এখন অবস্থা আরো ভাল, সেনাপতির ডানহাত, সেই তো বলে গেল শোনা যাচ্ছে সূর্যের রথের চাকা বসে যাচ্ছে।

তোমায় বলে গেল? রেবা জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ বলে গেল, ও হলো রাজার সতরি, ওর কাজই হলো খোঁজ রাখা, কোথায় কে আসা যাওয়া করে, কখন আসে, কবে আসে সব জেনে রাজসভায় জানিয়ে দেয়।

রেবা বলল, ভাল, তাই করুক।

ওর কাছে খবর এয়েছে রথের চাকা বসে গেলে আর দিবাকর পুব থেকে পশ্চিমে যাবে না, দিনের আলো একরকম থাকবে, ওফ সে যে কী হবে!

গন্ধবতী বলল, কথা সত্যি না। না, অমন হতে পারে না।

হচ্ছে তো, বর্ষা হয়েছে কতকাল আগে?

গন্ধবতী বলল, তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?

জল সব খেয়ে নিচ্ছে সূরজ, আমি এ জন্মে দেখিনি এমন, ওই দ্যাখ দ্যাখ রেবা, রোদটা কীরকম! কী রকম শনশন করছে, ঝলসাচ্ছে যেন!

রেবা তাকায় উঠোন পার হয়ে দূরে। মনে হয় যেন তাই। বুড়ি যেমন বলছে। রেবা দাওয়া থেকে নেমে আসে রোদ ঝাঁ ঝাঁ উঠোনে। বুড়ি পার্বতীও লাঠি ভর করে নেমে আসে। গন্ধবতী নামে সবার শেষে। ন্যুব্জ বুড়ি আকাশে মুখ তোলে, দেখেছিস, দ্যাখ, মনে হয় যেন কতদিন দিবাকর স্থির হয়ে আছে ওই আকাশে, এমন রোদ্দুর কত কাল ধরে রয়েছে!

রেবা, গন্ধবতী একসঙ্গে অস্ফুট গলায় বলে ওঠে, তাই?

হ্যাঁ তাই, কতকাল সূরজ ঘুমুতে যায়নি, গেছে?

রেবা গন্ধবতী ফিসফিস করল, তাই!

হ্যাঁ তাই, উদ্ধব যা বলে তা সত্যি, উদ্ধবের কথা মানে রাজার কথা, রাজার সভার কথা, রাজার কাছে অমন সংবাদ এয়েচে, শুরু হয়ে গেছে রথের চাকা বসা, হে মহাকাল! কতদিন থাকবে গো এমন রোদ্দুর—? এক হাতে লাঠি অন্য হাতে উকুনে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বুড়ি বলে, সব পালাচ্ছে, পাখপাখালি সব চলে যাচ্ছে, কতদিন ধরে চলছে এমন বল দেখি, এমন দিনমান, তাতই শেষ হয় না।

রেবার চোখে জল এসে গেল, বলল, অনেকদিন!

ভুতুড়ে স্বপন দেখিস না?

দেখি পিসি দেখি!

তবে তো আমার কথা সত্যি! সত্যি! সত্যি!

রেবা গন্ধবতী পরস্পরকে আঁকড়ে ধরল ভয়ে। এত যে দিনের আলো কিন্তু ভয় করছে খুব! মনে হয় অন্ধকার নেমে গেছে! আলোর যে এমন ভয়ানক রূপ আছে কে জানত! চোখ যে অন্ধকার হয়ে আসছে! বুড়ি পাক দিচ্ছে উঠোনে, ঘুরতে ঘুরতে বলছে, কী করবি ভেবে দ্যাখ, মা বিটিতে ভেবে দ্যাখ তোরা, খাবি পরবি বাঁচবি না পুড়ে পুড়ে মরবি।

একান্ন

রোদে মাথা ঘুরছিল রেবার। তাকে ধরে দাওয়ায় নিয়ে এসে বসিয়ে দেয় গন্ধবতী। বুড়ি পার্বতী রোদেই দাঁড়িয়ে আছে লাঠিতে ভর দিয়ে, মাথার চুল বাতাসে উড়ছে। ফোকলাগাল আর স্খলিত চামড়া

নিয়ে বুড়ির রূপ ভয়ানক হয়ে উঠেছে যেন। বুড়ি বলছে, আর উপায় নেই, আজ কালই সূরজ দেবতা পথে দাঁড়িয়ে যাবে, মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে গেছেও যেন, আর ফুরাবে না দিনমান।

তুমি থামো দাদিমা। গন্ধবতী মায়ের গা জড়িয়ে বিড়বিড় করে, জল খাবে মা?

ওকে চলে যেতে বল। কোনোরকমে বলল রেবা।

বলল গন্ধবতী, শুনে হাসল পার্বতীবুড়ি। ঠুকঠুক করে আবার দাওয়ার ছায়ায় এসে বসল, বলল, আমি তো যাব, কিন্তু তোদের কী হবে?

কী হবে?

পুড়ে পুড়ে খাঁক হয়ে যাবি, যৌবনের জ্বালা আমি বুঝিনে?

গন্ধবতী বলল, দাদিমা তুমি বাড়ি যাও, ওসব কথা বলো না।

বুড়ি দুহাতে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, উজ্জয়িনী নগরে এক ধনী ব্যক্তি আছে, বয়সটা তার বেশি একটু, কিন্তু আছে অঢেল, সে চায় কচি মেয়ে, যে কচি বউটা আছে, সে স্বৈরিণী, বুড়োকে দ্যাখে না, শয্যায় ঠাণ্ডা বরফ, পরপুরুষের কথা ভাবে, আবার বিয়ে করার কথা বলছে সেই ধনী ব্যক্তি, আমি তোর কথা ভেবেছি, তোর কথা মনে পড়ল আমার।

গন্ধবতীর চোখে যেন আগুন জ্বলল। রোষকষায়িত নেত্রে সে বুড়ির দিকে তাকিয়ে থাকল। কিন্তু বুড়ির তো কোনো ব্যত্যয় নেই। অগ্রাহ্য করল গন্ধবতীর ক্রোধাগ্নিকে। বলল, ওভাবে তাকাস কেন মেয়ে, তোর হবে কী, কে নেবে তোরে, কী দেখে নেবে?

তুমি থামো, চলে যাও পিসি। চেতনা ফিরল যেন রেবার, বলল ধীরে ধীরে।

গেলেই তো যাওয়া যায়, এখন তো আর বেলা পড়বে না, সন্ধে হবে না, রাত হবে না, ভোর হবে না, সকালও হবে না, গেলেই যাওয়া যায়, রোদের হাত থেকে কারোর কোনো সময়ে রেহাই নেই।

তবে যাও, বেলা পড়ার অপেক্ষায় থেকনা। গন্ধবতী বলল।

যাব, কিন্তু কখন যে যাব তা ঠিক করতে পারছিনে, সেই কখন এয়েচি আমি, ওই যে নিমগাছটার ছায়া, ছায়া কিন্তু লম্বা হচ্ছে না।

চমকে যায় গন্ধবতী! তাকায় উঠোনের কোণের কদম গাছটার দিকে। ছোট একটুখানি ছায়া পড়ে আছে মাটিতে, পূর্বদিকে। তার মানে দিনমণি পশ্চিমে আছেন। কিন্তু বুড়ির কথাটি সত্যি? ছায়া বাড়ছে না মানে সূর্য স্থির হয়ে গেছে। সমস্ত কিছু অদ্ভুত মনে হলো তার। রোদ, গাছ, ছায়া, উত্তাপ সব যেন স্থির মনে হতে লাগল। কোনো কিছুতেই কোনো স্পন্দন নেই। সে বলল, দাদিমা, তুমি দেখেছ সত্যি?

না দেখলে বলি কেন, এখন সুরজঠাকুরের চলন বুড়ো মানুষের মতো হয়ে গেছে, আস্তে আস্তে চলেছেন, এইরকম করতে করতে উনি থেমে যাবেন আকাশের উপরই, তখন ছায়া বড় হবে না, ছোটও হবে না।

গন্ধবতীর মনে হলো হতে পারে। চোখটা ধাঁধিয়ে যাচ্ছে রোদের দিকে তাকিয়ে। গাছটার ছায়া কি ছোট হয়ে যাচ্ছে আরো? ছোট হয়ে হয়ে পৃথিবীতে যত ছায়া আছে সব মুছে যাবে? কোথাও কোনো ছায়া থাকবে না, শুধু রোদ্দুর। তার ঠাকুর্দা যেন কীরকম হয়ে গেছেন। সব আশা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। হতাশমুখে এই রোদের ভিতরেই ঘুরে বেড়ান হেথা হোথা। তাম্রধ্বজকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনি। আচার্য বৃষভানু চলে গেছেন, তাম্রধ্বজও কি চলে গেল? গন্ধবতীর মনে পড়তে লাগল, নিষাদের মত বন্যরূপ তাম্রধ্বজের, কিন্তু মুখখানিতে তেমন কোনো ভাব নেই, যে ভাবের কথা মনে পড়ে নিষাদের কথা স্মরণে এলেই। গন্ধবতীর মনে পড়ে যায় আঙিনার ওই জায়গাটিতেই তাম্রধ্বজ এসে দাঁড়ায় প্রতিবার, তখন দিনমণি অস্ত যান, আঙিনার পশ্চিমে তাদের কুটিরখানি থাকায়, সেই ছায়ায় ঢেকে থাকে এই জায়গাটির সমস্ত অংশ। ছায়া আর তাম্রধ্বজের কথা একসঙ্গে মনে পড়ল গন্ধবতীর। ছায়া আর শীতল হয়ে আসা সন্ধ্যার কথা মনে পড়তে তাম্রধ্বজকেই বারবার মনে পড়তে লাগল। নিষাদ জাতীয় পুরুষের মতো মাথার চুলগুলি ঘন, কুঞ্চিত, চোখের মণিটি ঈষৎ কটা, কী চমৎকার লাগে যখন তাম্রধ্বজ তাকিয়ে থাকে। দীর্ঘকায় পুরুষ। তাম্রধ্বজ বোধহয় ধ্রুবপুত্রের চেয়েও মাথায় উঁচু। ঈষৎ শীর্ণকায় বটে, কিন্তু কী প্রশস্ত বক্ষ তার, সমস্ত দেহটি কী পুরুষালি, পেশীবহুল! তাম্রধ্বজ বলে দশার্ণ দেশ অবধি সে পায়ে হেঁটেই চলে যেতে পারে, কোথাও কখনো থামবে না, রাত্রেও বিশ্রাম নেবে না, বরং রাত্রে আরো দ্রুত বেগে

হেঁটে পথ কমিয়ে আনতে পারবে? তাম্রধ্বজ কি সেই পথে চলে গেল? খবর পেয়েছে এই অবন্তীদেশে সূর্যাস্ত হবে না।

বুড়িপার্বতী এসে গন্ধবতীর বুকে হাত দিল আচমকা। আর সেই স্পর্শে আতঙ্কিত হয়ে সরে গেল গন্ধবতী। মনে হলো যেন উদ্ধব দাসের মতো কেউ, অথবা অন্য কোনো দুর্বৃত্ত। বুড়ি রোদে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে হাসতে লাগল খ্যা খ্যা করে, তোর বুক তো শুকিয়ে যাচ্ছেরে মেয়ে।

লজ্জায় আতঙ্কে গন্ধবতী কুঁকড়ে গেল, বলল, তুমি যাও পিসি।

যাব রে যাব, কী সুন্দর আমফলের মতো রসে ভরা বুক ছিল তোর, রোদে পুড়ে পুড়ে শুঁকনো হয়ে গেছে, রস শুকিয়ে গেছে সব।

পিসি থামো।

বুড়ি মেয়েছেলের মতো হয়ে গেছে, কী দেখে পুরুষমানুষ তোকে নেবে রে মেয়ে, তোর সেই সখা তো ওইজন্যে আসছে না।

থামবে! গর্জন করে ওঠে গন্ধবতী।

বুড়ি রোদের ভিতরে উবু হয়ে বসে, এত তাড়াতাড়ি তোর যৈবন চলে গেল রে মেয়ে, যৈবন ভোগও করতি পারলিনে, বল আমি খবর পাঠিয়ে দিই ধনী দুর্মুখ শেঠীকে, তার বউটাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিক। তোকে বে'করে নিয়ে যাক। সে তোর যৈবন ভোগ করুক, তুই ধনী ব্যক্তির বউ হবি, সে মরলে কত সম্পত্তি দিয়ে যাবে তোকে।

গন্ধবতী ছুটে উঠোন থেকে দাওয়ায় বসা মায়ের কাছে এল। মাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরল। মা যেন প্রায় ঘুমিয়ে আছে। রোদে, তাপে, বুড়ির আগুনভরা কথায় গন্ধবতীর মা রেবা আধোচেতন হয়ে ঝিমিয়ে আছে। দাওয়ার ছায়ায় বসে গন্ধবতী চোখ বন্ধ করল। তখনই উঠোনের রোদে বসা বুড়ি পার্বতী বলল, তোর দাওয়ায়ও ছায়া থাকবে না যখন সূরজদেব দাঁড়িয়ে যাবে, ওই দ্যাখ, ওখেনে রোদ পড়েছে, উত্তর দিকটায় কি রোদ ছিল?

চমকে উঠে গন্ধবতী চোখ মেলে দেখল উত্তর দক্ষিণে লম্বা দাওয়ার উত্তর ভাগে এক ফালি চকচকে রোদ এসে পড়েছে। রোদ দেখে তার মনে হলো, যেন আর একটা খুনখুনে ডাকিনি বুড়ি বসে আছে ওখানে। ওখানে তো রোদ ছিল না একটু আগেও। এল কোথা থেকে, কেন এল? গন্ধবতীর মনে পড়ল না এখন সূর্যদেবের উত্তরায়ণের কাল। এই সময়টায় প্রতিদিন বারান্দার ওই কোণে পশ্চিমগামী সূর্যের রোদ কিছু সময় থাকে। দক্ষিণায়ণের কালে শীতের সময় ওই রোদ থাকে বারান্দার দক্ষিণ কোণে। গন্ধবতীর মনে পড়ল না শীতের সময় বারান্দার ওই দক্ষিণে বসে সে আর মা রেবা রোদটুকু ছুঁয়ে দ্যাখে। তবে উত্তরকোণের ওই রোদ তারা কোনোদিনই স্পর্শ করেনি। খেয়ালও করেনি ওই দিকে ভয়ানক বুড়ি রোদ এসে বসে থাকে এই সময়। ওদিকে তো আঁস্তাকুড়। গন্ধবতী ভয়ার্ত হয়ে চেয়ে থাকল রোদের দিকে।

কী দেখছিস?

তোমাকে। গন্ধবতী ফিসফিস করল, তুমি কে?

মরণ!

গন্ধবতী বলল, তুমি কখন এলে?

এখন রে এখন।

তুমি যাও।

যেতে তো আসিনি, আমি তোর ঘরে ঢুকব।

তুমি এলে কখন?

এখন।

তুমি যাবে কখন?

এখন।

তুমি কে?

মরণ, তোর ঘরের ছায়া পুড়ে যাবে, আমি তোর ঘরে ঢুকতে এয়েচি।

গন্ধবতী প্রায় ভুতুড়ে চোখে তাকিয়ে থাকল রোদটার দিকে। রোদ বদলে বদলে বুড়িপার্বতীর মতো হয়ে উঠল আরো। বুড়ি কি দাঁড়াল! হ্যাঁ, দাঁড়িয়েছে। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে আছে মরণ। এবার কোমর বাঁকিয়ে এদিকে আসবে।

গন্ধবতী ভয় পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি কে?

মরণ! রোদে তোর দাওয়া, ঘর সব পুড়ে যাবে, আর তো সূরজ ডুবে যাবে না।

গন্ধবতী আর্তনাদ করে মাকে জাপটে ধরল, মা, মা, ওকে?

রেবা চোখ খুলে চোখ মুছল, কই কে?

ওই যে মা, ওই যে ওদিকে। মায়ের মাথাটা ঘুরিয়ে দিল গন্ধবতী। ঘুরিয়ে দিতেই দেখল ভীষণ রোদ বিছিয়ে গেছে বারান্দার আরো একটু অংশে। তাহলে কি সত্যি? রোদ এইবার এদিকটাও খেতে আসছে। লকলকে জিভ, উকুন ভর্তি শাদা চুল, তোবড়ানো গাল, ঘোলাটে চোখ, বাঁকা দেহ ওই রোদের ডাকিনির।

তুমি কে? রেবা ঘুমঘুম চোখে কোনোক্রমে জিজ্ঞেস করে। ক্লান্ত শরীর কাঁপছে।

তখন বুড়ি পার্বতী উঠে দাওয়ার ধারে চলে এসেছে, আচমকা গন্ধবতীর উত্তরীয়র কোণ ধরে ফেলল তার অজ্ঞাতে, এই মেয়ে শোন!

কে? আর্তনাদ করে ছিটকে গেল গন্ধবতী, তুমি যাও।

যাব কেন, তোর জন্যই তো এয়েচি, যৈবন চলে গেলে আর কী হবে তোর?

রেবা এবার চোখ খুলে ফেলেছে। দেখল সামনে কুৎসিত রূপ নিয়ে বুড়ি হাসছে, তার পাকা চুল যেন দখিন পশ্চিমা বাতাসে উড়ে যাচ্ছে যেমন ওড়ে তুলো বীজ। সে ঝপ করে বুড়িকে ধরে ফেলল, তুমি যাবে?

যাব তো, আগে মেয়েটারে দে।

দেব মানে?

ধনী দুর্মুখ শেঠী কচি মেয়ে খুঁজছে, অনেকখানি জমি দেবে, আর দেবে সোনার গয়না, হীরের নাকফুল, তোকে সমেত নগরে নিয়ে গিয়ে রাখবে।

তুমি যাবে কিনা বলো। রেবা ঝপ করে উঠে দাঁড়িয়েছে, লাফ দিয়ে নেমেছে উঠোনে, তুমি যদি না যাও, আমি লোক ডাকব।

ডাক লোক, তোর মেয়েটা ধরেছিল সেই ধ্রুবপুত্তুরকে, সে তাকে নষ্ট করে উজ্জয়িনীর গণিকার ঘরে গিয়ে উঠল, আবার একটাকে ধরেচিস তোরা, গাঁয়ে আমিও বলব, আমার মুখ নাই।

কী বলছ তুমি দিদি! রেবা একেবারে দুমড়ে গেল যেন।

কী বলছি তা ঠিক বুঝছিস, কে আসে এ বাড়ি?

কে, কেউ না।

আসে না, নিষাদ একটা পুরুষ লোক।

কই! রেবা এড়াতে চায়।

তখন গন্ধবতী নেমে এল রোদে, বলল, আসে, দশার্ণদেশের এক জ্যোতির্বিদ।

মোটেই না, ও আর একটা পুরুষমানুষ, তোরে সবাই ছিবড়ে করে ফেলে রেখে যাবে, নাহলে এই দশা হয়! আবার ঝপ করে গন্ধবতীর বুকে থাবা মারল খুনখুনে বুড়ির হাড় খটখটি হাত। যন্ত্রণায় গন্ধবতী কঁকিয়ে উঠল। কী ভয়ানক পুরুষালি পেষণ বুড়ি পার্বতীর হাতে! স্তন, স্তনবৃন্ত যেন ছিঁড়ে নিতে চাইছে বুড়ি। গন্ধবতী দুহাতে বুড়িকে ঠেলে দিল, যাও, চলে যাও বলছি।

বুড়ি হাঁপাচ্ছে। জিভ দিয়ে টসটস করে লালা ঝরে পড়ল মাটিতে, বলল, কিস্যু নেই তোর, এই বয়সে অনেক থাকে, থাকলেই তো পুরুষ লোকে পছন্দ করে, তোরে ওই নতুন লোকটাও ছেড়ে যাবে, ভাল কথা বলেছিলাম।

মা মেয়ে লজ্জায় মুখ নামিয়ে দাওয়ায় এসে বসে থাকল। বুড়ি পার্বতী তাম্রধ্বজকে নিয়ে কুকথা বলে যাচ্ছে। কবে দেখল সে বৃষভানুর আশ্রমের তরুণ জ্যোতির্বিদকে? কী খারাপ কথাই না বলছে বুড়ি! মুখে কোনো আগল নেই। মুখ নামিয়ে আছে মা মেয়ে। বুড়ি এবার আচমকা চলে যাবে বলল। বলল, সুরজদেব তো আকাশে বসে যাবেন ক'দিনের মধ্যে, তখন যদি মন হয় যেন খবর দেয় তারা।

মেয়ে আর মা দুজনকেই সেই ধনীবুড়ো রেখে দেবে নিজের কাছে। এখন উজ্জয়িনী থেকে অনেকে বাণিজ্যে যাচ্ছে বাহ্লিক দেশে। যাবে বড় বণিক, ধনপতি শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত। তার সহযাত্রী হবে আরো সমস্ত বণিক। সেই বণিকদের একজন ওই বুড়ো দুর্মুখ। বহুদিনের পথ। সবাই চাইছে ভালো শক্ত সমর্থ, যুবতী দাসী। এই ধনীবুড়ো চাইছে কচি মেয়ে। যদি মনে ধরে সঙ্গেই রেখে দেবে বউ করে, আর না হলে অনেক উপঢৌকন দিয়ে ফিরিয়ে দেবে। নতুন বউ পেলে সে আর বাণিজ্যে যাবে না।

শুনছিল মা মেয়ে। কী বলছে বুড়ি তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আবার যাচ্ছেও না। দুহাতে কান চেপে ধরেছিল গন্ধবতী। মা মেয়ে দু'জনেই ক্লান্ত। এতই ক্লান্ত যে বুড়ির কথা শুনে একটু আগে যেভাবে ঝাঁজিয়ে উঠছিল, এখন তেমন পারছে না। সেই ঝাঁজ ফুরিয়ে গেছে। কেমন যেন নুয়ে পড়ছিল। তার মনে হচ্ছিল বুড়ি পার্বতী ছাড়বে না। বুড়ি পার্বতী তার লোল চর্মভরা হাত দিয়ে চেপে ধরেছে তাদের দুজনকেই। যে কাজে আসে বুড়ি, তা সিদ্ধ করেই ফিরে যায়।

রেবা জিজ্ঞেস করল, বুড়ো শেঠ-এর সঙ্গে আর কী কথা হয়েছে?

তা তো বলেনি উদ্ধব।

উদ্ধব পাঠিয়েছে তোমাকে?

না, না, উদ্ধব পাঠাবে কেন, উদ্ধব খোঁজ করতে বলেছে।

আমাদের কথা বলেছিল? বিড়বিড়িয়ে জিজ্ঞেস করে রেবা।

পার্বতী বুড়ি খুব চতুর, মাথা নাড়ে, তোদের কথা বলবে কেনরে? তোর মেয়ের যৌবন কি আছে, খসে গেছে, ওরে তুই দেখেছিস?

ক্লান্ত চোখে রেবা মেয়ের দিকে তাকায়। মেয়ে মুখ নামিয়ে রেখেছে দুই হাঁটুর মধ্যিখানে। দুটি হাত কানে চাপা ছিল এই কয়েক দণ্ড আগেও, এখন সেই প্রতিরোধটুকুও ভেঙে গেছে যেন।

পার্বতী বুড়ি চাপা গলায় বলে, এই বয়সের মেয়ের এমন চেহারা হয়। গায়ে তো শুধু হাড়, মাংস না থাকলে কী দেখে পছন্দ করবে?

তবে! রেবা বিভ্রান্ত হয়ে যেন আত্মসমর্পণ করে বসে পার্বতীর কাছে।

বুড়ি হাসল, সে ব্যবস্থা আমি করব, অন্নজল পড়লে, দুধ ঘি পেলে আবার ওর রূপ ফিরে আসবে, তাছাড়া এই সময় দেহ তো পুরুষ মানুষ যাঁচে, যাঁচে না?

হ্যাঁ। অস্ফুট উত্তর করে রেবা, তারপর বলল, সেই বণিকের বয়স কত?

মাথা নাড়ে পার্বতী, কত, কী জানি কত? পুরুষ মানুষের বয়স দেখে কী হবে, সোনা-দানা আছে অনেক।

বুড়ো বণিক?

বুড়ো হোক আর না হোক, তাতে তোদের কী? হীরে, মাণিক মুক্তোর কারবারি, ওই কারবারিরা খুব শান্ত হয়, ঠাণ্ডা হয়।

কে বলেছে?

আমি জানি, মুক্তো তো সমুদ্রে মেলে, সমুদ্র ঠাণ্ডা।

মুক্তো কোন সমুদ্রে মেলে?

বুড়ি মাথা নাড়ে, বলে, কোন সমুদ্র মানে?

রেবা বলল, তুমি মুক্তো দেখেছ?

দেখেছি, কেন দেখব না?

কোথায় দেখলে?

উদ্ধবের হাতে, তার অঙ্গুরীয়তে একটি মুক্তো আছে, শাদা।

রেবা বলল, মুক্তোর কথা জানত ধ্রুবপুত্র।

খ্যাখ্যা করে হাসে বুড়ি, আবার সেই কথা, ওরে সেই শয়তান তোদের মায়ায় বেঁধেছে, তারে ভেবে ভেবেই তোরা মা মেয়ে একসঙ্গেই মরছিস, তোর লজ্জা করে না তার নাম নিতে, ও রেবা বল!

রেবা হতচকিত হয়ে বুড়ির দিকে চেয়ে থাকল। এ কেমন কথা? কী বলতে চায় বুড়ি? অপমানে, লজ্জায় রেবার মুখ কালো হয়ে গেল। কী ভয়ানক কথা বলছে বুড়ি! বুড়ি আবার বলছে, ধ্রুবপুত্র মা

মেয়ে দুজনকে ইন্দ্রজালে বেঁধেছে। দু'জনে একসঙ্গে বসে, একই সময়ে ওই পুরুষমানুষটার কথা ভাবে। স্বপ্ন দ্যাখে। দেখিস না রেবা তুই? তোর স্বপনে কি আসে না ধ্রুবপুত্র? ওই যে তোর মেয়ে, সে ধ্রুবপুত্রের জন্য ক্ষয় করছে নিজেকে।

রেবা আর্তনাদ করে ওঠে, কী বলছ পিসি তুমি?

আমি কি বুঝিনে কিছু, তোদের আমি দেখছি না, তোর স্বামী যুদ্ধে গিয়ে ফিরল না, ঘরে পুরুষমানুষ না থাকলে যা হয় তাই হয়েছে, তোরও তো যৈবনে আগুন আছে, আছে, এখনো আছে।

না! কেঁদে উঠেছে রেবা। ঝরঝর করে তার চোখের জল গালের উপর ছড়িয়ে যাচ্ছে, সে মুখ নামাল। তখন ধ্বস্ত গন্ধবতী মুখ তুলে বলল, তুমি যাও দাদিমা।

যাব তো, বসে থাকতে এয়েচি?

গন্ধবতী মাকে জড়িয়ে ধরল, মা তুমি কেঁদ না, সে বোধহয় আর ফিরবে না।

কার কথা বলিস?

গন্ধবতী বলল, ধ্রুবপুত্র, ফিরবে না মা, হয়ত এইজন্য ফিরবে না।

কী জন্য?

গন্ধবতী ফিসফিস করল, এইজন্য, মা এখন বুঝছি সে ফিরছে না কেন?

তুই কি আমাকে অবিশ্বাস করিস?

না মা, তুমি আমার মা তো।

তবে ওকথা বলছিস কেন?

গন্ধবতী কাঁদল, কাঁদতে কাঁদতে বলল, জানিনা কেন বললাম, দাদি বুড়ি না গেলে আমি বলতেও পারব না, বুড়িকে আমার ভয় লাগছে।

পার্বতী বুড়ি দুলছিল রোদের দিকে চেয়ে। মুখখানি ধারালো, অতি-ভয়ানক হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। এতক্ষণে যেন সফল হয়েছে বুড়ি। মা মেয়ের ভিতরে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে সেই তৃপ্তিতে বুড়ি গুন গুন করছে .....।

বর নেই কো ঘরে, যৈবন গেল মরে,
সুরজ ঠাকুর বসে থাক, দেব থরে থরে।
আমার বর গিয়েছে মরে, কেউ নাইকো ঘরে
স্বপনে দেখি পুরুষ মানুষ, ঘুমায় বুকের পরে।
আমার ঘরের ভিতর আগুন জ্বলে, সেই আগুনে পুড়ি

কী গান মা? গন্ধবতী ফিসফিস করে।

সব মিথ্যে, তুই ছাড়া আমার কেউ নেই।

মা, যে গণিকার রূপে ভুলেছিল, সেও নাকি ওর চেয়ে বয়সে বড়?

রেবা বলল, পুরুষমানুষ কিসে ভোলে, কিসে ভোলে না কে জানে?

মা, তুমি কি সত্যি বলবে?

কী বলব?

ও তোমার দিকে কী চোখে তাকাত?

ও তো আমার সন্তানের মতো।

তুমি কি টের পেতে কিছু মা, ওকি সেই লজ্জায় ফিরছে না, সেই লজ্জায় উজ্জয়িনীর গণিকার কাছে গিয়ে পড়েছিল, মা পুরুষমানুষ কিসে ভোলে কে জানে, তুমি মা সত্যি বলবে?

তখন গুনগুন করতে করতে রোদের ভিতর নামল পার্বতী বুড়ি। এখন সে যাচ্ছে, আসবে পরে আবার।

বাহান্ন

বুড়ি পার্বতী চলে গেছে। মা মেয়ে এখন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে আছে দূরে দূরে। কত সময়। রোদ এখন পড়ন্ত। আজ তা হলে সূর্যদেব থেকে গেলেন না আকাশে, যে ভয় ছিল তা গেল।

কিন্তু ধরা যাচ্ছে সূর্যদেবের রথের গতি কমেছে। সূর্যদেবের সাতঘোড়ার কোনো কোনোটি হয় বুড়ো হয়েছে। অক্ষয় যৌবন যে অশ্বযূথের, তাদের পায়ের গতি কমেছে, তেজ কমেছে। কত সময় লাগাচ্ছে তারা আকাশের পূর্বদিগন্ত থেকে পশ্চিমদিগন্তে সূর্যদেবকে বয়ে নিয়ে যেতে। এখন অন্ধকার এলে মা মেয়ে দুজনেই যেন বাঁচে। পরস্পরের মুখ দেখতে হয় না। গন্ধবতীর ঠাকুর্দা কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ান সমস্ত দিন তার ঠিক নেই। বুড়োমানুষটার মাথার ঠিক নেই চারদিকের অবস্থা দেখে।

রেবা ডাকল মেয়েকে, উঠবিনে তুই?

উঠে কোথায় যাব?

জল আনতে যাবিনে গম্ভীরায়?

তুমি যাও।

তোকে একা রেখে যাব?

কী হবে, শৃগালেও খাবেনা মা।

রেবা বিষণ্ণ গলায় বলল, এমন কথা বলিস কেন?

তখন গন্ধবতী মুখ তুলল, মায়ের চোখে চোখ রেখে বলল, আমাকে তো মুক্তোর কথা বলেনি ধ্রুবপুত্র।

আমি তোর জন্য সপ্তলহরীর হারের কথা বলছিলাম তোর ঠাকুর্দাকে, তখন সেখানে ছিল সে, মুক্তোর কথা কত জানত!

মা তুমি তো আমাকে বলনি সে মুক্তোর কথা বলেছিল।

কী বলব, বলার কথা তো মনে হয়নি।

তোমাকে সে আলাদা করে বলত?

চমকে ওঠে রেবা, বলল, তুই কি ওই বুড়ির কথা সত্য মনে করলি?

সত্য যেন না হয়, বাবার কথা তো বল না মা।

কী বলব, কার কাছে?

কেন আমার কাছে।

তুই তো বলবি তোর বাবার কথা।

আমি তো বলি।

আমি তেমন ধ্রুবপুত্রের কথা বলি, সেও তো নিরুদ্দেশে, রেবা বলল।

তুমি ধ্রুবপুত্রের কথা কেন বলো?

বলব না, বললে তোর মন শান্ত হয়।

আর তো শান্ত হবেনা মা, মনে যে আগুন জ্বলল।

কী বলিস?

মা, তুমি কি সত্য বলছ?

এবার রেবা অশান্ত হয়ে ওঠে, তুই কেমন মেয়ে, তোর কপালে যে কী আছে, কী হবে যে তোর, সে যদি ফিরে আসে, তবে এই মন নিয়ে দাঁড়াবি কী করে, সে তো আমার সন্তানের মতো।

সন্তান কি সত্যি মা, সে তো ঠাকুদ্দার সখাপুত্র।

ঠাকুদ্দার সখা হলেও, তার বাবা ছিল তোর বাবার চেয়ে দু-চার বছরের বড়, আসলে সে তোর ঠাকুদ্দার পৌত্রবৎ।

গন্ধবতী বলল, তোমার প্রতি তার অন্ধ অনুরাগ ছিল মা।

থাকবে, আমি তার মায়ের মতো।

বলতে বুক কাঁপছে না মা তোর?

কী বলছিস তুই মেয়ে, তুই কি পাগল হলি?

আমি এখন বুঝতে পারছি তার নানা আচরণের অর্থ। বিড়বিড় করতে করতে গন্ধবতী নেমে এল উঠোনে, ধুলোমাটিতে উবু হয়ে বসল, বসে মায়ের দিকে ফের মুখ তুলে তাকায়, বলল, সে তোমারই অনুরাগী ছিল শুধু।

রেবা বলল, সুগন্ধা, তুই কথা বদলা, থাক ওসব, আমার শুনতে ভাল লাগছে না, যার স্বামী যুদ্ধে

গিয়ে ফেরে না, তার কেউ থাকে না জগতে, আমার কেউ নেই, ছিল একটা মেয়ে, সে আমার কাছ থেকে সরে গেল ওই অতদূরে।

গন্ধবতী বলল, ভাগ্যিস রাত হলো।

তুই থাম।

রাত না হলে তুমি লুকোতে কোথায় মা?

বুড়ির কথায় তোর এত বিশ্বাস হলো, আমি তোকে পেটে ধরেছিলাম, আমার কথা কি একটুও সত্যি না? আমি কী পাপ করেছি?

গন্ধবতী ধুলোমাটিতে তর্জনী দিয়ে দাগ কাটছিল। দাগ কাটতে কাটতে পুরনো কথা মনে করতে চাইছিল। যখন এত রোদ ছিল না, যখন আকাশে মেঘ ছিল, যখন শীত ছিল, কুয়াশা ছিল, যখন হেমন্ত ছিল, বসন্ত ছিল, যখন ছিল ধ্রুবপুত্র, সেই সময়ের কথা মনে করতে চাইছিল গন্ধবতী কিন্তু পারছিল না। কী অদ্ভুত! কিছুই মনে পড়ছিল না। যা মনে পড়ছিল তা মায়ের সঙ্গে ধ্রুবপুত্রের কিছু কথোপকথন। হায়রে! সে কিছুই বোঝেনি, বুঝেছিল ওই বুড়ি। এখন ধরতে পারছে মা মেয়েকে এড়াতে ধ্রুবপুত্র উজ্জয়িনীর গণিকার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। তারপর সেখানে অপমানিত হয়ে ঘরে ফিরেও থাকেনি মায়ের জন্যই। মা রেবার সঙ্গে সত্যি যদি সম্পর্ক কিছু হয়ে থাকে, তবে তো তা ভয়ানক লজ্জার। ধ্রুবপুত্র উজ্জয়িনীতে ফিরবে না সেই লজ্জায়। এ তো ভীষণ পাপ। মা বলে ডাক দিয়ে..... গন্ধবতী দেখল মাথা নামিয়ে বসে আছে রেবা।

গন্ধবতী বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করি মা?

কর, তুই আমাকে যা জিজ্ঞেস করতে চাস করে নে, আর জন্মে কোন পাপ করেছিলাম, তার ফল ভোগ করছি এজন্মে।

পাপটা এজন্মেও তো হতে পারে।

মাথা তুলল রেবা, ভাঙা গলায় বলল, পারে, তুই যখন বলছিস পারে, এর থেকে রেহাই দিতে পারে মরণ।

মা, ওসব বলো না, তুমি মরলে আমি কার কাছে যাব?

তা যদি জানিস, তবে ওসব কথা বলিস কেন?

মা, তুমি আমার সখী হয়ে বলো সব।

আমার কিছু বলার নেই।

কার্তিককুমার, আমার বাবার কথা মনে পড়ে?

পড়ে।

স্বপনে আসে তোমার স্বামী?

রেবা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, ফিসফিস করে বলে, কই নাতো, কতদিন আসেনি স্বপনে!

ধ্রুবপুত্র?

রেবা জিজ্ঞেস করল, তোর স্বপনে আসে না ধ্রুবপুত্র?

জানি না মা, ঘুমের ভিতর কত কী দেখি, সব মনে থাকে না।

ভোরের স্বপনে আসে না সে?

তোমার কথা বলো, তুমি কিছু লুকিয়ো না, আমাকে প্রতারণা করো না মা।

রেবা মাথা নিচু করে থাকল, তারপর বলল, এসেছিল সে।

কবে, কই বলনি তো।

ভুলেই গিয়েছিলাম, আর এতো স্বপনের কথা, সত্যি নয়।

গন্ধবতী বলল, কেমনভাবে এসেছিল ধ্রুবপুত্র?

দুয়ারে এসে ডাক দিল রেবা মা, জল দাও।

আশ্চর্য! সে তোমাকে মা ডাকে, কিন্তু তুমি ...., নাকি সে?

চুপ কর সুগন্ধা, পাপের কথা ভাবিস নে, সে এসেছিল দুমড়ে মুচড়ে, তার সমস্ত দেহটাই যেন জল চাইছিল, বহুপথ পার হয়ে জলের জন্য সে এসেছিল আমারই কাছে, কী দীনভাব ধ্রুবপুত্রের! এত দীন

আমি তাকে দেখিনি কখনো।

তারপর?

জল তো দিতে পারিনি।

সে কী, কেন?

কোথাও এক বিন্দু জল ছিল না, যেমন নেই এই অবন্তীদেশে।

আমি তখন কোথায় ছিলাম মা?

ঘুমিয়েছিলি আমার পাশে।

তা হলে কি সত্য, সে এসেছিল লুকিয়ে? গন্ধবতী জিজ্ঞেস করল।

রেবা বিড়বিড় করে, বলছি তো এ হলো ভোরের স্বপ্ন, ঘুম ভেঙে দেখি আলো ফুটছে, পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে।

সে কি রাতের অন্ধকারে এসেছিল?

রেবা বোঝে গন্ধবতী তার কথা বিশ্বাস করছে না পুরোপুরি। সে বলছে স্বপ্নের কথা, গন্ধবতী ভাবছে বাস্তবটাকে স্বপ্নের আড়ালে নিয়ে যেতে চাইছে মা। রেবা বিড়বিড় করে, কোথাও এক বিন্দু জল ছিল না, জল না পেয়ে সে চলে গেল!

তুমি তাকে বসিয়ে রাখোনি কেন?

রেবা জবাব দিল না। গন্ধবতী অন্ধকারে মায়ের মুখ দেখতে চাইল স্পষ্ট করে। বুঝতে পারছিল না কোন রেখা ফুটে উঠেছে মায়ের চোখে। তারার আলোয় মায়ের মুখ যেন আরো অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার কাছে। গন্ধবতী আবার জিজ্ঞেস করল, তাকে বসিয়ে আমাকে ডেকে তোলনি কেন মা?

রেবা জবাব দিতে পারছিল না। তাহলে ঘটনাটি মিথ্যে নয়, সত্য? তার কেমন বিভ্রম লাগছে। বাস্তব অবাস্তবের তফাৎ ধরতে পারছে না। সে কি স্বপ্নের কথা বলছিল, নাকি যা ঘটেছিল তাই-ই বলছিল? গন্ধবতী বিড়বিড় করছিল, কেন ডাকনি মা, আমি গম্ভীরা থেকে জল এনে দিতাম।

ঘুমিয়েছিলি তুই?

কখন এসেছিল সে?

শেষ রাত্রে, আমি তার ডাক শুনে বেরিয়ে এসে দেখি উঠোনে বসে আছে এক দীন ভিখারি, শেষরাত্রে চাঁদের আলো ছিল, কৃষ্ণপক্ষ ছিল, আলোয় দেখলাম তাকে, কিন্তু এতো সত্যিই স্বপ্নের ঘোর।

না, সে এসেছিল, বুড়ি দাদি যা বলেছে তা সত্যি।

রেবা বলল, আমি তো স্বপনের কথাই জানি।

এভাবে সত্যকে আড়াল করোনা মা, তাকে কতদিন খোঁজা হচ্ছে, তার জন্য সবাই বসে আছি, দশার্ণদেশের জ্যোতির্বিদ গণনা করে দেখছে সে কোথায় থাকতে পারে, অথচ সে কিনা লুকিয়ে দেখা করে যায় তোমার সঙ্গে।

রেবা বলল, সত্যিই কি তোর ঘুমের ভিতরে সে এসে দাঁড়ায় না?

না মা, কী করে সে আসবে, সে যে তোমাকেই জানে।

রেবা কপালে হাত দিল। তার মাথা কাজ করছে না। গন্ধবতীর কথার মর্ম ধরতে পারছে না সে। সে নিজে বুঝতে পারছিল না যে ঘটনার কথা বলছে তা সত্য নাকি মায়া? স্বপ্ন তো মায়া। মায়ায় ভুলিয়েছে তাকে ধ্রুবপুত্র। রেবার ভয় করছিল তাহলে কি বুড়ি পার্বতীর কথা সত্য হতে যাচ্ছে? কবে কোন কালে স্বপ্ন দেখেছে তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী কার্তিককুমারকে তা মনে পড়ে না। অথচ ধ্রুবপুত্র যে প্রায়ই হানা দেয় মাথার ভিতরে। কেন আসে সে? স্বপ্নের ভিতরে কি কেউ ইচ্ছে করে হানা দিতে পারে? স্বপ্নের ভিতরে প্রবেশ করে নিজেকে জানান দিতে পারে? যে কথা মুখ ফুটে বলতে পারেনি ধ্রুবপুত্র, তা কী......? কেঁপে উঠল রেবা। কথাটি সম্পূর্ণ ভেবে উঠতে পারল না।

গন্ধবতী বলল, কত সময় ছিল সে?

মনে নেই আমার।

কোনদিকে গেল সে?

উঠোন পার হয়ে পথে নামল।

তারপর? তুমি তাকে নিবৃত্ত করতে পারলে না?

রেবা বলল, থাক সুগন্ধা, থাক এসব।

গন্ধবতী বিষণ্ণ হয়ে বলল, আমি আর তার জন্য অপেক্ষা করব না মা, সে তোমার কাছে এসে ফিরে যায়, আমাকে ডাকে না জলের জন্য।

ওরে সে হলো স্বপ্নের ঘোর, ঘুমের ভিতর।

আমারও তো ঘুম থাকে, ঘোর থাকে, তার ভিতরে সে আসেনা তো কখনো, কতদিন সে আসে না, আমি আর তার জন্য পথের দিকে চেয়ে থাকবনা, তুমি থাকো তার পথ চেয়ে।

কী কলঙ্কের কথা বলিস তুই মেয়ে, তোর বাবা?

দুই পুরুষের জন্যই পথের দিকে চেয়ে থাকো মা।

তখন রেবা বলল, তুই শুধু শুধু আমাকে অপরাধী করছিস মেয়ে, তেমন কিছু না, যদি বলি বুড়ো মুক্তোর ব্যাপারির কথা মনে ধরেছে তোর।

কী বলছ মা?

বুড়ি পার্বতী কি আগে তোকে বলেছিল?

বলেছিল, সেদিনই তো গম্ভীরায় বলছিল আমাকে আলাদা টেনে নিয়ে গিয়ে।

বলিসনি তো?

বলিনি, বলতে ভয় করছিল।

তুই কি মুক্তোর ব্যাপারিকে চিনিস?

না, মা কী করে চিনব?

সে কি উদ্ধবনারায়ণ নিজেই?

তাই বা কী করে জানব, তবে সে ধনী, আর তার বয়স অনেক।

উদ্ধব তাহলে কীভাবে জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে।

সেই নারী সংগ্রহে বেরিয়েছে।

দুই হাতে কান চাপল রেবা, তুই কী করে মুক্তোর ব্যাপারির কথা ভেবে ধ্রুবপুত্রকে ভুলিস, তুই কি সত্যিই.... সত্যি যদি হবে তবে বুড়ির কথায় ক্রোধ প্রকাশ করলি কেন, আমার সব ভুল হয়ে যাচ্ছে।

গন্ধবতী মাথা নামিয়ে থাকল বহু সময়। মা মেয়ে চুপ করে থাকল অনেক সময়। তাদের ভিতরে অন্ধকার গাঢ় হতে লাগল। অনেক বাদে গন্ধবতী ফিসফিস করল, আমি তাকে কত ডেকেছিলাম, ফেরেনি কেন ধরতে পারছি এখন।

না, সে তো স্বপনের ঘোরে এসেছিল, তুই যা ভাবছিস তা সত্য নয়।

গন্ধবতী বলল, সে চলে গেল গম্ভীরার পাড় ধরে, কোনো ডাকই শুনল না, আমাকে সে ভালই বাসে না মা, তাই তোমার স্বপনে আসে।

তুই ভালবাসিস?

গন্ধবতী বিড়বিড় করে, একার ভালবাসার কী দাম মা?

রেবা বলল, আমাদের ভাগ্য, তোর বাবা যদি বেঁচে থাকে, সে ফেরেনা কেন, সে অন্যকোথাও যদি সংসার পেতে থাকে, আমরা মিছেই মরি তাকে ভেবে, চ, সুগন্ধা আমরা ওই বুড়ো বণিকের সঙ্গে চলে যাই মা মেয়ে।

গন্ধবতী বলল, তুমি মুক্তোর কথা বলবে বলছিলে না, তোমাকে আর কিসের কথা বলত ধ্রুবপুত্র?

অশ্বের কথা বলত, হস্তির কথা বলত, সেই বাহ্লিক দেশের পীতবর্ণের রেশমের কথা বলত, নানা রত্নের কথা বলত।

কখন বলত?

যখন সবাই ঘুমিয়ে যেত, তুই ও ঘুমিয়ে পড়তিস, তখন।

তুমি তো কখনোই বলনি।

বলিনি, আমি জানতাম ও তোকে বলত সব কথা, সেই যে পাণ্ড্যদেশের তাম্রপর্ণীনদী আর সমুদ্র সঙ্গমে পাওয়া তাম্রপর্ণিক মুক্তো, হিমালয়ে উৎপন্ন হৈমবত মুক্তো, মহেন্দ্র পর্বতের নিকটে সমুদ্রে উৎপন্ন

মাহেন্দ্র মুক্তো, মুক্তোভূষণ ইন্দ্রচ্ছন্দ, বিজয়চ্ছন্দ, নক্ষত্রমালা ....।

আমি কিছুই জানি না মা, এতদিনে বুঝেছি সে কেন চলে গেছে, গণিকার চেয়েও আমি তুমি দু'জনেই দায়ী।

আমি দায়ী নই, সে ছিল সন্তানের মতো।

আমার কোনো বিশ্বাস নেই মা। গন্ধবতী প্রায় কেঁদে উঠল যেন।

তখন আঙিনার বাইরে ঠাকুর্দা শিবনাথের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। সঙ্গে আর একজন রয়েছে। কে সে? ধ্রুবপুত্র? মুক্তোর ব্যাপারি বৃদ্ধ বণিক, নাকি আবার উদ্ধব? নাকি। বুক থরথর করে কেঁপে উঠল গন্ধবতীর। তাহলে কি এল তাম্রধ্বজ? তার কণ্ঠস্বরটিও যেন ধ্রুবপুত্রের মতো শোনা যায়। আজ অন্যরকম মনে হচ্ছে। মা মেয়ে উঠে দাঁড়াল। তারা বাঁচল। তারা ক্রমশ অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে প্রবেশ করছিল সেই অপরাহ্ন থেকে। সন্ধের পর থেকে।

গন্ধবতী ছুটে গেল, কে?

দীপ জ্বালোনি, আলো জ্বালো মা গন্ধবতী, আচার্য বৃষভানুর শিষ্য এসেছেন, তাঁকে বসতে দাও, জল দাও তিনি তৃষ্ণার্ত।

গন্ধবতী তখন জল আনবে নাকি আলো জ্বালবে আগে তা ভেবে উঠতে পারছিল না।

তিপ্পান্ন

রাত্রিকালে এল কেন তাম্রধ্বজ? এখন কত সময়ই বা বসবে, কখনই বা যাবে? রেবার মনে জিজ্ঞাসাটা জেগে উঠতেই তা যেন টের পায় আচার্য বৃষভানুর শিষ্য, অন্ধকারে স্মিত হেসে বলল, আমি তো অন্ধকারে দেখতে পাই তা আপনি কি জানেন না মা রেবা?

রেবা বলল, জানি, কিন্তু হিংস্র নিশাচর প্রাণী রাত্রিকালে সক্রিয় হয়ে ওঠে, তা ছাড়া দস্যু, তস্কর তো রয়েছেই।

তাম্রধ্বজ বলল, আমার কাছে তো কিছুই নেই, কী নেবে তারা?

তবু ভয় করে।

তাম্রধ্বজ হেসে উঠল, আমি রাত্রিকালে হাঁটাই পছন্দ করি, তখন শারীরিক শ্রম কম হয়, আকাশের তারারা পথ চেনায়।

রেবা হেসে বলল, তোমার সব আলাদা।

এই রকম যখন কথা হচ্ছিল গন্ধবতী বসেছিল তার ঠাকুর্দা শিবনাথের পিছনে। দূর থেকে দেখছিল সে জ্যোতির্বিদকে। তাম্রধ্বজ সত্যিই তৃষ্ণার্ত ছিল, কিন্তু তাকে তৃষ্ণার জল দিল মা, সে জ্বালালো প্রদীপ। তৃষ্ণার্ত পুরুষকে জল দেওয়ায় যে সুখটুকু, তা যেন তার কাছ থেকে অপহরণ করে নিয়েছে মা। প্রদীপ তো শুধু শুধু জ্বালানো হল। বাতাসে নিভে গেছে। আর প্রদীপ জ্বালাতে কত সময়ই বা গেল! মা তখন তাম্রধ্বজকে অমৃত ফল দিল ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য। মা-ই দিল, সে হাতে ধরে দিতে পারল না। এখন তার মনে পড়ে যাচ্ছে ধ্রুবপুত্রকে মা কীভাবে তার কাছ থেকে গোপনে সরিয়ে নিয়েছিল। নিয়েছিল নিশ্চয়। রাত জেগে রত্নের কথা, অশ্বের কথা, বাহ্লিক দেশের পীতবর্ণের রেশমের কথা গন্ধবতী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। এখন তাম্রধ্বজ তো তার গণনার ফল ঘোষণা করবে, জানাবে কোথায় আছে কার্তিককুমার, কোথায় ধ্রুবপুত্র। গন্ধবতী আকাশে তাকাল, উত্তরে ধ্রুবনক্ষত্রকে দেখল। দেখতে দেখতে তাম্রধ্বজও মায়ের হাস্য পরিহাস শুনতে পেল। সে বুঝতে পারছিলনা মা কী চায়? মা কি চায়না তার স্বামী ফিরে আসুক। প্রোষিতভর্তৃকা স্বামীর কথা ভুলে যাচ্ছে? গন্ধবতী উঠে দাঁড়াল, নিঃশব্দ চরণে এগিয়ে গেল মায়ের দিকে। মায়ের কাছে এসেছিল ধ্রুবপুত্র, জল চেয়েছিল। মা দিতে পারেনি, তাই তাম্রধ্বজকে নিজ হাতে জল দিয়ে তার তৃষ্ণা নিবারণ করে মা সেই দুঃখ থেকে মুক্ত হলো? মা তাকে হিংসা করে নাকি? মা কি তাকে সরিয়ে দিতে চায় যেমন সরিয়ে দিয়েছিল ধ্রুবপুত্রর কাছে থেকে? ধ্রুবপুত্রর কথা মনে পড়ল গন্ধবতীর। আবার ক্রোধাগ্নিতে সে জ্বলে উঠল। ধ্রুবপুত্র তাকে যেন দেখতেই পায়নি, চিনতেই পারেনি সেই বসন্তের রাতে। অপরাধবোধে ধ্রুবপুত্র পালিয়ে গেছে উজ্জয়িনী ছেড়ে, আর ফিরবে কী করে? সে ভালবাসে গন্ধবতীকে, রেবা মা যদি সেখানে দেওয়াল হয়ে দাঁড়াতে চায়, রেবা মা যদি তার

মেয়ের কাছ থেকে সরিয়ে নিজের কাছে টেনে নিয়ে যেতে চায় ধ্রুবপুত্রকে, তা টের পেলে কী করে আর ফেরে সেই বিদ্বান, পরম রূপবান পুরুষ।

গন্ধবতী হাত রাখল রেবার কাঁধে। রেবা শিহরিত হলো মেয়ের ছোঁয়ায়। চমকে ঘুরে তাকায় সে। দেখল মেয়ের চোখ জ্বলছে। উত্তেজিত গন্ধবতীর নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। রেবা বুঝল দুপুরের বিষবায়ুতে গন্ধবতী এখনো আচ্ছন্ন। সে মাথা নামিয়ে সরে এল। নিজেকে নিয়ে যে কী করবে? মেয়ের যৌবন নিস্ফলা কেন ব্যর্থই হয়ে যাচ্ছে। সেই ব্যর্থতা থেকে মেয়ের মন হয়ে গেছে দুর্বল। দুর্বল মনে ব্যাধির প্রবেশ অনায়াস হয়। তাইই হয়েছে। উকুনে বুড়ি পার্বতী ব্যাধি দিয়ে গেছে।

গন্ধবতী বলল, তুমি গিয়ে বসো মা, আমি ওঁকে ধ্রুবপুত্রর কথা জিজ্ঞেস করব, বাবার কথা যদি জানতে চাও, তুমি এস, না এলে আমি জেনে নেব।

তাম্রধ্বজ কাষ্ঠাসনে বসে ঠিক শুনতে পায়নি গন্ধবতী আর তার মায়ের কথা। দেখল নিঃশব্দে গন্ধবতীর মা সরে যাচ্ছে সম্মুখ থেকে। গন্ধবতী তার মুখোমুখি বসল উঠোনের ধূলায়। মাথা নামিয়ে বসে থাকল। সে যেন তাম্রধ্বজকে আড়াল করে নিশ্চিন্ত হলো।

রেবা বসল শিবনাথের কয়েক হাত তফাতে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর। শিবনাথ তাকে বলল, ধ্রুবপুত্রের খোঁজ পেয়েছে বোধহয়।

পেয়েছে! রেবা আনন্দিত হলো, আপনাকে বলেছে?

বলেনি, তবে মনে হলো, দেখা যাক ও কী বলে।

আসেনি কেন অনেকদিন?

গণনা শেষ হয়নি তাই হয়ত, আর আচার্য বৃষভানুর খবর ওকে খুব দমিয়ে দিয়েছে, আশ্রমশূন্য হয়ে গেছে তো।

কোথায় গেলেন আচার্য?

ও তাকে খুঁজতে বেরিয়েছিল।

পায়নি?

মাথা নাড়ল শিবনাথ, তারপর বলল, আমার তো মনে হয় তাম্রধ্বজ নিজেও চলে গিয়েছিল, উজ্জয়িনী ক্রমশ মনুষ্যবিরল হয়ে যাবে, কেউ থাকবে না।

এই অবন্তী দেশ?

হয়ত এই অবন্তীও, গম্ভীরা নদী যদি শুকিয়ে যায়, তবে মানুষ এখানে থাকবে কীভাবে?

নদী কি নির্জলা হয়ে যাবে?

হয়ত, বৃষ্টি না হলে আর কতদিন সজীব থাকতে পারবে!

রেবা বলল, সূর্যদেবের রথের চাকার কথা জানেন, শুনেছেন বাবা?

শুনেছি, তাম্রধ্বজ কী বলে শুনি।

রেবা জিজ্ঞেস করল, ও যদি চলেই গিয়েছিল, ফিরল কেন?

কথাটি বলে রেবা নিচু হয়ে দুহাতে আঙিনার কঠিন মৃত্তিকা ধারণ করল। তার জিজ্ঞাসাটি সঙ্গত নয়। তাম্রধ্বজ এসেছে বলে কি সে খুশি নয়? তাম্রধ্বজ তো তৃষ্ণার্ত ধ্রুবপুত্রের খবর আনবে। রেবার এখন মনে হচ্ছে স্বপ্নটি হয়ত স্বপ্ন ছিল না, বাস্তবেই যেন ঘটেছিল। ধ্রুবপুত্র এসেছিল রৌদ্রপীড়িত হয়ে, তৃষ্ণার্ত হয়ে। জল না পেয়ে ফিরে গেছে। দুঃখটি তাকে ঘিরে ছিল গোপনে। ঘিরে আছে অনেকদিন। গোপন দুঃখটি তাকে কি একধরনের সুখ দিত? ধ্রুবপুত্র তার স্বপ্নে এসেছিল। তারই স্বপ্নে। গন্ধবতী তো কোনো স্বপ্নের কথা বলতে পারে না। রেবা ঠিক করতে পারছে না সে কী চায়। ধ্রুবপুত্র তার কে? ধ্রুবপুত্র তার কন্যার দয়িত। ধ্রুবপুত্রের অপেক্ষায় থেকে গন্ধবতী শীর্ণ হচ্ছে দিন দিন। তাম্রধ্বজ আসা মানে ধ্রুবপুত্রের কোনো না কোনো সংবাদ আসা। সে কি তাম্রধ্বজকে স্বপ্নটির কথা বলবে? ধ্রুবপুত্র আমার সন্তানের মতো, সে আমার কাছে এল তৃষ্ণার্ত হয়ে, গন্ধবতীর কাছে গেল না, তবে কি সে ভুলে গেল গন্ধবতীর কথা? সেই যে পুরুবংশের রাজা দুষ্মন্ত আর মালিনীনদীতীরের কণ্বমুনির আশ্রমে প্রতিপালিতা কন্যা শকুন্তলার কাহিনী বলেছিল ধ্রুবপুত্র একদিন বহুরাত্রি পর্যন্ত, শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিল গন্ধবতী ভয় পেয়ে, সেই রাজার মতো ভুলে গেল না তো ধ্রুবপুত্র গন্ধবতীকে। রাজা

দুষ্মন্ত লোক লজ্জার ভয়ে সপুত্র পত্নী শকুন্তলাকে বিস্মৃত হয়েছিল। ধ্রুবপুত্র বলেছিল অন্যকথা। দুর্বাসা মুনির অভিশাপ লেগেছিল শকুন্তলার উপর। পতিচিন্তায় মগ্ন শকুন্তলা দুর্বাসা মুনির ডাক শুনতে পায়নি। সেই অপরাধে দুষ্মন্ত ভুলল শকুন্তলাকে। গন্ধবতী কি অভিশপ্ত হলো? সে নিজেও কি অভিশপ্ত হয়েছে? তাই ধ্রুবপুত্র, কার্তিককুমার দু'জনেই ভুলেছে দুই নারীকে।

শিবনাথের কোলে রঙজ্বলা মাথার শিরস্ত্রাণটি। বুড়ো হচ্ছে যত, ততোই যেন রোখ চেপে যাচ্ছে শিবনাথের। ঘুরে ঘুরে খোঁজ নিচ্ছে ধ্রুবপুত্র এবং কার্তিককুমারের। ধ্রুবপুত্র কতদূরই বা যেতে পারে? বণিক, ব্যাপারিদের কাছে কখনো কখনো একটি সূত্রও মিলে যায়। কিন্তু একজনের বর্ণনা আর একজন নস্যাৎ করেও দেয় বারবার। শিবনাথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল পাটুলিপুত্র থেকে আসা বণিক মণিভদ্র কিংবা বৃকোদরকে। বৃকোদর বলেছিল বিদিশার পান্থশালায় তার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে মণিভদ্রর। সেই দীপাবলির সময়ের খবর। এতদিনেও কি মণিভদ্র খবর পায়নি? আজ শিবনাথ মণিভদ্রর কথা বলবে তাম্রধ্বজকে। মণিভদ্র তো দশার্ণদেশ, বিদিশা সংবাদ হয়েই উজ্জয়িনীর পথে আসবে, অথবা অন্য কোনো দিকে যাবে, বিদিশার পান্থশালাতেই খবর পাবে তার জন্য অপেক্ষা করছে একজন উজ্জয়িনীতে। মণিভদ্রই নাকি দেখেছিল ধ্রুবপুত্রকে পথে।

রেবা ডাকল, বাবা, গণনা কি শেষ হয়েছে জানেন?

মাথা নাড়ল শিবনাথ, জিজ্ঞেস করিনি, দিনকাল অতি ভয়ানক হয়ে যাচ্ছে রেবা মা, কী যে হবে এরপর।

সত্যিই কি দিন ফুরোবে না?

কী জানি, তবে রাজা কলুষিত করেছেন মহাকাল মন্দিরকে, এতো সত্য।

তাহলে আমরা কী করব?

জানি না, একজন বলছিল যখন দিন ফুরোবে না, তাপে, ভয়ানক আলোয় সমস্ত মানুষ অন্ধ হয়ে যাবে।

এ আপনি কী বলছেন বাবা?

এই রকমই তো শোনা যাচ্ছে, আমার মনে হয় বণিকরা আর আসবে না উজ্জয়িনীতে, ভেবেছিলাম বর্ষার আগে হয়ত মণিভদ্র এই পথে যাবে সৌরাষ্ট্রর দিকে, মণিভদ্র কে তা বুঝতে পেরেছো তো মা?

মাথা কাত করে রেবা। কিন্তু ভেবেই পায় না আগের প্রোষ্টপদে আসা সেই বণিক নতুন কি সংবাদই বা আনবে? সে নাকি ধ্রুবপুত্রের মতো কাউকে দেখেছিল শূর্পারক বন্দরের পথে। সে তো চিনত না ধ্রুবপুত্রকে। কাকে দেখেছে কে জানে? কিন্তু আশায় বুক বেঁধে আছেন গন্ধবতীর ঠাকুর্দা। কাকে দিয়ে সংবাদ পাঠিয়েছেন, মণিভদ্র যেন এবার ধ্রুবপুত্রকে সঙ্গে করেই উজ্জয়িনীতে আসবে। রেবার মায়া হলো বৃদ্ধর দিকে তাকিয়ে। এমন কখনো হতে পারে?

শিবনাথ বলল, বণিকরা যদি জানতে পারে উজ্জয়িনীর এই দশা, সূর্যদেব ছারখার করে দিচ্ছেন সোনার উজ্জয়িনীকে এখানে দিন ফুরোবে না, সূর্যের আলোর মাত্রা কমবে না, বাড়বে না, সব স্থির হয়ে যাবে, তবে কি কেউ আর আসবে?

শুনেছি নগর ছেড়ে নগরের বণিকরা চলে যাচ্ছে। বিনবিন করে বলল রেবা।

হ্যাঁ, সবাই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

এ থেকে পরিত্রাণের কোনো বিধান নেই?

শিবনাথ বলল, রাজা কলুষিত করেছেন মহাকাল মন্দিরকে, সিংহাসনকে, এ হলো মহাকালের রোষ, দেবতার রোষ কত কঠিন হয় মানুষ তা দেখছে।

রেবা জিজ্ঞেস করল, রাজার পাপে প্রজা অন্ধ হবে?

হবে, রাজার পুণ্যে যে প্রজার মঙ্গল হয় মা। বলতে বলতে বৃদ্ধ মুখ নিচু করে থাকল, বিড়বিড় করতে লাগল, হুন বিজয়ে কত সৈন্য হারিয়ে গেল, কেউ তাদের কথা ভাবলই না, কতদিন ধরে বিজয় উৎসব হয়েছিল বলো, এসব কি ন্যায়? সৈন্যরা কোথায় হারাল, মরেছে না বেঁচে আছে শত্রুর হাতে বন্দি হয়ে সে খবরই কেউ নিল না।

শুনতে শুনতে রেবার চোখে জল এসে গেল। রেবা অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞেস করল, আমরা যদি চলে

যাই, তবে কি ওঁদের সঙ্গে তার দেখা হবে?

না, হবে না।

তবে আমরা কী করব বাবা?

যদি সত্যিই সূর্যের রথের চাকা বসে যায়, আমাদের যেতে হবে।

কোথায় যাব, বণিকদের সঙ্গে?

তা কেন, আমরা যাব নিজেদের মতো, বিদিশার দিকে যাব মা।

দশার্ণদেশে?

হ্যাঁ, সেই দেশে, তাম্রধ্বজও তো নিশ্চিত যাবে, শোনা যাচ্ছে আচার্য বৃষভানুই বলে গেছেন কথাটা, সূর্যের রথের চাকা বসে গেলে দিনের আলো একইরকম থাকবে, খুব আলো, কমবে না, বাড়বে না, তখন মা সময়ই স্থির করা যাবে না।

কী রকম হবে?

হবে ভয়ানক, অপরাহ্ন নেই, প্রাতঃকাল নেই, উষাকালও নেই, গোধূলি বেলাও নেই, থাকবে শুধু দ্বিপ্রহর, ভয়ানক দ্বিপ্রহর!

দ্বিপ্রহরের কথা কানে যেতেই রেবার চোখের সামনে ভেসে উঠল ফুরিয়ে যাওয়া এই দিনের দ্বিপ্রহরটির ছবি। ভয়ানক রৌদ্রের ভিতরে খুনখুনে বুড়ি পার্বতী দুই হাতে মাথার উকুন খুঁজছে পাকা চুলের ভিতরে। গনগনে আগুনে মাথার উকুন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। রোদে গাছের ছায়াটিও মরে গেছে তখন।

রেবা ফিসফিস করল, শুধুই দ্বিপ্রহর!

হ্যাঁ, শুধুই তাই, ধরাই যাবে না কেটে গেল কত মুহূর্ত, কত দিবস!

আশ্চর্য! সে কেমন সময়?

তাম্রধ্বজ বলতে পারবে।

আপনি জানেন না?

অন্ধকারে লজ্জিত হলো শিবনাথ, বলল, সমস্তটা জানত সে।

কে, কার কথা বলছেন?

কেন ধ্রুবসখার পুত্র, সে আমাকে বলেছিল একটু একটু।

আপনাকে? কই, কবে কখন?

তোমরা দু'জনেই যখন ঘুমিয়ে পড়তে, তখন হয়ত কখনো, কখনো হয়ত অতি প্রত্যুষে, বায়স পক্ষী ডেকে ওঠার আগে, বিহানবেলারও আগে।

আমরা তো জানি না।

বলিনি তো।

কেন বলেননি?

এমনি! এমনি বলিনি।

রেবা অস্ফুট বিস্ময় প্রকাশ করল, বিনবিনিয়ে বলল, তাহলে সে আমাদের সকলকেই আলাদা আলাদা করে শোনাতো জগতের কথা?

হ্যাঁ, শোনো মা, ধ্রুবসখার পুত্র ছিল মহাজ্ঞানী, আমার এখন মনে হচ্ছে সে হয়ত জেনে গিয়েছিল উজ্জয়িনীর ভবিষ্যত, তাই চলে গেছে!

রেবা মাথা নাড়ে, ধীরে ধীরে বলল, না বাবা, আমার তো মনে হয় সে চলে গেছে বলেই এমন বিপাকে পড়েছে উজ্জয়িনী।

কী জানি! সে আমাকে শীতের রাত্রিতে আচমকা ডেকে তুলল, সেই যে জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে নিষ্ক্রমণ হলো তার, তার মাস দেড়েক আগে যখন এসেছিল উজ্জয়িনী থেকে, সেই সময়।

তারপর?

শীতের গভীর রাত্রিতে সে আমাকে বলল সময়ের কথা শোনাবে।

কই, আমরা তো জানি না।

জান না, কেন জানবে তোমাদের তো বলেনি, বললে হয়ত অনুভব করতে পারবে না, কত বয়স তোমার আর তোমার মেয়ের?

জ্ঞানের সঙ্গে বয়সের কী সম্পর্ক?

যখন বয়স হয়, এই যেমন আমি এই এত বছর পার করে এসে টের পাচ্ছি সময় যেন চক্ষুর পক্ষ পাতনের মুহূর্তটুকু, তারও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ, এই তো জন্মালাম আমি, চোখ দুটি মেলে অবন্তীদেশের আলো দেখলাম, মহাকাল মন্দিরের সুবর্ণ চূড়ায় প্রতিফলিত সোনার আলো উজ্জয়িনী নগরকে ভাসিয়ে দিচ্ছে প্রত্যুষে, শিপ্রানদীতে স্নান করে এলাম, বিবাহ করে নিয়ে এলাম পশ্চিমের কন্যাকে, কার্তিককুমারের জন্ম হলো, ধ্রুবসখার মৃত্যু হলো, ধ্রুবসখা আমার কত ছোট ছিল, কিন্তু ছিল প্রাণসখা—কতটুকু সময়ে এ জীবনে এসব ঘটে গেছে বলো। আমার মনে হয় হাতের মুঠি খুলতেই সময়ের ভিতরে সময় হারিয়ে গেল, বয়স না হলে এই প্রত্যয় হতো না রেবা।

ধ্রুবপুত্র তো অতি তরুণ, সে কী করে এমন ভাবে ভাববে?

সেই তো আমাকে ভাবাল, সে ছিল পরমজ্ঞানী, জ্ঞানী পুরুষের বয়স অনন্ত হয়, আমাদের একটি দিবস যেন তাদের একটি বৎসর, শোনো মা, গভীর রাত্রিতে আমাকে জাগিয়ে তুলে সে বলল, সময়ের কথা বলবে, তখন কুয়াশা অন্ধকারের ভিতরে যেন অনন্তকাল থমকে ছিল, সে বলল চক্ষুর পক্ষপাতনের এক চতুর্থাংশ যে সময়, সেখানেই সময়ের আরম্ভ, সেই যে আমি জন্ম নিয়ে দুচোখ মেলে দিয়েই চোখের পাতা বন্ধ করলাম .... সেই কবে। সময়ের ক্ষুদ্রতম অংশ হলো ওই সময়টুকু, এক নিমেষের এক চতুর্থ অংশ তারপর সময় বেড়ে যেতে লাগল, সময় প্রবাহিত হয়ে দীর্ঘ হলো, নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, নালিকা, মুহূর্ত, দিনের পূর্বভাগ, পরভাগ, দিবস, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, সংবৎসর,যুগ....।

রেবা বলল, সমস্ত কথা সে বলে গিয়েছে?

হ্যাঁ মা।

আমরা কেউ কিছুই জানি না মা মেয়ে।

বলেছিল বিনিময়ে জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়।

রেবা অন্ধকারে তাম্রধ্বজ আর গন্ধবতীর দিকে তাকায়। ওদের কথা শোনা যাচ্ছে না। রেবা ভাবল গন্ধবতীকে ডেকে আনে এখানে। হায়রে মেয়ে! সমস্ত দুপুর তাকে কীভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছে গন্ধবতী। কী ভয়ানক বিষে জ্বলছে মেয়ে তার! গন্ধবতীকে কি বলে যায়নি ধ্রুবপুত্র, বিনিময়ে জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়। যদি বলে গিয়ে থাকে, এমন ভাবে জ্বলছে কেন ও। বহুদিন বৃষ্টি না হলে মানুষ কি এই রকম হয়ে যায়?

চুয়ান্ন

গন্ধবতী বলল, আপনি শীর্ণ হয়েছেন অনেক।

না কিছু না। আকাশে তাকায় তাম্রধ্বজ।

আপনার দেহ যেন রোদে জ্বলে গেছে, এখন যদি নদী থেকে স্নান করে আসতেন, দেহ শীতল হতো।

তাম্রধ্বজ বলল, ফিরে শিপ্রার বুক থেকে জল বের করে অবগাহন করব।

যখন তাম্রধ্বজ প্রবেশ করে, সেই গোধুলির আলোতেই গন্ধবতী দেখে নিয়েছে গায়ের উত্তরীয়খানি মলিন, মাথার ঘন কুঞ্চিত কেশ রোদে পুড়ে লালচে, মানুষটা আরো কালো হয়েছে রোদে পুড়ে।

তাম্রধ্বজ বলল, ওসব কথা সত্য নয়, সত্য হতে পারে না।

জবাব দিল তাম্রধ্বজ অনেক পরে। গন্ধবতী প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিল সূর্যের রথের চাকা বসে যাচ্ছে কিনা। যে কথা চারদিকে শোনা যাচ্ছে তা সত্য হলে কী হতে পারে। দিনমান নাকি আর শেষ হবে না? মানুষ নাকি সকলে অন্ধ হয়ে যাবে?

কথার জবাব দেয়নি তাম্রধ্বজ। চুপ করেই ছিল। যে কথাটুকু গন্ধবতী বলেছে, তার টানে যে কথা না বললে নয়, সেই কথাই বলেছে তাম্রধ্বজ। অনেকক্ষণ আগে জিজ্ঞেস করা কথার জবাব দিল এই মাত্র।

গন্ধবতী বলল, চারদিকে ওই কথা রটে যাওয়ায় সবাই উজ্জয়িনী ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

জলের অভাব ঘটেছে, আকাশে মেঘের অভাব, ফসলহানি হয়েছে, তাই সকলে উজ্জয়িনী ছাড়ছে, সূর্য কি শুধু মাত্র উজ্জয়িনী আর অবন্তী দেশে আলো দেয়?

গন্ধবতী মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল তাম্রধ্বজের দিকে। ধ্রুবপুত্রও এই সময় এমন কথা বলত, এইভাবেই। তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করল, ধ্রুবপুত্র বলেনি সূর্যের কথা?

মাথা নাড়ে গন্ধবতী, নাতো।

তুমি কি জাননা সূর্য স্থির হয়ে থাকলে, সময়ও থেমে যাবে।

গন্ধবতী অবাক হয়ে শুনছে তাম্রধ্বজের কথা। সময় থেমে যাবে মানে? দিন ফুরিয়ে রাত হবে না? বলে গেছে তো বুড়ি পার্বতী। কিন্তু তখন তো মুক্তোর কারবারি এক বুড়ো বণিকের কথাই প্রধান হয়ে উঠেছিল। গন্ধবতী বলল, দিন দিনই থাকবে, রাত হবে না।

হাসে তাম্রধ্বজ, সে তো হলো, সময় আর এগোবে না তাহলে?

সে কেমন?

সময়ের কথা তোমাকে বলে যায়নি ধ্রুবপুত্র?

তখন তো এমন অবস্থা হয়নি এদেশের।

কী অবস্থা হয়নি?

সূর্যদেবের নিষ্ক্রমণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা ওঠেনি।

তাম্রধ্বজ মাথা নাড়ে, ও সব অসত্য কথা, কত লক্ষ কোটি যোজন দূরে আছে সবিতা নক্ষত্র, ওর তাপে পৃথিবীতে প্রাণ তাপিত হয়, উষ্ণ হয়, শুধু উজ্জয়িনীর আকাশেই কি সবিতা নক্ষত্রের অবস্থান?

তা নয়?

তোমাকে ধ্রুবপুত্র এসব বলে যায়নি?

কই নাতো! গন্ধবতী জবাব দিয়েই টের পায় তার জবাবটিও সত্য হলো না, এই সব কথা অন্যভাবে তার যেন শোনা ছিল, কিন্তু এ নিয়ে আর কোনো আলাপ না হওয়ায় সে ধীরে ধীরে সব ভুলেই যাচ্ছিল। ভুলে গেছে কত কথা! এখন যদি তাম্রধ্বজ সব আবার ফিরিয়ে আনতে পারে মনের ভিতরে।

তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করল, এত গ্রহ নক্ষত্রের কথা বলত ধ্রুবপুত্র, সবিতা নক্ষত্রের কথা কি বলেনি, বলেনি কি সবিতা নক্ষত্র সমস্ত জগতে আলো দেয়, তাপ দেয়?

গন্ধবতী মাথা কাত করল, ফিসফিসিয়ে বলল, হয়ত বলেছিল।

হ্যাঁ বলেছিল, তুমি সব ভুলে যাচ্ছ।

হতে পারে, তুমি বলো আবার। গন্ধবতী অস্ফুট স্বরে বলল। বলতে বলতে শিহরিত হলো।

তাম্রধ্বজ বলে, নগরের বাতাসে বহু কথা উড়ছে, এখন বৃষ্টি এসে গেলে সমস্ত রটনার ইতি হতো, বাঁচত মানুষ।

বর্ষা কীভাবে আসবে?

তাম্রধ্বজ বিষণ্ণ হয়ে বলল, আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই, কী যে হবে! তুমি আমাকে ধ্রুবপুত্রের কথা জিজ্ঞেস করছ না তো!

বলো।

আমি অবাক হচ্ছি সবিতা নক্ষত্রের স্তব্ধ হওয়ার কথা কী করে তুমি বিশ্বাস করলে, সূর্য স্তব্ধ হয়ে গেলে পৃথিবীর কোথাও কোনো যাওয়ার জায়গা থাকবে না, হয় প্রখর দিন, নতুবা গভীর রাত্রি যা থাকবে উজ্জয়িনীতে তাই থাকবে সমস্ত জগতে।

গন্ধবতী মুখ তুলল, ফিসফিস করল, আশ্চর্য! একথা তো আমি জানতাম।

জানতে, ভুলে গিয়েছিলে?

কী জানি! কথাটা কি তুমিই বলেছিলে? গন্ধবতী আকাশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে।

হতে পারে, কত কথাই তো হয়েছে। তাম্রধ্বজ জবাব দেয়।

এই আঙিনাতে বসে?

হতে পারে তা। তাম্রধ্বজ বলল।

সন্ধ্যার সময়?

হতে পারে, এমনই সন্ধ্যা ছিল হয়ত তা। বলল তাম্রধ্বজ।

এই সন্ধ্যা কি সেই সন্ধ্যাই? জিজ্ঞেস করল গন্ধবতী।

হতে পারে তা! তাম্রধ্বজ অবাক হয়ে গন্ধবতীর মুখখানি দেখছিল, সে ভাবছিল এই সন্ধ্যাটিকে কি গন্ধবতী অতীতের কোনো এক সন্ধ্যার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে বলতে চাইছে সময় স্থির হয়ে আছে। দূরঅতীতের সেই সন্ধ্যা এখনো ব্যপ্ত হয়ে আছে চারদিকে। সবিতা নক্ষত্র স্থির হয়ে গেলে, তা যদি সন্ধ্যায় হয়ে থাকে, ওই সন্ধ্যাটিই বিরাজ করবে সমস্ত সময়। সূর্যই তো দিন রাত্রির, সকাল সন্ধ্যার সৃষ্টির উৎস। সূর্যই তো সময়ের উৎস। দ্বিপ্রহর আর অপরাহ্নের তফাৎ যদি না অনুভব করা যাবে, না দেখা যাবে, তবে সময়ের স্রোতকে উপলব্ধি করবে কী করে মানুষ? যদি প্রাতঃকালের নরম আলো, আর দ্বিপ্রহরের প্রখর আলোকে আলাদা করে না চেনা যাবে, তবে কী করে মানুষ বুঝবে তখন প্রাতঃকাল না দ্বিপ্রহর? যদি দ্বিপ্রহর থাকে শুধুই দ্বিপ্রহর, যদি সন্ধ্যা থাকে, শুধুই সন্ধ্যা।

গন্ধবতী বলল, বহুদিন আগের সন্ধ্যাটিই কি রয়েছে আমাদের চারদিকে?

আমি তো বহুদিন দশার্ণদেশ ছেড়ে এদেশে আসিনি।

আমি তো জানি এই সন্ধ্যাটি দূর অতীতের, যখন শুনেছিলাম সবিতা নক্ষত্রের কথা, সবিতা নক্ষত্র চলমান বলে দিনরাত্রি, সকাল সন্ধ্যা...., অতীত, ভবিষ্যৎ...!

হাসে তাম্রধ্বজ, ঠিক কথা, সবিতা নক্ষত্র স্তব্ধ হলে সমস্ত সময়ই হয়ে যেত ঘটমান বর্তমান, অতীত থাকত না, অতীত না থাকলে কী হতো গন্ধবতী?

গন্ধবতী বলল, অতীতকে ভুলে যেতাম, ভবিষ্যৎকে ভাবতে পারতাম না।

তাম্রধ্বজ বলল, সত্য, মানুষ তার অতীত বিস্মৃত হতো, মানুষ তার ভবিষ্যতের কল্পনাশক্তি হারিয়ে ফেলত, স্মরণ, বিস্মরণ, কল্পনা সবই সবিতা নক্ষত্রের অধীন।

গন্ধবতী বলল, তাহলে মানুষের কোনো ভয় নেই?

নেই, বৃষ্টি এসে গেলেই সমস্ত ভয় কেটে যাবে।

ধ্রুবপুত্রের খোঁজ পাওয়া গেল?

তুমি কি ধ্রুবপুত্রের জন্য বসে আছ?

গন্ধবতী কাঁপল, কিছু বলতে পারল না। সে ধ্রুবপুত্রকে ভাবতে চাইল, ধ্রুবপুত্রের মুখখানি মনে করতে চাইল, পারল না। সব যেন অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি অতীত মুছে যাচ্ছে তার কাছ থেকে? তাহলে কি সূর্য সত্যিই থেমে যাচ্ছে আকাশ মণ্ডলে? সে বলল, এতদিন কোথায় ছিলেন?

আচার্যর সন্ধানে গিয়েছিলাম।

আচার্য কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছিলেন? জিজ্ঞেস করল গন্ধবতী।

কে বলল?

জানিনা, কেউ বলেনি, মনে হলো।

তাম্রধ্বজ বলল, বহুদিন যদি তাপিত হয়ে থাকে কোনো ভূখণ্ড, বহুদিন যদি বৃষ্টি না হয়, তবে এমন অনেক কথা মনে হয়, অনেক কথা তৈরি হয়, আচার্যর বয়স হয়েছিল অনেক, স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁর চোখের জ্যোতি কমেছিল, তাঁর দেহে বার্ধক্য এসেছিল।.

গন্ধবতী বলল, বৃষ্টি না হলে তো মানুষ বাঁচবে না।

বৃষ্টি হবে, কোনো না কোনোদিন হবেই।

তখন গন্ধবতীর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে রেবা এবং শিবনাথ। তাম্রধ্বজ বলল, আপনারা বসুন, আমরা বরং কীভাবে নগর এই ভয়ানক দুর্বিপাক থেকে মুক্ত হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করি।

গন্ধবতীর এক পাশে রেবা, অন্যদিকে শিবনাথ বসল একটু কোণাকুণি, তার ফলে চারজনের একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হলো। রেবা জিজ্ঞেস করল, তোকে কি ধ্রুবপুত্র সময়ের কথা বলেছিল সুগন্ধা, সময় কীভাবে প্রবাহিত হয়?

গন্ধবতী ঘুরে তাকায়। মাকে যেন বিরক্ত করো। জবাব দেয় না।

রেবা বলল, বলেছিল তোর ঠাকুর্দাকে, আশ্চর্য ধ্রুবপুত্র এসব কথা সুগন্ধাকে বলেনি,আমাকেও না,

বলেছিল বাবাকে, আবার আমাকে যা বলেছিল তা বলেনি ওঁদের দু'জনকেও, সুগন্ধাকে যা বলত ধ্রুবপুত্র, তা আমরা কেউ শুনিনি.....।

গন্ধবতীর চোখের জ্বলজ্বলে ভাব কমে এল। অবাক হয়ে সে মায়ের কথা শুনছিল। শুনতে শুনতে একটু গুটিয়ে গেল যেন। মায়ের কথার পিঠে কোন কথা বলবে তা ভেবে উঠতে পারছিল না। তখন শিবনাথ সেই গভীর শীতের রাতের কথা বলল। তাকে জাগিয়ে তুলে ধ্রুবপুত্র কীভাবে ব্যাখ্যা করেছিল কালের সপ্তদশভাগ কল্পনা।

তাম্রধ্বজ বলল, কালের মান কীভাবে নিরূপণ করা হয় তাকি বলেছিল সে?

চমকে উঠল শিবনাথ, মাথা নাড়ে, বলল, তুট, লব, নিমেষ থেকে মুহূর্ত, দিবস এইসব জানিয়েছিল, চক্ষুপক্ষপাতনের যে সময় তার একচতুর্থাংশ থেকে কালের ক্ষুদ্রতম অংশ নিরূপিত হয়, এই ভাবে বলেছিল।

তাম্রধ্বজ বলে, ছায়া দ্বারা সময় নিরূপনের কথা বলেনি?

মাথা নাড়ে শিবনাথ, না, সুগন্ধা তুই শুনেছিলি, রেবা তুমি?

বিষণ্ণ গন্ধবতী মাথা নাড়ে। রেবা বলল, আমাদের তিনজনকে আলাদা আলাদা করে জগতের রহস্যের কথা বলত ধ্রুবপুত্র, কালের কথা এই প্রথম শুনলাম।

তাম্রধ্বজ বলল, একটি মানুষের পক্ষে জ্ঞানের সমস্ত দিক ধারণা করা সম্ভব নয় বলেই ধ্রুবপুত্র হয়ত সকলকে সব কথা বলে যায়নি।

গন্ধবতীর মনে হলো কথাটা যেন তাকে উদ্দেশ্য করে বলা। আজ দ্বিপ্রহর থেকে তার মনের ভিতরে যে ঘটনা ঘটে চলেছে তা জেনে গেছে তাম্রধ্বজ। তার সন্দেহের খোঁজও যেন পেয়েছে তাম্রধ্বজ। মাথা নামিয়ে নিল সে। তার বোধবুদ্ধি আর কাজ করছিল না যেন। সে ভেবে উঠতে পারছিল না কীভাবে তাম্রধ্বজ জেনে গেছে দ্বিপ্রহরের কথা। এই আঙিনায় প্রবেশ করার পর তাম্রধ্বজের মুখোমুখি বসে আছে সে। গন্ধবতী উঠে দাঁড়াল। রেবা জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবি?

গন্ধবতী জবাব দিল না। সে বুঝতে পারছিল ধ্রুবপুত্রের কাছে সে যতটুকু ছিল, তার মা, ঠাকুর্দাও ততটুকু। ধ্রুবপুত্রের কাছে আর পাঁচজনের মতো সেও ছিল সামান্যজন। কিন্তু পাঁচজন তো ধ্রুবপুত্রের অপেক্ষায় নেই, সে আছে কেন? তার স্বপ্নের ভিতরেও তো ধ্রুবপুত্র এসে দাঁড়ায় না, তবে সে কার জন্য বসে আছে? গন্ধবতী নিঃশব্দে উঠোনের অন্য প্রান্তে চলে যায় একা একা। একা না হলে নিজেকে চেনা যায়না। গন্ধবতী ধুলোর ভিতরে বসে পড়ল। নক্ষত্রময় আকাশের দিকে তাকাল এমনভাবে যেন দর্পণে মুখ দেখছিল। সে বুঝতে পারছিল যে অজ্ঞানতা নিয়ে সে সন্দেহের চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে ছিল আজ দ্বিপ্রহরে, সেই অজ্ঞানতা ধ্রুবপুত্রের প্রতি, নিজের প্রতি এবং মায়ের প্রতি অবিশ্বাস রচনা করেছে। নিজের আত্মবিশ্বাসহীনতাকেই প্রকট করেছে। গন্ধবতীর মনে হচ্ছিল যে সমস্ত কথা তাকে বলে গিয়েছিল ধ্রুবপুত্র, সব বিস্মরণে গেছে। নিঃশব্দে তার চোখ ভিজে যাচ্ছিল। আকাশের তারারা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। শূন্য হয়ে যাচ্ছিল। ধ্রুবপুত্র তাকে শূন্য করে দিয়ে গেছে যে তা এতদিনে জানল? ধ্রুবপুত্র তাকে মনে রাখেনি একটুও। হয়ত সে উজ্জয়িনীর কথা মনে রাখেনি। না ফেরার জন্যই চলে গেছে ধ্রুবপুত্র। গন্ধবতী মাথা নামিয়ে অন্ধকার মাটির দিকে দৃষ্টি মেলে ধরল। সে ধ্রুবপুত্রকে মনের ভিতরে খুঁজে নিতে চাইছিল, ব্যর্থ হচ্ছিল। ধ্রুবপুত্রের জন্য বসে থেকে থেকে মনের ভিতরটা শূণ্য করে ফেলেছে সে, তাকে হারিয়ে ফেলেছে যে তা টের পায়নি গন্ধবতী। লজ্জা করছিল, অনুশোচনা হচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল নিজেকে উদলা করে দিয়েছে সে। ধ্রুবপুত্র এক নিষ্ঠুর মানুষ! তাকে ছেড়ে গণিকার কাছে যখন আত্মসমর্পণ করেছিল সে, তখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল তার। মা তো তাকে বলতে পারত। বোঝাতে পারত। আসলে পুরুষমানুষের কোনো অপরাধই অপরাধ নয়, যৌবনে পুরুষমানুষ এমন ভুল করেই থাকে, পুরুষমানুষ বহুগামী, তাই অন্য নারীতে আসক্ত হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক, এই বিশ্বাসেই না ধ্রুবপুত্রের জন্য যৌবন ক্ষয় করছে সে। এই বিশ্বাস থেকে মাও অপেক্ষায় আছে কবে এসে সেই নিষ্ঠুর, বহুগামী, গণিকায় আসক্ত পুরুষ গ্রহণ করবে তার কন্যাটিকে। গন্ধবতীর চোখের জল উঠোনের ধুলোয় পড়ছিল। বহুদিন মহাশূন্য থেকে জলবিন্দু এসে ভিজিয়ে দেয়নি যে মাটির বুক, সেই মাটির অণু, পরমাণু অংশ ভিজে যাচ্ছিল। মাটি চঞ্চল হয়ে উঠছিল অন্ধকারে। ধুলিকণারা যেন ছোটাছুটি করছিল,

পরস্পরে পরস্পরকে ফিসফিসিয়ে বলছিল, বৃষ্টি এল। বোধহয় বৃষ্টি এল। তারা তখন অন্ধকারের ভিতর স্তব্ধ হয়ে প্রার্থনা করছিল, আরো জল, আরো জল দাও। তারা প্রার্থনা করছিল জল যেন না থেমে যায়। গন্ধবতী কাঁদছিল। তার সমস্ত শরীরে এত কান্না যে লুকিয়েছিল তা সে নিজেই জানত না। গোপন কান্নায় সে ধীরে ধীরে ভারহীন হয়ে যাচ্ছিল।

তখন তিনজন উঠে এসে তাকে পরিক্রমা করে তার সামনে বসল। তাম্রধ্বজ ডাক দিল, গন্ধবতী, তুমি কি আচার্যর কথা শুনবে না?

গন্ধবতী শুনতে পেয়েছিল তাদের নিঃশ্বাসের শব্দ। সে উদগত অশ্রু সম্বরণ করে মুখ নামিয়েই চোখ মুছে নিল উত্তরীয় দিয়ে। শান্ত মুখ তুলল, বলল, শুনব।

তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল।

গন্ধবতী বলল, অনুমান করেছিলাম, আপনিও তো বললেন।

তাম্রধ্বজ বলল, পৃথিবী বহুদিন তাপিত হয়ে থাকলে নানারকম অমূলক ভয় এসে অধিকার করে মানুষকে, নানারকম অদ্ভুত চিন্তায় মানুষ বিভ্রান্ত হয়।

এতো আমি জানি! গন্ধবতী অসহিষ্ণু হলো।

মানুষের মস্তিষ্ক কাজ করে না ঠিক মতো, উন্মাদের সংখ্যা বাড়ে।

জানি আমি, সব জানি।

কে বলেছে?

গন্ধবতী মাথা নাড়ল, বলবে কেন, এতো নিজেই জানা যায়।

তাম্রধ্বজের মুখ উজ্জ্বল হলো অন্ধকারে, বলল, তাহলে শোনো গন্ধবতী, সূর্যের রথ একচক্র, এক চক্র রথাসীন সূর্যদেব নিত্য ভ্রমণ করে সহস্র কিরণ দিয়ে যে জলপান করেন, অরুণের দ্বারা বাহিত রথাসীন হয়ে ঘুরতে ঘুরতে সেই জলই বর্ষণ করেন। সেই বিধির ব্যতয় ঘটেছে মনে হয়, সূর্যদেব যখন জলগ্রহণ করেছেন, তা দানও করবেন নিশ্চিত।

গন্ধবতী বলল, জানি, কতযুগ, মহাযুগ, মহাকাল ব্যাপ্ত হয়ে আছে এই জীব জগতে, কখনো কি এমন ঘটেনি? কোথাও কোনো দেশে, নগরে, ঘটেছে নিশ্চয়।

আশ্চর্য। তুই কী করে জানলি, কে বলেছে?

কেউ না মা, জানা যায়।

কী করে জানা যায়?

নিজের ভিতর থেকে জানা যায়, বিধি যখন আছে তার ব্যত্যয়ও ঘটে নিশ্চয়, প্রতিটি দিন কি আগের দিনটির মতো হয় কখনো?

আশ্চর্য। তুই কার কাছে শুনেছিলি, ধ্রুবপুত্র!'

মাথা নাড়ে গন্ধবতী, বলল, সে আর ফিরবে না।

কে ফিরবে না, কার কথা বলছিস?

গন্ধবতী বলল, ধ্রুবপুত্র, আমার বাবা কার্তিককুমার, ধ্রুবপুত্র ফিরবে না, কোনোদিন না।

রেবা তাকায় তাম্রধ্বজের দিকে। তাম্রধ্বজ কি গণনা করে এসব জেনে এসেছে। ধ্রুবপুত্র ফিরবে না শুনে গন্ধবতী উঠে এসেছিল? কই, তাম্রধ্বজ তো তাদের বলেনি। কী নিষ্ঠুর কথা শুনেছে সুগন্ধা কন্যাটি তার! কিন্তু রেবাকে বিস্মিত করে তাম্রধ্বজ বলল, আমার গণনা তো সম্পূর্ণ হয়নি, এখন সন্দেহ লাগছে এভাবে সম্ভব কিনা।

তাহলে তুই কী করে জানলি? গন্ধবতীকে জিজ্ঞেস করল রেবা।

গন্ধবতী বলল, এতো তুমিও জান মা, তোমার স্বামী যদি বেঁচে থাকে তবে তো তারও ফিরে আসার কথা ছিল এতদিনে।

তাহলে? রেবা কেঁদে উঠল।

গন্ধবতী বলল, সত্যটা কি তুমি জান না মা, পুরুষ মানুষ অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়, বেঁচে থেকেও সে ফিরবে না এমনও হতে পারে, ধ্রুবপুত্র ছিল বহুগামী, আমার বাবা কেমন ছিল, ধ্রুবপুত্রেরই মতো কি?

পঞ্চান্ন

রেবা বিষণ্ণ হয়ে বসে আছে। মেয়ের কথা তার মরমে প্রবেশ করেছে যেন। তাম্রধ্বজ তা লক্ষ্য করল, বলল, গন্ধবতী বালিকা মাত্র, সে কী বলছে তা সত্য বলে ধরে নেবেন না, সত্য উপলব্ধি করতে হয়।

গন্ধবতী মাথা নামিয়েছিল। কথাটা বলার পর তার মনে হয়েছে না বললেই হয়ত ঠিক হত। কথাটি কি সত্য? সত্য না হওয়ার সম্ভাবনাই তো বেশি। ধ্রুবপুত্র ভুলে গেলেও তার বাবা ভুলবে কেন নিজের পাতা সংসার, এই বাড়ি, এই গ্রাম, এই দেশ। যুদ্ধে গিয়ে ফেরেনি। যুদ্ধে গিয়ে নাফেরার সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা যেটি, তা যদি ঘটে থাকে তবে তো সে তার বাবাকে অসম্মান করেছে। যুদ্ধে যে নিহত হয়, তার সম্বন্ধে কি এইসব কথা উচ্চারণ করা যায়? যুদ্ধে যে বন্দী হয়ে শত্রু শিবিরে কষ্ট পায় তার প্রতি অশুদ্ধ উচ্চারণ তো পাপে নিমজ্জিত করে। গন্ধবতী কুঁকড়ে গিয়েছিল। ধ্রুবপুত্র তার বিশ্বাস ভেঙেছে, বাবা কি ভেঙেছিল? মনে হয় না।

তাম্রধ্বজ বলল, আপনার কন্যার কথাটি আপনাকে আঘাত দিয়েছে।

সত্যই তো বলেছে সে, পুরুষ মানুষ ওইরকমই হয়ে থাকে।

আপনি কি দেখেছেন তা, কাউকে তেমন দেখেছেন?

রেবা চুপ করে থাকে।

তাম্রধ্বজ বলল, সকল পুরুষমানুষই কি ওই উদ্ধবসত্রি বা শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত? একজন রাজার ক্ষমতার ছায়ায় দুরাত্মা, আর এক ধন গরিমায় সম্পত্তির দাপটে দুরাত্মা, কার্তিককুমার বা ধ্রুবপুত্রর কারো কি রাজক্ষমতা বা ধনসম্পদের গর্ব ছিল কোনোটা?

রেবা বলল, থাক এসব।

তাম্রধ্বজ বলল, যদি থেকে যায় আপনি পুড়বেন মা, সমস্ত রাত সমস্ত দিন, গন্ধবতীও অনুশোচনায় পুড়বে, এরা দুজনেই, ধ্রুবপুত্র বা কার্তিককুমার কেউ উদ্ধবসত্রি বা সুভগ দত্তর মতো নয়।

রেবা বলল, তাহলে কেন ভুলে গেল?

তাম্রধ্বজ বলল, সে ও তো কঠিন সত্য, সত্যকে সহ্য করা খুব কঠিন মা, শুনুন ধ্রুবপুত্র সত্যিই বিস্মৃত হয়েছে এই অবন্তীদেশ, উজ্জয়িনীনগর, শিপ্রা, গম্ভীরা দুই স্রোতস্বিনীকে।

তুমি জেনেছো তা?

তাম্রধ্বজ ঘাড় তুলে, যবন দেশীয় ঘোড়ার মতো গ্রীবা উদ্ধত করে বলল, হ্যাঁ, জেনেছি তো নিশ্চয়।

গণনায় জেনেছো?

জানা তো এমনিই যায় মা, সত্যকে উপলব্ধি করা যায়, তার জন্য গণনার প্রয়োজন কী, ধ্রুবপুত্র যুদ্ধে গিয়ে ফেরেনি, তা তো নয়, স্ব-ইচ্ছায় ছেড়েছে সব, তার আগে অপমানিত হয়েছিল নগরে, আপনি কি জানেন শ্রেষ্ঠীর এক দাস ছিল, তার নাম উতঙ্ক?

শিবনাথ চমকে ওঠে। এই চারজনের ভিতরে বসে থেকেও সে নিঃসঙ্গ এক শ্রোতা, বলল, হ্যাঁ দেখেছি, কী ভয়ানক সে, নিষ্ঠুর ছিল শুনেছি।

আপনি তাকে শেষ কবে দেখেছেন?

যেদিন গিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠীর কাছে উদ্ধবের দেওয়া অলঙ্কার নিয়ে।

তাম্রধ্বজ শুনল। রেবা, গন্ধবতী শুনল। শুনতে শুনতে বিষণ্ণ হলো। তাম্রধ্বজ কথা বলল শিবনাথ থাকলে, বলল, উতঙ্ক তো আপনাকে প্রহার করেনি?

না, না।

উতঙ্কর রথের পাশে শূদ্র, নিষাদ যে এসে পড়ত, ওর কশাঘাতে সে রক্তাক্ত হতো, উদ্যত প্রহরণ হাতে উতঙ্কর মূর্তি সকলের কাছে এখনো যেন বিভীষিকা।

কী হয়েছিল, উতঙ্কর কথা উঠল কেন?

তার হাতে প্রহৃত হয়েছিল ধ্রুবপুত্র।

কী বলছ তুমি তাম্রধ্বজ! রেবা আর্তনাদ করে উঠল।

হ্যাঁ, নগরের অনেকে জানে, পথের মধ্যে, সেদিন ছিল শুক্লা চতুর্দশী, সে ফিরছিল গণিকালয় থেকে,

জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল সব—।

তারপর?

চৈত্র পূর্ণিমা দুদিন পরে, উজ্জয়িনীর পথে জ্যোৎস্নারাতে অনেক মানুষ ছিল, সকলে দেখেছিল উতঙ্কর কশাঘাতে লুটিয়ে পড়ল ধ্রুবপুত্র।

তারপর কী হয়েছিল? জিজ্ঞেস করল রেবা।

যারা দেখেছিল তারা ভীত হয়ে লুকিয়ে পড়েছিল, সকলে বুঝতে পারছিল শ্রেষ্ঠীর রোষে ধ্রুবপুত্রের ওই অবস্থা, উতঙ্ক তার প্রভুর আদেশ পালন করেছে মাত্র।

উতঙ্ক কি চিনত না ধ্রুবপুত্রকে, ভ্রমে শূদ্র জাতির কেউ ভেবেছিল হয়ত?

গন্ধবতীর কথায় তাম্রধ্বজ মাথা নাড়ে, বলে, আমি তো শুনেছি ধ্রুবপুত্র এবং শ্রেষ্ঠীর কথা, শ্রেষ্ঠীর রথে বসে আছে ধ্রুবপুত্র এই দৃশ্য এখনো উজ্জয়িনীর মানুষ ভোলেনি, শ্রেষ্ঠী এবং ধ্রুবপুত্র বসে কথা বলতে বলতে যাচ্ছে, উতঙ্কর রথ মন্দলয়ে পরিক্রমা করছে নগর, এই দৃশ্যও তো দেখেছে বহু মানুষ, কেউ কিছুই ভোলেনি।

আপনি দেখেছেন? জিজ্ঞেস করল গন্ধবতী।

মাথা নাড়ে তাম্রধ্বজ, খেয়াল করিনি, হয়ত দেখেছি, কিংবা দেখিনি তবে আমি তো অনেক পরে এসেছি দশার্ণ দেশ থেকে, আমি ধ্রুবপুত্রকে তেমন চিনলে নিশ্চিত দেখতে পেতাম সেই দৃশ্য, একথা আমি শুনেছি।

তাহলে কি উতঙ্ক ...? কথা শেষ করে না রেবা।

হ্যাঁ শ্রেষ্ঠীর আদেশেই প্রহার করেছিল ধ্রুবপুত্রকে, তখন ধ্রুবপুত্র শ্রেষ্ঠীগৃহ থেকে বিতাড়িত, তা কি জানেন?

না। শিবনাথ বলল, এতদূরে থেকে কিছুই জানি না।

সান্দীপনী আশ্রমে তার স্থান নেই তখন, জানতেন?

না, কী করে জানব?

ধ্রুবপুত্র কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল জানেন?

শিবনাথ বলল, আমরা কিছুই জানি না, জানিনা বলেই আপনার শরণাগত হয়েছি হে যুবক, সে ছিল আমাদের অতি প্রিয়জন, যদি বলেন আমার সন্তানের মতো, আবার যদি বলেন রেবা মারও সন্তানের মতো।

শূদ্রপল্লীতে, খুব গোপনে, কী ভীষণ সাহসী ছিল ধ্রুবপুত্র।

শূদ্রপল্লী! হায় মহাকাল! আর্তনাদ করে ওঠে রেবা।

তাম্রধ্বজ বলল, এইটাই সত্য।

তুমি কি গণনায় জেনেছ?

না আমি খোঁজ নিয়েছি খুব গোপনে, শূদ্রপল্লীর কেউ কেউ জানত এই কথা, কিন্তু সকলে জানত না, খুব গোপন ছিল সব, তখন তো তার নগরে থাকার অধিকার ছিলনা, শ্রেষ্ঠী তাকে হত্যা করতেনই, শূদ্ররা তাকে আশ্রয় দিয়েছিল।

শূদ্র তো জল অচল, অস্পৃশ্য, তাদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। কেমন হতাশ কণ্ঠে বলল রেবা, *এইজন্য* নগর থেকে নির্বাসিত হয়েছিল সে?

তাম্রধ্বজ বলল, এ ব্যতীত তার আশ্রয় ছিল না, নগরের অনেকে তাকে পছন্দ করত, তার কথা শুনতে চাইত কিন্তু শ্রেষ্ঠীর বিপক্ষে যাওয়ার সাহস ছিল না কারোর, উজ্জয়িনীতে এখন শ্রেষ্ঠীরই শাসন, রাজার কাছে পৌঁছতে পারে না কেউ, শ্রেষ্ঠী এবং তাঁর অনুগত রাজকর্মচারী প্রতিশোধ নেয়—

শ্রেষ্ঠী কি জানতেন ধ্রুবপুত্র শূদ্রপল্লীতে আশ্রয় নিয়েছিল?

বোধহয় না, আবার জানতেও পারেন, এখন তো মনে হয় জানতেনই, না হলে উতঙ্ককে দিয়ে পুড়িয়ে দেবেন কেন শূদ্রপল্লী, আবার এও মনে হয় যদি জানতেনই তবে সেইসময়ই শ্রেষ্ঠী ব্যবস্থা নিতে পারতেন, এতদিন বাদে কেন, দু'আড়াই বছর ঘুরে গেল, তারপর কেন বিনা প্ররোচনায় অগ্নিসংযোগ করালেন শূদ্রপল্লীতে? এখন তো ধ্রুবপুত্রর ছায়াও নেই নগরে, মানুষ ভুলে যাচ্ছে তার কথা।

শিবনাথ বলল, আপনি তো ভয়ানক কথা নিয়ে এসেছেন হে দশার্ণদেশীয় জ্যোতির্বিদ, ধ্রুবপুত্র অত জ্ঞানী, অমন প্রজ্ঞাবান, সে কিনা শূদ্রপল্লীতে আশ্রয় নিয়েছিল শুধুমাত্র গণিকার মোহে পড়ে।

হ্যাঁ, এইটাই সত্য।

ধিক! অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল শিবনাথ, আমরা বড় আঘাত পেলাম।

তাম্রধ্বজ বলল, শূদ্রজাতি তো সেনাবাহিনীর মূল শক্তি।

তা হোক, শূদ্র সংসর্গ সর্বদা পরিত্যাজ্য। বলল রেবা।

তখন তাম্রধ্বজ বলল, মা শাস্ত্র শূদ্র এবং নারীকে একই সঙ্গে তুলনা করেছে, তাকি জানেন?

রেবার মুখ অন্ধকারে আরো অন্ধকার হলো। মাথা নামিয়ে বসে থাকল সে। কিন্তু গন্ধবতী ফোঁস করে ওঠে নবীন সাপিনীর মতো, বলল, সেই নারী গণিকা, তাই-ই সত্য।

কে বলেছে এই কথা?

ধ্রুবপুত্র। গন্ধবতী জবাব দিল।

না ধ্রুবপুত্র বলেনি এই কথা, শাস্ত্রে যা বলুক গণিকার কথা আলাদা ভাবে বলেনি, বলেছে নারীজাতির কথা।

এ থেকে কী বোঝাতে চান আপনি? গন্ধবতী ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আপনি তা হলে এসেছেন কেন? আপনি নারী বিরল কোনো স্থানে গিয়ে বাস করুন।

তাম্রধ্বজ হাসে, আশ্রমিকরা সেই ভাবেই থাকে, সেই ভাবেই তো আছি গন্ধবতী, কিন্তু একটি কথা বলি, শাস্ত্র যা বলুক মানুষ কি তার জননী, ভগিনী, স্ত্রী, প্রেমিকা, আত্মীয়া, শুভার্থিনীকে পরিত্যাগ করতে পারে, না করে থাকে, স্ত্রী জাতি ব্যতীত এই পৃথিবী তো প্রাণহীন হয়ে যাবে তা কি শাস্ত্রজ্ঞরা জানতেন না?

গন্ধবতী বলল, তাহলে শাস্ত্রের ওই কথা তুললেন কেন?

তাম্রধ্বজ বলল, রেবা জননী বলছেন শূদ্র সংসর্গ সর্বদা পরিত্যাজ্য, কিন্তু সেই সঙ্গে শাস্ত্র তো ওই কথাও লিখেছে, শুনুন মা, ধ্রুবপুত্র সেই বিধিনিষেধ ভেঙেছিল।

রেবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, মনে হয় ওর প্রতি বশীকরণ বিদ্যা প্রয়োগ করেছিল সেই গণিকা, গণিকারা ওই সব জানে শুনেছি, না জানলে তাদের হয় না।

তাম্রধ্বজ বলল, ধ্রুবপুত্র যা করেছিল তা করা যায় বলে করেছিল।

কী করা যায়?

শূদ্রপল্লীতে গিয়েও তো বাঁচা যায়।

যাবেনা কেন, তাই বলে শাস্ত্রর কথা মিথ্যা হয়ে যাবে, এখন ধরা যাচ্ছে ও সত্যিই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আমরা ওর জন্য বৃথাই বসে আছি, সেই ধ্রুবপুত্র, যাকে আমরা পাঠিয়েছিলাম রাজধানীতে, মানুষের মতো মানুষ হয়ে ফিরবে, সে কিনা বিতাড়িত হলো নগর থেকে, তারপর প্রহৃত হলো নীচজাতির মতো কার কী পরিণাম! বলে কাঁদতে লাগল রেবা, বলল, একথা আগে জানতে তুমি?

জেনেছি ক্রমে ক্রমে।

কার কাছে জেনেছ?

নগরে গিয়ে জেনেছি।

নগরের মানুষ জানে যে ধ্রুবপুত্র আশ্রয় নিয়েছিল শূদ্রপল্লীতে?

কেউ জানে, কেউ জানে না।

এ কখনো সত্য হতে পারে না। বলল শিবনাথ, উঠে পড়ল গন্ধবতীর ঠাকুর্দা, না, না তুমি ভুল জেনেছ, এসব শ্রেষ্ঠীরই রটনা।

তখন তাম্রধ্বজ বলল, আপনি কি আমার সঙ্গে যাবেন?

কোথায় যাব?

শূদ্র বসতিতে, রত্নাকর সাগরের ধারে, গিয়ে নিজ কানে শুনুন তাদের কথা, শুনুন মহাশয়, শূদ্রপল্লীরও সকলে জানত না যে সে রাত্রেও থেকে যায় সেখানে, তাদেরই অন্ন গ্রহণ করে, তাদেরই জল, খুব গোপন ছিল সমস্তটা, তখন দেবদত্তাকে ভালবেসে শ্রেষ্ঠীর রোষ থেকে বাঁচার চেষ্টা করছিল

ধ্রুবপুত্র, সে সন্ধ্যার পর দেবদত্তার গৃহে যেত, ফিরতও অধিক রাত্রে, গণিকাগৃহের অভ্যন্তরে, বিশেষত প্রধান গণিকা দেবদত্তার গৃহে শ্রেষ্ঠীর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

গন্ধবতী দু হাতে কান চাপা দিয়ে আছে। তাম্রধ্বজের কথাগুলি বিষবৎ মনে হচ্ছিল তার। কী সব ভয়ানক কথা নিয়ে এসেছে দশার্ণদেশীয় জ্যোতির্বিদ। সে কিনা গণনা করে বলবে কোথায় গিয়েছে ধ্রুবপুত্র, কেমন আছে সে, সেই খবর না এনে অন্য যে সব কথা শোনাচ্ছে তা তার শোনা উচিত নয়।

শিবনাথ বলল, তুমি কি এখন যাবে আমার সঙ্গে?

যেতে পারি, এখনই যাওয়া উচিত, যদি পরাশরও ছেড়ে চলে যায় উজ্জয়িনী, তবে তো কোনো তথ্যই জানা যাবে না। বলল তাম্রধ্বজ।

ওরা উজ্জয়িনী ছেড়ে যাচ্ছে?

হ্যাঁ, খরা, জল নেই কোথাও, ফসল হয়নি, এমন প্রাকৃতিক দুর্বিপাকেই তো নগর শূন্য হয়ে যায়, মানুষ দেশান্তরে যায়।

তখন রেবা বলল, গিয়ে কী হবে?

সত্যটা জানা যাবে। বলল তাম্রধ্বজ।

সত্য তো তুমি জেনেছ, তোমাকেই বিশ্বাস করছি। বলল রেবা, অন্ধকারে যেতে হবে না!

তাম্রধ্বজ বলল, আমাকে তো যেতে হবেই, আমি তো ফিরব, অন্ধকারে আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করি, আমি শুনেছি সেই রাত্রে ধ্রুবপুত্র একা একা রক্তাক্ত শরীরে ফিরে আসে শূদ্রপল্লীতে। তারপর সেখান থেকেই রওনা দেয় গম্ভীরার এইদিকে।

রেবা বলল, থাক আর বলতে হবে না, ধ্রুবপুত্রের কথা আর বলো না।

গন্ধবতীও বলল, হ্যাঁ আর নয়, আর নয়। ফুঁপিয়ে ওঠে গন্ধবতী।

রেবা বলল, তোমরা যদি শূদ্রপল্লীতে যাও তাহলে হয়ত আরো কথা উঠে আসবে, এমন এমন কথা জানা যাবে যা আমাদের ভাল লাগবে না, কী প্রয়োজন, তাকে তো আমাদের আর প্রয়োজন নেই, সে জানে না আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকতে হয়, শ্রেষ্ঠী তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তো সত্যি।

শিবনাথ অন্ধকারে পায়চারি করতে করতে বলল, না, তোমরা দুয়ারে আগল দিয়ে থাকো, আমি রওনা হবো এঁর সঙ্গে, আমি জানতে চাইব শ্রেষ্ঠীর দাস সত্যিই প্রহার করেছিল কিনা ধ্রুবপুত্রকে।

তাম্রধ্বজ তখন উতঙ্কের মৃত্যু সংবাদ দিল। তা জানে শিবনাথ। সে বলল, উতঙ্ক তো নয়, কশাঘাত করে ছিলেন তো শ্রেষ্ঠীই, তাঁর প্রশ্রয় ব্যতীত তাঁর দাসের সাধ্য কি রক্তাক্ত করে পথের ধারে ফেলে যায় ধ্রুবপুত্রকে, আপনি চলুন, আমি যাব শূদ্রপল্লীতে।

কী হবে বাবা, যে শূদ্রপল্লীতে অন্নগ্রহণ করত, সে গেছে ভাল হয়েছে, আমি চাই সে আর না ফিরুক। বলে উঠল রেবা।

গন্ধবতী তখন আকাশে তাকিয়ে। কথা বলছিল না গন্ধবতী। কথা শুনছিল কিনা তাও ধরা যাচ্ছিল না। কী আশ্চর্য নীরবতা তার! তাম্রধ্বজ দেখল তাকে, উঠে দাঁড়াল, বলল, আমারও মনে হচ্ছিল ধ্রুবপুত্রর শেষ কয়েকটা দিন সত্যিই কীভাবে কেটেছিল তা জানা প্রয়োজন, না জানলে জানা যাবে না সে এখন কোথায় কেমন আছে, ফিরছে এই দিকে, নাকি আরো দূরগামী হয়েছে, দূরদেশে চলে যাচ্ছে চিরকালের মতো, আমরা যাই।

রেবা বলল, আমি কিছু জানতে চাই না আর, সে যেন না ফেরে উজ্জয়িনীতে।

হাসল তাম্রধ্বজ, বলল, যুদ্ধে গিয়েছিলেন আপনার স্বামী, শূদ্র সৈনিকের পাশাপাশি দাঁড়িয়েই তো যুদ্ধ করেছিলেন তিনি, দিনশেষে তাদের সঙ্গে অন্নভাগ করে খেতে হয়েছিল তাঁকে, এমনই তো হয়ে থাকে মা।

চমকে ঘুরে তাকায় গন্ধবতী। কণ্ঠস্বরটি যেন নিকট-অতীত থেকে ভেসে এল। দেখল অন্ধকারে তাম্রধ্বজ দীর্ঘ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কতবড়। কত উঁচু! চোখ দুটি যেন দুটি নতুন তারার মতো আকাশ থেকে নেমে এসেছে নীচে। গন্ধবতী তাকিয়েই থাকল।

রেবা বলল, শুনেছি যুদ্ধক্ষেত্রে বিধি-বিধান নাস্তি, কোনো নিয়ম চলে না, তাই হয়ত।

তাম্রধ্বজ বলল, প্রয়োজনে নিয়ম নাস্তি, আসুন আপনি, আমরা এগোই, শূদ্রপল্লীর মানুষ নগর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সবাই চলে গেলে কি বৃদ্ধ সৈনিক থাকবে, তাকে, আমি একবার সাক্ষাৎ করেছিলাম শিপ্রাতীরে, শুনেছিলাম ধ্রুবপুত্র যেতেন ওখানে, এখন যা শুনছি তা সত্য কিনা জেনে নিতে চাই, তাহলে আমি গণনা সম্পূর্ণ করতে পারব।

দু'জনে চলে গেল অন্ধকারে।

ছাপ্পান্ন

অন্ধকার ধীরে ধীরে কোমল হয়ে উঠছিল। কৃষ্ণা চতুর্থীর চন্দ্রোদয় ঘটে গেছে তাদের দু'জনের অজ্ঞাতে, সেই চাঁদ আকাশে আরোহণ করছিল ক্রমে ক্রমে। আলোয় স্বচ্ছ হয়ে উঠছিল স্তব্ধ চরাচর। হাঁটতে হাঁটতে শিবনাথ বলল, ভাবছিলাম খুব অন্ধকার হবে।

তাম্রধ্বজ বলল, রাত্রি, জ্যোৎস্না—এসব দেখলে মনে হয় না এই দেশ এক ভয়ানক বিপর্যয়ের দিকে এগোচ্ছে, অন্ধকারে মনে হয় কোথাও জল আছে, বৃষ্টি হয়েছিল ক'দিন আগে, সব কিছু ঠিক আছে।

শিবনাথ হাঁটতে হাঁটতে বলে, মাঝে মধ্যে একটা অদ্ভুত কথা মনে হয়।

কী কথা?

ধ্রুবপুত্রের নিষ্ক্রমণের সঙ্গে কি অনাবৃষ্টির সম্পর্ক আছে?

তাম্রধ্বজ বলল, বহুদিন আকাশ মেঘহীন হয়ে থাকলে, সরোবর শুকিয়ে গেলে, এইরকম মনে হয়, একটা কোনো যুক্তির প্রয়োজন হয়।

ধ্রুবপুত্র চলে যাওয়ার পর একদিনও বৃষ্টি হয়নি।

ধ্রুবপুত্র থাকলেও হয়ত তেমনই হতো, দুটো ঘটনা মিলে গেছে।

কিন্তু কোনো কোনো মানুষের থাকা না থাকার সঙ্গে মঙ্গল অমঙ্গলও তো নির্ভর করে, কোনো মানুষের মুখ দেখলে মন প্রসন্ন হয়, আবার কাউকে দেখলে ভীষণ ভয় হয়, যেমন ওই উদ্ধবনারায়ণ, যেমন ছিল উতঙ্ক।

তাম্রধ্বজ বলল, তা সত্য, কিন্তু তার সঙ্গে বৃষ্টি অনাবৃষ্টির সম্পর্ক কোথায়?

কী জানি আমার তেমন মনে হয়। জ্যোৎস্না প্লাবিত প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে শিবনাথ বিড়বিড় করল।

রাতটা বেশ ঠাণ্ডা। হাওয়াও ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। গা জুড়িয়ে যাচ্ছে। তাম্রধ্বজ তো অঙ্গবস্ত্রটি কাঁধের উপরে নিয়ে অনাবৃত উর্ধ্বাঙ্গে চলেছে। হাঁটতে হাঁটতে একটুবাদে তাম্রধ্বজ বলল, আমার মনে হয় ধ্রুবপুত্রের নিষ্ক্রমণের সঙ্গে খরার কোনো সম্পর্ক নেই, ধ্রুবপুত্র থাকলেও এই কথা বলত, এই মহাবিশ্ব, সবিতা নক্ষত্র, আকাশমণ্ডল সবই যেন এক শৃঙ্খলায় বাঁধা আছে, তাই ঋতুচক্রের পরিবর্তন, বর্ষা শীত—নিয়ম একটা আছে, তার ব্যত্যয় ঘটেছে মনে হয়, ঘটতেই পারে এমন।

ঘটতে পারে? অবাক হলো শিবনাথ।

হ্যাঁ, আমাকে পূর্বদেশের এক বণিক বলেছিল তাদের দেশেও নাকি এমন হয়েছিল, এদেশেও কি হয়নি, মনে করে দেখুন।

হয়েছিল হয়ত, তবে তা এত দীর্ঘকাল ব্যাপ্ত হয়ে থাকেনি, যখনই মনে হয়েছে জীবজগৎ কষ্ট পাচ্ছে, তখনই মহাকাল মেঘ এনেছেন, বৃষ্টি নেমেছে, তাই স্বল্পকালের সেই অনাবৃষ্টির কথা মনে রাখতে পারেনি মানুষ।

পূর্বদেশে এই অবন্তীদেশের মতোই হয়েছিল, অনাবৃষ্টির ফলে বহুমানুষ চলে গিয়েছিল গ্রামনগর ছেড়ে, গ্রাম উজাড় হয়ে গিয়েছিল, মানুষের খাদ্যাভাব ঘটেছিল, শূন্য হয়ে গিয়েছিল সমস্ত জনপদ।

শুনিনি তো।

আমি শুনেছি, তাম্রধ্বজ বলল, তখন গাছের পাতা ভক্ষণ করতে আরম্ভ করেছিল অন্নহীন মানুষ, শীর্ণ জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল শিশু থেকে বৃদ্ধ, সকলে, পথে পথে মানুষ মরে পড়ে থাকত, মায়ের কোলে শিশু মারা যেত, মরা মায়ের পাশে শিশু ক্রন্দন করত, মানুষ কঙ্কালসার হয়ে ঘুরে বেড়াত হা অন্ন করে, কত লোক যে মরেছিল।

এসব তো আমি কিছুই জানি না।

জানবেন কী করে, এ হলো পূর্বদেশের কথা, সেই সময় ভিক্ষার অভাব ঘটেছিল, রাজা কর বৃদ্ধি করেছিলেন আবার তখনই, অথচ অনাবৃষ্টিতে অজন্মা হয়েছিল, কোনো ফসলই হয়নি এমন কী গাছে পাতা ছিল না, মাটিতে তৃণও না।

কী বলছেন আপনি? শিবনাথ ভয় পেয়ে যায়, এমনই কি আমাদের ভবিষ্যৎ, উজ্জয়িনীতে এমন হবে?

বহুদিন বৃষ্টি না হলে তো এমনই হয়।

হায় হায়! তাহলে আমি ওই দুই আশ্রিতাকে নিয়ে চলে যাই দেশ ছেড়ে।

আশ্রিতা কেন হবেন ওঁরা?

কখনো তেমনই মনে হয়, না হলে এই বয়সে কি আমার এই সব করার কথা, যাদের উপর নির্ভর করেছিলাম তারাই হারিয়ে গেল, ছেড়ে গেল! আমি এখন কী করি, ঈশ্বরচিন্তার সময়ও নেই আমার।

তাম্রধ্বজ বলল, ওঁরা আপনার অতি নিকটজন, গন্ধবতীর ভিতরে আপনারই রক্ত তো প্রবাহিত।

সত্য, কিন্তু আমার তো বয়স হয়েছে, বয়স দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, বহুদিন বৃষ্টি না হলে কি এমন হয়, আমার মতো বৃদ্ধদেরও অবকাশ মেলে না, নিরুদ্দিষ্ট মানুষ ঘরে ফেরেনা।

তাম্রধ্বজ বলল, হয়ত তাই, অনাবৃষ্টির কালে সমস্ত বিপন্নতাই অনাবৃষ্টিজাত মনে হয়, শুনুন পিতামহ, পূর্বদেশে এমন অজন্মা হয়েছিল ফসলের যে তা থেকে তার মস্ত প্রভাব এসে পড়ে মানুষের ভিতরে, শুনেছি সেই সময়ে নারীরাও আর গর্ভধারণ করতে পারছিল না। নতুন শিশুর কান্না শোনা যাচ্ছিল না অনেক অনেকদিন।

কী ভয়ানক কথা! কেঁপে উঠল শিবনাথ, বলল, থাক আর বলবেন না।

বলছি এমন তো হয়েছিল।

কিন্তু অমন যদি এদেশে হয়?

হতে পারে, হয়ত সেই পথেই যাচ্ছে দেশ।

শিবনাথ বলল, এর থেকে মুক্তির পথটি হয়ত বলে দিতে পারতেন আচার্য বৃষভানু, তিনিই নেই, কী হবে এই দেশের কে জানে তা?

তাম্রধ্বজ এই কথার কোনো উত্তর দিল না। হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা এগিয়ে আচমকা তাম্রধ্বজ দাঁড়াল, বলল, এতটা পথ তো নিশ্চিন্ত ভাবে এলাম, এখন সবে নগর ছাড়তে আরম্ভ করেছে মানুষজন, দস্যু তস্করের হাতে দেশ এখনো চলে যায়নি, পূর্বদেশে তা হয়েছিল।

শিবনাথ বলল, উদ্ধবনারায়ণ রাজকর্মচারী হলেও তো দস্যুই বটে।

তাম্রধ্বজ বলল, এখনো সময় আছে।

সময় থাকলেও তা কাজে লাগাবার শক্তি মানুষের হাতে নেই, মানুষ বড় অসহায়, আকাশের দেবতা দয়া না করলে এই অবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি নেই, আমরা নিজেরা কী করতে পারি, রাজাই বা কী করতে পারেন?

তাম্রধ্বজ নিশ্চুপ। কথাগুলি সে মেনে নিয়েছে মনে হয়।

শিবনাথ আবার বলল, তবে রাজাই পারেন, রাজা নিষ্কলঙ্ক থাকলে, যাগযজ্ঞ করলে, মহাকাল প্রীত হলে কেন অনাবৃষ্টিতে পুড়বে দেশ, রাজার শুদ্ধ থাকা প্রয়োজন, আপনার কি মনে হয় না?

তাম্রধ্বজ বলে, সত্য, তবে শুদ্ধাশুদ্ধের হিসেবেও তো সন্দেহ থেকে যায়, রাজা ভর্তৃহরি মানুষটির অন্তর শুদ্ধ বলেই জানি, একদিন তার সঙ্গে কথা বলেছিলাম আমাদের আশ্রমে, সেই দিনই আচার্য চলে যান আশ্রম ছেড়ে।

শিবনাথ চুপ করে থাকে। রাজনিন্দা গর্হিত কাজ। অপরাধই। তা মনে পড়তে গুটিয়েই গেল বৃদ্ধ। পথের দুপাশের গাছগাছালির ও কান আছে মনে হয় শিবনাথের।

তাম্রধ্বজ বলে, আপনি কি জানেন শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত বাণিজ্যে যাচ্ছেন।

জানি, জেনে ভয় পাচ্ছি, এরপর উদ্ধবনারায়ণ ভয়ানক হয়ে উঠবে।

শ্রেষ্ঠী অভিভাবক নন, রাজা তো আছেন।

শিবনাথ বলল, রাজার কাছে পৌঁছনো যায় না।

আমি যাব, আপনার চিন্তা নেই, যেদিন আচার্য চলে যান সেই দিন রাত্রে রাজা আশ্রমে গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, খুবই নরম হৃদয় তাঁর, যুক্তি মানেন।

শিবনাথ শুনল কিছু বলল না। এখন তাদের দক্ষিণপার্শ্বে শিপ্রানদী। শিপ্রানদী শান্ত, নিশ্চল যেন বা জ্যোৎস্নায় পড়ে আছে মৃত এক সরীসৃপের মতো। দুজনে দাঁড়ায় নদীর মুখোমুখি। একে অন্যের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

একটু বাদে তাম্রধ্বজ বলল, আমি অনেকদিন যাইনি আপনাদের গৃহে, ছিলাম না এখানে।

তা জানি, খুঁজতে এসে দেখেছি আপনি নেই।

কোথায় ছিলাম জিজ্ঞেস করলেন না?

বিদিশায় গিয়েছিলেন?

না, শুনুন পিতামহ, বিপন্ন আমরা সকলে।

কী বলছেন?

আমি পূর্বদেশের বণিকদের সেই বিবরণ সত্য হতে দেখেছি আচার্যর সন্ধানে গিয়ে, আচার্য বৃষভানুর জন্য বেরিয়ে গিয়েছিলাম আশ্রম ছেড়ে।

কোন বিবরণের কথা বলছেন?

মানুষ কঙ্কালসার, পশুপক্ষী, মানুষ একসঙ্গে মরছে।

কঙ্কালসার তো হয়ে যাচ্ছি আমরাও, দেখেছেন তো গন্ধবতী আর ওর মাকে?

এখানেও কি অন্নাভাব ঘটছে?

ঘটছে, গতবারও তো ফসল হয়নি, পরপর দু'বছর অজন্মা, ধান্য, গোধুম, যব।

তাম্রধ্বজ বলল, আমাদের কিছু একটা করা উচিত, আজ রাতেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে উজ্জয়িনীতে গিয়ে সব খোঁজ নিয়ে।

কী সিদ্ধান্ত?

তাম্রধ্বজ বলল, পূর্বদেশ জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল, বহু মানুষ মারা গিয়েছিল, আকাশ থেকে শকুন্ত পাখিরা নেমে এসেছিল কুটিরের মাথায়।

আমাদের এখানে তো অমন হয়নি।

হচ্ছে, আমি উত্তরদিকে গিয়েছিলাম অনেকদূর, আপনি কি জানেন আচার্য অন্ধ হয়ে নগর ত্যাগ করেছেন।

অন্ধ! আর্তনাদ করে ওঠে শিবনাথ, তাহলে কি সূর্যের তাপে অন্ধ হওয়ার কথা সত্য? তাহলে কি সত্যিই রাত অবলুপ্ত হয়ে যাবে, দিন ফুরোবে না?

তাম্রধ্বজ মাথা নাড়ে, উঁহু, বার্ধক্য ঘিরেছে তাঁকে তাই দৃষ্টি ক্ষীণ হয়েছে, এ তো প্রাকৃতিক নিয়ম, আচার্য আর নক্ষত্র চিনতে পারছেন না, দেখতে পাচ্ছেন না অরুন্ধতী, তাঁর অন্ধতা তো আমাদের মতো হবে না, শুনুন পিতামহ, আচার্যকে খুঁজতে গিয়ে আমি দেখেছি অনাবৃষ্টি আরো ব্যাপক, আরো ভয়ানক, আরো দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে দূর উত্তরের গ্রামে, জনপদে, সেখানে বৃষ্টি নেই ধ্রুবপুত্রের নিষ্ক্রমণের অনেক আগে থেকে, মানুষের কঙ্কাল ঘুরে বেড়াচ্ছে, সব কিছু জীর্ণ হয়ে গেছে—ওফ্ সে কী ভয়ানক এক অভিজ্ঞতা। কী নিদারুণ!

কী দেখেছেন বলবেন? শিবনাথ অনুরোধ করল।

সাতান্ন

আচার্য বৃষভানু উত্তরে গিয়েছিলেন। শিপ্রার পূর্বতীরে তাঁর আশ্রম, সেই তীর ধরে নদীর সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে এগিয়েছিলেন আচার্য। কিন্তু কতটা এগোবেন তিনি? উত্তরে এক যোজনেরও কম পথের পর নদী থেকে একটি শাখা নেমে গেছে দক্ষিণে। নদী ওখানে পার না হলে উত্তরের পথ বন্ধ। আচার্য যে নদী পার হয়ে উত্তরেই এগোবেন, তারপর হাঁটবেন উত্তরপুবে, কোশল, শ্রাবস্তীর পথে তা অনুমান করেছিল তাম্রধ্বজ। পরে দেখেছে তার অনুমানে কোনো ভুল ছিল না।

উত্তরে বহুযোজন দূরে হিমালয়। দেবাত্মা পর্বতমালা ঘিরে রেখেছে এই পৃথিবীর একটি অংশকে।

উত্তরপুব থেকে তা ক্রমশ পশ্চিমে অগ্রসর হয়েছে। উত্তরপশ্চিমে মথুরা, সুরসেনা, মৎস্যদেশ, ইন্দ্রপ্রস্থ পার হয়ে হিমালয় বহু বহুদূর। বরং উত্তরপুবে তার দূরত্ব কম। বণিকেরা সেই রকমই বলে থাকে। শ্রাবস্তীর বণিকরা তো আসে উজ্জয়িনীতে, তারা বলেছে সার্থবাহ নিয়ে এসে পৌঁছতে কতদিন প্রয়োজন হয়। তা অনেক কম ইন্দ্রপ্রস্থ পার হয়ে আরো দূর হিমালয় থেকে আসা বণিক বা তীর্থযাত্রীরা যে সময়ের কথা বলে থাকে তার চেয়ে।

আচার্য একবার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন যখন মৃত্যু এসে দাঁড়াবে জীবন সায়াহ্নে, তাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি হিমালয়ের দিকে হেঁটে যাবেন। যদি তাঁকে সময় দেয় মরণ, তিনি হিমালয়ে গিয়ে তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করবেন। ওই পর্বতমালাতেই স্বর্গের পথ খুঁজে পেয়েছিল পাণ্ডবরা। সেই পথ তো আছে, হারায়নি। কোথাও এখনো নিঃসঙ্গ শুয়ে আছে সেই পথ, ভবঘুরে, আলাভোলা পথিক যেভাবে বিশ্রাম নেয়, সেইভাবে। তার দুপাশে বহু বর্ণের ফুল সম্ভার, মাথার উপর গভীর নীল আকাশ। কোথাও কোনো শব্দ নেই। নৈঃশব্দই তো মৃত্যুর নিরাকার রূপ। আচার্য ভাবতেন সেই পথে অগ্রসর হবেন যদি পথ তাঁকে গ্রহণ করে।

আচার্য এই রকম ভেবেছিলেন। বার্ধক্যের কথা ভাবেননি তিনি। ভেবেছিলেন মরণ আচমকা এসে দাঁড়াবে তাঁর কাছে। ভ্রম হয়েছিল আচার্যর। আসলে মানুষ নিজেই যে এগোয় মৃত্যুরূপী সেই মহা ভবিতব্যের দিকে, অনন্ত অন্ধকারের দিকে তা বিস্মৃত হয়েছিলেন আচার্য বৃষভানু। বিস্মৃত হয়েছিলেন, অথবা মনে করতে চাননি। মৃত্যুকে সাথী করে হিমালয়ের দিকে যাত্রা অথবা মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে থাকা শিপ্রানদীতীরে—এই দুই কল্পনার ভিতরে মৃত্যুর কোনো চিহ্ন ছিল না। বরং ছিল প্রাণের অসম্ভব প্রকাশ। জ্ঞানী জ্যোতির্বিদ ভাবতেও পারেননি তিনি নিজে ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছেন। সেই গভীর নির্জন নৈঃশব্দে ভরা পথ তাঁকে গ্রহণ করেছে জন্মমুহূর্ত থেকেই। জন্মের পরই তো মানুষের যাত্রা শুরু হয় সেইপথে।

তাম্রধ্বজ কয়েকদিন অপেক্ষা করেছিল যদি আচার্য ফিরে আসেন। ফিরে এসে এই শিপ্রানদীতীরেই বসে থাকেন ভবিতব্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে। কিন্তু তাঁর ফিরে আসার সম্ভাবনা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হলে, কয়েকদিন কেটে গেলে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তাম্রধ্বজ। আসলে তারও বিশ্বাস হয়নি আচার্য চলে যেতে পারেন। অনাবৃষ্টির হাত থেকে অবন্তীদেশকে বাঁচাতে না পেরে তিনি যে সত্যি সত্যি ছেড়ে যাবেন এই আশ্রম, মঙ্গলনাথের মন্দির, নদী, বট, পিপুল, নিম, বেল বৃক্ষে ভরা নদীতীর তা অনুমান করতে পারেনি তাম্রধ্বজ। শেষ পর্যন্ত সেও বেরিয়ে পড়ল এক রাত্রে, চাঁদের আলোয় পথ দেখে দেখে। পূর্ব তীর ধরে অনেকটা এগিয়ে বাঁকের মুখে নদীতে নেমেছিল তাম্রধ্বজ। চারদিক কেমন ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে জেগেছিল। তাম্রধ্বজের হাতে একটি লাঠি, লাঠির অগ্রভাগে খাদ্য ও সামান্য বস্ত্রাদির পেটিকা, কাঁধে লাঠিটি নিয়ে এগোচ্ছিল সে। অন্য কোনো ভয় ছিল না, আচমকা যদি নিশাচর হিংস্র শ্বাপদ এসে আক্রমণ করে। অরণ্য জলহীন হয়ে গেলে, হিংস্র জীবজন্তু লোকালয়ে জলের খোঁজে চলে আসে।

তাম্রধ্বজ নদী পার হয়ে উত্তরপুবে হেঁটেছিল। দিবাভাগে ভীষণ রোদ্দুর, উত্তাপ, পশ্চিমের মরুদেশ থেকে ধেয়ে আসা আগুনে বাতাস তাম্রধ্বজকে বাধ্য করেছিল থামতে। তখন শুক্লপক্ষ ছিল। চাঁদের আলোয় সে হাঁটত। এই ভাবে প্রায় পক্ষকাল হেঁটে সে থামল। যে বটবৃক্ষের ছায়ায় দ্বিপ্রহরে সে থেমেছিল, সেখানে তখন জনাতিরিশেক নারী পুরুষ, নিষাদজাতীয় মানুষ। তাম্রধ্বজ দেখেছিল বটবৃক্ষের কোলে একটি ভীমাকার প্রস্তরখণ্ড। সেই প্রস্তরখণ্ডে চোখ আঁকা হয়েছিল খড়ি মাটি দিয়ে। পাথর যেন জীবন্ত হয়ে তাকিয়েছিল তার দিকে। তাম্রধ্বজকে দেখে মানুষগুলি অবাক হয়েছিল। তাম্রধ্বজের চেহারার ভিতরে নিষাদজাতির মানুষের চেহারার একটি আবছা সাদৃশ্য আছে। তবে সেই নিষাদ পুরুষগুলির ভিতরে তাম্রধ্বজের মতো আরণ্যক স্নিগ্ধতা ছিল না। তারা ছিল ভগ্ন দেউলের মতো প্রায়। হাড়সর্বস্ব, চক্ষুমণি অনুজ্জ্বল, কোটরগত, মাথার ঘন কুঞ্চিত চুল ঝরে গেছে অনেকেরই।

তাম্রধ্বজ এগিয়ে গিয়েছিল তাদের দিকে, তোমরা কারা?

বয়স্ক একটি মানুষ বলেছিল, আমরা এই গাঁয়ের, তুমি কে?

তাম্রধ্বজ বলেছিল, এখানে কী করছ?

বয়স্ক মানুষটি বলেছিল, কতদিন জল নেই, আকাশ ফেটে আগুন ঝরছে, তুমি কি আকাশের জলের খোঁজ জানো?

তাম্রধ্বজ বসেছিল বটের একটি শিকড়ের উপরে। তখন শুনেছিল ঢাকের শব্দ। শিঙা ও ঢাক বাজিয়ে একটি ময়ূর, একটি ময়ূরী নিয়ে জনাপাঁচেক লোক এসে দাঁড়াল সেখানে। মাঠ ভেঙে এল তারা। একজনের হাতে ছিল ভয়ানক কুঠার। তাম্রধ্বজ উঠে দাঁড়িয়েছিল, কী হবে এখানে?

ঠাকরুণকে রক্ত দেওয়া হবে, রক্ত মাটিতে দেওয়া হবে, তাহলে জল হবে।

কে বলেছে এই কথা? তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করেছিল।

কে বলবে, এইরকমই তো হয়। বৃদ্ধ নিষাদ এগিয়ে এসেছিল আবার, বৃষ্টি না হলে ময়ূর ময়ূরীর রক্ত চায় ইনি, ইনি আমাদের গ্রামরক্ষা করেন, এঁকে দেখুন, কালামুখী ঠাকরুণ।

তাম্রধ্বজ দেখেছিল প্রস্তরখণ্ডের দুটি চোখ যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ময়ূর ময়ূরী দুটি কেমন কুঁকড়ে ছিল ভয়ে। তারা যেন টের পেয়েছিল কী হতে যাচ্ছে কয়েক দণ্ড পরে। তাম্রধ্বজ বলেছিল, এভাবে বৃষ্টি আসে?

কোথাও না আসুক, আমাদের এই কালামুখীর গাঁয়ে আসবে, ইনি কালামুখী ঠাকরুণ, গরাম দেবী, ইনি রক্ত পেলে মেঘ আসবে।

আর একজন বলল, ময়ূর ময়ূরীর জন্যই যেন বর্ষা আসে, মেঘ এলে তাদের আনন্দ হয়, ময়ূর ময়ূরীর মিলন হয়, মেঘের জন্য ময়ূর ময়ূরীর রক্ত দিলে মেঘ না এসে পারবে না।

একজন বলল, মেঘই ময়ূর চায়, বর্ষা না এলে ময়ূর দিতে পারলে বর্ষা হবেই।

মেঘ তো আসেনি। তাম্রধ্বজ বলেছে।

মেঘ এবার ময়ূর চায়, ময়ূরী চায়, তাতেও না হলে মানুষ দিতে হবে, রক্ত ছাড়া কালামুখী সন্তুষ্ট হয় না, আকাশও না, রক্ত ছাড়া কোনো কিছু হয় না, কিন্তু তুমি কে হে প্রভু?

তাম্রধ্বজ বলেছিল, উজ্জয়িনী নগর থেকে আসছি।

কোথায় উজানি,

তোমরা উজ্জয়িনী জাননা?

জানি মনে হয়, আবার জানি যে তাও বলা যাবে না। বলেছিল বৃদ্ধ নিষাদ।

উজ্জয়িনী অবন্তী দেশের রাজধানী।

অবন্তী দেশ কোথায়?

এই তো অবন্তী দেশ।

তারা মাথা নেড়েছিল, তা হবে কী করে, এটা কালামুখী ঠাকরুণের কালামুখী গাঁও, কালামুখী দেশ, অবন্তী দেশ হবে কেন?

তাম্রধ্বজ বলেছিল, মহাকাল মন্দিরের কথা জানো?

আমরা এই কালামুখীর কথা জানি, কালামুখী যদি রেগে থাকে তবে এইরকম হয়, বৃষ্টি হয় না, জঙ্গলে পশু থাকে না, ফসল মরে যায়, মেয়ে মানুষের পেট খসে যায় আপনা আপনি....।

তাম্রধ্বজ আবার বলেছিল, মহাকাল উজ্জয়িনীতে আছেন, তিনি সমস্ত দেবতার চেয়ে বড় দেবতা, তোমরা ময়ূর ময়ূরীকে ছেড়ে দাও।

উঁহু! কালামুখী রক্ত চায়, মাটিও রক্ত চায়, এর আগেও কালামুখী খেয়েছে। একবার, একজোড়া কৌতর খেল, তারপর একটা কুকুর, তারপর এই ময়ূর ময়ূরী নিচ্ছে, রক্ত না দিলে ঠাকরুণ জল দেবে না।

তাম্রধ্বজ বলেছিল, তোমরা ময়ূর ময়ূরীকে ছেড়ে দাও, তারা মেঘ ডাকলেই মেঘ আসবে।

সকলে হই হই করে উঠেছিল, তুমি কে, তুমি অন্যায় কথা বলছ কেন, কালামুখী রক্ত চায়, আরম্ভ কর, ঢাক বাজা, শিঙা ফুঁকে দে।

তাদের সেই বাদ্যযন্ত্র ভয়ানক। তার শব্দ যেন মেঘের গর্জনকে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল। লোকজন নাচতে লাগল। তাদের বেশির ভাগই পান-উন্মত্ত ছিল। একজন ময়ূরীর গলা ছিঁড়ে দিল। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল। সেই রক্তে কালামুখী প্রস্তরখণ্ড স্নান করল। রক্ত দেখে মানুষগুলি আরো উন্মত্ত হয়ে গেল। তাম্রধ্বজ দুহাতে মুখ ঢেকেছিল। শুনতে পেল ময়ূরীর মুণ্ড ছিঁড়ে নেওয়া হলো, ময়ূরকে বলি দেওয়া হবে। সেই ভীষণ দগ্ধ দুপুরে ময়ূরের আর্তনাদ শোনা গেল। তা শুনে লোকজন আরো উন্মত্ত হয়ে উঠল।

তাম্রধ্বজ চোখ খুলে দেখল মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেছে। ময়ূরটি পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে প্রস্তরখণ্ডের কোলে। বৃদ্ধ নিষাদ বসেছে পুরোহিতের আসনে। মন্ত্র পাঠ হচ্ছে। আশ্চর্য সেই মন্ত্র—

বৃদ্ধ নিষাদ ডাকে, কালামুখী জ্বালামুখী কী করো বসিয়া।

একজন ধুয়ো দেয়, মেঘ নাই পানি নাই, বুক যায় ফাটিয়া

কালামুখী জ্বালামুখী কী করো বসিয়া
রক্ত লাও রক্ত খাও রক্তে যাও ভাসিয়া
কালামুখীর জিভ দ্যাখো, লালা না ঝরিল
পানি বিনা লালপোকা বেঘোরে মরিল
লালপোকা নীল পোকা নীল মাছির ছাই
কালামুখী জ্বালামুখী করে খাই খাই।

বৃদ্ধ নিষাদ গর্জন করে উঠল, কালামুখী খেতে চায়, ময়ূরীর জোড় চায়, ময়ূর ময়ূরী দুটাকেই খেতে চায়, খেলে ওর বুক ঠাণ্ডা হবে, ওর বড় তিয়াস, আমরা পানি চাই, মাগি রক্ত চায়, রক্ত খেয়ে পানি দিবে, শুনো ওই যে মানুষটা এয়েছে, ওর দেশের কথা আমি শুনেছি।

কী ভাবে শুনলে, গিয়েছিলে?

না, শুনেছি, শুনেছি বিষ্টি নাই তোমার ওদিকেও, বৃষ্টির জন্য একটা মানুষ পুড়ায়ে দিয়া হয়েছে, হয় নাই?

তাম্রধ্বজ অবাক হয়েছিল। স্তম্ভিতও। উতঙ্কের মৃত্যুর খবর এইভাবে এসে পৌঁছেছে এতদূরে। মানুষটি অতিবৃদ্ধ। তার নাকের নীচে ঘন করে শনের কুণ্ডলীর মতো পাকা গোঁফ। মাথার সমস্ত চুল শাদা। গায়ের চামড়া স্খলিত ; চোখ দুটি ঘোলাটে, কোমরে একখানি রক্তবস্ত্র। নিষাদদের অনেকজনের কোমরেই বল্কল। বস্ত্র যাও ছিল তা ছিন্নপ্রায়। তারা সবাই হাঁ করে বৃদ্ধ, অতি প্রাচীন নিষাদের দিকে তাকিয়ে ছিল।

বৃদ্ধ নিষাদ বলল, আমি শুনেছি ওই উজানি নগরে বাস করে বড় বড় মানুষ, বহু ধনরত্ন, উজানি নগরে প্রায় আকাশ পর্যন্ত উঁচু মন্দিরের চূড়া, উজানি নগরে সব মানুষ সুখে থাকে।

তাম্রধ্বজ বলেছিল, সত্য কথা।

উজানি নগরে কোনো অভাব নাই।

তাও সত্য।

উজানি নগরের মানুষের ঘরে ঘরে হাতি বাঁধা থাকে।

তাও থাকে।

শাদা ঘোড়ায় চেপে মানুষেরা ঘোরে।

তাও সত্য।

উজানি নগরে যে মেয়েমানুষেরা থাকে তারা অতি সুন্দর।

সত্য বটে।

তাদের গায়ের বস্ত্র চাঁদের আলোর মতো, চোখ দুটি হরিণের মতো টানা, তারা যখন হাসে মুক্তো ঝরে।

তাম্রধ্বজ হেসেছিল, সত্য তো নিশ্চিত।

তাদের চোখে কখনো পানি আসে না, মনে কোনো দুঃখ নাই।

তাম্রধ্বজ ঘাড় কাত করেছিল।

উজানি নগরে কোনো দুঃখ নাই, কষ্ট নাই।

সত্য হতে পারে।

কিন্তু উজানি নগরে বিষ্টি নাই।

হ্যাঁ।

অনেক অনেক দিন বিষ্টি নাই।

হ্যাঁ।

তখন উজানি নগরের এক বণিক তার দাসকে পুড়ায়ে সেই ছাই মাঠে মাঠে ছড়ায়ে দিল।

কে বলল?

সত্য কিনা বলো, আমরা কুকুর, কৌতর, ময়ূর দিচ্ছি কালামুখী ঠাকরুণরে, উজানি নগরের মহাকাল ঠাকুর গোটা একটা মানুষ নিল।

তাম্রধ্বজ বলেছিল, হ্যাঁ সত্য।

কিন্তু রক্তের বদলে মাটিতে ছাই পড়ল, উজানি নগরের ঘরে ঘরে সেই ছাই উড়ে গেল, এক নদী আছে ক্ষিপ্রা, তার পানিতেও সেই ছাই পড়ল, মহাকাল তবু সন্তুষ্ট হল না, উজানি নগরের মানুষের মনে কোনো দুঃখ ছিল না, কিন্তু বিষ্টি না হলে তো চলে না, তারা বিষ্টি চায়।

এসব কথা কে বলল?

সে বারণ করে গেছে, বলা বারণ।

মানুষটা কে? চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তাম্রধ্বজ।

বলা তো বারণ, শোনো সবাই, উজানি নগরে ছিল সাত সরোবর, কোথাও পানি নাই, যত কুয়া কোথাও পানি নাই, মেয়েমানুষের মুখে তাই হাসি নাই, তাহারা সিনান করতে পারে না, চাঁদের আলোর মতো সুন্দর সব মেয়েমানুষের গায়ে কলঙ্ক লেগেছে, ছাই-এর কালি।

তাম্রধ্বজ বলে, সব বলে গেছে সেই জন?

কী জানি, কতকটা বলেছিল সে, কতকটা বলে নাই, আমি বলছি, কথা তো এমনই হয়, হয়ে থাকে, বলছি উজানি নগরের মেয়েমানুষের কথা, যাদের মুখে আশ্বিন মাসের মেঘের মতো হাসি, চুলে মেঘের মতো বরণ, সেইরূপ সব ঝরে যাচ্ছে দিনদিন, তাহারা আর কেউ রূপের গরব করতে পারে না।

তাম্রধ্বজ বলে, কী আশ্চর্য কথা, কে বলল?

যে বলেছে তার বারণ আছে, বলছি মেয়েমানুষের তো রূপ নাই আর, পুরুষমানুষও তাই অসুখী, উজানি নগরের রাজা তাই মহাকালের এক দাসীকে নিল অন্ধকারে গোপনে, শুনা যায় মহাকাল অমনই চায়, সুলক্ষণা মেয়েমানুষ যদি পায়, রাজার রূপ ধরে ভোগ করে সমস্ত রাত ধরে, লোকে জানে রাজাই নাকি নষ্ট করেছে মহাকালের এক যুবতী দাসীকে, আসল কথা হলো মহাকালই ধরল রাজার রূপ।

এসব কথা কে বলে গেছে?

তার তো বারণ আছে, সে আমাকে বলেছিল উজানি নগরের কোনো মানুষের সঙ্গে যদি দেখা হয় ওই কথা বলে দিতে, লোকে যা জানে তা সত্য নয়, লোকে যা জানে না তাই সত্য।

তাম্রধ্বজ শিহরিত হচ্ছিল বৃদ্ধ নিষাদপতিকে দেখে। বৃদ্ধ তার দিকে চেয়ে আছে, বলছে, নগরে ফিরে গিয়ে ওই কথা যদি জানাতে পারো, তবে নগর বাঁচবে। উজানি নগরের রাজা ভাল তাই সবাই ভাল, রাজার কলঙ্ক হলে সবারই তা হবে, শোনো এই সেই উজানি নগরের মানুষ, একে তোমরা উজানি নগরের কথা শুনাতে বলো।

তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করে, কার কাছে শুনেছো এসব কথা?

সেই বুড়া বারণ করে গেল, কত রাত ধরে আমাকে উজানি নগরের কথা শুনালো, ক্ষিপ্রা নামের নদী, নগরের মন্দিরচুড়া।

বুড়ো গেল কোথায়?

জানিনে শেষ রাত্তিরে উঠে চলে গেল, আমার তখন মরণ ঘুম, জেগে থাকলে বুড়োকে বেঁধে রেখে দিতাম, উজানি নগরের কত কথা বলল বুড়া।

আকাশের তারাদের কথা?

না তো, একটি বারও বলেনি তো।

আটান্ন

তাম্রধ্বজ বুঝতে পারছিল আচার্য বৃষভানুর কথা বলছে সেই প্রাচীন নিষাদ। গ্রাম্যবৃদ্ধ নিষাদপতি ধীরে ধীরে কথা বলছিল, নিজেকে মেলে ধরছিল। তাম্রধ্বজ তার কথায় নিশ্চিন্ত হয়েছিল যে আচার্য এই পথেই আছেন। তার অনুমানে কোনো ভুল ছিল না, সে জিজ্ঞাসা করেছিল, কবে এই গ্রাম ছেড়ে গেছেন তিনি?

কে একজন বলেছিল, বোধহয় তখন চাঁদ ছিল রোগা, সরু, বাঁকা।

উঁহু চাঁদটা তখন অর্ধেক ভরা ছিল, তারপর তো ভরতে ভরতে পুন্নিমে হলো।

উঁহু, অর্ধেক ভরা ছিল, কমতে কমতে অমানিশি হলো, সেই অমানিশিতে কী ঘোর, এখন অমানিশিতে অন্ধকার বেশি হয়।

না, না পুন্নিমে হয়ে চাঁদ ছোট হতে লাগল, সে কবে হলো?

তাম্রধ্বজ হিসেব করছিল মনে মনে। যেদিন আচার্য আশ্রম ছাড়লেন, সেই রাত্রি ছিল কৃষ্ণা চতুর্দশী। কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর চাঁদ সমস্ত দিন প্রায় আকাশে ছিল, অস্ত গিয়েছিল অপরাহ্নে, সেই চাঁদ আবার পূর্ব দিগন্তে ক্ষীণ দেহ নিয়ে ভেসে উঠেছিল শেষ রাত্রে, তখন রাত্রি প্রায় মুছে যাচ্ছে। সমস্ত দিন ক্ষীণ চাঁদ আকাশে ভেসে আবার অপরাহ্নে অস্ত গেল, রাতটি থাকল চন্দ্রবিহীন, অমনই ছিল কৃষ্ণা চতুর্দশী। আচার্য কৃষ্ণা চতুর্দশীর অন্ধকারেই যাত্রা করেছিলেন। তারপর তো চাঁদ একটু একটু করে বড় হতে লাগল। পূর্ণিমা এল। সেই পূর্ণিমার পর আবার কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হয়েছে। আজ তিথি মতে কৃষ্ণা সপ্তমী। তাম্রধ্বজ হিসেব করল, চন্দ্রোদয় ঘটতে মধ্যরাত প্রায়, এখন যা বেলা চন্দ্র অস্ত গেছে। সে বৃদ্ধ নিষাদকে জিজ্ঞেস করে, কবে গেলেন আচার্য?

থাকেননি তো, শুধু সমস্ত দিন বিশ্রাম নিয়েছিলেন, মনে আছে সেদিন পৌর্ণমাসী ছিল, এই তো সেদিনের কথা।

হ্যাঁ হ্যাঁ পৌর্ণমাসী ছিল, সকলে বলল। বৃদ্ধের কথায় তারা নিশ্চিন্ত হয়েছে পূর্ণিমা তিথি বিষয়ে। তাম্রধ্বজ মনে মনে ভাবল, আচার্য এত বয়স নিয়েও প্রায় তার মতো গতিতে হেঁটে চলেছেন উত্তর পূর্ব দিক লক্ষ্য করে। আচার্যর শরীরে শক্তিতো কমেনিই মনে হয়।

বৃদ্ধ নিষাদ জিজ্ঞেস করল, উনি কে?

আচার্যর পরিচয় দিলে প্রাচীন মানুষটি কী বুঝল কে জানে? চুপ করে থাকল তারপর জিজ্ঞেস করল, আকাশের সব তারা চেনেন উনি?

হ্যাঁ, তাই তো জানি।

তখন কে যেন বলল, আকাশ তো চেনে পক্ষী, কৌতর, টিয়া, শকুন।

তাম্রধ্বজ জবাব দেয় না। সে বুঝতে পারছিল এই মানুষগুলি আচার্যকে চিনতে পারেনি। দেখতেই পায়নি। দেখবে কী করে এরা যে দুচোখ থাকতেও অন্ধ। অবন্তীদেশের অংশ হতে পারে এই কালামুখীর গাঁ, কিন্তু অবন্তীর আলো এখানে এক বিন্দুও পৌঁছয়নি। এই অন্ধ প্রাকৃতজনেরা জানেনা তাদের দেশের নাম অবন্তী। অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনীর আর এক নাম বিশালানগর। এরা জানেনা ওই বিশালানগরের আর এক নাম পদ্মাবতী কেননা পদ্মাসীনা লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান ওই নগরে। এরা জানে না ওই পদ্মাবতী নগরেরই নাম কুমুদবতী, কেন না সপ্তসরোবরে সমস্ত বৎসর রক্তপদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে। কুমুদবতী উজ্জয়িনী নগরের সঙ্গে অমরাবতীর তুলনা করা হয়। দেবরাজ ইন্দ্রের রাজধানী অমরাবতী নগরের মতোই অবন্তীর রাজধানীতে শোক তাপ জরা মৃত্যু যেন কিছুই নেই। অমরাবতী যেমন দেবতাদের বাসভূমি, অবন্তীর রাজধানীতে উজ্জয়িনীতেও যেন বাস করেন তাঁরা, তাঁদের সঙ্গে থাকে অপ্সরারা, তাদের রূপের আলোয় নগর ঝলমল করে। সুমেরু পর্বতে অধিষ্ঠিত সেই নগরের মতো এখানেও যেন মন্দার, পারিজাত, সন্তানক, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন—পাঁচটি দেববৃক্ষ রয়ে গেছে কোথাও। এই দূর দেশী প্রায় নিষাদেরা যেমন জানেনা ওই সব কথা, তেমনি জানে না এখন আর সেই উজ্জয়িনী নেই। তারা খোঁজও রাখে না যে অমরাবতীর গৌরব ধীরে ধীরে নষ্ট হয়েছে, এখন কেউ খুঁজেও পাবেনা পাঁচ দেববৃক্ষ। পদ্মাবতী লক্ষ্মী ছেড়ে গেছেন উজ্জয়িনী তাই ওই নগরের হতশ্রী দশা সর্বত্র। সপ্তসরোবরের জল শুকিয়ে যাওয়ায় রক্তপদ্মর চিহ্ন কোথাও নেই তাই কুমুদবতী নামটি আর কেউ কখনো উচ্চারণই করবে না।

তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করল, উনি কোন দিকে গেছেন?

বৃদ্ধ নিষাদ মাথা নাড়ল, বলল, তখন তো আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন উনি।

উনি ওঁর অভিপ্রায় বলেননি?

না, বলেছেন শুধু উজানি নগরের কথা, দাসের মৃত্যুর পরও পানি নাই, সুলক্ষণা দেবদাসীর সঙ্গে রতিকর্মেও পানি নাই।

আর কী বলেছেন?

বলেছেন উজানি নগরের কথা, মহাকালঠাকুর খুব জাগ্রত।

হ্যাঁ জাগ্রতই তিনি। তাম্রধ্বজ দূর দক্ষিণ পশ্চিমে মহাকালের উদ্দেশে প্রণাম করল, বলল, তিনি উজ্জয়িনীকে রক্ষা করেন।

যুবতী সুলক্ষণা কি ছিল না?

কে বলেছে?

তা হলে পানি নাই কেন?

কী বলছ তুমি?

বৃদ্ধ নিষাদ বলে, ওভাবে পানি আসে, তবে আমাদের মিলন হয় জমিনে, ফসলের ক্ষেতে, সেই যুবতীকে হতে হবে অক্ষত, পুরুষকেও হতে হবে শুদ্ধ, কোনো মেয়েমানুষকে যে ছোঁয়নি এ পর্যন্ত—রাজার কি বিবাহ হয় নাই?

রানী আছেন, রাজা সব সময় সুলক্ষণযুক্ত, রাজা সব পারেন।

কিন্তু শুনেছি রাজার বেশে তিনি মহাকালঠাকুর।

হতে পারে।

তুমি কী জান?

কিছুই জানিনা। তাম্রধ্বজ বলে।

তা বললে কী করে হবে, রাজা যদি শুদ্ধ না হন, রতিক্রিয়া করে থাকেন আগে, তবে কী করে আকাশে পানি আসে, আর যুবতীকে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল ফসলের জমিনে, মন্দিরে কেন?

জানিনা।

মানুষ যদি দিলে, তবে তার রক্ত ছিটায়ে দিলে না কেন জমিনে, তাতে বৃষ্টি আসতই, পুড়ানোর কথা কে বলেছিল?

তাম্রধ্বজ বলল, আমি জানি না, আমি তখন বোধহয় ছিলাম না নগরে।

বৃদ্ধ নিষাদ জিজ্ঞেস করে, তুমি কী জান?

তাম্রধ্বজ হেসেছিল, আমি বেরিয়েছি তাঁর খোঁজে যিনি তোমাদের এই গ্রামে এসেছিলেন।

বৃদ্ধ নিষাদ বলল, এটাই অবাক কথা, তিনি এল দেখলাম, গেল তা দেখতে পেলাম না, এখন মনে হয় তিনি আসেই নি।

তাহলে তাকে দেখলে কী করে?

দেখেছি কী?

না দেখলে এসব জানলে কী করে?

বৃদ্ধ বলে, স্বপনে হতে পারে, তুমি উজানি নগরের কথা বলো।

তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করে, তোমরা কেউ জাননা কোনদিকে গেছেন তিনি?

তিনি মিলিয়ে গেছেন, এমন তো হয়।

হয়, কী করে হয়?

শুনেছি এমন হয়, নেড়া নেড়িরা পারে।

উনি তো তা ছিলেন না।

কী জানি।

কোনো এক রমণী খিলখিল করে হাসে, বলে, ধরে নাও তিনি আসে নাই।

তবে কে এল?

কেউ আসে নাই। বলল বৃদ্ধ নিষাদ, তুমি বলো কী করে জানলে এই কালামুখীর গাঁও তোমার অবন্তী দেশে পড়ে?

তাম্রধ্বজ জানে অবন্তীর সীমা অনেক অনেক বড়। ছয় পক্ষ সাতপক্ষ হেঁটেও এদেশ পার হওয়া যাবে না। তার দশার্ণদেশও অবন্তীর বশ্যতা নিয়েছে। এক বণিক বলেছিল, তার বৎস্য দেশ থেকে রওনা হয়ে এক পক্ষের মধ্যে অবন্তী দেশে পড়ল, তারপর হেমন্ত গেল, শীত গেল, এসে পৌঁছল নানা দেশ

ঘুরে ঘুরে, সবই নাকি অবন্তীর অধীনে, অবন্তীর রাজার জয়ধ্বনি দেয় সবাই, সে দেশে অন্য রাজা থাকলেও অবন্তীর কথাই বলে সবাই।

বৃদ্ধ নিষাদ বলল, অবন্তীর রাজা তাহলে এই জগতের রাজা?

হ্যাঁ।

উজানি নগরে তাঁর বাস?

হ্যাঁ, তাইই তো।

তুমি রাজাকে গিয়ে বলো আমাদের এই গাঁ জ্বলছে।

ফিরে বলব।

তুমি রাজাকে গিয়ে বলো পানি নাই কুথাও।

বলব।

পানির অভাবে জীবজন্তু বৃক্ষ মানুষ মরে যাচ্ছে।

তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করল, কবে কোথায়?

এই তো যাও ওইদিকে, উত্তর পশ্চিমে, দেখতে পাবে।

তাম্রধ্বজ বলল, কী দেখতে পাব?

মরা জন্তু জানোয়ার, আকাশের শকুন নেমে এসেছে, রোজই মরছে, মরলে ওদিকে ফেলে আসি, শকুনে খেয়ে বাঁচুক।

তাম্রধ্বজ দেখল গ্রাম্য বৃদ্ধ নিষাদের চোখ দুটিতে কোনোরকম ভাব নেই। কেমন যেন মৃত পশুর মতো চোখ নিয়ে বৃদ্ধ কথা বলে যাচ্ছে। বৃদ্ধ বলছে, রাজাকে বলো অন্ন নাই কোনো ঘরে।

বলব।

যদি সুলক্ষণা মেয়েমানুষ না থাকে উজানি নগরে, আমরা দেব, রাজা আসুন এখেনে, এই মাঠ জমিন পড়ে আছে তার জন্য।

কী বলছ তুমি!

ঠিক বলছি, এত জমিন! পানি নাই, ঘাস পর্যন্ত মরে যাচ্ছে।

সে তো সব দিকে।

রাজাকে বলো তাঁর রথে চেপে উজানি নগর থেকে কালামুখীর গাঁতে আসুন, এই মাঠ জমিন তাঁর জন্য আছে, আছে অক্ষতযোনি যুবতীকন্যা, যার কোনো অঙ্গ এখনো কোনো পুরুষ কামভাবে ছুঁয়ে দ্যাখে নাই, আমরা তারে রাজার জন্য রেখেছি।

কী হবে?

রাজা মন্দিরের দাসীকে ভোগ করল, কিন্তু আকাশে মেঘ এল না, দাসী নিশ্চয়ই সত্য কথা কহে নাই, আর রাজা কেন জমিনে যায় নাই সেই দাসীকে নিয়ে।

তাম্রধ্বজ চুপ করে থাকে। বৃদ্ধ নিষাদের মাথাটি পরিষ্কার নয়। একই কথা ঘুরে ঘুরে বলছে। কোন কথা বলেছে, বলেনি তা ভুলে যাচ্ছে বৃদ্ধ। আবার বলছে সেই কথা। কিন্তু তাম্রধ্বজ অবাক হচ্ছে আচার্য কী ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন এদের, তা ভেবে। উতঙ্কর মৃত্যু বা দেবদাসীর সঙ্গে রাজার গভীর গোপনে অন্ধকারে মন্দির মধ্যে রতিক্রিয়া, এই দুই ঘটনা তো উজ্জয়িনীর কলঙ্ক, সেই কলঙ্ককে নিজের মনের ভিতরে অন্যভাবে লালন করে রেখেছিলেন আচার্য বৃষভানু। নিজে ব্যর্থ হয়েছেন অনাবৃষ্টির কালকে সুবৃষ্টির সময়ে পরিণত করতে। তাই উতঙ্কর মৃত্যু আর দেবদাসী ধর্ষণকে বৃষ্টির সম্ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ক্রিয়াকলাপ হিসেবে ভেবে রেখেছেন। এতো আচার্যর ভয়ানক ব্যর্থতা। আচার্য তো কখনো এমন বিশ্বাসের কথা বলেননি তাকে, তাহলে এই নিষাদরা ওসব শুনল কী ভাবে আচার্যর কাছে। নাকি আচার্য শুধু উতঙ্কর মৃত্যু আর রাজার কলঙ্কর কথা বলেছেন, বলেছেন মানুষের চরম নির্দয় হৃদয়ের কথা, কামনার ভয়ানক স্ফূরণের কথা—তাকে ওই ভাবে ভেবে নিয়েছে নিষাদ বৃদ্ধ।

বৃদ্ধ নিষাদ বলল, সিনান করতে হবে, মোদের এখানে নদী নাই, জলকুন্ড আছে, পাতালের জল উঠে সবসময়, সেই জলে সিনান করে নেবে শুদ্ধ পুরুষ আর মেয়েমানুষ, তারপর মন্তর দিয়া হবে কালামুখীর, তারপর দু'জনার মিলন হবে সন্ধ্যাকালে যখন মেয়েপুরুষের মিলন হয়, মিলনের সময় হয় যখন, রাজারে

বলো কালামুখীর গাঁ মরে যায়, শকুন নামছে দিনভর, শকুনে রাতেও মড়া পাহারা দেয়, তিনি এসে কালামুখীর জমিনে আমাদের কন্যাটারে ভোগ করুন, তাঁর দেশে আবার বিষ্টি হবে।

তাম্রধ্বজ বলল, থাক, বলা যাবে।

রাজাকে বলো ফসলহানি তাই ফসল নাই, অন্ন নাই, ফসল যদি হয় সুবিষ্টিতে, তখনো অন্ন থাকে না, সুবিষ্টি অনাবিষ্টি সব এক, অনুমানই।

কেন?

দস্যু লুটে নিয়ে যায়, আমাদের রাজা আছে শুনলাম, কিন্তু রাজা আমাদের রক্ষা করে নাই কোনো কালে, রাজা থাকতে মোদের এমন হয় কেন?

তাম্রধ্বজ বলল, রাজাকে জানাব।

তখন বৃদ্ধ নিষাদ তার দিকে তাকিয়ে থাকল মৃত পশুর চোখের মতো তার চোখ দুটি স্থির করে। অনেকক্ষণ দেখে বলল, তুমি মোদের রাজা নও তো? তিনি রাজার কথা এমনই বলে গিয়েছিল।

চমকে উঠেছে তাম্রধ্বজ, না আমি কেন হবো?

শুনেছি রাজারা দেশ দেখতে বেরোয়, প্রজার কষ্ট আনন্দ দেখতে বেরোয় গরিবের বেশে, কেউ যাতে না চিনতে পারে তিনিই রাজা।

তাম্রধ্বজ হাসে, সত্য।

মোরা মোদের রাজারে কখনো দেখি নাই, মোদের যে রাজা আছে তা আমাদের জানা ছিল নাই, তাহলে মোরা রাজারে খুঁজে নেব কী করে?

দেখলেই চিনতে পারবে।

সে কী করে সম্ভব হবে?

হবে, হাজার মানুষের ভিতরেও রাজা এসে দাঁড়ালে চেনা যাবে।

প্রাচীন নিষাদ বলল, রাজা কি মানুষের মতো হবে না?

মানুষই তো, মানুষই মানুষের রাজা হয়।

আশ্চর্য। তা হলে কী করে চেনা যাবে?

দেখলেই মনে হবে তিনিই রাজা হতে পারেন, সবার থেকে আলাদা।

বৃদ্ধ চুপচাপ হয়ে গেল। তাম্রধ্বজ ভাবছিল তার অবয়বে নিষাদের ভাব আছে ; কুঞ্চিত চুল, তাম্রবর্ণ তাই তাকে রাজা বলে ভেবে নিয়েও সেই ভাবনা ত্যাগ করেছে বৃদ্ধ। এখন বৃদ্ধ বুঝে উঠতে পারছে না রাজা কেমন হতে পারেন। রাজা মানুষই যদি হবেন, তবে সেই মানুষটাকে আলাদা করা যাবে কী করে? রাজা যদি রক্ত মাংসের মানুষ হন তবে তিনি রাজা হন কী করে?

একটু বাদে বৃদ্ধ নিষাদ বলল, রাজার রূপ কেমন বলে দাও দেখি।

এক যুবতী খিলখিল করে হেসে ওঠে আচমকা, রাজার কি মাথায় শিং থাকে যে সব মানুষ আর সে এক নয়?

তাম্রধ্বজ যুবতীকে দেখল। কৃষ্ণকায়া, বৃত্তাকার মুখ, ক্ষুদ্র দুটি চোখ, কপালে হয়ত বা রক্তচন্দন। তার যৌবন এখন পরিপূর্ণ, কিন্তু অন্নাভাবে সেখানে ভাঙনের চিহ্ন। যুবতী হাসছিল, হাসির সঙ্গে তার সমস্ত দেহে ঢেউ উঠছিল। তাম্রধ্বজের মনে পড়ল ভয়ানক বর্ষায় তার দশার্ণদেশের বেত্রবতী নদীর উচ্ছ্বাসের কথা।

যুবতীর হাসিতে বৃদ্ধ নিষাদ অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে ধমকে উঠল, অ্যাই থাম তুই কালামুখী, রাজা আসবে এদেশে, আগে এল সেই বুড়া, তারপর এইজন, এইবার রাজা, রাজা এলে এদেশে মেঘ আসবে, পানি নামবে, রাজা মেঘ আনতে পারেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই। অবাক হয়ে যায় তাম্রধ্বজ, সবাই এক সঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ, তাইই সত্য, রাজা যদি আসে মেঘ এসে যাবে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের রাজা আছে, উজানি নগর থেকে রাজা আসবে যখন পানিতে ভেসে যাবে কালামুখীর গাঁ।

তাম্রধ্বজ চোখ বুঁজে শুনেছিল মানুষগুলির গম্ভীর উচ্চারণ, তার মনে হচ্ছিল কথাগুলি সত্য। সেও তাদের সঙ্গে গলা মেলাল। বলতে লাগল আশ্চর্য এক সম্ভাবনার কথা। মনে হচ্ছিল, রাজা ভর্তৃহরি

যদি শুনতে পান এই সমস্ত কথা কোনোদিন, ধন্য হয়ে যাবেন। উজ্জয়িনী নগরে তাঁর ভীষণ দুর্নাম। অনাবৃষ্টি দেবদাসী ললিতার সঙ্গে মহাকাল মন্দিরের ঘটনা রাজাকে খুব ছোট করে দিয়েছে। মানুষ একটি ঘটনার সঙ্গে আর একটিকে মিলিয়ে নিচ্ছে।

বৃদ্ধ নিষাদ বলল, রাজা আসুন, আমরা তাঁকে গো-বৎস দেব, পালান্ন আর গো-বৎসের সুস্বাদু মাংস তাঁকে পৌরুষ দেবে, তিনি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জয় করবেন।

বৃদ্ধ নিষাদ আবার বলল, রাজা আসুন, আমরা তাঁকে সবচেয়ে বড় ময়ূর দেব।

তারপর একটু থেমে বৃদ্ধ বলল, সুলক্ষণা কন্যা দেব, রতিকর্মে পটিয়সী হবে সে, রাজার সেবা করবে সে, রাজাকে দান করব আমরা, পশ্চিমে যে বন আছে, সেই বনের সব জন্তু দেব, তিনি আসুন, পানি নামুক।

তাম্রধ্বজের গায়ের রোমকূপ দিয়ে বৃদ্ধের কথাগুলি যেন দেহের ভিতরে প্রবেশ করছিল। শিহরণ আসছিল সমস্ত শরীরে। তাম্রধ্বজ দেখছিল কথাগুলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত নারীপুরুষের মুখের চেহারা বদলে যাচ্ছে। তাম্রধ্বজ শুনছিল কথাগুলি যেন আকাশের কোথাও লুকিয়ে থাকা মেঘের ডাকের মতো ভেসে উঠছিল থেকে থেকে।

উনষাট

সেইদিন সন্ধেতেই তাম্রধ্বজ আবার হেঁটেছিল। সমস্ত রাত ধরে। মধ্যরাতে চন্দ্রোদয় হয়েছিল। তারপর শেষ রাতে কৃষ্ণা সপ্তমীর চাঁদ মাথার উপরে। তাম্রধ্বজ পৌঁছেছিল এক লোকালয়ে। রোদ তীব্র হতে হতে আর এক গ্রামে। সেখানে গিয়েও শুনেছিল আচার্যর কথা। আচার্য তাঁর যাত্রাপথে উজ্জয়িনীর কথা বলে যাচ্ছেন। নগরের কথা, মহাকাল মন্দিরের কথা, দেবদাসী ললিতার সঙ্গে রাজার মিলনের কথা, উতঙ্কর মৃত্যুর কথা—অনাবৃষ্টির কথা—রাজার কথা।

গ্রামটি ধুঁকছিল যেন। মানুষগুলি কঙ্কাল প্রায়। কিন্তু তারা তাম্রধ্বজকে বরণ করেছিল আচার্যর মতো করেই। তারা মনে মনে হয়ত ভাবছিল এমন কেউ আসবে তাদের গাঁয়ে, যে বৃষ্টির মেঘ সঞ্চার করতে পারবে মাথার আকাশে। তারা রাজার কথা শুনেছিল আচার্যর কাছে। আচার্য ক'দিন আগেই এসেছিলেন এখানে। রাজার কথা গ্রামখানির কোনো মানুষই জানত না। তারা আচার্যর কথায়, পরে তাম্রধ্বজের কথায় রাজাকে চিনতে পারছিল যেন ধীরে ধীরে।

তাম্রধ্বজ বুঝতে পেরেছিল সেই সব প্রাকৃতজনেরা রাজাকে নিষ্কলঙ্ক পুরুষ ধরে নিয়েছিল। সেই রকম কথাই বলে গেছেন আচার্য। তারা ধরে নিয়েছিল দেবদাসী ললিতার সঙ্গে রাজার মিলন এই পৃথিবীকে শস্যশালিনী করে তোলার জন্য। সুবৃষ্টি হলে সুফসল হবে, তাতেই মানুষ বাঁচবে। তারা ধরে নিয়েছিল উত্তরপূর্ব দেশীয় পাহাড়িয়া দাস উতঙ্কর মৃত্যু ঘটানো হয়েছে অনাবৃষ্টিকে রোধ করতে। তাম্রধ্বজ জানতে পেরেছিল মানুষজন ধরে নিয়েছে রাজা আসবেন শীঘ্রই। রাজা এলে অনাবৃষ্টির দিনের অবসান হবে। গাঁয়ে গাঁয়ে একটি করে সুলক্ষণা কন্যাও নাকি অপেক্ষা করছে না-দেখা প্রায় অলৌকিক রাজার জন্য। তারা সায়ংকালে রাজার সঙ্গে মিলিত হয়ে আকাশে নিয়ে আসবে বজ্রগর্ভ মেঘ। মেঘ না এলে সবাই মরে যাবে।

সমস্ত কথা শুনতে শুনতে শিবনাথ জিজ্ঞেস করে, দেখা পেয়েছিলেন আচার্যর?

না।

তাহলে?

তৃতীয় রাত্রি, বোধহয় কৃষ্ণা নবমী হবে, শেষ রাতে চন্দ্রোদয় হলো, দেখি আমি এক প্রান্তরে, তারপর শেষ হলো রাত্রি, ভোরবেলা দেখি মাঠের ভিতরে একটি মনুষ্য কঙ্কাল।

সে কী! আর্তনাদ করে ওঠে শিবনাথ।

হ্যাঁ, তার দেহ থেকে সমস্ত মাংস ভক্ষণ করেছে শৃগাল এবং গৃধিনীতে, তবু শৃগাল একটি হাড় শুঁকে শুঁকে বিফল মনে ভোরবেলা চলে যাচ্ছিল দূরে কোথাও, জীবিত প্রাণীদের আর কিছু দেওয়ার ছিল না মৃত ব্যক্তির।

কোথায় যাচ্ছিলেন তিনি, তিনি কে?

পান্থজন। বিড়বিড় করে বলল তাম্রধ্বজ। শিবনাথ দেখল ভীষণ ভারে নুয়ে পড়েছে আচার্য বৃষভানুর শিষ্য। অন্ধকারে হাত বাড়ায় শিবনাথ। স্পর্শ করে তাম্রধ্বজকে, ধীরে ধীরে বলে, মুখ তুলুন আপনি, রাত্রিকাল, অন্ধকারে আপনাকে স্পষ্ট দেখা যাবে না, বলুন তিনি কে?

মহাপ্রান্তর পার হয়ে উত্তরপুবে যাচ্ছিলেন সেই পান্থজন, আমার মনে হয় তিনি দিকহারা হয়েছিলেন, সেই প্রান্তরে দিকহারা বৃদ্ধ ভীষণ রৌদ্রে লুটিয়ে পড়েছিলেন হয়ত, তাঁর শক্তির অতিরিক্ত শক্তি নিয়ে তিনি হাঁটছিলেন, অশক্ত শরীর নিয়ে আর পারেননি, অথচ সেখানে তো বাঁচার উপায় ছিল।

ছিল? জিজ্ঞেস করল শিবনাথ।

তাম্রধ্বজ বলে, সেই প্রান্তর অবশ্য মরুভূমি ছিল না, তার ভিতরে, খুব কাছেই একটি জলকুণ্ড ছিল, অদূরে ছিল একটি সুবৃহৎ পিপুল বৃক্ষ, তার ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল হিংস্র সারমেয়র দল এবং গৃধ্র, গৃধিনী, পান্থ সেই ছায়া কিংবা জলকুণ্ডের দিকে যেতে পারেনি। সে হয়ত, এমন হতে পারে, সত্যিকারের অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই ভয়ঙ্কর রৌদ্রদগ্ধ প্রকৃতি দেখতে পায়নি কিন্তু তার তাপ অনুভব করছিল, তাপে পুড়ছিল, ছায়া চাইছিল কিন্তু কোথায় তা, ঠাহর করতে পারছিল না, লুটিয়ে পড়েছিল গনগনে রৌদ্রের ভিতরে।

তাঁকে কী করে শনাক্ত করলেন, দেখেছেন তো শুধু কঙ্কাল!

কেন তাঁর রেশমি বস্ত্র, পুঁথির ক্ষুদ্র পেটিকা, তা তো ছুঁয়েও দ্যাখেনি মাংসাশী প্রাণী আর পক্ষীকূল।

তারপর?

হাড় ক'খানা রেশমি বস্ত্রে ঢেকে আমি ফিরতে লাগলাম শিপ্রানদীর দিকে, সমস্ত দিন, সমস্ত রাত হেঁটেছি ক'দিন, তারপর আচার্যর হাড় নিয়ে এসে শিপ্রাতীরে পৌঁছেছি, গভীর রাত্রে দাহ করেছি কাউকে না জানিয়ে, বুক ভেঙে যাচ্ছিল, কোন মানুষের কী পরিণতি!

• অশৌচ পালন করেননি?

না, আমি আচার্যর মৃত্যুকে গোপন রাখতে চেয়েছি, তিনি মহাগুরু ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর জীবিত প্রায় দেহই গৃধ্র, গৃধিনী আর সারমেয়র দল ভক্ষণ করতে আরম্ভ করেছিল কিনা কে জানে, না হলেও তাকে হত্যা করেছিল হয়ত তারা, জীবিত আচার্য শুনতে পেয়েছিলেন সারমেয় আর গৃধিনীর ভয়ঙ্কর উল্লাসধ্বনি—এমন মৃত্যু গোপন থাকাই তো ভাল।

কিন্তু মৃত্যুটা তো সত্য।

এই মৃত্যু সত্যরও অধিক, এখন রাজা, রাজ্য, রাজধানী বিপন্ন, আচার্যর মৃত্যু সংবাদ এলে মানুষ আরো বিপন্ন হয়ে পড়বে, রাজা নিজেও আঘাত পাবেন ভয়ানক, পারলৌকিক কাজ করলে মৃত্যুটিকে গোপন রাখা যেত না।

তারপর কোথায় ছিলেন?

তাম্রধ্বজ বলল, আচার্যকে দাহ করে আমি আবার বেরিয়ে পড়েছিলাম, দেখেছি সমস্ত দেশ বিপন্ন, যতদূর গেছি কোথাও নেই বৃষ্টির চিহ্ন, মানুষ ত্যাগ করছে পিতৃপুরুষের গ্রাম, বসতি, যাত্রা করছে অনির্দিষ্ট ভবিতব্যের দিকে, আর যারা থাকছে, তারা ভাবছে এভাবে চলতে পারে না, পরিবর্তন হবেই।

কী পরিবর্তন?

আকাশে মেঘ এলে তাও পরিবর্তন, একজন আমাকে বলল আকাশে নাকি একটি নতুন তারা দেখা দিয়েছে, তার ফলে এই বিপর্যয়।

এই কথা তো শুনিনি! শিবনাথ বলল।

নানারকম রটছে, সূর্যের রথের চাকা বসে যাওয়ার কাহিনীটিও ওইদিকে রটে গেছে, সত্য হলো আমি ওদিক থেকেই শুনেছি প্রথম, পরে কাহিনীটি উজ্জয়িনীতে রটে, আচার্য থাকলে ওসব কথা উচ্চারিত হত না।

আর কী শুনেছেন?

এইরকম, উত্তরপুবের মানুষ, কিছুদূর পর্যন্ত অপেক্ষা করছে রাজার জন্য, তারা ভাবছে আচার্যর কথা মতো রাজা গিয়ে অনাবৃষ্টির অবসান ঘটাবেন, আর দক্ষিণ পশ্চিমের মানুষ বলছে নতুন তারাটি সব ওলটপালোট করে দিচ্ছে, ওই দিক দিয়ে সেনাপতি বিক্রম তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে গিয়েছেন রেবানদী

পার হয়ে শূর্পারক বন্দরের দিকে।

সেই শূর্পারক, অপরা সমুদ্রের তীরে?

হ্যাঁ, আপনি কি গিয়েছেন কখনো সেখানে?

শিবনাথ বলল, গিয়েছিলাম, প্রথমযৌবনে, যৌবনকালটি পূর্বজন্মের বলে মনে হয়।

তাম্রধ্বজ বলল, ওইদিকে দস্যু তস্করেরা ভয়ানক সক্রিয় হয়ে উঠেছে, শূর্পারক, বারুগাজা থেকে যবন বণিকেরা উজ্জয়িনীর পথে আসে, কয়েকটি সার্থবাহকে সর্বস্বহারা করে দিয়েছে তারা, এতে উজ্জয়িনীর দিকে বণিকের আসা কমে যাচ্ছে।

শিবনাথ বলল, এখনতো অনুকূল বায়ু, এই সময়েই তো তারা আসবে, এরপর বর্ষা নেমে গেলে পথঘাট অগম্য হয়ে যাবে, তখন বন্দরেই অপেক্ষা করতে হবে, একদিনের পথ তিনদিনে অতিক্রম করা হবে।

তাম্রধ্বজ বলল, যেতে যেতে সেনাবাহিনীর লোকজন বলে গেছে উজ্জয়িনীর আকাশে যে নতুন তারাটি দেখা দিয়েছে, তা নিজস্ব জায়গায় স্থিত না হলে এইরকম চলবে অনাবৃষ্টি, খরা—আচ্ছা আমি তো জ্যোতির্বিদ্যার প্রথম পাঠটি পেয়েছি আচার্য বৃষভানুর কাছে, নতুন তারার খোঁজ আমি তো জানিনা।

আচার্য কী বলেছিলেন?

একটা কথা মনে পড়ল, আচার্য উজ্জয়িনী ছেড়েছিলেন সপ্তঋষির অন্যতম বশিষ্টর পাশে ক্ষুদ্রতম অরুন্ধতী তারাকে না দেখতে পেয়ে, আচার্য বলেছিলেন অরুন্ধতীকে না দেখা মানে মৃত্যু সমাসন্ন, তাঁর অনুমান সত্য হলো।

মাথা নামিয়ে থাকা শিবনাথ বলল, আমি সপ্তর্ষি মণ্ডলকে এখন আর দেখিনা, ভয়ে এখন উত্তর পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাই না।

তাম্রধ্বজ বলল, জানিনা কী থেকে কী হয়, কিন্তু কত মানুষকে দেখেছি কিছুই দেখতে পান না, জরাগ্রস্ত, অথর্ব, অন্ধ কিন্তু বেঁচে আছেন, দশার্ণ দেশে, আমার নগর বিদিশার প্রান্তে এক বৃদ্ধ বাস করেন, তিনি নাকি অনেকদিন শতবর্ষ পার করেছেন।

কে আর বয়স হিসাব করে রাখে, একটা কথা আমি জেনেছিলাম ধ্রুবদাসের কাছে সেই যৌবন কালে, শূর্পারক বারুগাজায় অপরা সমুদ্র যেমন বয়ে আনে যবন বণিকদের এই সময়, তেমনি আমাদের এই অবন্তী দেশ শস্যশালিনী হয় ওই সমুদ্র থেকে উঠে আসা বাতাসে, সেই বাতাস মেঘ বয়ে আনে উজ্জয়িনীর দিকে।

জানি, জানি যবন বণিকরা ওই বায়ুকে বলে মৌসম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধ্রুবদাস বলত বটে, মনে পড়েছে, যবন বণিকরা হাসতে হাসতে নাকি বলত মৌসম তারা তাদের বাণিজ্যতরীতে করেই নিয়ে আসে, তাকি সত্য?

তাম্রধ্বজ অন্ধকারের দিকে চেয়েছিল। আচমকা সে চুপ করে গেছে। ভাবছিল এই বিপুল পৃথিবী, আকাশে ওই লক্ষ তারা, অনাবৃষ্টি, সুবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বাণিজ্যবায়ু, মৌসম—কী আশ্চর্য সাজিয়েছেন মহাকাল। ওই যে সমুদ্র, সে নাকি দিকহীন কূলহীন, কিন্তু তারও পার আছে, সেদিকে কত দেশ আছে। তাম্রধ্বজের মনে এক গোপন বাসনা আছে, সমুদ্রের কোন পারে কোনদিকে আছে দ্রাক্ষাকুঞ্জে শোভিত গৌরবর্ণ মানুষের যবনদেশ, গ্রিক জাতিরা যদি অতদূর থেকে এই দেশে আসতে পারে, সে কেন যাবে না তাদের দেশে বাণিজ্যতরী নিয়ে। তার জ্যোতির্বিদ্যা শেখার আসল কারণটি তো ওই, আকাশের তারাদের চেনা থাকলে, তাদের গতিপ্রকৃতি জানা থাকলে সমুদ্রযাত্রায় সুবিধে হয়। তাম্রধ্বজ কল্পনা করে অকূল সমুদ্রে ভেসে আছে সে, মাথার উপর রাত্রিকালের আকাশ। মহাপ্রান্তরের ভিতরে আকাশ যেমন ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, সমুদ্রের উপরও তেমনই হবে নিশ্চয়ই। তখন, রাতের অন্ধকারে তারারা ব্যতীত আর কিছুই দৃশ্যমান নয়, তার পরিচিতও নয়। তারাদের চিনে চিনে সে তরী বয়ে যাবে। হেমন্তকালে যখন মৌসম ফিরে যায় যবন বণিকের সঙ্গে, তখনই তাম্রধ্বজের যাত্রা আরম্ভ হবে। সত্যিই কি তার ভবিষ্যতে অমন একটি দিন অপেক্ষা করে আছে? মহাসমুদ্রের মতো বিরাট জীবন, মহাকাশের মতো অন্তহীন জীবন! দশার্ণ থেকে এতদূরে একা একা রাত্রিকালে তাম্রধ্বজ ভেবেই চলে। ঘুম আসেনা কত রাত!

শিবনাথ বলল, একটি কথা বলি সাহস করে।

বলুন, ভয়ের কী কারণ আছে?

কে কোথায় আছে কে জানে, অন্ধকারে গাছগাছালিকে মানুষ ভ্রম হয়, শুনুন দস্যু তস্কররা যেমন লুণ্ঠন করে বণিক, পথিকের সর্বস্ব, সৈনিকরাও তো কম যায় না, সেনাবাহিনীও সেই কাজ করে।

আপনার পুত্রও তো সেনাবাহিনীতে ছিল।

তা থাকুক, সেনাবাহিনীতে বীর সাহসী সৈনিকরা যেমন থাকে, তেমনি থাকে লোভী, কুচক্রী, দুরাচারীরা, অস্ত্রের ক্ষমতা ভীষণ ক্ষমতা, অস্ত্রের অহংকার ভীষণ অহংকার, সেই অহংকারে রাজকর্মচারী, সেনাবাহিনী অত্যাচারী হয়ে ওঠে, উদ্ধবদাসকে দ্যাখেননি আপনি?

তাম্রধ্বজ বলল, সত্য, কিন্তু সর্ব অংশে নয়।

আমি দেখেছি তো বণিকের সর্বস্ব লুট করে ভাগের জিনিসপত্র নিয়ে আবার কলহে মত্ত হয়েছে সৈনিকের দল, তাদের অধিনায়কই এসব কাজে তাদের উদ্বুদ্ধ করে, নারী অপহরণ করে না সেনাবাহিনী?

করে হয়ত।

করে বলেই রাজকর্মচারীও সেই পথে যায়, তার ক্ষমতা তো রাজার ক্ষমতা, উদ্ধবদাস সেই ক্ষমতায় দুরাচারী, অহংকারী, আমার কী মনে হয় জানেন, বণিকরা যেন সত্যিই বৃষ্টিবায়ু নিয়ে আসে অপরা সাগর থেকে, বণিকরা না এলেও তারা তা পাঠিয়ে দেয় এই দিকে, কথাটা একবার আমাকে বলেছিল ধ্রুবপুত্র। আহা সে কত জানত! যেটি জানত না স্পষ্ট, কল্পনায় সত্য করে তুলত। এখন সেই দিকে বণিকদের রক্ষা করতে গেছে সেনাবাহিনী, সেনাবাহিনী কি বৃষ্টির মেঘ, বায়ু, মৌসমকে রুখে দেবে না দক্ষিণ পশ্চিমে, যদি তা দেয় তবে কি অনাবৃষ্টির কাল কখনো শেষ হবে?

তাম্রধ্বজ হাসে, আপনার কথা কি কখনো সত্য হবে? হবে না।

কেন, সেনাবাহিনীর অত অস্ত্র, অত ক্রোধ, তত লালসা, অত লোভ, অত কামনা, দখলের অত স্পৃহা, তারা কি পারবে না?

পারবে না যে তা আপনি জানেন, সবই মহাকালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, মহাকালের শক্তির কাছে সেনাবাহিনী তো তুচ্ছ, আকাশ পথে তার কোনো অধিকারই নেই, মানুষের কি ওই ক্ষমতা আছে, থাকতে পারে? মানুষ সব কিছু পারেনা বলেই জগত রক্ষা পেয়ে যায়, যার হাতে ক্ষমতা সে যদি জানত বৃষ্টির মেঘকে নিয়ন্ত্রণ করতে, শক্তিমানের দেশ শেষ করে দিত দুর্বলের পৃথিবী, মেঘ, বৃষ্টি, রোদ, মহাকালের ইচ্ছা, তাই কালামুখীর গাঁ-ও আশ্চর্য সুন্দর।

চুপ করে থাকল শিবনাথ। তার মনে হচ্ছিল যে পথে আসবে মৌসম — যবন বণিকদের সঙ্গে বর্ষার বাতাস, সেই পথে অগ্রসর হয়েছে সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর যাওয়া মানে ধ্বংস, লুণ্ঠন, হত্যা, ধর্ষণ—তা পার হয়ে শুভার্থী মেঘ, শুভার্থী বায়ু, কি আসতে পারবে এই দেশে? এই উজ্জয়িনীর আকাশে?

ষাট

সেনাবাহিনী গেছে রেবা নদীর ওপারে দক্ষিণ পশ্চিমে অপরা সাগরের কূলে শূর্পারক বন্দরের দিকে। সেখানে যবনদেশীর বণিকরা পণ্য সম্ভার নিয়ে নেমেছে অর্ণবপোত থেকে। সেনাবাহিনী তাদের রক্ষা করবে, নিয়ে আসবে উজ্জয়িনী নগরে। তাদের পিছু পিছু হয়ত এসে যাবে বর্ষার মেঘ। শিবনাথ বলেছে, বর্ষার মেঘের আগমনকে রোধ করবে সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনী চায় এদেশে আরো অনেকদিন অনাবৃষ্টি চলুক, শৃঙ্খলা ভেঙে যাক সব, তাহলে তস্কর, দস্যুকে দমন করতে গিয়ে নিরপরাধ মানুষকে, বিহ্বল বণিকক দমন করা তাদের পক্ষে সহজ হবে। লুণ্ঠন চলবে।

তাম্রধ্বজ বলল, বর্ষার মেঘ কি শুধু শূর্পারক বন্দর থেকে আসবে?

শিবনাথ চুপ করে আছে। শিবনাথ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছে তার অলীক ভাবনাটির কথা এভাবে ব্যক্ত করা হয়ত ঠিক হয়নি। তাম্রধ্বজ তো তাকে নিঃস্বার্থ সমর্থন দিল না, বরং তাম্রধ্বজকে দেখে মনে হচ্ছে সে অনেক পরিণত, বিচার বিবেচনা করে কথা বলে। তাম্রধ্বজ কে? দশার্ণদেশীয় জ্যোতির্বিদ, আচার্য বৃষভানুর শিষ্য। আচার্যর সঙ্গে রাজার মধুর সম্পর্ক ছিল। রাজা নির্ভর করেছিলেন আচার্যর উপরে, তিনি হয়ত ভেবেছিলেন এই ভয়ানক বৃষ্টিহীনতা থেকে মুক্ত হবার উপায় আচার্যই সন্ধান করে দেবেন। আচার্য বলে দেবেন কেন এই অনাবৃষ্টি। তিনি পারেননি, তাই ছেড়ে গেছেন নগর। আচার্যর

শিষ্য এই যুবকের সঙ্গেও তো রাজার সুসম্পর্ক, রাজা একে ব্যক্তিগত ভাবে চেনেন নিশ্চয়ই। তাহলে এর সম্মুখে সেনাবাহিনী সম্পর্কে কটুকথা উচ্চারণ করা গর্হিত হয়েছে। কে কোন কথা কীভাবে নেয়? সেনাবাহিনীর নিন্দার অর্থ তো রাজারই নিন্দা।

শিবনাথের কাছ থেকে জবাব না পেয়ে তাম্রধ্বজ বলল, মেঘের জন্মভূমি ওই অপরাসমুদ্র, আর আছে দক্ষিণপূর্ব দিকে পূর্বসমুদ্র, শূর্পারক থেকে আরো দক্ষিণেও মেঘ জন্মায়, দক্ষিণ পশ্চিমে মলয় পর্বতের উপত্যকায় উঠে আসা মেঘ উজ্জয়িনীর দিকে আসে তা জানেন?

মাথা নাড়ে শিবনাথ, আমি কী করে জানব, যখন ধ্রুবসখা ফিরে আসে শূর্পারক থেকে, সে আমাকে ওই কথা বলেছিল, তখন তার কঠিন অসুখ কিন্তু রহস্য করতে ভুলত না, বলেছিল যবন বণিকরাই মেঘবাহী বাতাসের অনুকূলে অর্ণবপোত ভাসিয়ে শূর্পারকে এসে পৌঁছেছিল।

আশ্চর্য! তিনি ধ্রুবপুত্রের পিতা?

হ্যাঁ, আমার ধ্রুবসখা, আমার অনুজ প্রতিম, বয়সে ছোট, কিন্তু জ্ঞানে-গরিমায় বড় ছিল ওই বয়সেই।

চমৎকার বলেছিলেন তিনি,আচার্য বলতেন ওই বায়ুই বাণিজ্যে প্রলুব্ধ করে যবন দেশের মানুষদের, তারা সমুদ্রে ভাসে, অবশ্য এই কথা আচার্য এক বণিকের মুখেই শুনেছিলেন, সেই বণিক আবার জ্যোতির্বিদ্যার অনেক খবর রাখত।

শিবনাথ বলল, আমি ধ্রুবসখার কথাটা বলতে গিয়ে অন্য কথা বলে ফেলেছি, যা বলার নয় তা বলে ফেলেছি, আপনি ভুলে যান।

তাম্রধ্বজ গন্ধবতীর পিতামহ বুঝল শঙ্কিত হয়ে উঠেছে আচমকা। কেমন গুটিয়ে গেছে। কুঁকড়ে গেছে মনে হয়। চাঁদ এখন পশ্চিমগামিনী, অস্ত যেতে তো সকাল হয়ে যাবে। তার ওপর আকাশে থাকবে কিছু সময়। চাঁদের আলো না থাকলে হয়ত বৃদ্ধ কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে কথা বলতেন। অন্ধকারে নিজেকে উন্মোচন করা যায় অনেক অনেক বেশি। তবু তাম্রধ্বজের মনে হলো তাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করে উঠতে পারছে না গন্ধবতীর পিতামহ। সে যদি নির্ভরতাটুকু না দিতে পারল, তবে কার কাছে গিয়ে সাহায্যপ্রার্থী হবে মানুষটি? বিষণ্ণ হয়ে কার কাছে ছুটে যাবে? কার অপেক্ষায় বসে থাকবে পথের দিকে চেয়ে? এই সমস্ত কথা মনে হতে জ্যোৎস্না প্লাবিত নদীর ওপারের দিকে চোখ মেলে তাকায় তাম্রধ্বজ। ভাবল, সেই বা কেন এতটা ভাবছে শিবনাথকে নিয়ে? সে তো ক'মাস আগেও এই পরিবারটিকে চিনত না, এখন এদের নির্ভরতা দেওয়ার অধিকার অর্জন করল কীভাবে? নদীর ওপার আবছা হয়ে ফুটে আছে চোখের সামনে। কিছু বোঝা যায়, অনেকটাই ধরা যায় না। সোজাসুজি, ওপারে একটি তরুণ বটবৃক্ষ আছে। সেই গাছটিকে আলো আঁধারে বিপুল মনে হচ্ছে যেন। তাম্রধ্বজ ওপার থেকে চোখ নামিয়ে আনল নদীর বুকে। মৃত এক অজগরের কথা মনে পড়ল তার। বিদিশানগরীর উপকণ্ঠে নীচৈঃ পাহাড়ের কোলে এসে মরেছিল সেই অজগর। বুড়ো হয়ে নিজে নিজেই। বোধহয় দীর্ঘদিনের বাসস্থান ছেড়ে সে নেমে এসেছিল নীচে। পাহাড়ের ওপর থেকে। তারপর এগোচ্ছিল বন নদীটির দিকে। তৃষ্ণার্ত ছিল হয়ত। তৃষ্ণার্ত হয়ে মরেছিল যে মস্ত প্রাণীটি, তাকেই যেন শুয়ে থাকতে দেখল তাম্রধ্বজ। দীর্ঘকালীন অনাবৃষ্টিতে নদী যেন মরেই পড়ে আছে। আহা! নদীর দিকে চেয়ে তাম্রধ্বজের মায়া হলো, ক্ষিপ্র গতিসম্পন্না এই নদী তার দু'পারকে শস্যশালিনী করে তুলেছে সেই আদি থেকে। নদী তার জন্ম থেকেই অবন্তীদেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এখনো ওর বুক খুঁড়ে জল তুলে নিচ্ছে উজ্জয়িনীর মানুষ। যতক্ষণ পারে নদী বাঁচাতে চেষ্টা করবে দু'পারকে। তাম্রধ্বজের মনে হলো ক্ষিপ্রা নদী — শিপ্রা নদী যেন তার দিকে চেয়ে আছে মৃতপ্রায় দেহটি নিয়ে, অনন্ত তৃষ্ণা নিয়ে। নদী জল চায়। ক্ষিপ্রা নদী এখন বার্ধক্যে গতিহীনা, ধুঁকছে যেন— তেমনই মনে হচ্ছে তার। এখন নদী তার কাছে সাহায্য প্রার্থী হয়তবা। তাকে বাঁচালে সেও বাঁচাবে এই দেশকে। আবার শস্যশালিনী হবে অবন্তী। নদীর দিকে তাকিয়ে তাম্রধ্বজের মনে হলো এই আকাল, অনাবৃষ্টিতে সকলে সকলের উপর নির্ভর করতে পারলে বোধহয় বেঁচে থাকতে পারবে। নির্ভরতা দেওয়ার শক্তি সকলকে অর্জন করতে হবে।

তাম্রধ্বজ আকাশে তাকায়। তারায় তারায় ঝলমলে আকাশের দিকে চেয়ে দশার্ণ দেশীয় যুবকটি যেন শক্তি প্রার্থনা করল। মানুষ তো ওই তারকাপুঞ্জ, নক্ষত্রমালার সন্তান। নক্ষত্র থেকে অনন্ত অন্ধকারের ভিতরে এক বিন্দু জলের মতো মানুষের প্রাণ যেন নেমেছিল এই পৃথিবীতে। প্রাণ তো আলোই। আলোর

বিন্দু থেকেই জন্ম নিল মানুষ। পৃথিবীর স্তব্ধতা ভাঙল মানুষের নিঃশ্বাসে, প্রশ্বাসে। অন্ধকার ভাঙল চোখের আলোয়। এইরকম ভাবতে ভাবতে তাম্রধ্বজ আকাশের দিকে চেয়ে শক্তি প্রার্থনা করল মনে মনে। তারপর বলল, আপনি কি ভয় পাচ্ছেন ঠাকুদ্দা?

শিবনাথ বলল, না, তা নয়, তবে কিনা বলতে চেয়েছিলাম ধ্রুবসখার কথাটি, বলেছি অনেক বেশি কথা, আপনি ভুলে যান।

কী ভুলে যাব, কী মনে রাখব?

বিষণ্ণ শিবনাথ বলল, আমি সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম, না হলে কেন বলব ওই কথা, অমার পুত্রও তো সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধেই গিয়েছিল—।

তাম্রধ্বজ বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুক, এই সমস্ত কথা এখানেই থাকবে, আমাদের ভিতরেই থাকবে, বিপন্নতো আপনি একা নন, প্রকৃতি যখন বিমুখ হয়, তার প্রভাব সকলের উপর পড়ে, রাজা যেমন অসুখী হন, প্রজাও, বৃষ্টি হলে তো সকলের দেহই শীতল হতো, অনাবৃষ্টিতে শুধু আপনিই পুড়ছেন না ঠাকুদ্দা, পুড়ছে বৃক্ষাদি, সমস্ত প্রাণী, নদী, মৃত্তিকা সবই।

শিবনাথ চুপ করে থাকে। প্রকৃতি যখন বিরূপ হয়, তখন সমস্ত জীবজগৎই বিপন্ন হয়। কীটপতঙ্গ পর্যন্ত। কিন্তু প্রকৃতির বিরূপতায় সাধারণ মানুষ যত কষ্ট পায়, প্রাণীকুল যেভাবে তৃষ্ণার্ত হয়, রাজা কি সেইভাবে হয়ে থাকেন? রাজা সর্বশক্তিমান। তাঁকে বিপন্ন করবে কে? তাকে কোনো বিপদই শেষ করে দিতে পারে না। তাম্রধ্বজ তরুণ। এই জীবনের কাছ থেকে পাঠ নিতে হবে তাকে আরো অনেক। বয়স না হলে মানুষ প্রকৃত প্রাজ্ঞ হয় না, কিন্তু বয়স যখন বাড়ে, জীবনের উপলব্ধিগুলি যখন সঞ্চিত হয়, তখন শক্তি কমে, সাহস কমে। মানুষের জীবন এইরকম।

তাম্রধ্বজ প্রসঙ্গ বদলে আবার পূর্বকথায় ফেরে, বলল, শূর্পারক বন্দরের দিক থেকে আসা মেঘ উজ্জয়িনীতে বৃষ্টি নামিয়ে চর্মন্বতি নদীর দুইকূলে বৃষ্টি নামিয়ে যমুনা নদী পার হয়ে যায়। ইন্দ্রপ্রস্থে বৃষ্টি নামিয়ে সে যায় আরো উত্তরপুবে, ওইদিকে হরিদ্বার, নীলধারা গঙ্গা, আরো দূরে গোমতি নদী, হিমালয় শুরু হয়ে গেল, ওইপথেই তো গিয়েছিলেন আচার্য, যেতে চেয়েছিলেন।

মেঘের পথে? জিজ্ঞেস করল শিবনাথ।

হ্যাঁ, কিন্তু মেঘ তো নেই, কে পথ দেখাত আচার্যকে? আর মেঘ ওখানে গিয়ে আবার পৃথিবীর পথেই ফেরে, স্বর্গের পথে নিঃশেষ হয়ে যায় না মানুষের মতো।

আশ্চর্য। শিবনাথ ভাবছিল সে যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে ধ্রুবপুত্রের কণ্ঠস্বর। এই যুবকের জ্ঞানভাণ্ডারও যে কম সমৃদ্ধশালী নয়। তাম্রধ্বজ বলছে ওখান থেকে, পৃথিবীর ওই প্রান্ত থেকে মেঘ আবার ফিরে আসে জনপদের দিকে। গ্রাম নগর মানুষজনকে যদি না ভেজাতে পারে, যদি শুষ্ক তৃণভূমিকে সজীব না করে তুলতে পারে, বিশীর্ণা নদীকে আবার চঞ্চলমতি, যৌবনশালিনী না করে তুলতে পারে, তবে মেঘের জন্ম কেন? মেঘ যদি ফসলের জন্ম না দিতে পারে, ময়ূরের পেখম না সাজাতে পারে, বিরহীর মনে আকাঙ্ক্ষার জন্ম না দিতে পারে, বিরহিনীর চোখে প্রেমিক কিংবা স্বামীর ফেরার পথটির ছবি না এঁকে দিতে পারে, তবে মেঘের জন্ম কেন? মেঘ হিমালয়ে পৌঁছে স্বর্গের পথে নিঃসঙ্গ যাত্রা করে না, উত্তরের জনপদের দিকে ফেরে। গঙ্গার দুকূল ধরে, গোমতীর দুকূল ধরে। যমুনার দুকূল ধরে এগিয়ে ঢুকে পড়ে তৃষ্ণার্ত মাটির দেশে। দূর উত্তরপশ্চিমে শতদ্রু, বিপাসা নদ-নদীকে পরিপূর্ণ করে তোলে সেই মেঘ......।

তাম্রধ্বজ ধীরে ধীরে বলে যাচ্ছিল। অবাক হয়ে শুনছিল শিবনাথ। শিহরিত হচ্ছিল। মেঘের স্মৃতি ফিরে আসছিল তার ভিতরে। তাম্রধ্বজ বলছিল, উত্তর, পশ্চিমগামী মেঘ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ক্রমশ, সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয় সিন্ধুনদের দুইপার জল সিঞ্চিত করে। দক্ষিণ পশ্চিমের মেঘ উত্তরপুবে যাত্রা করে আষাঢ় মাসে। দূর উত্তরপুবে, লৌহিত্যনদ, সেই নদের কথা তাম্রধ্বজ শুনেছে ওই দেশের বণিকদের কাছে।

গুবাকের দেশ তো! শিবনাথ বলল।

আপনি জানেন?

বাহ্ ধ্রুবসখা তো শূর্পারক বন্দরে গুবাকের বাণিজ্য করত যবনদেশীয় বণিকদের সঙ্গে, সে আমাকে

লৌহিত্যনদের কথা বলেছিল, তা আমি ধ্রুবপুত্রকে বলেছিলাম, লৌহিত্যনদ নাকি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে এই আষাঢ় মাসে, সেই নদী যে কত জল ধারণ করে তা অনুমানে ধরা যায় না, সমুদ্রের মতো হয়ে ওঠে এই আষাঢ় মাসে।

তাম্রধ্বজ ফিসফিস করছিল, লোহিত্য নদের উপত্যকায় সহস্র সহস্র গুবাকে বৃক্ষ এই সময়ে আকাশের মেঘ স্পর্শ করে থাকে। ওইদেশে শুধু বেনুকুঞ্জ আর গুবাক অরণ্য। গুবাক বৃক্ষরা, দীর্ঘ, উন্নত, শীর্ণকায়। বর্ষার মেঘবাহী বাতাসে আন্দোলিত হতে থাকে।

শিবনাথ জিজ্ঞেস করে, আপনি গুবাক বৃক্ষ দেখেছেন?

না, বণিকদের মুখে শুনেছি, নারিকেলের মতো হয়।

নারিকেল বৃক্ষ দেখেছেন?

না, শুনেছি তা গুবাকবৃক্ষেরই মতো, ধ্বজার মতো উঠে যায় আকাশপানে, একেবারে অগ্রভাগ পত্রবহুল হয়, আমি এঁকে দেখাতে পারি।

দেখেননি তো, কী করে আঁকবেন?

ওই দেশীয় বণিকরা আমাকে এঁকে চিনিয়ে দিয়েছিল, লৌহিত্যনদের উপত্যকায় এই সময় মেঘ এসে দাঁড়ায় গুবাক অরণ্যের মাথায়, গন্ধও তেমন ছড়িয়ে পড়তে থাকে চারদিকে, কে জানে পূর্বসমুদ্রের মেঘ এবার লোহিত্যনদের কুলে পৌছেছে কিনা।

পূর্বসমুদ্রের কথা ধ্রুবপুত্র শুনিয়েছিল। শিবনাথ বলল।

হ্যাঁ সেই সমুদ্রের বাতাসই পূর্বদেশে পৌছয়, অপরাসমুদ্রের বাতাস ওই পথে যায় না, তাহলে মেঘবাহী বাতাসকে নেমে যেতে হয় দক্ষিণে, তারপর আবার ঘুরতে হয় পূর্বদেশের দিকে, পিতামহ আমার মনে একটি আশ্চর্য যোগসূত্রের উদয় হয়েছে।

কী সূত্র?

সেই যোগসূত্রটি বোধহয় আপনিই ধরিয়ে দিয়েছেন।

কোনসূত্র, আমি তো অজ্ঞান মানুষ।

অজ্ঞান কিনা জানিনা, আমার মনে হচ্ছে মেঘবাহী বাতাসের সঙ্গে বণিককুলের গমনাগমনের একটি গোপন সম্পর্ক আছে।

এই কথাটি আপনিই বলেন, বলেছেন তো যবন বণিকরা উজ্জয়িনীতে বয়ে আনে, মেঘবাহী বাতাস, তার নাম মৌসম।

কথাটি তো আপনিই জানতেন, আমি যেন আপনার মুখেই শুনেছি।

শিবনাথ মাথা নাড়ে, আমি কিন্তু আপনার কাছে শুনেছি।

উঁহু, আপনিই না বললেন বণিকদের লুণ্ঠন করতে, অনাবৃষ্টির কাল দীর্ঘ করতে সেনাবাহিনী গেছে শূর্পারক, বারুগাজা বন্দরে।

আমি ওভাবে ঠিক বলতে চাইনি। শিবনাথ বলল অস্ফুটস্বরে।

আমি বলেছি কথাটা সর্বাংশে সত্য নয়, কিন্তু সর্বাংশে অসত্যও তো নয়, সেনাবাহিনী শূর্পারকের দিকে গেছে, ওখানে যবন বণিকেরা অর্ণবপোত থেকে নামে, তাদের সঙ্গে আসে মেঘ—সমস্ত কিছু রুদ্ধ করতে সেনাবাহিনীর যাত্রা, মনে হচ্ছে সত্য, কিছুটা সত্য, মেঘের সঙ্গে বণিকদের নিবিড় সম্পর্ক...।

শিবনাথ চুপ করে থাকে। সে বুঝতে পারছে না কী বলতে চায় তাম্রধ্বজ। তাকে সমর্থন করছে না তার বিপক্ষে বলছে, না তার মন বুঝে নিতে চাইছে তাকে সমর্থন করে। তাম্রধ্বজের কথাগুলো নিবিষ্ট হয়ে শোনে শিবনাথ।

তাম্রধ্বজ বলছিল, তার সঙ্গে পূর্বদেশের বণিকদের দেখা হয়েছিল শীতের মধ্য ভাগে, তারা হৈমন্তিক ফসল ওঠার পর এই দিকে যাত্রা করে, গুবাক সংগ্রহ করে আশ্বিন মাসে, ওই সময়ে গুবাক সম্পূর্ণ পেকে ওঠে, গুবাক, ধান্য সংগ্রহ করে তারা যখন উত্তর-পশ্চিমে যাত্রা শুরু করে শূর্পারক বন্দর, উজ্জয়িনী নগর থাকে তাদের লক্ষ্য, তখন তাদের সঙ্গে মেঘ যেন ফিরে আসে অপরাসাগরের দিকে, পূর্বসমুদ্রের দিকে, উত্তরপূবের মেঘ শীতকালীন বর্ষা নামায় এই দেশে।

এবার তো শীতকালীন বর্ষা হয়নি।

হয়নি, বণিকরাও কম এসেছে, বণিকরা তো আসছে না কোনোদিক থেকে, তাদের কাছে সংবাদ গেছে উজ্জয়িনী পুড়ছে অনাবৃষ্টিতে।

বণিকরা এলে মেঘ আসত? শিবনাথ জিজ্ঞেস করে।

কী জানি, তবে মনে হয় তারাই যেন মেঘবৃষ্টির নিয়ন্ত্রক

মহাকালই তো মেঘবৃষ্টি, প্রকৃতির নিয়ন্ত্রক, আপনিই তো বলেছেন।

তাই তো জানি। বলল তাম্রধ্বজ, কিন্তু সব কিছু আমরা জানি না ঠাকুদ্দা, বণিকরা বহু দেশে ঘোরে, তাদের পিছনে পিছনে মেঘ ওড়ে, মেঘই যেন তাদের পথ দেখিয়ে আনে, উত্তরপূর্ব দেশ থেকে যে মেঘ বায়ু পূর্বসমুদ্র, অপরাসমুদ্রের দিকে এসে নিঃশেষিত হতে থাকে, তারা কঠিন মৃত্তিকা কোমল করে, তখন মানুষজন কৃষিকর্মে প্রবৃত্ত হয় আবার, কৃষিকাজ ভাল হলে বণিকের ভাল, তাদের বাণিজ্য ভাল হয়, দেশ দেশান্তরে ফসল নিয়ে যেতে পারে, মানুষও ক্রয়বিক্রয় করতে পারে, বিনিময় করতে পারে।

অনাবৃষ্টি মানে তাহলে বণিককুলেরও দুঃসময়।

হ্যাঁ, আশ্চর্য উজ্জয়িনীর বণিক এখন যাচ্ছে দেশ ছেড়ে, যে মেঘবায়ু গোপনে এসেছিল তারা কি তাঁর সঙ্গে চলে যাবে?

মেঘ বায়ু কোথায়?

তাহলে কি উনি অনাবৃষ্টির বাতাস সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন?

তাই বা কী করে হবে। শিবনাথ সংশয় প্রকাশ করল।

অনাবৃষ্টি বয়ে নিয়ে গেলে তাঁর এই বাণিজ্যযাত্রা ব্যর্থ হবে?

তাই তো হওয়ার কথা।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল তাম্রধ্বজ, সমস্তটাই অনুমান।

ভোর হচ্ছিল। পাখিরা জেগে উঠছিল। আবার একটি দগ্ধতার দিন এল। দু'জনে হাঁটতে আরম্ভ করল। তারা চলেছে শূদ্রপল্লীর দিকে। ধ্রুবপুত্রের বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য রয়েছে ওখানে। নির্বাসনের আগে, গম্ভীরায় ফেরার আগে ধ্রুবপুত্র শূদ্রপল্লীর আশ্রয়ে ছিল কিনা জানা প্রয়োজন।

যেতে যেতে শিবনাথ দাঁড়ায়, আপনার কথাই সত্য বলে মেনে নিই যদি।

কোন কথা?

ধ্রুবপুত্র শূদ্রপল্লীতেই ছিল।

আপনি কি যাবেন না? তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করতে করতে বোঝে মনে মনে জটিল সংশয় তৈরি করে ফেলেছে বৃদ্ধ। শূদ্রের আশ্রয়ে থাকাকে মেনে নিতে পারছে নানা গন্ধবতীর ঠাকুদ্দা।

শিবনাথ বলল, মানুষের জীবনে অনেক ঘটনাই ঘটে, জীবনের প্রবাহ সেইরকম, তা নিয়ে অনর্থক ভেবে লাভ কী?

তাম্রধ্বজ বলল, পিতৃসখা ছিলেন শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত, তিনি আশ্রয়চ্যুত করলেন কামনার বশীভূত হয়ে, ধ্রুবপুত্রর প্রতি নিজেকে নিবেদন করেছিল গণিকা দেবদত্তা, দেবদত্তা তাকে ভালবেসেছিল।

শিবনাথের মাথা ঝুলে পড়ল। তখন ভোরের নীলাভ ভাব অন্তর্হিত হয়ে চারপাশে জেগে উঠছে উজ্জ্বল আলো। আলোয় শ্রীহীন লাগছে নদী, নদীতীর, ঝোপঝাড়, দূরের প্রান্তর এমন কী আকাশও। ধূলিমলিন বৃদ্ধার মতো উজ্জয়িনীর বাধ্যর্ক্যে ন্যুব্জ হৃতযৌবন দেহখানি থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বৃদ্ধ শিবনাথ চোখ বুঁজল। ভাবল, ধ্রুবপুত্র তার কে? গণিকা, শূদ্রপল্লী—ধ্রুবপুত্রের পবিত্রতা তো শেষই হয়ে গিয়েছে তখনই।

একষট্টি

শূদ্রপল্লীকে দূর থেকে দেখেছে শিবনাথ। কোনোদিন প্রবেশ করার প্রয়োজন হয়নি। ইচ্ছেও হয়নি। শূদ্রপল্লী নিয়ে কোনো কৌতূহলই ছিল না তার। এখন তাম্রধ্বজের পিছনে পিছনে সে পা দিয়েছে আরো শ্রীহীন এক দুঃস্থ জনপদে। উজ্জয়িনী নগর, গম্ভীরা, চারদিক ক্রমশ শ্রীহীন হয়ে যাচ্ছে সত্য, কিন্তু শূদ্রপল্লীতে যেন শ্রী ছিল না কোনোদিনই, সুতরাং তা হারিয়ে আবার কোন দশা হবে? শ্রীমণ্ডিত মানুষ যখন শোক রোগ তাপে জীর্ণ হয়ে যায়, তখনো রূপহীন রূপের ভিতরে একটি শ্রী থাকে, যা কখনো

নিঃশেষ হবার নয়। উজ্জয়িনী নগর, অবন্তী দেশ অনাবৃষ্টিতে শ্রীহীন হয়ে গেলেও, দেখেতো চেনা যায় এই নগর কেমন ছিল, বৃষ্টির পরে, সমস্ত কিছু আবার স্নিগ্ধ শীতল হলে কেমন হয়ে উঠবে এই নগর। শূদ্রপল্লী দেখে শিবনাথের অস্বস্তি হচ্ছিল। এমনিতে সমস্ত রাত জেগেছে সে। সমস্ত রাত যেন ভ্রমণ করে এসেছে দূর দিগন্তে, কখনো আচার্য বৃষভানুর সঙ্গে, কখনো তাঁর শিষ্য তাম্রধ্বজের সঙ্গে, কখনো মেঘের সঙ্গে শূর্পারক বন্দরে, আবার উত্তরপুবের পাহাড়ে, অপরাসমুদ্রে, পূর্ব সমুদ্রে। এখন ক্লান্ত লাগছে। সেই ক্লান্তি বাড়ছে ছেড়ে যাওয়া ভিটে বাস্তুগুলি দেখে। আঙিনার চুল্লিগুলি ভেঙে দিয়ে গেছে তারা। কাদা মাটি আর পাথরে তৈরি ঘরগুলি ভাঙেনি বটে, কিন্তু মানুষ চলে গেলে যেমন হয়, সব আপনা আপনিই ধ্বসে যাচ্ছে। আগুনে পোড়া একটি গাছ দাঁড়িয়েছিল। আচমকা শিবনাথের মনে হলো সূর্যের আগুনেই পুড়েছে যেন। এমন কি হতে পারে, অসহ্য উত্তাপ গাছগাছালিতে আগুন ধরিয়ে দেবে? যেমন হয় শীতের শেষে কখনো কখনো। ঘন অরণ্যে, পাহাড়ের দিকে। সে তাম্রধ্বজকে জিজ্ঞেস করল, আপনি দাবানল দেখেছেন?

এই আগুন তো উতঙ্ক ধরিয়ে দিয়েছিল, জানেন না?

জানি, শুনেছি, উতঙ্ক কেন এই কাজ করেছিল?

তাম্রধ্বজ মাথা নাড়ে, বলল, সেই খোঁজে ও তো এসেছি এখানে।

শিবনাথ জিজ্ঞেস করল, আপনি আগে এসেছেন এখানে?

মাথা নাড়ল তাম্রধ্বজ, সে সুযোগ হয়নি, অনেকদিন ধরে ভাবছি এসে জেনে যাব ধ্রুবপুত্র কোন আকর্ষণে এখানে আসত।

কথাটি পছন্দ করল না শিবনাথ, বলল, তাহলে তো গণিকাপল্লীতেও যেতে হয়।

যাব আমি।

যাবেন সত্যি?

না গেলে কি সত্য জানা যাবে?

সমস্ত সত্য জানার প্রয়োজন হয় না, কোনো কোনো সত্যের আশ্রয় অন্ধকারে।

তাম্রধ্বজ চুপ করে থাকে। শিবনাথ দেখছিল তাদের প্রবেশের সংবাদ এর ভিতরেই পৌঁছে গেছে পল্লীর ভিতরে। এক বৃদ্ধ, শীর্ণকায়, দীর্ঘকায়, কটিবস্ত্র ব্যতীত আর কোথাও কোনো আবরণ নেই তার, এগিয়ে এল, বলল, আপনারা কারা, কী প্রয়োজন, দেখে মনে হয় উচ্চবংশজাত?

কথাটিতে মুগ্ধ হলো শিবনাথ। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল জীর্ণ মানুষটির দিকে, তখন তাম্রধ্বজ বলল, এসেছি ধ্রুবপুত্রের খোঁজে।

বুড়ো পরাশর চমকে উঠেছে, তারপর কী যেন আন্দাজ করে দুটি হাত জোড় করে মাথা নামিয়েছে, বলল, আপনারা কারা, ধ্রুবপুত্র এখানে কেন থাকবে?

তাম্রধ্বজ বলল, ধ্রুবপুত্র এবং উতঙ্কের খোঁজে এসেছি।

আপনারা কি রাজার লোক?

উঁহু, আমরা আসছি গম্ভীরা গ্রাম থেকে।

আপনারা কি সেনাপতির লোক?

না, ইনি ধ্রুবপুত্রের পিতৃসখা।

শ্রেষ্ঠী পাঠিয়েছে?

না, আমরা ধ্রুবপুত্রের খোঁজ করছি।

পরাশর বলল, আমরা কিছুই জানি না।

বটমূলে বসল তাম্রধ্বজ, তার পাশে শিবনাথ। তাদের কয়েক হাত দূরে গ্রাম বৃদ্ধ পরাশর উবু হয়ে বসেছে। পরাশরের পিছনে নানা রকম মুখ, নানা বয়সের, নানা অভিব্যক্তি তাদের মুখে—ভয় মিশ্রিত কৌতূহল যেমন, তেমন কোনো অভিব্যক্তিই নেই, ভাবলেশহীন—এই রকম, নানারকম।

শিবনাথ জিজ্ঞেস করল, এখানে সে আসত?

কে, উতঙ্ক?

না, ধ্রুবপুত্র।

উতঙ্ক তো আসত, উতঙ্ক পুড়িয়ে দিল সব, ওই যে গাছটা দেখুন কীভাবে আগুন জ্বলেছিল, কত আগুন, কী আগুন।

তাম্রধ্বজ বলল, ধ্রুবপুত্রের কথা বলো।

আমরা তো জানি না।

ধ্রুবপুত্র এখানে আসত?

জানি না।

শিবনাথ বলল, আমি তার পিতৃসখা, আমার কাছে সে প্রতিপালিত, সে চলে গেল না বলে, আমরা তাকে খুঁজছি, তার অর্বতমানে আমরা বিপন্ন।

এখানে তো নেই।

ছিল তো, এখানে আসত না? তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করে, বলো, ভয় নেই।

আমরা কিছুই জানি না।

তাহলে ধ্রুবপুত্রকে ফেরাতে পারব না।

শ্রেষ্ঠী বলে পাঠিয়েছিলেন, উতঙ্ক বলেছিল.... কথা অর্ধ সমাপ্ত রাখে পরাশর।

কী বলেছিল? তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করে।

ধ্রুবপুত্রর কথা ভুলে গেছি আমরা।

না ভোলনি। তাম্রধ্বজ ঝুঁকে পড়ে, আমরা না রাজা, না শ্রেষ্ঠী, না সেনাপতি, কারোর লোক নই, আমরা ধ্রুবপুত্রর কল্যাণ চাই।

ভুলিনি। পরাশর ভেঙে পড়ল। দু চোখ ছলছল করতে লাগল।

শিবনাথ বুঝতে পারছিল ধ্রুবপুত্র এই মানুষগুলির ভিতরে গভীর রেখাপাত করেছিল। ধ্রুবপুত্র এদের অচেনা নয়। ধ্রুবপুত্র এখানে আসত। ওই যে বৃদ্ধর দুচোখ দিয়ে জল ঝরে যাচ্ছে। বৃদ্ধ বলছে এই বটমূলেই এমনই এক প্রত্যূষে ধ্রুবপুত্র প্রথম এসে বসেছিল। ঠিক যে জায়গাটিতে তাম্রধ্বজ বসেছে, সেখানে। কেন এসেছিল ধ্রুবপুত্র? কেন আসত মাঝে মধ্যেই? এই শূদ্রবসতিতে তার কী প্রয়োজন ছিল? এখানেও কি সে কোনো যুবতীর মোহে পড়েছিল? নারীর তো শূদ্র অশূদ্র ভেদ নেই। কী হয়েছিল ধ্রুবপুত্রের?

বুড়ো পরাশর বলল, ধ্রুবপুত্রকে নগর থেকে তারা উদ্ধার করে এনেছিল। কবে? না, তার নিষ্ক্রমণের আগে। সে ছিল বোধহয় শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি, অষ্টমীও হতে পারে। আকাশের চাঁদ ছিল অর্ধেক। অনেক রাতে ঘরে ফেরার পথে দু'জন দেখেছিল সে পড়ে আছে পথের ধারে, রক্তাক্ত শরীর। উতঙ্ক তাকে কশাঘাত করেছিল।

কেন, কী বলেছিল ধ্রুবপুত্র?

কিছুই বলেনি প্রভু। পরাশর দু'হাত জোড় করল।

কারা তাকে উদ্ধার করেছিল?

তারা কেউ নেই, ভিটে ফেলে চলে গেছে, নগর নাকি আকাশের আগুনেই পুড়ে শেষ হয়ে যাবে।

কিছু সময় কেউ আর কোনো কথা বলছিল না। গভীর এক স্তব্ধতা ছেয়ে গেল বটের ছায়ায়। মুখ নিচু করে বসে আছে বুড়ো পরাশর। মুখ নিচু হয়ে গেছে তাদের পেছনের মানুষগুলির। সকলের মুখে অন্ধকার। ছায়া এখন বিষাদময়ী।

তাম্রধ্বজ একটু সময় নিয়ে জিজ্ঞেস করে, তারপর কী হয়েছিল?

কিছু হয়নি, দু'দিন বাদে ধ্রুবপুত্র আবার নগরে গেল।

তারপর?

উতঙ্ক এসে বলে গিয়েছিল ধ্রুবপুত্র সম্পর্কে কোনো কথা না বলতে, আমরাও বলিনি, উতঙ্ক খুব নিষ্ঠুর ছিল।

আর কী বলেছিল?

ধ্রুবপুত্র যেন আশ্রয় না পায়, উচ্চ বংশজাত সে, শূদ্রপল্লীতে তাকে আশ্রয় দেওয়া মানে উচ্চবংশের অপমান, শ্রেষ্ঠী সহ্য করবেন না।

শিবনাথ অধৈর্য হয়ে উঠছিল। তার এসব কথা ভাল লাগছিল না। দুহাতে কর্ণকুহর রুদ্ধ করে দিতে

পারলে বেশ হত। ধ্রুবপুত্র কোন জালে জড়িয়ে পড়েছিল? কোন কুহকিনীর কুহকে ভুলেছিল সব, নিজের মান মর্যাদা, পরিচয়। তার সমস্ত শিক্ষাই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল তা স্পষ্ট ধরা যাচ্ছে। তাকে কিনা উদ্ধার করে এই পল্লীতে এনে তুলেছিল এরা। সে কিনা শ্রেষ্ঠীর দাসের কশাঘাতে পথের ধারে পড়েছিল। কোন মানুষের কী পরিণতি! শ্রেষ্ঠীর চোখের মণি হয়ে নগরে এসে চক্ষুশূল হয়ে উঠল কীভাবে? শুধুই কি গণিকার প্রণয়, নাকি শূদ্রপল্লীও কোনো এক কারণ?

শিবনাথ জিজ্ঞেস করল, সে এখানে আসত কেন?

সেই জানত। বলল পরাশর।

তোমরা তাকে ডাকতে?

না তিনি আসতেন।

তার তো এখানে আসার কথা নয়। শিবনাথ বলল।

হ্যাঁ প্রভু।

তবে কেন আসত, কার জন্য আসত?

পরাশর নিশ্চুপ হয়ে গেল। সে বুঝতে চাইছিল প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের উদ্দেশ্য কী? ঠিক এই ভাবেই না একদিন উতঙ্ক—। না তার কণ্ঠে যে নিষ্ঠুরতা ছিল তা এই মানুষটির ভিতরে নেই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য একই। পরাশর বুঝে নিতে চাইছিল এদের উদ্দেশ্য কী।

শিবনাথ জানে শূদ্ররা গোপনে সকলে সদ্ধর্মের অনুরাগী। সদ্ধর্মের নেড়ানেড়িরা কত যে ইন্দ্রজাল জানে, গুপ্ত বিদ্যা। এই পল্লীর কারোর কুহকে পড়েছিল নাকি ধ্রুবপুত্র? তার গণিকাপল্লীতে যাওয়ার কারণ ধরা যায়, এখানে আসবে কেন? শ্রেষ্ঠী কি শুধু তার গণিকা আসক্তির জন্য তাকে ত্যাগ করেছিলেন, দাসকে দিয়ে প্রহার করেছিলেন, নাকি আরো কিছু আছে তার পিছনে? শিবনাথ জিজ্ঞেস করে, প্রথমে সে এসেছিল কীভাবে?

তা তো জানিনা।

সে কি নিজে নিজে এল, না কেউ তাকে নিয়ে এল এখানে?

কিছুই জানি না প্রভু, তাঁকে কেউ আনেনি, আমি তাঁকে আগে কখনো দেখিনি, তাঁর কথা শুনিনি, কী করে শুনব? আমরা অজ্ঞান মানুষ। ধ্রুবপুত্রের কথা আমাদের বলবে কে? আমরা কিছুই জানিনা, আমাদের কেউ কিছু বলে না, দূরে কেউ গেলে যে সংবাদ নিয়ে আসে তাছাড়া আর কিছু জানব কীভাবে? তাঁকে আমরা চিনতামও না।

শিবনাথ বুঝতে পারছিল এ এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। ধ্রুবপুত্রের নিষ্ক্রমণ যেমন তার কাছে গভীর এক জটিল বিষয় হয়ে উঠেছে, তেমনি এই ঘটনাও। তাম্রধ্বজ আচমকা জিজ্ঞেস করল, কেউ কেউ কি চলে যাচ্ছে তোমাদের বসতি ছেড়ে?

পরাশর বলল, যাচ্ছে, যাবে সবাই।

অনাবৃষ্টি চলছে তো সব দেশে।

কী করে জানবে, সব জায়গায় কি উজ্জয়িনীর পাপ লেগেছে?

উজ্জয়িনীর কী পাপ?

পরাশর সতর্ক হলো, বলল, তা তো জানি না মহাশয়, লোকে বলছে শুনতে পাচ্ছি, বলছে সূর্য ঠাকুর কদিন বাদে আর নড়বেন না, আকাশ থেকে সমস্ত দিন আগুন ঝরে যাবে, আগুন লেগে যাবে গাছপালায়, ঘরবাড়িতে, মাটিতেও।

তাম্রধ্বজ বুঝতে পারছিল সর্বগ্রাসী ভয় ছড়াচ্ছে সর্বত্র। এর থেকে কে বাঁচাতে পারে? বাঁচাতে পারে প্রকৃতি, আকাশের মেঘ। যবনদেশীয় বণিকরা যদি সত্যিই মেঘ নিয়ে আসতে পারত, আহা সে কত মধুর হতো। পূর্বদেশীয় বণিকদের সঙ্গে যদি শীতের শেষে মেঘ আসত, তবুও তো বাঁচত অবন্তী দেশ। বণিকরা মেঘ নিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াক, মেঘের বেচা কেনা আরম্ভ করুক, তাম্রধ্বজ মনে মনে ভাবে। না হলে দিনমানের তাপেই এরপর আগুন ধরে যাবে গাছগাছালিতে। ওই যে পোড়া গাছ, ওইটিই যেন ভবিষ্যতের নগর উজ্জয়িনীর রূপ। গাছটিকে দেখতে দেখতে তাম্রধ্বজ নিজের ভিতরে শিহরণ অনুভব করে। সে যেন মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে উঠছিল।

শিবনাথ জিজ্ঞেস করে, সত্য কথা বলো, ধ্রুবপুত্র এখানে আসত কেন?

আমরা কী ভাবে বাঁচি তা দেখতে।

এই কথা কি বিশ্বাস্য?

আমিও তো বিশ্বাস করি না। বলল পরাশর।

তবে কেন আসত?

আমাদের দেখতে, আমাদের সবাইকে, বরাহ, কুক্কুট, ময়ূর সকলকে দেখতে আসত মনে হয়, এখানে বসে বিশ্রাম নিত, আমরা সবাই এসে হাজির হতাম এখানে, এই যেমন এসেছি এখন।

তোমাদের এখানে কুহকিনী আছে?

মাথা নাড়ে পরাশর, জানিনে তো?

বশ করে তারা?

জানিনে তো।

ধ্রুবপুত্র কোন টানে আসত, সে কি জানত না শূদ্র সর্বদাই পরিত্যাজ্য?

মাথা নামায় পরাশর, বিড়বিড় করে, আমরা তো দূরে থাকি, আমরা তো তাকে ডাকিনি। একদিন ভোর বেলা দেখি শ্বেত বসন তার, শ্বেত উত্তরীয়, কী সুন্দর রূপ তার, যেখানে দাঁড়াবে সেখানে আলোর ছটা দেখা দেবে, হেঁটে আসছে মাঠ ভেঙে, এসে একা একা বসল এই বটমূলে।

সে কি জানত এটি শূদ্রপল্লী?

জানত, জেনেই এসেছিল, সে এসে যুদ্ধের কথা শুনত।

শিবনাথ গ্রীবা উন্নত করল, মেরুদণ্ড টান টান হলো তার, জিজ্ঞেস করল, তুমি কি সত্য বলছ?

জানি না।

তাহলে অসত্য বলছ?

পরাশর ঘাড় হেঁট করল, তাও তো জানিনা, এখন যে মনে হয় কোনোটাই সত্য নয়।

কোনটা সত্য নয়।

যা বলেছি, ধ্রুবপুত্রর কথা যা বলেছি।

তাম্রধ্বজ বলল, আমরা ধ্রুবপুত্রর কথা জানতে এসেছি, জানলে তাকে খুঁজে বের করা সহজ হবে হয়ত, সত্য কথা বলো।

পরাশর বলল, আমার এখন সব যেন মিথ্যা মনে হয়, মনে হয় আমরা তার কথা ভেবেছিলাম শুধু, এমন একজন যে আমাদের সঙ্গে বসে সমস্ত দিন, সমস্ত রাত আমাদেরই কথা শুনবে, সিন্ধুনদের কথা, মলয় পর্বতের কথা।

তুমি এসব নাম জানলে কার কাছে?

হয়ত ধ্রুবপুত্র, নাহলে আমিই জানতাম, কিন্তু সব মনে হয় মিথ্যা, ধ্রুবপুত্র এখানে যেন আসতই না, আমি তাকে দেখেছিলাম একবার নগরে গিয়ে, অনেকদিন আগে, শ্রেষ্ঠীর রথে বসে আছে, তার গায়ের উত্তরীয়খানি বাতাসে উড়ছে।

তারপর? জিজ্ঞেস করল শিবনাথ।

জানি না, এখন মনে হয় সব আমার বুড়ো বয়সের ভ্রম, ধ্রুবপুত্র এখানে আসবে কেন? আমাদের ঘরে তেমন কন্যা নাই যে তাকে দেব ভোগের জন্য, তার জন্য সেরা গণিকা প্রস্তুত, সে কিসের জন্য আসবে এখানে? আমাদের ধনরত্নও নেই যে নিতে আসবে সে।

তাহলে আসেনি? শিবনাথ জিজ্ঞেস করল।

আসেনি কিন্তু এই বটমূলে তাকে দেখেছিলাম, ওই রত্নাকর সাগর ধারে তাকে দেখেছিলাম প্রভু, দেখেছিলাম মাঠ ভেঙে সে আসে, মাঠ ভেঙে সে যায়।

এ তুমি কী বলছ, স্পষ্ট করে বলো।

শূদ্র ঘরে সে আসবে কেন, কত বড় জ্ঞানী সে, মোদের ঘরে তেমন কন্যাও নাই যার টানে সে আসবে, তেমন কুহকিনী নাই যে তাকে কুহক করতে পারে।

শিবনাথ বুঝতে চাইছিল। তাম্রধ্বজ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল রত্নাকর সাগর ধারে, কিংবা এই

বটমূলে সে বসে আছে। সামনে সবাই। শূদ্র ঘরে প্রতিপালিত প্রাণীগুলিও এসেছে। তাম্রধ্বজের শরীর কাঁপছিল। দপদপ করেছিল মাথা। সে বুঝতে পারছিল জানা গেছে অনেক, গণনায় কিছুই জানতে পারেনি সে।

পরাশর বলল, সবই মনে হয় স্বপন, স্বপন দেখেছি আমি এক বুড়া।

তাই বলো। শিবনাথ নিচুগলায় বলল, শূদ্র ঘরে অন্ন নিয়েছিল সে?

স্বপন, সবই স্বপন?

নিয়ে থাকে তো বলো না।

স্বপন। না হলে সে অন্ন নেবে কেন?

নিয়েছিল অন্ন? আর্তনাদ করে ওঠে শিবনাথ।

জানি না, হয়ত সে ধ্রুবপুত্র ছিল না।

ছিল না?

না, অন্য কেউ, জগতে কত মানুষ, কতজন যায় মাঠ দিয়ে, এই বটমূলে কতজন বিশ্রাম নেয়, উতঙ্ক তো কতজনকে কশাঘাত করেছে, মেরেও ফেলেছে, বড় নিষ্ঠুর ছিল সে, তেমন কাউকে হয়ত তুলে এনেছিল, এমন কি হতে পারে না, যাকে এনেছিল সে হয়ত ধ্রুবপুত্র নয়।

আশ্চর্য! তা কী করে হবে? বলল শিবনাথ।

যদি হয়, হতেও তো পারে।

তোমরা যে বললে সেই ধ্রুবপুত্র।

না সে ধ্রুবপুত্র নয় বলেই এখন মনে হয়, অন্য কেউ, আমরা অজ্ঞান, তাকে ধ্রুবপুত্র ভেবে রেখেছিলাম, প্রভু আপনারা সেই ভুল ভাঙিয়ে দিলেন, উচ্চজাতির মানুষ উচ্চজ্ঞানী ধ্রুবপুত্র কেন শূদ্রপল্লীতে আসবে, তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ, অজ্ঞানের কাজ, সে অজ্ঞান ছিলনা, তাই আসেনি।

শিবনাথ স্তব্ধ হয়ে থাকল। তাম্রধ্বজ তাকিয়েছিল বৃদ্ধ শূদ্রপুরুষের দিকে। লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

বাষট্টি

পরাশর বলল, আমরা এখন যাব।

কোথায়? জিজ্ঞেস করল তাম্রধ্বজ, চলে যাবে নাকি সবাই? তারা কি সেই সময়ে এসে পৌঁছেছে যখন শূদ্রপল্লী একেবারে শূন্য হয়ে যাচ্ছে। হয়ত তাই। বরাহ যূথ, সারমেয়কুল, কুক্কুট, ময়ূর, গর্দভ সবই তো রয়েছে। এবার জীবজন্তু, গৃহপালিত পশু, নারী শিশুদের নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করলেই হয়। শিশুরা রয়েছে। নারীরা নেই, হয়ত তারা অচেনা পুরুষ বলে এদিকে আসেনি। নারীরা হয়ত সংসার হাতে করে বসে আছে কুটিরে কুটিরে। বৃদ্ধ ডাক দিলেই সবাই বেরিয়ে আসবে। বৃদ্ধকে মনে হচ্ছে এই শূদ্রপল্লীর অধিপতি। গ্রামবৃদ্ধরা তো ধীরে ধীরে তেমনই হয়ে ওঠে। তাম্রধ্বজের মনে পড়ল হস্তিযূথের কথা। হস্তি যেভাবে হস্তিযূথকে নিয়ে চলে যায়, এই বৃদ্ধও সেইভাবে চলে যাবে হয়ত। দশার্ণদেশের অরণ্যপথের কথা মনে পড়ল তাম্রধ্বজের। দশার্ণদেশের অরণ্যে স্তব্ধ হয়ে নতুন যাত্রার কথা ভাবতে থাকা হস্তিযূথের কথা মনে পড়ল তার। ঠিক এমনই। তাম্রধ্বজ বিষণ্ণ হয়ে গেল, এই ভাবে মানুষ চলে গেলে উজ্জয়িনীর ভবিষ্যৎ কী? অগ্নিকাণ্ডেও শূদ্রপল্লী শূন্য হয়নি, অনাবৃষ্টি মনুষ্যবিরল ভূখণ্ড করে তুলছে উজ্জয়িনী নগরকে। সে নিম্নস্বরে শিবনাথকে বলল, এরা চলে যাচ্ছে।

শিবনাথ মাথা তুলল, যাক।

কেন, নগর মনুষ্য বিরল হয়ে যাবে যে।

শিবনাথ ধীরে ধীরে বলল, শূদ্রপল্লী না থাকা নগরের মঙ্গল।

তাম্রধ্বজ ঘাড় তুলে তাকায়। দেখল যূথপতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বটের ছায়ার প্রান্তে সরে গেছে। তার মুখ পশ্চিমে। শিবনাথ আবার মৃদু কণ্ঠে বলল, আমি ধরতে পারছি কেন শ্রেষ্ঠী ধ্রুবপুত্রের প্রতি কুপিত হয়েছিলেন, কুপিত হওয়ারই কথা।

কেন? তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করল।

শিবনাথ উত্তরীয় দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিল, অনুচ্চ গলায় বলল, কোনো সদ্বংশজাত পুরুষ শূদ্রজাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করবে, এই ঘটনাটা কি সহ্য করতে পারেন বণিক, তাঁকে আমি চিনি, খুব নিষ্ঠাবান মানুষ।

তাম্রধ্বজ বলল, কিন্তু এখানে ধ্রুবপুত্র এসেছিল কিনা তাও তো সঠিক জানা গেল না, লোকটা তো বলল অন্য কেউও হতে পারে।

বলেছে, ভুল বুঝতে পারছে তাই বলেছে, না হলে ওদের সাধ্য কী ধ্রুবপুত্রকে অন্ন দেবে, শূদ্রের ঘরে অন্নগ্রহণ করেছে ধ্রুবপুত্র, এই কথা আমার মুখে শুনলে আমার পুত্রবধূ এবং পৌত্রী কী ভীষণ আঘাত পাবে কল্পনা করতে পার।

তাম্রধ্বজ বলল, ওরা তো বলছে....।

যাই ই বলুক, তা ধ্রুবপুত্রের পক্ষে যুক্তি হয়ে দাঁড়াবে। ধ্রুবপুত্র যদি কোনোদিন ফেরে এরা যেন আশ্রয় না দেয়, অন্ন না দেয়। শূদ্রের ঘরে অন্নগ্রহণ যে ভীষণ অপরাধ, পুরোহিত যদি শোনেন এতে যে সমাজ ভেঙে যাবে, চারবর্ণ কি এমনি এমনি সৃষ্টি করেছেন মহাকাল?

তাম্রধ্বজ চুপ করে থাকে। উজ্জয়িনী এসে দেখেছে সবই মহাকাল। কিন্তু মহাকাল শিবের লিঙ্গমূর্তি দেখে তার একদিন আচমকা মনে হয়েছে যেন নিষাদ মূর্তি। আশ্চর্য! স্ত্রী যোনি আর লিঙ্গের মিথুন মূর্তিকে দেখে কখনোই তার মনে হয়নি ওই দেবতা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যর অনুরাগী হতে পারেন। সেই কালামুখীর গ্রামেও দেখেছে সে পিপুলবৃক্ষের নীচে লিঙ্গমূর্তি, ফুল, বিল্বপত্র, — যেন মহাকাল মূর্তির ক্ষুদ্র সংস্করণ। তাম্রধ্বজ মাথা ঝাঁকায়। এসব ভাবনা অনৈতিক। এভাবে না চিন্তা করাই শ্রেয়। মহাকাল দেবতার কথা সে দূর বিদিশা নগরীতে বসে শুনেছিল। বণিকের দলের যাত্রা সব সময়ই উজ্জয়িনীর দিকে। তার কারণ মহাকাল মন্দিরও নিশ্চয়। মহাকাল দর্শনে পুণ্য হয়, সেই পুণ্যে বাণিজ্যযাত্রা সফল হয়। উজ্জয়িনীতেই বেচাকেনা হয়ে যায় সব।

শিবনাথ বলল, এরা কি নেড়ানেড়ির অনুগামী, সদ্ধর্মের অনুসারী?

চমকে ওঠে তাম্রধ্বজ। সে দেখল শিবনাথের চোখে গোপন সন্দেহ। ধ্রুবপুত্রকে রক্তাক্ত অবস্থায় নগরের রাজপথ থেকে এরা তুলে এনে শুশ্রূষা করেছিল, বাঁচিয়েই তুলেছিল, ধ্রুবপুত্রকে অন্ন দিয়েছিল যখন সে বিতাড়িত, কিন্তু তার জন্য এতটুকুও কৃতজ্ঞ নয় শিবনাথ। বরং সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে কেন আশ্রয় দিয়ে ধ্রুবপুত্রকে প্রায় ধর্মচ্যুত করে ফেলেছিল শূদ্রজাতি। জানাজানি তেমন হয়নি। নাকি হয়েছে তাই ধ্রুবপুত্র নির্বাসিত হয়েছে নগর থেকে? তাই তাকে বিতাড়িত করেছেন শ্রেষ্ঠী। এইটিই হয়ত আসল কারণ। গণিকার প্রেম সত্য নয়। এই কারণটিকে চাপা দিতে হয়তগণিকা-অনুরাগের কথা শ্রেষ্ঠীর রটনা। তাহলে ধ্রুবপুত্র পতিত হলো না শূদ্র সংসর্গের দায়ে। শিবনাথ কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। তার মনে হচ্ছে উজ্জয়িনীতেও গিয়ে গোপনে খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন। গণিকার কাছেও যাওয়া প্রয়োজন। তাহলেই ধরা যাবে সব। পুরুষ মানুষ, তার যৌবন-কাল কি গণিকা সংসর্গে কলুষিত হতে পারে? গণিকাদের কাজই তো পুরুষের মনোরঞ্জন করা। সেই আনন্দ গ্রহণ করতেই তো ধ্রুবপুত্রের সেখানে যাওয়া। যে আনন্দ গৃহবাসী নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে পায় না, পেতে পারে না, সেই আনন্দ দিতেই তো গণিকারা আছে। ধ্রুবপুত্র যদি সেখানে যায় তবে তার কী এমন অপরাধ? ধ্রুবপুত্র যদি কলাবিদ্যা, রতিক্রিয়ার প্রাথমিক পাঠ নেয় গণিকাগৃহে গিয়ে তবে তা কোন অন্যায় হলো যে সেই কারণে শ্রেষ্ঠী তাকে বিতাড়িত করবেন, দাস দিয়ে প্রহার করবেন, হত্যার চেষ্টা করবেন, শেষ পর্যন্ত নির্বাসিত করবেন নগর থেকে? আসল সত্যটা অন্য জায়গায় নিহিত আছে। শিবনাথ মিলিয়ে নিতে চাইছিল। এতদিন সে বিষয়টি নিয়ে তেমন ভাবেনি। আজ, এখন যেন ভাবনার অর্গল খুলে যাচ্ছে! হায়। গন্ধবতী জানে সে গণিকাসক্ত হয়ে তাকে ভুলেছিল। গণিকায় আবার আসক্তি কী? গণিকারা যে কারণে আছে সেই কারণেই তার কাছে যেত ধ্রুবপুত্র। নগরে এলে কি সে সব চিনে নেবে না? গণিকা সংসর্গ না করলে জীবনের অনেক পাঠই নাকি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। গন্ধবতীর প্রতি অনুরাগ সেই জন্য কমবে কেন? কিন্তু শ্রেষ্ঠী তার কপালে ওই কলঙ্ক, যা আসলে কলঙ্কই নয়, পৌরুষের গৌরব, লেপন করে রক্ষা করেছেন পুরোহিত ব্রাহ্মণ, সমাজপতিদের ক্রোধানল থেকে। ধর্মচ্যুত হলে ধ্রুবপুত্র কি আর কোনোদিন উজ্জয়িনীতে ফিরতে পারত? নাকি উজ্জয়িনীর উচ্চ সমাজে বিচরণ করতে পারত? তার জ্ঞান, তার বুদ্ধি সবই নষ্ট হয়ে যেত। জ্ঞান,

বুদ্ধি, কবিত্বের প্রতিভা রাজানুকূল্যে লালিত না হলে বিকশিত হতে পারে না। ধর্মচ্যুত ব্যক্তি কি রাজানুকূল্য পেতে পারে? হায়রে! তাম্রধ্বজ শুনেছে সব। ধ্রুবপুত্র এখানে অন্নগ্রহণ করত। এখানেই শুশ্রূষা নিয়েছিল। কথাটা যদি রটে যায়, তখন কী হবে?

তাম্রধ্বজ বলল, সদ্ধর্ম শেষ হয়ে গেছে, নেড়ানেড়িরা, মুণ্ডিত মস্তক বুদ্ধের অনুরাগীরা যদি কোথাও থাকেন, আত্মগোপন করে, তারা উজ্জয়িনীতে কেউ আছে বলে জানি না, আমার দেশে দেখেছি।

কী দেখেছেন?

সদ্ধর্মের মানুষ, মুণ্ডিত মস্তক সধর্ম অনুরাগী, অনুরাগিনীরা বিদিশা দিয়ে চলে যান সাঁচীর অরণ্যপাহাড়ে।

সেই পাহাড় কোথায়?

বিদিশার দক্ষিণে, খুবই নিকটবর্তী, উজ্জয়িনী আসার পথে সাঁচীর পাহাড় থেকেই পশ্চিমে ঘুরতে হয়, ধরে নিতে পারেন, উজ্জয়িনী থেকে পুবে হাঁটলে সাঁচীর পাহাড়ে পৌঁছনো যাবে, হ্যাঁ বিদিশাতেও, পাহাড়টা আসলে বিদিশা নগরের উপান্তে।

কথা বলতে বলতে তাম্রধ্বজ দেখল কৌতূহলে তাদের দিকে ফিরে তাকিয়েছে বৃদ্ধ শূদ্রপুরুষটি। শুনছে তাদের আলাপ। তাম্রধ্বজ বলছিল, সাঁচীর পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করে থাকেন সদ্ধর্ম সাধকরা, ভগবান বুদ্ধের অনুগামী তাঁরা।

শিবনাথ জিজ্ঞেস করল, ওই পাহাড়ে আপনি গেছেন?

গিয়েছিলাম, এক সদ্ধর্ম সন্ন্যাসী আমাকে নিয়ে গিয়েছিল গোপনে, পাহাড়টি গভীর অরণ্যে ঢাকা, অরণ্য খুবই বিপদ সংকুল, তবে পাহাড়ের ভিতরটা পরিচ্ছন্ন, ওখানে অনেক বুদ্ধের উপাসক থাকেন, প্রবেশের এক গোপন পথ আছে পাহাড়ের দক্ষিণে অর্থাৎ পশ্চাৎভাগে সুড়ঙ্গপথ।

কী দেখেছেন?

পাথরে পাথরে, গুহার দেওয়াল গাত্রে ভগবান বুদ্ধের জীবন আঁকা আছে।

আপনি তো এসব বলেননি?

প্রয়োজন হয়নি।

আপনি কি জানেন ভগবান বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার হলেও তাঁর অনুগামীরা অতি দুরাচারী, ধর্ম মানে না, চতুরাশ্রম মানে না।

জানি তা, ওরা বলে ওদের ধর্ম আলাদা।

ভুল বলে, জানে না তাই বলে, আমি শুনেছি ওই ধর্ম যারা পালন করে তারা হিংস্র প্রকৃতির, ভূতপ্রেত নিয়ে তাদের ওঠা বসা, অদ্ভুত সব ক্রিয়াকলাপ জানে।

হবে হয়ত, সেই সন্ন্যাসী ছিল মধুর স্বভাবের।

আপনি বিদিশা থেকে উজ্জয়িনীতে এসে বেঁচে গেছেন, নতুবা ওরা আপনাকে সম্মোহিত করত, তখন আর উপায় থাকত না ফেরার।

তাম্রধ্বজ চুপ করে থাকে। তখন শিবনাথ চাপা গলায় বলল, আমার মনে হয় সদ্ধর্ম অনুগামীরা আত্মগোপন করে আছে বহুজায়গায়।

জানি না আমি কিছুই।

এ ব্যাপারে রাজার মনোযোগী হয়ে ওঠা উচিত।

কী জানি। তাম্রধ্বজের ভাল লাগছিল না কথাগুলি। অথচ শিবনাথকে সে তো পছন্দই করে। গন্ধবতীর পিতামহ বলে নয়, মানুষটি অতি সাধারণ, নির্লোভ, সরল প্রকৃতির। আর বিপন্ন তো নিশ্চয়ই। পুত্র নিরুদ্দিষ্ট, ধ্রুবপুত্রও নিরুদ্দেশে গেছে। একা একা খুঁজে বের করার ক্ষমতা কোথায় তাঁর?

শিবনাথ বলল, আমি শুনেছি সদ্ধর্ম সাধকরা আমাদের ভিতরে এমনভাবে মিশে গেছে চেনা যায় না, শূদ্ররা শুনেছি সকলে সদ্ধর্মের অনুগামী হয়ে গিয়েছিল? জিজ্ঞেস করল শিবনাথ।

আমি জানি না।

ওই ধর্মে তো শূদ্র অশূদ্র ভেদ নেই, ছিল না, এই ওরা ধ্রুবপুত্রকে অন্ন দিয়েছে, এত সাহস পেয়েছে কি সদ্ধর্ম থেকে?

কী বলছেন? চমকে উঠেছে তাম্রধ্বজ। ভয় পেয়েছে। চকিতে সে শূদ্রদের দেখে নিল। তারা কি শুনেছে কথাগুলি? তাম্রধ্বজ দেখল শিবনাথের রূপই বদলে গেছে সম্পূর্ণ। ক্রোধে গরগর করছেন গন্ধবতীর পিতামহ। চাপা গলায় বলছেন, শূদ্র জাতিই সদ্ধর্মে আছে বেশি, আমার সন্দেহ হচ্ছে ধ্রুবপুত্র কি কোনো সদ্ধর্ম অনুগামীর দেখা পেয়েছিল?

থাক এসব কথা। তাম্রধ্বজ ভাবলেশহীন মুখগুলির দিকে চেয়ে ভাবছিল ওরা হয়ত শুনছে, প্রতিক্রিয়া দেখানোর সাহস নেই।

ধ্রুবপুত্র পুবের দিকে গেছে, গন্ধবতী তাইই বলেছিল।

হ্যাঁ, আমিও তা শুনেছি।

সে কি তাহলে বিদিশার দিকে গেল, সাঁচী পাহাড়ে? জিজ্ঞেস করে শিবনাথ।

কেন, সে তো সদ্ধর্মী মানুষের আশ্রয়।

আপনি বুঝতে পারছেন না ধ্রুবপুত্র কোনো সদ্ধর্মসাধক, বুদ্ধের ধর্মের অনুগামীর মোহে পড়েছিল হয়ত, আমরা যতই বলি, তারা এখনো আছে, খুব গোপনে আছে।

মাথা নাড়ল তাম্রধ্বজ, তা হতে পারে না।

হতে পারে না তো এই পল্লীতে শ্রেষ্ঠী আগুন লাগিয়েছিলেন কেন?

আগুন তো তাঁর দাস লাগিয়েছিল।

তাঁর অনুমোদন ছাড়া দাস উতঙ্কর সাধ্য কি আগুন লাগায়।

কেন লাগিয়েছিল?

এরা সদ্বংশজাত মানুষকে অন্ন দিয়ে জাতিচ্যুত করে, এরা হয়ত গোপনে সদ্ধর্মী, নাহলে এরা কীভাবে সাহস পেল, মরে থাকত ধ্রুবপুত্র পথের ধারে, নিজ ধর্মে নিধনও শ্রেয়।

তাম্রধ্বজ বলল, একজন বেঁচে থাকল, তার চেয়ে তার মৃত্যু কি ভাল?

ধর্মচ্যুত হতো না তো তাহলে।

তাম্রধ্বজ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তার ভয় করছিল শিবনাথের কথায়। শিবনাথ বলছে শ্রেষ্ঠী খুবই নিষ্ঠাবান ধার্মিক। শ্রেষ্ঠীর কানে হয়ত পৌঁছে গিয়েছিল ধ্রুবপুত্রের শূদ্র সংসর্গের কথা। শূদ্র নারী হলে অন্য কথা, তাও সহ্য করতেন শ্রেষ্ঠী, কিন্তু শূদ্রপল্লীতে এসে শূদ্রের হাতে অন্নগ্রহণ—সে তো ভয়ানক অপরাধ। যেমন ধ্রুবপুত্রের অপরাধ, তেমনি এই মানুষগুলিরও। এরা নিশ্চয় নেড়ানেড়ির ধর্মের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রেখেছে, না হলে পারত না। আর সেইজন্যই এদের পল্লীতে আগুন দিয়েছিল উতঙ্ক শ্রেষ্ঠীর কথায়।

তখন পরাশর ঘুরে দাঁড়ায়, আমরা এবার যাব।

কোথায় যাবে?

পরাশর বলল, মোদের হাতে জলপানিও তো নেবেন না প্রভু, আমরা কী দেব? বুঝতে পারছি অপরাধ হয়েছিল।

শিবনাথ জিজ্ঞেস করল, যে আসত, সে কি ধ্রুবপুত্রই সত্য?

বলেছি তো প্রভু কতলোক আসে যায় ওই মাঠ দিয়ে, তাদের কেউ?

ধ্রুবপুত্র তো নয়।

না প্রভু, আপনি যা বলেন তাইই সত্য।

ধ্রুবপুত্র তো অন্নগ্রহণ করেনি এখানে?

না প্রভু।

সে তো আসেনি এখানে?

না প্রভু। পরাশর ভয় পাচ্ছিল।

ধ্রুবপুত্র কি তোমাদের হাতে অন্নগ্রহণ করতে পারে?

না প্রভু, পারে না।

তোমরা কি তাকে অন্ন দিতে পার?

না প্রভু পারি না।

জল দিতে পার?

না প্রভু না, আমাদের হাতের জল তাঁর অযোগ্য।

তোমরা কি নেড়ানেড়ির ধর্ম মানো?

না প্রভু না। আতঙ্কিত হয়ে আর্তনাদ করে ওঠে পরাশর।

বুঝে কেন উতঙ্ক আগুন দিয়েছিল?

পরাশর বলল, বুঝলাম, প্রভু এবার আমরা যাব, রোদ চড়া হয়ে যাচ্ছে।

তখন তাম্রধ্বজ উঠে দাঁড়াল, বলল, সবাই চলে গেলে উজ্জয়িনীতে থাকবে কে? বৃষ্টি আজ না হোক কাল তো হবে।

হ্যাঁ হবে। বলে দূরের আকাশের দিকে তাকায় পরাশর।

বৃষ্টি হলে তো আর অসুবিধে হবে না। তাম্রধ্বজ বলে।

হবে না সত্য, সায়রে জল হবে।

তবে কেন যাবে, উজ্জয়িনী যে শূন্য হয়ে যাবে।

হ্যাঁ প্রভু, ধ্রুবপুত্র গিয়ে শূন্য হয়ে গেছে। বিড় বিড় করল পরাশর।

তোমরা ধ্রুবপুত্রের কথা বলো না, শিবনাথ বলে, নামোচ্চারণ করো না।

বলব না, এই কেউ ধ্রুবপুত্রর কথা বলো না। পরাশর সকলকে শোনায়, বলল, ধ্রুবপুত্র আমাদের মোহে ফেলেছিল।

থাক ওসব। শিবনাথ বলল।

হ্যাঁ থাক, যাই প্রভু। পরাশর আবার হাত জোড় করল।

যাবে কোথায়, কোন দেশে? জিজ্ঞেস করল তাম্রধ্বজ।

হাসল পরাশর, কোথায় যাব প্রভু, কোথাও না, রত্নাকর সায়রে যাব সবাই, আমাদের যাওয়ার জায়গা কোথায়, কোথাও বিষ্টি নাই।

তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করল, ওই সায়র কি সাত সরোবরের একটি?

হ্যাঁ প্রভু, রাজা দান করেছিলেন এই জল, রাজার জয় হোক।

এখন কি জল আছে?

না কী করে থাকবে, নদী ব্যতীত কোথাও জল নাই।

তাহলে ওই জলহীন সরোবরে কী প্রয়োজন? জিজ্ঞেস করল তাম্রধ্বজ।

পরাশর বলল, খনন করছি।

চমকে উঠল তাম্রধ্বজ এবং শিবনাথ। অবাক হয়ে শূদ্রপতির মতো বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন যূথপতি। তার পিছনে সবাই এসে দাঁড়িয়েছে। তাম্রধ্বজের মনে হলো এই বৃদ্ধ উজ্জয়িনীর রাজার চেয়েও সুখী। এর পিছনে সবাই, সমস্ত পল্লী।

শিবনাথ জিজ্ঞেস করল, খননে কী হবে?

যদি জল থাকে পাতালে, উঠে আসবে।

শিবনাথ বলল, পাতাল এক সমুদ্র, আকাশ এক সমুদ্র, কোথাও জল নাই।

বৃদ্ধ পরাশর দুহাতজোড় করল আবার, নদী খুঁড়লে জল মেলে প্রভু।

শিবনাথ জবাব দিতে পারল না। তাম্রধ্বজ দেখল অধিপতি পুরুষহস্তি যেভাবে যূথকে নিয়ে চলে যায় সেই ভাবে চলল বুড়োমানুষটি। শূদ্রপতির পিছনে সমস্ত জনপদ যেন চলেছে। চলেছে জলহীন সরোবরের পথে। তার পিছনে পিছনে যাচ্ছে বরাহ যূথ, গর্দভ, কুক্কুট, সারমেয়কুল, ময়ূর, শিশুরা। সবাইকে নিয়ে বৃদ্ধ যেন দূরযাত্রায় হেঁটেছে। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। চলতে লাগল পরাশরের পাশে পাশে, জিজ্ঞেস করল, খননের কথা কে বলেছিল?

কেউ না।

ধ্রুবপুত্র?

ধ্রুবপুত্রকে মোরা চিনিনা প্রভু। দুহাত জোড় করে জলভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে বৃদ্ধ সৈনিক পরাশর।

তেষট্টি

তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করল, খননে কি জল উঠবে?

গভীর তো হবে সায়রখানি, বর্ষার সময়ে আরো জল ধারণ করবে।

এই খননের কথা কে বলেছিল, ধ্রুবপুত্র?

পরাশর দাঁড়াল, বলল, আমরা তাকে দেখিনি কখনো, ছোটজাতের তাকে জানার অধিকার নাই, আমাদের অন্ন দিবার অধিকার নাই।

তাহলে কি তুমি নিজে ভেবেছ খননের কথা?

না। মাথা নাড়ল পরাশর, আমিও না।

তবে কে ভাবল, কে বলল?

পরাশর বলল, মানুষজন চলে যাচ্ছে, এখন যদি এক বিন্দু জলও পাই, তবে তারা থেকে যাবে, তাই খনন আরম্ভ হলো, আর খনন আরম্ভ হলো মানে জল উঠতে পারে, তাতে লোকের আশা হলো, তাই গেল না ভিটে ছেড়ে।

ধীরে ধীরে হাঁটছিল পরাশর। মানুষজন এগিয়ে গেছে দ্রুত। অনেকটা দূরে সেই সরোবরের উঁচু পাড়, দেখতে পাচ্ছে তাম্রধ্বজ। লোকজন সেইদিকে যাচ্ছে বড় বড় পায়ে। জীবজন্তুগুলিও ওই দিকে যাচ্ছে। আশ্চর্য! তারাও যেন টের পেয়েছে জল উঠে আসতে পারে। জলের অভাবে খুব কষ্টে আছে তারা। দূর নদী থেকে যে জল সংগ্রহ করে আনে মানুষজন, তা থেকেই তো তাদের তৃষ্ণা মেটে। মেটে কি? মিটলে দ্বিপ্রহরে গর্দভগুলি আকাশের দিকে চেয়ে ডাক ছাড়ে কেন?

পরাশর বলল, মানুষের কোনো আশা ছিল না প্রভু, মানুষ ভাবছিল একদিন ছাতি শুকিয়ে সমস্ত জীব মরে যাবে, তাদের সঙ্গে তারাও, ভয় লেগেছিল খুব।

এখন, এখন কি সেই ভয় গেছে?

ভয় তো আছে, সুয্যিঠাকুর আকাশে দাঁড়িয়ে যাবেন, তখন তো আর রাত্রি হবে না, পুন্নিমে হবে না, জোছনা রাত্তিরে সমস্ত রাত্তির ধরে সায়রের মাটি কাটা হবে না, ভয় কি নাই প্রভু, খুব আছে, বুকে কান দিলে ধরা যাবে।

তাহলে আশা হলো কী করে?

মানুষ তো ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে, সব দিক থেকে সংবাদ আসছিল কোথাও আকাশে মেঘ নাই, তাহলে মানুষ কী করবে, রাজারও সাধ্য নাই আকাশের মেঘ আকাশে নিয়ে আসে, শ্রেষ্ঠীরও সাধ্য নাই, মহাকাল মন্দিরের বরামভন পুরোহিতেরও সাধ্য নাই যে আকাশ থেকে জল নামায়, তখন মানুষের মরণ ছাড়া উপায় নাই, কী ভীষণ দিন বলুন প্রভু!

তাহলে আশা হয়নি কোনো?

হয়েছে, আমার কথা শেষ হয় নাই, চারদিকে শুধু ভয়, এক মাথা খারাপ কবরেজ আছেন, নহুষ বুড়া শর্মণ, তিনি বলে বেড়াচ্ছেন দিনমান যখন আরম্ভ হবে চিরকালের মতো, তখন মানুষের ঘুম থাকবে না কেননা রাত থাকবে না, কিন্তু মরণ থাকবে, মানুষ সব অন্ধ হয়ে যাবে।

ওসব সত্য নয়।

সত্য নয় তা বুঝবে কে, সবাই বলছিল চলে যাবে, কোথায় যাবে তা জানে না, কিন্তু যাচ্ছিলও না, আবার যাচ্ছিলও, যেতে যেতে ফিরে আসছিল, ফিরতে ফিরতে চলে যাচ্ছিল, হা হুতাশ করছিল আকাশের দিকে চেয়ে, মহাকালকে ডাকছিল, কিন্তু মহাকাল ঠাকুর মোদের ডাক শুনবে কেন, সে মন্দিরে মোদের কোনো অংশ নাই, মন্দিরে তো ঢুকা বারণ, তাই মহাকালকে প্রাণ দিয়ে ডাকতেও পারছিল না, এমন চলছিল প্রভু, কিন্তু আপনি প্রভু ধ্রুবপুত্রের কে, এত কথা ধ্রুবপুত্র ছাড়া কেউ শুনতে চায় না।

ধ্রুবপুত্র কী শুনতে চাইত?

সে বলত মোরা শুনতাম।

কী বলত ধ্রুবপুত্র?

কিছু না প্রভু, যা বলেছি ভুল বলেছি, ধ্রুবপুত্রকে ভুলে গেছি, আমরা তাকে চিনি না।

তাম্রধ্বজ বলল, ঠাকুদ্দা তো নেই, যা সত্য তাই বলো।

মাথা নাড়ল পরাশর, বড় ভয় করে, উতঙ্ক কি ওই কারণে আগুন দিল, কিন্তু সে নিজেও তো ছিল দাস, শ্রেষ্ঠী যদি আগুন দিতে বলবে তো শ্রেষ্ঠী তাকে রক্ষা করে না কেন মরণের হাত থেকে, এখন দেখছি ধ্রুবপুত্র নাই কিন্তু সেই থেকে যাচ্ছে সব তাতে।

তাম্রধ্বজ বলল, ধ্রুবপুত্রের কথা বলবে না?

না জলের কথা বলব, জলের কথার ভিতরেও কি সে এসে যাবে?

খননের কথা কি সে কখনো বলেছিল?

বলেছিল। ঘাড় কাত করে পরাশর, তারপর বলে, বলেছিল যে তা আমি জানি না, খনন যখন আরম্ভ হলো এক বুড়া, দিকপতি তার নাম, সে বলল একদিন, তখন ফাগুন মাস, যে চৈত্রে ধ্রুবপুত্র চলে গেল সেই ফাগুন হতে পারে, অন্য ফাগুনও হতে পারে, আবার না হতেও পারে কোনো ফাগুন, বুড়া দিকপতির মাথায় কিছু থাকে না, আষাঢ় মাসকেও ফাগুন বলে ভেবে বসে, আপনাকে হয়ত ধ্রুবপুত্র ভেবে বসবে, চোখে দ্যাখে না, কানেও শোনে না।

তাম্রধ্বজের মনে হলো বৃদ্ধ কথা গিলে ফেলছে, আবার উগরে দিচ্ছে। বলতে চাইছে, আবার ভয়ও পাচ্ছে, ভয় পেয়ে কথা বানাচ্ছে। বানাতে বানাতে খেই হারিয়ে ফেলছে। কী বলছে নিজেও বুঝতে পারছেনা। সে জিজ্ঞেস করল, তারপর কীহলো?

কিসের পর? পরাশর অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

আশা নেই যখন বৃষ্টির, খননের কথা কে বলল?

আমরা বললাম, সবাই বলল।

সবাই কী করে একই কথা বলে?

বলে, ধরুন যদি কেউ বলে সায়রের মাটি কাটা হোক, জল উঠে আসবে, তখন সবাই তো বলবে মাটিকাটা হোক, যখন মানুষ শুধুই ভাবছে অনাবৃষ্টি চলবে বছরের পর বছর, শেষপর্যন্ত নদীও শুকিয়ে যাবে, কোথাও জলের চিহ্ন থাকবে না, রাজাও চলে যাবে নগর ছেড়ে, শ্রেষ্ঠী, যত বণিক সবাই চলে যাবে, সেনাপতি চলে যাবে, সৈন্যরা চলে যাবে, মহাকালও ত্যাগ করবেন এই নগর, তখন যদি কেউ বলে সায়র কাটা হোক, মাটির নীচে জল আছে, শুনে সবাই একসঙ্গে বলল, হ্যাঁ কাটা হোক, এক ফাগুনে সিনান করে উঠে ধ্রুবপুত্র বলেছিল ফাগুন চৈত্রে সায়রের জল কমে যায়, সায়র ছেঁচে জল তুলে ফেলে আবার কাটা হোক, তাহলে পাতালের জল উঠবে, আবার বর্ষার জলও ধরে রাখবে বেশি করে।

তাম্রধ্বজ বলল, তখন কী হলো?

সায়র কাটার কথা উঠতে, সবাই ধরে নিয়েছে জল উঠে আসবে, জল যদি উঠে আসে তবে তো বেঁচে গেল সবাই, সবাই ভাবছিল প্রকৃতি জল দেবে না, মাটির তলার জল, সে জলও তো তাঁর, মহাকাল প্রকৃতির, যারা যাবার কথা বলছিল, আশা হারিয়ে শুধু মরণের কথা ভাবছিল, আকাশের শকুন পাখি দেখছিল, তারা বলল, একবার চেষ্টা করা হোক, এতে লোকে ভাবল কিছু করা যাবে, জলটা বের করতে পারলে আকাশের জলও আসবে।

আসবে?

হ্যাঁ, তাই তো মনে হয়, সায়রের জলে আকাশ মুখ দেখবে, আকাশে মুখ দেখবে সায়র, নীচে জল নাই বলে উপরেও নাই, উপরে জল নাই বলে নীচেও নাই, কারুর উপর ভালবাসা নাই, ধ্রুবপুত্র নাই, কিছুই নাই মানুষের।

তাম্রধ্বজ ভাবল এমনভাবে চলে গেছে সে, যে তার নিষ্ক্রমণের কথা প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করাচ্ছে প্রতিজনকে। সে চলে গিয়েও তাই রয়ে গেছে। শূদ্রপতি, গ্রামবৃদ্ধ এবার বসছে নিমগাছটির নীচে, চ্যাটালো একটি পাথরের উপর, বসতে বসতে বলল, এইখানেও সে এসে বসত, আমি এলে আমাকে বসাত, নিজে বসত মাটিতে।

তাম্রধ্বজ আকাশে তাকায়। নির্মেঘ খটখটে, দূরের মাঠে কত আলো, ওই দিকটা পুব। তাম্রধ্বজ ভাবল, এমনও তো হতে পারে গ্রামবৃদ্ধ সবটাই বানাচ্ছে, সত্যিই হয়ত সে আসত না এখানে। ভাবতে গিয়ে তাম্রধ্বজ বিব্রত হয়ে পড়ে। ধ্রুবপুত্রের সঙ্গে কারোর কোনো মিল হবে না। যদি কেউ এসে শূদ্রপল্লীতে অন্ন নিয়ে থাকে, সে ওই জনই।

তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করে, এত রোদ, কীকরে কাজ হচ্ছে?

এই সকালটায় হবে, তারপর বিকেলে, ক'দিন আগে পূর্ণিমা গেল, রাতভর কাজ করা হলো, ওই দিনই কাজ আরম্ভ হলো, কাজটা পেয়ে সবাই বেঁচে গেল।

কী করে বাঁচল।

সবাই বুঝতে পেরেছে জল উঠলেও উঠতে পারে পাতাল থেকে, যদি ওঠে তারা তুলবে, জলটা সবার হবে, সায়রটা গভীর হলো, বর্ষার কতজল ধরবে ওর ভিতরে, আপনি কে প্রভু, ধ্রুবপুত্রের মতো কথা বলো।

ধ্রুবপুত্র এমন কথা বলত?

বলত, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করত, কিছু বাদ দেওয়ার উপায় ছিল না, যাও দেখে এস প্রভু, নীচে অনেক পাথর, একটা বড় পাথর পড়েছে, ওটাকে সরাতে হবে ওই জায়গা থেকে।

তাম্রধ্বজ ধীরে ধীরে সায়রের পথে হাঁটল। অনেক মানুষ পাড়ে, অনেক মানুষ নীচে। নীচ থেকে কালো মাটি উঠে আসছে, নরম, ভিজে ভিজে, সেই মাটি পাড়ের একধারে পড়ছে। সরোবরের দুইধার উঁচু, অন্য দুই ধার সামান্য নিচু, পশ্চিমে চড়াই মাটি ধীরে ধীরে উঠে গেছে, জমির রকম সেইরকম। ওই দিকের জল ঢালু পাড় দিয়ে সরোবরে এসে জমা হয়, পুবের পাড়টি ভেঙে নিচু হয়ে গিয়েছে, সে দিকে মাটি পড়ছে। তাম্রধ্বজ পাড়ে গিয়ে দাঁড়াতেই সকলের কাজ থেমে গেল আচমকা। জনা কুড়ি লোক চার দিকে ছড়িয়ে মাটি কাটছে কুঠার,খনক, ভল্ল দিয়ে। কারো কারো কাছে মাটি কাটার উপযোগী অস্ত্রও রয়েছে, কোদাল। সমস্ত মানুষ দাঁড়িয়ে তাম্রধ্বজকে দেখছে। কে একজন চাপা গলায় বলল, প্রভু!

তাম্রধ্বজ বলল, আমি কেউ নই।

প্রভু! অবাক মানুষগুলি নুয়ে অভিবাদন জানাল তাম্রধ্বজকে।

তাম্রধ্বজ বলল, তোমরা তোমাদের কাজ কর।

সবাই আবার শরীর বাঁকিয়ে মাটি কাটতে লাগল। পাঁচজন লোক একটি অতিবৃহৎ ঝামাপাথর সরাতে চাইছে পারছে না। ওই পাথরটির কথাই বলছিল গ্রামবৃদ্ধ। তাম্রধ্বজ ডাকল, শোনো সবাই।

বলুন প্রভু! সকলে আবার কাজ থামিয়ে দিল।

ওই পাথরটাকে সরাতে হবে।

মাটি আরো কাটা হোক। কে যেন বলল।

ওই পাথরই বোধহয় জল আটকে রেখেছে।

জল! সমস্বরে সমস্ত মানুষ উল্লাস প্রকাশ করল।

তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করে, পাথরটা কীভাবে বেরোল, পাথরটা কি মাটির নীচ থেকে উঠে এল, মাটি চাপা ছিল?

হ্যাঁ প্রভু।

পাথর সরাতে পারবে?

খুব ভার! চেষ্টা হয়েছে। কে যেন বলল।

তাম্রধ্বজ বুঝল, ভীমাকার পাথর এক, ছোট একটি পাহাড় প্রায়। মাটির নীচে লুকিয়ে ছিল। রংটি ধূসর লাল, গায়ে অসংখ্য ক্ষত। তাম্রধ্বজের মনে হচ্ছিল ওই পাথর সরাতে পারলে সত্যিই বেরিয়ে আসতে পারে জল। আবার নাও পারে। সরোবরটি অনেকটা নতুন করে খনন করা হয়েছে। জলের মুখ দেখা যাচ্ছে না। তাম্রধ্বজ শঙ্কিত হলো, এমন তো হতে পারে জল আর বেরোবে না। জল পাতালপুরিতে চলে গেছে। মাটি কাটতে কাটতে এক সময় ক্লান্ত হবে মানুষগুলো হতাশ হবে, তখন? তখন কী ভাবে এদের আটকে রাখবে গ্রামবৃদ্ধ? কয়েকদিন মাত্র কাজ হয়েছে, এতবড় সরোবর খুঁড়ে গভীর করতে সময় লাগবে অনেক। তবে ভিজে মাটি বেরিয়ে এসেছে। ভিজে মাটি কি রত্নাকর সাগরের সুসময়ের স্মৃতি? নাকি এর গর্ভে লুকিয়ে থাকা জলের চিহ্ন?

মাটি কাটছে একদল। আর একদল বাঁশ ও বেতের ঝুড়িতে করে মাটি তুলে এনে পাড়ে ফেলছে। মাটি যারা তুলছে তাদের ভিতরে যুবতী নারীও আছে। তাম্রধ্বজ শুনল মাটি কাটতে কাটতে কারা যেন গুনগুন করতে লাগল। তার সঙ্গে গলা মেলাতে লাগল এক একজন। একজন একজন করে সবাই

মিলিয়ে দিল গলা। গান গাইতে লাগল। অবোধ্য সঙ্গীত, ঠিক ধরতে পারে না তাম্রধ্বজ, কিন্তু তার ভিতরে সুর আছে। সেই সুর তাকে কালামুখীর গাঁয়ের কথা মনে করাল। সেই গাঁয়ে যে গান শুনেছিল সেই গানই যেন শুনছে। একই সুর প্রবাহিত হয়ে এসেছে যেন পরম্পরায়। গানের ছন্দে ছন্দে মাটিতে ভল্ল, খনক, কুঠার, কোদাল পড়তে লাগল। মাটি মাথায় মানুষগুলি উঠে আসতে লাগল সারি সারি, গান গাইতে গাইতে উঠতে লাগল, গানের সঙ্গে শরীরের ছন্দ মেলাতে মেলাতে উঠতে লাগল। এর ভিতর থেকে আবার কে একজন যেন হাঁক মারতে লাগল নিজস্বভাষায়, সেই ভাষার ভিতরেও ছন্দ তৈরি হল্যো, ডাকের ভিতরে সুর শোনা গেল। তার সঙ্গে গলা মেলাতে লাগল কেউ কেউ। গলা মেলাতে মেলাতে একজন আলাদা হয়ে গিয়ে হাত ছড়িয়ে দিল আকাশের দিকে, তাম্রধ্বজ দেখল সে এক যুবতী। পাড়ে মাটি নামিয়ে দিয়ে নীচে নামতে নামতে গেয়ে উঠল সুরেলা গলায়, পানি নাই, মেঘ নাই, মনের মানুষ মনে নাই—নাই গো!

তার গানে প্রায় সবাই গলা মিলিয়ে দিল। এইরকম ভাবে মাটি কাটা চলতে লাগল। এক গান থেকে আর এক গানে, এক সুর থেকে আর এক সুরে যেতে লাগল মানুষগুলি। তাম্রধ্বজ হাত তোলে, যাই।

মাটিকাটা মানুষ দাঁড়িয়ে পড়ে, আবার এস প্রভু।

আবার এস প্রভু! তাম্রধ্বজ ঘাড় ঘুরিয়ে দ্যাখে গ্রাম বৃদ্ধ তাকে অভিবাদন করছে, জল তো উঠবে প্রভু?

তাম্রধ্বজ বলল, উঠবে।

পরাশর তখন চিৎকার করে বলল, প্রভু বলছে জল আর দূরে নাই, কাটো মাটি, জল ছাড়া বাঁচার উপায় নাই।

রত্নাকর সরোবরের শূন্য গর্ভ থেকে মানুষগুলি চিৎকার করে ওঠে, জল আর দূরে নাই, প্রভু সব জানে, প্রভু বলছে।

তাম্রধ্বজ নেমে আসছিল সরোবরের পাড় থেকে। তাকে অনুসরণ করছিল পরাশর। নামতে নামতে না ফিরে তাম্রধ্বজ বলে, যদি জল না ওঠে?

ও কথা বলবেন না প্রভু। পিছন থেকে চাপা গলায় আর্তনাদ শোনে সে।

যদি তেমন হয়?

পরাশর বলতে লাগল, যদি জল ওঠে, সবার মঙ্গল, শুধু শূদ্রজাতি একা বাঁচবে না, উজ্জয়িনীর সবাই বাঁচবে?

কে জল নেবে এই রত্নাকর সাগর থেকে, শূদ্রপল্লী থেকে? কোন ব্রাহ্মণ? তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করে ঘুরে দাঁড়াল।

পাড় থেকে নেমে এসেছে তারা। গ্রামবৃদ্ধের মুখখানিতে আশ্চর্য এক বিভা দেখা গেল যেন, বলল, আর যে ছয় সাগর আছে, সেই ছয় সাগর তখন খুঁড়তে হবে।

আর যদি জল সত্যিই না মেলে?

কেউ থাকবে না কোথাও।

যাবে কোথায়?

অন্য জায়গায়, অন্য নগরে, অন্য গাঁয়ে, মানুষ তো লুকিয়ে পালাচ্ছে।

লুকিয়ে কেন?

পুরুষ মানুষের পিছু ধরছে তার বউ বাচ্চা, তাই সে লুকিয়ে পালাচ্ছে, পালিয়ে গিয়ে ভাবছে যেখানে যাবে সেখানে সব আছে, শ্রেষ্ঠীও পালাচ্ছে প্রভু।

তাম্রধ্বজ এসে পৌঁছল নিমছায়ায়। ওই দূরে বটমূলে শিবনাথ ঝিমোচ্ছে। সমস্ত রাত্রির জাগরণ আর শরীরকে শক্ত থাকতে দিচ্ছে না। পা ছড়িয়ে দিয়েছে শিবনাথ। বটের নীচটায় ঠাণ্ডাও রয়েছে। মৃদুমন্দ বাতাস বৃদ্ধের দেহে আলস্য এনেছে।

পরাশর বলল, তারা ভাবছে যেখানে যেতে পারবে সেখানে এমন খরা নাই, অন্ন আছে, সেখানে যুবতী কন্যে আছে, খালি জমিন আছে, বন আছে, সেখেনেও নদী আছে, সায়র আছে এমন, কিন্তু গিয়ে দেখবে নাই কিছু।

তাম্রধ্বজ বলল, জল না উঠলে তাহলে মানুষ পালাবে?

পালালে মরে যাবে, ধরে রাখার উপায় খুঁজতে হবে, আমি সবার চেয়ে বেশিদিন আছি এখেনে, এখেনেই মোর জম্মো, রাজার কাছে সেনাবাহিনীতে কম্মো, আমি জানি উজ্জয়িনীতে যা নাই তা কোথাও নাই, উজ্জয়িনীতে যদি মেঘ নাই, তো জগতের কোথায় মেঘ থাকবে কহো প্রভু? কোথাও না, উজ্জয়িনীতে নাই তো কোথাও নাই, কে যাবে কোথায়?

সেই কথা বলো।

বললে মানুষ বুঝছে না, জীবনটা বদল করে নেবে বলছে এই সময়, পুরুষমানুষগুলো ভাবছে এই সুযোগ, ছেলে বউ ছেড়ে পালাতে গিয়ে দুটা মানুষ ধরা পড়েছে, তারা বলছে জীবন আরম্ভ করবে নতুনভাবে।

অবাক হয়ে তাম্রধ্বজ তাকিয়ে আছে। গ্রামবৃদ্ধ দুলে দুলে কথাগুলো বলছে, বলতে বলতে থামছে, আবার আরম্ভ করছে। যখন দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টি হয়, এই রকম নাকি হয়ে থাকে। মানুষ নানারকম ভাবে, নানারকম স্বপন দ্যাখে। মানুষ ভাবছে এই সুযোগে এই জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে নতুন কোথাও গিয়ে আবার আরম্ভ করবে জীবন। সেখানে তাদের জন্য সুলক্ষণা যুবতী, মেঘ, নদী, জলভরা সরোবর, ফসলভরা ক্ষেত যেন অপেক্ষা করছে। হায়রে মানুষ! মনে মনে জানে মরণের দিকে হাঁটছে প্রত্যেকদিন অথচ স্বপন দেখছে নতুন করে জন্ম নেওয়ার। তাদের যদি এখানে না আটকে রাখতে পারল তবে পরাশরই বা বেঁচে থাকবে কাদের নিয়ে? নিজেকে বাঁচাতেই এই রকম কৌশল খুঁজে বের করা। জল যদি না ওঠে তো মরণ ব্যতীত অন্য কোনো উপায় জানা নেই তার যা দিয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

চৌষট্টি

বৈদ্যরাজ নহুষ শর্মণের কাছ থেকে ফেরার পর বীট মহাপার্শ্ব চতুরিকার গৃহে দৌবারিক হয়ে গেছে যেন। এ ছাড়া কী করবেই বা বীট? নগরে ভিনদেশী মানুষ আসছে কম, সমস্ত দিন শুধু পথে পথে ঘোরা তার ধুলোমাখা। তার চেয়ে চতুরিকার দরজায় বসে থাকা অনেক সুখের। এর ভিতরে মহাপার্শ্ব একটা কাজ করেছে। কবে কোন সন্ধ্যায় কোথায় পান করতে বসে উদ্ধবনারায়ণকে জানিয়ে দিয়েছে তার নাগরী ফুস, আর যেন চতুরিকার দিকে না তাকায় উদ্ধব।

উদ্ধব তো অবাক, কী বলছিস রে বেজন্মা?

যা বলছি সত্য বলছি।

তুই জীবনে কোনোদিন সত্য বলেছিস?

শোনো সতরি মশাই, চতুরিকার দিকে নজর পড়েছে শ্রেষ্ঠীর, পড়বে না, অমন যৈবন!

উদ্ধব তখন অনুধাবনের চেষ্টা করে কার কথা বলছে বীট। নামটা শুনল বটে, কিন্তু নেশার ঘোরে তো মানুষ ভুলও শোনে, সে আবার জিজ্ঞেস করেছিল, কোন মাগির কথা বলিস?

কেন গণিকা চতুরিকা, এবার তার কপাল ফিরল।

ওই মেয়ে বিড়াল, মার্জারি, ওর কী হলো আবার?

হবে কি, শ্রেষ্ঠী তাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন বাণিজ্যযাত্রায়, বেছে বেছে মেয়েমানুষ নিচ্ছে।

শুনে উদ্ধব বিষম খায় আর কী। শ্রেষ্ঠীর কি মাথা খারাপ হয়েছে? নাকি এই মর্কট মিথ্যে বলছে? জগতে সুন্দরী মেয়েমানুষের অভাব! শেষ পর্যন্ত কিনা ওই মার্জারি! যৌবনবতী বটে, কিন্তু যৌবনে কারই না যৌবন থাকে, কে না সুন্দর হয়? পথে যে গাধীগুলো চরে বেড়ায়, তারাও কত সুন্দর, কেমন নিতম্ব দুলিয়ে কান নাচিয়ে হাঁটে তাই বলে গাধীতে নজর দিতে হবে? তার বিশ্বাস হয়নি। এই বীটকে তো সেই চেনে। সেই যে যেবার শ্রেষ্ঠী তাকে রাজপথে ঘোড়া থেকে নামিয়ে দিল প্রায়, কত কথা না বলেছিল! সবটা তো উদ্ধব সামলে নিল। অবশ্য সেই ঘটনার সঙ্গেও জড়িয়ে ছিল চতুরিকা। তার ঘর থেকে অলঙ্কার নিয়ে এসেই তো বিপত্তি। উদ্ধবনারায়ণ নিজে সন্দেহপ্রবণ মানুষ, জিজ্ঞেস করেছিল মহাপার্শ্বকে, কে বলেছে?

কেন, শ্রেষ্ঠী তার দূত পাঠিয়েছিল।

সত্যি কথাটা বল।

মহাকালের নামে সত্যি বলছি।

শুনে উদ্ধবনারায়ণ গুটিয়ে গেছে। তার মন বলেছিল সত্য হলেও হতে পারে। শ্রেষ্ঠীর দেওয়া অলঙ্কার তো চতুরিকার অঙ্গেই উঠেছিল। চতুরিকা আর আগের মতো নেই। কী রকম চোখে তাকায়, কী রকম ভাষায় কথা বলে, কিছুই বুঝতে পারে না উদ্ধব। নাচের মুদ্রাও শিখেছে কয়েকটি, বীণা বাজানো প্রায় শিখে ফেলল—এসব হয়ত শ্রেষ্ঠীরই জন্য। কার কোথায় মজে মন, কে কহিবে কোন জন? সাবধান হবে উদ্ধব।

সফল হয়েছে মহাপার্শ্ব। উদ্ধব আর আসছে না এদিকে। আসা এমনিতে কমেছিল চতুরিকার উপার্জন কমে যাওয়ায়, লুটের মুদ্রা অধিক না হওয়ায়। মহাপার্শ্বর কথা শুনে যে মাটির তলায় ঢুকে গেছে বিষধর। অনাবৃষ্টি না গেলে সে আবার আগের মতো হয়ে উঠতে পারবে না।

চতুরিকার দুয়ারে কখনো, কখনো আঙিনার ধারে, কদম গাছটির নীচে বসে থাকে মহাপার্শ্ব। চতুরিকা জানে ঘরের ভিতরে ঢোকার সাহস নেই ধূর্ত দুরাত্মার। ওকে তো সে চেনে। আগে কেমন ছিল হাড়ে হাড়ে জানে, কিন্তু এখনকার রূপের সঙ্গে আগের কোনো মিল নেই। সত্যিই বদলে গেছে লোকটা। দীর্ঘকাল আকাশে মেঘ না থাকলে এমনও হয়। শ্রেষ্ঠীর মনে তার প্রতি প্রেম জাগে, বীট মহাপার্শ্ব ভাল মানুষ হয়ে যায়।

চতুরিকা দ্যাখে মর্কট বীটের কালামুখ। সে যেন তার সামান্য হাসিতে, ডাকে, তার নূপুরের শব্দেই খুশি। সুখী। চতুরিকার মুখ দেখতে পেয়েই যেন তার জীবন সার্থক। তবে চতুরিকা জানে বীট কী রকম প্রকৃতির। অনাবৃষ্টি তার ভাগ্য বদলে দিচ্ছে বলে বীট ওই রকম হয়ে আছে। সময়ে আসল পুরুষ মানুষ হয়ে উঠবে। শুধুই চোখের দেখাতে কত সময় চুপচাপ থাকবে পুরুষমানুষ? চতুর পুরুষেরা হলো আকাশের শকুন পাখির মতো। হাড়গিলে পাখি মাটিতে নেমে অপেক্ষা করে থাকে কখন মরবে মুমূর্ষ জীবটি। মরলেই সে এগোবে। শকুন যেমন জানে অপেক্ষা করলে তার লাভ। পুরো একটা মড়া পেয়ে যেতে পারে, পুরুষ মানুষ অনেক সময় সেই রকম হয়। কেউ হয় হিংস্র কুকুর, যেমন রাজার সত্রি উদ্ধব নারায়ণ, দেখতে পেলেই ছিঁড়ে খায়, কেউ হয় হাড়গিলে পাখি, যেমন এই মহাপার্শ্ব। মহাপার্শ্ব জানে সে ঝাঁপাঝাঁপি করলে পিছলে যাবে চতুরিকা। চতুরিকা তার সেবা নেবে না।

মহাপার্শ্ব ওই যে বসে আছে ভৃত্যের মতো। আজ সে ভৃত্য, কালই উল্টো হয়ে যেতে পারে, চতুরিকা হয়ে যাবে তার দাসী। তার জন্য মহাপার্শ্ব আলো ফুটতে না ফুটতে নদী থেকে জল বয়ে আনে। চতুরিকা জানে মহাপার্শ্বর এই সেবা সে চিরকাল ধরে পাবে না। সুযোগ পেলেই ফোঁস করবে মানুষটা। সে আরো জানে গোপনে তাকে নজরবন্দি করেছে বীট। কখনোই চোখের আড়াল হতে দেয়না। এতে কখনো রাগ হয় চতুরিকার, কখনো মায়া হয়। সে চাতালে বসে স্নান করবে। তার স্নান দেখবে কেন মর্কটটা? তারপর ভাবে ওতো তার ভৃত্য, যা বলবে তাই করবে। এখন তার জীবনে এমনই ঘটে যাচ্ছে। সুতরাং মহাপার্শ্ব দেখুক না দেখুক, তার কী? বরং তাকে দেখে যদি আরো সেবা করে তবে তারই লাভ। একদিন সে বসে থাকা মহাপার্শ্বকে ডেকেছিল, এই মর্কট শোন।

চমকে উঠেছিল মহাপার্শ্ব, আমাকে ডাকিস চতুরিকে?

বসে থাকিস কেন?

ভাল লাগে।

আয় দেখি, ঝামা দিয়ে পায়ের গোড়ালি মেজে দে।

আশ্চর্য! তাই-ই করল মহাপার্শ্ব। পায়ের গোড়ালি ব্যতীত অন্য কোথাও ভুলেও তাকাল না। এমন কি বুকের কাপড় সরিয়ে সে জল ঢেলে দিলেও, মহাপার্শ্ব টের পেয়ে মাথা তুলল না।

একটু আগে, অপরাহ্নবেলায় ডেকেছিল মহাপার্শ্বকে, এই মর্কট শোন দেখি, পরামানিকের বউ, নাপতেনী আসে না কেন?

কী জানি, হয়ত পালিয়েছে, মানুষ তো পালাচ্ছে।

আমি যে আলতা পরব, কে পরাবে?

খোঁজ করব?

না। একটি পা বাড়িয়ে দিয়ে চতুরিকা বলল, তুই ঝামা দিয়ে গোড়ালি ঘষে দিলি, তুইই পরিয়ে

দে আলতা, যদি শ্রেষ্ঠী আসেন।

মহাপার্শ্ব পরিয়ে দিল। সাজিয়ে দিল পা দুখানি তার। নাপতেনী বউ-এর চেয়েও সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়ে তাকিয়ে থাকল, বলল, হয়েছে?

হলো, কিন্তু তুই তো পুরুষ মানুষ, এই পর্যন্ত থাক।

থাক তাহলে?

শ্রেষ্ঠী যদি আসেন, পালাবিনে মর্কট।

ঘাড় কাত করল মহাপার্শ্ব অনুগত ভৃত্যের মতো। চতুরিকা জানে তার পায়ে আলতা পরাতে পরাতে কীরকম কাঁপছিল মহাপার্শ্ব। তার গা ঘামছিল স্পষ্ট। চোখ দুটো ছোট হয়ে এসেছিল, রতিক্রিয়ার সময়ে যেমন হয় পুরুষ মানুষের, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছিল। চতুরিকা জানে এখন এখানেই থামছে বীট, শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্তর ভয়ে চুপ করে থাকছে। না হলে বাঘ হয়ে তাকে ছিঁড়েই খেত। বীটতো পুরুষমানুষ বটে। তার গায়ে কত শক্তি। কিন্তু তার মতো ধূর্তই বা কে? নিজে না পারলে ডেকে আনত উদ্ধব বা তার মতো আর কাউকে। লেলিয়ে দিত। এখন শ্রেষ্ঠীর সঙ্গিনী হয়ে চলে যেতে পারলেই যেন বাঁচে সে। কতদিন ঠেকিয়ে রাখবে ক্ষেপা কুকুরের দাঁত?

চতুরিকা চলে যাবে নগর ছেড়ে। এতদিন বাদে ভাগ্যদেবতা, মহাকাল ভগবান সদয় হয়েছেন তার প্রতি। শ্রেষ্ঠী ডাক দিয়েছেন তাকে। চতুরিকা বুঝতে পারছে এতদিনে জীবন সত্যিই বদলে যাচ্ছে। অনাবৃষ্টি তার জীবনে আশীর্বাদ হয়েই এসেছে যেন। অনাবৃষ্টি না হলে শ্রেষ্ঠী কি এতদিন বাদে এমন সময়ে বাণিজ্যে যেতেন? না যেতেন না। তিনি তো উজ্জয়িনীতে বসেই ভিনদেশী বণিকদের সঙ্গে কেনাবেচা সারছিলেন। তাতেই তাঁর ঘরে স্বর্ণমুদ্রার ছড়াছড়ি। শ্রেষ্ঠী যাচ্ছেন কেননা তাঁকে যেতে হচ্ছে। নগর ক্রমশ শূন্য হয়ে যাচ্ছে। কেউ গোপনে যাচ্ছে, কেউ যাচ্ছে দশদিকে জানান দিয়ে, যেমন শ্রেষ্ঠী যাচ্ছেনা বাহ্লিক দেশে। সে দেশে আকাশে মেঘ আছে, মেঘের ডাক আছে, বৃষ্টি আছে। সে দেশে নদীতে জল আছে, ক্ষেতে ফসল আছে, লোকের হাতে স্বর্ণমুদ্রা, মোহর অঢেল। চতুরিকা জানে শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে বাহ্লিক দেশ পর্যন্ত গিয়ে সে মুক্ত হয়েও যাবে আবার। সেই দেশে কোনো এক রূপবান যবন পুরুষ তার অপেক্ষায় আছে। সেখানে উদ্ধবের মতো কেউ নেই। এখন যাত্রা শুরু করতে পারলেই হলো। এই নগরে আর থাকা যাবে না। তার ভাগ্য ভাল অনাবৃষ্টি চলছে। মেঘ নেই। মেঘ আসেনি। এলে, বৃষ্টি নামলে কি তার ভাগ্য বদলাত? শ্রেষ্ঠী তখন ডাকতেন না নিশ্চয়। দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টি চললে এমন হয়, বহুলোক যেমন মরণের দিকে এগোয়, কারোর কারোর ভাগ্য এভাবে বদলে যায়। অনাবৃষ্টি ছিল বলে এই নির্মম জীবন ছেড়ে, আগুনে পোড়া নগর ছেড়ে, অলক্ষ্মীর অধিবাস ছেড়ে সে যেতে পারছে। চরম দুর্ভাগ্যের ছায়ায় ঢেকেছে এই নগর, মরণ এর শিয়রে এসে বসেছে, এখন ছেড়ে যেতে পারলেই হয়। আহা! কবে সে পৌঁছবে এক আশ্চর্য নগরে, যেখানে সব আছে, আনন্দ আছে জীবনে।

চতুরিকা মহাপার্শ্বকে ডাকল সন্ধেবেলায়, মহাপার্শ্বহ, মহাপার্শ্বভাই।

মহাপার্শ্ব দুয়ারে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে ভাই বলো কেন চতুরিকে?

চতুরিকা হেসে বলল, নাগর বলি তা হলে, নাগর তুই গিয়ে খোঁজ নিয়ে আয় কবে যাবেন শ্রেষ্ঠী।

মহাপার্শ্ব বলল, যবে যাবেন লোক পাঠিয়ে জানান দেবেন।

না, না তিনি ডেকেছেন, আমি খোঁজ না নিলে যদি ভাবেন আমিও দেবদত্তার মতো তাকে প্রত্যাখ্যান করছি।

মহাপার্শ্ব পা ঘষে অন্ধকার মাটিতে, বলে, না, না তা ভাববেন কেন?

তুই যা, বলে আয় আর জিজ্ঞেস করে আয়।

তবু মহাপার্শ্ব ধানাইপানাই করে, বলে, আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করা কি ঠিক?

বিরক্ত হয় চতুরিকা, মনে মনে বলে, তোকে আমি এমন ঘুর লাগাবো মর্কট, তুই তখন টের পাবি, যাওয়ার আগে শ্রেষ্ঠীকে বলে নগরের পথে ফেলে তোকে কশাঘাত করাব, যদি শ্রেষ্ঠী শোনেন তুই গোপনে আমার রূপ সুধাপান করিস তোকে না তাঁর দাস উতঙ্কের মতো পুড়িয়ে মারেন। তুই বামন, তোর চাঁদ ধরার সাধ হয়েছে। তোর ন্য ধোপার গাধাই যথেষ্ট, নাহলে এক কুক্কুরি। থুহ্!

চতুরিকাকে চুপ করে থাকতে দেখে মহাপার্শ্ব আবার বলে, যদি শ্রেষ্ঠী তোকে নিয়ে যান চতুরিকে,

তিনি তাঁর চতুর্দোলা পাঠাবেন, না হয় রথ পাঠাবেন, তোকে নিজে খোঁজ নিতে হবে কেন?

চতুরিকার মনে হলো তাকে যেন উপহাস করছে মহাপার্শ্ব। চতুর্দোলা, রথ! যেন সে তার উপযুক্তই নয়। থাক চতুর্দোলা, থাক রথ, সে পায়ে হেঁটে যাবে শ্রেষ্ঠীর গৃহ পর্যন্ত। সে মহাপার্শ্বকে ঝাঁজিয়ে ওঠে, তোকে অত ভাবতে হবে না মর্কট, যা বলছি তাই কর, না হলে আমার সামনে থেকে যা, তোকে দিয়ে যদি কোনো কাজ হয়।

ওই ওষুধেই কাজ হলো। সন্ধ্যার অন্ধকারেই চলল মহাপার্শ্ব। চাঁদ উঠতে দেরি আছে, তবু সে চলল। অন্ধকারে পথ হাঁটতে তার কোনো অসুবিধে হয় না, বরং সে নাকি অন্ধকারেই চোখে দ্যাখে ভাল। চতুরিকা তাকে পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কখন ফেরে, কোন খোঁজ নিয়ে আসে সে। কী কথা বলে আসে, কী কথা শুনে আসে?

পথ তো কম নয়। তালঢ্যাঙা মহাপার্শ্ব খুব জোরে হাঁটে বটে, লম্বা লম্বা পা ফেলে বটে, কিন্তু যাবে, শ্রেষ্ঠীর জন্য বসে থাকবে, আবার ফিরবে—সময় তো লাগবে। চতুরিকাকে হয়ত আজ সমস্ত রাত্তির অপেক্ষা করতে হতে পারে। শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ কখন পায় মহাপার্শ্ব কে জানে? চতুরিকা আকাশের তারা দেখতে লাগল।

এতদিন বাদে তার কপাল খুলেছে। ভাগ্য তাকে সহায়তা করতে আরম্ভ করেছে। সে এই নগর থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এই নগর থেকে মুক্তি পাওয়া মানে এই জীবন থেকে মুক্তি পাওয়া। দখিনা বাতাসে চোখ বুঁজে আসে চতুরিকার। সে শুনেছে এই উজ্জয়িনীতে যা যা নেই, বাহ্লিক দেশে সেই সব আছে। মেঘ, বৃষ্টি, জলপূর্ণ সরোবর, পুষ্পোদ্যান-সব। সে শুনেছে সেই দেশে সুরূপা কুরূপার ভেদ নেই, মার্জার-আঁখি আর নীল নয়নার তফাৎ নেই। সেখানে কেউ গণিকা নয়, আবার যারা গণিকা তারা সবাই দেবদত্তার মতো। সেই নগরে রাজকর্মচারীরা নরম প্রকৃতির, নরম হৃদয়ের। উদ্ধবনারায়ণের মতো কেড়ে নিতে আসে না কেউ। চতুরিকা মনে মনে প্রার্থনা করে, চলুক অনাবৃষ্টি। বৃষ্টি এসে গেলেই শ্রেষ্ঠী হয়ত তাঁর যাত্রা স্থগিত রাখবেন, পরে কি কখনো শ্রেষ্ঠী তার কথা মনে করবেন?

খুব তাড়াতাড়িই ফিরে এল মহাপার্শ্ব। তখন চাঁদ উঠে গেছে। জ্যোৎস্না এসে পড়েছে তার আঙিনায়। মহাপার্শ্ব হাঁপাচ্ছে। একটু দূরে উবু হয়ে বসল। চুপ করে থাকল। চতুরিকাও তার দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ। একটু বাদে মহাপার্শ্ব বলল, দৌড়ে গেছি, দৌড়ে এসেছি প্রায়।

অতটা পথ দৌড়ে গেলি তুই?

মহাপার্শ্ব হাসল, দৌড়বার মতো করে গিয়েছি, আমি কত জোরে হাঁটতে পারি বল।

খোঁজ পেলি?

পেলাম। মহাপার্শ্ব সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে চুপ করে থাকে। চতুরিকা তার মৌনতায় উৎসাহী হয়। তাহলে মহাপার্শ্ব সঠিক সংবাদ নিয়ে ফিরেছে নিশ্চয়ই। মহাপার্শ্ব তো মনে মনে চায় না সে শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে উজ্জয়িনী ত্যাগ করে। চতুরিকার দমবন্ধ হয়ে আসে মহাপার্শ্বর কথা শোনার জন্য। মহাপার্শ্বও যেন ঝিমোচ্ছে, সংবাদটা দিতেই চায় না।

কী খোঁজ পেলি, বল। চতুরিকা ডাকল মহাপার্শ্বকে।

মহাপার্শ্ব যেন ঘুম ভেঙে উঠল, বলল, বৈদ্যরাজটা পাগলা, ওর কথা সত্য নয়।

মুখ অন্ধকার হয়ে গেল, চতুরিকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল মহাপার্শ্বকে। হাঁই তুলছে মর্কট। এই খোঁজ আনতে গিয়েছিল নাকি সে? চাঁদ যেন কোনো এক গাছের আড়ালে চলে গেল। এরই ভিতর যেন অস্ত গেল। চতুরিকা কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল, তুই গিয়েছিলি মহাপার্শ্ব, সত্যি কথা বল।

হ্যাঁ গিয়েছিলাম।

কার সঙ্গে দেখা হলো?

শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে।

শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে তোর দেখা হলো?

হ্যাঁ হলো।

শ্রেষ্ঠী কী বললেন?

বৈদ্যরাজ পাগলা।

মহাকালের নামে বল দেখি তুই শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে দেখা করে এলি।

মহাপার্শ্ব চুপ। সন্দেহ সত্য হলো। অনেকক্ষণ থমথমে হয়ে বসে থেকে মহাপার্শ্ব উঠতে যাবে তো চতুরিকা গর্জন করে ওঠে, এই মর্কট বস, মিথ্যে কথা বলেছিস?

চুপ করে থাকে মহাপার্শ্ব। ধরা পড়ে গিয়ে এছাড়া উপায় কী। আর তাতে চতুরিকা যেন টের পায় শ্রেষ্ঠীর কাছে গেলে যাত্রার দিনক্ষণ জেনে যাবে বলেই মহাপার্শ্ব যায়নি। মহাপার্শ্ব সব জানে। সমস্ত দিন টইটই করে বেড়ায় নগরে, সে জানবে না? চতুরিকা বলল, তুই আর আমার এখানে আসবি না, এখানে বসে থাকবি না, আমি যেন তোর মুখ না দেখি।

মহাপার্শ্ব ভয় পেল। চতুরিকার এখানে যদি সে না আসতে পারে, যদি চতুরিকার জন্য সে দূর নদী থেকে জল বয়ে না আনতে পারে, যদি চতুরিকার স্নান না দেখতে পারে, চাঁদপানা মুখখানি দেখে জীবন ধন্য না করতে পারে, তবে সে বেঁচে থাকবে কিসের জন্য? সেও চলে যাবে নগর ছেড়ে। কত লোক চলে যাচ্ছে, সেও চলে যাবে। যাবে বটে, কিন্তু চতুরিকাকে ফেলে যাবে কী করে? চতুরিকা থেকে যাবে উজ্জয়িনীতে, আর সে কিনা চলে যাবে বৃষ্টির মেঘের উদ্দেশে, আর এক নগরের উদ্দেশে যেখানে সব আছে। সব থাকলেও চতুরিকা তো থাকবে না। চতুরিকার না থাকা মানে সব শূন্য হয়ে থাকা। কিছুই না থাকা। মহাপার্শ্ব অন্ধকার মুখে চেয়ে থাকল চতুরিকার দিকে।

চতুরিকা বলল, তোর এত বড় সাহস, তুই সত্য গোপন করিস আমার কাছে।

মহাপার্শ্ব বলল, আর হবে না।

তোকে তো বিশ্বাস করা যায় না, আঁস্তাকুড়ের মানুষ, তুই কি আমার এখেনে বসে থাকার যোগ্য, তুই তো শ্রেষ্ঠীর পায়ের নীচের ধুলো!

মহাপার্শ্ব বলল, যাচ্ছিলাম, যেতে যেতে দেখি শ্রেষ্ঠীর রথ যাচ্ছে রাজপ্রাসাদে।

তাতে শ্রেষ্ঠী ছিলেন তো রথ থামালি না কেন, এখন তো উতঙ্ক নেই।

রথে কেউ ছিল না চতুরিকে।

তবে কে ছিল, কী করে চিনলি ওটা শ্রেষ্ঠীরই রথ?

চিনি আমি, শ্রেষ্ঠীর রথ কে না চেনে, শূন্য রথও চেনা যায়।

শূন্য রথ তো ফিরে এলি কেন?

বুঝতে পারলাম শ্রেষ্ঠী আছেন রাজপ্রাসাদে।

আবার মিথ্যে কথা বলছিস।

না চতুরিকে।

যদি তুই মিথ্যে বলিস আমার মরামুখ দেখবি।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ল তালঢ্যাঙা মহাপার্শ্ব, নুয়ে পড়ল যেন মাটির উপর, বলল, আমি যাই নাই।

এতক্ষণ তাহলে কোথায় ছিলি?

অন্ধকারে বসে ছিলাম ওই মাঠের দিকে, ঠিকই করেছিলাম চাঁদ উঠলে ফিরে আসব।

সত্যি বলছিস?

হ্যাঁ সত্যি, তুই যদি শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে যাস, আমি কোথায় যাব চতুরিকে?

চতুরিকা বলল, এই কথা যদি শ্রেষ্ঠীর কানে যায়, তোর প্রাণ থাকবে?

না, থাকবে না। মহাপার্শ্ব জবাব দেয়।

কাল সকালে যাবি, না যাবি তো আর আমার মুখ দেখতে পাবিনে।

মহাপার্শ্ব বলল, যদি শ্রেষ্ঠীর দেখা না পাই?

বসে থাকবি, খোঁজ তোকে আনতেই হবে।

মহাপার্শ্ব ঘাড় কাত করল। চতুরিকা তাকে আদেশ করছে, এই আদেশের জন্যই যেন সে এত সময় বসেছিল। মহাপার্শ্ব ভাবল সে চতুরিকার দাস, দাসানুদাস। চতুরিকা যা বলবে সে তাই করবে। চতুরিকা যদি তাকে পদাঘাত করে সে তা সহ্য করতে পারবে, এমনই তার মোহ। দাস হতে পারলেই তবে মেয়েমানুষকে ভালবেসে সুখ। জীবন সার্থক হয়। সে বিড়বিড় করল, যা বলবি তাই করব।

তবে এখন যা।

রাত হয়েছে যে, দ্যাখ চাঁদ কত দেরিতে উঠেও আকাশের মধ্যিখানে পৌঁছে গেছে, এবার অস্তাচলের দিকে গড়াবে।

তা হোক, শ্রেষ্ঠী তো রাজপ্রাসাদ থেকে এখন ফিরবেন।

কে বলল? মহাপার্শ্ব অবাক।

তুই যে বললি শূন্যরথ রাজবাড়ি যাচ্ছে।

মহাপার্শ্ব বলল, ও তো মিথ্যে কথা, আমি তো তোকে সত্যি বলিনি।

চতুরিকা মাথা নাড়তে লাগল, উঁহু, তুই এমন ভাবে বললি, মিথ্যে যদি হয়, ওই মিথ্যেটা কী করে বললি?

মহাপার্শ্ব হাসে, তখন চাঁদ ওঠেনি, অন্ধকারে রথ যাবে? আর শূন্য রথ যাবে কেন, শ্রেষ্ঠী কি তাহলে পায়ে হেঁটে রাজপ্রাসাদে গিয়েছিল?

তা যাবে কেন, রথেই যাবে। মশাল জ্বালিয়ে যাবে।

রথেই যাবে তো রথ রাজপ্রাসাদেই তো থাকবে। মহাপার্শ্ব বোঝাতে চায়।

চতুরিকা বলল, আমি ওসব জানিনে, তুই গিয়ে দ্যাখ, দরকারে শ্রেষ্ঠী গৃহের দরজায় শুয়ে থাক গিয়ে, যখন তিনি ফিরবেন কিংবা বেরোবেন, সে আজ রাত্তিরে হোক বা কাল সকালে হোক, পায়ে পড়ে যাবি।

কী আর করে মহাপার্শ্ব? তার বড় ঠেকা। মেয়েমানুষকে ভালবাসলে বুঝি এই হয়। সে কোনোদিন মেয়েমানুষকে এভাবে ভাবেইনি। সে হলো গণিকা মেয়েমানুষের ঘরের প্রহরী, তার এসবে মন হবে কেন? হয়েছে। এ হলো পূর্ব জন্মের অভ্যেস। হাঁটতে হাঁটতে মহাপার্শ্ব তাই ভাবল। মহাপার্শ্ব ভাবল, পূর্ব জন্মে আমি ছিলাম পরম রূপবান গন্ধর্ব। প্রেমে পড়া আমার ভবিতব্য। চতুরিকার জন্য আমি মরতে পারি পর্যন্ত। চতুরিকে আমি তোর প্রণয়ী হতে চাই। প্রণয়ীকে প্রণয়িনী এত কষ্ট দেয়। নাকি প্রেমের বেদনাতেই আসল সুখ। তালঢ্যাঙা মহাপার্শ্ব লগবগে পায়ে জ্যোৎস্নারাত্তিরে শূন্য রাজপথে একা একা হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়ায়। ভাবে সারারাত আমি শ্রেষ্ঠীগৃহের সামনের পথে বসে থাকলাম না ঘরে ঘুমোলাম, কে খোঁজ নিতে যাচ্ছে? বরং বাড়ি ফিরি। সকালে ওইদিকে গেলেই হবে।

আর দাঁড়াল না মহাপার্শ্ব। একটু ঘুরপথে নিজ কুটিরের সম্মুখে এসে যেন বাঁচল। বসল দুপা ছড়িয়ে। তারপর চিত হলো আঙিনায়। চিত হয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু সেই ঘুম ভেঙে গেল আচমকা। পেটের ভিতরে যেন অগ্নিদহন চলছে। ঠিক দুপুরে উজ্জয়িনীর পথ ঘাট যেমন হয়ে ওঠে তেমনি। কিন্তু ঘরে তো অন্নের কোনো ব্যবস্থাই নেই। সমস্তদিন চতুরিকার মুখ দেখে কাটে। আজ সে মাগি তাকে খেতেও বলেনি। মহাপার্শ্ব উঠে দাঁড়াল। খিদে পেটে থাকলে তার মাথার গোলমাল হয়ে যায়। এখন সে কী করে? যাবে নাকি গণিকার গৃহে? আগে কিছু খেতে দে চতুরিকে, অন্নজল দে, আমি তোর দাসানুদাস, পোষা কুকুর—। মহাপার্শ্ব টলতে টলতে এগোয়।

পঁয়ষট্টি

মহাপার্শ্বর এখন খুব বিপদ। সে বুঝতে পারছে চতুরিকা আর তার ধানাইপানাই মিথ্যে শুনবেনা। আশ্চর্য! মহাপার্শ্বর সব মিথ্যেই ধরে ফেলে চতুরিকা। অথচ মিথ্যে বলতে তার মতো পটু মানুষ কি এই নগরে মিলবে? মহাপার্শ্ব জানে যদি তার সঙ্গে কথাও হয় শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্তর, সে সত্যটি বলতে পারবে না। মুখে আটকাবে। কথাটা চেপে রাখবে অন্য কথায়। বানিয়ে কথা বলতে তার ঠোঁট সব সময়ই সুড়সুড় করে। তখন চতুরিকার কাজ হবে জেরা করে সত্য কথাটা বের করে নেওয়া। চতুরিকা তা পারে। আর একমাত্র চতুরিকার কাছেই মিথ্যেটা বেশি সময় ধরে রাখতে পারে না মহাপার্শ্ব। চতুরিকাকে সে ভালবাসে যে।

ভালবাসে তাই সে চতুরিকার দাস। কতদূর থেকে তার জন্য জল বয়ে আনে ভোর ভোর, আলো ফুটতে না ফুটতে। কাক যেমন উচ্ছিষ্টের জন্য বসে থাকে, তেমনি সে বসে তাকে শুধু মাত্র চতুরিকার শ্রীমুখখানি দেখার জন্য। কণ্ঠস্বর শোনার জন্য। কখন ডাকবে তাকে সেই জন্য। ডেকে এ কাজটা, ওকাজটা

করতে বলবে, সেইজন্য। অথচ সে কিনা আসল কাজটিই করে-উঠতে পারছে না। মিথ্যে বলছে আর ধরা পড়ে যাচ্ছে। কী করে পারবে সে? শ্রেষ্ঠী গৃহে যাওয়ার শপথ নিল চতুরিকার কাছে, কিন্তু পথে বেরিয়ে একা হতেই মন অন্যরকম হয়ে গেল। হয়ে যাচ্ছে। প্রেমে পড়লে কি এমন হয়? নাকি অনাবৃষ্টির জন্য এমন হয়? অনাবৃষ্টিই কি শেষপর্যন্ত চতুরিকাকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নেবে?

গত পরশু খিদের জ্বালায় চতুরিকার ঘরে সে ফিরেছিল মধ্যরাতে। তখন জ্যোৎস্না সরে গেছে তার আঙিনা থেকে। মহাকাল ভগবানের আলো মহাকাল ভগবানই টেনে নিয়েছেন নিজের কাছে। অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে সে ডেকে উঠেছিল, চতুরিকে।

ঘুমোয় না বোধহয় গণিকা। এক ডাকেই অর্গল খুলে প্রদীপ হাতে বেরিয়ে এসে উত্তর দিয়েছিল, কে ডাকে, এত রাত্তিরে কে, বৈদ্যরাজ নাকি?

ক্ষুধার্ত মহাপার্শ্বর বুক ভেঙে গিয়েছিল আর একবার। রাতভর জেগে আছে গণিকা শ্রেষ্ঠীর ডাকের জন্য। আবার পাগলা বৈদ্যরাজ এসে খোঁজ দেবে, জানাবে শ্রেষ্ঠী কখন ডেকেছেন, কোথায় থাকবেন সন্ধ্যায়। মহাপার্শ্ব বুঝতে পেরেছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত। তিনি ধনপতি মানুষ, ঐশ্বর্যের সীমা নেই তাঁর। আর সে হলো পথের ভিখারি। মহাপার্শ্ব জবাব দিয়েছিল, আমি চতুরিকে, আজ সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি।

মহাপার্শ্ব। তুই যাসনি?

গিয়েছিলাম, খিদেয় ফিরে এলাম।

গিয়েছিলি, ফিরে এলি?

হ্যাঁ চতুরিকে, খাওয়ার কিছু আছে?

যাসনি তো?

হ্যাঁ গিয়েছিলাম।

আবার মিথ্যে, সত্যি বল।

সত্যি বলতে হলো। আশ্চর্য। তাকে ভৎর্সনা না করে চতুরিকা খেতে দিল। দুধ দিল, তিলকূট যব চূর্ণ, আখের গুড়, পক্করম্ভা। খেতে খেতে মহাপার্শ্বর মনে হয়েছিল তাকে ভালবাসে চতুরিকা তাই এমন ভাবে তার খিদের আগুন নেভাতে পারল। ভালবাসা এইরকম। খাওয়া শেষ করে জল খেতে খেতে সে টের পেয়েছিল এমন ভালবাসারই কাঙাল সে। তাকে কে খেতে দেয় এমনভাবে? কেউ না। এমন ভাবে খিদের আগুনে জল ছিটিয়ে নেভানোর জন্য তো মেয়েমানুষই দরকার। আর কেউ পারে না। সে কিছুতেই চতুরিকাকে শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে যেতে দেবে না। দরকারে শ্রেষ্ঠীর পা ধরবে। তারপর চতুরিকাকে নিয়ে এই নগর ছেড়ে চলে যাবে। এই নগর তাকে সুখে থাকতে দেবে না। আছে এক উদ্ধবনারায়ণ, সে তো সব জেনে গেলে আবার আসবে। তার ক্রোধ ভয়ানক। সে কম নিষ্ঠুর নয়। তার হাত থেকে বাঁচতে বরং অন্য কোথাও গিয়ে নতুন ভাবে জীবন আরম্ভ করা ঢের ভাল। উজ্জয়িনী যখন এত কষ্ট দিচ্ছে, অন্য নগরে গেলে সুখে থাকবে চতুরিকা। চতুরিকার সঙ্গে সে নিজে। মহাপার্শ্ব ভেবে নিয়েছে, সেখানে এক নদীর ধারে ঘর বাঁধবে তারা। সেখানে রোদ নরম, বাতাস ঠাণ্ডা। সেখানে তাদের জন্য ফসলের জমি পড়ে আছে, আকাশে মেঘ আছে, জমিতে সুবৃষ্টি আছে, আছে সব সুভদ্র রাজকর্মচারী। সেনাবাহিনী। পুণ্যবান রাজা। কেউ তাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না, তাদের অনিষ্ঠ করতে এগিয়ে আসবে না। সেই নগরে গণিকালয় নেই, গণিকা নেই, তাই অভিশপ্ত গন্ধর্ব, বীটও নেই। সেই নগরে তার মতো ধূর্ত, মিথ্যেবাদিও নেই। নেই বলেই সে তার স্বভাব মুক্ত হয়ে যাবে। অভিশাপ মুক্ত হয়ে আবার হয়ত গন্ধর্বের রূপ ফিরে পাবে। গন্ধর্বের রূপ পেলে, চতুরিকা তাকে মানুষের মতো দেখবে। পুরুষমানুষের মতো দেখবে। চতুরিকা তার প্রতি প্রেমভাবে তাকাবে। তার দিকে কামভাবে তাকাবে। তার অনুরাগিনী হয়ে উঠবে। এ সব হতে পারে যদি শ্রেষ্ঠী সত্যিই চতুরিকাকে বাহ্লিক দেশে না নিয়ে যান। তখন চতুরিকা তার প্রতি নির্ভর করতে শিখবে। তাকে অবলম্বন করে বাঁচতে চাইবে।

শ্রেষ্ঠী গৃহে যাবে বলে বেরিয়ে যেতে পারছে না মহাপার্শ্ব। নগরের পথে ঘুরছে। কী যে করে সে? চতুরিকার কাছেও ফিরে যেতে পারছে না, আবার শ্রেষ্ঠীর কাছে গিয়েও খোঁজ নিতে পারছে না কবে তিনি যাত্রা করবেন, কবে চতুরিকা তাঁর কাছে আসবে।

পথের ধারে একটি কদম গাছের নীচে বসে ঝিমোচ্ছে মহাপার্শ্ব। রাত্তিরে ঘুম হচ্ছে না। দিন মানেও বিশ্রাম পাচ্ছে না। কী যে এখন করে? তখন দুই ব্যক্তি, এক জন প্রৌঢ় আর একজন নবীন যুবক এসে তাকে ডাকল, শুনছেন মহাশয়।

মহাশয় তো শোনার জন্যই কদমতলায় বসে আছে। মহাপার্শ্ব উঠে বসে। তার ধূর্ত চোখ বুঝতে পারল এরা নগরে খুব সড়োগড়ো নয়। নগরে নতুন। তবে তার স্মৃতি খুব প্রখর। এদের সে দেখেছে মনে হয়। আগে কখনো হয়ত এই উজ্জয়িনীরই পথে। নগরের মানুষ না হলেও, আশপাশের কেউ। প্রতিদিনই কত মানুষ নগরে আসে। হয় রাজদরবারে, কোনো রাজকর্মচারীর খোঁজে, না হয় বাণিজ্যের কারণে, ক্রয় বিক্রয়ের জন্য। আবার অনেকে এমনি এমনিই আসে। নগর দেখতে, নগরে ঘুরতে। অনেকে আসে মহাকাল মন্দিরে মানত করতে, মহাকাল দর্শন করতে। মহাকাল দর্শনের পর গণিকালয় খোঁজে। এই নগরে যত ফূর্তির আয়োজন, তা আর কোথাও নেই। ইদানীং আবার অনাবৃষ্টির কারণে নগর থেকে মানুষ যেমন পালাচ্ছে, তেমনি নগরে এসে পড়ছেও কতজন। ভেবে আসছে, এখেনে যখন মহাকাল ঠাকুর আছেন, রাজা আছেন, এখানে নিশ্চয় সব আছে, মেঘ, সুবৃষ্টি।

মহাপার্শ্ব জিজ্ঞেস করল, কী প্রয়োজন?

আপনি কি এই নগরের?

মহাপার্শ্ব বলল, তাই তো জানি, এখেনেই আমার জম্মো এবং কম্মো।

তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করল, আমরা একটি প্রয়োজনে এসেছি।

আপনি কে, কোথা থেকে আসা হচ্ছে, কেন এসেছেন, কার কাছে কী প্রয়োজন?

তাম্রধ্বজ নিজের পরিচয় দিতে সোজা হয়ে বসল মহাপার্শ্ব, বলল, তিনি তো পালিয়েছে নগর ছেড়ে, চলে গেছে শুনেছি উত্তরদিকের কলিঙ্গ দেশে।

বক্তার জ্ঞানে তাম্রধ্বজ মুগ্ধ হলো। নগরে এই রকম মানুষ বেশি। ভান করে অনেক জানার, অথচ জানেনা কিছুই। সে বলল, কলিঙ্গ তো দক্ষিণে।

না, উত্তরে, তাই তো শুনেছি সেনাপতির কাছে, রাজাও তাই বললেন।

কী বললেন?

উনি কলিঙ্গে গেছেন উত্তরদিকে, আমি নিজ কানে শুনেছি, কিন্তু প্রয়োজন কী?

তাম্রধ্বজ ভাবল এ এক বখাটে ব্যক্তি, দেখে মনে হয় উঞ্ছবৃত্তিই এর জীবিকা। এর কাছে কী খোঁজ পাবে? কিন্তু এমন মানুষ তো পথেই কাটায় সবসময়। সব কিছু চোখে দেখে থাকে এরা। এদের কৌতূহল সর্ববিষয়ে। এইরকম মানুষের কাছেই খোঁজ পাওয়া যাবে কী হয়েছিল সেই সময়। ধ্রুবপুত্রকে কীভাবে আহত করেছিল শ্রেষ্ঠীর দাস। ধ্রুবপুত্রর সঙ্গে দেবদত্তার সম্পর্ক কতটা কী হয়েছিল। ধ্রুবপুত্রকে নগর থেকে নির্বাসিত করেছিলেন শ্রেষ্ঠী, কেন? নির্বাসন দন্ড কি রাজার দেওয়া, নাকি সেনাপতির?

মহাপার্শ্ব বুঝল এরা খুব সাধারণ নাগরিক নয় যে সে ঠকিয়ে কিছু লাভ করে অন্তর্ধান করবে। কিন্তু এদের সাহায্যে যদি লাগতে পারে প্রাপ্তিযোগ হতে পারে। সে এতক্ষণে একটা কাজ পেয়েছে। কদমতলায় কত সময় বসে থাকতে পারত? এরপর তো উঠে আবার হাঁই হাঁই রোদে চক্কর মারতে হতো। একবার শ্রেষ্ঠীগৃহ আর একবার শূন্য রাজপথ। এছাড়া আর যেত কোথায়? চতুরিকা এখন হয়ত অন্ধকার ঘরে গা এলিয়ে ঘুমিয়ে আছে। ঘুমের ভিতরে শ্রেষ্ঠীর স্বপ্ন দেখছে। তবে তাঁকে স্বপ্ন দেখবে বললেই তো দেখতে পাবে না চতুরিকা। শ্রেষ্ঠীর কথা ভাবতে ভাবতে কল্পনা করতে করতে ঘুমিয়ে হয়ত মহাপার্শ্বকেই স্বপ্ন দেখছে চতুরিকা। তাকে দিয়ে অঙ্গ মার্জনা করাচ্ছে হয়ত গণিকা। সে চতুরিকার আদুল শরীরে হয়ত চন্দনের সুগন্ধ ভরা জল ঢেলে দিচ্ছে। চতুরিকার দুটি স্তনে লেপন করছে শ্বেত চন্দন। যৌবনে চতুরিকাই শ্রেষ্ঠা। প্রধানা গণিকা দেবদত্তার চেয়েও চতুরিকা যেন অনেক কামনা উদ্দীপক। তেমনই মনে হয় মহাপার্শ্বর। দেবদত্তার দিকে মাথা তুলে তাকায়নি সে কোনোদিন। সে সাহসই নেই তার। দেবদত্তা অনেক দূরের তারা, চোখে দেখা যায় না প্রায়, চতুরিকা আকাশের চাঁদ। ভাবলে ছুঁয়ে দেখা যায়। স্বপ্নে ছোঁয়া যায়। জ্যোৎস্নায় স্নান করা যায়, নিজের না হলেও নিজের মনে করা যায়।

তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করে ফেলল, ধ্রুবপুত্রকে মনে আছে?

মনে আছে, তবু ভান করল মহাপার্শ্ব, বলল, কার পুত্র?

ধ্রুবপুত্র, শ্রেষ্ঠীর আশ্রয়ে ছিল।

ওহ্ হো, সেই নির্বোধ, যাকে খুব মেরেছিল উতঙ্ক, মেরেই ফেলে দিত যদি আমি না গিয়ে প্রহরণটি ধরে ফেলতাম, সে তো চুকে বুকে গেছে, উতঙ্কও মরে গেছে, শ্রেষ্ঠীও বাহ্লিক দেশে চলে যাচ্ছে চতুরিকে গণিকে কে নিয়ে, অনাবিষ্টিতে কারোর সর্ব্বোনাশ, কারোর অঘ্রান মাস।

আপনার পরিচয়? শিবনাথ জিজ্ঞেস করল।

পরিচয় আবার কী, রাজার কাছে নিয়ে গেলেও তিনি চিনবেন, শ্রেষ্ঠীও চেনেন, গণিকারাও চেনে, দেবদত্তা পর্যন্ত, এই আমার পরিচয়।

তিনি কোথায় থাকেন? তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করে।

তিনি টা কিনি?

গণিকা দেবদত্তা? জিজ্ঞেস করল তাম্রধ্বজ আবার।

মহাপার্শ্ব চুপ করে প্রশ্নটি বুঝতে চাইল। এরা দুজন কি ধানাই পানাই আরম্ভ করেছে? আসলে জানতে চায় দেবদত্তার গৃহখানি কোথায়, তাই অন্য কথা থেকে ওই কথায় পৌঁছতে চাইছে? দেবদত্তার গৃহ খোঁজে কে? যার সামর্থ্য আছে দেবদত্তাকে খুশি করার। ধনী তো হতেই হবে। এদের দেখে তেমন মনে হচ্ছে না, তবে বীট মহাপার্শ্ব জানে গ্রামদেশীয় ধনী ব্যক্তিরা ধনসম্পদ প্রকাশ করে না কখনো। তাদের দেখলে ধরা যাবে না কত সম্পদের অধিকারী, ক'জন গণিকাকে অন্নবস্ত্র দিয়ে রাখতে পারে নিজের কাছে। সুতরাং সতর্ক হলো মহাপার্শ্ব, বলল, মহাশয়রা কী জানতে চান, কার কথা, স্পষ্ট করে না বললে কী করে উত্তর দিতে পারি?

তাম্রধ্বজ বলল, ধ্রুবপুত্রর কথা, আপনি আমাদের সাহায্য করুন, আপনার ভাল হবে।

ভাল হবে শুনে আচমকা অভিভূত হয়ে গেল মহাপার্শ্ব। ভাল হবে মানে সে চতুরিকার অধিকারী হবে। শ্রেষ্ঠী ত্যাগ করবেন চতুরিকাকে। সে চতুরিকাকে নিয়ে নগর ছাড়বে। সাত সকালে এই কথা শোনার অর্থ কথা সত্য হবেই। সে জিজ্ঞেস করল, তার কথায় কী প্রয়োজন?

প্রয়োজনের কথা শোনায় তাম্রধ্বজ। শিবনাথের পরিচয় দেয়। শুনতে শুনতে মহাপার্শ্ব ভাবে সে সত্য বলবে না মিথ্যে বলবে? মিথ্যে বানিয়ে বলে দেওয়া যায়, কিন্তু তাতে কি এদের খুব সুরাহা হবে? এরা বলেছে সে এদের সাহায্য করলে তার ভাল হবে। নিজের ভাল চাইলে তো সে মিথ্যে বলতে পারবে না। কিন্তু বলবেই বা কী? ধ্রুবপুত্র ছিল শ্রেষ্ঠীর আশ্রিত। আর ছিল গণিকা দেবদত্তার অনুরাগী। দেখা যায় পুরুষলোকই মেয়েমানুষকে নিজের কাছে বাঁধা রাখে, কিন্তু সে যেমন চতুরিকার দাস হয়ে গেছে, ধ্রুবপুত্র নাকি সেইরকমই হয়ে গিয়েছিল দেবদত্তার ভৃত্যপ্রায়। আর যা যা জানে, নগরে টইটই করার সময় দেখেছে সে। খুব কাছ থেকে দ্যাখেনি, দূর থেকে। তার শোনাও দূর থেকে। যে সত্যটা পল্লবিত হয়ে, ডালপালা মেলে নগরের পথে ভেসে যায়, তার ভিতরে মূল সত্য কোথায় লুকিয়ে যায় যে ধরাই কঠিন। সবই লোকে অনুমানে বলে। তাকে যেভাবে চতুরিকা গণিকা উঠতে বসতে থেঁতো করছে, অন্য পুরুষমানুষের খোঁজ নিতে পাঠাচ্ছে, নাপতেনীর কাজ তাকে দিয়ে করাচ্ছে, তেমন কি ধ্রুবপুত্রকে দিয়ে করাতে পারত দেবদত্তা? মনে হয় না। শ্রেষ্ঠী আছেন দুই গণিকার ভিতরেই। এক গণিকা, চতুরিকা, শ্রেষ্ঠীর জন্য তাঁহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করেছে, অন্য গণিকা দেবদত্তা শ্রেষ্ঠীকে যেন বীট মহাপার্শ্বর মতোই দেখত যেমন দ্যাখে মহাপার্শ্বকে অন্য জন, চতুরিকা। এইসব ভাবতে ভাবতে মহাপার্শ্ব ভাবে শ্রেষ্ঠী তাঁর সর্বস্ব দিয়েও মন পাননি দেবদত্তার, তাহলে তারই বা দোষ কী? তার তো কিছুই নেই,আছে শুধু মন, ভালবাসিবার অধিকার আর এই বিকট দর্শন রূপখানি।

শিবনাথ বলল, ধ্রুবপুত্র সম্পর্কে কী জানেন মহাশয়?

জানি তো বটে।

সে কি শূদ্রপল্লীতে নিয়মিত যাতায়াত করত?

এ এক নতুন কথা। কী করে জানবে এসব মহাপার্শ্ব? গণিকার জন্য গ্রাহক সংগ্রহ করতেই সারাদিন পার হয়ে যেত। তখন নগরে বণিক, ভিনদেশী, ফুর্তির উদ্দেশে ধনীপুত্ররা আসত, যেত। গণিকালয় চলত রমরম করে। কোনো ঘরই শূন্য থাকত না। সন্ধ্যেয় সব ঘরে প্রদীপ জ্বলত। চন্দন, অগুরুর গন্ধ, বর্ষায় স্বর্ণচাপা, জুঁই মালতির গন্ধ বাতাসে ভাসত। ওই পথে গেলেই সেই গন্ধ অনুসরণ করেই যেন

ভিনদেশীরা পৌঁছে যেত গণিকার ঘরে। আহা সে কী দিনই না ছিল! চোখে জল এসে যায় মহাপার্শ্বর। বর্ষা, শীত, বসন্ত কোনো সময়েই মানুষের আনন্দের অভাব ঘটত না। আর কি সেই দিন ফিরবে? তখনও তো গণিকা চতুরিকা ছিল। কিন্তু তার প্রতি কোনোরকম টানই অনুভব করত না মহাপার্শ্ব। অত সময়ই ছিল না। কত রাত্তির পর্যন্ত সে পথেই থাকত। কোন ঘরের কোন পুরুষ কোন ঘরের কোন মেয়েমানুষের সঙ্গে গোপন অভিসারে মিলিত হচ্ছে, সেই সব খোঁজ রেখে তাদের কাছ থেকে প্রাপ্তি যোগ হতো। এখন সব বন্ধ। তার কাজও নেই প্রায়। কাজ নেই বলেই যেন গণিকার প্রতি প্রেম উথলে পড়ছে দিন দিন। অনাবৃষ্টি না হলে এমন হত না। অনাবৃষ্টিই তার এই সব্বোনাশ করেছে। অনাবৃষ্টি তার জীবনে অদ্ভুত এই অনুভব এনেও দিয়েছে। কখনো মনে হয় প্রেমহীন জীবন কত অসুন্দর! কিন্তু চতুরিকার অবহেলায় সে ক্রমশ প্রেমের কাছ থেকে নিষ্কৃতিও চাইছে যেন।

গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মহাপার্শ্ব বলল, সে তো যেতই, তার চেয়ে বড় কথা হলো গণিকার ভৃত্য হয়ে গিয়েছিল, দাসানুদাস।

সে কেমন? তাম্রধ্বজ একটু অবাকই, এমন তো সে শোনেনি।

আজ্ঞে, নাপতেনীর বদলে তিনিই মেয়েমানুষের পায়ে আলতা পরাত, তার আগে ঝামা দিয়ে গোড়ালি ঘষে দিত, ছি ছি ছি।

গা রি রি করে ওঠে শিবনাথের, জিজ্ঞেস করে, এসব কী বলছ, এত অধোগতি হয়েছিল তার! জ্ঞান, বিদ্যার্জন সব ধুলো হয়ে গেল?

আজ্ঞে গেল, মেয়েমানুষে সব যায়, আবার যদি সেই মাগি তাকে নিয়ে খেলা করে তবে তো আরো গেল, মেয়েমানুষকে বশ না করতে পারলে পুরুষমানুষের জীবন বৃথা, কোনো কোনো পুরুষমানুষ আছে শুধু শুধু মেয়েমানুষের বিশ্বস্ত ভৃত্য হয়ে উঠে, পোষা কুকুর বেড়ালের মতো হয়ে উঠে বেঁচে থাকতে।

শিবনাথ বলল, থাক, আর বলো না, এই শুনতে নগরে এলাম!

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মহাপার্শ্ব, দুহাতে মাথার চুল আঁকড়ে ধরে, তারপর বলে, অথচ মেয়েমানুষ কি সত্যি এমন পারে? আমরা ইচ্ছে করলে পাঁচটা মেয়েমানুষ ভোগ করতে পারি, বনে টেনে গিয়ে ধর্ষণ করতে পারি, আর তা করে বলেই পুরুষের কাছে মেয়েমানুষ নিচু হয়ে থাকে, শুধু কী যে হলো ওই আপনার ধ্রুবপুত্রের, মেয়েমানুষ হয়ে গেল সে নিজেই, গণিকা তার সামনে উদলা হতো কিন্তু কোনো অঙ্গ তাকিয়ে দেখার অধিকার ছিল না তার, ছোঁয়া তো যেতই না।

তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করল, সত্য বলছেন?

সত্য না বলে উপায় আছে ম'শায়, চারদিকে কী হচ্ছে দেখছেন না, এখন শুধু সত্য বলতে হবে, সত্যের জোরে যদি এই অবস্থা বদলায়, এই নগরে সত্য ছাড়া মিথ্যে আর চলছে না, মিথ্যে কেউ শুনছে না, নগরবাসী এতদ্দিনে বুঝেছে সব, আপনি এখানে যা শুনবেন, সব সত্য।

আমি তো এই সব শুনিনি, নগরে তো আসি।

তখন তো মিথ্যে চলত, এত মিথ্যেবাদি হয়ে উঠেছিল সবাই, তখন আপনি কোনো সত্যই শুনতে পাননি ম'শায়, আপনার ধ্রুবপুত্র গণিকার রূপে মজেছিল, গণিকার জন্য জল বয়ে আনতে যেত নদী থেকে, সরোবর থেকে।

তখন তো জলের অভাব ছিল না।

ছিল, আর গণিকার খেয়াল, অমন ভৃত্য পেলে তাকে দিয়ে কাজ করাতে ইচ্ছে হয় না? গণিকার আদেশে তার আর বিরাম ছিল না।

সত্য কথা, কী আশ্চর্য, এমন কথা তো জানিই না। বলে তাম্রধ্বজ।

কী করে জানবেন, আমি জানি, তিনি গণিকার জন্য উম্মাদ অথচ গণিকা তাকে পাঠাবে শ্রেষ্ঠীর কাছে, রাজার কাছে, অন্য পুরুষদের কাছে।

ইস! মুখ বিকৃত হলো শিবনাথের, সে কেন পালিয়ে যায়নি?

পালাবে ভাবছিল, কিন্তু মেয়েমানুষের আকর্ষণ যে ভয়ানক! মেয়েমানুষ যে কুহক করে, বশ করে গরু ছাগল বানিয়ে দেয়, তখন কী উপায়?

তারপর কী হলো?

কী আর হবে, গণিকার আদেশে নগরের পথে পথে ঘুরতে হতো তাকে, আবার ক্লান্ত হয়ে যে গণিকার কাছে ফিরবে, সে উপায়ও ছিল না, গণিকা তাকে আবার পাঠাবে শ্রেষ্ঠীর খোঁজে, কিন্তু পুরুষমানুষ কি তার মনে ধরা মেয়েমানুষের জন্য অন্য পুরুষমানুষ খুঁজতে পারে?

সন্দেহ হচ্ছিল তাম্রধ্বজের। মনে হচ্ছে সত্য নয়। আবার সত্যও হতে পারে। কিন্তু শ্রেষ্ঠীকে তো পছন্দ করেন দেবদত্তা, তবে কেন শ্রেষ্ঠীর খোঁজে ধ্রুবপুত্রকে পথে পথে ঘুরতে হবে। সে বলল, আমাদের দেবদত্তার কাছে নিয়ে যাবে, আমরা তার গৃহ চিনি না।

বাঁচল মহাপার্শ্ব। বহুদিন বাদে নিজের কাজ করতে পারছে সে। রাস্তা থেকে পুরুষমানুষ ধরে গণিকার ঘরে নিয়ে যায় সে। সদ্ধর্মে ফিরে এল সে। চলল ওদের নিয়ে।

ছেষট্টি

গণিকা গৃহে প্রবেশ করতে করতে শিবনাথ ভেবেছে ফেরার সময়ে শিপ্রা নদীর দহে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে বাড়ি ফিরবে। সমস্ত রাত ঘুম নেই। এখনো বিশ্রাম নেই। তাম্রধ্বজ যেন তাকে নরক দর্শন করিয়ে বেড়াচ্ছে। নরকের কথা শোনাচ্ছে।

এই রকম সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে গণিকাগৃহের অন্দর মহলে ঢুকে দেবদত্তার মুখোমুখি হয়ে বিমোহিত হয়েছে প্রৌঢ়। সে জানে গণিকারা একরকম, এখন দেখছে এই গণিকা অন্যরকম। সে জানে গণিকারা উগ্র স্ত্রী লোক, এখন দেখছে এ বড় নরম প্রকৃতির, যেমন ছিল বর্ষার মেঘ, যেমন ছিল সজল ঘনশ্যাম অরণ্য, গাছগাছালি। সে জানে গণিকারা কটুভাষিণী, চতুর প্রকৃতির, সুযোগ পেলেই পুরুষ মানুষকে সর্বস্বান্ত করে ফেলে। শাস্ত্রে যে বলেছে, নারীই নরকের দ্বার, সেই নারী যে গণিকাকুল তা জানে শিবনাথ। কিন্তু এখন দেখছে এর মতো মধুরভাষিণী হয় না। গণিকাসুলভ উগ্র সাজসজ্জা কই? এতো নিরাভরণা এক তপস্বিনী যেনবা। শিবনাথের মনে পড়ল তাপসী উমার কথা।

পথের সেই চতুর লোকটি তাদের এই ঘরে পৌঁছে দিয়ে দুয়ারের অদূরে অপেক্ষা করছে। তাম্রধ্বজ পরিচয় দিয়ে বলল, তার খোঁজেই এসেছি, সে তো একেবারে হারিয়ে যেতে পারে না।

না পারে না। অস্ফুট জবাব দিতে দিতে দেবদত্তা মেঝেতে মাথা নামিয়ে প্রণাম করল দুই অজ্ঞাত পরিচয় পুরুষকে, তারপর মাথা তুলে বলল, কতদিন হয়ে গেল! কী আশ্চর্য কেউ তার খোঁজ করে না, খোঁজ নিতে আসেওনি, সাতকুলে তার কেউ নেই ভেবেছি, কিন্তু তাই কী হয়, মানুষ তো গাছের মতো জন্মায় না।

তাম্রধ্বজ বলল, সে তো গাছের মতোই, পিতামাতা কেউ নেই।

বান্ধবহীন মানুষ ছিল নাকি, তার কি কোনো শুভানুধ্যায়ী ছিল না?

তাম্রধ্বজ বলল, নগরে কে আছে জানি না, তবে শূদ্রপল্লীতে দেখে এলাম, আর এই যে ইনি, এঁর পুত্রবধূ, পৌত্রী।

দেবদত্তা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। প্রায় রংহীন তার বেশবাস। আর গৃহখানি কেমন নৈঃশব্দ্যে ভরা। দাসদাসী তো আছেই, দুয়ারে সৌরাষ্ট্র দেশীয় একটি দৌবারিকও ছিল, যে তাদের পৌঁছে দিয়ে গেল এতদূর, সকলেই যেন বিষন্ন হয়ে আছে। বৃষ্টি নেই বলে নাকি দেবদত্তা নিজে বিষণ্ণ বলে?

তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করে, সে কেমন ছিল?

তাকি আপনারা জানেন না?

তার কী হয়েছিল?

তাও কি আপনারা জানেন না, কতদিন হয়ে গেছে, এখন কি কিছু অপ্রকাশ্য আছে?

শিবনাথ বলল, কন্যা তুমি তাকে কেমন ভাবে দেখতে?

দেবদত্তা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। ভাবছিল এই মানুষটির কথা, এঁর পরিবারের কথা কি তাকে বলেনি ধ্রুবপুত্র? এঁদের কথাই তো বলত। সে জিজ্ঞেস করল, যে যুদ্ধে গিয়ে ফেরেনি, সে কি ফিরল?

আমার পুত্র, কার্তিককুমার, না কোনো খোঁজ নেই।

দেবদত্তা জানালা দিয়ে শূন্য আকাশে তাকিয়ে আচমকা গুনগুন করে ওঠে

স্বামীর বুকে ঘুমায় আমার পড়শী সখী যতো...

নিজের স্বামী বিদেশ বিভুঁই, হারানো মেঘের মতো।

কী বলছো তুমি? জিজ্ঞেস করে শিবনাথ।

এই দুই কলি সে বলত, রেবার কথা বলত তো।

কী বলত? ভয় পেল শিবনাথ। আবার কী শোনে, সত্যদর্শন যে ভয়ানক!

ওই গানটা, রেবা কি গাইত, এখনো কি গায়?

শিবনাথ বলল, আমি তো জানি না, এ কী গান!

ধ্রুবপুত্রর কাছে শুনেছিলাম, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, আচমকা মনে পড়ে গেল, সেই যে রেবা, তাকে যদি দেখতে পেতাম।

শিবনাথ বলল, তাকে দেখবে কী করে, সে আমার গৃহলক্ষ্মী, প্রোষিতভর্তৃকা পুত্রবধূ সে কি এই জায়গায় আসতে পারে, আপনি কি এবার উঠবেন?

তাম্রধ্বজ বলল, অস্থির হবেন না, বসুন, কোনো ভয় নেই।

দেবদত্তা বলল, পিতামহ কি জলগ্রহণ করবেন এখানে?

মাথা নাড়ল শিবনাথ। সে কঠিন হয়ে বসেছিল। মানুষকে বাইরে থেকে চেনা বড় কঠিন। ধ্রুবপুত্র তার আড়ালে কী ভাবে বড় হয়ে উঠেছিল কে জানে? রেবার কথা এসে গণিকালয়ে গণিকার কাছে বলেছে—কী বলেছে তা মহাকাল জানেন। অথচ রেবা তো ছিল তার জননীর অধিক।

দেবদত্তা বলল, আপনি স্থির হন পিতামহ, রেবা মা তাকে প্রতিপালন করেছিল, রেবা মা তার স্বামীর জন্য জেগে থাকে সমস্ত রাত্তির প্রায়, স্বামী যার বিদেশ বিভুঁয়ে, সে যে কী করে পারে—বলত ধ্রুবপুত্র?

কী বলত?

রেবা মাকে প্রণাম করত এখেনে বসে, বীণা বাজাতে বসত যখন, আগে তাঁকেই প্রণাম করে তবে না স্পর্শ করত বাদ্য যন্ত্র, শুনুন পিতামহ সে রেবা মার যে গান শুনতে শুনতে বড় হয়েছিল ....।

আমি তো তাকে গান গাইতে শুনিনি কখনো।

ধ্রুবপুত্র শুনেছিল

আম গাছে মুকুল এল
অশোক ফুল ঝরছে
স্বামী আমার বিদেশ বিভুঁই
তাকেই মনে পড়ছে।

গুনগুন করতে করতে দেবদত্তা মাথা নামায়, ফিসফিস করে বলে, আগে কি জানতাম, সে আমার ভবিষ্যতের কথা রচনা করে যাচ্ছে।

এ কি তার রচনা?

না তার রেবা মায়ের গান, তার স্বামী ফেরেনি।

কই রেবা মা তো এগান গায় না। তাম্রধ্বজ বলে।

মনে মনে গায়, যার মনেরমানুষ ভিনদেশে গিয়ে আর ফেরেনা, তার কথা কে বুঝবে, কেউ না, যদি বুঝত সে ওই ধ্রুবপুত্র, আমি সব ভুলে গিয়েছিলাম, ধ্রুবপুত্রকে ভুলতে চাইছিলাম, আবার মনে পড়ল সব.....।

আর কী গানের কথা বলত?

ওই দু এক কলি, আরো দু এক কলি, আমি তাকে বীণা বাজাতে শেখাতাম, সে আমাকে শোনাত প্রোষিতভর্তৃকার কথা, শুনেছি মেঘের দিনে তার খুব কষ্ট, আমি তো দেখি অনাবৃষ্টিতেও দুঃখ একটুও কম নয়।....।

তোমায় কে যুদ্ধে পাঠাল?

যুদ্ধ আমার সতীন হলো
যুদ্ধ আমার স্বামী নিল
মনের সুখ কেড়ে নিল

স্বামী আমার বিদেশ বিভুঁই
দুয়ারে অভাব দাঁড়াল।

তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করে, ধ্রুবপুত্রর কী হয়েছিল?

আমি তো জানি না, বীণা বাজাতে শিখেছিল ভাল।

তাহলে সে চলে গেল কেন?

দেবদত্তা মাথা নামিয়ে থাকে বহুসময়, তারপর ধীরে ধীরে বলল, শ্রেষ্ঠী তাকে পাঠিয়েছিল আমার সঙ্গে সন্ধি করতে, শ্রেষ্ঠীকে আমি ঘৃণা করি, তার দিকে তাকালে আমার ভয় হয়, আমি কী বলব, এইই তো সত্য।

তাম্রধ্বজ ভাবল সে এইরকমই ভেবেছিল যেন। দেবদত্তা বলছে, তার এক গোপন ঘৃণা, অসহনীয়তা আছে ধনপতিদের প্রতি। এক ধনপতির ক্রোধে তার মা রসমঞ্জরী স্বামীহারা হয়েছিল। ধনপতিরা তাদের ধন সম্পত্তির জোরে সব কিছুই তাদের করায়ত্ত ভেবে বসে। ভেবে বসে তাদের উপঢৌকনই সত্য, আর কিছু সত্য নয় এই জগতে, প্রেমপ্রীতি, ভালবাসা, করুণা, ত্যাগ ...। তাই সে ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করেছে শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্তকে। রাজার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার কথা তার। কিন্তু উজ্জয়িনীর রাজা তো তার দিকে চোখ মেলে তাকিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। ধ্রুবপুত্রর কথা মনে হলে এখনো গায়ে শিহরণ ওঠে। ঘুম ভেঙে যায় মধ্যরাতে।

ধ্রুবপুত্র কি গন্ধবতীর কথা বলেনি?

সেই বালিকা। অদ্ভুত এক হাসি ফুটে ওঠে দেবদত্তার ঠোঁটের কিনারে। সে বলল, বালিকার কথা বলেছিল নিশ্চয়ই, তার বাবা যুদ্ধে গিয়ে ফেরেনি, তার মা পথের দিকে চেয়ে থাকে, মনে মনে ভাবে স্বামী তার পথ বেভুল হয়ে ঘুরছে পথে পথে হয়ত, নাকি ভস্ম মেখে যুদ্ধে মেতেছে এমন, যে যুদ্ধ আর শেষই হচ্ছে না, স্বামী ফিরবে ঘোড়ায় চেপে, নাকি উটে চেপে, নাকি ষাঁড়ের পিঠে বসে মহাকাল শিবের মতো —

স্বামী আমার হারিয়ে গেল,
ভস্ম মেখে শিব হলো।
আমি পথের ধারে বসে,
ফিরবার কি সময় হলো?

শিবনাথ বলল, এই গান কি তোমার?

না, ধ্রুবপুত্রের।

আশ্চর্য, আমরা তার নাগাল পাইনি!

আমিও পাইনি, আমি ভাবতাম কাকে পাঠাল শ্রেষ্ঠী সন্ধি করতে, তার হাতে শ্রেষ্ঠীর পত্র আসত, আমি তো জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিতাম, সে বলত গম্ভীরার কথা, উজ্জয়িনীতে আসা ভিনদেশী বণিকদের কথা, যবন বণিকদের কথা, শিপ্রানদীর কথা, গন্ধবতী নদীর কথা, গম্ভীরা নদীর কথা, রেবা নদীর কথা, রেবা নদীর কথা বলত

মেয়ের নিকট যৈবন এল,
যৈবন দেখে ভ্রমর এল।
আমার যৈবন চলে গেল,
অন্ধকারে গেল, নিশুতি রাতে গেল,
চাঁদনি রাতে স্বামী গেল
যৈবন আমার শূন্য হল।

থাক! শিবনাথ আচমকা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, জননীকে নিয়ে এসব কী কথা!

জননীর কি যৈবন থাকতে নেই? দেবদত্তা ফিসফিস করে।

দু'হাতে কান চাপে শিবনাথ, থাক কন্যা, আর বলো না, তাকে চেনা বড় কঠিন ছিল, এখন বুঝছি সে কুভাবে দেখত রেবাকে?

দেবদত্তা বলল, কারোর প্রতি কুভাব ছিল না, যৌবন না থাকলে জননী সন্তান ধারণ করে কীভাবে,

আর যৌবন যদি শুকায়, নিস্ফলা যায়, দুঃখ হবে না তার?

শিবনাথ বলল, থাক কন্যে, তুমি তার কাছে এই সব শুনতে, তোমাদের কাজই তো অবৈধ সম্পর্ক গড়া, গড়ে দেওয়া, ধ্রুবপুত্র তরুণ ছিল, তোমার ক্রোধ ধনপতির উপর, সেই ক্রোধের বলি হলো সে।

ধনপতি শ্রেষ্ঠীর সাধ্য কি নির্বাসন দেওয়ার!

দিয়েছে তো।

ধ্রুবপুত্র অভিমানে নগর ছেড়েছে।

কী অভিমান?

তা তো আমি জানি না, শুনেছি দাস উতঙ্ক তাকে প্রহার করেছিল ভয়ানক, তারপর আর আসেনি আমার কাছে, কবে যে চলে গেছে ধ্রুবপুত্র, আমি জানি না।

সে কি শূদ্রপল্লীতে যেত?

জানি না, শূদ্রপল্লীর কথা বলত, তাদের অনেকে কাজ করতে গিয়ে ফেরেনি, মেয়েমানুষরা গাইতে গাইতে কাঁদত, এই সব কথাও বলত, আমার আশ্চর্য লাগে, প্রোষিতভর্তৃকা বধূদের কথা ঘুরে ঘুরে বলত ধ্রুবপুত্র, আমাকে প্রোষিতভর্তৃকা করে চলে গেছে কোথায়, সমস্তদিন পায়ের শব্দে কান রাখি, তার পায়ের শব্দ আমি চিনতাম। আমি তার গায়ের গন্ধ চিনতাম, তার মতো চুম্বন করতে পারত না কেউ, তার মতো প্রেমের কথা বলতে পারত না কেউ, তার মতো উদ্দীপনা দিতে পারত না কেউ, জীবনটা যে কত মধুর হতে পারে, সে ছাড়া আর কেউ জানত না।

শিবনাথ দু হাতে কর্ণকুহর বন্ধ করতে গিয়েও স্তব্ধ হয়ে যেতে লাগল গণিকার কথা শুনতে শুনতে। শিহরিত হতে লাগল। কী আশ্চর্য কথা শোনাচ্ছে! কী নির্লজ্জ, অথচ নির্লজ্জের মতো মনে হচ্ছে না তার একটুও। কথাগুলির ভিতরে মধুরতা আছে। সেই মধুরতার স্পর্শ পেতে লাগল যেন শিবনাথ।

তাম্রধ্বজ বলল, সে তাহলে শূদ্রপল্লীতে যেত?

হ্যাঁ যেত, না গেলে শূদ্রপল্লীর গান শোনাত কী করে?

সে শূদ্রপল্লীর অন্নগ্রহণ করত? জিজ্ঞেস করল তাম্রধ্বজ।

হ্যাঁ, করত, তার মনে কোনো পাপ ছিল না সত্য।

সেই জন্য কি শ্রেষ্ঠী তাকে প্রহার করল?

না, ধনপতিরা খুব নিষ্ঠুর হয়, শ্রেষ্ঠী তাঁর দাসের চেয়েও নিষ্ঠুর, আমাকে আঘাত করতে ধ্রুবপুত্রকে আহত করেছিলেন শ্রেষ্ঠী।

আহত হয়েছিল সত্য?

হ্যাঁ সত্য, যদি সে উজ্জয়িনীতে থেকে যেত, আরো আহত হতো, আরো, উতঙ্ক তাকে কশাঘাত করেই যেত শ্রেষ্ঠীর আনন্দের জন্য।

একি তোমার অনুমান? জিজ্ঞেস করল শিবনাথ।

ধনপতিরা সত্যিই নিষ্ঠুর হয়, আমার মায়ের কথা মনে পড়ে, হয়তো ধ্রুবপুত্র হত হতো দাস উতঙ্কের হাতে, ধনপতি শ্রেষ্ঠীরা এমন করে থাকেন, মা রসমঞ্জরী পালিয়ে এসেছিল সৌরাষ্ট্র থেকে, আমার পিতা ছিলেন ভিনদেশী, যবন, আকসুনদীর ধারে তাঁর দেশ ছিল.....।

নিম্নস্বরে বলে যাচ্ছিল দেবদত্তা। বলতে বলতে দুচোখ প্লাবিত হচ্ছিল। শিবনাথ মাথা নামিয়ে বসে ছিল। শিবনাথ বুঝতে পারছিল না তাম্রধ্বজ তাকে যদি এখানে নিয়ে না আসত তবে কোন সত্য নিয়ে বাকি জীবনটা কাটাতে হতো তাকে। দেবদত্তা বলছে, হত হওয়ার ভয়ে ধ্রুবপুত্র নগর ছেড়ে যায়নি, অপমানে, অভিমানে ছেড়ে গেছে, কিন্তু ছেড়ে গেছে বলে তার জীবনরক্ষা হয়েছে, ধ্রুবপুত্র না বাঁচলে কার জন্য বসে থাকত সে?

দেবদত্তা, শিবনাথ, তাম্রধ্বজের আলাপের ভিতর দুয়ারের বাইরে বসা মহাপার্শ্ব ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছিল। ক্ষুধার্ত হয়ে উঠছে সে। বেলা তো অনেক হলো। বাইরে রোদের তেজও বেড়েছে খুব। কথাবার্তা তো শেষই হয় না। মহাপার্শ্ব ভেবেছিল দেবদত্তা আর এই নবীন প্রবীণে খুব কলহ লাগবে। ধ্রুবপুত্র ছিল এক অপরিপক্ক, বুদ্ধিহীন অর্বাচীন, তার খোঁজে এরা এতদূর চলে এসেছে! মহাপার্শ্ব যা বুঝতে পারছে,

তা হলো ধ্রুবপুত্র হয়ে উঠেছিল শ্রেষ্ঠীর বিরাগভাজন। শ্রেষ্ঠী তাকে হত্যাই করত যদি না সে পালাত। এখনও তো তার সেই অবস্থা। শ্রেষ্ঠী যদি শোনে সে চতুরিকার অনুরাগী, তাকে কি ছেড়ে দেবেন? পিপীলিকার মতো টিপে মারবেন। কী যে হবে তার।

দু'জন বেরোয় না ঘর থেকে, তাই মহাপার্শ্বও যেতে পারে না। ওরা তো তাকে কিছু দেবে? একটি সুবর্ণমুদ্রা অন্তত। না হলে দুইটি রৌপ্য মুদ্রা। না হলে দ্বিপ্রহরের অন্নজলের ব্যবস্থা। বারবার চতুরিকার দুয়ারে দাঁড়াতে হীন লাগে নিজেকে। হাজার হোক, চতুরিকা তো মেয়েমানুষ। সে নিজে তো প্রকৃত পুরুষ। মনে মনে জানে অভিশপ্ত গন্ধর্ব। মেয়েমানুষের বশ্য হয়ে থাকা কি পুরুষের কাজ? সজাগ হলো মহাপার্শ্ব। মেঝেতে ঘষটে ঘষটে দুয়ারের দিকে এগিয়ে এল। লোকের আলাপ গোপনে শুনতে পেলে লাভ বই ক্ষতি হয় না কখনো যে তা মহাপার্শ্ব জানে। মহাপার্শ্ব শুনতে পায় আকসুনদীর কথা। শুনতে পায় আকসু নদীর ধারের দেশটির কথা। সেই দেশে যেন দেবতাদেরই বাস। সেই দেশে নাকি তার পিতা এখনো রয়েছে, পিতামহ, প্রপিতামহ—মৃত আত্মীয় স্বজনরা পর্যন্ত। দেবদত্তা বলছে তার মা রসমঞ্জরী সেই কবে দেহ রেখেছেন, তিনিও যেন বাস করেন আকসুনদীর তীরে। সেখানে গন্ধর্বপ্রতিম পুরুদের বাস, সেই দেশে উর্বসীর মতো রূপবতী নারীরা থাকেন। তার মা রসমঞ্জরী তেমনই ছিল যেন। মা যেতে চেয়ে যেতে পারেনি, সেও যেতে চায়।

তাম্রধ্বজ বলল, যবন গ্রিকজাতির যেন দেবতুল্য রূপই।

শিবনাথ বলল, শুনেছি গন্ধর্বের দেশ।

দেবদত্তা বলল, আমার মা বলত, আপনি ধ্রুবপুত্রর মুখে শুনেছেন নিশ্চয়।

হ্যাঁ, কবে যেন বলেছিল সে!

আমার কাছে শুনেছিল, আমার মা বলত আমার বাবা গান গাইতেন আশ্চর্য। ছবি আঁকতে পারতেন, মূর্তি গড়তেন, রেশম বুনতেন, আবার দেশে দেশে ঘুরতেন সেই রেশম বস্ত্র নিয়ে, মা তাকে বল্লকী আর বীণা বাজানো শিখিয়েছিলেন। তিনি বাজাতেন .... গন্ধর্বের মত প্রেমময় ছিলেন তিনি, আকসুনদীর ধারের সেই দেশ গন্ধর্বের দেশ।

মোহিত হয়ে গেছে তাম্রধ্বজ, বলল, কী অপরূপ কথা শোনাচ্ছেন আপনি!

আমি তো তাই জানি, যে গন্ধর্বরা মানুষ হয়ে নেমে আসে, তারাই আবার ফিরে যায় ওখানে, আকসুনদী আর এক পাহাড় আছে, আছে সবুজ তৃণভূমি, আকাশে রামধনু, বাতাসে মধুর গন্ধ, আর বীণাবাদনের সুর, আর দ্রাক্ষাকুঞ্জের দেশ থেকে বয়ে আনা গান, বীর আলেকজান্ডার ওই দেশের পত্তন করেন, তিনিও তো গন্ধর্বের সন্তান.....। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল দেবদত্তা। মাথা নামায়।

তখন মহাপার্শ্ব ডাকছিল দুয়ারের বাইরে থেকে, কথা কি শেষ হয়ে গেল মা?

কে? দেবদত্তা সচকিত হলো।

মহাপার্শ্ব দুয়ারে সরে এল, মা আমি মহাপাশশো, বীট আঁজ্ঞে, মা তোমার কথা কি শেষ হয়ে গেল, গন্ধর্ব কথা, বলছি মা, শুনেছি তাঁরা ওখান থেকে, মানে তাঁদের দেশ থেকে পিথিবীতে এলে নাকি মানুষের মতোই হয়ে যায় কেউ কেউ, মানে এই বীট যেমন, তার গলায় গান নাই, তার রূপ নাই, তার বীণা বাদন নাই, অন্ন নাই, মেয়েমানুষের দাস....।

দেবদত্তা জিজ্ঞেস করল, তুমি কে?

মহাপার্শ্ব বলল, আমি বীট মহাপার্শ্ব চতুরিকা গণিকার দাস এখন, কিন্তু আমি তো আসলে গন্ধর্ব ছিলাম পূর্বজন্মে, আর ওই চতুরিকা ছিল গান্ধর্বী, আমাদের এখন খুব কষ্ট মা, আমার খুব কষ্ট, অন্ন নাই জল নাই....।

দেবদত্তা অবাক, চতুরিকার কি দাস আছে, শুনিনি তো?

আজ্ঞে আমি স্বইচ্ছায় তাঁর দাস হয়েছি, কী করে শুনবে, তার জীবনও বড় করুণ, আমরা দু'জনে মুক্তি চাই, গন্ধর্বের দেশে ফিরে যেতে চাই মা।

যাবে?

যাব মা।

আমিও যাব।

তুমি! তোমার তো অভাব নাই মা, অন্ন আছে, জল আছে, সুখ আছে।

দেবদত্তা বলল, আমার কিছুই নাই, আমি আকসু নদীর তীরে গিয়ে বাঁচতে চাই, ভাল লাগে না রাজ অনুগ্রহ, শ্রেষ্ঠীর দান।

মহাপার্শ্ব চুপ করে থাকল। তার বিশ্বাস হয় না কোনো কথাই।

তখন দেবদত্তা বলল, এমন তো হতে পারে, ধ্রুবপুত্র সেই দেশে চলে গেছে, সেও তো ছিল গন্ধর্বপ্রতিম।

হতে পারে! শিবনাথের বুক ভেঙে গেল।

হ্যাঁ পারে, আমার কাছে সে আকসু নদীর কথা শুনেছিল।

তাহলে কী হবে?

ওই দেশ থেকে কেউ আর ফেরে না।

তখন তাম্রধ্বজ ভাবছিল, ফেরে না তাই কি সত্য? যদি না ফেরে ধ্রুবপুত্র উজ্জয়িনী কি অনাবৃষ্টিতে দগ্ধ হতে হতে শেষ হয়ে যাবে? সে বলল, ধ্রুবপুত্র মেঘের মতো, সে কোথাও যেতে পারে, কিন্তু ফিরতেও পারে মেঘ যেমন ফেরে, আপনার কথা সত্য নয় ভদ্রে, আমরা ধ্রুবপুত্রের আশায় আশায় পথে নেমেছি, আপনি তাকে ফিরতে দিন।

দেবদত্তা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। দু'চোখে জলবিন্দু। ধ্রুবপুত্রকে ফেরাতে পারে সে? কোথা থেকে ফেরাবে সেই নীলচক্ষুর দেবপ্রতিম যুবককে? সে মাথা নামিয়ে ভাবতে লাগল ধ্রুবপুত্রের কথা।

সাতষট্টি

অপরাহ্ন বেলায় মহাপার্শ্ব ফিরে এল চতুরিকার কাছে। সাজসজ্জা করেছে চতুরিকা। বনফুলের মালা গেঁথে খোঁপায় জড়িয়েছে। কাঁচা হলুদে ছোপানো তার মেখলা। কাঁচুলিখানি গৈরিক, উত্তরীয়খানি চুন খয়েরে ছোপানো যেন, টুকটুকে লাল। পায়ে দু'দিনের বাসি আলতা। এখন আঙিনার পশ্চিমধারে ফিরে এসেছে অনেকদিনের পুরোন ছায়ার মতো রোদে পোড়া মহাপার্শ্ব। ছায়া এলিয়ে আছে মৃতপ্রায় হয়ে। আর একটু বাদেই যেন তার প্রয়াণ ঘটে যাবে। সেই মুমূর্ষু প্রায় ছায়ার উপরে বসে আছে চতুরিকা, তার অদূরে ছায়ার উপরেই মহাপার্শ্ব। বসে শ্বাস নিয়ে, স্থির হয়ে মহাপার্শ্ব বলল, সত্যি কথাটা বলি চতুরিকে, শুনে এলাম সাহস দিস তো বলি।

তুই যাসনি তাঁর কাছে?

না।

গৃহদ্বারে পৌঁছেছিলি?

না।

তুই এক প্রবঞ্চক, আমার খাবি আর আমার কাজটা করবিনে, দূর হ।

মহাপার্শ্বতো প্রস্তুত হয়েই এসেছে। সে ভয় পেল না বরং অপেক্ষা করতে লাগল কখন চতুরিকার উত্তেজনা কমে। উত্তেজিত হলে মেয়ে বিড়ালের মতো গাল ফোলায় যেন চতুরিকা। বুক দুটি আরো স্ফীত হয়ে উঠল যেন। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে গণিকা তার রূপই যেন মেলে ধরেছে মহাপার্শ্বর সামনে। তিরস্কার করতে করতে ধীরে ধীরে থেমে গেল চতুরিকা। না থেমেই বা করবে কী? মহাপ্রলয় তো থামে এক সময়। আর সে জানে দূর হতে বললেও ভরসা ওই মহাপার্শ্ব। এই সময়ে ওই মর্কট যদি না পাশে থাকত, কী করত সে? তার পক্ষে খোঁজ নেওয়া তো খুব কঠিন, অসম্ভব। আর মহাপার্শ্বকে দিয়ে কথাটা উদ্ধবের কানে পৌঁছনোয় সেও এদিক মাড়াচ্ছেনা। চতুরিকা মনে মনে যুক্তি সাজায়, শ্রেষ্ঠী এই নগরের শ্রেষ্ঠ ধনপতি, ঐশ্বর্যের কোনো সীমা নেই। তার সঙ্গে দেখা হওয়া কি অতই সহজ? মহাপার্শ্ব তো সামান্য মানুষ। শ্রেষ্ঠীর পায়ের তলায়ও ওর স্থান হবে বলে মনে হয় না। মহাপার্শ্ব তো সময় নেবেই। সময় নিতে নিতে, শ্রেষ্ঠী গৃহের দিকে যেতে যেতে সাহস সঞ্চয় করছে মহাপার্শ্ব। একদিন আচমকা দেখা করে ফেলবে ঠিক। তার কথায় সমস্ত দিন পথে পথে শ্রেষ্ঠীর জন্য ঘুরে বেড়ায় তো মহাপার্শ্ব। চতুরিকার মায়া হলো। রোদে পুড়ে এল মানুষটা, তাকে তৃষ্ণার জলটুকুও তো দিতে হবে। খেয়ে ওর বুক ঠাণ্ডা হোক, কলিজা ঠাণ্ডা হোক, তারপর তো কথা। সে জিজ্ঞেস করল, জল খাবে?

মাথা নাড়ে মহাপার্শ্ব, বলল, কথাটা তা হলে বলি।

বলবি, আগে ঠাণ্ডা হ, মহাকাল এবার পুড়িয়ে মারবে সবাইকে, শ্মশানের চিতা জ্বালিয়ে দিয়েছে যেন।

মহাপার্শ্ব বলল, শোন চতুরিকে, কথাটা তোর জানা প্রয়োজন।

জানব, বলবি তো, এখন বিশ্রাম নে ছায়ায় বসে।

হয়েছে বিশ্রাম, বলছি, শ্রেষ্ঠী অতি নিষ্ঠুর মানুষ।

তার মানে! চতুরিকা সচকিত হয়ে ওঠে, চোখে মুখে সন্দেহ জাগে, কী বলিস তুই?

সত্য কথা, শ্রেষ্ঠী ভীষণ নিষ্ঠুর, ধনপতিরা নিষ্ঠুরই হন।

এবার চতুরিকার গা পিত্তি জ্বলে গেল যেন। তার মনে হলো মহাপার্শ্ব না যাওয়ার যুক্তি সাজাচ্ছে। আর যাবে না সেই যুক্তিও সাজাচ্ছে। মর্কটের মনে তো কুভাব সব সময়। তাকে দেখে মর্কট কামোদ্দীপ্তও হয়ে ওঠে মনে হয়। মনে মনে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নজর দেয়। তা দিক। কিন্তু এ তো এখন অন্য পরিকল্পনা করছে মনে হয়। শ্রেষ্ঠীর কাছে তাকে না যেতে দেওয়ার ফন্দি। শ্রেষ্ঠীর কাছে না গিয়ে সে যেন ওই মর্কটের শয্যায় গিয়ে উঠবে, কত সাধ! বামন হয়ে পাহাড় ডিঙোবে। মর তুই! দূর হ। বিড় বিড় করতে করতে আচমকা ঝাঁজিয়ে ওঠে চতুরিকা, বলল, বড় খোঁজ নিয়ে এসেছিস, বস তোর জন্য পরমান্ন রাঁধি, তোর গায়ে চন্দন মাখাই, তোকে সেবা করি।

আমি সত্যই বলছি চতুরিকে।

শ্রেষ্ঠী যদি শোনেন তোর কী দশা হবে বল দেখি।

মহাপার্শ্ব বলে, আমি তো তোকে বললাম শুধু, শ্রেষ্ঠীর কানে যাবে কেন?

কত রকমে যেতে পারে, তিনি তো তোর মতো মর্কট নন, সব চেয়ে ধনী, তাঁর কোনো কিছুর অভাব নেই, তিনি যা চাইবেন তা পেতে পারেন, তিনি ডাক দিলে একশো জন মেয়েমানুষ তাঁর দুয়ারে গিয়ে মাথা কুটবে, তিনি যাত্রা করলে কী পাবেন না, মহাকাল তাঁকেই দিয়েছেন সব।

মহাপার্শ্ব বলল, তোর কথা সত্য নয়।

সত্য নয় কি মিথ্যে?

মহাপার্শ্ব বলল, তিনি যাত্রা করলে মেঘ আসবে উজ্জয়িনীর আকাশে?

আসতে পারে।

মহাপার্শ্ব হাসে, বলল, চতুরিকে তিনি অতি নিষ্ঠুর, তিনি ধ্রুবপুত্রকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন তাঁর দাসকে দিয়ে, সেই দাস উতঙ্ক, সে যখন মরল তাকে বাঁচাতেও এগোলেন না, তাঁর তো অত ঐশ্বর্য, কিন্তু প্রধান গণিকা কি তার কথায় সাড়া দেয় কখনো?

চতুরিকা বলে, তিনি মহানুভব, না হলে ধ্রুবপুত্রকেও কারাগারে বন্দী করাতেন, প্রধান গণিকাও পার পেতনা, তাঁর দয়া মানে কি তাঁর না পারা?

দেবদত্তা বলেছে, ধনপতিরা কারোর ভালো করেন না।

অসত্য, কিন্তু তুই শুনলি কী করে?

তখন মহাপার্শ্ব ধীরে ধীরে সব বলল। শুনতে শুনতে চতুরিকা রাগে কাঁপতে লাগল, বলল, তার বড় অহঙ্কার, সেতো মেয়েমানুষ, পুরুষমানুষ নয়, মেয়েমানুষের অহঙ্কার করতে নেই, শ্রেষ্ঠী কতবার ডেকেছেন, কত উপঢৌকন এনেছেন, সে শুধুই ফিরিয়ে দিয়েছে, দিয়েছে তো দিয়েছে, দিয়েছে বলে শ্রেষ্ঠী আমার কাছে এসেছেন, তুই কি বলেছিস শ্রেষ্ঠী আমাকে ডেকেছেন?

না, বলিনি, আমি শুধু তাদের কথা শুনেছি।

ভাল করেছিস, বাইরের মানুষ তো ছিল। বলতে বলতে শান্তভাবে শ্বাস নিতে লাগল চতুরিকা। বুকের ভিতরে ক্ষুদে পাখিটি যেন ঘুমিয়ে পড়ছিল। নিরুদ্বেগ হয়ে যাচ্ছিল সে। ক'দিন ধরে তার ভয় হচ্ছিল, মেয়েমানুষের মন, দেবদত্তা যদি শ্রেষ্ঠীর প্রতি নরম হয়ে যায়? গণিকার তো বাঁধা পুরুষমানুষ চাই একটি, উদ্ধবনারায়ণের মতো নয়, ধনপতি শ্রেষ্ঠীর মতো ধনী, যে তাকে সোনাদানায় ঢেকে দেবে। দেবদত্তার দিকে রাজার মন নেই, যার মন ছিল তার দিকে দেবদত্তা ফিরে তাকায়ও না, আর ধ্রুবপুত্র তো চলেই গেছে নগর ছেড়ে। দেবদত্তার ভবিষ্যৎ কী? নগর যে শ্মশান হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। এরপর

যদি সত্যিই দিনের আগুন না শেষ হয়, তখন তো কেউ থাকবে না এখানে, দেবদত্তা যাবে কোথায়? থাকুক দেবদত্তা। চতুরিকা বলল, শ্রেষ্ঠীর অন্তঃকরণ খুব ভাল।

ভাল না চতুরিকে, আমি জানি।

জানিস, সত্যি জানিস?

হ্যাঁ জানি, ভোগের পর মেয়েমানুষকে পদাঘাতে পালঙ্ক থেকে নামিয়ে দেয়।

কে বলেছে এই কথা, মিথ্যা।

আমি জানি, যে বলেছিল সে তো নগরে নেই।

তোর সব্বোনাশ হবে, তুই আর কথা বলিসনে।

মহাপার্শ্ব বলে, আমি তো সামান্য কীটের মতো মানুষ, আমার আর কতটা সব্বোনাশ হবে, তার উপরে পুরুষমানুষ, পুরুষমানুষই তো সব্বোনাশ করে বেড়ায়, তুই মেয়েমানুষ, তোর ভয় বেশি, নিজের কথা ভাব চতুরিকে।

চতুরিকার মনে যে সংশয় ছিল তা যেন দূর হয়ে যেতে থাকে। মহাপার্শ্ব তাকে আটকাতে চাইছে তার অর্থ শ্রেষ্ঠী তাকেই যাঞ্চা করেছেন। সেই সত্যটা বিশ্বাস করতনা মর্কট বীট, আজ যেন জানতে পেরে অন্যভাবে রুখে দিতে চাইছে চতুরিকাকে।

চতুরিকা বলল, তোর এত সৎ-বুদ্ধি হলো কবে, তোর কাজ তো লোকের সব্বোনাশ করে বেড়ানো, লোক ঠেকিয়ে বেড়াস।

মহাপার্শ্ব বলল, আমার কতটা সাধ্যরে চতুরিকে, এই তো আমার দশা, দুবেলা অন্ন জোটে না, লোক আমি কত আর ঠকাই, কিন্তু ধনপতির ধন কি এমনি এমনি তার ঘরে যায়? ধনপতি মানুষকে মানুষের মতো দ্যাখে না।

চতুরিকা বিরক্ত হয়ে উঠল, চাপা গলায় ভৎর্সনা করে ওঠে মহাপার্শ্বকে, বলল, ওই রকম মানুষের নামে এসব বললে তোর পাপ হবে মহাপার্শ্ব, মহাকাল না দিলে কেউ অত পায় না, মহাকাল ভগবানের আশীর্বাদ আছে তাঁর উপর।

মহাপার্শ্ব বলল, শ্রেষ্ঠী ভাবেন মুদ্রায় যেমন কিনে আনেন রেশম, ঘোড়া-ফসল, অলঙ্কার, তেমনি নগদ মুদ্রায় মানুষ কেনা যায়, অলঙ্কার দিয়ে কেনা যায় মেয়েমানুষ, মানুষকে ঘোড়া আর রেশমের মতো মনে করেন উনি।

শুনে চতুরিকার দুচোখ বিস্ফারিত। এসব কেমন কথা? কে শেখাল ওই মর্কট বীটকে? এমন কথা তো সে জন্মেও শোনেনি। সে গর্জন করে ওঠে, তুই থাম মহাপার্শ্ব, না পারিস তো চলে যা, বড় মানুষের নিন্দে করা পাপ, বড় মানুষের নিন্দে করলে ভাল হয় না কারোর, তুই দেখছি বড় জ্ঞানী হয়েছিস।

আমি বলিনি, এসব তো বলেছে দেবদত্তা, আমি শুনেছি।

চতুরিকা গরগর করে ওঠে, তুই কেন তার কাছে গিয়েছিলি পাষণ্ড?

কেন গিয়েছিলাম তাতো শুনেছিস।

তুই যাবিনে, তোর উপর মহাকাল রুষ্ট হবেন, তোর সব্বোনাশ হবে মর্কট, আর সবচেয়ে বড় সব্বোনাশ হবে দেবদত্তা সখীর, অত অহংকার ভাল না, অহংকারে সে ভেবেছে তার মাথা আকাশে ঠেকে গেছে, আকাশ অনেক অনেক উপরে, মেয়েমানুষের অহংকার কিসে হয়, পড়ে থাকে তো পুরুষমানুষের নীচে, তার যৈবন গেলে কে পোঁছে তাকে, যদি রোগ হয় কে দ্যাখে তাকে? পুরুষমানুষের দয়ার শরীর, তার নিন্দা করলে মুখে পোকা হবে।

মহাপার্শ্ব চুপ করে থাকে। কিন্তু চতুরিকার কথা সে বিশ্বাস করছে না। প্রায় সমস্ত দুপুর ধরে যা শুনেছে দেবদত্তার ঘরের দুয়ারে বসে তা সে বিশ্বাস করে ফেলেছে। চতুরিকা পুরুষমানুষ আর মেয়েমানুষের যে কথা বলছে সেই কথা বলেনি দেবদত্তা আর সেই দুটো মানুষ। দেবদত্তা বলেছিল, যা তা মনে ধরেছে তার। মহাপার্শ্ব অপেক্ষা করছিল চতুরিকার উত্তেজনা কখন থামে। কথা বলতে বলতে নিরুত্তর মহাপার্শ্বকে লক্ষ্য করে চতুরিকা আচমকা থামল, বলল, চুপ করে আছিস যে?

তুই দেবদত্তার কাছে গিয়ে শুনে আয় চতুরিকে।

আমি শুনতে যাব কেন?

শুনলে তোর বিশ্বাস হবে, শ্রেষ্ঠীর কাছে মানুষের কোনো আলাদা দাম নেই, দাস উতঙ্ককে দিয়ে শূদ্রপল্লী পুড়িয়ে তাকেই পুড়িয়ে মারল শ্রেষ্ঠী, কাঠ কুটোর যা দাম ওই দাস উতঙ্কেরও সেই দাম ছিল তার কাছে।

চতুরিকা আবার বিরক্ত হয়, বলল, সখীর বিপদ হবে।

কার? ভ্রু কুঁচকে যায় মহাপার্শ্বর, দেবদত্তার কথা বলছিস?

হ্যাঁ, ধনপতি শ্রেষ্ঠী তো ঘুমিয়ে থাকেন না সব সময়, যে লোকদুটো তোর সঙ্গে সখীর ঘরে গিয়েছিল তাদের তুই চিনতিস?

থমকে যায় মহাপার্শ্ব, হতচকিত হয়ে তাকিয়ে থাকল চতুরিকার মুখে, বলল, তারা তো পথিক, নগরের বাইরের মানুষ, তবে মুখটা চেনা চেনা মনে হয়, আগে দেখে থাকতে পারি।

চতুরিকা বলল, তোরও সব্বোনাশ হবে, সখী না হয় প্রধান গণিকা, রাজা তাঁর অনুরাগী শোনা যায়, কিন্তু তুই কে রে মর্কট?

মহাপার্শ্ব বলল, পষ্ট করে বল কী বলতে চাস।

বলছি লোকদুটো শ্রেষ্ঠীর গুপ্তচর হতে পারে, রাজার গুপ্তচর হবে, তারা খোঁজ নিয়ে বেড়াচ্ছে কারা কথা বলছে রাজা আর শ্রেষ্ঠীর বিরুদ্ধে।

মহাপার্শ্ব ঘাবড়ে যায়, তারা তো ধ্রুবপুত্রের খোঁজে এসেছিল, একজন আচার্য বৃষভানুর শিষ্য।

চতুরিকা বলল, বৃষভানুই নেই নগরে তো তাঁর শিষ্য, তাকে চিনিস?

মহাপার্শ্ব ঘাড় নাড়ে। চতুরিকা গালে হাত দিল, বলল, সব কথা চলে যাবে আসল জায়গায়, দেশে বিষ্টি নেই, নগর জ্বলছে শ্মশানের চিতার মতো, এখন নগরের মানী মানুষের বিপক্ষে কি কথা বলা ঠিক?

ঠিক না?

একদম না, এতে তো প্রজা বিদ্রোহ হবে।

ভয় পেয়ে যায় মহাপার্শ্ব, আমরা তো সেই সব কথা বলিনি।

তুই কী বলেছিস?

ওদের কথায় সায় দিয়েছি।

তোকে যদি এবার কারাগারে ঢুকিয়ে দেয়, আর বেরোতে পারবি?

মহাপার্শ্বর মনে হলো চতুরিকার কথাগুলো অসত্য হতে পারে না। সত্যিই তো দুটো লোক এতদিন বাদে ধ্রুবপুত্রের খোঁজ করতে নগরে আসবে কেন? আর নগরে এসে তাকেই বা ধরবে কেন? এখন তো অনাবৃষ্টি চলছে। অনাবৃষ্টির কালেই তো প্রজারা বিদ্রোহ করতে পারে। আর তা দমন করতে রাজার গুপ্তচর পথে পথে ঘুরতে পারে। হায় হায়! এটা তো ঠিক হয়নি। সে কিছুই বুজতে পারল না অথচ ওই দু'জনের কথায় এক নাগাড়ে সায় দিয়ে গেল।

আমার তাহলে কী হবে চতুরিকে?

মরবি তুই, উতঙ্কের মতো তোকেও পুড়িয়ে মারবে শ্রেষ্ঠী।

উঁহু, সে কী কষ্ট। মরণ যন্ত্রণা আমি শুনেছিলাম, বরাহ নিধনের কালে অমন শোনা যায়, বরাহর মতো মরেছিল সে।

তার তো ততো অপরাধ ছিল না, শূদ্রপল্লী পুড়িয়েছিল শুধু, তোর অপরাধ আরো ভয়ানক, মানী মানুষের বিপক্ষে কথা বললে নরকবাস হয়, তোর পোড়া দেহ কুকুর দিয়ে খাওয়াবে শ্রেষ্ঠী।

আর্তনাদ করে ওঠে মহাপার্শ্ব, এসব কী বলছিস চতুরিকে, আমি কী করলাম, ঘুমোচ্ছিলাম কদমগাছের নীচে বসে, লোক দুটো আমাকে টেনে তুলল, গুপ্তচরদের আমি তো ডাকিনি।

তোর দুই হাত কেটে দিতে পারে জল্লাদ, জানিস?

আমার তো কোনো অপরাধ নেই।

তোর তো সব চেয়ে বেশি অপরাধ, তুই তাদের সঙ্গে দেবদত্তা সখীর ঘরে গিয়েছিলি ধনপতি শ্রেষ্ঠী আর রাজার নিন্দে করতে করতে।

না তা করিনি, পথে কথা বলিনি।

গুপ্তচররা যদি বলে বলেছিস তুই, তখন?

তারা বলবে কেন?

বলবে তোর দুই হাত যাতে কাটা পড়ে, তোর দুই পা যাতে কাটা পড়ে জল্লাদের হাতে, চোরের শাস্তি হবে তোর, জ্যান্ত অবস্থায় তোকে বুনো কুকুর দিয়ে খাওয়াবে শ্রেষ্ঠী, তাঁর ক্রোধ ভীষণ।

তা জানি, ধ্রুবপুত্রকে নাকি তিনি মেরেই ফেলতেন যদি না সে চলে যেত।

চতুরিকা বলল, উতঙ্কের তো কোনো দোষই ছিল না, নিরপরাধ ছিল, সে শূদ্রপল্লী কি এমনি পুড়িয়েছিল? তবু তো তাকে এত কষ্ট পেয়ে মরতে হলো।

হ্যাঁ। ঘাড় ঝুলে গেল মহাপার্শ্বর, বলল, এই সব কথাই তো হয়েছিল।

এই সব কথা মনে আনাও পাপ, মনে আনলেও তা জেনে যাবে শ্রেষ্ঠী, তিনি মহাকালের চরণ আশ্রিত। বলল চতুরিকা, ফিসফিস করে বলতে লাগল, তিনি ভাল হলে ভাল, সোনায় মুড়ে দেবেন দাসদাসীকে, না হলে পুড়িয়ে মারবেন, তখন তাঁর মনে কোনো দয়ামায়া থাকে না, তুই সাবধান হ মহাপার্শ্ব।

এখন আমি কী করব?

গুপ্তচর দুটো কোথায় গেল?

গেল শ্রেষ্ঠীর খোঁজে, যদি তাঁর দেখা পায়।

তাহলে বোঝ, যা শুনেছে তা শ্রেষ্ঠীকে শোনাবে আজই।

মহাপার্শ্ব বুঝতে পারছিল না কী করবে এখন সে। বাঁচাতে পারে চতুরিকা, চতুরিকাকে শ্রেষ্ঠীর মনে ধরেছে। সে বললে হয়ত শ্রেষ্ঠী ক্ষমা করে দিতে পারেন। মহাপার্শ্ব কুঁকড়ে যাচ্ছিল ভয়ে। উতঙ্কের মরণ আর্তনাদ মনে পড়ে যাচ্ছিল তার।

চতুরিকা বলল, ধনপতি শ্রেষ্ঠীরই তো সমস্ত শক্তি।

জানি তা, তোর সখীও বলল তা।

তাঁর যদি ইচ্ছে হয় একটা মানুষকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে মারতে পারেন, তার দোষ থাকুক না থাকুক, শুনেছি তিনি অতি নিষ্ঠুরও।

ভয় পায় মহাপার্শ্ব, বলল, আমাদের কথাগুলোই তো তুই বলছিস চতুরিকা।

চতুরিকা মাথ নাড়ে, বলল, আমার প্রতি তিনি সদয়, কিন্তু তিনি ইচ্ছে করলেই কাউকে মেরে দিয়ে আনন্দ করতে পারেন।

দুপুরে এই কথাই তো হচ্ছিল।

চতুরিকা বলল, এসব উদ্ধব বলেছিল, আমি শ্রেষ্ঠীকে উদ্ধবের কথা বলব, উদ্ধবকে ভিখারি করে মেরে দেবেন তিনি, তুই শুধু তাঁকে আমার খবরটা দিবি মহাপার্শ্ব, গিয়ে বল চতুরিকা দাসী কবে যাবে তাঁর চরণে?

মহাপার্শ্ব বলে, আবার যদি গুপ্তচরে ধরে?

আমি দেখেই চিনতে পারতাম তারা গুপ্তচর কিনা, সখী কি বোঝেনি?

না। বিড়বিড় করে মহাপার্শ্ব, তুই যাবি তোর সখীর কাছে, খোঁজ নিয়ে আসবি কারা এসেছিল, কেন এসেছিল?

চতুরিকা বলল যাবে পরদিন। বীট এবং রাজসত্রি উদ্ধবের ভোগ্য প্রায় কুরূপা মার্জার-আঁখি চতুরিকা একই রকম বুদ্ধি ধরে। তারা সন্ধে থেকে অনেক রাত্তির পর্যন্ত শ্রেষ্ঠী আর গুপ্তচর নিয়ে অনর্থক কথা বলে যেতে লাগল।

আটষট্টি

চতুরিকা বলল, সখী, তোমার কথাই সত্য হলো শেষ পর্যন্ত, ভাগ্য খুলল।

দেবদত্তা খড়িমাটি দিয়ে মেঝের উপর একটি মানুষকে এঁকে তুলছিল। চিত্রটি মনের মতো করে সম্পূর্ণ করে বিভোর হয়ে উঠছিল। খড়িমাটিতে আঁকা মানুষটিকে চেনা যায় না, কিন্তু আন্দাজ করা যায় যেন। ওই মুখ রাজার নয়। কোথায় রাজার গরিমা? রাজার উষ্ণীষ, তলোয়ার কিংবা ধনুর্বাণ? ওই মুখ এক সাধারণ জনের। দেখে নিশ্চিন্ত হলো যেন চতুরিকা। ওই মুখ শ্রেষ্ঠীরও নয়। শ্রেষ্ঠীর হওয়ার কথাও

তো নয়। তবু চতুরিকার মনের ভিতরে ক্ষীণ আশঙ্কা তো রয়েই গেছে। শ্রেষ্ঠী যাঞ্ঞা করেন দেবদত্তাকে, যদি দেবদত্তা সম্মত হয়, তার দিকে ফিরেও তাকাবেন না শ্রেষ্ঠী, ধনপতি সুভগ দত্ত। কিন্তু যে নারী মনে মনে, গোপনে, একা একা এক অতি সাধারণ পুরুষমানুষকে নিয়ে আকাশকুসুম রচনা করে, তাকে নিয়েই মগ্ন থাকে, তাকে কেন যাঞ্ঞা করবেন ধনপতি শ্রেষ্ঠী? ধন সম্পদ তাঁর ঐশ্বর্যের কোনো গরিমা নেই নাকি?

চতুরিকার সহর্ষ উপস্থিতিতে দেবদত্তা বিস্মিত, বিরক্তও হলো, তবু মুখের ভাবে তা লুকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কার ভাগ্য খুলল, কী হলো নগরে?

চতুরিকা নিজের বুকে হাত দিল, এই অভাগীর, কিন্তু সখী এ তুমি কাকে এঁকেছো, এ কোন ভাগ্যবান, কোন রূপবান যে দেবদত্তা তাকে একা একা ....?

চতুরিকার কথা শেষ হওয়ার আগে নিজের উত্তরীয়খানি দিয়ে ধীরে ধীরে খড়িমাটিতে আঁকা চিত্রটি মুছে দিতে লাগল দেবদত্তা। সমস্তটা জেনেও চতুরিকা না জানার ভান করছে। চতুরিকা যেন আরো চতুর হয়েছে। কিন্তু অতি চাতুর্যই যে শেষ পর্যন্ত নিবুদ্ধিতায় পরিণত হয় তাকি জানে চতুরিকা? ধ্রুবপুত্রকে নিজের মতো করে এঁকে একা একা তাকে নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকা তার মনের খেলা। এই খেলায় আর একটি চিত্র আছে। তবে সেই চিত্র কোনো বাস্তবতা থেকে সে আঁকতে বসে না। কখনো ধ্রুবপুত্র, কখনো এক স্বপ্নের নদীতীর, ছোট ছোট কুটির, দূরে পর্বতশ্রেণী—এক নিসর্গকে নিয়ে সে মগ্ন হয়। আকসু নদী, নদীরকূল, দূরের পাহাড়, বনভূমি..... কত কী? ধ্রুবপুত্র যেমন ধীরে ধীরে অলীক হয়ে যাচ্ছে তার কাছে, তেমনি সেই আকসু নদীর তীর তো অলৌকিকই হয়ে আছে ছেলেবেলা থেকে। কিন্তু এসব তার মনের একান্ত আলোছায়া, আর কেউ এসব দেখতে পাক তা চায় না সে। দেবদত্তা মনে মনে বিরক্ত হলো আরো।

চতুরিকা বলল, কী করছ সখী, মুছে দিচ্ছো?

দেবদত্তা জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোর কী হলো?

ওই যে তুমি আমাকে বলতে সখী, হয় শ্রেষ্ঠী না হয় সেনাপতি, না হয় ভিনদেশী কোনো বণিক, রাজপুরুষ আমাকে পছন্দ করবে ঠিক, উদ্ধব চিরকাল আমায় পীড়ন করতে পারবে না, তাই হলো, তোমার কথা সত্য হলো।

বলেছিলাম! মেঝেতে খড়ি মাটি দিয়ে নতুন রেখা টানতে টানতে দেবদত্তা জিজ্ঞেস করল, তা এল রাজপুরুষ, কোন দেশের রাজপুত্তুর?

চতুরিকা যেন লজ্জায় অবনত হয়, নিম্নস্বরে বলল, তুমি তো বলেছিলে আমার নৃত্যে শ্রেষ্ঠী কিম্বা সেনাপতি বা রাজা মুগ্ধ হবেন।

কে মুগ্ধ হলো?

চতুরিকা বলল, শ্রেষ্ঠী, ধনপতি সুভগ দত্ত।

আশ্চর্য! দেবদত্তা দেখতে লাগল চতুরিকাকে। কই সৌভাগ্যে চিহ্ন তো ফুটে ওঠেনি ওর রূপে! মুখখানি তো চিন্তামগ্ন। মনের মতো পুরুষ পেলে সমস্ত নারীই তো পূর্ণিমার চাঁদের মতো আলোয় ভরে ওঠে। সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। চতুরিকার ভিতরে সেই চিহ্ন কোথায়? হয়ত আছে, সে দেখতে পাচ্ছে না। সে শুনেছে শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত ডেকেছেন চতুরিকাকে। শ্রেষ্ঠী এতদিনে স্তব্ধ হলেন। সংবাদে বাঁচল যেন দেবদত্তা। কিন্তু কথাটা কি বিশ্বাসের যোগ্য। চতুরিকার এই রূপে কী করে মুগ্ধ হবেন শ্রেষ্ঠী? এই নগরে কি সুরূপা কন্যার অভাব ঘটেছে? অনাবৃষ্টিতে কি মানুষ অন্ধ হয়ে যায় যে তার ভালমন্দ জ্ঞান হারিয়ে যায়? না হলে চতুরিকাকে কেন যাঞ্ঞা করবেন শ্রেষ্ঠী? নাকি এ তাঁর এক খেয়াল? দেবদত্তার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে কুরূপা চতুরিকাকে ডেকে এক রকম শোধ নেওয়া হলো তাঁর। দেবদত্তা আর চতুরিকা দুজনেই তাঁর কাছে তুল্যমূল্য হলো। চতুরিকাকে গ্রহণের মধ্য দিয়ে দেবদত্তাকে ছোট করা হলো, যেন চতুরিকা আর দেবদত্তায় তফাৎই নেই। নাকি ধনপতিরা এইরকমই হন। ধনগর্বে মানুষকে মানুষ বলে মনে করেন না। না হলে চতুরিকাকে তিনি ডাকেন? ওই মার্জারিকা চতুরিকার ভিতরে এমন কিছু আছে যাতে কেউ মুগ্ধ হতে পারে? দাঁত উঁচু, স্ফীত ওষ্ঠাধর, ভারী বুক, ভারী নিতম্বের চতুরিকা যেন মাংসেরই স্তূপ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাংসেই তো মন ভরে পুরুষের, তাই কি শ্রেষ্ঠী চতুরিকাকে যাঞ্ঞা করলেন?

চতুরিকা বলল, নৃত্যের ক'টি মুদ্রা যা শিখেছিলাম তা কাজে লাগবে।

তোর নৃত্য, দেখেছেন নাকি শ্রেষ্ঠী?

চতুরিকা ঘাড় কাত করে, হ্যাঁ।

কবে দেখলেন?

এক সন্ধ্যায়। বিড়বিড় করল চতুরিকা।

কী বললেন উনি?

পরে দূত পাঠালেন, বাণিজ্যে যাবেন, আমাকে সঙ্গিনী করবেন।

দেবদত্তা শুনতে শুনতে ভাবল সে বেঁচেছে। আর ওই বৃদ্ধ ধনপতি তার কামনা নিবারণে তাকে আমন্ত্রণ জানাবে না, যদি অবশ্য সত্য হয়, চতুরিকা যদি তার সঙ্গিনী হয়। দাসীও হতে পারে। বাণিজ্যে তো মস্ত সার্থবাহ যায়। তাতে কত মানুষ, কত রথ, গো-গাড়ি যাবে। দাস দাসী যাবে। সেই দাসদাসীর ভিতরে চতুরিকা থাকতে পারে। তাই তো হবে। না হলে তার রূপের আলো যে মিথ্যে হয়ে যাবে, ভাবল দেবদত্তা। তার পরিবর্তে কোনো কারণেই এই কুরূপা নারীকে গ্রহণ করবে না বৃদ্ধ ধনপতি। দেবদত্তা খড়ি মাটি দিয়ে আঁকাবাকা এক নদীকে আঁকতে লাগল মেঝের উপর। এই নদী সেই আকসু নদী, এই নদী আর সেই দেশ কিছু দিন ধরে তার মাথার ভিতরে প্রবেশ করেছে যেন। এখন তার মনে হচ্ছে ধ্রুবপুত্র ওই আকসু নদীর ধারে চলে যেতে পারে। যেখানে ঘর বেঁধে, পুঁথিপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে দেবদত্তার জন্য। জানে একমাত্র আকসু নদীর ধারের বাহ্লিক দেশই দেবদত্তার পক্ষে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ওই একটি দেশের কথাই জানে দেবদত্তা। ওই দেশে দেবদত্তার পিতৃকুল, মাতৃকুল—দুই কুলই খুঁজে পাওয়া যাবে। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহরা যেন ওই আকসু নদীর ধারে বহু শত বৎসর ধরে বসবাস করছেন। ওখানে মানুষের মৃত্যু হয় না। চিরঞ্জীবী মানুষ, মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষ আকসু নদীর জলে স্নান করে প্রতিদিনই হৃত যৌবন ফিরে পান, প্রতিদিন যতটা ক্ষয় হয় তাঁদের শরীরে, তা পূরণ হয়ে যায় প্রতিদিনই।

চতুরিকা জিজ্ঞেস করল, সখী এ কী আঁকছ?

নদী।

শিপ্রানদী?

হাসল দেবদত্তা, হ্যাঁরে, তুই যা মনে করবি তা, আকসু নদীর কথা জানিস, তোকে না বলেছিলাম মনে হয়?

মাথা নাড়ে চতুরিকা। বলে থাকতে পারে দেবদত্তা, কিন্তু তা মনে নেই চতুরিকার। সে ফিরে এল শ্রেষ্ঠীর কথায়, বলল, যে কোনোদিন শিবিকা পাঠাবেন হয়ত শ্রেষ্ঠী, চলে যেতে হবে, আর কি ফিরতে পারব সখী?

তাহলে যাবিনা, যাবি কেন বুড়োর সঙ্গে?

সখী, আমাকে যে তাঁর মনে ধরেছে, কত বড় মানুষ তিনি, অতুল ঐশ্বর্য তাঁর, সব আমার হবে, তোমার কথাই তো সত্য হলো, আমার ভাগ্য বদলাল।

দেবদত্তা হাতের খড়িমাটি মেঝেতে রেখে দিয়ে আবলক হয়ে দেখতে লাগল চতুরিকাকে। এখন তো মনে হচ্ছে কথাগুলি সত্য। কিন্তু কী করে সত্য হয়? চতুরিকায় যদি মুগ্ধ হয় ধনপতি, তবে তো রূপ অরূপের তফাৎই থাকে না জগতে। সে জিজ্ঞেস করল, কবে যাত্রা শুরু হবে?

শ্রেষ্ঠী তা জানেন।

তুই কী জানিস?

জানি আমাকে যেতে হবে তাঁর সঙ্গে, আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না, তোমার কাছে আসা হবে না, সখী আমাকে কিছু উপদেশ দাও।

কী উপদেশ?

আমি কী করে তাঁকে সেবা করব, পুরুষমানুষকে কীভাবে বশ করতে হয়, কী ভাবে তাঁর কাছে নিজেকে নিবেদন করলে তিনি সুখী হবেন।

দেবদত্তা বলল, তুই নিজে যেমন জানিস তেমন ভাবে সেবা করবি।

আমি যে কিছুই জানি না সখী।

মেয়েমানুষ হয়েছিস, যৌবনকাল তোর, তুই জানিস না, উদ্ধবকে কী করে বশ করতিস?

চতুরিকা থরথর করে কাঁপছিল। এই আলাপে সত্য হচ্ছে যে উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ ধনপতির কাছে আশ্রয় পেয়েছে চতুরিকা। ধনপতি তার জন্য শিবিকা পাঠাবেন, মহামূল্য অলঙ্কার, রেশম-বস্ত্র, চন্দন, পুষ্প সব পাঠাবেন। সে সুসজ্জিতা হয়ে শিবিকায় উঠে ধনপতির উদ্দেশে যাত্রা করবে। শিবিকার পাশাপাশি পদব্রজে চলবে তার ভৃত্যের মতো ওই বীট মহাপার্শ্ব, যে বসে আছে দুয়ারের বাইরে।

চতুরিকা বলল, আমি তো রাজ-সত্রিকে বশ করিনি সখী। সে আমার উপর অত্যাচার করত, সমস্ত কিছু অপহরণ করত, নতুবা কারাগারে বন্দি করবার ভয় দেখাত, ভয়েই আমি তার বশ্যতা স্বীকার করেছিলাম, তা তো তুমি জান।

দেবদত্তা বলল, যাতে শ্রেষ্ঠীর মন পাস সেই কাজ করিস, উনি তো বৃদ্ধ, ওঁর যত কামনা সব চোখে আর মুখে, দেহে কি শক্তি আছে?

চতুরিকা বলল, আছে, ওর কত ঐশ্বর্য, থাকবে না?

ঐশ্বর্য তাই কী, যে ভিখিরি সেও প্রবল শক্তি ধরতে পারে।

না সখী, যাঁর অত ঐশ্বর্য, যাঁর প্রতি মহাকালের করুণা সবসময় ঝরে পড়ছে, তাঁর কোনো কিছুরই অভাব নেই, আমি জানি, তাঁর যৌবন একেবারে নবীন যুবকের মতো, তাঁদের চেয়েও তিনি কৃতী, তিনি জানেন ভোগের নানা কলাকৌশল, নানা সূত্র, উদ্ধব তো অত্যাচারী, তিনি প্রেমময়।

এসব কী করে জানলি?

তিনি যে এসেছেন আমার কাছে।

দেবদত্তা ভাবল শ্রেষ্ঠী তাহলে সত্যিই শোধ নিচ্ছেন। নিন শোধ, তাতে সে বাঁচবে। শ্রেষ্ঠী উজ্জয়িনী ছেড়ে নরকে যান, তাতে উজ্জয়িনীর মঙ্গল হবে। সে বিড়বিড় করে বলল, তুই যদি আর না ফিরিস কষ্ট হবে, অনাবৃষ্টিতো চিরকাল চলবে না।

শ্রেষ্ঠী যদি না ফেরেন, আমি ফিরব কী করে?

তিনি না ফিরলে উজ্জয়িনীর মঙ্গল। বলল দেবদত্তা।

এ তুমি কী বলো সখী?

জবাব দেয় না দেবদত্তা। চতুরিকা উসখুস করতে থাকে। তার মনে হচ্ছিল এখন ঈর্ষায় পুড়ছে প্রধান গণিকা। তার প্রত্যাখ্যানের পর শ্রেষ্ঠী ডেকে নেবেন চতুরিকাকে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি, সে বলল, শ্রেষ্ঠীর তুল্য ঐশ্বর্য কার আছে?

তাঁর ঐশ্বর্য আছে তো নগরের মানুষের কী?

তিনি চলে গেলে নগর যে ঐশ্বর্যহীন হয়ে যাবে সখী।

তাতেই বা নগরের মানুষের কী?

এমন কথা বলো না সখী, তিনি এখন আমার প্রভু।

বাইরে বসে বিরক্ত হচ্ছিল বীট মহাপার্শ্ব। চতুরিকার সঙ্গে সে জানতে এসেছিল গত পরশুর সেই দুজন গুপ্তচর কিনা। কিন্তু চতুরিকা তো শুধু বিভোর হয়ে আছে শ্রেষ্ঠীতে। মহাপার্শ্ব নিজেও অবাক হচ্ছিল দুয়ারের বাইরে বসে চতুরিকার কথা শুনতে শুনতে, কবে এলেন শ্রেষ্ঠী কবে দেখলেন চতুরিকার নাচ? কই সে তো শোনেনি শ্রেষ্ঠী এসেছিলেন চতুরিকার ঘরে। এলে কি জানতে পারত না মহাপার্শ্ব? সে গলা খাঁকারি দিল ঘরের বাইরে বসে, বলল, চতুরিকে হে, সেদিনের দু'জনের কথাটা দেবদত্তা মাকে জিজ্ঞেস করলিনে?

কোন কথা? দেবদত্তা জিজ্ঞেস করল।

চতুরিকা কথাটি বলতে দেবদত্তা হেসে উড়িয়ে দিল চতুরিকার আশঙ্কা, বলল, গুপ্তচরের কাজ নেই কে কার নিন্দে করছে সেই খোঁজ নিয়ে বেড়ায়, তাঁরা ধ্রুবপুত্রের খোঁজে এসেছিলেন, হ্যাঁরে, চতুরিকে তুই যাচ্ছিস কোন দেশে, শ্রেষ্ঠী তোকে কোথায় নিয়ে যাবে দাসী করে?

দাসী না, শ্রেষ্ঠী আমাকে যাওয়া করেছেন, মর্যাদা দিয়ে নিয়ে যাবেন।

যাচ্ছেন কোথায় তিনি, কোন দেশে?

চতুরিকা বলতে চাইল, কিন্তু বলতে পারল না। ভুলে গেছে। মনে পড়ছে না কিছুতেই। পেটে এসে মুখে আসছে না কথাটা। শেষে বলল, মনে নেই, ভুলে গেছি যে সখী, তবে সে নাকি বহুদূরের পথ, অনেক দেশ, অনেক নদী, অনেক গিরিপথ পার হতে হবে।

শ্রেষ্ঠী তোকে বলেননি?

বলেছিলেন, এইটুকু তো মনে আছে, সেই দেশে নাকি এমন আগুন নেই, এখানে সূর্যের রথের চাকা বসে যাচ্ছে, সেখানে আকাশে মেঘ আছে।

বুঝেছি, তবে দেশটা কী?

তখন মহাপার্শ্ব দুয়ার থেকে মুখ বাড়ায়, ভুলে গেলি চতুরিকে?

মনে পড়ে না কেন রে মহাপার্শ্ব?

মহাপার্শ্ব বলল, আমি বলব?

মনে আছে তোর?

মহাপার্শ্ব বলল, ভেবে বলি, সেই দেশে রেশম পাওয়া যায়, হলুদরঙের রেশম, তাই তো শুনেছি আমি, যবন দেশ।

হ্যাঁ, কিন্তু তার নামটা কী?

মহাপার্শ্ব হাসল, এইবার মনে এসেছে চতুরিকে, বৈদ্যরাজ বলেছিল, সে দেশের নাম বাহ্লিক, বাহ্লিক দেশের রেশম নাকি খুব ভাল—?

কোন দেশ? উৎকর্ণ হয়ে ওঠে দেবদত্তা, কোন দেশের কথা বললি?

চতুরিকা বলল, বাহ্লিক দেশ, বৈদ্যরাজ এসে তো তাই বলে গেল।

কোন বৈদ্যরাজ?

শ্রেষ্ঠীর দূত নহুষ শর্মণ।

কোন দেশ? আবার জিজ্ঞেস করল দেবদত্তা।

বাহ্লিক, সে দেশ নাকি অনেক দূরে।

আকসু নদীর ধারে?

কী জানি, অত জানিনে। মাথা নাড়ল চতুরিকা।

তোকে আকসু নদীর কথা বলেননি শ্রেষ্ঠী?

বলে গেছে তো তাঁর দূত, সে আর কত জানে?

দেবদত্তা তখন দুয়ারের দিকে তাকায়, ডাকল মহাপার্শ্বকে, তুমি সেইজন, সেই মানুষ, এসেছিলে সেই দিন?

হ্যাঁ মা, আমি মহাপার্শ্ব বীট, বলি ধনপতির খেয়াল এটা, তাঁরা ভাল হন না, নিষ্ঠুর হন, তুমি মা চতুরিকাকে বোঝাও, সে তো তোমার চরণে আশ্রিত, শ্রেষ্ঠীর কাছে গিয়ে কি তার ভাল হবে? বলতে বলতে দুয়ারে এসে বসল মহাপার্শ্ব, বলল, সে নাকি অনেকদূর, নগরে খোঁজ নিয়েছি আমি।

সত্যি যাচ্ছেন ধনপতি ওই দেশে?

হ্যাঁ যাচ্ছেন। বলল মহাপার্শ্ব।

আকসু নদীর ধারে বাহ্লিক দেশে?

বাহ্লিক দেশই বটে, হলুদ রেশম বানায় যবনরা।

দেবদত্তা বলল, এতো সেই আকসু নদী, এর ধারে সেই দেশ, সেই দেশে মানুষের মৃত্যু নেই, জরা নেই, হিংসা নেই, ব্যাধি নেই। শূদ্রে আর ব্রাহ্মণে ভেদ নেই।

এমন তো শুনিনি। বলল চতুরিকা।

হ্যাঁ সেই দেশ যেন গন্ধর্বেরই দেশ। ফিসফিস করল দেবদত্তা, আমার পিতৃভূমি, হলুদ রেশম, আকসুনদী, আমার বাবা .....। চোখ ছলছল করে ওঠে দেবদত্তার, সেই দেশে যাবেন শ্রেষ্ঠী?

এ কি সেই দেশ, যেই দেশের কথা তুমি বলেছিলে সেদিন? জিজ্ঞেস করল মহাপার্শ্ব, গন্ধর্বের দেশ?

হ্যাঁ, সেই দেশের নামই তো বাহ্লিক দেশ।

কী আশ্চর্য, সেখানে যাচ্ছি আমি? চতুরিকা বলল, আমার কি সৌভাগ্য।

সত্যি বলছিস চতুরিকে, শ্রেষ্ঠী যাচ্ছেন সেই দেশে? জিজ্ঞেস করে দেবদত্তা।

হ্যাঁ, তাইই তো, হলুদ রেশমের কথা আমি তো আগেই শুনেছি।

ওই দেশে গেলে আর কেউ ফেরে না, কেন ফিরবে মানুষ, রোগ, শোক, দুঃখ, মৃত্যু নেই .... তোর বড় সৌভাগ্য, আমার পিতৃভূমি ওই দেশ।

দুয়ার থেকে মহাপার্শ্ব তার উটের মতো গলা বাড়িয়ে দিল, তুমি যাবে মা? তুমি যদি বলো শ্রেষ্ঠী তোমাকে তাঁর রথে করে নিয়ে যাবেন পাশে বসিয়ে।

দেবদত্তা উত্তর দেয় না। চুপ করে বসে থাকে। তার হাতের খড়িমাটি আবার মেঝের উপর আকসু নদীকে এঁকে তুলছিল। জলস্রোতের ঝিরঝির শব্দে শুনতে পাচ্ছে দেবদত্তা। মেঘের ডাক শুনতে পাচ্ছে। পাহাড়ের ছায়া দেখতে পাচ্ছে। সবুজ তৃণভূমিতে হলুদ রেশম বস্ত্রে সুন্দর গন্ধর্ব, গান্ধর্বীরা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাতাসে মধুর সঙ্গীত। দেবদত্তা নদীর জলে নিজের ছায়া দেখতে দেখতে বলল, আমাকে নিয়ে যাবেন তিনি, যে জন আমাকে সেই দেশে নিয়ে যাবে সেই জন যে হোক না কেন, শত্রু মিত্র যে হোক, নিষ্ঠুর দয়ালু যে হোক, যুবক বা বৃদ্ধ যে হোক, আমি তো যাবরে চতুরিকে।

উনসত্তর

একদিন সকালে দুই জোয়ান এসে বলল, কোনো লাভ নাই, উপরের সমুদ্দুর যেমন নির্জলা হয়ে গেছে, পাতালের সমুদ্দুরও, কেনা জানে দু'য়ের ভিতরে যোগ আছে।

পরাশর বুঝতে পারছিল আর রাখা যাবে না আটকে। এবার একে একে সব নিরুদ্দেশে যাবে উজ্জয়িনী ছেড়ে। দিন পাঁচ মাটি কেটেও জলের মুখ দেখা যায়নি রত্নাকর সাগরে। লোকে আর থাকবে কেন? অন্নের অভাবও ঘটে যাচ্ছে। এরপর তো ভিক্ষারও অভাব হবে। কী ভয়ানক দিন আসছে! সূয্যি ঠাকুর আর অস্ত যাবেন না—অর্ধোন্মাদ বৈদ্যরাজ এসে বলে গেছে ক'দিন আগে সন্ধ্যায়। সে বলল, আজকের দিনটা দেখা হোক।

কোন লাভ নাই, খাটনিই সার, উপরে জল না থাকলে নীচেও থাকে না।

পরাশর বলল, নদীতে তো আছে জল, কোনো কোনো কুয়ো এখনো শুকোচ্ছেনা, দিনে শুকোলে রাত্তিরে মা বসুমতী জল দিচ্ছে পাতাল থেকে।

এক জোয়ান লঙ্কেশ বলল, ওই মাঠপানে তাকাও, আকাশ তো মাটিতে ঠেকে আছে বটে।

তা আছে।

আর এক জোয়ান প্রহ্লাদ বলল, আকাশ সমুদ্দুর শুকায়ে গেলে পাতাল সমুদ্দুরের জল টানে সে, তাও তো জান, সত্য কিনা।

পরাশরের মনে হলো সত্য, কিন্তু সে কিছুই বলল না। তখন এক জোয়ান বলল, তাইই হয়েছে। নিজে নির্জলা হয়ে পাতালের জলও টেনে নিয়েছে আকাশ।

তাহলে সেই জল তো নামবে।

নামবে কী করে, উপরের আগুনে জল ধোঁয়া হয়ে গেছে। লঙ্কেশ বলল।

গেল কোথায়?

প্রহ্লাদ বলল, তা জানিনে, কিন্তু জল আর নাই যখন সাগর খুঁড়ে লাভ কী, আমরা বরং শ্রেষ্ঠীর সার্থবাহর পিছু পিছু যাই।

সেদিন সন্ধ্যায় বৈদ্যরাজ এসে বলে গেছে নগর ছেড়ে চলে যেতে। না হলে কেউ বাঁচবে না। শ্রেষ্ঠী বাণিজ্যে যাচ্ছেন, তাঁর পিছু পিছু যেতে বলল বৈদ্যরাজ। আগামী শুক্লপক্ষের আরম্ভে তিনি বাহ্লিক দেশে যাচ্ছেন। উন্মাদ বৈদ্যরাজ বাহ্লিক দেশের কথাও শুনিয়ে দিল কেমন!

কোন দেশ? জিজ্ঞেস করেছিল পরাশর। আবার শুনে মাথা নাড়তে আরম্ভ করেছিল বৈদ্যরাজ, তার অচেনা। সমস্ত জায়গায় তো সৈনিক হয়ে যাওয়া হয়নি একজীবনে। বৈদ্যরাজ বলেছিল, সে নাকি এক চিরবসন্তের দেশ, রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু নেই। অতি মহার্ঘ হলুদ রেশম সেখানে সবারই বস্ত্র। জোয়ানেরা শুনে সকাল থেকে বিগড়োতে আরম্ভ করেছে যে তা টের পায় পরাশর, বলল, ওই সব দেশে গেলে মানুষ ফিরতে পারে না, যে দেশে শ্রেষ্ঠী যাচ্ছেন সে দেশে তোরা যাবি কেন, ও হলো

ইন্দ্রজালের দেশ, নাহলে চিরবসন্ত হয়?

সত্যি বলছ? লঙ্কেশ জিজ্ঞেস করে।

বলছি, চিরবসন্ত হলে বৃষ্টি নামবে কখন?

কেন বর্ষায়।

বর্ষা তো নাই চিরবসন্ত, তাহলে চাষবাস, ফসল, তাকি বসন্তে হবে?

জানিনে আমরা।

ইন্দ্রজাল হয় ওই দেশে, আমি জানি, আমার বয়স সবার চেয়ে বেশি, আমি জানব যা তা কি তোরা জানবি?

না, না তা কেন, কী জান বলো? প্রহ্লাদ জিজ্ঞেস করে।

ওই দেশে গিয়ে ফিরতে পারে না কেউ, শ্রেষ্ঠী বুড়ো হয়েছেন, উনি ফিরবেন না, কিন্তু তোরা তো জোয়ান।

কিন্তু সাগরে জল ওঠে না, যে দিকে চোখ যায় আমরা চলে যাব।

পরাশর ভাবল একজন দুজন চলে গেলে ওই রকমই যেতে থাকবে। সাগর খুঁড়ে জল খোঁজা বন্ধ হয়ে যাবে। শূদ্রপল্লী জনশূন্য হয়ে যাবে। আর জনশূন্য যদি হতে থাকে এইভাবে উজ্জয়িনী, এখানে আর কোনোদিন মেঘ আসবে না। মেঘ তো আসে মানুষের টানে, মানুষকে ভিজিয়ে নরম করে দিতে। নিষ্ঠুর মানুষও বৃষ্টির জলে ভিজে যেন দয়ালু হয়ে ওঠে। মনুষ্যবিরল নগরে কেন আসবে বর্ষার মেঘ? শূন্য নগরে শুধুই আগুন সমুদ্রের ঢেউ বয়ে যাবে। পরাশর উদ্বিগ্ন হলো, বলল, সার্থবাহ যেতে তো দেরি আছে, আর ওই বৈদ্য তো উম্মাদ।

এখন ভাল হয়ে গেছে, আমরা আজই যাব শ্রেষ্ঠীর কাছে, তাঁর ভৃত্য হবো, তাঁর ভৃত্য চাই অনেক।

তখন পরাশর বলল, শোনো, শেষ বারের মতো আজ শুধু ওই সাগরে নেমে দ্যাখো।

কী দেখব, সমস্ত পরিশ্রম বিফলে যাচ্ছে, কাল কত চেষ্টা করেছি পাথরটা সরাতে, আমাদের দেহে বল নাই, পারছি না।

পাথরের পাশটা খুঁড়ে দ্যাখো।

লাভ নাই, জল নাই।

তখন পরাশর বলল, আছে, আমি স্বপন দেখেছি।

কথাটা সত্য বলল না পরাশর। বানিয়ে বলল আচমকা কথাটা তৈরি করে। স্বপ্ন দেখেছে রত্নাকর সাগরের নীচে একটি সোনার কলস আছে। সেই কলসের ভিতরে কী আছে? কলসের বন্ধ মুখ খুলে ফেলতেই জল বেরোতে লাগল। সেই জলে রত্নাকর সাগর ভরে গেল। সাগর উপচে জল বয়ে গেল মাঠ দিয়ে। নদীতে গিয়ে পড়ল। নদীভরে গেল। মাঠ নদীতে জল দেখে উপরের আকাশ ডাকতে লাগল। সেই আশ্চর্য মেঘের ডাক শুনতে শুনতে ঘুম ভেঙেছিল তার। ঘুম ভাঙার পরও যেন শুনেছিল মেঘের ডাক। পরাশর জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি শেষরাতে মেঘের ডাক শুনেছ, সেই অনেকদিন আগে আষাঢ়ে শ্রাবণে যেমন হতো।

কেমন হতো?

তাকি তোমরা ভুলে গেছ?

এক জোয়ান বলল, সব ভুলে গেছি, এরপর বর্ষার কথাও ভুলে যাব, তারপর তো আমরা মরে যাব, তুমি আমাদের ছেড়ে দাও ঠাকুদ্দা, আমরা চলে যাব।

আজ যদি জল উঠে আসে?

কী করে উঠবে, জল তো নেই।

আমার স্বপ্নটা তো ছিল ভোরবেলার, ওই সময় তা সত্য হতে পারে।

এক জোয়ান মাথা দোলায়, ভোরের স্বপন সত্য হয় তো লোকে বলে।

তখন পরাশর বলল, আজ আবার কৃষ্ণানবমী, কৃষ্ণা নবমীর স্বপন নাকি আরো সত্য হয়, ঘুম ভাঙার পর ময়ূরের ডাক শুনেছি, তাও শুভ।

তাহলে কি আমরা যাব সায়রে?

হ্যাঁ যাবে, সোনার কলসে ভরে মহাকাল ভগবান জল রেখেছেন। বিড়বিড় করে বলল পরাশর, আমি তো অনেকদিন আগে এমন অনাবৃষ্টির স্বপনও দেখেছিলাম, সেও এক ভোরবেলায়।

সত্য বলছ?

হ্যাঁ, তারপর কতদিন বাদে এই স্বপন! পরাশরের মনে হয় স্বপ্নটা সত্য। সে বানিয়ে বলেনি। সত্যিই যেন সে ভোরবেলায় মেঘের ডাকের স্বপ্নের ভিতরে জেগে উঠেছে আজ। সোনার কলসটা যেন সত্যিই ঘুমের ভিতরে দেখেছিল জলহীন রত্নাকর সাগরে। না দেখলে সে বলল কী করে?

প্রহ্লাদ জিজ্ঞেস করল, অনাবৃষ্টির স্বপন কেমন ছিল?

আকাশ দিয়ে অন্ধকার পড়ছিল, গরম ছাই-এর মতো অন্ধকার—অনেকদিন আগের কথা, ভুলেও যাচ্ছি, আসলে সে ছিল একটা দুঃস্বপ্ন,ওইরকম দুঃস্বপ্ন তখন প্রায়ই দেখা হতো, কিন্তু ধরা যেত না ওর মানে কী, কেননা বিষ্টি আর অনাবিষ্টি দুরকম ভাবে হয়, বিষ্টির জন্য সময় লাগে না বেশি, অনাবিষ্টি তো অনেকদিন ধরে হয়।

তা বটে। এক জোয়ান মাথা নাড়ে।

লঙ্কেশ বলে, আমরাও তখন ভয়ের স্বপন দেখতাম।

অনাবিষ্টির স্বপন, ভয় মানেই অনাবিষ্টি।

এখনো দেখি।

দেখবেই তো অনাবিষ্টি চলছে, কতদিন ধরে যে চলবে!

তারপর সবাই নেমেছিল সরোবরের শূন্য গর্ভে। বুড়ো বসেছিল সরোবর থেকে দূরে এক নিম গাছের গোড়ায়। সে বুঝতে পারছিল আর বড়জোর দু-একদিন রাখা যাবে, তারপর সবাই চলে যাবে জলহীন, শূন্যগর্ভ রত্নাকর সাগরকে ফেলে রেখে। রোদ একটু চড়া হতে কাজ বন্ধ হলো, তারপর আবার আরম্ভ হলো রোদ পড়তে। ঠিক সন্ধ্যার আগে আসে কে যেন উল্লাস করতে করতে উঠে এল বসুমতীর গর্ভ থেকে, কাঁদছিল সে আনন্দে, চিৎকার করে বলছিল, জল উঠছে বুড়োবাবা, সায়রে জল উঠছে।

সত্যি বলছিস?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই দ্যাখো কপালে সেই জল।

বুড়ো বলল, কী করে উঠল জল?

সেই যে পাথর, তাকে উপড়ে দিলাম সমস্ত দিন ধরে—জল এসে গেছে জল! জলের সংবাদ দিয়ে সে ছুটে গেল পল্লীর দিকে। জল যেন বয়ে নিয়ে গেল শূদ্রপল্লীর শূন্যতায়। জল ছেটাতে ছেটাতে গেল যেন। অলৌকিক জলের ধারায় ভিজে যেতে লাগল পথ ঘাট, মানুষের মুখ। বুড়ো উঠে দাঁড়াল। তখন রত্নাকর সাগরের ভিতর থেকে যেন মিছিল উঠে এল। অনেক মানুষ, নারী পুরুষ যেন পাতাল থেকে জল মেখে উঠে আসছিল। পাতাল থেকে জলের খোঁজ নিয়ে উঠে আসছিল।

বুড়ো পরাশর আকাশে তাকায়, ফিসফিস করে, হে ভগবান, জল এল! তুমি কি জল নামিয়ে দিলে পাতালে?

জোয়ান এসে বলল, জল উঠছে, জল আবার রত্নাকর সাগরকে ভরে দেবে, এক রাত্তিরেই অনেকটা হয়ে যাবে।

বুড়ো পরাশর সরোবরের পাড়ে বসে পড়ল, সে যেন কান পেতে জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল, বলল, সোনার কলসি তাহলে জল দিল?

দিল, কিন্তু কলসিটা কোথায়?

আছে পাতালে নিশ্চয়। কে যেন বলল।

একজন বলল, কী অদ্ভুত! তোমার স্বপ্ন সত্যি হলো!

পরাশর বিশ্বাস করতে পারছিল না। কী করে কথাটা মিলে গেল! সেই ওই রকম একটা কাহিনী কোথায় যেন শুনেছিল বহু বছর আগে। আজ আচমকা মনে পড়তে স্বপ্নের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে কাহিনীটাকে সত্য করে তুলল। ক্রমাগত খুঁড়ে গেলে জল বেরিয়ে আসতই, কিন্তু জলস্তর কতটা নেমে গেছে তা জানত না পরাশর। সে মনে মনে বলল, মহাকাল ভগবান করুণাময়, না হলে এই পল্লীতে তাকে ফেলে রেখে সবাই চলে যেত, সে এই বুড়ো বয়সে কোথায় যেতে পারে? কোথাও না। যে নগরে জল আছে,

মেঘ আছে, হলুদ রেশম আছে, ফসল আছে—সেখানেও না। পরাশর নিজে ওইরকম কোনো জায়গার কথা জানে না। তার কাছে উজ্জয়িনীই শ্রেষ্ঠ। উজ্জয়িনী, শিপ্রানদী, শূদ্রপল্লী, সাতসরোবর, মহাকাল মন্দির ছেড়ে সে যাবে কোথায়? মন্দিরে প্রবেশাধিকার নেই বটে, কিন্তু দূর থেকে দেখার ভিতরেও তো আনন্দ আছে। আনন্দ আছে সন্ধ্যার পর রত্নাকরসাগর তীরে বসে থাকায়, বসে মলয় পর্বতের কথা বলায়, বৎসরাজ উদয়ন আর বাসবদত্তার কাহিনী বলার ভিতরে। পরাশর মনে মনে জানে যদি আবার বর্ষার সময় বর্ষা, শীতের সময় শীত, বসন্তে কুহুধ্বনি ফিরে আসে, তবে উজ্জয়িনীতেই রোগ শোক জরা মৃত্যু যেন থাকবে না। উজ্জয়িনী ছেড়ে যেতে তার বুক ভেঙে যাবে।

পরাশর ঝিমোচ্ছিল যেন। জলের শব্দে ঝিমুনি আসে, ঘুম আসে। সে ঘুমিয়ে পড়ে ঘুমের ভিতরে পাতাল থেকে উঠে আসা জলের শব্দ শুনতে চায়। সোনার কলস যে জলকে ধরে রাখে, সেই জলের যেন শেষ নেই।

সেই সময় ঘোড়া ছুটিয়ে এল উদ্ধবনারায়ণ। সে পার হয়ে যাচ্ছিল শূদ্রপল্লীর সীমানা দিয়ে, কলরব শুনে ঢুকে পড়েছে ভিতরে। এখনো অস্পষ্ট আলো পৃথিবীর গায়ে গোপন মায়ার মতো লেগে আছে। সে ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে হাঁক মারল, কী হয়েছে এখানে?

এক জোয়ান মাথা নুয়ে বলল, জল।

জল মানে?

সায়রে জল উঠেছে সতরি মশায়।

অবাক হয়ে উদ্ধব সায়রের পাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকল। কী বলছে জল উঠেছে? কোথা থেকে জল উঠল? কে দিল জল? কোথাও জল নেই শূদ্রদের জলাশয়ে জল উঠল, ইন্দ্রজালের মায়া নাকি?

বুড়ো পরাশর এসে দাঁড়াল করজোড়ে, প্রভু, আমরা এবার বাঁচব।

শূদ্রের মরণ নাই, জল পেলি কোথায়?

মা বসুমতী সদয় হলো প্রভু।

উদ্ধব দেখল চাদ্দিকে অন্ধকার ঝুপ করে নেমে যাবে এরপর। অন্ধকারে ঘোড়া হাঁটিয়ে নিতে যেতে হবে তাকে। সে নিজেও যেমন পারে না, তার টাঙ্গন ঘোড়াটিও না, অন্ধকারে পথ চলা দু'জনের পক্ষেই দুষ্কর। কোথাও জলের চিহ্ন নেই দু-একটি কুণ্ড, আর কুয়ো ছাড়া, আর নদী ছাড়া। এরা বলছে এদের সায়রে জল উঠেছে। সত্য না মিথ্যা যাচাই করার দরকার নেই। যাচাই-এর অভ্যেসও তার নেই। সন্দেহ যখন জেগেছে, তখন এর বিহিত করা প্রয়োজন। আকাশ থেকে জল নামছে না তো শুকনো সায়র ভর্তি হলো কী করে? আচমকা গা ছমছম করে ওঠে তার। মায়া হতে পারে। শূদ্র জাতির ভিতরে এমন এমন কাণ্ড হয় যার কোনো ব্যাখ্যা নেই। এই যেমন বৃষ্টি হলো না অথচ সায়র জলে ভরে গেল। সে লাফ দিয়ে ঘোড়ার উপর উঠে গেল। আর এখানে থাকা প্রয়োজন নেই। যা জানার সে জেনেছে। এখন তাকে যেতে হবে প্রধান পুরোহিতের কাছে। এরা তুকতাক জানে, ভেলকি জানে—ইন্দ্রজালের হাওয়া তার গায়ে লেগেছে, পাপ বিনাশ করতে হবে। উদ্ধব যেমন আচমকা এসেছিল তেমনি আচমকা চলে গেল গোধূলি বেলায় ঘোড়া ছুটিয়ে।

তখন পরাশর বলল, এবার আর তো কেউ যাবে না উজ্জয়িনী ছেড়ে, পাতাল যখন জল দিল, আকাশ সমুদ্দুরও দেবে ঠিক, তাকে ডাকো, বুক চিরে রক্ত দাও মাঠে, মাঠের ভিতরে রতিলীলা কর জোয়ান-জোয়ানি, আকাশ জল দেবে।

সত্যি দেবে? জোয়ান একজন জিজ্ঞেস করে।

তাই তো জানি আমি, তোমরা জাননা?

জানি, শুনেছি এতে ফসল ভাল হয়।

হ্যাঁ, তাই করো, আমার যখন ছিল বয়স, এমন হয়েছিল।

অনাবিষ্টি?

এমন অনাবিষ্টি না, আষাঢ় প্রায় শুকনো যাচ্ছিল, বোশেখ জষ্টিতে বিষ্টি ছিল, তখন ঠাকুদ্দা হুকুম করল, তাতেই বিষ্টি এল, তোমরা পালন করো আর কোনো ভয় আছে মনে হয় না, জল নামবেই শুদ্ধ রতিকর্মের পর।

তখন এক জোয়ান বলল, কিন্তু মেয়েমানুষে এ চায়না।

চায়না মানে? পরাশর অবাক, যুবতী মেয়েমানুষ পুরুষ সঙ্গ করতে চায় না, তার মানে অন্য পুরুষে তার মন গেছে, তা যেতে পারে, কিন্তু রতিক্রিয়া হোক, কুমারী কন্যার সঙ্গে যদি কোনো জোয়ান পুরুষ মিলতে পারে, তা আরো শুভ, গোপনেই হোক, কিন্তু হোক, পরে তারা বিয়ে করুক, কুমারী কন্যার রক্তপাত হোক মা বসুমতীর উপর, আকাশ ভেঙে জল নামবে।

অন্য একজন বলল, এটাই আশ্চর্য, ও যেমন বলেছে তাই সত্যি, স্ত্রী লোকের পুরুষ সংসর্গের ইচ্ছা নাই ঠাকুদ্দা।

বুড়ো পরাশর অন্ধকারে তাকিয়ে থাকল। এমন কথা সে এ জীবনে শোনেনি, যুবতী স্ত্রী লোকের কামনা বাসনা চলে গেছে। পুরুষ সংসর্গের ইচ্ছা চলে গেছে। তা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে পুরুষমানুষগুলো কী নিয়ে থাকবে এখানে? নারী সংসর্গের অভাবেই তো তারা চলে যাবে নিরুদ্দেশে। তবু তার মনে হলো এ হয়ত ব্যক্তি বিশেষের সমস্যা। সে বলল, তোমরা আমার কাছে এস, মেয়েমানুষকে ভোলানোর উপায় বলে দেব, অশ্বগন্ধা পাতা চেন?

তখন আর একজন অন্ধকার থেকে বলল, আমাদেরও তো ইচ্ছা নাই।

ইচ্ছা নাই, স্ত্রীলোক সংসর্গের ইচ্ছা নাই?

না, একদিন যখন বউ বলল তার আর মন চায় না, সে যেন শুকিয়ে গেছে, তারপর থেকে আমারও যেন তাই মনে হতে লাগল।

বুড়ো পরাশর অন্ধকারে জলের শব্দ শুনতে চাইছিল। কিন্তু এতই ক্ষীণ তা যে নৈঃশব্দের ভিতরে মিশে গেছে। এই মানুষগুলিকে এখানে আটকে রাখা প্রয়োজন এই অনাবৃষ্টির দিনে। বৃষ্টি হয়ে গেলে এরা কেউ যাবে না। কিন্তু কবে যে বৃষ্টি আসবে? কোনো চিহ্নই নেই আকাশে। এখন কীভাবে সে ধরে রাখতে পারে? ক'দিন রত্নাকর সাগর খুঁড়তে গেল। জল উঠল। কিন্তু সেই জল কতটাই বা উঠবে, কতটাই বা ভরবে এই সরোবর? ক'দিন বাদেই তো এই জলের মায়া চলে যাবে। তখন আবার পালাতে চাইবে কেউ। একজন থেকে অনেকজন হবে। এখন স্ত্রীলোকই এদের আটকে রাখতে পারে। স্ত্রীলোকের মায়ায় এই সব পুরুষরা এখানে থাকতে পারে। কিন্তু স্ত্রীলোক যদি পুরুষ সংসর্গে না আসে, স্ত্রী যদি স্বামী সংসর্গ না করে, কেন মানুষগুলো থাকবে এখানে?

পরাশর বলল, স্ত্রী সংসর্গ না করলে আকাশে মেঘ আসবে না।

মন যে চায়না। আবার একই কথা বলল কোনো এক পুরুষ।

আর এক পুরুষ একই কথা বলল, কারোরই মন চায় না, না পুরুষ না স্ত্রীলোকের, ঠাকুদ্দা আমরা যেন খুব তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

কী বলছিস তুই? বুড়ো আর্তনাদ করে ওঠে।

হ্যাঁ, আমার তো নতুন বউ, বিয়ের পর আর বিষ্টি নাই, এখন আর আমাদের কোনো ইচ্ছাই হয় না ঠাকুদ্দা, অথচ এতদিনে আমার বউ-এর পোয়াতি হয়ে ওঠার কথা।

বুড়ো পরাশর যেন ত্রিকালজ্ঞের মতো বসে আছে অন্ধকারে, বলল, ওই রকম হয়, কেউ কেউ দেরিতে পোয়াতি হয়, তোর বউকে বল গাঁয়ে যারা এখন পোয়াতি তাদের কাছে যাতায়াত করতে, ভরা পোয়াতির কাছে গেলে পোয়াতি হওয়ার ইচ্ছে জাগবে।

লোকটা অন্ধকারে গাছের মতো দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল, এ জায়গা ছেড়ে যেতে হবে।

কেন এখেনে কি মানুষের জম্মো হয়নি, না হয় না, এখেনে কি স্ত্রী পুরুষের মিলন হয় না, না হয়তো তোরা সব জম্মালি কী করে, আমিই বা জম্মালাম কী করে, শোন তোর বউ কোনো পোয়াতির সখী হোক, পোয়াতি মেয়ে মানুষ যখন পা ছড়িয়ে বসে শোনাবে পেটের ভিতরে বাচ্চা কখন কীভাবে জানান দেয়, তখন সত্তুর বছরের বুড়িরও ফের মা হবার ইচ্ছে জাগে, কামনা ওঠে।

লোকটা বলল, তুমি বলছ সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি, পাঁচ ছ'মাসের পোয়াতি ঢের পাবি তুই, তার কাছে যাক তোর বউ।

তখন একজন বলল, আমিও পাঠাব।

আর একজন বলল, আমিও, একটার পর আর পোয়াতি হল না আমার বউ।

অন্ধকার থেকে অন্য একজন বলল, তাহলে আমিও পাঠাব, আমার প্রথমটা মরে যাবার পরে বউ শুধু কাঁদে, বলে পেটে ধরতে হয় কেমন করে তা তার মনে নেই।

বুড়ো শুনছিল। শুনতে শুনতে বুঝতে পারছিল ওদের বউদের গর্ভবতী করে তোলাই ওদের এখানে আটকে রাখার উপায়। গর্ভবতী বউকে নিয়ে কেউ নিরুদ্দেশ যাত্রা করবে না। কিন্তু সে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল এদের মনে ইচ্ছা আছে কিন্তু যেন পারছে না। মেয়ে-পুরুষ কেউ পারছে না।

তখন একজন বলল, কার ঘরে তাহলে পোয়াতি আছে?

আছে নিশ্চয়ই। অন্ধকারে জবাব দিল অন্যজন।

কোন ঘরে বলো দেখি? আর একজন জিজ্ঞেস করে।

অন্যজন বলল, মনে করে নিই।

মনে করে দ্যাখো দেখি, আমার তো মনে পড়ছে না।

তখন আচমকা সবাই চুপ করে গেল। অন্ধকার আরো নিঃস্তব্ধ হলো। অন্ধকার আকাশ দিয়ে বাদুড় চলে গেল আরো দূর অন্ধকারে। পেঁচা ডেকে উঠল কোথায় কোন গাছে যেন। বুড়োর গায়ে রোয়া কাটল। বুড়োও মনে করতে চাইল কার ঘরে পোয়াতি আছে। ভরা পেট, সাতআট মাস বয়স যার গর্ভের, তেমন মেয়েমানুষ কি চোখে পড়েছে ইদানীং? আজ, কাল, পরশু—গেল পূর্ণিমায়, তার আগের অমাবস্যায়, জৈষ্টর আগে বৈশাখে, সেই বৈশাখের আগে চৈত্রে, ফাল্গুনে, বসন্তে, শীতে, হেমন্তে? কই মনে পড়ছে না তো। কেন মনে পড়বে? সত্যিই তো খেয়াল করেনি। আগে যে পথে ঘাটে শ্লথগমনা গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের দেখা যেত তারা সবাই গেল কোথায়? বুড়ো যেন ভয় পেল, সে না পেরে জিজ্ঞেস করল, কার ঘরে পোয়াতি মেয়েমানুষ আছে কহো দেখি।

কেউ জবাব দিল না। দূরে কোনো গাছে শকুনের ছানা কেঁদে উঠল। তাতে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার আরো রহস্যময় হলো। বুড়োর মনে হলো অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে কেউ যেন তাদের কথা শুনছে। কী আশ্চর্য! আজ কিনা এত কষ্টের পর জল উঠল। আর আজই কিনা তার ভয় করতে লাগল। আজই কিনা খোঁজ হলো পোয়াতি মেয়েমানুষের, আর আজই কিনা মনের ভিতরে তাদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছেনা। অনাবৃষ্টিই এমন করে দেয় হয়ত। সবচেয়ে সুখের দিনে দুঃখের ছায়া এসে ঢেকে নেয় সবাইকে।

সত্তর

উদ্ধব নারায়ণ তার ঘোড়াটিকে নিয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নগরের ভিতরে প্রবেশ করেছিল। তারপর থেমে সমস্তটা গভীর ভাবে চিন্তা করেছিল। শুকনো সরোবর জলে ভরে গেছে এর চেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা যেন ঘটেনি আর তার জীবনে। সে সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি। ইন্দ্রজালের কথা ভেবেও সন্দেহ করতে ভুলল না। একটা সোনার কলসির কথাও শুনে এসেছে সে। তার ভিতর থেকে নাকি জল বেরিয়েছে। শূদ্র জাতি বড় রহস্যময়। তারা আলাদা থাকে, গোপনে কী করে তা তারাই জানে। পাষণ্ড ধর্ম অনুসরণ করে কিনা কে জানে! উদ্ধব ভাবতে লাগল ব্যাপারটি। জলের রহস্যটা কী?

ঘোড়াটিকে গাছে বেঁধে উদ্ধব এক পানশালায় ঢুকল। সেখানে প্রদীপের স্বল্প আলোয় খোলা আকাশের নীচে পান চলছিল। উদ্ধব পান করতে করতে সংবাদটি ছড়িয়ে দিল। কিন্তু একটু রং চড়িয়েই বলল। সংবাদটি পাঁচ কান না করে তা দিয়ে যদি নিজের কোনো সুবিধা হয় সেই চেষ্টাও তো উদ্ধব করবে। সবটা ভাঙবে কেন?

উদ্ধব বলল, ফেরার পথে আমি আজ এক জায়গায় বৃষ্টির মধ্যে পড়েছিলাম।

পানশালার লোক ক'জন অবাক, কোন বছর, কবের কথা বলছ?

কেন আজ, আজই তো।

শুনে উদ্ধবের পান-সঙ্গীরা খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল, বলল, পান করতে আসার আগে গঞ্জিকা সেবন করে এসেছ নাকি সতরি মশায়?

উদ্ধব মাথা নাড়তে লাগল, না, সত্যি কথাই বলছি, তবে বৃষ্টিটা অদ্ভুত?

কী রকম?

এক জায়গায় তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে, আমি সেই বৃষ্টির বাইরে।

তারপর?

বৃষ্টিতে একটা দীঘি জলে ভরে গেল।

তারপর?

বৃষ্টির জলে অনেক মানুষ ভিজতে লাগল।

তুমি ভেজোনি?

না আমি যত এগোই বৃষ্টি পিছিয়ে যায়।

কোথায় দেখলে?

এই তো আসার পথে, লোকের গলার স্বর শুনে ঘোড়া থামিয়ে এগিয়েছি, এগোতেই শুনলাম বৃষ্টির শব্দ, ঝমঝম বৃষ্টি, বাতাস ঠাণ্ডা, মেঘ গুরগুর করছে।

কোথা থেকে এলে এখন?

উদ্ধব মিথ্যে বলল, নদীর ওপার থেকে, পুব দিকে গিয়েছিলাম।

কেন গিয়েছিলে?

গুপ্তচরের খোঁজে, দেশে অনাবৃষ্টি, এই সময় শত্রু সুযোগ নেয়, আমি এখন ঘুরে বেড়াচ্ছি খুব, সবদিক নজরে রাখতে হচ্ছে তো, সেনাপতির নির্দেশ তাই, তিনি বোধহয় কাল ফিরবেন।

পরের কথাগুলো কেউ শুনল না। সবাই জানে উদ্ধবনারায়ণের বাগাড়ম্বর বেশি। কিন্তু পুবদিকে সত্যি যদি এমন হয়ে থাকে তবে তা আশ্চর্য ঘটনাই বটে। অবশ্য উদ্ধবকে বিশ্বাস করা যায় না। চোখে মুখে মিথ্যে কথা বলতে তার তুল্য পারদর্শী এই নগরে আর একজনও নেই। সুতরাং একজন বলল, স্বপ্নে এইরকম হয়, তুমি কি পথে নিদ্রা গিয়েছিলে?

ঘোড়ার উপর নিদ্রা যাব কী করে?

শুনেছি বীরেরা তা পারে, যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়ার উপর নিদ্রা যায়।

উদ্ধব বলল, আমিও পারি, তবে আজ তা হয়নি।

পথে কোনো গাছের ছায়ায়ও তো নিদ্রা যেতে পার, স্বপ্নে এমন হয়।

না, না, পথিমধ্যে আমি কখনো নিদ্রা যাইনা।

তখন পানশালার কয়েকজন ধরে নিল উদ্ধব হয়ত গঞ্জিকা সেবন করেছিল। এমন হতে পারে দিবসেই সিদ্ধি খেয়ে পড়েছিল কোথাও। সেই সব সন্দেহ তারা নেশার ঘোরে প্রকাশ করলে উদ্ধব মাথা নাড়তে লাগল, আশ্চর্য ব্যাপার, আকাশে মেঘ ডাকছিল সত্যি—।

স্বপ্নেই তো এমন হয়।

উদ্ধব চুপ করে থাকে। তখন সঙ্গীদের একজন বলল, অনেক সময় স্বপ্ন সত্য হয়ে যায়, তার জীবনে তা বার বার ঘটেছে।

উদ্ধব গর্জন করে উঠেছে, এটা স্বপ্নই নয়।

লোকটি মেনে নিল। মেনে নিতেই হবে। উদ্ধব রাজকর্মচারী, তার কত ক্ষমতা! কিন্তু লোকটা তার স্বপ্নের কথাটাও বলতে ভুলল না। সে একদিন মুক্তা বিপনির অধিকারী বুড়ো দুর্মুখের দ্বিতীয়া স্ত্রীকে স্বপ্নে পেয়েছিল। তার হাত ধরেছিল স্বপ্নের ভিতরে। তারপর তা সত্য হয়ে গেছে। একদিন অপরাহ্নে সে যখন একা একা হেঁটে যাচ্ছিল পথ দিয়ে তখন দেখল জানালায় সেই তরুণী বধূ দাঁড়িয়ে।

উদ্ধব থামিয়ে দিল লোকটাকে, এর সঙ্গে বৃষ্টির সম্পর্ক কী?

লোকটা মাথা নাড়ল, কোনো সম্পর্কই নেই, তখন তো ছিল বসন্তকাল, আমি দুর্মুখ শেঠীর বউ-এর দিকে তাকালাম পথে দাঁড়িয়ে, ইশারা করলাম—।

লোকটা বানায়। এই সব কথাগুলোও বানাচ্ছে যে তা জানে উদ্ধব। কিন্তু এর ভিতরে কোনো ইঙ্গিত আছে কিনা তার প্রতি তা ধরতে না পেরে সে গর্জে ওঠে, আমি বৃষ্টি দেখে এলাম, তুমি অন্য কথা বলছ কেন, দুর্মুখের বউ অতি সতী সাধ্বী স্ত্রী লোক. আমি জানি।

লোকটা গুটিয়ে গেল, তারপর চাপা গলায় বলল, আসল কথাটা বলি, আমি এমন স্বপ্নও দেখেছি যে তুমি শিপ্রানদীতে ময়ূরপঙ্খী নৌকোয় ভেসে আছ, তোমার পাশে ওই বুড়োর বউ, সত্য হয়েছে কি?

উদ্ধব এই সমস্ত কথায় ভোলেনা। তার সমস্তটাই গোপন। বুড়ো দুর্মুখের বউকে দু'একবার ইঙ্গিত করার চেষ্টা যে অশ্বারোহী উদ্ধব করেনি তা নয়, কিন্তু বুড়ো তো তার বউকে চোখে চোখ রাখে।

রাত্তিরে নাকি বুড়ো ঘুমোয়ই না। তার পক্ষে অভিসারে বেরোন সম্ভব নয়। যাক, সে কথা তো অন্য কথা। উদ্ধব যে বৃষ্টি দেখে এসেছে সেই কথার ভিতরে এই কথা ঢুকবে কেন?

লোকটা বলল, আমি বৃষ্টির স্বপ্ন দেখিনি অনেকদিন, দেখলে ঠিক সত্য হতো।

উদ্ধব বলল, না আজকেরটা সত্য।

তাহলে কোনো কুহকিনীর পাল্লায় পড়েছিলে তুমি, তারা এমন পারে, ঘোর অমাবস্যার রাত্তিরে আমাকে পূর্ণিমার চাঁদ দেখিয়েছিল এক ঐন্দ্রজালিক।

উদ্ধব বলল, ঐন্দ্রজালিকরা অমন পারে, কিন্তু আমি যা দেখেছি তা সত্য।

পানশালার লোকটি বলল, ইন্দ্রজাল তো সত্যই মনে হয়।

উদ্ধব হঠাৎ রেগে যায়, তুমি কে হে, কী নাম তোমার?

লোকটি ঈষৎ ভয় পায়, নাম কী হবে?

বল না কী নাম তোমার?

তুমি কি আমাকে চেন না; এই পানশালায় কি আমাদের প্রায়ই দেখা হয় না?

হয়, কিন্তু তোমার নামটি তো জানা প্রয়োজন।

কেন, আমার নাম কি তুমি আগে শোনোনি?

কবে শুনলাম?

প্রায়ই তো শুনে থাকো, জিজ্ঞেস করো না?

করি, কিন্তু তুমি কি জবাব দাও?

অনেকবার বলেছি, তুমি শুধু ভুলে যাও। বলে লোকটা মাথা নিচু করে থাকে।

উদ্ধব বলল, এত মানুষের নাম মনে রাখতে হয়, দু চারটে তো ভুলতেই পারি।

তাহলে ভুলেই থাকো।

না, আমার খোঁজ নিতে হবে, এখন দিনকাল খারাপ যাচ্ছে, এমন সময়েই তো বিপদ আসে বিদেশী শক্তির কাছ থেকে, গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে নিশ্চয়ই দু'চারজন, তাদের খোঁজা হচ্ছে, কী বুঝলে?

লোকটির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মৃদু আলোয় উদ্ধব দেখল লোকটি ভয় পেয়েছে মনে হয়। এতে উদ্ধবের মনের বল যেন ফিরল। তার হাতে কত ক্ষমতা! সে রাজসভার লোক, সে যদি বলে সূর্য পশ্চিমে ওঠে, তাই তো স্বীকার করার কথা এই সমস্ত মানুষের। উদ্ধব বলল, কোথায় সেই ঐন্দ্রজালিক?

কোন ঐন্দ্রজালিক?

যে তোমাকে অমাবস্যার রাতে চন্দ্রোদয় দেখিয়েছিল।

লোকটা বলল, রাতটা অমাবস্যা ছিল কিনা মনে নেই।

তুমি তো বললে অমাবস্যা।

ভুলও তো হয়।

ভুল হবে কেন, সেই ঐন্দ্রজালিক কে?

লোকটি বলল, সে তো বহুদিন আগের কথা।

কতদিন আগের কথা, তখন কি খরা চলছিল?

বোধহয় বোশেখ মাস, এমনিতেই তখন বৃষ্টি ছিল না।

উদ্ধব সন্তুষ্ট হয় না। সে জানে সন্তুষ্ট হলেই জনসাধারণ পেয়ে বসে। রাজকর্মচারীর অসন্তোষই সাধারণ নাগরিকদের ভিতরে ভয়ের সঞ্চার করতে পারে। আর তা করা খুব জরুরি। না হলে শাসন করা যাবে কী ভাবে? উদ্ধব জিজ্ঞেস করে, ঐন্দ্রজালিক কোন দেশের মানুষ ছিল, তাড়াতাড়ি বলো।

উজ্জয়িনীর মেলায় এসেছিল।

কই আমি তো জানি না।

অনেকদিন আগের কথা এসব।

অনেকদিন আগের কথা হলে আমি জানব না কে বলল?

লোকটি চুপ করে থাকে। তাতে উদ্ধব আরো অসন্তুষ্ট হয়, বলল, তুমি সমস্ত কথার ঠিকঠাক উত্তর দিচ্ছ না, বন্দি হয়ে যেতে পার।

আঁতকে উঠল সে, বলল, আমার অপরাধ?

যা জিজ্ঞেস করছি, উত্তর দাও, ঐন্দ্রজালিক কোথায়?

জানি না, তাকে আর দেখিনি।

কেমন দেখতে তাকে?

দীর্ঘকায়, প্রবীণ পুরুষ।

উদ্ধব জিজ্ঞেস করে, কোন দেশের?

লোকটি তখন বলল, ঐন্দ্রজালিক-টালিক সত্য নয়, এমনি বললাম।

তাহলে দীর্ঘকায় ব্যক্তি কে?

কেউ না। লোকটি বলে।

শুনে উদ্ধব গর্জন করে ওঠে, তুমি বিভ্রান্ত করছ আমাকে, দীর্ঘকায় ব্যক্তি কে, বলো ঠিক করে, না হলে তুমি বন্দি হবেই, এখন অবন্তীদেশে খরা চলছে, অনাবৃষ্টিতে নানারকম গুপ্ত শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে, তাদের রোধ করতে হবে, এরপর নানারকম বিধি বিধান চালু হবে নগরে, ইচ্ছা মতো চলাফেরা করা চলবে না, তুমি কি পাষণ্ড ধর্মের অনুরাগী?

লোকটি এবার উঠে দাঁড়াল, আমি যাই, সুরার নেশাই নষ্ট হয়ে গেল, বাইরে তো অন্ধকার, চাঁদ কখন উঠবে তাও জানিনা, আদৌ উঠেছে কিনা তাও জানিনা, অন্ধকারটা অসহ্য লাগে।

তুমি তো আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না।

লোকটি চুপ করে থাকল। বসেই থাকল আবার। লোকটির মনে হচ্ছিল উদ্ধবনারায়ণকে অগ্রাহ্য করে চলে যায়। কিন্তু কেমন ভয় ভয় লাগছিল। উদ্ধব লোকটি ভীষণ খল প্রকৃতির। লোকের উপকার না করতে পারুক, লোকের সর্বনাশ করতে ওর তুল্য ব্যক্তি এই নগরে আর নেই। উদ্ধব এখন শ্বাস নিচ্ছে। সেও চুপ করে আছে। কিছু সময় দুজনেই নিশ্চুপ, তারপর উদ্ধবই আবার গর্জে উঠল প্রায় সারমেয়র মতো, জিজ্ঞেস করল, সেই লোকটি কি ধ্রুবপুত্র?

লোকটি অবাক, জিজ্ঞেস করে, কোন লোকটি?

ঐন্দ্রজালিক?

হতে পারে।

তাহলে তো তোমার কথা ভুল, সে প্রবীণ নয় নবীন।

হ্যাঁ, তাই-ই।

ঠিক করে বলো, সে কী ইন্দ্রজাল দেখিয়েছিল?

তখন লোকটি জিজ্ঞেস করল, সে দীর্ঘকায় না খর্বকায়?

মধ্যম উচ্চতার, উদ্ধব উত্তর দেয়।

হ্যাঁ তাই-ই, মধ্যম উচ্চতার এবং নবীন, প্রবীণ নয়।

এইরকম অর্থহীন কথাবার্তা হয়ে যাচ্ছিল উদ্ধব ও তার সুরাপায়ী সঙ্গীর ভিতরে। উদ্ধব এতক্ষণে একটু যেন সন্তুষ্ট হয়েছে। লোকটি ধ্রুবপুত্রর নাম জড়াতে সাহায্য করেছে। ইন্দ্রজাল দেখিয়েছিল নাকি ধ্রুবপুত্র? সে কি তাও জানত? সে বলল, ধ্রুবপুত্র এখন কোথায় বলতে পার?

মাথা নাড়ে লোকটি, বলল, এই পানশালায় তো নেই।

পানশালায় কেন থাকবে, সেকি এখানে আসত?

আসত তো নিশ্চয়, কে এখানে আসে না, পুরুষমানুষ অথচ সুরাপান করে না।

উদ্ধব চুপ করে গেল। একটু হতাশা যেন আসছে মনের ভিতরে। দুরাচারী ধ্রুবপুত্র নগর থেকে নির্বাসিত হয়েও নগরেই যেন রয়ে গেছে। উদ্ধবের গা হাত পা শক্ত হয়ে গেল। কিন্তু তা ধীরে ধীরে আবার এলিয়ে গেল। শত্রুকে যদি হাতে না পাওয়া যায় তার বিরুদ্ধে যে দাঁড়ায় কীভাবে? একটি কাজ হতে পারে গন্ধবতীকে অপহরণ করে রাক্ষস মতে বিবাহ করা। কিন্তু তার জন্য আরো শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

লোকটি বলল, তাহলে এবার যাই।

কোথায় যাবে?

অন্ধকারে বাড়ি ছাড়া আর যাব কোথায়?

উদ্ধব পা ছড়িয়ে দিল, বলল, বৃষ্টির কথাটা বলা শেষই হলো না।

লোকটি বলল, তোমার সৌভাগ্য তুমি বৃষ্টি দেখেছ।

উদ্ধব বলল, আশ্চর্য! এভাবে বৃষ্টি নামলে তো খরা আর থাকবে না।

থাকবে না, না থাকলে বেঁচে যাবে সবাই।

উদ্ধব চুপ করে থাকে, একটু সময় নিয়ে, বলল, নাগরিকদের স্বার্থে, উজ্জয়িনী নগরের স্বার্থে, অবন্তীদেশের স্বার্থে অনাবৃষ্টিই থাকা প্রয়োজন মনে হয়।

কেন, কী প্রয়োজন?

অত জানতে হবে না, মোট কথা ভয়ানক এক বৃষ্টি দেখেছি আমি, তাতে একটা বড় দীঘি জলে ভরে গেছে— মেঘের কী গুরুগুরু ডাক!

এতক্ষণে যেন পানশালার অন্যান্যরা কথাটা ভাল করে শুনল, উল্লাসে উঠে দাঁড়ায়, কোথায় কবে কখন, কোন দীঘি?

উদ্ধব মাথা নাড়তে নাড়তে ওঠে, সব তো বলা যাবে না, আগে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ জানুন।

কিন্তু উদ্ধব না বললেও তার কথা তার সঙ্গে বেরিয়ে এল পানশালা থেকে। বয়ে আনল অন্য সুরাপায়ীরা। কথাগুলো খোলা আকাশের নীচে ছড়িয়ে যায়। বৃষ্টির কথা তো, ছড়াতে দেরি হল না। মেঘের মতোই ছেয়ে গেল উজ্জয়িনীর আকাশে। কথা চলে গেল গণিকালয়ে, বণিকের গৃহে, প্রাসাদে, মহাকালমন্দিরে। সেদিন সেনাপতি বিক্রম ফিরে এসেছিলেন নগরে। তাঁর বাহিনী পথে পথে ঘুরছে, শিকার খুঁজছে। তারা গিয়েছিল দূরদেশ থেকে আসা বণিক, তীর্থযাত্রীদের রক্ষা করতে, কিন্তু কে আর কাকে রক্ষা করে, রাজার নির্দেশ কেই বা পালন করে। প্রধান পুরোহিত যখন বৃষ্টির কথা শুনে খোঁজ নেবেন ভাবছিলেন, তখনই সেনাপতি ফিরেছেন নগরে। ফিরে মহাকাল দর্শনই তো বিধি, তাই মন্দিরে প্রবেশ করে শুনলেন বৃষ্টির এক অলীক কাহিনী।

একাত্তর

মহাকাল দর্শনের সময় প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে মহাসেনাপতি বিক্রমের সাক্ষাৎ হলো মহাকালের সামনে, গর্ভগৃহে। মহাসেনাপতি বিক্রম বয়সে নবীন, দীর্ঘদেহী, প্রশস্তবক্ষ, বৃষস্কন্ধের পুরুষ। তাঁর কণ্ঠস্বর ভারী, গম্ভীর, ভীষণ পৌরুষ দীপ্ত। মাথায় ঘন কুঞ্চিত কেশ, চোখ দুটি উজ্জ্বল, দ্যুতি সম্পন্ন, গাত্রবর্ণ গৌর। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শরীর তাঁর, দুটি বাহু, উরু যুগল পেশীবহুল। মাটিতে বসেছেন বিক্রম মেরুদণ্ড মহাকাল মন্দির চূড়ার মতো টানটান রেখে। তাঁর সামনে প্রধান পুরোহিতকে বিসদৃশ দেখায়। দ্বিজদেব বৃদ্ধ, এই নবীন পৌরুষের সামনে অতিবৃদ্ধ, খর্বাকৃতির, ঈষৎ ন্যুব্জও হয়তবা। তিনি তামাটে বর্ণের মানুষ, মাথাটি কেশবিরল, মুখ গহ্বর দন্তশূন্য, কিন্তু দুচোখ ধূর্তের মতো সদা সঞ্চরণশীল। গর্ভগৃহের দ্বাররুদ্ধ। মহাকালের যে দাসী ছিল, তাকে সরিয়ে দিয়েছেন পুরোহিত। ভগবান মহাকাল এবং পুরোহিত ও সেনাপতি—কাউকেই চামর ব্যজন করছেনা দেবদাসী।

প্রধান পুরোহিত জিজ্ঞেস করলেন, আচমকা চলে এলেন যে, পশ্চিমে অপরা সাগরের দিকে রওনা হয়েছিলেন না?

হ্যাঁ। রূপবান রাজপুরুষ বললেন, আমি এখন উজ্জয়িনী ছেড়ে থাকতে পারছি না।

তাহলে বণিকদের কী হবে?

আমি বণিকদের রক্ষা করব কেন, সেনাবাহিনীরই বা কী দায়?

তাহলে কেন গেলেন?

রাজা পাঠিয়েছিলেন আমাকে উজ্জয়িনী থেকে সরিয়ে দিতে।

তিনি কি আপনার অভিপ্রায় জেনে গেছেন?

জানি না, হতেও পারে, অনুমান করতে পারেন, রানীর প্রত্যাখ্যান রাজাকে সন্দেহপ্রবণ করে তুলেছে মনে হয়।

বৃদ্ধ প্রধান পুরোহিত চুপ করে থাকলেন অনেকটা সময়, তারপর আচমকা বললেন, আপনি কি প্রস্তুত?

হ্যাঁ।

মেঘ ডাকলে ভয় পাবেন না? বৃদ্ধ পুরোহিত জিজ্ঞেস করলেন।

রূপবান রাজপুরুষ হাসলেন, আমার ভয়ে মেঘ ডাকবেই না।

মেঘের মায়ায় আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করবেন না?

আমার মনে মায়া জন্মাবে না, আমি চাই অনাবৃষ্টি চলুক।

অনাবৃষ্টিতে নগরের মানুষ নগর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

যাওয়া আসা চলবে, নগরেও আসছে অন্য জায়গার মানুষ, অনাবৃষ্টিতে ভয় পেয়ে।

বৃদ্ধ পুরোহিত বললেন, যদি বৃষ্টি এসে যায়?

তার আগে সমস্ত কিছু হয়ে যাওয়া দরকার।

আপনার বাহিনী কি যবন বণিকদের রক্ষা করছে?

না লুণ্ঠন করছে, লুণ্ঠনের স্বাধীনতা দিয়ে এসেছি যাতে তারা এই পর্যন্ত না আসতে পারে, আমার কেমন মনে হচ্ছে বণিকদের পিছু পিছু যেন বর্ষার মেঘ তাদেরই অনুসরণ করবে।

প্রধান পুরোহিত তাঁর জরাগ্রস্ত হাতটি রাজপুরুষের মাথায় রাখলেন, বললেন, যদি বণিকরা না আসে, যদি সুভগ দত্ত নিষ্ক্রান্ত হন তবে উজ্জয়িনী যে শেষ হয়ে যাবে, দেওয়া নেওয়ার ইতি হবে।

আমি আবার গড়ে তুলব ; জানি বর্ষা আসবেই।

কী করে আসবে সূর্যের রথের চাকা যে বসে যাচ্ছে।

আসতে আসতে শুনেছি, কথাটা বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে, কথা কি আপনার তৈরি?

প্রধান পুরোহিত বললেন, আমি উন্মাদ বৈদ্যকে বলেছিলাম, এমনি, রহস্য করে, কিন্তু সে ধরে নিল ওইটাই সত্য, এখন নগরের সবাই ওই কথা বলাবলি করছে।

রাজপুরুষ স্থির হয়ে মহাকালের প্রস্তর বিগ্রহে তাকিয়ে আছেন। তিনি আর কোনো কথা বলছেন না। বৃদ্ধ পুরোহিত তাঁকে দেখছিলেন, দেখতে দেখতে বললেন, মহারাজ আপনার কপালে রাজটিকা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, জয় হবেই।

বৃদ্ধ পুরোহিতের সম্ভাষণে সেনাপতির দেহ শিহরিত হলো। এই সম্ভাষণ শোনার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন অনেকদিন। প্রথম সম্ভাষণে তার চোখে প্রসন্ন ভাব এল, তারপর পরিতৃপ্তির ভাব এল। তিনি তাকিয়ে থাকলেন মহাকাল বিগ্রহেরই দিকে। মহাকালই পারেন তাঁর ভাগ্যকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে। ওই সম্ভাষণ সত্য করে তুলতে। তখন বৃদ্ধ পুরোহিত ফিসফিস করে বললেন, এই কথা তো সত্য, আপনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বৃষ্টি নামবে, নামবেই।

কতকালই বা বৃষ্টিহীন হয়ে থাকবে এই দেশ।

হ্যাঁ, আপনার অপেক্ষায় আছেন যেন মহাকাল, আপনি রাজ্যের ভার হাতে নিলে তিনি বন্দি মেঘকে মুক্ত করে দেবেন উজ্জয়িনীর আকাশে, আকাশ আবার মেঘান্ধ হবে, আপনি আসুন উজ্জয়িনীর সিংহাসনে।

মহাসেনাপতি শুনছিলেন। বৃদ্ধের কথায় তিনি নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিলেন। ভবিষ্যৎ নিয়েও নিঃসন্দেহ হচ্ছিলেন। তাঁকে চেয়েছিলেন শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত। কিন্তু শ্রেষ্ঠীই ত্যাগ করে যাচ্ছেন উজ্জয়িনী। তিনি তাঁর ভিতরে সিংহাসন লিপ্সার জন্ম দিয়ে গেছেন। সেই আকাঙ্ক্ষা, লিপ্সা যেন কামের মতোই অন্ধ, দিগ্বিদিকহীন, না পূরণ হলে তিনি শান্ত হবেন না।

মহাসেনাপতি বিক্রম বললেন, সেনাবাহিনী কয়েকদিনের মধ্যে ফিরে আসবে, এখন সিংহাসন অধিকার করার ক্ষেত্র প্রস্তুত, দিকে দিকে হাহাকার উঠেছে, মানুষ এক জায়গা ছেড়ে আর একজায়গায় চলে যাচ্ছে মেঘের আশায়, রাজনিন্দায় সবদিক মুখরিত।

বৃদ্ধ বললেন, পৌরুষহীন রাজা যতদিন সিংহাসনে থাকবেন, ততদিন মানুষের দুর্গতি, মহারাজ রাজকর্মচারী উদ্ধবনারায়ণ এক অদ্ভুত কথা বলেছে ক'দিন আগে, নগরে রটে গেছে, তাকে আমি ডেকেছি, সে আসবে এইবার।

সে তো সামান্য সত্রি।

সামান্য সত্রিও কত কাজে লাগে, সে নাকি বৃষ্টি দেখেছে কোথায়, জানতে হবে সে কার পক্ষে,

কার হয়ে এই কথা রটিয়ে দিয়েছে, রাজার কর্মচারী তো নিশ্চয়, কেন রটালো এই মিথ্যা, কে বলেছে রটাতে? কী থেকে কী হয় কে জানে, এখন যদি সত্যি বৃষ্টি নামে তাহলে সমূহ সর্বনাশ।

উঠে দাঁড়ালেন সেনাপতি। তিনি হাত বাড়ালে তাঁকে ধরে বৃদ্ধ পুরোহিতও উঠে দাঁড়ালেন। অর্গলমুক্ত করে তাঁরা বাইরে এলেন। দূরে দেবদাসী ললিতা মাথা নিচু করে বসেছিল। আরো দূরে সুভদ্রা। দ্বার মুক্ত হওয়ার শব্দে দুজনেই উঠে দাঁড়িয়েছে। ললিতার দিকে তর্জনী তুলে বৃদ্ধ বললেন, এই দেবদাসীকে রাজা ধর্ষণ করেছিলেন।

সেনাপতি চলছিলেন। দাঁড়ালেন না। তাঁর ভিতরে রাজকীয় ভাব আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। বৃদ্ধ পুরোহিত তাঁকে অনুসরণ করতে করতে বললেন, আমার ঘরে চলুন মহারাজ, সুভদ্রাদাসী আয়, চামর ব্যজন করবি উজ্জয়িনীর অধিপতিকে।

তাঁরা দু'জনে ঘরের সামনে এসে দেখলেন উদ্ধবনারায়ণ হাজির। সেনাপতিকে দেখে উদ্ধব গুটিয়ে গেল। তার মুখখানি শুকিয়ে যেন চিমসে হয়ে গেল। সে মাটিতে বসে মাথা নত করল সেনাপতির পায়ে, নিম্নস্বরে বলল, প্রভু, আমি উদ্ধব, আমি নির্দোষ।

প্রধান পুরোহিত যেন তাঁর নিজের পায়েই নত হতে দেখেছেন উদ্ধবকে, বললেন, কোথায় বৃষ্টি, অনাবৃষ্টিতে নগর জ্বলছে, তুই নাকি বৃষ্টি দেখে এসেছিস?

হ্যাঁ প্রভু।

সত্যিকথা বল, না হলে তোর শিরচ্ছেদ হবে।

উদ্ধব মাথা তুলল না। মাটিতে রাজপুরুষের পায়ে মাথা ঠেকিয়েই থাকল। সেনাপতি দেখলেন এই সত্রিই যেন বৃদ্ধ পুরোহিতের যৌবনকাল, অতীত। আর বৃদ্ধ পুরোহিত যেন এই সত্রির দূর ভবিষ্যৎ। সত্রিকে তিনি দেখেছেন, কিন্তু এভাবে দ্যাখেন নি। এমন ভীরু! তিনি উদ্ধবের পিঠে হাত দিলেন নিচু হয়ে, শান্ত গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কী দেখেছিস?

জল। উদ্ধব কাঁপছিল। তার মনে হচ্ছিল ঘাড়ের কাছে খড়্গ এসে গেছে। শুধু নেমে আসার অপেক্ষা। তার চোখে জল এসে গেল। হে মহাকাল! জল দেখায় কী অপরাধ, বৃষ্টির কথা বলায় কী অপরাধ?

কোথায় জল? বৃদ্ধ পুরোহিত গর্জমান হয়ে উঠতে চাইলেন।

শূদ্রপল্লীতে।

উদ্ধবের জবাব পেয়ে পুরোহিত তাকালেন সেনাপতির দিকে। দুজনের ভিতরে দৃষ্টি বিনিময় হলো। পুরোহিত ভাবলেন আবার শূদ্রপল্লী। শূদ্রপল্লী দানবের আবাস। যমদূতের আবাস। সেখানে বৃষ্টি হয়েছে? কবে? এই কথা সত্য হতে পারে না। যদি সত্য হয়, শূদ্রপল্লী ধ্বংস করে দেওয়া প্রয়োজন। কোথাও যখন বৃষ্টি নেই, শূদ্রপল্লীতে কী করে বৃষ্টি হয়? এই রটনার পিছনে কোনো গভীর উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকতে পারে। শূদ্র জাতিকে বিশ্বাস নেই। এখন এই দেশ এক চরম পরিবর্তনের মুখে। অনাবৃষ্টিই চলবে এই সময়।

বৃষ্টি হলো কেউ জানল না?

বৃষ্টি না প্রভু, জল, রত্নাকর সাগরে জল উঠেছে।

কে বলল? পুরোহিত জিজ্ঞেস করেন, বিস্মিত হয়েছেন স্পষ্ট।

আমি দেখেছি।

কী করে উঠল?

জানি না, ওরা তো ইন্দ্রজাল জানে, তন্তর মন্তর।

সেনাপতি এবার উঠতে বললেন উদ্ধবকে। উদ্ধব উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল। সেনাপতির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার সাহস তার নেই। সেনাপতি বললেন, কাল প্রত্যুষে দেখে এসে সংবাদ দিবি কী করে জল উঠল।

উদ্ধব বলল, ইন্দ্রজালে।

তুই গিয়ে শুনে আসবি, ঐন্দ্রজালিক কে, জেনে আসবি।

হ্যাঁ প্রভু।

দ্বিজদেবকে সংবাদ দিবি।

দেব প্রভু।

এই কথা যেন আর কেউ না জানে।

জানবে না প্রভু।

জানলে তোর শিরচ্ছেদ হবে।

হবে প্রভু। উদ্ধব আবার হাঁটু মুড়ে বসে মাটিতে মাথা ছোঁয়াল। সে বুঝতে পারছে কিছু একটা হতে যাচ্ছে নগরে। কী তা ধরা যাচ্ছে না। কিন্তু এই সময় তাকে সতর্ক থাকতে হবে।

প্রধান সেনাপতি বিক্রম এবার পুরোহিতকে বললেন, আপনার আর কিছু জিজ্ঞেস করার আছে লোকটাকে?

বৃদ্ধ পুরোহিত বললেন, আছে, ওকি সত্যিই দেখেছে?

উদ্ধব মাথা নামিয়ে বলল, হ্যাঁ প্রভু।

মনে করে দ্যাখ, নিজে দেখেছিস না কানে শুনেছিস?

উদ্ধব চুপ করে থাকে। কী বলবে বুঝতে পারছে না। তবে তার অনুমান বলল, প্রধান পুরোহিত এবং সেনাপতি কেউ চান না বৃষ্টি হোক, সুতরাং বৃষ্টি হয়েছে এই রটনা তাঁদের মনঃপুত হবে না। সে ভাবল আমি আর কেন অপ্রিয় হই রাজশক্তির কাছে, অম্লান মুখে বলল, প্রভু আমি শুনেছি।

কে বলেছে?

একটা লোক।

তারপর?

শুনেছি মাত্তর, কথাটা কী করে যে আমার নামে রটে গেল।

বৃদ্ধ পুরোহিত বললেন, সত্য কথাটা এতক্ষণ বলিসনি কেন, তুই নগরে রটিয়ে দে কথাটা সত্যি না, কথাটা যে লোকটা রটিয়েছে তাকে বন্দি কর।

উদ্ধব বলল, যা বলেন প্রভু।

আর খোঁজ নিয়ে আয় আসলে কী হয়েছে।

সরোবরে জল হয়েছে।

তুই দেখেছিস?

হ্যাঁ প্রভু।

নগরে রটিয়ে দে সব মিথ্যে, অনাবৃষ্টি চলছে।

প্রভু ঐন্দ্রজালিক কেউ......? উদ্ধব কথা শেষ করতে পারল না ভয়ে। প্রধান সেনাপতির দুটি চোখ তাকে নিরীক্ষণ করছিল। ঘাড়ে সিরসির ভাব টের পায় উদ্ধব।

ঐন্দ্রজালিককে ধরে আন। পুরোহিত বলেন।

সে নগরে নেই। উদ্ধব বিড়বিড় করে।

যা এবার আর যেন বৃষ্টির কথা না শোনা যায়, যে বলবে বৃষ্টি হয়েছে তার শিরচ্ছেদ হবে, কী বুঝলি।

বুঝেছে সব উদ্ধব। বুঝতে পারছে সুরা নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। পানশালায়, গণিকালয়ে, কোথাও মুখ খোলা যাবে না। কিন্তু তার মহাসৌভাগ্য। প্রধান সেনাপতি তাকে কাজের ভার দিয়েছেন। তার মানে তার গুরুত্ব তৈরি হয়েছে। সে মনে মনে ভাবল এই সুযোগ হারালে চলবে না। এই তার উন্নতি শুরু হলো। উত্তেজিত উদ্ধব মহাকাল মন্দির থেকে বেরিয়ে ঘোড়াটিকে নিয়ে গন্ধবতী তীরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। যেন কারোর জন্য অপেক্ষা করছে সে। একজনকে বন্দি করতে হবে। কাকে বন্দি করবে সে? পানশালার সেই লোকটাকে? কিন্তু তাকে তো আর দেখা যাচ্ছে না। তার নামও জানে না উদ্ধব। সে ভাবতে লাগল কী ভাবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ভালভাবে পালন করতে পারে সে।

বাহাত্তর

ক'দিন ধরে শূদ্রপল্লীর ঘরে ঘরে খোঁজ নেওয়া হলো। কোন ঘরে পোয়াতি মেয়েমানুষ আছে। কী আশ্চর্য। পোয়াতি হওয়ার উপযুক্ত নারীর অভাব নেই কোনো ঘরে, তার উপযুক্ত পুরুষের অভাব নেই

কোনো ঘরে, কিন্তু একজন গর্ভবতীর দেখাও মিলল না। বুড়ো পরাশর নিজে হেঁটে হেঁটে ঘুরল শূদ্রপল্লী। হতাশ হতে লাগল সে। জীবনে এমন ঘটনা কখনো দ্যাখেনি। শুধু কি গর্ভবতী নারী, সদ্যোজাত শিশুও নেই কোনো ঘরে।

এক বুড়ি বলল, বউ হয়ত বাঁজা, ছেলের জন্য আর একটা বউ আনব আর একবছর দেখে, বিয়ের দু-তিন মাসে সবাই পোয়াতি হয় যখন এতদিন গেলেও সে পেটে ধরল না....।

ঘুরতে ঘুরতে বুড়ো খোঁজ নিল, বাচ্চা হয়েছে কোন ঘরে?

জানিনা।

কোনো ঘরেই কোনো শিশুর জন্ম হয়নি অনেকদিন, এতদিন তা খেয়াল করেনি কেউ, আজ যেন সবাই চোখে দেখতে পেল। এর মানে বহুদিন কোনো নারী গর্ভবতী হয়নি এই পল্লীতে। গর্ভবতী না হওয়া মানে সেই সন্ধ্যায় যে কথাগুলি বলেছিল পুরুষরা তাই-ই সত্য। নারী পুরুষ উভয়ের কামনা বাসনা অন্তর্হিত হয়েছে সকলের অজ্ঞাতে।

বুড়ো একা একা বসে থাকল দূরের বটবৃক্ষটির গোড়ায়। সরোবরটিতে জল উঠেছে অনেক। বুড়ো মনে মনে ভাবে, সোনার কলসের মুখ খুলে গেছে, এখন আর ভয় নেই। কিন্তু ভয় যে অন্য জায়গায়। কেউ তো থাকবে না ওই জলের মায়ায়ও। যদি কামনাবাসনা না থাকে, তবে কী নিয়ে বাঁচবে মানুষ? আকাশে তাকায় বুড়ো। বহু উঁচুতে চক্রাকারে পাক খাচ্ছে শকুনের পাল। দেখতে দেখতে চোখ বুঁজে এল বুড়ো পরাশরের। যদি না বৃষ্টি আসে, এমন হবে। অনাবৃষ্টিতে মানুষ তাহলে সন্তান জন্ম দিতে ভুলে যায়। অনাবৃষ্টি মানুষের কামনাবাসনা শেষ করে দেয়। বুড়োর চোখের সামনে ধূসর এক ছায়া বিস্তৃত হতে থাকে। তার মনে হলো আর বেঁচে থেকে লাভ নেই। জমিতে ফসল থাকবে না, আকাশে মেঘ থাকবে না, কোনো ঘরে শিশু থাকবে না, নতুন বউ গর্ভবতী হবে না—বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে উজ্জয়িনী নগর। বুড়ো পরাশরের মনে হলো সে মরে যায়। সত্যিই মরে যায়। কতভাবে চেষ্টা করছে নগর যাতে শূদ্রহীন না হয়ে যায়। অথচ ভিতরে ভিতরে যে আকাশের দেবতাই শূন্য করে দিচ্ছে সব— টের পাওয়া যায়নি।

এক জোয়ান এসে ডাকছিল বুড়োকে, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ঠাকুদ্দা?

ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে পরাশর, কষের লালা মুছে নেয়, বলল, ঘোর লেগেছিল চোখে।

ঘরে ঘরে ঘুরে কী দেখলে তুমি?

ওই কথাই সত্য। বুড়ো বলল।

সে তখন বলে, বিশাইকে মনে আছে ঠাকুদ্দা?

বিশাই। সে তো ছেড়ে চলে গেছে অনেকদিন হলো।

তার বউ বাচ্চা বিয়োতে গিয়ে মরে গেল।

মনে পড়ল পরাশরের। তখন যেন এমন আগুনে সময় শুরু হয়ে গিয়েছিল। তারপরে কি বৃষ্টি হয়েছিল? মনে পড়ে না। আগে? কতদিন আগে তা? কিছুই মনে পড়ে না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল বুড়ো, বলল, এবার নিশ্চয়ই আকাশের জল নামবে।

কতদিন ধরে শুনছি তা, মেঘ এই পথ ভুলে গেছে। বলল পুরুষটি।

পরাশর বলল, আমি কী করব, আমার কী ক্ষমতা লঙ্কেশ?

তুমিই তো সায়রে জল আনালে পাতাল থেকে, তোমার কথা বলছে সবাই।

কারা বলছে?

সবাই বলছে, তুমিই পারবে আকাশের জল নামাতে, সোনার কলসির কথা তুমি বলেছিলে ঠাকুদ্দা, তা তো সত্যি হলো, এখন তোমাকে বলতে হবে কী করে আকাশের জল নামবে, মেঘ আসবে।

শূন্য চোখে বুড়ো পরাশর তাকিয়ে থাকল লঙ্কেশের মুখের দিকে। লঙ্কেশ বিড়বিড় করে বলছে, বুড়ো ঠাকুদ্দার সেই ক্ষমতা আছে, পাতালের জল যখন তুলে আনল আকাশের জল নামিয়ে আনবে, নাহলে যারা এখনো আছে তারা উজ্জয়িনী ছেড়ে চলে যাবে।

কোথায় যাবে, বণিকের পিছু পিছু?

তা জানিনে, তবে এমন জায়গায় যাব যেখেনে মেয়েমানুষ বছর বিয়োনি, ঘরে ঘরে পোয়াতি বউ,

সব ঘর ছেলেপুলেতে ভর্তি, ছেলেপুলের কান্না, ছেলেপুলের খলখল হাসি সব সময় শোনা যায়, সেখেনে মেয়েমানুষ পুরুষমানুষ যৈবন ভোগ করতে পারে, যৈবন যদি ভোগই না করা গেল তবে তা দিল কেন বিধাতা?

পরাশর বলল, আমাদের এই জায়গা তো ওই রকমই ছিল।

ছিল, এখন তো নাই, এখেনে মেয়েমানুষ পোয়াতি হয় না।

পরাশর বলল, আরো ক'দিন দেখা হোক।

কী দেখব, আকাশের জল যদি না নামে তবে হবেওনা, আমরা উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম— যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব।

বুড়ো পরাশর বলল, তোমাদের ইচ্ছে, কিন্তু কতদূর যে অনাবিষ্টি চলছে তা আমরা জানি না, কত পথ যাবে মানুষ?

যত পথ যেতে হয় বাঁচার জন্য, যাবে, কিন্তু তুমি ঠাকুদ্দা যদি মেঘ আনতে পার আকাশে তাহলে সমস্ত মেয়েমানুষ পোয়াতি হবে, মেঘ এলে মেয়েমানুষ গর্ভবতী হয়।

এ কথা কে বলল?

আমার বউ।

তাকে কে বলল?

শুনেছে, সে বলে মেঘ দেখলে তার ভিতরে কামভাব বেড়ে ওঠে।

বুড়ো বলল, আমাদের ঘরে পোয়াতি নাই, কিন্তু উজ্জয়িনীর বড় মানুষের ঘরেও কি এমন হয়েছে?

কী করে জানব, কে খোঁজ দেবে? লঙ্কেশ বলে।

কেউ দেবে না, তবে কিনা জীবনের যত কষ্ট দুঃখ সবই তো আমাদের, অনাবিষ্টির কষ্টটা দেবতা আমাদের উপর ঢেলে দিয়েছে আগুনের সঙ্গে।

লঙ্কেশ বলল, শুনেছি যত পাপ আমাদের, তাই শুদ্দুর জম্মো।

বুড়ো কেঁদে উঠল, এবার কি শুদ্দুরের শেষ, মেয়েমানুষ পোয়াতি না হলে শুদ্দুরের ঘরে শুদ্দুরের জম্মো হবে না।

না জম্মো হলে আমাদের পাপ নিয়ে আমরা যাব কোথায় ঠাকুদ্দা? তুমি মেঘ আনো, তুমি আবার একটা স্বপন দেখে জানিয়ে দাও আকাশের জল কোথায় আছে, কোথায় আছে আর একটা সোনার কলসি।

বুড়ো চুপ করে বসে থাকল গাছটির নীচে। লঙ্কেশ গেল সরোবরে। সেখানে গিয়ে দেখল জল অনেকটা উঠে এসেছে। জলের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। ক'দিন আগেও শুকনো খটখটে ছিল রত্নাকর সাগর। তারপর যেন অদৃশ্য বৃষ্টিপাত হয়ে গেছে। আকাশে তাকাল সে। নির্মেঘ, খটখটে আকাশ দেখে ভয় হয় যেন। সে হাঁটল পল্লীর দিকে। এই যে জল উঠেছে, এই জল কীভাবে ব্যবহার হবে তা নিয়ে সকলে ধন্ধে আছে। এই আশ্চর্য জল এখন আর ছুঁতে চাইছে না কেউ। বলছে থাকুক, তাদের যেভাবে চলছিল নদীর জলে সেই ভাবে চলুক। কথাটা তার বউ-এর, মায়ের। সবাই কি এই রকমই মনে করছে? ভাবছে, যদি ফুরিয়ে যায় পাতালের জল। খোঁজ নেবে সে।

বুড়ো পরাশর নিঃঝুম হয়ে বসে থাকল বটমূলে। সমস্ত দিন। ছায়া সমস্ত দিনই থাকল, কিন্তু ঘোর মধ্যাহ্নে বুড়োর গায়ে আলোকচক্রগুলি ভেসে থাকল অনেকটা সময়। তারপর তা চলে গেল। পশ্চিমের রোদ ঘুরে গেল, বুড়ো বসে ছায়ার বাইরের রোদ দেখতে দেখতে ভাবল, সে মেঘের কী জানে? সে স্বপ্নেরই বা কী জানে? কবে কোন কালে শোনা গল্পটি শুনিয়েছিল লঙ্কেশদের, সেই সোনার কলসই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে গেল। বুড়ো মনে মনে ভাবল, আমি তো সামান্য মানুষ, আমি কী করে বলব আকাশে কীভাবে মেঘের ঢল নামবে? সেই ঘন কালো ছায়ার মতো মেঘ, ধূসর ছায়ার মতো মেঘ— ধ্রুবপুত্র বলত, মেঘেই নাকি পক্ষীকুল গর্ভবতী হয়, মানুষও হয় তাহলে! টের পাওয়া যাচ্ছে।

বুড়ো সমস্তদিন ধরে একই কথা ভাবতে লাগল। সে সামান্য মানুষ, সে কিছুই জানে না। উজ্জয়িনীতে কত বড় বড় মানুষের বাস। আছেন রাজা, তাঁর অমাত্যবর্গ, সেনাপতি, কত রাজপুরুষ, কত রূপবান তারা, কত জ্ঞানবান, শক্তিমান তারা ; আছেন আরো কত পণ্ডিত, জ্যোতির্বিদ, অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী বণিকবর্গ, পুরোহিত বর্গ, তাদের ভিতরে শূদ্র কোনো মানুষই নয়। শূদ্রকে কেউ মানুষ বলে মনে করে

না। শূদ্র নিজেও জানে সে মানুষ নয়। শূদ্রর কি অধিকার আছে আকাশে মেঘ নিয়ে আসার? শূদ্রর কি অধিকার আছে মেঘের জন্য প্রার্থনা করার? মেঘের স্বপ্ন দেখার অধিকার কি সে পেয়েছে এই জন্মে?

সন্ধেবেলায় ক'জন এল, ডাকল লঙ্কেশ, ঠাকুর্দ্দা ওঠো, ঘরে যাবে না?

বুড়ো বলল, না।

না কেন, রাত হয়ে গেল, কৃষ্ণপক্ষ।

বুড়ো পরাশর বলল, মেঘ না এনে আমি ঘরে যাব না।

ঘরে না গেলে মেঘ আসবে?

মেঘ না এনে আমি অন্নগ্রহণ করব না।

উপোসী থাকলে মেঘ আসবে ঠাকুদ্দা?

বুড়ো বলল, মেঘ না এনে আমি জল ছুঁয়েও দেখব না।

তুমি এখেনেই থাকবে?

হ্যাঁ, আমি সমস্ত রাত্তির, সমস্ত দিন মেঘ ডাকব, আমায় ফেলে যদি সবাই চলে যায়, উজ্জয়িনী যদি শ্মশান হয়ে যায় তবু আমি এখেনেই বসে মেঘ ডাকব, মেঘ ডাকতে ডাকতে যদি মরণ হয় আমার তবু মেঘই ডেকে যাব।

সকলে স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকল বুড়ো পরাশরের দিকে তাকিয়ে। লোকটা এবার খুব সমস্যায় ফেলল। একটা মানুষ না অন্ন না জল না গৃহ হয়ে বটমূলে বসে থাকবে একা একা, তাকে ফেলে রেখে তারা নিরুদ্দেশে যাবে কীভাবে? এই বুড়ো এককালে ছিল বীর সৈনিক। সেনা-বাহিনীর সঙ্গে কতদূর গেছে, কত নদী, কত মাঠ প্রান্তর পার হয়েছে। সেই সব কাহিনী শুনতে শুনতে যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছে বালকবালিকারা। সকলে অন্ধকারে আকাশের দিকে তাকিয়ে কাঁদল। হে দেবতা জল দাও, নাহলে তোমাকে ডেকে ডেকে আমার পরাশর বুড়ো মরে যাবে। জল না খেয়ে অন্ন না গ্রহণ করে একটা মানুষ কতদিন বাঁচবে? যদি বুড়ো মরে যায় আমরা সবাই চলে যাব উজ্জয়িনী ছেড়ে। একজন শূদ্রও থাকবে না। থাকবে না, থাকবে না, থাকবে না। আর শূদ্রহীন হয়ে কি দেবতার দিন কাটিবে? রাজা অমাত্য পুরোহিত সেনাপতি নিঃশূদ্র উজ্জয়িনীতে বাস করতে পারবেন?

সেদিন রাতে শূদ্রপল্লীর কেউ নিদ্রা গেল না। শিশুরাও না। বালক বালিকারাও জাগল। নারীরা জাগল একধারে, পুরুষেরা অন্য ধারে। নারী পুরুষ শয্যায় গেল না, পাশাপাশি বসল না প্রেমালাপে, পরস্পরকে ছুঁয়েও দেখল না। তারা ভাবছিল বুড়ো পরাশরের কথা। গাঁওবুড়ো একা একা মেঘের জন্য বসে আছে বটমূলে—তারা কী করে নিদ্রা যাবে?

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার অন্ধপ্রায়, শুধু তারার আলোতে যেটুকু ভাসমান হয় দৃষ্টিতে। আকাশে কত সহস্র তারা। আকাশ দেখলে কে বলবে ওই আকাশ বহুদিন মেঘ ধারণ করেনি। নারীরা মেঘের কথা ভাবতে গিয়ে কত কথাই না ভাবছিল। কে যেন বলেছে মেঘ না এলে কেউ গর্ভবতী হবে না, তারা মেঘের প্রার্থনা করছিল গোপনে। অন্ধকারে সেই প্রার্থনা হারিয়ে যাচ্ছিল।

যুবতী বউটি জিজ্ঞেস করল এক বুড়িকে, তোমাদের সময় কী হতো দাদিমা?

কী হতো, মানে, কোন কথা জিজ্ঞেস করিস? বুড়ি জিজ্ঞেস করে।

আমাদের কেন এমন হচ্ছে দাদিমা?

বুড়ি বলল, জানিনে আমি এগারজনকে জম্মো দিয়েছিলামরে বউ।

আমিও তো তাই চাই।

চাস তো হয় না কেন?

তোমাদের কীভাবে হয়েছিল?

শুনে বুড়ি খিকখিক করে হাসে, যেভাবে হয়, পুরুষলোক পেটে এনে দেয়, আমার অত মনে নেই।

আহা তোমার স্বামী তোমাকে কীভাবে ভালবাসত?

পোয়াতি হয়েছি জানলে অন্নদিত বেশি করে, খেতাম খুব।

না দাদিমা, বলছি তোমরা তোমাদের ভালবাসতে কীভাবে?

বুড়ি বুঝতে চেষ্টা করে কথাটা। বুঝেও ফেলে, কিন্তু অতি সহজে জবাব দিতে পারে না। তার এগার

সন্তানের পাঁচটি অকালে মরেছে, বাকি ছ'টির চারটি মেয়ে। এই পল্লীতেই আছে, বুড়ি হয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। দুটি ছেলের কেউ নেই উজ্জয়িনীতে। কোথায় গেছে তা বুড়ি নিজেও জানে না। বুড়ির স্বামী কতদিন আগে মরে গেছে! এখন বুড়ি সব ভুলে গেছে। স্বামী সংসর্গের কথাও। যদিও বা মনে পড়ে বিশ্বাস হয় না তা এজন্মের কথা। এই যে শরীর বেঁকে গেছে, মাথার সব চুল শাদা, গায়ের চামড়া থলথলে, স্তনদুটি রসহীন, বুকের সঙ্গে মিশে গেছে প্রায়—এমন নারীই কি তার স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতো ক্ষেতে, খামারে, অন্ধকার আঙিনায়, এমন কি দ্বিপ্রহরে নদীতীরের বনমধ্যে? এই নারীই কি সম্মুখের নারীর মতো সুস্তনী, সুনিতম্বিনী, সুকেশী ছিল? স্বামীর যত দাপট ছিল, তারও ততো ছিল প্রায়। কিন্তু বিশ্বাস হয় না এখন। যৌবন যদি ছিল তা গেল কবে? সে কি টের পাবে না তার আনন্দময়ী যৌবন অপহরণ করছে কেউ গোপনে? বুড়ি ভাবল ওসব মিথ্যা। এইটিই সত্য। এই বার্ধক্যই সত্য। আর সত্য তার এগারটি সন্তানের জন্ম। পাঁচটির মৃত্যুও সত্য। এসব সত্য, কিন্তু যৌবন সত্য নয়, পুরুষমানুষ সত্য নয়, তার সংসর্গও সত্য নয়। আর সত্য যদি না হবে সন্তানের জন্ম দিল কে? বুড়ি বলল, মেঘ।

মেঘ, মেঘ কি তোমার বর?

বুড়ি বলল, পাখিদের পেটে সন্তান দেয় যেমন, আমাকেও দিয়েছিল মেঘ তেমন, মেঘ না এলে তোদের পক্ষে পেটে ধরা কঠিন, ক্ষেতে, বনমধ্যে, নদীর ধারে কি মিলন হয়েছে কখনো, যেমন হয়েছিল আমার পূর্বজন্মে, স্বপনে?

বউটি বলল, অমন আমাদের হয়না।

এমন কথা চলতে লাগল সমস্ত রাত্তির ধরে। ভোরের দিকে কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে মেঘের স্বপ্ন দেখল হয়ত, হয়ত বা মিলনের লজ্জাহীন স্বপ্ন দেখল, পুরুষরা দেখল, নারীরাও দেখল। মিলনের ভিতরেই বৃষ্টির শব্দ শুনলো যেন। বৃষ্টি আর মেঘের স্বপ্নও দেখলো।

উজ্জয়িনী বহুদিন অনাবৃষ্টিতে আছে। অনাবৃষ্টির কালে সমস্ত স্বপ্নই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। ঘুম ভাঙার পর ভয়ানক রৌদ্রপ্লাবিত আকাশ-পৃথিবী দেখে স্বপ্নালু মানুষগুলি আবার স্বপ্ন দেখার কথা ভুলে গেল যেন।

অনাবৃষ্টির দিনে এমন হয়। স্বপ্ন দেখার কথা ভেবেও স্বপ্ন দেখার কথা ভুলে যায় মানুষ। ভেবে নেয় এই নির্জলা পৃথিবী, উত্তপ্ত আকাশ, মাটি আর জন্মহীন শূন্যতাই তাদের ভবিতব্য। এর বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই বৃষ্টির প্রার্থনা করা ছাড়া। বৃষ্টিই হয়ে উঠতে পারে জন্মের সূত্র।

সেই ভোরে শোনা গেল টাঙ্গন অশ্বের ক্ষুরধ্বনি। ঘোড়ার অশ্ব আসীন উদ্ধবনারায়ণ গর্জন করতে করতে প্রবেশ করল শূদ্রপল্লীতে, কই সেই ঐন্দ্রজালিক কই, কে জল এনেছে রত্নাকর সাগরে।

সমস্ত রাত নির্ঘুম প্রায় মানুষগুলো ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়াল সরোবরের কূলে। ওখানেই তো দাঁড়িয়ে আছে উদ্ধব, এই অতি প্রত্যুষেই সজ্জিত রাজপুরুষের মতো এসেছে সে। উদ্ধব জানে উষ্ণীষ, রেশমবস্ত্র না থাকলে তার আর শূদ্রপল্লীর যে কোনো মানুষের কোনো তফাৎ ধরা যাবে না। উদ্ধব হাঁকছে, কে এনেছে জল, রাজার আদেশ হয়েছে সংবাদ নিয়ে যাওয়ার।

আঁজ্ঞে গাঁ বুড়া, পরাশর।

পরাশর বুড়ো, সে কই?

আজ্ঞে বটমূলে।

এখেনে আসতে বলা হোক।

সে তপস্যা করে মেঘের জন্য। মেঘ না এলে ..... । এক একজন করে পরিচয় দেয় বুড়ো পরাশরের। তাতে উদ্ধবের দু'চোখ স্ফীত হয়ে ওঠে। কিন্তু সে তো সন্দেহপ্রবণ মানুষ। জানে শূদ্রর তপস্যার অধিকারই নেই তো তার তপস্যায় কী হবে? আর এই জায়গায় তপস্যা হয়? যেতে হয় বনে, পাহাড়ে। তবে জল যে এসেছে তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মাটি যে কাটা হয়েছিল তাও দেখা যাচ্ছে, সরোবরের তীরে নতুন মাটির স্তূপ। সে জিজ্ঞেস করল, ক'দিন ধরে কাটা হলো মাটি, কারা কাটল, কার কথায় কাটল?

জবাব পেল উদ্ধব। তার সঙ্গে শুনল সোনার কলসের কথা। সেই কলস থেকে নাকি জল বেরোনর কথা, বেরিয়েছে। কোথায় সেই কলস? বুড়ো জানে। উদ্ধব সরোবর কূল থেকে নেমে এল নীচে। হাঁটতে লাগল। কোথায় সেই বুড়ো? সোনার কলস! সোনার কলসটি নিয়ে ফিরবে সে। কিন্তু বটতলায় এসে

দেখল বুড়ো পরাশর স্থির হয়ে বসে আছে, আর তিনজন মেয়েমানুষ মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে আছে। অবাক হয়ে সে দেখল সত্যি যেন তপস্বীর মতো লাগছে। সেই বুড়ো, যে কিনা সেনাবাহিনীতে ছিল রাজা গন্ধর্ব সেনের সময়ে, সে এখন বৃষ্টি নামানোর তপস্যায় বসেছে।

উদ্ধব চলে এল। ঘোড়া ছুটিয়ে শূদ্রপল্লী পার হয়ে দাঁড়াল। শূদ্রদের সামনে বুড়ো তপস্বীকে প্রণাম করা হয়নি। এখান থেকে সে প্রণাম করল মনে মনে। কার ভিতরে কী আছে কে জানে? জল তো উঠেছে রত্নাকর সাগরে। মাটি কেটে হোক বা সোনার কলসির মুখ থেকে হোক, জলে ভর্তি হয়ে গেছে সরোবর। কোথাও যখন জল নেই, বুড়ো জল তুলেছে, এখন বৃষ্টি নামাবে। সে মহাকাল মন্দিরে গিয়ে পুরোহিতের সামনে মাথা নোয়াল, প্রভু দ্বিজদেব, শূদ্র বুড়ো তপস্যায় বসেছে বৃষ্টির জন্য।

বৃদ্ধ পুরোহিত প্রতিক্রিয়া জানায় না, জিজ্ঞেস করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। রত্নাকর সাগরের মাটি কেটে জল তুলেছে তারা বুড়ো পরাশরের কথায়। এখন তারা বলছে পাতাল সমুদ্দুরের পর আকাশ সমুদ্দুর ভাঙবে বুড়ো।

প্রধান পুরোহিত কোনো কথা বাদ দিলেন না। সব শুনলেন। উদ্ধবও সমস্ত কথা বলতে পেরে নিশ্চিন্ত হলো। তার একটা সন্দেহ আছে, কিন্তু তা প্রকাশ করার উপায় নেই। সন্দেহ নিয়েই বাঁচা যেন।

তিয়াত্তর

তাম্রধ্বজ এসেছে আচমকা, দ্বিপ্রহরের শেষে, যখন আঙিনায় ছায়া পড়তে শুরু করেছে দিনমণি কুটিরের আড়ালে চলে যাওয়ায়। গন্ধবতী, রেবা, শিবনাথ তিনজনেই দেখল ভীষণ রোদে পথ ভেঙে এতদূর এসে ধুঁকছে দশার্ণদেশীয় জ্যোতির্বিদ। রেবা গন্ধবতী ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তৃষ্ণার্ত হয়ে এসেছে পুরুষটি। ক্ষুধার্তও হয়ত। তৃষ্ণাই নিবারণ করল তাম্রধ্বজ তিলকূট মিষ্টান্নে। শ্বাস নিয়ে ক্লান্তি দূর করে বলল, কী দুর্মতি হয়েছিল, আমি সকালে বেরিয়ে ঘুরছি, কিন্তু দ্বিপ্রহরটি ইদানীং অতি ভয়ানক হয়ে উঠেছে, সমস্ত পথে জনপ্রাণীটি নেই, পাখপাখালির ডাকও শোনা যাচ্ছে না কোথাও, দু তিনটি মৃত প্রাণীকে ঘিরে শকুনের পাল দেখলাম, মনে হয় অনেক মানুষই ত্যাগ করেছে অবন্তী দেশ।

রেবা বলল, এই রোদ্দুরে সকাল থেকে না ঘুরলে হত না?

একা একা ভাল লাগে না মা, আচার্য নেই, আশ্রম শূন্য হয়ে গেছে, আমি বসে রয়েছি যেন আচার্যর প্রত্যাবর্তনের জন্য, অথচ আমিই তো তাঁর হাড় ক'খানি বয়ে এনে দাহ করেছি শিপ্রাতীরে।

শুনে আর্তনাদ করে ওঠে গন্ধবতী অস্ফুট স্বরে। ইদানীং তার ভিতরে ভয় ঢুকেছে। ধ্রুবপুত্ররও হয়ত আচার্যর দশা ঘটেছে। তাদের সমস্ত কথা বলেছে শিবনাথ। শুনে গন্ধবতীর মনে হয় তার বাবা কার্তিক কুমারেরও ওই দশা ঘটতে পারে যা ঘটেছে আচার্যর ক্ষেত্রে, যা হয়ত ঘটেছে ধ্রুবপুত্রর ক্ষেত্রে। মনে পড়ে গেল কথাটা। সে আর নিজেকে সামলাতে পারে না। উত্তরীয়তে চোখ মোছে।

তখন তাম্রধ্বজ বলল, সুসংবাদও আছে, নগরে কত কিছু ঘটে যাচ্ছে, নগর থেকেই তো ফিরছি, শুনুন পিতামহ সেই শূদ্রপল্লীতে রত্নাকর সাগরে জল উঠে এসেছে পাতাল থেকে।

আশ্চর্য। পাতালে জল ফুরোয়নি তাহলে? বলে উঠল রেবা।

না মা, সেও তো এক সমুদ্র, পাতালে কত অন্তঃসলিলা নদী, সব কি শুকিয়ে যেতে পারে, শুনুন এক সোনার কলসের কথা।

সোনার কলসের কথা শুনতে শুনতে গন্ধবতীর দুচোখ বিস্ফারিত হলো। উজ্জ্বল হলো। কলসের রুদ্ধ মুখ উন্মুক্ত করা হয়েছে নাকি, তা যতদিন না রুদ্ধ হবে আবার রত্নাকরসাগরে জল ফুরোবে না।

গন্ধবতী জিজ্ঞেস করল, সেই সোনার কলস দেখেছেন আপনি?

না, সে তো দেখা যাবে না।

শিবনাথ ভাবছিল কোথাও জল নেই, জল এল কিনা শূদ্রপল্লীর জলাশয়ে! এই ঘটনা কী ইঙ্গিত দেয়? শূদ্ররা মহাকালের করুণা পেয়েছে। কী হলো? বহুদিন বৃষ্টি না হলে কি দেবতারও বিচার বিবেচনার শক্তি নষ্ট হয়ে যায়? জলঅচল নিম্নবর্ণের শূদ্রজাতি, যাদের জন্মই হয়েছে পূর্বজন্মের পাপ স্খালন করতে তাদের পল্লীতে কিনা জল এল জলাশয়ে। কোথাওনা।

শিবনাথ জিজ্ঞেস করে, ওরা কি ভেলকি জানে?

কেন আপনি তো দেখে এসেছিলেন, ওরা খনন করছিল সরোবরটি।

খনন করলেই কি জল উঠবে? তাহলে নগরের অন্য জলাশয়গুলি খনন করা হচ্ছে না কেন, প্রাসাদের সরোবরেও তো জল নেই।

তখন তাম্রধ্বজ বলল, শূদ্রপল্লীর মানুষের আর এক আশ্চর্য উদ্যোগের কথা, তপস্যায় বসেছে বুড়ো পরাশর, জল না হলে সে অনশনে মৃত্যু বরণ করবে, বটবৃক্ষের নীচে বসে আছে।

শিবনাথ বলল, শূদ্রের তপস্যার অধিকার তো নেই।

কিন্তু সে বসেছে তো, ব্যাধ রত্নাকর তো বাল্মিকীমুনি হয়ে উঠেছিলেন।

শিবনাথ চুপ করে থাকল। সমস্ত কিছুই বদলে যাচ্ছে। আজ শূদ্রজাতির কেউ যদি তপস্যায় বৃষ্টি নামাতে পারে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার হবে। হোক, বৃষ্টি আসুক। শিবনাথ আকাশের উদাসীন রূপের দিকে তাকায়। নিঃঝুম হয়ে আছে সব। শিবনাথ বেরিয়ে পড়ল। যাবে গম্ভীরাকূলে। তখন তাম্রধ্বজ পিছু ডাক দিল, বলল, ঠাকুদ্দা আর একটি সংবাদ আছে।

এগিয়ে এল শিবনাথ, কী কথা বলবেন?

সেই লোকটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, মহাপার্শ্ব যার নাম।

সংকুচিত হয়ে পড়ে শিবনাথ। সেদিনের অনেক কথাই সে বলেনি রেবা গন্ধবতীকে। গণিকালয়ের কথা তো নয়ই। এখন তাম্রধ্বজ যদি সকলের সামনে সেই অপূর্ব গণিকার কথা বলতে শুরু করে তা কেমন হবে? হাত তুলে শিবনাথ বলল, থাক, পরে কথা হবে।

তাম্রধ্বজ ইঙ্গিতটা ধরতে পারল। তবু সে নিবৃত্ত হলো না। শিবনাথকে অনুসরণ করে আঙিনার বাইরে এল, বলল, গণিকা দেবদত্তা সেই শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্তর সঙ্গে চলে যাচ্ছে নগর ছেড়ে।

এ কী কথা! বিস্মিত শিবনাথ ঘুরে দাঁড়ায়।

হ্যাঁ, কত আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে চারদিকে, অনাবৃষ্টিই তার কারণ।

গণিকার জন্যই তো প্রহৃত হয়েছিল ধ্রুবপুত্র, গণিকার প্রত্যাখ্যানে শ্রেষ্ঠী হিংস্র হয়ে উঠেছিলেন তাই তো শুনলাম সেদিন।

হ্যাঁ, ধনপতিরা নিষ্ঠুর হয় এই কথাই তো শুনলাম সেদিন দেবদত্তার মুখে।

তাহলে শ্রেষ্ঠীর বশীভূত হলো কী করে সে?

মহাপার্শ্বর এখন খুব ফূর্তি। বলল তাম্রধ্বজ। তারা এখন পথের উপর। পথ গেছে নদীর দিকে। বেলা শেষে বাতাস ছেড়েছে দক্ষিণপশ্চিম থেকে। গা জুড়িয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর।

শিবনাথ জিজ্ঞেস করল, ও তো বীট, গণিকার প্রহরী।

হ্যাঁ, দেবদত্তার প্রস্তাব শ্রেষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিয়ে মুক্তোর মালা পেয়েছে সে, গলায় দিয়ে ঘুরছে, আমাকে খুব খাতির করল।

দেবদত্তার মত পরিবর্তনের কারণ?

বীট বলল, শ্রেষ্ঠী যাবেন গন্ধর্বের দেশে, সেই দেশে নাকি দেবদত্তার পিতৃভূমি, শুনে তার মন বদল হয়ে গেছে, মহাপার্শ্বর খুব ফূর্তি, সেও নাকি সার্থবাহকে অনুসরণ করবে, তারও নাকি পূর্বজন্মের দেশ ওটি, সে নাকি আসলে অভিশপ্ত গন্ধর্ব এক, উন্মাদ!

শুনতে শুনতে শিবনাথ বলল, নগরে উন্মাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাম্রধ্বজ হাসে, তাই বলা যেতে পারে, কিন্তু সে নাকি পূর্বজন্মে গন্ধর্বই ছিল এমনি কত কথা শোনাল, কিন্তু দেবদত্তা যে চলে যাচ্ছে নগর ছেড়ে এতে ধ্রুবপুত্র সম্পর্কে আপনারা নিশ্চিন্ত হবেন।

যে নেই নগরে, তার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত অনিশ্চিন্ত কী?

ফিরে তো আসবে?

আসবে বলছেন?

উজ্জয়িনী ছেড়ে চিরকালের মতো কেউ চলে যেতে পারে, এমন নগর আর আছে এই জগতে? সেই বাহ্লিক বলেন, গন্ধর্বের দেশ বলেন।

কবে আসবে?

তার যখন বাসনা হবে ফেরার।

শিবনাথ বলল, এই সব কথা শোনার জন্য আপনার অপেক্ষা রয়েছে রেবা, গন্ধবতী, আপনি যান।

তাম্রধ্বজ ফিরে এল আঙিনায়। দেখল মধ্যস্থলে কাষ্ঠাসন পাতা। এখন রোদ নেই। সে খোলা আকাশের নীচে কাষ্ঠাসনে আসন গ্রহণ করতে করতে দেখল গন্ধবতী কাছে পিঠে নেই কোথাও। রেবা মা বসে আছে কয়েক হাত দূরে। রেবা যেন তাম্রধ্বজের জন্যই অপেক্ষা করছিল। গন্ধবতীকে না দেখে, শুধু রেবার অপেক্ষা দেখে তাম্রধ্বজের ভিতরে উদ্বেগ জন্মালো। সে বসতেই রেবা বলল, একটা কথা আছে।

জানি। তাম্রধ্বজ উদ্বেগ লুকোতে হাসে।

রেবা বলল, কী জানো?

মাথা নাড়ে তাম্রধ্বজ, তারপর বলে, সেই গণিকা, যাকে নিয়ে রটনা হয়েছিল, ধ্রুবপুত্রর নিষ্ক্রমণের কারণ যে ছিল, সে চলে যাচ্ছে।

সংবাদে রেবার ভিতরে কোনো প্রতিক্রিয়া দ্যাখে না তাম্রধ্বজ। না দেখে অবাকও হয় না। তবু সে বলল, ধ্রুবপুত্র হয়ত ফিরতে পারে এইবার, না ফিরে পারবে না।

কে বলল, সবাই যখন পালিয়ে যাচ্ছে, সে ফিরবে, সেই নিষ্ঠুর?

কোনো কিছু চিরকাল একই ভাবে চলে না।

রেবা বলল, আমার কাছে ধ্রুবপুত্রর মৃত্যু ঘটে গেছে, ওর কথা থাক।

কী বলছেন মা?

সত্য বলছি, তোমার আচার্যর মতো মৃত্যুও তো ঘটতে পারে তার।

তার মৃত্যু কামনা করছেন?

সে যেন আর আমাদের কাছে না ফেরে, আমি একটা কথা বলতে চাই।

তাম্রধ্বজ মাথা নামিয়ে ছিল। সে যেন বাতাসে গন্ধবতীর শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। রেবা আবার বলল, কথাটা আমি বলব, না তুমি গন্ধবতীর কাছে শুনে নেবে?

কথাটা কি আপনার না গন্ধবতীর?

দুই জনের, শোনো আমার স্বামী ফেরেনি, আমি তো উজ্জয়িনী ছেড়ে যেতে পারব না, এই কুটীরেই থেকে যাব।

ছেড়ে যাওয়ার কথা কে বলেছে?

ছেড়ে তো যেতেই হবে, যারা বাঁচতে চাইবে তারা ছেড়ে যাবে অবন্তী দেশ, উজ্জয়িনী, তুমি আর কতদিন থাকবে, তুমিও কি দশার্ণ অভিমুখে যাত্রা করবে না, শুনছি নগর শূন্য হয়ে যাচ্ছে।

ঠিকই শুনেছেন, কিন্তু আপনাদের রেখে আমি যাব কোথায়, আমি যদি দশার্ণ যাই, আপনি, গন্ধবতী, ঠাকুন্দা সকলেই যাবেন আমার সঙ্গে।

রেবা মাথা নাড়ল, আমি তো যাব না, আমার স্বামী যদি ফেরে।

তাম্রধ্বজ বলল, তাহলে কেউই যাবে না।

না যাবে, কিন্তু আমার যাওয়ার উপায় নেই, শোনো তুমি আমার পুত্রবৎ, যেমন ছিল ধ্রুবপুত্র, আমার স্বামীর অপেক্ষায় আমি সমস্ত জীবন বসে থাকব, বৈধব্য নিয়েও বসে থাকব যদি ফেরে সেই মানুষ, তার নির্বাসন কাল যদি শেষ হয়।

তাম্রধ্বজ ফিসফিস করল, আপনার সেই গান আমি শুনেছি মা।

কোন গান?

সেই যে সেই গান।

কোন গান, কোথায় শুনেছো?

তাম্রধ্বজ বলল, নগরে শুনেছি মা, বনের ভিতরে শুনেছি, প্রান্তরের ভিতরে, অন্ধকারে শুনেছি, জ্যোৎস্নায়, ভীষণ রোদের ভিতরেও।

আমার গান, কী গান...? রেবা আচমকা উদ্বেল হয়ে ওঠে।

তাম্রধ্বজ গুনগুন করে দেবদত্তার কাছে শোনা সুরটি অবিকল ভাসিয়ে দিতে থাকে, গুনগুনিয়ে বলে, স্বামীর বুকে ঘুমায় আমার পড়শী সখী যতো..... আমার স্বামী বিদেশ বিভুঁই, হয়েছে মেঘের মতো.....।

এই গান, আবার বলো দেখি।

আবার বলল তাম্রধ্বজ। শুনে আবার শুনতে চাইল রেবা। আবার গুনগুনায় তাম্রধ্বজ, আমগাছে মুকুল এল অশোক ফুল ঝরছে ..... স্বামী আমার বিদেশ বিভুঁই তাকেই মনে পড়ছে...।

মুখখানি রাঙা হয়ে গেল যেন। রেবা মুখ নামিয়ে বলল, কার কাছে শুনলে, নগরে তোমাকে কে বলল, এতো কারোর জানার কথা নয়, আমি তো এ গান গাইনি কখনো, কিন্তু এমনিই যে মনে হয় আমার।

কখনো মনে মনেও গেয়ে ওঠেননি মা?

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে রেবা, বলল, এখন তো মনে হয় আমার গান, পুত্র এ গান আমার গান কে বলল তোমাকে?

কেউ বলেনি মা, মনে হলো যেন।

আবার বলো দেখি তুমি, বুক জুড়োক, পুত্র এ গান কে রচনা করেছে?

আপনি জানেন না রেবা মা?

না, কিন্তু মনে হয় যেন শুনেছি ঘুমের ঘোরে, অলস মধ্যাহ্নে, ঘোর বর্ষার রাত্রিতে, ফাল্গুনে বৈশাখে, গভীর শীতে অগ্রহায়ণে।

তাম্রধ্বজ বলল, এই গান আপনার রচনা তাই তো জানি।

কী করে জানলে তুমি, কে বলল, আমি তো এ গান শোনাতে যাইনি কারোর কাছে, কেউ জানে না পুত্র, কী লজ্জা।

এই গান সত্য?

সত্যই মনে হয়, মনে হয় যেন আমার রচনা, কিন্তু তা তুমি জানলে কী ভাবে? দুটি হাত আকাশে তুলল রেবা, ফিসফিস করল, কতদিন সে নেই, কতকাল! যেন পূর্বজন্ম থেকে তার জন্য বসে আছি আমি, তুমি পুত্রবৎ, মায়ের মনের সমস্ত আলো অন্ধকার খুঁজে পেলে কী করে তরুণ, আমার সামনে কত বসন্ত গেল, কত শীত! নির্বাসন শেষ হলো না স্বামীর।

তাম্রধ্বজ বলল, মা শুনবে আরো?

কী শুনব, আরো গান?

হ্যাঁ, স্বামী আমার হারিয়ে গেল ভস্ম মেখে শিব হলো আমি পথের ধারে বসে ফিরবার কি সময় হলো?

তখন সজল চক্ষু রেবা মুখ তুলে বলল, তোমার রচনা?

না।

তুমি যে শুনেছ প্রান্তরে, জ্যোৎস্নায়, বনমাঝে, দ্বিপ্রহরে, তোমার রচনা?

না মা, আমি অকবি, আমার রচনা কী করে হবে, এ তোমার রচনা বলেই জানি তো, তুমি রচনা করেছ মনে মনে, শুনিয়েছিলে তাকে ।

ধ্রুবপুত্রের কথা বলো?

হ্যাঁ।

সে আমার পুত্রবৎ তাকে কী করে শোনাব এই সমস্ত কলি?

সে তো বলেছিল এ তোমার রচনা, তুমিই তাকে শুনিয়েছ।

বিস্মিত রেবা বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তাম্রধ্বজের দিকে। কোনো কথা বলতে পারে না। তাম্রধ্বজ বলছে ধ্রুবপুত্রের কথা। ধ্রুবপুত্রই নাকি বলে গেছে এই গান রেবা মার। তারই রচনা। শুনতে শুনতে রেবা বলে, যে গান অন্তরের কথা বলে তা তো নিজেরই রচনা মনে হয় পুত্র, এ কি ধ্রুবপুত্র রচনা করেছিল?

হয়ত তাই, সে বলে গেছে তুমি মনে মনে গেয়েছ এই গান।

তা সত্য, কিন্তু রচনা করিনি আমি, আমি সামান্য সৈনিকের স্ত্রী, আমার সে ক্ষমতা কোথায়, তবে কিনা স্বামীর জন্য যখন মন খারাপ হয়, তার জন্য চেয়ে থাকি শূন্য পথে, আমার এমনই মনে হয় পুত্র, মনে হয় নির্বাসন দিয়েছে কেউ আমার স্বামীকে, তাই সে ফিরছে না, বহুদূরে রামগিরির শিখরে রেখে

এসেছে তাকে কেউ, মাথার উপরে আকাশ আর আকাশ, বর্ষায় সে আকাশে ঘন, পুঞ্জ মেঘ, সেই মেঘ চলেছে দূরে কোথাও, হয়ত দশার্ণ দেশ হয়ে, বেত্রবতী পার হয়ে এই উজ্জয়িনীর দিকে আসছে সে আমার স্বামীর কথাটি নিয়ে।

তাম্রধ্বজের শরীরে শিহরণ এল, সে নিশ্চুপ শুনতে লাগল প্রোষিতভর্তৃকার কথাগুলি। সে যেন আজ দুয়ার খুলে দিয়েছে, মনের অর্গল ভেঙে দিয়েছে এই রমনীর। ভিতরে যত কথা জমে ছিল অন্ধকারে, সব বেরিয়ে আসছে মুক্ত জলস্রোতের মতো। রেবা বলে যাচ্ছিল, কোনোদিন সে তার মনের কথা, তার কল্পনার কথা, স্বপ্নের কথা, ম্রিয়মাণ দিন রাত্রির কথা কাউকে বলে উঠতে পারেনি। আজ তাম্রধ্বজ উসকে দিয়েছে। যে গান শুনিয়েছে দশার্ণ দেশের জ্যোতির্বিদ, সেই গান যেন তার মনেরই গান। রেবা কাঁদতে কাঁদতে বলে যাচ্ছিল সব। সদ্য তরুণীর মতো বলে যাচ্ছিল প্রিয়তম পুরুষটির কথা। তার লজ্জা ভেঙে গেছে। কার কাছে কী বলছে তা খেয়ালও নেই।

রেবা থামলে তাম্রধ্বজ বলল, মা ধ্রুবপুত্র রচনা করেছিল তাহলে গানের এই কলি।

তাই-ই তো, সে ছাড়া পারবে কে?

মা মেঘ যদি না আসে তোমার স্বামীর কথা কে শোনাবে?

আমি তো মেঘের জন্যও বসে আছি।

তখন তাম্রধ্বজ মাটির উপরে জানু পেতে বসল প্রার্থনার ভঙ্গীতে, বলল, মা তুমি তুমি তোমার স্বামীর কথা ভাব, মেঘ আসবে, মেঘ হয়ে তিনি ফিরে আসবেন, মা আমার একটি প্রার্থনা আছে।

মা রেবা বলল, আমারও একটি প্রার্থনা আছে পুত্র।

তাম্রধ্বজ বলল, মা আমি গন্ধবতীকে প্রার্থনা করছি তোমার নিকটে।

মা রেবা বলল, আমি তোমাকে প্রার্থনা করছি আমার সন্তানটির জন্য, পুত্র তুমি গন্ধবতীকে গ্রহণ করো, সে তোমাকে চায়, সে ধরে নিয়েছে ধ্রুবপুত্র ফিরবে না, প্রেম যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে মানুষ মানুষী কী কঠিন না হয়ে ওঠে, তার মনের ভিতরে ধ্রুবপুত্রের মৃত্যু ঘটেছে, সে তোমার প্রণয়ে মুগ্ধ, তুমি তাকে নিয়ে এই দগ্ধ নগর ছেড়ে দশার্ণের পথে রওনা হও, আমি থাকব, দ্বাদশবর্ষ অতিক্রান্ত হলে বৈধব্য নেব, তবু অপেক্ষা করব, গন্ধবতীর পিতামহ থাকবেন, আমি তাঁর কন্যার মতো, আমাকে ছেড়ে যেতে পারবেন না, যাবেন না তিনি, আমরা মেঘের জন্য, গন্ধবতীর পিতার জন্য অপেক্ষা করব, পুত্র তাম্রধ্বজ, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

তাম্রধ্বজ দেখল গোধূলি বেলার আলোয় গন্ধবতী এসে দাঁড়িয়েছে ওই দূরে, কুটিরের সম্মুখে।

চুয়াত্তর

গান্ধর্ব মতে বিবাহ হয়ে গেল তাম্রধ্বজ গন্ধবতীর সেদিন। প্রায় সেই মুহূর্তে গোধূলিবেলায়। গন্ধবতী মালা গেঁথে রেখেছিল যূথিকার। সেই মালা পরিয়ে দিল তাম্রধ্বজের গলায়। মালা বদল হলো। রেবা আড়াল থেকে দেখতে দেখতে শিহরিত হলো। আনন্দে নাকি বেদনায় দু চোখ দিয়ে অশ্রুপাত হলো তা ধরতে পারেনা সে। রেবা এল কাছে। দুজনে মাকে প্রণাম করল। ভারাক্রান্ত গলায় রেবা বলল, তুমি ওকে গ্রহণ করেছ পুত্র, তুমি ওকে নিয়ে ছেড়ে যাও এই দগ্ধ নগর, তোমাদের নবীন বয়স, এখানে তোমরা সুখে থাকতে পারবে না।

তাম্রধ্বজ বলল, আপনার আর ভয় নেই মা।

খুব ভয় করে, চারদিকে শৃগাল গৃধিনীর চোখ, আমি বলছি তোমরা আজ রাতে না পারো, কাল অতি প্রত্যূষে রওনা হয়ে যাও।

তাম্রধ্বজ বলল, তাই কি হয়, উজ্জয়িনীর প্রতি আমার মায়া পড়ে গেছে যে মা, তপস্যায় বসেছে শূদ্রপল্লীর বৃদ্ধ, বণিক যাত্রা করছে দূর দেশের উদ্দেশে, আমি তো উজ্জয়িনীর ভাল মন্দের সাক্ষী হতে চাই।

বিদিশাও তো তোমার নগর।

যাব, উজ্জয়িনীতে মেঘ এলে আমি বিদিশার দিকে রওনা হব।

রেবার মুখ থেকে তবু ভয়ের ভাবটি কাটে না, বলল, এখানে এক বুড়ি আছে, প্রতি নিয়ত আসছে,

তার হাত থেকে আমার মেয়েকে রক্ষা করো, পার্বতী বুড়ি হলো দুশ্চরিত্র রাজকর্মচারী, বণিক, ব্যবসায়ী, বিপণি অধিকারীর দূতী, প্রতিনিধি, সে খুব ভয়ানক, যে কাজে হাত দেয় সফল করেই ছাড়ে।

তাম্রধ্বজ হাসে, আর চিন্তা নেই মা।

পুত্র, অনেক ঘর ভেঙেছে সেই বুড়ি, সে বশীকরণ জানে।

তাম্রধ্বজ মাথা নাড়ে, বলল, আমার উপর বিশ্বাস রাখুন।

অমাবস্যা, ঘোর অন্ধকার, এমন একটি তিথিতে কি বিবাহ সফল হয়? একা হতে পেরে কথাটা জিজ্ঞেস করল গন্ধবতী।

শুনে তাম্রধ্বজ বলল, অনাবৃষ্টির কালে বিধির ব্যতিক্রম হয়ে থাকে, যখন বহুদিন তৃষ্ণার্ত থাকে পৃথিবী, তখন শীতের বর্ষণও সে সানন্দে স্বীকার করে নেয়, শোনো গন্ধবতী, তুমি কি উজ্জয়িনী ছেড়ে যেতে চাও?

গন্ধবতী বলল, প্রদীপ জ্বালব?

প্রয়োজন নেই, তারার আলোর বিভা কম নয়, আমি তো তোমার মনের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, তুমি বিদিশায় যেতে চাও এখনই?

যদি তোমার দেশে মেঘ এসে থাকে।

আসতেই পারে।

ওদেশে কেমন বর্ষণ হয়?

অপূর্ব, মেঘ এসে বেত্রবতীনদীর জলে ছায়া ফেলে, কী মায়া যে রচনা করে!

গন্ধবতী বলল, মেঘের দিন তো এসে গেল, আষাঢ় শুরু হবে কবে? আর ক'দিন বাকি?

তাম্রধ্বজ হিসেব করে বলল, ছ'টি দিন।

গন্ধবতী বলল, আমরা কবে যাব বিদিশা নগরে?

তাম্রধ্বজ বলল, যাব, কয়েকটা দিন অপেক্ষা করি।

গন্ধবতী বলল, এই পোড়া দেশে আর কার জন্য অপেক্ষা, আমি এখানে থাকতে চাই না, তুমি যদি পারো আজই শেষ রাত্রে রওনা হও।

তাম্রধ্বজ অবাক হলো না। কিন্তু মা, ঠাকুদ্দাকে ছেড়ে যেতে মনখারাপ হবে না গন্ধবতীর? গন্ধবতী বলল, তাঁরা অনুমতি দিয়েছেন।

তারা তো অনুমতি দেবেন কিন্তু তুমি কি যেতে পারবে?

পারব, আমার আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করল, তোমার বাবা যদি ফেরেন গন্ধবতী?

মা তাঁকে নিয়ে বিদিশায় যাবেন আমাদের কাছে।

তাম্রধ্বজ চুপ করে থাকে। তার মনে হলো গন্ধবতী নির্দয়া। আবার মনে হলো এমনই তো হওয়া স্বাভাবিক। গন্ধবতী তাকে যখন অবলম্বন করেছে, পূর্ব প্রেমের কথা ভুলতে চায়। ধ্রুবপুত্রকে মুছে দিতে হলে তাকে এই গম্ভীরা, অবন্তী দেশ ছেড়ে চলে যেতেই হবেই। কিন্তু সে কী করবে? নিরন্তর দগ্ধ হতে থাকা এই নগর ছেড়ে চলে যাবে? কী করে যাবে বুঝে উঠতে পারছিল না তাম্রধ্বজ। তার মনে হচ্ছিল কিছু একটা হয়ে যাবে এই নগরে। খুব শীঘ্রই। তার ইঙ্গিত রয়েছে নানা ঘটনায়। রত্নাকর সাগরে জল ওঠা, বুড়ো পরাশর, শূদ্রপতি গ্রাম বৃদ্ধের তপস্যায় বসা, দেবদত্তার প্রতিজ্ঞা ভাঙা, শ্রেষ্ঠীর কাছে আত্মসমর্পণ এবং গন্ধবতীর সঙ্গে তার মিলন—এ সব ঘটনা যখন ঘটে গেছে, তখন আরো কিছু ঘটনা ঘটে যাবে, ভবিষ্যতের গর্ভে তা ঘুমিয়ে আছে। সেই ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করতে চাইছিল তাম্রধ্বজ। সে নিজে দেখে যেতে চায় নিরন্তর তাপিত দগ্ধ এই নগর, এই দেশ শেষ পর্যন্ত সুস্থির হয়ে উঠতে পারে কিনা। মেঘ আসে কিনা মহাকালের দেশে।

গন্ধবতী বলল, আজ সমস্ত রাত্রি আমি বিদিশার কথা শুনব তোমার কাছে, তারপর ভোর রাত্রে আমি আমার পতিগৃহে যাত্রা করব।

তাম্রধ্বজ বলল, আমার যে মায়া বসে গেছে গন্ধবতী এই নগর, এই গ্রাম, এই দেশের উপর।

গন্ধবতী বলল, এই দেশ আরো মর্মান্তিক কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে, আমরা কেন সেই দিনের

জন্য এখানে থেকে যাব?

তাম্রধ্বজের মনে হলো গন্ধবতীর কথা হয়ত সত্য। ভবিষ্যতের গর্ভে আরো কঠিন সত্য হয়ত ঘুমিয়ে আছে। তা জেগে উঠলে সহ্য করতে পারবে তো তারা? কিন্তু নগরে যা যা ঘটে যাচ্ছিল অনেকদিন ধরে, আর যা যা ঘটে যাচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে তার ভিতরে প্রকৃতিগত এক পার্থক্য আছে। এখন যা ঘটছে তা যেন আশার সঞ্চার করছে তার মনে, রত্নাকর সাগরে জল, দেবদত্তার পিতৃগৃহে যাত্রা এবং গন্ধবতীর পরিণয় তো সেই সরল সত্য, মর্মান্তিক কোনো কিছু নয়। তাহলে তো অপেক্ষা করা যায়।

গন্ধবতী বলল, এগুলি সামান্য ঘটনা, এই সামান্য মঙ্গল বৃহৎ হয়ে উজ্জয়িনীর আকাশে ব্যাপ্ত হবে না, এই মঙ্গলজনক ঘটনাগুলির সঙ্গে প্রকৃতি-বিপর্যয়ের কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না, তুমি বিদিশার কথা বলো, বেত্রবতী নদীটি কেমন?

তাম্রধ্বজ বলল, তার জলের রং নীল, স্বচ্ছ, তলদেশের নুড়ি পাথর দেখা যায়, বর্ষায় সেই নদী হয়ে ওঠে ঘোলাটে, প্রচুর জলরাশি নেমে আসে উত্তর থেকে, বেত্রবতীর দুপারে বনযুথিকা, কেয়া, কেতকীর বন।

জানি। গন্ধবতী ফিসফিস করল, গৃহগুলি কেমন?

কেতকীর বেড়া দিয়ে গৃহগুলি ঘেরা, প্রাঙ্গণগুলিতে শুকনো পাতাও যেন পড়ে থাকে না, প্রোষিত-ভর্তৃকা বধূরা আকাশের মেঘ দেখে স্বামীর কথা মনে করে, তাদের স্বামীরা বর্ষার আগে উপার্জনের জন্য দূরদেশে যায়, দূর দেশে কৃষি কর্মের সুযোগ বেশি।

তুমিও যাবে?

তাম্রধ্বজ হাসে, যদি যেতে হয় যেতে হবে, শোনো গন্ধবতী, বিদিশায় রয়েছে বাসুদেবের মন্দির, তার সামনে এক গরুড় স্তম্ভ, হোলিওডেরাস নামের এক যবন স্থাপন করেছিলেন তা, তিনি ছিলেন পুরুষ পুরের যবন রাজার দূত, বাসুদেবের মন্দিরে সকাল সন্ধ্যা ধূপধুনোর গন্ধ, আর আছে নীচৈঃ পাহাড়..।

নীচৈঃ পাহাড় আর তার গুহাগুলির কথা জানে গন্ধবতী, শুনেছিল। তবু সে আবার শুনতে চায়। শেষরাতে গন্ধবতী উঠে দাঁড়াল তাম্রধ্বজকে নিয়ে, বলল, আমরা তাহলে যাব এবার, মা জানে, ঠাকুদ্দাও, বলো আর দেরি না করা ঠিক।

গন্ধবতীই টেনে নিয়ে চলল যেন তার স্বামী তাম্রধ্বজকে। রাত্রি কত ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডায় তারা পৌঁছে যাবে আশ্রমে। তারপর সেখান থেকে সে যাত্রা করবে পতিগৃহে। অন্ধকারে তাম্রধ্বজ ডাকল, ঠাকুদ্দা, মা, আমরা তাহলে আসি।

অর্গল খুলে বেরিয়ে এল রেবা একটি ঘর থেকে, আর একটি ঘর থেকে শিবনাথ। তারা নেমে এল আঙিনায়। অন্ধকারের আলোয় মুখ দেখল দু'জনের, রেবা বলল, আমার মেয়ের যেন অন্নের অভাব না হয়।

হবে না।

সে যেন ভালবাসা পায় তোমার।

তাম্রধ্বজ বলল, তোমার কথা সত্য হবে মা।

সে যেন বিরহী হয়ে না থাকে, প্রোষিতভর্তৃকা করো না তাকে।

তাম্রধ্বজ বলল, এই কথাও সত্য হবে মা।

সামান্য তিলকূট, যব, গোধুম, অন্ন দুখানি অলঙ্কার, এটা ওটার একটি পেটিকা নিল তাম্রধ্বজ লাঠির অগ্রভাগে বেঁধে। লাঠিটি কাঁধে রাখল। শিবনাথ এসে তার মাথায় বেঁধে দিল গোলাপি শিরস্ত্রাণ। রওনা হলো তারা। কুটীর থেকে পথে বেরিয়ে গন্ধবতীর হাত ধরল দূর দশার্ণ দেশের তরুণ। মাথার উপরে অনন্ত আকাশ, গ্রহ তারা, ছায়াপথ, নীহারিকাপুঞ্জ—মহাবিশ্বের ভিতরে দু'জনে পরস্পরের প্রতি আরো নির্ভরশীল হয়ে পড়ল যেন। গন্ধবতী কাঁদছিল। পথে নেমে তার চোখের কোলে মেঘ এল যেন। তাম্রবজ বলল, তোমার কোনো ভয় নেই গন্ধবতী।

যদি ফিরে যাই। গন্ধবতী দাঁড়াল।

আর তো ফেরা যায় না, তাঁরা আমাদের যাত্রা শুরু করে দিয়েছেন।

গন্ধবতী আবার হাঁটতে লাগল। পায়ে চলা পথে পুবের দিকে হেঁটে যেতে যেতে তারা দেখতে পাচ্ছিল অন্ধকার ধীরে ধীরে তরল হয়ে আসছে। দুপাশে কখনো প্রান্তর, কখনো বুনো ঝোঁপ, কখনো প্রাচীন সব বৃক্ষেরা, কালোমাটি-রিক্ত নিঃস্ব প্রকৃতি। পথের ধুলোয় গন্ধবতীর পায়ের চিহ্ন আঁকা হয়ে যাচ্ছিল। সে চলে যাচ্ছে গম্ভীরা ছেড়ে, তা সত্য হয়ে উঠতে লাগল ওই চরণ চিহ্নে চিহ্নে।

আমরা তো আশ্রমে যাচ্ছি।

না মহাকাল মন্দির হয়ে শূদ্রপল্লীতে।

গন্ধবতী দাঁড়ায়, কেন?

আমি তুমি তাঁর ছায়া থেকে কখনো মুক্ত হতে পারব না গন্ধবতী।

গন্ধবতী বলল, শূদ্রপল্লীর কথা আমি জানি।

ধ্রুবপুত্র বলেছিল?

হ্যাঁ, আমরা সেখানে যাব কেন?

চলো গন্ধবতী, জল চিহ্ন দেখে যাত্রা করলে সেই যাত্রা শুভ হয়, রত্নাকরসাগরে কত জল, আছে এক তপস্বী, তার আশীর্বাদ নিয়ে যাব।

গন্ধবতী ভাবছিল ধ্রুবপুত্র কি আর এক জন্ম নিয়ে তার কাছে ফিরে এসেছে? এমন কথা তো ধ্রুবপুত্রই বলতে পারত। হায়! মনকে যে শাসন করে রাখতে পারে না সে। সে উজ্জয়িনী গম্ভীরা ছেড়ে যেতে চায় যে জন্য, যার জন্য, সেই-ই যেন অন্যরূপে তার পাশে পাশে চলেছে তার হাত ধরে। সে তো ভেবেছিল ধ্রুবপুত্রের মৃত্যু হয়েছে, এখন মনে হচ্ছে বেঁচে ফিরুক ধ্রুবপুত্র। চোখে জল এল আবার। এই উজ্জয়িনী গম্ভীরা, শিপ্রানদী, মহাকাল মন্দির ছেড়ে চলে যাচ্ছে যার কঠিন প্রত্যাখ্যানে, যে ফিরে আসতে পারে তাই চলে যাচ্ছে মায়ের কাছ থেকে, সেই মানুষটিই যেন হাঁটছে তার পায়ে পায়ে। তাম্রধ্বজ তার কাছে এসে নিজের উত্তরীয় দিয়ে গন্ধবতীর চোখের জল মুছে দিল, দু হাতে তার মুখখানি আলতো করে ধরে বলল, তোমার পানি প্রার্থনা করতেই যেন আজ গিয়েছিলাম গম্ভীরায়, কী আশ্চর্য! আমার প্রার্থনা পূরণ হয়ে গেল, তুমি আমার সঙ্গে বিদিশা যাত্রা করেছ, অলৌকিক মনে হচ্ছে সব।

গন্ধবতী চোখ নামাল, বলল, আমি এমন ভোর কখনো দেখিনি।

ভোরের পাখিরা জেগে উঠছিল। তাদের কলকাকলিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে চারদিক। এখনো উজ্জয়িনী থেকে তারা নিরুদ্দেশে উড়ে যায়নি। সমস্ত কিছু শেষ হয়ে যায় নি মনে হয় গন্ধবতীর। কোন গাছের ডালে বসে একটি অচেনা পাখি সুরেলা গলায় ভোরের আলোর বন্দনা করছিল, গন্ধবতী তা শুনতে শুনতে হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে পথের দুপাশের ঝোঁপঝাড় বন পার হয়ে যায়। পার হতে হতে বলে, কখনো ঠাকুদ্দা, কখনো অন্য কেউ গম্ভীরা থেকে উজ্জয়িনী যাওয়ার এই পথটি বর্ণনা করেছিল, ছবি এঁকে দিয়েছিল যেন চোখের সামনে, সব সত্য মনে হচ্ছে, সামনে পথটি যেখানে বেঁকেছে শিপ্রানদীকে পেয়ে যাব, একটি পিপুল গাছ আছে, তার ছায়ায় সবাই বিশ্রাম নেয়।

তাম্রধ্বজ বলল, সত্য, সেই ধ্রুবপুত্রও কতবার বসেছে ওই পিপুলগাছের গোড়ায়।

গন্ধবতী থমকে যায়। তাম্রধ্বজের মুখে এখনো যে ধ্রুবপুত্রের নাম উচ্চারিত হবে তা সে ভাবতেও পারেনি। কী দুঃসাহসী এই পুরুষ! কী আত্মবিশ্বাস এই পুরুষের যে তার প্রেমিকার, নববধূর পূর্ব প্রণয়ের সব কথা জেনেও সেই প্রণয়ীর নাম নিঃসঙ্কোচে উচ্চারণ করতে পারে নববধূর সম্মুখেই। গন্ধবতী সাহসী পুরুষটিকে দ্যাখে। প্রশস্ত বুক, সরল শরীর, মাথার উষ্ণীষটি খুলে রেখেছে তাই ঘন কুঞ্চিত কেশে বীর নিষাদের মতো দেখায় যেন দশার্ণ দেশের পুরুষটিকে। তাম্রবর্ণের গাত্র ত্বক, চোখ দুটি চঞ্চল, ভ্রু যুগল ঘন কালো, গালে পাতলা শ্মশ্রুর চিহ্ন। গন্ধবতী সহসা যেন তাম্রধ্বজের জন্য উতলা হয়ে পড়ে। তাম্রধ্বজ এই মুহূর্তে তাকে ভয়ানক চঞ্চল করে তুলেছে। গা হাত পায়ে শিহরণ এল যেন, বুক ভার হলো, স্তনযুগল দৃঢ় হলো। কিন্তু আশ্চর্য তাম্রধ্বজ এসব খেয়ালই করেনি, বলছে, শোনো গন্ধবতী, আমি যখন আসি উজ্জয়িনীতে, তখন একজন আমাকে এক আশ্চর্য কাহিনী বলেছিল, শুনবে সেই কাহিনী?

গন্ধবতী ধীরে ধীরে তাম্রধ্বজের বুকে দুই করতল স্থাপন করল, বলল, নদীর ধারে বসে শোনা যাবে সেই কাহিনী।

তাম্রধ্বজ বলল, তাই হবে, ভাবছি এই জীবন কত বর্ণময়, আমরা শুধু বর্ণান্ধ বলে কোনো বর্ণকেই

চিনতে পারি না, সব কিছু ধূসর মনে হয়।

গন্ধবতী বলল, তুমি তো বর্ণান্ধ নও, আমিও নই।

কী জানি! উদাসীন হলো তাম্রধ্বজ। তার গ্রীবার উপর গন্ধবতীর নিঃশ্বাস পড়ছিল। সেই নিঃশ্বাস তপ্ত, কিন্তু তাম্রধ্বজের ভিতরে তা কোনো প্রতিক্রিয়া তৈরি করল না। তার মাথার ভিতরে কাহিনীর রং বিস্তার লাভ করছিল ধীরে ধীরে।

নদীর কাছে, পিপুল গাছটির সন্নিকটে পৌঁছে তাম্রধ্বজ বলল, শোনো গন্ধবতী, যখন আমি উজ্জয়িনীতে আসি, তখন এক বণিক, মণিভদ্র তার নাম, আমাকে বলেছিল নগরের উপকণ্ঠের একটি গ্রামের কথা, গ্রাম, গম্ভীরা নদী, বেতসবন আমি মণিভদ্রর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। বিদিশা থেকে উজ্জয়িনীতে আসার সময় কতজন কত কথা কত পরামর্শই না দিয়েছিল, আমিও জনে জনে জিজ্ঞেস করেছিলাম উজ্জয়িনীর কথা, নতুন, অচেনা নগর, জ্যোতির্বিদ্যা শিখতে আসছি, মণিভদ্র বলেছিল অন্য অনেকের মতো উজ্জয়িনীর কথা, তার সঙ্গে গম্ভীরার কথা।

গন্ধবতী জিজ্ঞেস করে, তিনি কি এসেছিলেন আমাদের গম্ভীরায়?

না, কিন্তু তিনি যেমন বর্ণনা দিয়েছিলেন গম্ভীরার, সব মিলে গিয়েছিল, এমনকি সেই কুটিরটি, প্রাঙ্গণ, কদমগাছটি, পথের ধারের কুপটি, ভুঁই চাঁপার গন্ধও।

গন্ধবতী এবার গ্রীবা বাঁকায় সতর্ক হরিণীর মতো। সে জলহীন নদীর দিকে তাকিয়ে পুরুষটির কথা শুনছিল, কিন্তু তার আর নদী দেখা হলো না। দেখল কী উদাসীন চোখ দুটি ওই মানুষটির! কী নির্ভয়! কার কথা বলছে? কে সেই মণিভদ্র যে গম্ভীরার সব জানে, বেতসবন থেকে কূপ, তাদের কুটিরের আঙিনা, ভুঁইচাঁপা, গম্ভীরার নীলজল—সব? এসব জানত তো একজন। কথা লুকোচ্ছে নাকি তাম্রধ্বজ? কোনো সন্দেহ লুকিয়ে রেখেছে নাকি গন্ধবতীর স্বামী? ভয় করল গন্ধবতীর। সে কী করে বোঝাবে ধ্রুবপুত্রকে আর মনেও পড়ে না, এখন সমস্ত দিন সমস্ত রাত, নিদ্রা জাগরণে শুধু এই পুরুষ।

তাম্রধ্বজ জিজ্ঞেস করল, তোমার কৌতূহল হচ্ছে না, কী করে এসব চিনেছিল মণিভদ্র?

গন্ধবতী মাথা নাড়ল, তারপর বলল, মণিভদ্রর পরিচয় কী?

তাম্রধ্বজ বলল, আমি মণিভদ্রর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, সত্যি মনে ছিল না, কোনো অচেনা জায়গায় রওনা হওয়ার আগে বহুজনের কাছে নানান সন্ধান নিতে হয়, সেই প্রথম ছিল বিদিশা ছেড়ে আমার কোথাও যাওয়া। উজ্জয়িনী কেমন নগর, কীভাবে সেই নগরের মানুষ আমাকে গ্রহণ করবে সেই বিষয়টি তো অজানাই ছিল, তারপর তোমার ঠাকুর্দার সঙ্গে দেখা হতেই আবছা মনে পড়ে গেল, আর গম্ভীরায় গিয়ে দেখি সব অনুপুঙ্খ মিলে যাচ্ছে, বর্ণে বর্ণে, পথের ধুলোও যেন মিলে গেল—আশ্চর্য।

গন্ধবতী মাটিতে ঘাসের উপর বসে পড়ল। দুই করতল মাটির উপর স্থাপন করে যেন নির্ভরতা নিল পৃথিবীর কাছে, বলল, আমাকে বলো সে কী করে গম্ভীরার কথা জেনেছিল, সে কি মায়া দর্পণের অধিকারী ছিল?

তাম্রধ্বজ বলল, মণিভদ্রকে যে এই কথাগুলি বলেছিল তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি গন্ধবতী।

কে এমন ভাবে বলেছিল যে তার কথা শুনে পাটালিপুত্রের বণিকের সব হুবহু মনে থাকবে, বর্ণনায় কোথাও কোনো ভুল হবে না?

গন্ধবতীর মুখোমুখি বসল তাম্রধ্বজ জানু পেতে, বলল, আমার কাহিনী এখনো শেষ হয়নি গন্ধবতী, ভেবেছিলাম কথাগুলি গোপনই থেকে যাবে, তোমাকে কোনোদিন জানাব না, কিন্তু বিবাহের পর এখন মনে হচ্ছে সব তুমিও জান।

গন্ধবতীর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সে মাথা নামিয়ে বসেছিল। একটা আশঙ্কা তো মনের ভিতরে কাঁটা ফোটাচ্ছে এখন। সে তো একজনের অনুরাগিনী, প্রণয়িনী ছিল সত্য, আর সেই কথা এই পুরুষটি, তার স্বামী জানে। পুরুষ আর কত উদার হতে পারে, কত সংশয়হীন হতে পারে? সে হয়ত কৌশলে গন্ধবতীর মনের ভিতরটিকে দেখে নিতে চাইছে। তাহলে সে যাবে কোথায়? ফিরে যাবে গম্ভীরার সেই দহে, যেখানে একদিন ধ্রুবপুত্র ....।

তাম্রধ্বজ বলল, শোনো গন্ধবতী, সেই মণিভদ্র আমাকে বলেছিল গম্ভীরার জলে একজন আত্মহনন করতে চেয়েছিল, চৈত্র পূর্ণিমার রাত ছিল সেই দিনটি, সহসা তার চোখের সামনে আবির্ভূত হন দেবী

সরস্বতী, বালুচরে দাঁড়িয়েছিলেন দেবী, দেবী তাকে নিরস্ত করেছিলেন আত্মহনন থেকে।

গন্ধবতী ভর দিল মহাপৃথিবীর উপর। তার মাথা থেকে উত্তরীয় খসে গেছে কখন, রুখু চুল ভোরের বাতাসে থিরথির করে কাঁপছে। তাম্রধ্বজ সজলচক্ষু গন্ধবতীর ভিতরে যেন পৃথিবীরই রূপ দ্যাখে। একই নারী কত রকম রূপ নিয়েই না দাঁড়ায়। তাম্রধ্বজ হাত বাড়িয়ে গন্ধবতীর উরুস্পর্শ করল, বলল, তোমার কি মনে পড়ে গন্ধবতী?

পড়ে, খুব স্পষ্ট, আমি তো বলেছিলাম সেই নিষ্ক্রমণের কথা।

মণিভদ্র যে রূপবান পুরুষের কথা বলেছিল, যে তাকে উজ্জয়িনী আর গম্ভীরার কথা বলেছিল, তাকে আমি দেখিনি, মণিভদ্র বলেছিল একবারই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তোমার ঠাকুদ্দার সঙ্গে যদি গম্ভীরায় না যেতাম আমি, হয়ত কোনোদিনই যাওয়া হত না, আমি জ্যোতির্বিদ্যা শিখতে এসেছিলাম সত্য, কিন্তু জানতাম না আমার আচার্যই ক্রমশ ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে যাচ্ছেন, আমি মণিভদ্রর কথাও ভুলে গিয়েছিলাম, গম্ভীরায় পা দিয়ে ধীরে ধীরে আমি আমার পথ খুঁজে পেলাম যেন।

শুনতে শুনতে গন্ধবতী বলল, এমন হয়, হতে পারে?

তাম্রধ্বজ বুঝতে পারল না গন্ধবতী কী জিজ্ঞেস করছে, সে সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলল, সেই রূপবান পুরুষটি বলেছিল গম্ভীরার তীরে বেতসকুঞ্জে নাকি দেবী সরস্বতী থাকেন, দেবী তার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করেছিলেন।

গন্ধবতী মাথা নামায়, ফিসফিসিয়ে বলে, সে কি আমায় চিনতে পারেনি সেই রাত্রে, কতবার ডেকেছিলাম তাকে।

তাম্রধ্বজ বলল, সে দেবীকে দেখেছিল, তারপর হেঁটে গিয়েছিল দক্ষিণ পুবের দিকে, যেদিকে রেবা নদী, বিন্ধ্য রামগিরি, দশার্ণ দেশ, যেদিক থেকে জ্ঞানের প্রথম আলো নেমে এসেছিল সরস্বতীনদীর তীরে, শোনো গন্ধবতী, যার ভিতরে সে দেখেছিল বাগদেবীকে, তার কাছে সে অন্যরূপে ফেরে কী করে, আমি এতদিন অন্ধের মতো পথ হাতড়েছি, ভেবেছি মানুষের সাময়িক বিভ্রম ঘটতে পারে গণিকার রূপে, কিন্তু সেই বিভ্রম কেটে গেলেও ফেরে না কেন সে?

তার এই বিভ্রম হলো কেন? গন্ধবতী জিজ্ঞেস করে।

কোথাও আশ্রয় খুঁজছিল ধ্রুবপুত্র, হয় মৃত্যুর অনিঃশেষ অন্ধকারে না হয় জ্ঞানের আলোয়, শেষ পর্যন্ত জ্ঞানই সত্য হলো, মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরে আসা তো জ্ঞানের আলোয় ফিরে আসা, গন্ধবতী তুমি কি বাগদেবীর কথা জানো?

সে বলত কোনো এক সরস্বতী নদীর কথা।

সেই নদী তো আর নেই, ফুরিয়ে গেছে।

অন্তঃসলিলা হয়ে গেছে, সেই নদীর দুইধারে ছিল ফসলের অতি প্রাচুর্য, মানুষ ছিল সম্পন্ন, নদীর জলেই ফসল ফলত দুই পারে, মস্ত নদী, তার একুল ওকুল দেখা যায় না, আমার চোখের সামনে যেন ভাসে সেই নদী।

সে তো কোন অতীতে মুছে গেছে, সেই নদীর কথা শুধু শোনাই যায়, দেখা যায় না, তোমার চোখের সামনে তার রূপ ভেসে ওঠে কী করে?

গন্ধবতী বলল, এমনভাবে বলত সে, আচ্ছা সে উজ্জয়িনী ছেড়ে গেল তার সঙ্গে দেবী সরস্বতীও কি গেলেন, সরস্বতী তো ছিলেন ফসলের দেবী, সৃষ্টির দেবী, তাইকি মেঘশূন্য হলো এই পৃথিবী, সৃষ্টির পথ রুদ্ধ হলো।

তাম্রধ্বজ মুগ্ধ হচ্ছিল তরুণী বধূর কথায়। এতক্ষণে নিজেকে ভারমুক্ত মনে হচ্ছে। তাদের দু'জনের মধ্যে ধ্রুবপুত্র যেন দাঁড়িয়েছিল গত সন্ধ্যায় বিবাহের পর থেকে। এখন সে সরে যাচ্ছে। গন্ধবতীও কেমন নিশ্চিন্ত হয়েছে। তাম্রধ্বজের একটি হাত নিয়ে নিজের বুকে স্থাপন করেছে, বলল, আমি খুব সামান্য একজন, আমার ভিতরে তুমি আমাকেই দেখ স্বামী।

তাম্রধ্বজ আরো ঘনিষ্ঠ হলো তরুণী বধূর। একটি হাত তার স্তনের উপর রেখে অন্য হাতে মুখখানি তুলে ধরে চুম্বন করল দুই চোখে, বলল, গন্ধবতী, আমি তো জানি তুমি খুব ছোটনদী, সরস্বতীর মতো দুকুল ছাপানো নও, আমি সামান্য মানুষ, ছোট নদীতে ভয় করে না, বড় নদীর সামনে গেলে বুক কাঁপে।

পঁচাত্তর

মহাসেনাপতি বিক্রম ফিরে এসেছেন। ফিরছে সেনাবাহিনী সেই অভিযান থেকে দলে, দলে। সেনাবাহিনী বণিকদের রক্ষা করেছে না লুট করেছে তা নিয়ে নানা কথা উড়ে আসছে নগরে। যদি রক্ষা করে থাকে বণিকরা তো এসে পৌছত উজ্জয়িনীতে। বণিকরা এলে তাদের মাথায় মাথায় এসে পৌছত বর্ষার মেঘ। মেঘ এলে অনাবৃষ্টিরকাল শেষ হতো। শূদ্রপল্লীর মানুষজন সন্ধ্যায় জলে ভরা রত্নাকরসাগরের ধারে বসে সেনাবাহিনীর ফিরে আসার সংবাদ নিয়ে আলাপ করে।

পল্লীর সবচেয়ে জোয়ান পুরুষ লঙ্কেশ বলছিল, যদি সেনাবাহিনী বাধা না দেয় আকাশের জল এবার নেমে আসবেই উজ্জয়িনীর মাটিতে।

এক মধ্যবয়সী বলল, সেনাবাহিনীর কি সেই শক্তি আছে?

লঙ্কেশ বলে, সেনাবাহিনী চায় চলুক অনাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টিতে বহু মানুষের কষ্ট যেমন, কিছু মানুষের আনন্দও লুটতরাজ চলছে।

মধ্যবয়সী বলে, আকাশের দেবতার চেয়ে কি সেনাবাহিনীর শক্তি বেশি?

লঙ্কেশ বলে, আকাশের দেবতাকে আমরা দেখিনি, সেনাবাহিনীকে দেখেছি, সেদিন এই সায়রের জল দেখে গেল রাজার সত্রি, গুপ্তচর উদ্ধবনারায়ণ, কেন এল দেখতে?

কেন এল, এমনি এল।

এমনি কোথাও যায় না উদ্ধব, ওকে আমি চিনি।

তা হলে কী উপায়?

আকাশের জল না নামলে রেহাই নেই আমাদের।

এই রকম আলাপ চলছিল শূদ্রপল্লীতে। সন্ধ্যার পর অন্ধকারে, তারার আলোর ভিতরে, অনেক রাত ধরে, সমস্ত রাত ধরে। তখন উজ্জয়িনীর ধনীমানী, অমাত্য, রাজার পারিষদরা ভাবছিল জল-অচল শূদ্রদের সায়রে জল এল, তাদের সায়র জলহীন হয়ে থাকবে আর কতকাল?

সেনাবাহিনীর এক ভাগ গত সন্ধ্যায় এসে পৌছেছে নগরে। এসেই তারা আদেশ পেয়েছে নতুন অভিযানের। রাতে ভালমতো বিশ্রামও পায়নি তারা। ভোর ভোর বেরিয়ে পড়েছে নতুন দলপতির আদেশে। সুতরাং পদাতিক বাহিনী আলো ফুটতে না ফুটতে পৌছে গেল শূদ্রপল্লীতে। প্রাসাদ থেকে শূদ্রপল্লী আর কতদূর? এইটুকু পথ অতিক্রম করতে পদাতিক বাহিনীর যতটা সময় লাগে তার বেশি লাগেনি, বরং কমই। দীর্ঘদিনের উদ্দেশ্যহীন অভিযানের ক্লান্তি এই পদাতিক বাহিনীর সামনে এক ধূসর ছায়া টেনে দিয়েছিল যেন, কিন্তু এই অভিযান সমাপ্ত করে বিশ্রাম পাবে এই আশায় এবং নতুন দলপতির ভয়ে তারা দ্রুত এসে পৌছেছিল শূদ্রপল্লীতে। তারা সারিবদ্ধভাবে, আগে ভেরি এবং শিঙাবাদক, তার ও আগে শাদা টাঙ্গন অশ্ব পৃষ্ঠে আসীন দলপতি, যাঁর মাথায় কালো উষ্ণীষ, উষ্ণীষে ময়ূর পালক। উষ্ণীষের কৃষ্ণবর্ণ ময়ূরপালকের ময়ূরকণ্ঠী রঙে মিশে গিয়ে তাকেও ওইরকম করে তুলেছে। নতুন দলপতি এই নগরেই ছিলেন, কোনো অভিযানে যাননি, রোদও গায়ে লাগেনি তাঁর, সুতরাং তাঁর ভিতরে কোনো ক্লান্তি নেই। তাঁর পরনে জলপাই সবুজ রঙের বস্ত্র, বুকে ধূসরবর্ণের বর্ম। কোমরে খাটো তলোয়ার। দলপতিকে চিনত পদাতিক বাহিনীর অনেকেই। উনি একদিন এই বাহিনীতে যোগ দিতে এসে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। সেই যুবক কী করে হলো রাজসত্রি, তারপর পদোন্নতি ঘটে এখন সেনাবাহিনীর পঞ্চাশজনের পদাতিক বাহিনীর দলপতি, এই অভিযানের প্রধান। বাহিনী পদাতিক, কিন্তু উনি ঘোড়া ব্যতীত কোথাও নাকি যান না।

শূদ্রপল্লীর ছেলে-বুড়োরা চোখ মুছছিল ভোরের আলোতে। রাত খুব ছোট, তার উপর একজন তপস্যায় বসেছে, তারা তো প্রায় ঘুমোয়ই না। সেনাবাহিনী যখন অনেকদূরে, মাঠের ভিতরে, তখন লঙ্কেশ টের পেল ভেরি আর শিঙার শব্দ। লঙ্কেশের শ্রবণ-ক্ষমতা বেশি। শোনা যায় সে নাকি গাছের পাতাঝরার শব্দও টের পায়। সে নাকি বলেছে, যদি সত্যিই সবার অলক্ষ্যে মেঘ আসে উজ্জয়িনীর আকাশে, সেই টের পাবে আগে। মেঘের এমন গুরুগুরু ধ্বনি আছে যা পৃথিবীর মাটি পর্যন্ত পৌছতে পারে না, সেই ধ্বনি তার কানে এসে যাবে। লঙ্কেশই বলেছিল, 'সেনাবাহিনী আসছে আমাদের দিকে।

আসছে না যাচ্ছে? জিজ্ঞেস করেছিল এক বয়স্কজন।

না না আসছে, এদিকেই, এদিকে কেন?

তখন আর এক বয়স্ক মানুষ বলল, সেনাবাহিনী তো পথে, পথ থেকে প্রাসাদে ফিরবে, পশ্চিমে গেছে তারা।

উঁহু, সেনাবাহিনী এই দিকেই, ওই যে দেখা যায়।

দেখতে পেয়েছিল সবাই। মাঠের মধ্য দিয়ে প্রায় যেন দৌড়ে আসছে পঞ্চাশজন সৈনিক। তাদের আগে আগে এক এরা কারা? ভিনদেশী সৈনিক? উজ্জয়িনী কি আবার হুন জাতির কবলে পড়ে গেল? এমন অনাবৃষ্টি চলছে, তা হতেই পারে। অনাবৃষ্টিতে সমস্ত কিছুই সম্ভব হয়ে ওঠে।

লঙ্কেশ বলল, যদি ভিনদেশী সৈনিক হয়, আমরা কী করব?

পরাশর বুড়ো জানে, সে তো তপস্যায় আছে, তপস্যা ভাঙাবে?

লঙ্কেশ বলল, আমরা আগে শুনি, রাজার বাহিনীও হতে পারে।

রাজার বাহিনী এদিকে আসবে কেন, রাজা ডাকলেই তো যেতে পারি।

লঙ্কেশ এগিয়ে গেল। তার পিছনে আরো কয়েকজন। আরো বেশ কিছু মানুষ। অস্ত্রহীন এক পদাতিক বাহিনী নিয়েই লঙ্কেশ মাঠের দিকে এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দেখল, এ তো রাজার বাহিনী। আর এই অশ্বারোহী যে চেনা মানুষ। সেই উদ্ধব সত্রি। সত্রি আবার সেনাবাহিনীর দলপতি কবে হয়ে গেল? ক'দিন আগেও তো এসেছিল এখানে।

শূদ্রপল্লীর কাছে এসে দাঁড়ালো পদাতিক বাহিনী। উদ্ধব তার ঘোড়ায় বসেই দেখল সামনে জনা তিরিশের মানুষ, সবাই পুরুষ। রণংদেহি ভঙ্গীতেই যেন সবাই প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়েছে। উদ্ধব গতকালই এই পঞ্চাশজনের পদাতিক বাহিনীর দলপতি হয়েছে। পঞ্চাশজন সৈনিকের অধিপতি, সেনাপতি। শূদ্রপল্লীর যে সংবাদ নিয়ে সে পুরোহিতের কাছে পৌঁছেছিল, তারপর সেনাপতির কাছে, তা যে এত মূল্যবান জানবে কী করে উদ্ধব? তার পদোন্নতি হয়ে গেল। সেনাপতির নির্দেশে উদ্ধব এই অভিযানের নেতৃত্বে। উদ্ধব স্বপ্নেও ভাবেনি এমন হতে পারে। জীবনে কত আশ্চর্য ঘটনাই না ঘটে, এখন যদি স্বয়ং গণিকা দেবদত্তা তাকে সেবা করতে চায় তাতেও অবাক হবে না উদ্ধব। সে কিনা পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্বে, যারা তার আজ্ঞাবাহক, ওই শিঙাদার, ভেরিদার তাদের সঙ্গেই উদ্ধব একদিন কর্মপ্রার্থী হয়ে ছিল রাজপ্রাসাদে। সৈনিকের কাজে ঢুকবে বলে সমস্ত রাত বসেছিল গাঁয়ের চাষাভুষো, শূদ্র, চামার, নিষাদদের সঙ্গে। কিন্তু সুযোগ পায়নি উদ্ধব, বরং জুটেছিল বাহিনীর এক অধিপতির লাথি। যারা অসফল হচ্ছিল, তাদের পদাঘাতে সরিয়ে দিচ্ছিল, মনে আছে তার। সেই লোকটাও নাকি বেঁচে নেই, সেই অধিপতি। এই বারই মরেছে কোথায় পেটের অসুখে। তাকে মাঠে ফেলে দিয়ে চলে এসেছে বাহিনী নেতৃত্বহীন হয়ে। মরেছে বলেই উদ্ধবের এই পদোন্নতি। না মরলে হত না। ছিল গাঁয়ের চাষা, প্রায় ভূমিশূন্য রাখালরাজা, উঞ্ছবৃত্তি করে দিন চলত, এখন সে পঞ্চাশজনের প্রভু। পঞ্চাশজন সৈনিক নিয়ে যেখানে দাঁড়াবে, সেই জায়গায় অসৈনিক সকলেরও প্রভু। তার অধীনস্থ পঞ্চাশজন রুগ্ন, আধারুগ্ন পদাতিক সৈন্য অস্ত্রের ক্ষমতায় তার আদেশ পালন করতে সমস্ত সময় প্রস্তুত। সে যদি বলে লুণ্ঠন করতে, তারা লুণ্ঠন করবে। সে যদি বলে মেয়েমানুষ নিয়ে এসো, আনবে তারা তাদের নতুন প্রভুর জন্য। উদ্ধব এখন প্রভু। এই দীর্ঘকালের অনাবৃষ্টি তার জীবনে এতবড় পরিবর্তন ঘটিয়েছে। চলুক এই বৃষ্টিহীন সময়, সূর্যদেব যেন আর অস্ত না যান, তাঁর রথের চাকা যেন সত্যিই বসে যায় আকাশ পথে। সকাল সন্ধ্যা আগুন ঝরে পড়ুক আকাশ থেকে। তাতে তার পদোন্নতি ঘটবে আরো। যে সমস্ত ঘটনা অসম্ভব মনে হয় তা সম্ভব হয়ে উঠবে। হচ্ছেও কত। না হলে নগরের সবচেয়ে রূপবতী গণিকা দেবদত্তা নিজে আত্মসমর্পণ করে শ্রেষ্ঠীর কাছে! আরো আগুন যদি ঝরে পড়ে আরো বহুদিন ধরে, গম্ভীরা গাঁয়ের সুন্দরী গন্ধবতী নিজে আসবে উদ্ধবের কাছে। দূতী পাঠাতে হবে না, জোর করতে হবে না। আগুনের পৃথিবীর ভিতরে অক্ষতযোনি কুমারী ধর্ষণের চেয়ে সুখ আর নেই। এখন সবই সম্ভব হবে এই সফল অভিযানের পর থেকে।

উদ্ধব ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামল। কোমরের তলোয়ারে হাত রেখে এক সৈনিককে বলল ঘোড়াটিকে অশোকগাছের গায়ে বেঁধে দিতে। উদ্ধবের গায়ের রক্ত চনমন করে ওঠে। সে গর্জন করে ওঠে, কোথায় সেই বুড়ো পরাশর, শুনেছি সে বেটা নাকি এককালে সেনাবাহিনীতে ছিল?

লঙ্কেশ এগিয়ে গেল এক পা, জিজ্ঞেস করল, সেনাবাহিনী এল কেন?

উদ্ধব গর্জে উঠল, তোকে জবাব দেব নাকি, আমি উদ্ধবনারায়ণ, এই সেনাবাহিনীর অধিপতি, এই দলের দলপতি, এখেনে কতজন পুরুষ আছে?

লঙ্কেশ বলল, তার কোনো হিসেব নেই, অনেক লোক চলে গেছে।

যারা চলে গেছে তাদের ধরে আনতে বাহিনী যাবে, তুই তো যাসনি, কী নাম তোর?

তাকে চেনে উদ্ধব। সত্রি হয়েও চিনত। এখন চিনতে পারছে না পদাতিক বাহিনীর প্রধান হয়ে। লঙ্কেশ কিছু একটা আন্দাজ করতে চাইছিল, পারছিল না। সে অনুমান করছিল খারাপ কিছু হতে যাচ্ছে, না হলে ভোরবেলায় পদাতিকবাহিনী নিয়ে উদ্ধব সত্রি চলে আসবে কেন? সত্রির নতুন বেশ মানে নতুন পদ। নতুন পদ পেয়ে, পঞ্চাশজন সৈনিকের মাথা হয়ে উদ্ধবনারায়ণ কি এমনিই চলে এসেছে লুটপাট করতে? এই রকম তো করে উদ্ধব। শোনা যায় তা। আর সেনাবাহিনীকে দিয়েও এসব করানো যায়। লঙ্কেশ ভাবল সত্যি যদি সেনাবাহিনী সেইরকম কোনো উদ্দেশ্যেও আসে তারা প্রতিরোধ করবে। তারপর রাজার কাছে চলে যাবে। রাজা থেকে সেনাপতির কাছে। উদ্ধবনারায়ণ যতই পদাতিক বাহিনীর হোক, সে তো উদ্ধবই, তার অত্যাচার বিনা বাক্যে মেনে নেওয়া হবে না।

কী হলো নাম বলছিস নে কেন? উদ্ধব গর্জে ওঠে।

লঙ্কেশ নাম বলতে উদ্ধব হাহা করে হেসে ওঠে, আজ রাবণ বধ হবে, শালা শূদ্র মাথায় উঠলে এমন হয়, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, মেয়েমানুষের ঋতুবন্ধ হয়ে যায়, অ্যাই শকুনের বাচ্চা শকুন, সবাইকে হাজির করেছিস, আর কত জন বাকি আছে।

লঙ্কেশের মুখ আরো কালো হয়ে গেল। সে একপা পিছিয়ে বলল, কেন, কী প্রয়োজন?

উদ্ধব খেয়াল করল যুবকটি তাকে একবারও প্রভু সম্বোধন করেনি। সদ্য প্রভুত্ব অর্জন করা উদ্ধব ওই সম্ভাষণের জন্য অধীর হয়ে উঠল। গর্জন করে উঠল, আমি তোর প্রভু, শকুন হাঁটু মুড়ে বস, আর পরাশর বুড়োকে আসতে বল।

মধ্যবয়সীরা বুঝতে পারছে গুরুতর কোনো কারণে পদাতিক বাহিনী নিয়ে উদ্ধবের আগমন। কারণটি অবোধ্য। তারা এমন কিছু করেনি যার জন্য সেনাবাহিনী চলে আসতে পারে। লঙ্কেশ দেখছিল সেনাবাহিনী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। উদ্ধবের আদেশের জন্য ছটফট করছে। সে কি হাঁটু মুড়ে বসে প্রভু সম্বোধনে উদ্ধবকে শান্ত করবে? কিন্তু অপরাধ কী? শোনা আছে বহুদিন আগে শূদ্রজাতির প্রতিটি পুরুষকে গলায় ঘণ্টা বেঁধে রাখতে হত। নগরের মধ্যে প্রবেশ করলে ওই ঘণ্টাধ্বনিতে উচ্চবর্গীয়রা নিজেদের রক্ষা করত শূদ্রর ছায়া থেকে। সেই বিধান এখন নেই। রাজা গন্ধর্ব সেন, রাজা ভর্তৃহরির আমলে তারা নিজেদের মতো করে আছে। কখনো সৈনিক, প্রহরী এই পল্লীতে তলোয়ার উঁচিয়ে ঢোকেনি। এখনো তো রাজা ভর্তৃহরি সিংহাসনেই আছেন। তবে কেন সেনাবাহিনী এল? তাহলে কি আবার পায়ে বেড়ি, গলায় ঘণ্টা ঝুলিয়ে দেবে উদ্ধবনারায়ণ? লঙ্কেশ ধীরে ধীরে বসল। হাঁটু মুড়ল। সে জেনে নিতে চায় কেন এল এরা? উদ্বেগে ভার হয়ে আছে সে।

উদ্ধব গর্জন করল, নতশির হয়ে বস, জোড়হস্ত হ শকুনের বাচ্চা, কার আদেশে রত্নাকর সাগর খনন করেছিস তোরা?

বুঝতে পেরেছে লঙ্কেশ, লাফ দিয়ে উঠে পড়ল, বলল, বৃষ্টি নেই কতদিন, আমরা সায়র খুঁড়ে জল বের করেছি পাতাল থেকে।

উঠলি কেন বস, যেমন ছিলি তেমন হ।

লঙ্কেশ যেন কথাটা শুনতেই পায় না, সে বলে উঠল, সাতটি দিন ধরে খুঁড়েছি মাটি, তারপর সোনার কলসির মুখ খুলে গেছে।

সোনার কলসের নাম শুনে উদ্ধব সচকিত হয়ে ওঠে। সোনার কলস, কোথায় তা, বের কর সোনার কলস, সায়রের নীচে সোনার কলস ছিল, রাজার কাছে গিয়েছিলি, রাজার অনুমতি নেওয়া হয়েছিল, সোনার কলস রাজাকে ফেরত দেওয়া হয়েছিল?

লঙ্কেশ বলল, সোনারকলস পাতালে থাকে।

শিয়ালের বাচ্চা, মিথ্যা বলা হচ্ছে, ওকে ধর, রত্নাকর সাগরের সোনার কলস তুলে লুকিয়ে ফেলেছে।

লাফ দিয়ে চারজন সৈনিক গিয়ে লঙ্কেশকে ঘিরে ফেলে মাটিতে চিৎপাত করে দিল। আর তা দেখে অন্য সকলে পালিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিতেই উদ্ধব গর্জন করে উঠল, আমি তোদের প্রভু, একজনও রেহাই পাবে না, সোনার কলস না পাওয়া পর্যন্ত কারোর রেহাই নেই, আর ওই রত্নাকর সাগরের জলে কেউ যেন না যায়, কোনো শূদ্র শকুনের বাচ্চা যেন ওই জল ছুঁয়ে জলকে অপবিত্র না করে, ওই জল এখন থেকে রাজপ্রাসাদের সম্পদ।

সেনাবাহিনী বিশৃঙ্খল জনতাকে ঘিরে ধরল, তার ভিতর থেকে দু-একজন পালাতেও সমর্থ হোল। পলাতক পুরুষের পিছনে সৈনিকদের এক একজন ছুটল। উদ্ধব তার কোমর থেকে তলোয়ার নিষ্কাষণ করে খোলা তলোয়ার নিয়ে যেন উল্লাস করতে লাগল। ভেরিবাদককে বলল, ভেরি বাজাও, শিঙাদারকে বলল, বাজাও শিঙা, জয় হয়েছে মহাসেনাপতি বিক্রমের বাহিনীর, আত্মসমর্পণ করেছে প্রতিপক্ষ, চারজন গিয়ে রত্নাকর সাগরের চার কোণে দাঁড়িয়ে পড়, ওই জলে শূদ্রের ছায়া না পড়ে, ছায়া পড়লে তা অপবিত্র হয়ে যাবে, শুকিয়ে যাবে আবার।

শীর্ণকায়, জীর্ণ মানুষগুলিকে সেনাবাহিনী নিয়ে গিয়ে রোদে দাঁড় করিয়ে দিল। তারা কেউই বুঝতে পারছিল না কোন অপরাধে সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি হয়েছে সকলে, উদ্ধবনারায়ণ রত্নাকর সাগর অধিকার করতে এসেছে। আর কোথও জল নেই কোন সায়রে, সুতরাং সায়র দখল করতেই পারে সেনাবাহিনী। তারা বাধা দেয়নি। বাধা দেওয়ার উপায় নেই। কিন্তু বাধা যখন দেয়নি অপরাধটা কী?

উদ্ধব বলল, সোনার কলসটি কোথায় লুকোন হয়েছে?

সকলে একসঙ্গে বলল, আমরা সোনার কলস কখনো দেখিনি প্রভু।

সোনার কলসের কথা শুনেছিই শুধু প্রভু। এক বৃদ্ধ বলল।

প্রভু সম্বোধনে উদ্ধব যেমন খুশি হলো, তেমনি তার রোষও বেড়ে গেল। সে এত মানুষের প্রভু! এই মানুষগুলি শ্রেষ্ঠীকে প্রভু ডাকে, মহাসেনাপতি বিক্রমকে প্রভু ডাকে, রাজার দেখা পেলে তাঁকেও প্রভু ডাকবে, এরা মহাকালের পুরোহিতকেও প্রভু ডাকতে বাধ্য হবে যদি সেই সৌভাগ্য হয় এদের। এরা তাকেও প্রভু সম্বোধনে তার সামনে প্রায় লুটিয়ে পড়ছে। শুধু সেই লঙ্কেশ মাটিতে শুয়ে, তার বুকের উপর খোলা তলোয়ার ধরে আছে এক সৈনিক। উদ্ধব বলল, উজ্জয়িনীতে মিথ্যার কোনো স্থান নেই, সোনার কলস এনে দে, না হলে ওই কলস চুরির দায়ে সবার শিরচ্ছেদ হবে, আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে দাস উতঙ্কের মতো, কোথায় কলস?

কেউ কোনো কথা বলল না। জবাব না পেয়ে উদ্ধব আরো ক্ষেপে ওঠে, বলল, সোনার কলস যদি পাওয়া যায় তবে তোদের শাস্তি লঘু হতে পারে, সোনার কলস ছোঁয়ার অধিকার নেই শূদ্রর, কোথায় কলস?

লঙ্কেশ আচমকা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, বলে, পাতালে।

ধর ওকে, ধর, ধর। উদ্ধব চিৎকার করে ওঠে।

চার সৈনিক ঝাপটে ধরেছে লঙ্কেশকে। আবার ধরা পড়ল লঙ্কেশ। কিন্তু সে যে পালাতে চায়নি তা কি উদ্ধব জানে? লঙ্কেশ জানে পালালে ধরা পড়তেই হবে। সেনাবাহিনী যদি চায় যতদূর যাবে সে ততদূর থেকে ধরে আনবে তাকে। চিত হয়ে শুয়ে উদ্ধবের মুখোমুখি হতে পারছিল না বলেই সৈনিকদের ছিটকে দিয়ে সে উঠে দাঁড়িয়েছে।

উদ্ধব বলল, তোর আজ শিরচ্ছেদ হবে মহাসেনাপতির হাতে।

লঙ্কেশ এই কথায় উদ্ধবের চোখে নিজের চোখ স্থির করে দাঁড়িয়ে থাকে। সে জানে মহাসেনাপতি আর উদ্ধব এক মানুষ নয়। মহাসেনাপতি তার মতো দুর্বল মানুষকে শিরচ্ছেদ না করে মুক্ত করে দিতে পারেন। এমন হয়েছে কত? কিন্তু উদ্ধব পারবে না। উদ্ধবের ক্ষমতা প্রদর্শনের জায়গা শুধু তার কাছেই। মহাসেনাপতি তার শিরচ্ছেদ না করেই শূদ্রপল্লীর জল দখল করে নিতে পারেন। এই যেমন এখন নিচ্ছে সেনাবাহিনী, তা মহাসেনাপতির আদেশেই। উদ্ধব তার পঞ্চাশজন সৈনিককে নিয়ে জল দখলের কথা ভাবতেই পারত না। তার সেই মাথা নেই। মহাসেনাপতির মাথাই তার মাথা। মহাসেনাপতি উদ্ধবের কথায় লঙ্কেশের শিরচ্ছেদ করবেন কিনা তা তিনি ব্যতীত আর কেউ জানেনা। শূদ্ররা রত্নাকরসাগর খুঁড়ে জল বের করেছে, সেনাবাহিনী তা কেড়ে নিতে এসেছে। ওই যে উদ্ধব তার চোখে চোখ রাখতে

না পেরে অন্যদিকে তাকিয়ে বলছে, এই নগরে সাত সাগর, রত্নাকরসাগরে জল উঠে আর ছয় সাগর নির্জলা থাকবে তা তো হতে পারে না। মহাসেনাপতির আদেশ, গোবর্ধনসাগর, ক্ষীরসাগর, বিষ্ণুসাগর, পুষ্করসাগর, পুরুষোত্তমসাগর আর শিবসাগরেও জল চাই, শূদ্ররা ওই সব সাগর খনন করবে। সব সাগরে জল তুলতে পারলে তবে মুক্তি, নগর এছাড়া বাঁচবেনা, নগরের মানুষকে বাঁচাতে মহাসেনাপতি এই আদেশ করেছেন।

লঙ্কেশ বলল, আমরা আমাদের সাগর খুঁড়েছি, আমরা পাতাল সমুদ্দুরের কাছে প্রার্থনা করেছি তবে জল উঠেছে।

লঙ্কেশের কথা শুনেই খোলা তলোয়ার হাতে তার দিকে ছুটে গেল উদ্ধব। এই লোকটা কথা বলছে কেন? এ তো এখন দণ্ডিত অপরাধী, শিরচ্ছেদ হলো বলে। কথা বলে লোকটা উদ্ধবের প্রতাপ তুচ্ছ করে দিচ্ছে। উদ্ধব তার বুকের উপর তলোয়ার এমন ভাবে ছুঁইয়ে রাখল যেন এখনই তা অন্তঃস্থল ভেদ করে যাবে। কিন্তু এইভাবে কতক্ষণ সে তলোয়ার তুলে রাখবে লঙ্কেশের বুকে? সে অভ্যাস তার নেই। আর এতে সমস্ত মনোযোগ লঙ্কেশের উপর থাকে, রাখতে হয়, ফলে শূদ্রপল্লীর নিরীহ মানুষেজনের সামনে মহাসেনাপতির বলে বলীয়ান উদ্ধব নিজে তার ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারবে না। সে তলোয়ার নামিয়ে সরে এল লঙ্কেশের কাছ থেকে। গর্জন করে বলল, শকুনের বাচ্চা তোর হবে, মহাসেনাপতির আদেশে আমি তোর শিরচ্ছেদ করব, শূদ্রপল্লীর সবাই এখন বন্দি, আমার সঙ্গে সবাই নগরে যাবে, গিয়ে ছয় সাগর খুঁড়ে জল বের করবে, কিন্তু তার আগে সোনারকলসি চাই, বল সেই কলসি কোথায় সরিয়েছিস, কলসি না পেলে ঘরে ঘরে সেনাবাহিনী যাবে, না পেলে ঘরে ঘরে আগুন দিয়ে দেবে, সেনাবাহিনী তা পারে। সব পারে, কোথায় সেই বুড়ো পরাশর? তাকে ডাক, বুড়ো বলে তার রেহাই নেই, শুনেছি জল খুঁড়ে বের করার বুদ্ধিটা তার, কে বলেছিল রত্নাকরসাগর খুঁড়তে, কোথাও জল নেই তোদের জল চাই, কার আদেশে মাটি খুঁড়ে জল বের করেছিস, মাটি কি তোদের? নগরের অমাত্য, ধনীমানীরা জল পাচ্ছে না ; তোরা কী জল টেনে বের করলি পাতাল থেকে, পাতাল কি তোদের? শতজন্ম পাপ করলে শুদ্দুর হয়, সেই শুদ্দুরের এত সাহস যে শুকনো সায়রের মাটি খোঁড়ে ...।

উদ্ধবনারায়ণ গর্জন করছিল। ক্রমাগত ডেকে যাওয়া হিংস্র সারমেয়ের মতো উদ্ধবের কণ্ঠস্বর। তা শুনতে শুনতে একজন আচমকা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

এইভাবে কেউ জ্ঞানহারা হয়, কেউ ভয়ে গুটিয়ে যায়, কেউ কেউ ভাবে কী প্রয়োজন ছিল দিনের পর দিন খনন করে জলের মুখ দেখা। জল এখন চলে গেল সেনাবাহিনীর হাতে। ওই যে রত্নাকর সাগর—সরোবরের চারকোণে চারসৈনিক খোলা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। শূন্য কুম্ভ নিয়ে ফিরে আসছে রমণীরা। পল্লীর সবচেয়ে জোয়ান লঙ্কেশকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলেছে সৈনিকরা। উদ্ধব দলপতি গর্জন করে উঠছে—

কার জয় হলো, কার?

শূদ্রপল্লীর মানুষজন বলে, রাজার মহাসেনাপতির।

জল কার হলো, কার?

মহাসেনাপতি, রাজার।

পাতাল সমুদ্র তাহলে কার?

মহাসেনাপতির, রাজার।

আকাশ সমুদ্র কার?

মহাসেনাপতির.....।

উদ্ধব তলোয়ারখানি আকাশে উঁচিয়ে আবার গর্জন করে ওঠে, সোনার কলস, কার হবে সেই সোনার কলস?

জনতার গলার স্বর ম্রিয়মাণ, কোনোরকমে বলল, রাজার, মহাসেনাপতির।

একজন বুদ্ধিমান বলল, সোনার কলসি প্রভুর, প্রভু উদ্ধব দলপতির।

উদ্ধব বলল, অহলে সোনার কলসি এনে দে।

সবাই চুপচাপ। স্তব্ধতা গভীর হতে লাগল। দিনমানে রাত্রি নেমে এল যেন।

কোথায় সেই সোনার কলসি, তা দ্যাখেনি কেউ কোনোদিন। সোনার কলস পাতাল সমুদ্রে অফুরন্ত জল নিয়ে ভেসে আছে। সবাই ভাবছিল সোনার কলস, তা যদি এই নিষ্ঠুর উদ্ধবের হাতেও এনে দিতে পারত, শেষ হত এই অনাবৃষ্টির কাল, জলে ভেসে যেত উজ্জয়িনী নগর, অবন্তীদেশ, শিপ্রা, গন্ধবতী দুই নদী। মহাকালের মন্দির চূড়ায় এসে দাঁড়াত প্রোষিতভর্তৃকা বিরহিণীর কাছে স্বামীর খবর নিয়ে আসা মেঘ।

ছিয়াত্তর

গন্ধবতী আর তাম্রধ্বজ খুব ভোরে নগরে প্রবেশ করেছিল। ভোরে নগর ছিল নিঃস্তব্ধ। বাতাস ছিল নরম, মোলায়েম শীতল। মহাকাল মন্দিরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে তারা শুনেছিল সেনাবাহিনীর শিঙার ডাক, ভেরির শব্দ। অবাক হয়ে দেখেছিল সেনাবাহিনী যাচ্ছে পুবের দিকে। ভেরি আর শিঙার শব্দে গন্ধবতী দাঁড়িয়ে পড়েছিল, ফিসফিসে গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, যুদ্ধে যাচ্ছে?

তাম্রধ্বজ অবাক হয়েছিল, এখন আবার কোথায় যুদ্ধ? কালও তো নগরেই ঘুরেছিল সে, যুদ্ধের কথা শোনেনি, আর এই ক্ষুদ্র বাহিনী কোথায় যুদ্ধ করবে? ক্লান্ত সৈনিকরা যেন ধুঁকতে ধুঁকতে হাঁটছে। তাম্রধ্বজের কাছে জবাব না পেয়ে গন্ধবতী নিজের অনুমানকে নিজেই সমর্থন করেছিল, হ্যাঁ যুদ্ধেই যাচ্ছে, এইরকম শিঙাই তো বাজে, ওই রকম ভেরি, আমার খুব মনে আছে।

তাম্রধ্বজ তখন আবিষ্কার করেছিল অশ্ব পৃষ্ঠাসীন উদ্ধবকে। আগে আগে চলেছে বাহিনীর দলপতি হয়ে। সে গন্ধবতীকে টেনে সরিয়ে এনে শিরিস গাছের আড়ালে চলে গিয়েছিল। এই প্রথম উজ্জয়িনী নগরে এসে তার ভয় করল। এতদিন একা একা নিঃশঙ্কচিত্তে ঘুরে বেড়াত। আচার্য নেই, আশ্রম প্রায় বন্ধ, তবে রাজানুগ্রহ বন্ধ হয়নি কেননা আচার্যর মৃত্যু সংবাদ কোথাও কেউ জানে না, পৌঁছয়নি। আর সে হলো আচার্যর শিষ্য, তাকে কেউ বিরক্ত করবে না এই নগরে তা সে জানে। কিন্তু গন্ধবতীর কাছে উদ্ধব নামের রাজকর্মচারীর যে পরিচয় পেয়েছে সে, আর নগরে ইতস্তত ঘোরাঘুরিতে যেভাবে চিনেছে তাকে, ভয় করল তাম্রধ্বজের। ওই ক্ষুদ্রবাহিনীর দলপতি হয়ে উদ্ধব চলেছে পুবদিকে। কোথায় চলেছে? উদ্ধব তো সত্রি, সেনাবাহিনীর অধিপতি হলো কবে? কী ভীষণ ব্যাপার হয়ে গেল এটি? উদ্ধব যদি সেনাবাহিনীর অধিপতি হয় গন্ধবতীর বেঁচে থাকাই তো কঠিন হয়ে দাঁড়াত। সেনাবাহিনী চলে যেতে ভীতা গন্ধবতী বলল, আমাদের গাঁয়ে যাচ্ছে না তো?

কী জানি, হতেও তো পারে, কিন্তু তাহলে তো দিক পরিবর্তন করতে হতো।

তখন গন্ধবতী বলল, হ্যাঁ, ওই দিকে তো আমাদের গ্রাম নয়।

তাম্রধ্বজ বলল, হ্যাঁ, অন্যদিকে যাচ্ছে।

ওই দিকে কী আছে?

তাম্রধ্বজ বলল, চলো গন্ধবতী আমরা মহাকালেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বিদিশার দিকে রওনা হই, উজ্জয়িনী আর মানুষের বাসের উপযোগী হয়ে থাকবে না, ওই দুরাত্মা উদ্ধব সেনাবাহিনীর অধিপতি হয়েছে, মানুষের জীবনই দুর্বিষহ হয়ে উঠবে, দীর্ঘকালের অনাবৃষ্টিতে মানুষের কেন রাজা, সেনাপতি সবারই বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়েছে, সিদ্ধান্ত সব ভুল হয়ে যাচ্ছে।

গন্ধবতী জিজ্ঞেস করল, ওই দিকে কী আছে?

তাম্রধ্বজ বলল, তোমার কোনো ভয় নেই গন্ধবতী।

গন্ধবতী বলল, আমাকে না পেয়ে মায়ের উপর অত্যাচার করবে না তো উদ্ধব, সেনাবাহিনী শুনেছি সব পারে, সেনাবাহিনীর অপরাধ অপরাধ নয়।

তাম্রধ্বজ বলল, সে কথা সত্য, তবে তা পরাজিত দেশে, নিজ নগরে, নিজ দেশে সেনাবাহিনী স্বভাবত অপরাধ করে না, যদি করে রাজা তা ভাল চোখে দ্যাখেন না।

গন্ধবতী বলল, রাজার কানে কি সেই অপরাধের কথা পৌঁছয়?

তাম্রধ্বজ বলল, একদিন না একদিন পৌঁছবেই।

গন্ধবতী চুপ করে থাকে। ধীরে ধীরে হাঁটছিল সে। তার হাত ধরে আছে তাম্রধ্বজ, মাথায় উষ্ণীষ, কাঁঠের লাঠিতে পেটিকা, তারা দুটিতে যেন ভিনদেশ থেকে এসেছে মহাকাল দর্শনে, যেমন মানুষের

আসা যাওয়া ক'দিন আগেও খুব স্বাভাবিক ছিল এই নগরে।

কয়েক পা এগিয়ে গন্ধবতী যেন গর্জে উঠল, অবরুদ্ধ ক্রোধে ঘুরে দাঁড়াল, উদ্ধব যে দেশে সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেয়, সেই বাহিনী কেন অপরাধ করবে না, করবেই, কী সব্বোনাশ! ওর কি কোনো যোগ্যতা আছে সেনাবাহিনীর অধিপতি হওয়ার?

থাক গন্ধবতী, আমরা তো এই দেশে থাকছি না।

তুমিই না বলেছ দিন পরিবর্তন হচ্ছে, ভাল হবে মানুষের, বর্ষার মেঘ আসবে।

তা যদি না হবে তো রত্নাকর সাগরে জল উঠল কেন?

গন্ধবতী আচমকা বলল, জল ওঠেনি।

ওঠেনি মানে, শূদ্রপল্লীর রত্নাকর সাগরের কথা বলছি।

গন্ধবতী বলল, কোথাও জল ওঠেনি।

তাম্রধ্বজ বলল, আমি নিজ চোখে দেখেছি সেই জল, আমাদের তো যাওয়া হয়নি শূদ্রপল্লীতে, মহাকাল প্রণাম সেরে আমরা শূদ্রপল্লীতে যাব, রত্নাকর সাগরের জল দেখে বিদিশার পথে যাত্রা করব।

গন্ধবতী বলল, তুমি যা দেখেছ ভুল দেখেছ, এই নগরের কোথাও জল নেই, ছায়া নেই, সেনাবাহিনীর অধিপতি হয়েছে উদ্ধব, গিয়ে দ্যাখো সব বদলে গিয়েছে, সেই জল আর নেই, হে মহাকাল, উদ্ধব কি তোমার চোখের বাইরে!

তাম্রধ্বজ ধরল গন্ধবতীকে, বলল, উত্তেজনা থাক, আমাদের বহুদূর যেতে হবে, এ জগতে ভাল এবং মন্দ পাশাপাশি বাস করে দিনরাত্রির মতো, উদ্ধবের না হয় পদোন্নতি ঘটল, কিন্তু আমাদের জীবনও একসূত্রে গাঁথা হলো একই সময়ে, এটা তো মিথ্যা নয়।

গন্ধবতী আঁকড়ে ধরল তাম্রধ্বজকে, তার চোখমুখে ভয়ের ছায়া ঘনিয়ে এল যেন, বিড়বিড় করল, যদি মিথ্যা হয়ে যায়, কী জানি আমার খুব ভয় করছে, মনে হচ্ছে যা কিছু মঙ্গলজনক, সবই অসত্য, একমাত্র উদ্ধবনারায়ণই সত্য, সেনাবাহিনী নিয়ে ও আমাদের জীবন ছারখার করে দেবে, আমার আর কোনোদিন উজ্জয়িনী আসা হবে না, আমি চিরকালের মতো উজ্জয়িনী ছেড়ে যাব।

তাম্রধ্বজ ভাবছিল তাইই তো সত্য। দশার্ণ দেশ থেকে আবার কবে আসবে এখানে গন্ধবতী? দূর তো কম নয়। সে মনে মনে পরিকল্পনা করে নিচ্ছিল কীভাবে গন্ধবতীকে নিয়ে যাবে ওই দূর পথে। কোথায় কোন পান্থশালায় আশ্রয় নেবে। এমন অনাবৃষ্টির দিনে পান্থশালাগুলি আছে তো! পথের ধারে ছায়া মেলে দেওয়া বনস্পতিরা? পথের দুপাশের সম্পন্ন গ্রামাবাসীরা? সবুজ বন, কুলকুল বয়ে যাওয়া ঝর্ণা, নদী! আছে তো? গন্ধবতীকে দেখতে গ্রামবধূরা এসে আলো করে তুলবে তো বনস্পতির ছায়া, নদীতীরের স্তব্ধতা? তারা হাসতে হাসতে একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়বে, তারপর গন্ধবতীর মুখখানি দুহাতে তুলে ধরে চিনতে চাইবে। কোন গাঁয়ের মেয়ে তুমি, কার সঙ্গে বিয়ে হলো, যাচ্ছ কোন দেশে? শুনে গন্ধবতীর মুখে কোনো কথা নেই, অধোমুখে মাটির দিকে চেয়ে থাকবে। তারপর কোনো প্রাচীনা এসে তাম্রধ্বজকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে হেসে বলবে, বরের গুমরে বউ মুখ তোলে না হে! এমন একখান পুরুষমানুষ পেলে আবার বিয়ে করতে সাধ হয়রে মেয়ে, এতো দেখি মহাদেব, কোথায় ঘর তোমার বাছা, ওই বউ-এর সতীন নেবে গো তুমি?

শুনে গন্ধবতী মুখ তোলে।

গন্ধবতীকে দেখে বহুপ্রাচীনা তার আঁচল উড়িয়ে নেচে নিল একপাক, গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠল কোনো এক গান যেন। গান থামিয়ে বলল, ও বউ, আমারে সতীন করে নে, রাঁধা বাড়া তুই করবি আর সোয়ামী লিয়ে আমি আহ্লাদ করব, তারে আমি দুধ খাওয়াবো, মিঠাই খাওয়াবো, পরমান্ন খাওয়াবো, তারপর ঘুম পাড়াব, ঘুমা বাপ ঘুমা, ওই যে উদ্ধব আসে গাধায় চেপে, উদ্ধবের এ্যাত্তো বড় বড় দাঁত, লাল লাল চোখ, লাল লাল জিভ, হাতে পায়ে বড় বড় নখ, গা ভর্তি চুল....।

চমকে ওঠে তাম্রধ্বজ, তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তালঢ্যাঙা মহাপার্শ্ব। দুচোখ কচলে নিল সে, এইটুকু সময় যেন ঘোরের ভিতরে ছিল, সুখ থেকে ভয়ের দিকে চলে যাচ্ছিল সে। গন্ধবতী তার গা ঘেষে মুখখানি উত্তরীয়তে ঢেকে মাটির দিকে চেয়ে আছে। আর মহাপার্শ্বও তার চেনা মানুষটির পাশে একটি স্ত্রীলোককে দেখে সঙ্কোচে পড়েছে। বুঝতেই পেরেছে স্ত্রীলোকটি এই ব্যক্তির স্ত্রী হতে পারে।

সেই সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। একদিনের আলাপেই এই দশার্ণ দেশীয় ব্যক্তির যে পরিচয় সে পেয়েছে তাতে অন্যরকম ধারণা করা কঠিন। তবু খোঁজ তো নিতে হয়। আগের দিনই তো, মানে এই তো ক'দিন আগে যে কথাবার্তা হয়েছিল দেবদত্তার বাড়ি পর্যন্ত যেতে যেতে তাতে তো ধারণা হয়েছিল মানুষটি অবিবাহিত, দূরদেশে পড়ে আছে শুধুমাত্র জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষার জন্য। এর মধ্যে বউ জুটে গেল কীভাবে? জুটেইছে বটে, দশার্ণ দেশ থেকে এতদূরে স্ত্রীলোকসহ বিদ্যাশিক্ষা করতে তো সে আসেনি। নাকি অন্য কোনো ব্যাপার? মহাপার্শ্ব তো স্ত্রীলোক মুখটির দেখতে পাচ্ছে না। মুখখানি, চোখদুটি দেখলে ধরে ফেলতে পারত আসলে ওর মনে কী আছে। মানে তিনি এই পুরুষমানুষটির কে? স্ত্রী না অন্য কোনো সম্পর্কে জড়িত স্ত্রীলোক। কোনো গৃহস্থ ঘরের বউকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না তো এই তাম্রধ্বজ? দেবদত্তার সঙ্গে সেদিনকার আলাপে আর একটি স্ত্রীলোকের কথা উঠেছিল, কী নাম যেন তার? ওই বৃদ্ধের পুত্রবধূ। পুত্রটি আবার যুদ্ধে গিয়ে ফেরেনি। ফেরেনি মানে যে মরে গেছে এমন কোনো কথা নয়। সেই সব দেশে থেকে যেতে পারে। এমন তো থেকে যায় কত সৈনিক কত দেশে। তারপর সেই দেশের মানুষের মতো হয়ে ওঠে। যবন দেশের মানুষ কি এদিক ওদিকে থেকে যায়নি? সৌরাষ্ট্র, মালব দেশে তাদের কি চোখে পড়ে না? মহাপার্শ্ব গণিকালয়ের জন্য পুরুষ সংগ্রহ করতে করতে এতসব জেনে গেছে। সেই সব পুরুষমানুষরাই বলে দেয় তাদের কোন পুরুষের কে এই দেশে যুদ্ধ করতে এসে যবনরা এই ভাবে তো এখানে ওখানে রয়ে গেছে, সুভগ দত্ত শ্রেষ্ঠী যে দেশে যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে যে দেশের লোভে লোভে গণিকা দেবদত্তা যাচ্ছে, সেই বাহ্লিক দেশ—গন্ধর্বের দেশেও গন্ধর্ব পুরুষরাও নাকি এক সময়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে ছিল। যুদ্ধ করতে এসে থেকে গেছে সেই এক নদীর ধারে যে নদীতে যতো ডুব দেবে তুমি, ততো রূপবান হয়ে উঠবে। যতো ডুব দেবে, ক্লেদ ততো ধুয়ে যাবে। যতো ডুব দেবে এ জীবনের পাপ ততো ভেসে যাবে। এসব কথা দেবদত্তার। আকসু নদীর কথা মহাপার্শ্বকে শুনিয়েছে দেবদত্তা। বলেছে সে আকসু নদীর ধারে যেতেই না শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে তার সন্ধিস্থাপন। সেখানে আছে দিগন্ত বিস্তারি এক পর্বত মালা, তার ছায়া পড়ে আকসু নদীর জলে। সেই নদীর লোভে মহাপার্শ্বও যাচ্ছে শ্রেষ্ঠীর সার্থবাহর সঙ্গে। মহাপার্শ্বর সঙ্গে যাচ্ছে চতুরিকা। এখনো সম্পূর্ণ রাজি হয়নি বটে, কিন্তু যাবে যে তা জানে মহাপার্শ্ব। যাবে নদী তার পর্বতমালার ছায়ার লোভে নয়, যাবে বুড়ো বণিকের সঙ্গে সন্ধির আশায় আশায়। হায় মেয়েমানুষ! তার মন বোঝে না সে নিজেই।

মহাপার্শ্ব জিজ্ঞেস করল, কুশল তো মহাশয়?

জোড় হাতে প্রতিনমস্কার করল তাম্রধ্বজ, হ্যাঁ, তোমার সব ভাল তো, সেদিন খুব উপকার করেছিলে, শ্রেষ্ঠী কি রওনা হলেন?

তাম্রধ্বজের কথায় কান দিল না মহাপার্শ্ব। যতক্ষণ না কৌতূহল নিবারণ হচ্ছে ততক্ষণ তার স্বস্তি নেই। এ হলো তার অভ্যাস। মন সমস্ত সময় সন্দেহপ্রবণ, ভালকে মন্দ দেখতে অভ্যস্থ। হতেও তো পারে এমন, দিনদুপুরে, ভর সক্কালে গৃহস্থ ঘরের বউ অভিসারে এসে মুখ লুকোচ্ছে উত্তরীয়র আড়ালে। যে নগরে বৃষ্টি হয় না বহুকাল, যে নগরের নদী, সরোবর শুকিয়ে পড়ে থাকে, আকাশ পুড়তে পুড়তে বেঁকে যায় একটু একটু করে, সেই নগরে এমন অনাসৃষ্টি হতেই পারে। বহুকাল বৃষ্টি না হলে এমন হয় বুঝি, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে থাকে মানুষ। দিন দুপুরে, ফটফটে আলোর ভিতরেও অভিসারে চলে গৃহস্থের বউ, মেয়ে। আচ্ছা কাল কি রাত্তির হয়েছিল? সন্ধে? তারপর শৃগালের প্রহর ডাকা রাত, গভীর রাত? হয়েছিল তো মনে হয় মহাপার্শ্বর। সে না সন্ধে থেকে বসেছিল চতুরিকার ঘরের বাইরে। চতুরিকা খুব রেগে আছে। ভয়ানক। পারলে মহাপার্শ্বকে মেরেই ফেলে, শূলে চাপায়, আগুনে পুড়িয়ে মারে। কিন্তু সে কি গত কালের কথা, না গত পরশুর কথা? গত পরশুই হবে হয়ত। মহাপার্শ্ব আচমকা জিজ্ঞেস করে, আজ্ঞে মহাশয়, গত পরশু না গত সন্ধ্যা, কোন দিন বলুন দেখি?

চমকে গেছে তাম্রধ্বজ, শ্রেষ্ঠী গত পরশু চলে গেছেন?

মহাপার্শ্ব জিভ কাটল, না না, আগামী পরশু তো রওনা হবেন, কিন্তু গত পরশু তো সন্ধে হয়েছিল, হয়েছিল কিনা?

তাম্রধ্বজ কেন গন্ধবতীও অবাক। সে উত্তরীয়র আড়াল থেকে দেখল মহাপার্শ্বকে। দেখে কি উন্মাদ মনে হচ্ছে? বৃষ্টি না হলে মানুষ ক্রমশ উন্মাদ হয়ে যেতে থাকে, একথা তার মা বলেছে, ঠাকুদ্দাও।

এও কি তেমন এক মানুষ যার ভিতরে উন্মাদ-লক্ষণ ক্রমশ ফুটে উঠছে। না হলে বলবে কেন গত পরশু সন্ধ্যা হয়েছিল কিনা। হয়েছিল কিনা ও জানে না?

তাম্রধ্বজের জবাব শুনে মহাপার্শ্বর মনে হলো তাহলে গতকাল বোধহয় সন্ধ্যা হয়নি। তাইই হবে। গতকাল নয়, গত পরশুই সে ছিল চতুরিকার ঘরের সামনের উঠোনে বসে। আর চতুরিকা তাকে একনাগাড়ে অশিষ্ট কথা বলে যাচ্ছিল। অশিষ্ট বাক্যবাণে বিদ্ধ করছিল। সেই সন্ধ্যার পর আর সন্ধ্যা হয়নি। সন্ধ্যা হয়নি, তাই ধরা যাচ্ছেনা দিন বা রাত্রি। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বড়ঘরের মেয়ে বা বউ মুখ ঢাকা দিয়েছে উত্তরীয়তে। বৈদ্যরাজ নহুষ শর্মণের কথা তাহলে সত্য হলো। মহাপার্শ্ব আকাশে তাকায়। সত্যি সত্যি যেন সূর্যের রথের চাকা বসে গেছে আকাশ মণ্ডলে।

তাম্রধ্বজের কৌতূহল হলো, জিজ্ঞেস করল, সন্ধ্যা হবে না কেন?

মহাপার্শ্ব নিজের মাথার চুল টানল নিজে নিজে, বিড়বিড়িয়ে বলল, তারপর আর সন্ধে হয়নি মহাশয়, দিনই চলছে, তাইতো।

সকাল থেকে দিন চলছে।

হ্যাঁ সকাল আর দিন কিছুই ফুরোচ্ছে না, এই সময় অভিসারিকাদের খুব বিপদ, বলতে পারেন অভিসারের দিন শেষ, পরপুরুষ, পরনারী গমনের দিন শেষ, আমাকে এদেশ থেকে পালাতে হবে শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে, আপনি যাবেন মহাশয়, আকসুনদীর দেশে, ওই নদীতে নাইতে পারলে এ জীবনের সমস্ত পাপ ধুয়ে যাবে।

আমরা বিদিশা যাচ্ছি, দশার্ণ দেশে ফিরে যাচ্ছি।

পালান, খুব তাড়াতাড়ি চলে যান, উজ্জয়িনীতে দিন ফুরোচ্ছে না।

কী বলছ তুমি? অবাক হলো এবার তাম্রধ্বজ। এতক্ষণে সম্যক উপলব্ধি হলো কী বলতে চায় এই তালগাছের মতো সিড়িঙ্গে মানুষটা।

আজ্ঞে যা বলছি সত্য বলছি, এক বর্ণও মিথ্যে হবে না, সেই গতকাল থেকে যে দিন চলছে তার আর শেষ নেই, রোদে পুড়ে পুড়ে উজ্জয়িনী শেষ হয়ে যাবে।

উত্তরীয়র আড়াল থেকে গন্ধবতী আবার দেখল মহাপার্শ্বকে। সে কখনো উন্মাদ দ্যাখেনি এর আগে। এই প্রথম। মানুষটা কেমন জোর দিয়ে কথা বলছে। গতকাল থেকে নাকি দিন চলছে! খিলখিল করে হেসে ফেলল গন্ধবতী, হাসির দমকে তার সমস্ত শরীরে যেন ঢেউ উঠল। জলের মতো বয়ে গেল যেন সে। এত সময় ধরে তার মনের ভিতরে যে ভয়, যে বিপন্নতা জন্ম নিয়ে নিয়ে বড় হয়ে উঠছিল, তা যে কোথায় উধাও। সে ঝপ করে তাম্রধ্বজের একটি হাত ধরে ফেলল, ইনি কে?

এই নগরের মানুষ, আমার উপকার করেছিলেন একদিন।

আবার হাসল গন্ধবতী, ইনি কি উন্মাদ?

না, না তা হবে কেন, রোদে মাথা গরম হয়েছে।

গন্ধবতী বলল, এমন কখনো হতে পারে, আমরা সমস্ত রাত কাটালাম পথের অন্ধকারে, তারাদের আলোয় পথ হাঁটলাম, আর ইনি কিনা বলেন রাত ছিল না, দিনই চলছে, উন্মাদ ব্যতীত এমন কথা কে বলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। মহাপার্শ্ব যুক্ত করে গন্ধবতীকে অভিবাদন জানাল। মুখখানি সে দেখে নিয়েছে এর ভিতরেই। আহা কী সুন্দর! কে বলে দেবদত্তা সুন্দরী? ইহার তুল্য সুন্দরী যেন এ জগতে আর নাই। এ কে? এমন রূপবতীকে এই নগরের প্রধান গণিকা করে তোলা কোনো ঘটনাই নয়, হয়ে যাবে। দেবদত্তা চলে যাচ্ছে আকসুনদীর দেশে, তার গৃহখানিতে এই গান্ধর্বীর অধিষ্ঠান হতে পারে। এই নারী যদি উজ্জয়িনীর প্রধান গণিকার স্থান গ্রহণ করেন, মহাপার্শ্ব আকসুনদীর দেশে যাবে না। এঁর পদতলে পড়ে থাকবে এঁর দাস হয়ে। এতসব ভেবে নিয়ে মহাপার্শ্ব বলল, মহাশয়, এই দেবীকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

জবাব পাওয়ার পর মহাপার্শ্ব বলল, ইনি কে, কোন ঘরের কন্যা, কোন ঘরের বধূ, পরস্ত্রী নাকি, কী করে পেলেন, পরিচয় কী এঁর?

তাম্রধ্বজ বিব্রত হলো। গন্ধবতী কুঁকড়ে গেছে। তার হাসিমুছে গেছে। সে গন্ধবতীর হাত ধরে টানল, চলো, রোদ বেড়ে যাচ্ছে।

মহাশয়, যদি বলেন আমি গণিকালয়ে সংবাদ দিতে পারি, গণিকাধ্যক্ষ আছেন রাজসভায়, তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারি এই রমণীকে, এমন সুন্দর নারীরত্নর সন্ধান পেলে সকলেই খুশি হবেন, রাজাও, প্রধান গণিকা চলে যাচ্ছেন নগর ছেড়ে..., আমি রাজসত্রি উদ্ধবকে চিনি, তাকে ডেকে আনি।

আর্তনাদ করে স্বামীকে আঁকড়ে ধরল গন্ধবতী। তখন তাম্রধ্বজ কঠিন হলো, বলে উঠল, তুই নরকের কীট, ক্লেদ নাড়াচাড়া করতে করতে সমস্ত সময় তোর মন ওইদিকে, আমরা স্বামী স্ত্রী, তুই কাকে কীভাবে অপমান করছিস খোঁজ রাখিস, যাব রাজসভায়?

শুনেই মহাপার্শ্ব তীর বেগে তাদের সামনে থেকে অন্তর্হিত হলো। ইস! এই সরল সত্যটা সে অনুধাবন করতে পারেনি? হায় হায়, এখন শ্রেষ্ঠীর পিছু পিছু নগর ছেড়ে যেতে পারলেই বাঁচে।

সাতাত্তর

মহাকাল মন্দির আগে দ্যাখেনি গন্ধবতী। গন্ধবতী নদীও আগে দ্যাখেনি গন্ধবতী। উজ্জয়িনী নগরও তার প্রথম দেখা। প্রথম দেখার বিস্ময়ের ভিতরে আনন্দ ছিল কম, অথচ গত রাত্রি থেকে তারা তো স্বামী স্ত্রী, সে আর তাম্রধ্বজ। জীবনের চলনই বদলে গেছে। শরীর মনের শিহরণ বয়ে নিয়েই তো চলছে দুজনে।

মহাকাল মন্দিরের চূড়া আকাশ ছুঁয়েছে। সেই চূড়া সুবর্ণমণ্ডিত। মহাকাল মন্দিরের গায়ে গন্ধবতী নদী প্রায় জলহীন। শুকনো বালি বাতাসে উড়ছে। নদী যে এত রিক্ত হয়ে যায় তা যেন দ্যাখেনি আগে গন্ধবতী। তাদের গম্ভীরাও শুকিয়ে গেছে প্রায়, মধ্যভাগে রয়েছে শীর্ণ এক গাছি চুলের মতো জলরেখা। কিন্তু তাকে রিক্ত মনে হয়নি এমন। প্রতি বছর গম্ভীরা যেভাবে বৈশাখে নির্জলা হয়ে যায়, তার চেয়ে অনেক অনেক শূন্য হয়ে গেছে এবার, কিন্তু সেখানে প্রকৃতিও তো শূন্য, তাই নদীকে আর কতটা শূন্য মনে হবে? গন্ধবতী নদীর ধারে মহাকাল মন্দির এই অনাবৃষ্টির দিনে তার বিপুলতা যেন আরো বেশি করে মেলে ধরেছে আকাশের নীচে। সেই মন্দিরে কোনো রিক্ততা নেই, বরং কঠিন রৌদ্রে তার গায়ের ঝামাপাথর যেন আরো কঠিন হয়ে উঠেছে। পাথরের গায়ে রোদ জমে যাচ্ছে। মন্দির চাতালে নগ্ন পা রাখাই দায়। এই মন্দির যেন উদ্ধত এক রাজপুরুষের মতো প্রত্যাখ্যান করছে গন্ধবতী আর তার স্বামীকে।

গন্ধবতী বলল, চলো ফিরে যাই।

মহাকাল দর্শন করবে না?

গন্ধবতী জোড় হাতে প্রণাম করল, তারপর বিড়বিড় করে বলল, হে মহাকাল, তুমি আমাদের রক্ষা করো, উজ্জয়িনীকে বাঁচাও।

তাম্রধ্বজ বলল, আর কোনোদিন আসা হবে কিনা জানি না।

গন্ধবতী চুপ করে থাকল। সে মনে মনে যে মহাকালকে স্মরণ করছিল সেই মহাকাল যেন অন্য কেউ। হায়রে মন! মন্দিরের সামনে এসে ধ্রুবপুত্র কেন আচ্ছন্ন করে তুলছে তাকে। সে এখন তাম্রধ্বজের বণিতা। তাম্রধ্বজকে ছুঁয়ে আছে সে। এখন কেন ধ্রুবপুত্র এসে দাঁড়ায় মনের গভীর নির্জনতায়। মহাকাল মন্দিরকে বর্ণনা করত ধ্রুবপুত্র। মহাকাল মন্দির উজ্জয়িনীকে দশদিগন্তে মেলে ধরেছে সোনার নগরী বলে। সেই মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়ে সে। মাথার উপরে আগুন। পায়ের নীচে আগুন। মন্দির এত বৈভবমণ্ডিত যে তার পাশে বয়ে চলা নদীটি যেন মাথা নামিয়ে আছে। মহাকালের ঐশ্বর্যের কাছে নদী গন্ধবতী একেবারেই রিক্ত। তাম্রধ্বজ হাত ধরেছে গন্ধবতীর, তাহলে ফিরি চলো।

হ্যাঁ ফিরি, আমার ভয় করছে গো।

দেবমন্দিরে এসে ভয় করবে কেন?

জানি না, মন্দির এত শূন্য কেন?

আছে, ভিতরে সবাই আছে, সন্ধ্যার পর এদিক ওদিক থেকে মানুষজন আসে, যে তাপপ্রবাহ চলছে! নগরেই তো মানুষ কম।

গন্ধবতী দু'চোখ বুঁজল। ভাবতে চাইল মহাকালেশ্বর নীলকণ্ঠ মহাদেবকে। ধ্রুবপুত্রের মুখখানি ভেসে এল নির্জন অন্ধকারে। এই যে সে চলে যাচ্ছে উজ্জয়িনী ছেড়ে, আর কখনোই হয়ত আসা হবে না। আর কি দেখা হবে ধ্রুবপুত্রের সঙ্গে? ধ্রুবপুত্রের ভাল হোক, সে ফিরে আসুক, ফিরে আসুক। মন্দিরের

কোটরে কোটরে বাসা বেঁধে থাকা কবুতরেরা তখন বকম বকম করে উঠল। গন্ধবতীর মনে হলো ওই কবুতরেরাও বোধহয় ওই একই কথা বলছে। পায়ের নীচে পাথর তখন আর গরম লাগছিল না। রোদের তাপও যেন কমে গেল। গন্ধবতী বলল, চলো, আমরা যাত্রা করি।

হাঁটতে হাঁটতে গন্ধবতীর মনে হতে লাগল মন্দিরের ছায়া থেকে ধ্রুবপুত্রের ছায়া যেন তার মনের ভিতরে প্রবেশ করছে। বড় মোলায়েম, শীতল সেই ছায়া। তার ভিতর দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে দশার্ণের পথে। ধ্রুবপুত্রকে মনে করে রোদ তো নরম লাগছে, শান্ত হচ্ছে সব কিছু। সে শক্ত করে চেপে ধরেছে তাম্রধ্বজের হাত, বিড়বিড় করে বলল, কীভাবে কী হয়ে গেল!

হ্যাঁ, এসেছিলাম জ্যোতির্বিদ্যা শিখে নিতে, কী হয়ে গেল!

গন্ধবতী বলল, এসেছিলে গণনা করতে, কী হয়ে গেল!

আমি ধ্রুবপুত্রকে খুঁজতে বেরোব ভেবেছিলাম, কী হয়ে গেল!

গন্ধবতী বলল, ধ্রুবপুত্র উজ্জয়িনী না ছেড়ে গেলে এমন হত না।

কী হতো তাহলে?

কী হতো তাও আমরা জানি না।

হয়ত এমনই হতো, অন্য কোনোভাবে অন্য কোনো পথে, আমি কি তোমাকে দেখতে পেতাম না কোনো ভাবেই?

গন্ধবতী নিশ্চুপ। সে ভাবছিল এই রিক্ত নিঃস্ব নগরে কেন ফিরবে ধ্রুবপুত্র? ফিরে গম্ভীরা যাবে, দেখবে গন্ধবতী নেই। ফিরে নগরে আসবে, দেখবে সেই গণিকাও নেই। ফিরে সরোবরগুলিতে যাবে, দেখবে কোথাও জলের চিহ্ন নেই। যাবে গন্ধবতী নদীর ধারে, দেখবে নদী হাড়জিরে হয়ে পড়ে আছে তাই মহাকাল মন্দিরের সৌন্দর্য অনেকটা মুছে গেছে। ওই স্রোতস্বিনীও তো মন্দিরের ঐশ্বর্য। এখন টের পেল গন্ধবতী কেন মন্দির তাকে টানতে পারল না ভিতরে। কেন বিগ্রহ তাকে নিয়ে যেতে পারল না ভিতরে। মন্দির দাঁড়িয়ে আছে স্বৈরাচারী উদ্ধবের মতো, মন্দিরের বৈভব আর নেই। মানুষ যদি জল জল করে চাতক পাখির মতো ছুটে বেড়ায়, মাঠ নদী যদি শুকিয়ে মরে যেতে থাকে, তবে মন্দিরের দেবতা কোন ঐশ্বর্যে রূপবান হয়ে থাকতে পারেন? সে তাম্রধ্বজকে বলল, শূদ্রপল্লীতে তো যাবে?

যাব, দেখবে কতজল সেখানে।

গন্ধবতী দাঁড়ায় রৌদ্রের ভিতরে, মাথার উত্তরীয় পড়ে গেছে, বলল, মহাকাল কি তাহলে শূদ্রপল্লীতে চলে গেছেন গো?

কেঁপে উঠল তাম্রধ্বজ, কী বলছ তুমি, একথা শুনলে তোমাকে অগ্নিদগ্ধ করবে প্রধান পুরোহিত, এমন কথা উচ্চারণ নিষিদ্ধ।

গন্ধবতী উত্তরীয় মাথায় টানল, বলল, মহাকালই জল?

হ্যাঁ মহাকালই জল।

মহাকালই বৃষ্টি?

হ্যাঁ মহাকালই বৃষ্টি।

মহাকালই মেঘ?

হ্যাঁ মহাকালই মেঘ।

মহাকালই সমস্ত কিছু?

হ্যাঁ মহাকালই সব, মহাকালের বাইরে কিছুই নেই এই জগতে। বলল তাম্রধ্বজ।

তাহলে মহাকাল কি সত্যিই চলে গেছেন শূদ্র বসতিতে?

তাম্রধ্বজ বলল, রত্নাকর সায়রে জল উঠেছে সত্যি, মহাকাল যদি জল হন তবে তিনি ওই সরোবরে জলের সঙ্গে মিশে আছেন, জলই তো জীবন।

মহাকালই জীবন। ফিসফিস করল গন্ধবতী।

চলো গন্ধবতী রত্নাকর সাগরে মহাকাল দর্শন করে, তপস্বী পরাশরকে দর্শন করে আমরা উজ্জয়িনী ছেড়ে চলে যাই।

যেতে যেতে তারা থমকে যায়। আবার ভেরির শব্দ, শিঙার শব্দ শোনা যাচ্ছে। শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে

আসছে। ভারী হয়ে আকাশ রৌদ্রে ছড়িয়ে পড়ছে। তাহলে কি সেনাবাহিনী ফিরছে? কোন সেনাবাহিনী? সকালে যারা যুদ্ধে গেল? তাদের যুদ্ধ কি এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল? সেই শেষ হওয়া যুদ্ধ কোথায় হলো? নাকি সেনাবাহিনীর অন্য কোনো দল, যারা গিয়েছিল দস্যুদের হাত থেকে বণিকদের রক্ষা করতে, ফিরছে। গন্ধবতী টানল তাম্রধ্বজকে, পথ থেকে দূরে পিপুল গাছের আড়ালকে আশ্রয় করল।

ফিরছিল জয়ী বাহিনী। উদ্ধবের বাহিনী উল্লাস করতে করতে ফিরছিল। সবার আগে উদ্ধব। প্রথম যুদ্ধ, প্রথম জয়। ভয়ানক উল্লাসে উন্মুক্ত তরবারী সে আকাশের দিকে উঁচিয়ে ধরছে আবার নামিয়ে নিচ্ছে। তরবারির ভার সহ্য করতে পারছে না তার শীর্ণ বাহু, তবু তরবারিই তো শক্তি, তাই তার বিক্রম দেখাতেই হয়, দেখাতে পারলে যেন উদ্ধবের দেহ সবল সুন্দর হয়ে ওঠে। অশ্বারোহী উদ্ধব যখন তরবারি আকাশের দিকে উঁচিয়ে ধরে, মনে হয় সে যেন আকাশকেই বিদ্ধ করতে চায় তরবারির অগ্রভাবে। উন্মুক্ত তরবারিতে তখন সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়, ঝকঝক করে ওঠে অস্ত্রখানি। গন্ধবতীর মনে পড়ল মহাকাল মন্দিরের সুবর্ণ মণ্ডিত শৃঙ্গের কথা। কেন যে মনে পড়ল? সে সভয়ে চোখ বুঁজে ফেলল। শিঙা আর ভেরির শব্দ আরো তীক্ষ্ণ আরো গম্ভীর হলো। ওই যে এসে পড়েছে উদ্ধবের বাহিনী। পদাতিক সৈন্যদের হাতে রজ্জুর অগ্রভাগ। সেই রজ্জুর অন্য প্রান্ত বেঁধেছে বন্দিদের দুটি হাত একসঙ্গে। সৈন্যরা উল্লাসে গর্জন করছে, বন্দিরা মাথা নামিয়ে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে বেঁকে যাচ্ছে ধনুকের মতো। দেখতে দেখতে তাম্রধ্বজ আর্তনাদ করে ওঠে অস্ফুট স্বরে, এ কী, কাদের নিয়ে যাচ্ছে, কেন নিয়ে যাচ্ছে, কোথায় গিয়েছিল সেনাবাহিনী?

তাম্রধ্বজের আর্তনাদে গন্ধবতী চোখ মেলল, চোখ মেলতে মেলতে ভাবল এদিকটা তো গম্ভীরা নয়। সেনাবাহিনী গম্ভীরা থেকে তাহলে ফিরবে কী করে? সে এইটুকু ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে তাকিয়ে দেখল কৃষ্ণবর্ণের নিষাদপ্রায় কতগুলি মানুষকে যেন টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে সেনাবাহিনী। এরা কারা? অরণ্যচারী? এদের কি চেনে তাম্রধ্বজ?

তাম্রধ্বজ বলল, শূদ্রপল্লী থেকে ফিরছে সেনাবাহিনী।

কেন, কী হলো?

জানিনা, শূদ্রপুরুষদের বন্দি করে নিয়ে যাচ্ছে।

তস্কর নাকি দস্যু ওরা?

তাম্রধ্বজ বলল, ওরা নিরীহ মানুষ, প্রায় পক্ষকাল খনন করে রত্নাকর সাগরে জল তুলেছে পাতাল থেকে, ওদের কি অপরাধ?

গন্ধবতী ফিসফিস করল, উদ্ধব যদি সেনাবাহিনীর অধিপতি হয়, ছারখার করে দেবে সব, আমি যা বলেছিলাম।

দুজনে পিপুল গাছের আড়ালে, ছায়ার ভিতরে বসল গুটিগুটি। যুদ্ধে জয়ী সেনাপতি উদ্ধব উন্মত্ত। এতগুলি মানুষকে বন্দি করে রাজধানীতে নিয়ে যাচ্ছে, এর চেয়ে বড় সফলতা আর কী হতে পারে? উদ্ধব গর্জন করতে করতে এগিয়ে গেল। তার পিছনে পিছনে পদাতিক বাহিনী চলে গেল। একটু বাদে পথটি নিঃস্তব্ধ, নির্জন হয়ে গেল। পথের ওদিকের রৌদ্রপ্লাবিত প্রান্তর থমথম করতে লাগল।

গন্ধবতী ছায়া থেকে উঠতে চায় না, বলল, ওদের নিয়ে গেল কেন?

জানি না, শূদ্রপল্লীতে সেনাবাহিনী গিয়েছিল দেখছি।

ওরাই তো জল এনেছে সেই সরোবরে।

হ্যাঁ, ওরা সবাই শূদ্র।

গন্ধবতী বলল, সেই জলই মহাকাল?

হ্যাঁ, যেমন এই ছায়াও।

গন্ধবতী বলল, মহাকাল ওইদিন মন্দির থেকে বেরিয়েছেন হয়ত, যেদিন জল উঠেছিল সেই সরোবরে।

তাম্রধ্বজ অভিভূত হয়, বলল, তোমাকে এই রকম ভাবতে কে শিখিয়েছে?

গন্ধবতী বলল, তুমি! তুমি! মহাকাল ওদের আশ্রয়ে তাই কি সেনাবাহিনী গেল শূদ্রপল্লীতে, তুমি কী জানো?

তখন তাম্রধ্বজ ভাবছিল একদল সৈন্য গিয়েছিল দূর শূর্পারক বন্দরের দিকে যবন বণিকদের রক্ষা করতে। ক'দিন আগে এই নিয়ে কথা হয়েছিল তো গন্ধবতীর ঠাকুদ্দার সঙ্গে। তিনি বলেছিলেন সেনাবাহিনী গেছে মেঘের সঞ্চরণ রুদ্ধ করতে। সেনাবাহিনী চায় অনাবৃষ্টির কাল দীর্ঘহোক। জলের অভাব থেকে যাক, তাহলে তাদের দস্যুতার সুবিধেগুলি বজায় থাকে। সেই কথাটিই যেন সত্য হলো। সেনাবাহিনী গেল যেখানে সেখানে সরোবর জলপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেই জল নষ্ট করতে কি সেনাবাহিনী গিয়েছিল ওখানে? কী ভয়ানক কথা! কী ভয়ঙ্কর সত্য! শূর্পারক বন্দরের দিকে সেনাবাহিনী গিয়েছিল যে কারণে, সেই কারণটি সত্য হলো যেন শূদ্রপল্লীর অভিযানে। সে গন্ধবতীকে টেনে তুলল, চলো।

শূদ্রপল্লী থমথম করছিল। পুরুষরা বহুজন বন্দি হয়ে চলে গেছে উদ্ধব নারায়ণের বাহিনীর সঙ্গে। সরোবরের চার কোণে চারজন সৈনিককে বসিয়ে দিয়ে গেছে উদ্ধব। জল স্পর্শ না করে যেন শূদ্রজন। উজ্জয়িনীর রাজার আদেশ, সেনাপতির আদেশ—জল, স্থল, ছায়া, আলো, রোদ, বৃষ্টি সবই রাজার নিয়ন্ত্রণে আছে। উদ্ধব বলে গেছে তাই। রাজাদেশ ব্যতীত পাতালের জল তুলে আনা গর্হিত কর্ম হয়েছে। সেই কর্ম আরো গর্হিত হবে যদি সেই জল স্পর্শ করে পতিত শূদ্রজন। এই জল নিয়ে কী হবে তার বিধান দেবেন মহাকাল মন্দিরের প্রধান পুরোহিত দ্বিজদেব। তিনি এসে জল শুদ্ধ করবেন, তারপর সেই জল যাবে নগরে।

শুনতে শুনতে গন্ধবতীর দুচোখ দিয়ে জল নামছে। তাদের গিরে ধরেছে শূদ্রানীরা। তারা শূন্য কুম্ভ নিয়ে তপস্বী পরাশরের অদূরে বসে আছে। উদ্ধবের সাহসে কুলোয়নি তপস্বী পরাশরের ধ্যান ভাঙাতে। সে বন্দি করে নিয়ে গেছে জোয়ানদের। নগরে আরো যে ছয় সরোবর আছে নির্জলা হয়ে, তা খনন করাবে ওদের দিয়ে।

সৈনিক চারজন এখন একসঙ্গে পুকুর পাড়ের একটি নিমগাছের ছায়ায় বসেছিল ভাবলেশহীন মুখে। গন্ধবতী বলল, আমাকে একটি কুম্ভ দেবে?

কী হবে? জল তোলা নিষেধ, বলে গেছে উদ্ধব।

শুনে গন্ধবতীর মাথা থেকে উত্তরীয় খসে গেল। তেজে দপদপ করতে লাগল সে। তার মনে পড়ল সেই কতদিন আগে কুয়োপাড়ে ঘোড় সাওয়ার উদ্ধবের আগমন। কী ভয় না পেয়েছিল সে! এই মুহূর্তে সেই ভয় যেন উধাও হয়ে গেছে। সে বুঝতে পারছে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব পেয়ে উদ্ধব ক্রমশ আরো স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে। সেনাবাহিনীর ক্ষমতায় বলীয়ান উদ্ধব আরো দুরাচারী হয়ে উঠবে। গন্ধবতীর মনে হলো সে চলে যাওয়ার আগে উদ্ধবের বিরুদ্ধাচরণ করে যাবে। উদ্ধবকে সে যতটা চেনে, প্রতিরোধ পেলে ভেঙে পড়তে সময় লাগে না তার। সে বলল, উদ্ধব এলে বলবে গম্ভীরা গাঁয়ের কার্তিককুমারের কন্যা, ধ্রুবপুত্রের অনুরাগিনী, দশার্ণদেশের জ্যোতির্বিদ তাম্রধ্বজের প্রণয়িনী, সহধর্মিনী গন্ধবতী উদ্ধবের আজ্ঞা ভেঙেছে, গন্ধবতীই ছুঁয়েছে জল, গন্ধবতী জল দান করে গেছে এখানে।

তাম্রধ্বজ বলল, যাদেরই জল, দানে তা গ্রহণ করতে হবে তাদেরই?

দান তো এমনই হয়ে থাকে চিরকাল। বিড়বিড়িয়ে বলল এক বৃদ্ধা শূদ্রানী।

এক যুবতী রমনী বলল, সেনাপতির আজ্ঞা না মানলে ক্ষতি হবে খুব।

আজ্ঞা ভাঙব আমি, তোমাদের জল তোমরা নেবে, মাথার উপর মহাকাল আছেন, চন্দ্রসূর্য আছে।

মাথা নাড়তে লাগল বৃদ্ধা শূদ্রানী, বলল, তুমি কত জল তুলবে মা, তুমি জল তুললেও মরণ হবে আমাদের, এমনিই তো বলে গেছে সেনাপতি, সন্ধ্যের পর সৈনিক পাঠাবে, একটি যুবতী যেন যায়, সে আনন্দ করবে, না পাঠালে সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেবে মেয়ে বউদের পিছনে, সে অতি ভীষণ কাণ্ড হবে, ঘর ছেড়ে পালাতে হবে সকলকে।

গন্ধবতী বলল, তবুও কুম্ভ দাও, জলভরা কুম্ভ শুভ হয় যাত্রায়, আমি অন্তত উদ্ধবের নিষেধ অমান্য করে যাই।

তুমি জল ছুঁলে তো অমান্য হবে না মা, তুমি তো শূদ্রানী নও।

গন্ধবতী স্তব্ধ হলো। রমণীরা সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বটের মস্ত ছায়ার এখানে ওখানে শূন্য কুম্ভ নিয়ে বসে আছে। বটমূলে বুড়ো পরাশর যেন বহু বছর আগে জন্মানো ভগবান বুদ্ধের মতো বসে আছে স্থির। দুটি চোখ বন্ধ। মেঘের ডাক শুনলে দুচোখ মেলবে বলেছে গ্রামবৃদ্ধ। সে নাকি মনে মনে মেঘের

তপস্যা করে যাচ্ছে।

গন্ধবতী বলল, জল যদি না ছুঁই, জল দর্শন করব না আমি।

তাম্রধ্বজ বলল, জলই মহাকাল, জলপূর্ণ সরোবর দেখবে না গন্ধবতী?

যে জলে এদের অধিকার নেই, সেই জলে আমারও অধিকার নেই।

শুনে বৃদ্ধা, যুবতী, মধ্যবয়সিনী শূদ্রানীরা হা-হা করে ওঠে, তা কী করে হয় মা, তুমি তো শূদ্র ঘরে জন্মাওনি, এই যে তুমি এলে স্বামীর সঙ্গে, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য, হয়ত এবার আমাদের ঘরে ঘরে বউগুলি সব পোয়াতি হবে, এবার আমাদের সব ঘরে ছেলেমেয়ে কাঁদবে, এবার আমাদের স্বামী পুত্রের সংসার সুখের হবে, এবার আমাদের কিন্তু কোথায় স্বামীরা, তারা তো উদ্ধবের হাতে বন্দি, মেঘ যদি না আসে তাদের নাকি ছাড়বে না উদ্ধব। আবার বলে গেছে মেঘ যাতে না আসে তার ব্যবস্থা করেছে প্রধান পুরোহিত। স্বামীরা যদি না ফেরে মা, আমরা কী করে পেটে ধরব আবার, আমাদের স্বামীরা মেঘের মত গো মেঘ এলেই তারা আমাদের দিকে ফিরে তাকায়, মেঘ এলে আমরা পোয়াতি হইরে মা, এতকাল তাই হয়েছে, মেঘ না এলে আমরা শুকিয়ে থাকিরে মা....।

শূদ্রানীরা গুনগুন করছিল গন্ধবতীকে ঘিরে। ঘুরে ঘুরে মেঘের কথা, বৃষ্টির কথা বলে যাচ্ছিল তারা। এক একজন এক একভাবে বলছিল। মেঘ এলে ময়ূর কেমন পেখম মেলে ডাকে ময়ূরীকে সেই কথা বলছিল কেউ, কেউ বলছিল হরিণ হরিণী কীভাবে কাছে আসে মেঘের ছায়ায় সেই কথা। কেউ বলছিল বৃষ্টির রাতে কীভাবে পুরুষের কাছে গিয়েছিল সে, পরে সেই পুরুষ কোথায় গেছে সে জানে না। এখনো অপেক্ষায় রয়েছে সে। যদি মেঘ এসে যায়, পুরুষ মানুষটা ফিরে আসবে ঠিক। এক শূদ্রানী যুবতী গন্ধবতীর কানে মুখ আনে, তোর কী হলোরে সই কী হলো?

কী হবে? গন্ধবতী কাঁপছিল। দেখছিল দূরে তাম্রধ্বজ বটের ছায়ার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে ছায়া আর রোদ পড়েছে। দুটি চোখ জ্বলছে তার স্বামীর। হাতছানি দিল তাম্রধ্বজ, এসো।

শূদ্রানী যুবতী তার কানে মুখ এনে বলল, কোন জায়গায় তোকে গ্রহণ করল ওই পুরুষ মানুষটা, নদীর ধারে, বনের ধারে, নাকি মাঠের ভিতর, সমস্ত রাত যে পথে পথে কাটালি তোরা, কোথায় কখন এক হলি, তুই ওকে জাগালি, না ও তোকে?

গন্ধবতী চুপ করে থাকে, মাথা নামায়।

যুবতী তার বুকে হাত দেয়, বলল, আমার কাছে বল, আমার সোয়ামীকে নিয়ে গেছে উদ্ধব, সে যখন ফিরবে তোদের কথা শোনাব, তোরা দুজনই আমার মেঘ হবি তখন, আকাশের জল হবি, বলরে মেয়ে বল কীভাবে কী হলো, এই দ্যাখ তোকে দেখেই আমার বুকদুটো শক্ত হয়ে গেছে, শরীর কাঁপছে, বুকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দ্যাখ মেয়ে....।

গন্ধবতী দু'হাতে মুখ ঢাকে। আর তা দেখে যুবতী তার কানে ফিসফিস করে, শুনতে চায় প্রেমের সমস্ত সময়টুকুর খুঁটিনাটি, জিজ্ঞেস করে, তাকে চুম্বন করতে করতে কী বলল ওই পুরুষ, তার স্তনদুটি ছুঁয়ে কী বলল তার স্বামী।

গন্ধবতী বুঝতে পারছিল এই সব রমণীরাপুরুষ মানুষের সঙ্গে, স্বামীর সঙ্গে বাস করেও বহুদিন যেন স্বামী-পুরুষমানুষের সঙ্গহীনা হয়ে আছে। ভুলে গেছে প্রেমের আস্বাদ। নববিবাহিত তারা তাদের ভিতরে কামনা জাগিয়ে তুলছে একটু একটু করে। যুবতী বধূটি একা নয়, সমস্ত শূদ্রানীরা তাকে ঘিরে ধরে হাসতে লাগল, বারবার জানতে চাইল একই কথা, কখন কীভাবে কোথায় তার স্বামী তাকে প্রথম গ্রহণ করল, পুরুষমানুষের সঙ্গে সেই মিলনের শিহরণ কেমন?

গন্ধবতী ধীরে ধীরে সরে এল তাম্রধ্বজের কাছে। তার হাত ধরল। তার মনে হচ্ছে সমস্ত জোয়ান পুরুষমানুষগুলি বন্দি হয়ে নগরে চলে যাওয়ায়, শূদ্রপল্লীর রমণীরা আকুল হয়ে উঠেছে। তাদের ভিতরে কামনা জেগে উঠছে ধীরে ধীরে। চমকে ওঠে সে। এই রমণীরাই না বলছিল আকাশের মেঘ অন্তর্হিত হওয়ায় তারা আর পোয়াতি হতে পারেনি। মেঘ না এলে কামনা জাগবে না তাদের ভিতরে, মেঘ না এলে শুকিয়ে থাকে তারা। এখন যে মনে হচ্ছে অন্য কথা। গন্ধবতী তাম্রধ্বজকে টেনে রৌদ্রের ভিতরে গিয়ে আকাশ দেখল। মেঘ এল কি? আষাঢ়ের মেঘ, শ্রাবণের মেঘ—বৃষ্টির মেঘ কি এল উজ্জয়িনীর আকাশে। তাই কি আকুল হলো রমণীরা?

ধূসর আকাশ তার দু'চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ওই দূরে শূদ্রানীরা বসে পড়েছে মাটিতে। তারা এখন হতোদ্যম, কয়েক মুহূর্ত আগে যে আকুলতা এসেছিল তা এখন আর নেই। ক্লান্ত হয়ে শ্বাস নিচ্ছে সবাই। ওই আরো দূরে গ্রামবৃদ্ধ তপস্বী স্থির হয়ে আছেন। তাঁর চারদিকে নিঃসীম স্তব্ধতা গাঢ় হয়ে ভেসে আছে। তাম্রধ্বজের মুখের দিকে তাকায় গন্ধবতী, জিজ্ঞেস করে, মেঘ এসেছিল কি?

জানি না তো, কোথায় মেঘ, ওই তো আকাশ।

তাহলে কেন ওই সব মেয়েরা, বউরা কামার্ত হয়ে উঠেছিল একটু আগে? মাথা নাড়তে লাগল গন্ধবতী। আকাশে তাকিয়ে কী যেন খুঁজতে লাগল।

আটাত্তর

বহুদিন বাদে রাজা এসেছেন প্রধান গণিকা দেবদত্তার গৃহে। একা একা, গোপনে। আগামী কাল সকালে সুভগ দত্তর দূর যাত্রা আরম্ভ। সেই যাত্রায় তার সঙ্গিনী হয়েছে গণিকা দেবদত্তা। রাজা জেনেছেন বণিক সুভগ দত্ত এত বয়সেও গণিকা দেবদত্তার প্রেমে বিভোর। সুভগ দত্তর যাত্রা বন্ধ করতে পারে দেবদত্তা, আর কেউ নয়। বল প্রয়োগে, সেনাবাহিনী দিয়ে শ্রেষ্ঠীর বাণিজ্য যাত্রা স্তব্ধ করতে পারেন রাজা ভর্তৃহরি, কিন্তু সেই কাজ হবে চূড়ান্ত অনৈতিক। তার ফলে অন্য সমস্যা ঘনিয়ে আসতে পারে। শ্রেষ্ঠী বিপুল বৈভবশালী, তাঁর প্রভাব উজ্জয়িনীর সমস্ত মানুষের ভিতরে, প্রধান পুরোহিত থেকে সেনাপতি বিক্রম, শ্রেষ্ঠীর অনুগত কে নন। এই সমস্ত কথা দেবদত্তা শুনেছিল। রাজা চান উজ্জয়িনীর বিপদের দিনে শ্রেষ্ঠী নগরেই থাকুন।

দেবদত্তা আজ সমস্ত দিন তার সমস্ত কিছু বিলিয়ে দিয়েছে অন্য গণিকাদের ভিতরে। চতুরিকা আসেনি। তাকে ডেকেও তার সাড়া পাওয়া যায়নি। সন্ধ্যায় প্রায় শূন্য ঘরে শূন্য হৃদয়ে দ্বীপ জেলে একা একা বসেছিল দেবদত্তা। তখন রাজা এলেন। রাজা যে এসেছেন সেই খবর আনল সেই তালঢ্যাঙা লোকটি। বীট মহাপার্শ্ব। সে কখন কোথায় থাকছে তা সে নিজেই ঠিক করতে পারছে না। অবিরাম নানা ভুল কথা বয়ে নিয়ে নগরে পাক খাচ্ছে, চতুরিকার গৃহে যাচ্ছে, সেখান থেকে তাড়া খেয়ে দেবদত্তার দুয়ারে ছুটে আসছে। সে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকে বলল, রাজা!

দেবদত্তা অবাক, রাজা মানে?

উজ্জয়িনীর রাজা, মা তিনি অপেক্ষা করছে প্রাঙ্গণে, আমাকে সংবাদ দিতে বলল, অন্ধকারে আমি তো প্রথমে চিনিইনি তারে।

তাহলে কী করে চিনলি?

চিনব কী করে মা, মুখখানি ঢাকা। লুকিয়ে এসেছেন।

রাজাতো, একা কোথাও যেতে হলে তাঁকে নিজেকে লুকিয়েই যেতে হয়।

রাজা আমাকে বললেন তোমাকে সংবাদ দিতে, রাজা ভর্তৃহরি তোমার দুয়ারে, তুমি কাল রওনা হবে, তোমাকে বোধহয় বিদায় জানাতে এসেছেন রাজা, মা রাজাকে নিয়ে আসি।

আর কে?

কেউ না, তিনি একা, তিনি নিজে না বললে কে বলবে তিনিই রাজা, তুমি তো রাজাকে চেন মা, চিনে নিয়ো।

দেবদত্তা ভাবল অন্য কেউ নয়ত? তারপর নিজেই মনে মনে হাসল, আর কে হবে? এই নগরে তার অনুরাগী আর কে আছে? আর কেই বা আসবে মিথ্যা পরিচয় নিয়ে? কেনই বা আসবে? রাজা এসে দাঁড়িয়ে আছেন প্রাঙ্গণে, একা একা—দেবদত্তা অভিভূত হয়ে পড়ল। রাজা এতদিন বাদে এলেন তার কাছে, দেবদত্তার মনে হলো এই জীবনের সমস্ত পাওয়া যেন শেষ হলো। আকসু নদীর তীরে, বাহ্লিক দেশে তার পিতৃভূমিতে তো অন্য জীবন আরম্ভ হবে। সেই জীবন ভুলিয়ে দেবে উজ্জয়িনীর জীবনের কথা। দেবদত্তার চোখে জল এসে গেল। সে বলল, চলো মহাপার্শ্ব, আমি নিয়ে আসি রাজাকে, রাজা না সেই নীলচক্ষুর যুবক ধ্রুবপুত্র, কার উপর আমার মন পড়েছিল তা আমি এখনো বুঝে উঠতে পারি না, কখনো মনে হয় ধ্রুবপুত্রই সব, পরে মনে হয় উজ্জয়িনীর দুঃখী রাজাই সব আমার—চলো মহাপার্শ্ব নিয়ে আসি রাজা ভর্তৃহরিকে।

মহাপার্শ্ব কিছুই বোঝে না দেবদত্তার কথা। তবে তার মনে হলো সন্দেহ অমূলক, ধ্রুবপুত্র নয়, রাজাই এসেছেন। ধ্রুবপুত্র ভবঘুরে হয়ে চলে গেছে কোথায়। সে কী ভাবে আসতে পারে? গণিকাদের মন বোঝা দায়। বহু পুরুষ ছুঁয়ে ছুঁয়ে সর্বোত্তমেও মন বসেনা তাদের। মহাপার্শ্ব অনুসরণ করল দেবদত্তাকে। দীপ হাতে দেবদত্তা এগোতে থাকে অন্ধকারে নিঃঝুম অলিন্দ ধরে। গৃহখানি শান্ত। কোথাও কোনো চাঞ্চল্য নেই, মানুষের সাড়াশব্দ নেই। চাপা ফিসফাস নেই। শুধু দেবদত্তার নূপুরের শব্দটি অন্ধকারে আবছা ধ্বনিত হতে থাকে এই সময়ে। দেবদত্তা তার পোষা শুকসারি উড়িয়ে দিয়েছে সকালে। তারা থাকলে হয়ত আচমকা ঘুম ভেঙে ডেকে উঠত। এই গৃহখানির কোটরে কবুতর বাস করে অনেক। তারা ঘুমের ভিতরেই ডাকে। আজ তারা থেমে আছে। দেবদত্তা জানে না কবুতরের দল গৃহত্যাগ করেছে কিনা। পশুপাখি তো সব টের পায় আগে। মনুষ্যবিহীন কোনো গৃহ কবুতরের বাসযোগ্য হতে পারে না। দেবদত্তা তো চলেই যাচ্ছে উজ্জয়িনী ছেড়ে। তার ছেড়ে যাওয়া গৃহখানিতে কে এসে বাস করবে? কেউ না। নতুন যে গণিকা প্রধানগণিকা হয়ে আসবে এই নগরে, সে কি দেবদত্তার এই ছায়ায় থাকতে চাইবে? এই গৃহ ভেঙে পড়বে একদিন। সাপের বাসস্থান হবে, কালোপেঁচা, বাদুড় নিশ্চিন্তে থাকবে এখানে।

দেবদত্তা এসে দাঁড়াল প্রাঙ্গণে। কৃষ্ণপক্ষের নবমীর চাঁদ এখনো ওঠেনি। কিন্তু তারার আলোয় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কে এসেছেন প্রাঙ্গণে। রাজা স্থির হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখখানি উত্তরীয়তে ঢাকা, কিন্তু রাজবেশে রাজাকে চেনা যায়। ধ্রুবপুত্র রাজবেশ পাবে কোথায়? মাটিতে প্রদীপটি রেখে দেবদত্তা প্রণাম করল মাটিতেই, রাজার উদ্দেশে, ডাকল, প্রভু স্বাগত।

দেবদত্তা উঠে দাঁড়াতে রাজা মুখ নামালেন। দেবদত্তার হাতে আবার প্রদীপটি, ক্ষীণ বাতাসে তার শিখা কাঁপছে। নিভে গেল। বাইরের অন্ধকারে অসুবিধে হয় না। অন্দরমহলের অন্ধকার যেন পাথর চাপা থাকে। দম নেওয়াই সেখানে কষ্ট। প্রদীপটি নিভল কেন, কোথাও তো কোনো আলো নেই। রাজা বললেন, কল্যাণ হোক। স্তিমিত কণ্ঠস্বর, শোনাই গেল না প্রায়।

দাসীর পরম সৌভাগ্য রাজা এলেন তার গৃহে।

রাজা কোনো কথা আর বললেন না। দেবদত্তাকে অনুসরণ করলেন। নেভা দ্বীপের অন্ধকার দেখিয়ে দেবদত্তা তাঁকে নিয়ে যেতে লাগল ভিতরে। তার পায়ের নূপুরের শব্দ রাজাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘ অলিন্দের পথে। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল মহাপার্শ্ব। সে বুঝে উঠতে পারছিল না তার এখন কী করা উচিত। দুয়ারে অপেক্ষা করা উচিত নাকি এই গৃহ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত। কাল সকালে যাত্রা, সে যাবে কিনা এখনো ঠিক করে উঠতে পারেনি। চতুরিকা হ্যাঁ বলেনি, আবার নাও বলেনি। কিন্তু মহাপার্শ্বও বুঝে উঠতে পারছে না, যাবে কি যাবে না। এখন বর্ষার সময়, কিন্তু বর্ষা নেই গত কয়েকবছর ধরে। এই সময় যাবে, এরপর বর্ষা অবসান হবে, তারপর আসবে সেই কতদিন বাদে কার্তিক মাস, কৃত্তিকা নক্ষত্রর কাছে থাকবে তখন পৌর্ণমাসীর চাঁদ। সেই গন্ধর্বের দেশে তখন পৌঁছবে। এর ভিতরে অবশ্য একটা কিন্তু আছে। বর্ষা অবসান যখন হবে তখন নাকি তারা গান্ধার নামে একটা দেশে—আচ্ছা বর্ষাই যদি না হয় তবে তার অবসান ঘটবে কী করে? অবসান যদি না ঘটে বর্ষার, তাহলে তো তারা গান্ধার দেশে কোনোকালেই পৌঁছতে পারবে না। তখন তারা কোথায় যাবে? মহাপার্শ্ব হাঁটতে থাকে। উজ্জয়িনীতে বর্ষা এসে গেলে এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে হত না তাকে।

রাজা এসেছেন গণিকা দেবদত্তার গৃহে। দেবদত্তা চলে যাচ্ছে, তাই কি শেষ ফূর্তি! হি হি করে হাসল মহাপার্শ্ব। তাই বা কী করে হয়? রাজার কণ্ঠস্বরে কী ক্লান্তি, কী দীনভাবে এসেছেন রাজা। রাজা তো দশদিকে জানান দিয়ে আসবেন, দূত পাঠাবেন, দেবদত্তাকে নিয়ে যাবেন প্রাসাদে, তা হল না, লুকিয়ে এলেন যেন। কেন লুকিয়ে এলেন? তাহলে কি রাজা আসেননি? অন্য কেউ? অন্ধকারে তো ধরা গেল না কিছুই। রাজার নামে কি অন্য কেউ এল ঘোর অন্ধকারে? কী যে হচ্ছে এই নগরে। রাজা কিনা অন্ধকারে লুকিয়ে গণিকাগৃহে আসেন। অনাবৃষ্টির কালে কী যে হয় কী হয় না তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। মহাপার্শ্ব হাঁটতে লাগল। কাল শ্রেষ্ঠী যাত্রা করবেন। শ্রেষ্ঠীগৃহের সম্মুখে সাজো সাজো রব উঠেছে সমস্ত দিন ধরে। সার্থবাহ যাবে, তারা সব তৈরি হচ্ছে। তাগড়াই তাগড়াই বলদ, তারা টানবে গো শকট। তাগড়াই তাগড়াই মহিষ, তাদের শিং আবার ভল্লের মতো বাঁকানো, তারাও টানবে শকট। গাধা আছে পঞ্চাশটার উপরে। শুনে দ্যাখেনি মহাপার্শ্ব। সে তো দাঁড়ায়নি ওখানে। পাক দিয়ে এসেছে মাত্র। কিন্তু

অনেকবার পাক দিয়েছে সত্য, তাতে মনে হয়েছে গাধার সংখ্যা বেশিই হবে আরো। তারা ভার বয়ে নিয়ে যাবে, আর আছে শিবিকা। তার একটিতে থাকবেন শ্রেষ্ঠী, অন্যটিকে দেবদত্তা। অন্য বণিকদেরও শিবিকা আছে, আবার রথও আছে, তাগড়াই তাগড়াই মানুষ পেশী ফুলোচ্ছে শ্রেষ্ঠীগৃহের সম্মুখে। তারা যাবে সঙ্গে। মহাপার্শ্ব বুঝে নিতে চেয়েছে সে আর চতুরিকা গেলে যাবে কীভাবে? শিবিকা কোথায়, রথ কোথায়, গো-শকটই বা কোথায়? তারা কি হেঁটে যাবে?

অন্ধকারে মহাপার্শ্ব এসে পৌঁছল চতুরিকার গৃহ প্রাঙ্গণে। এখন তো তাকে সংবাদ পাঠাতে হয় রাজার মতো। রাজা এসেছেন বলে রাজার পরিচয় নিয়ে কে যে ঢুকে গেল দেবদত্তার গৃহে? সেখানে ছিল মহাপার্শ্ব, তাই সংবাদটা পৌঁছে গিয়েছিল দেবদত্তার অন্দরমহলে। এখানে কার মাধ্যমে সংবাদ যাবে? মহাপার্শ্ব অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। এখানে যদি তার মতো কেউ থাকত, তবে বলে দেওয়া যেত রাজা এসেছেন চতুরিকার গৃহে, তার সান্নিধ্য পেতে। গণিকা এসে নিয়ে যাক রাজাকে। দুলতে লাগল মহাপার্শ্ব, রাজা আসতেই পারেন চতুরিকার গৃহে। দেবদত্তা এখন শ্রেষ্ঠীর অনুরাগিনী। গণিকা দেবদত্তার কাছে প্রত্যাখ্যাত রাজা কোন নারীর কাছে যাবেন? চতুরিকা। নগরে তো শোনা যায় রানীও সদয় নন রাজার প্রতি। রাজা শেষ পর্যন্ত মহাকাল মন্দিরের দেবদাসীকে ধর্ষণ করেছেন রাত্তিরে একা একা মন্দিরে গিয়ে। ইস! কী যে হলো নগরে? উজ্জয়িনীর রাজা দেবদাসী ধর্ষণ করেন, কেন নগরে কি মেয়েমানুষের অভাব? দেবদাসী ললিতা কি গণিকা দেবদত্তার চেয়েও সুন্দরী, তার যৌবন কি এতই টেনেছিল রাজাকে যে অন্ধকারে, মধ্যরাতে, একা একা....। নগরে সব কথা সবাই জানে।

মহাপার্শ্বর মনে হলো রাজা যদি দেবদাসী ললিতাকে গোপনে ভোগ করে আসতে পারেন, রাজা এখানে, এই চতুরিকার কাছেও চলে আসতে পারেন। আর রাজা এসব করছেন বলে অন্ধকারে রাজার নাম নিয়ে অন্য কেউ ঢুকে যেতে পারে দেবদত্তার গৃহে। তাইই হয়েছে। রাজা তো এসেছেন চতুরিকার কাছে। রাজা তো ভোগী পুরুষ। নানারকম নানারূপের নারীর সাহচর্য চান। তাই যেমন দেবদাসীর কাছে যান, আসেন চতুরিকা দাসীর কাছে। এদিকে রানী ভানুমতি থাকেন সেনাপতির সঙ্গে, গণিকা দেবদত্তার কাছে রাজার পরিচয় নিয়ে অন্য কেউ আসে। এই সমস্ত ঘটনা নগরের সবাই তো জানে। মহাপার্শ্ব নিজের মাথার চুল টেনে ধরল, সে ঠিক ভাবে বুঝে নিতে চাইল কোথায়, কোন নারীর কাছে কোন পুরুষ গেল—

ক) রানী ভানুমতির কাছে গেলেন সেনাপতি। সবাই জানে এইকথা।

খ) চতুরিকা দাসীর কাছে এলেন রাজা।

গ) দেবদাসী গেল পুরোহিতের ঘরে।

ঘ) দেবদত্তার ঘরে কে গেল রাজার নামে?

এমন হতে পারে শ্রেষ্ঠী এলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠী তো দেবদত্তাকে নিয়ে যাত্রা করছেন গন্ধর্বের দেশে, তাহলে কেন গোপনে মিথ্যা পরিচয় নিয়ে আসবেন? এমন তো হতে পারে, উদ্ধব নারায়ণ এল। নাহ্! তার অত সাহস হবে না। রাজার পরিচয় নিয়ে কোনো তস্কর ঢুকতে পারে দেবদত্তার গৃহে। উদ্ধব আসতে পারে এখানে। এলে আজ ভীত সারমেয়র মতো লেজ গুটিয়ে পালাবে। রাজার সামনে দাঁড়ানোর সাধ্যই নেই তার। মহাপার্শ্ব ধাক্কা দিল বন্ধ দুয়ারে, চতুরিকে, ও চতুরিকে।

কে, মহাপার্শ্ব ভাই! কী শান্ত চতুরিকার কণ্ঠস্বর।

মহাপার্শ্ব আরো শান্ত, গম্ভীর গলায় বলল, কল্যাণ হোক, রাজা তোমাকে যাচ্ঞা করেন চতুরিকে।

রাজা! কয়েক মুহূর্ত বাদে দুয়ার খুলে গেল। দীপ হাতে চতুরিকা বাইরে এসে দাঁড়াল। মহাপার্শ্ব সরে গেছে অনেকটা দূরে। উত্তরীয়খানি দিয়ে ঢেকে নিয়েছে মুখ, বলল না কিছুই, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। চতুরিকা হকচকিয়ে গেল। কোথায় কে? বাইরেটা তো শূন্য প্রায়। দীপ হাতে সে এগোয়। গা ছমছম করে।

মহাপার্শ্ব অন্ধকারের আড়ালে গিয়েছিল। এখন তো মনে হচ্ছে সে সত্যিকারের রাজা, এই উজ্জয়িনী নগরের। চতুরিকা রাজার খোঁজে দীপ হাতে বেরিয়েছে। এখানে যদি কোনো মানুষ থাকে তবে আছে সে। সেই তাহলে রাজা। উজ্জয়িনীর রাজা। তার কণ্ঠস্বরেই তো দুয়ার খুলেছে চতুরিকা।

দীপের আলোয় ঢ্যাঙা লোকটিকে দেখতে পায় চতুরিকা। মুখ ঢেকে আছে বটে, কিন্তু অমন তালঢ্যাঙা মানুষ আর কোথায় এই নগরে? চতুরিকা দীপ নামিয়ে রাখল মাটিতে একটু আড়াল করে, ডাকল মহাপার্শ্বকে, কে রে তুই?

রাজা তোমাকে যাঞ্জা করেন চতুরিকে।

মর্কট সামনে আয়, মুখ ঢেকেছিস কেন?

রাজা তোমার সম্মুখে চতুরিকে।

আবার বিভ্রান্ত হলো চতুরিকা। কোথায় রাজা? তিনি কি সত্যি এসেছেন? কোথায় গেলেন তিনি? এই অদ্ভুত আঁধারে যে কিছুই চেনা যায় না। সে দুটি হাত জোড় করে বলল, রাজামশাই যদি এসে থাকেন, দাসী তাঁর চরণে নিজেকে নিবেদন করতে চায়, দাসীর প্রণাম নিন রাজা মশাই।

মহাপার্শ্ব উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তা হলে সত্যিই সে রাজা। সে যদি রাজা হয়, হয়ে উঠে চতুরিকার দুয়ারে এসে পৌঁছয়, আর চতুরিকা যদি সেই ছদ্মবেশটি না বুঝে উঠতে পারে, তবে দেবদত্তার ঘরে গেল কে? কী ভীষণ অন্ধকার! এই অন্ধকারে কার বেশে কে কোথায় চলে যাচ্ছে তার ঠিক নেই।

চতুরিকা অনুনয় করল, দাসীকে দেখা দিন প্রভু, দাসী আপনার সেবা করবে, দাসী বড় অভাগী, প্রভু যে যাঞ্জা করেন আমাকে, আমি ধন্য।

মহাপার্শ্ব ভাবছিল দেবদত্তার ঘরে কে গেল সত্যি সত্যি। গণিকা অন্ধকারে কিছুই বুঝতে পারেনি, কিন্তু সে বুঝেছে, তার মনের ভিতরে একটা 'কিন্তু' রয়ে গেছে। রাজা নন অন্য কেউ। চতুরিকার গৃহে রাজা কেন, কেউই আসেনি, এসেছে সে, তবু কিনা চতুরিকা অন্ধকারে ধরে নিয়েছে এসেছেন রাজাই।

মহাপার্শ্ব এগিয়ে এল, চতুরিকে।

কোথায় তিনি? রাজা!

আমিই রাজা চতুরিকে, শোন চতুরিকে, রাজার বেশে কেউ যেন গিয়েছে দেবদত্তার গৃহে, সে তো সর্বস্ব ত্যাগ করে কাল রওনা হবে আকসুন্দীর দেশে, কে এলরে চতুরিকে?

চতুরিকা অবাক, কিছুই বুঝে উঠতে পারে না, তবু বলল, বুড়ো শ্রেষ্ঠী?

না, সে তো কাল নিয়েই যাবে।

তবে কে, হয়ত রাজাই।

না রাজা নন, কিন্তু দেবদত্তা রাজা ভেবে তাকে নিয়ে গেল অন্দরমহলে, তার হাতের দীপটি প্রাঙ্গণে আসতেই নিভে গেল, কেন নিভল বাতাস নেই, আর তার হাতের আড়ালও ছিল, কিন্তু রাজার সামনে যেতে....।

চতুরিকা গালে হাত দিল, সত্যি বলছিস মহাপার্শ্ব ভাই?

মিথ্যে বলতে এতদূর আসব?

তুই দেখতে পেলিনে কে?

অন্ধকার তো, তারপর সে দাঁড়িয়েছে অন্ধকারে, ভাবলাম গোপন অভিসারে এসেছেন রাজা, তাই লুকোতে চায়, এখন তো মনে হচ্ছে রাজা নন অন্য কেউ।

চতুরিকা জিজ্ঞেস করল, তুই কি রাজাকে চিনিসনে মর্কট?

দূর থেকে দেখেছি, চিনব কী করে মুখ মাথা সব ঢাকা, আমি ঝিমোচ্ছিলাম দুয়ারে বসে, ভাবছিলাম কোন শিবিকায় আমরা যাব, আমি না হয় হেঁটে যাব, তুই কী করে যাবি, তখন এল সে, কী খনখনে গলা সেই রাজার বলল, মেয়েছেলেটাকে গিয়ে বল রাজা এসেছে।

এই বলল, এইভাবে?

হ্যাঁ। সুরা পান তো করেছিল মনে হয়।

রাজা কি সুরাপান করে আসবে মনে হয়?

মাথা নাড়ল মহাপার্শ্ব, তা কী করে বলি, রাজা চাইলেই সুরা পায় যখন পান করবে না কেন, আর রাজা যখন পারে দেবদত্তার ঘরে যেতে, যাবেই না বা কেন?

কী বলল ভেবে বল দেখি?

বেশ্যা মাগিটা কাল চলে যাবে, গিয়ে বল রাজা এসেছে।

কপালে চাপড় দিল চতুরিকা, হায় হায়, তুই বুঝতে পারলিনে মহাপার্শ্ব ভাই, এ অন্য মানুষ, রাজার পরিচয়ে ঢুকে পড়েছে সখীর ঘরে, কী সব্বোনাশ, রাজার ভাষণ কি অমন হবে, অমন খারাপভাবে সম্বোধন করবে উজ্জয়িনীর রাজা, তিনি তো কবি, অতি সুসভ্য মানুষ।

তবে একে?

চেনা মানুষ নিশ্চয়, অন্ধকারের সুযোগ নিয়েছে, দস্যু, তস্কর বটে কিন্তু চেনা মানুষ, এমন ভাবা কার হতে পারে বল তুই?

মহাপার্শ্ব দুলতে থাকে। তার পেটে এসেছে নামটা, মুখে আসছে না। আবার মুখে এলেও বলতে সাহস হবে কি? তার মনে হলো সে চিনতে পেরেছে। খনখনে কণ্ঠস্বর বোধহয় আসল কণ্ঠস্বরকে চাপা দিতে পারেনি। তার ধন্দ হয়েছিল বলেই না সে চতুরিকার গৃহে এসে রাজা সেজে দাঁড়াল। এখানে রাজা আসা মানে দেবদত্তার গৃহে রাজা নেই। রাজা যাননি। তা হলে কে গেল? যে গেল সে খুব ভয়ানক হয়ে উঠেছে ক'দিন ধরে। ধরে ধরে একে ওকে কারাগারে ঢোকাচ্ছে। ভয় দেখাচ্ছে। লুণ্ঠন আরম্ভ হয়ে গেছে নগরের ভিতরেই। কী সব্বোনাশ যে করে দিল এই অনাবৃষ্টি।

চতুরিকা বলল, মনে করতে পারলি নে মর্কট?

মাথা দোলায় মহাপার্শ্ব, বলল, মনে করে কী হবে, তোর ঘরে তো ঢোকেনি।

সখী আমার সব্বোনাশ করেছে জানি, সখী রাজি না হলে তো আমাকেই নিয়ে যেতেন শ্রেষ্ঠী, তবে কিনা লোকটা হদ্দো বুড়ো, দুরাত্মা, সখী আমার উপকারই করেছে মনে হয়, আকসু নদীর দেশে গিয়ে আমার কী হবে, ওখেনে সখীর বাপের বাড়ি, সে যাক, কিন্তু কে ঢুকল তার ঘরে, ওরে মহাপার্শ্ব, তুই বুঝতে পারলিনে, রাজা নন, ও হলো অন্যকেউ।

মহাপার্শ্ব চাপা গলায় বলল, জানি।

জানিস তবু সখীরে বলিসনি।

পরে টের পেলাম, তখন ভয় করল, আমাকে বন্দি করে ফেলবে, সেনাবাহিনীর দলপতি হয়েছে উদ্ধব, আর আমাকে মানুষ বলে মনে করে না যে লোকটা, রাজা সেজে এল, সে লাথি মেরে ডেকে তুলেছিল দুয়ারে এসে, এখন কী হবেরে চতুরিকে?

চতুরিকা বলল, চল, সখীরে বাঁচাতে যাই, কেন এল রাজার পরিচয়ে?

উনআশী

ভয় পেয়েছে মহাপার্শ্ব ও চতুরিকা। ভয় পেয়ে কাঁপছে দুজনে। কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এসেছে দেবদত্তার গৃহ থেকে। বাইরে এবং ভিতরে নিকষ অন্ধকার। তবু তো দেবদত্তার ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলছিল। সেই প্রদীপের আলোয় দুজনে দেখেছে পড়ে আছে নগরসুন্দরী চিত হয়ে, সমস্ত দেহে এক কণাও বস্ত্র নেই। দুহাতে মুখ ঢেকেছিল মহাপার্শ্ব। ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। ছিল চতুরিকা। ছিন্ন ভিন্ন বস্ত্র দিয়ে ঢেকেছে দেবদত্তাকে। ছুঁয়ে দেখেছে কোথাও কোনো স্পন্দন নেই। ঠোঁটের কোণ থেকে বেরিয়ে এসেছে রক্ত, দুটি চোখ স্ফীত, অক্ষিগোলক থেকে আঁখি দুটি যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। দেখলে ভয় হয়। ভয় হয়েছিল।

চতুরিকা ডেকেছে, মহাপার্শ্ব ভাই।

মহাপার্শ্ব বাইরের অন্ধকারে সাড়া দিল, এই তো।

এখন কী করব, সখীর একী হলো? কেঁদে উঠেছিল চতুরিকা।

বেরিয়ে আয় চতুরিকে, এ এক মহা সব্বোনাশ হয়ে গেছে, পালিয়ে আয়।

সখী এই ভাবে পড়ে থাকবে?

থাকুক, প্রাণ থাকলে কোবরেজ বদ্যি ডাকতাম, তখন জানা যেত কী করে কী হলো, সেই যে এল কালো উত্তরীয়তে মুখ ঢেকে।

রাজা!

মহাপার্শ্ব তখন ঘরে ঢুকে চতুরিকার হাত ধরে টেনেছে, আর, আর আকসুনদীর দেশে যাওয়া হলো না তোর সখীর, গন্ধর্বর দেশে যাওয়া হলো না, হায়রে। তখন যদি আমি টের পেতাম, চলে আয় চতুরিকে, ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেছে, কে এসে পড়বে, আমাদের ঘাড়ে দোষ চেপে যাবে।

বেরিয়ে এসে অন্ধকার আকাশের নীচে ওরা কাঁপছিল। এইভাবে কী পড়ে থাকবে চতুরিকার সখী দেবদত্তা নাকি তারা ছুটে যাবে শ্রেষ্ঠী ঘরে? তাকে জানাবে। নাকি তারা যাবে রাজপ্রাসাদে? এত রাতে

গিয়ে তো দুয়ার খোলাতে পারবে না, ঘুমন্ত প্রহরীদের জাগাতে পারবে না। তাহলে তারা যায় কোথায়? মহাপার্শ্বর তখন মনে হলো সেই যে দুজন এসেছিল, এক প্রৌঢ় আর এক তরুণ, তরুণ জ্যোতির্বিদ, তাম্রধ্বজ তার নাম, সে তার নতুন বউ নিয়ে গেল কোথায়? তাকে বলতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। তাহলে এখন কী করবে তারা? উদ্ধবনারায়ণকে বলবে? মহাপার্শ্বর গায়ের রোম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, শীত করে উঠল। না উদ্ধবকে বলা যাবে না। কেন বলা যাবে না তা জানেনা মহাপার্শ্ব। সেনাবাহিনীর তলোয়ার হাতে নিয়ে উদ্ধব যেন দৈত্যের মতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে নগরে। চতুরিকা তাকে টানতে টানতে রাজপথে নিয়ে এল। রাত অনেক, পথ একেবারে জনশূন্য নয় বটে, কোথাও কোথাও কেউ কেউ বসে আছে ; দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর গায়ের শীতলতায় গা জুড়োতে। চতুরিকা উত্তরীয়তে মুখ প্রায় আড়াল করে পথের ধারে একটি কদমগাছের নীচের অন্ধকারে মহাপার্শ্বকে নিয়ে লুকিয়ে পড়ল, চাপাগলায় জিজ্ঞেস করল, কে এসেছিল?

মহাপার্শ্ব বলল, ভুলে যা চতুরিকে ভুলে যা, সব দিক পাপে ভরে গেছে এমন কখনো হয়েছে এখেনে, গণিকাকে ওভাবে মেরেছে কেউ?

কে এসেছিল বল?

জানিনে, অন্ধকারে কালো উত্তরীয়তে মুখ ঢাকা।

কী বলেছিল সে?

আমাকে পদাঘাত করে জাগিয়ে তুলে বলল, রাজা।

রাজা তো তুই বলছিস নে।

আমি কিছু জানিনে চতুরিকে।

তুই আমার ওখানে গিয়ে রাজা এসেছেন বলে ডাকলি কেন?

জানিনে।

রাজা তো আসেনি, রাজার ভাষা অমন নয়।

জানিনে।

কে এসেছিল বল মহাপার্শ্ব, আমার সখী কষ্ট পেয়ে মরেছে, সখীর সর্বস্ব নিয়েছে তার ঘাতক, আমি জানতে চাই সে কে?

মহাপার্শ্ব বলল, চল চতুরিকে তোরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ঘরে আমি ফিরব না, মর্কট বল দেখি এতরাতে তুই আমার কাছে এলি কেন, কেনই বা নিয়ে গেলি সখীর কাছে, তুই কি ভয় পেয়েছিলি, জানতে পেরেছিলি যে এমন হতে পারে।

আমি জানিনে।

আমরা কেন সখীর কাছে গেলাম?

আমি কিছু জানিনে চতুরিকে।

তুই যখন এলি, তখনো সখী বেঁচে?

বেঁচে, তার কাছে সে এল।

কে এল বল।

খুব অন্ধকার চতুরিকে, আকাশে চাঁদ নেই, দীপও নিভে গেল নাকি ফু-দিয়ে নিভিয়ে দিল সে, চেনার উপায় নেই।

সখী তো রাজাকে চেনে।

অন্ধকারে চিনতে পারেনি সে, দীপ নিভে গেল, রাজা তাকে অনুসরণ করল।

সে কি সত্যিই রাজা? চতুরিকা জিজ্ঞেস করে, ভাল করে ভেবে বল, রাজার বদলে কে এসেছিল।

রাজা তো তোর দুয়ারে গিয়েছিল।

সে তো রাজা নয়, তুই।

আমি কিছু জানিনে চতুরিকে, চ তোকে ঘরে রেখে আসি, আমি তোর দুয়ারে পড়ে থাকি, গা হাত পা কাঁপছে আমার।

তারা গুটিগুটি পায়ে রওনা হলো। দেবদত্তার ঘর থেকে বেরিয়ে নগরের অন্যদিকে চলে এসেছিল

তারা। এখন যেতে হবে অনেকটা। যেতে যেতে মহাপার্শ্ব বলে, ভোর বেলায় শ্রেষ্ঠীর শিবিকা আসবে দেবদত্তাকে নিয়ে যেতে, তারাই দেখবে মরে পড়ে আছে গণিকা, মরার আগে খুব চেষ্টা করেছিল বাঁচার।

আকসু নদীর দেশে যাবে, সেই নদীতে সিনান করলে নাকি যৌবন ফিরে আসে, কুরূপা হয় সুরূপা, সেই দেশে নাকি তার মা বাবা নদীর ধারে হেঁটে বেড়ায়, গন্ধর্বরা গান গায়। বিন বিন করে বলতে লাগল চতুরিকা।

রাজা এল, কিন্তু রাজা তো তোর দুয়ারে গিয়েছিল।

আমার দুয়ারে যাবে কেন, তুই রাজার নাম ধরে এসেছিলি।

রাজা যদি তোর দুয়ারে আসে তবে দেবদত্তার দুয়ারে যেতে পারে না।

আমার দুয়ারে তুই ছিলি, তুই কী বলতে চাস, রাজা যায়নি সখীর দুয়ারে, আমার দুয়ারে যেমন তুই রাজার নামে ডেকেছিলি আমাকে, তেমনি?

জানিনে আমি।

জানিস সব, বল।

রাজা তোর দুয়ারে গেলে ওর দুয়ারে যেতে পারে না।

তাহলেও তো একই হলো, রাজা নন, কে এসেছিল সখীকে শেষ করতে, কার এত সাহস, নগর গণিকার কাছে রাজার পরিচয়ে যাবে, সখী যে গোপনে রাজার অনুরাগিনী ছিল, কত পত্র আমি নিয়ে গেছি রাজার কাছে।

দুজনে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছিল চতুরিকার গৃহ, গণিকাপল্লীর দিকে। ফিসফিস করে কথা বলছিল। তখনই অশ্বের ক্ষুরধ্বনি কানে এল। চতুরিকার হাত ধরে মহাপার্শ্ব পথের ধারে লুকিয়ে পড়ার কোনো জায়গাই পেল না। এখানে কোনো বৃক্ষই নেই তো লুকোবে কোথায়। কী করবে ভাবছে যখন মহাপার্শ্ব ভীত হয়ে, তখনই তার অনুমান সত্য হয়ে উদ্ধবের ঘোড়া উদ্ধবকে বয়ে নিয়ে এল। তাদের দেখেই উদ্ধব নেমে পড়ল লাফ দিয়ে। জ্বলন্ত মশালটি ধরে দুজনের মুখ দেখে নিয়ে ঘোড়ার বল্গা টেনে ধরে তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল, এত রাত্তিরে যে পথে তোরা?

চতুরিকা জবাব দেয় না। মহাপার্শ্ব মাথা নামিয়ে থাকে। উদ্ধব গর্জন করে ওঠে, কোথায় গিয়েছিলি, কোথা থেকে আসছিস?

আসছি না, ফিরে যাচ্ছি গৃহে। বলল চতুরিকা।

তুই মাগি যাবি বলেছিলি না শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে, যাবি তো?

চতুরিকা মুখ তুলল, দেবদত্তা যাবে।

কে যাবে? উদ্ধব যেন কেঁপে ওঠে।

দেবদত্তা যাবে, আমিও যাব, কাল প্রাতঃকালে।

তুই যাবি কীরে, তুই ঘরে থাক, আমিই তোর কাছে যাব, এই গাধার বাচ্চা কোথায় গিয়েছিলি একে নিয়ে?

মহাপার্শ্ব চুপ করে থাকে। উদ্ধব বলল, তোদের দুটোকে এখনই বন্দি করে ফেলতে পারি, কাল সকালে শূলে চাপাতে পারি, পুড়িয়ে মারতে পারি, আমি এখন কী হয়েছি তা জানিস, কোথায় গিয়েছিলি বল।

কোথাও না, খুব গরম, পথে ঘুরছি।

এই মেয়েমানুষটাকে নিয়ে ঘুরছিস কেন?

ও বলল তাই, একা একা ঘুরতে ওর ভয় করে।

ও না শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে বাহ্লিক দেশে যাবে বলেছিল?

দেবদত্তা যাবে। বলল মহাপার্শ্ব।

তখন উদ্ধব কী যেন ভেবে নিল মনে মনে, বলল, দেবদত্তার ঘরে কি রাজা গিয়েছিলেন?

আমি তো জানিনে প্রভু। করজোড়ে উদ্ধবনারায়ণকে প্রভু সম্বোধন করল মহাপার্শ্ব, মাথা নামিয়ে দাঁড়াল। আবার ভয়টা ঘিরে ধরছে তাকে। দেবদত্তার দেহখানি চোখের সামনে ভেসে উঠল। মরণের আগে খুব চেষ্টা করেছিল বাঁচার। আকসু নদীর দেশে না গিয়ে মরতে চায়নি দেবদত্তা। তাকে জোর করে ভোগ করেছে সেই ঘাতক। মুখখানি কালো উত্তরীয়কে ঢাকা। খনখনে গলা। চেনা মনে হয়, লুকোতে

চেয়েছিল কিন্তু পারেনি।

তুই জানিসনে রাজা গিয়েছিলেন কিনা?

না প্রভু।

প্রাসাদে রাজা ছিলেন না অনেক সময় বোধহয়।

জানিনে, আমি সামান্য বীট, গণিকার ঘরে মানুষ পৌঁছে দিই।

তুই না সন্ধেয় দেবদত্তার ঘরে গিয়েছিলি?

না প্রভু ওই ঘরে আমি যাব কেন, আমি সামান্য বীট।

গর্জন করে উঠল উদ্ধব, আমি এখন সেনাপ্রধান, প্রধান সেনাপতিই আমাকে এই পদ দিয়েছেন, প্রথম যুদ্ধ জয় করেছি, শূদ্রপল্লীর পুরুষগুলোকে বেঁধে নিয়ে এসেছি নগরে, জানিস?

জানি প্রভু।

মিথ্যে কথা বললে তোর শিরচ্ছেদ হবে, বল সন্ধের পর রাজা গিয়েছিল কিনা গণিকার ঘরে, আমি সব খোঁজ রাখি।

আজ্ঞে?

রাজা তোকে পদাঘাতে জাগিয়ে তোলেনি, বল সত্যি কথা বল।

না প্রভু।

তুই রাজাকে গণিকার ঘরে নিয়ে যাসনি?

না প্রভু।

সত্য বল, আমি রাজপ্রাসাদের লোক, আমার অগোচরে কোনো কিছু হওয়ার উপায় নেই, সত্য না বললে এখনই তোর শিরচ্ছেদ করব। বলতে বলতে মশাল ফেলে দিয়ে কোষমুক্ত করেছে খর্বাকার তলোয়ার, বুকের উপর তলোয়ার ছুঁইয়ে গর্জন করে উঠেছে, তোরা কি দেবদত্তার গৃহ থেকে ফিরছিস, এই পথে কেন?

আজ্ঞে না। মহাপার্শ্ব গুটিয়ে যাচ্ছে ভয়ে।

আমি জানতাম তোরা সেখানে যাবি, গিয়ে দেখি এই মাগিটা ঘরে নেই, এই গাধার বাচ্চার সঙ্গে তুই কার অনুমতি নিয়ে পথে বেরোস, তোকে নগর থেকে বের করে দেব বেশ্যামাগি, পাঁচটা সৈনিক লেলিয়ে দেব, তারা তোকে ঘর থেকে তুলে এনে একসঙ্গে ভোগ করবে, কোথায় গিয়েছিলি বল।

মহাপার্শ্ব বুঝতে পারছিল ধরা পড়ে গেছে। চতুরিকাও বুঝতে পারছিল যে কথাটা মহাপার্শ্ব সরাসরি বোঝাতে পারছিল না, তা স্পষ্ট করে দিচ্ছে উদ্ধব। কে রাজার নাম নিয়ে অন্ধকারে ঢুকেছিল দেবদত্তার ঘরে তা আন্দাজ করে বুক হিম হয়ে গেল তার। মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তাকে কিছুই বলেনি মহাপার্শ্ব, কিন্তু বলেছে তো প্রায় সবই। আর যেটুকু বাকি ছিল সব বলে দিচ্ছে উদ্ধব, খোলা তলোয়ার অন্ধকারে ঝকঝক করছে। ওই দূর পুবাকাশে ক্ষীণচন্দ্র দেখা যাচ্ছে। দমবন্ধ হয়ে এল চতুরিকার। মহাপার্শ্বর অত উঁচু তালঢ্যাঙা দেহ বেঁকে যেন এইটুকু হয়ে গেছে। শম্বুকের মতো সে যেন খোলসে ঢুকে স্থির হয়ে গেছে ভয়ে। উদ্ধব বলছে, তার কাছে সংবাদ আছে মহাপার্শ্ব ছিল গৃহদ্বারে। তখন রাজা আসেন, রাজার সংবাদ মহাপার্শ্বই নিয়ে যায় ভিতরে...সব অবিকল বলে দিচ্ছে উদ্ধব। কিন্তু তারপরের সংবাদটা কী? রাজা কখন বেরোলেন ওই সুন্দরীর গৃহ থেকে? রাজা যেন ভাদ্র আশ্বিনের সারমেয় হয়ে গেছেন। সিংহাসনের মর্যাদাই থাকছে না। একবার গেলেন দেবদাসী ভোগ করতে, একবার প্রধান গণিকাকে। এর ভিতরে আরো কত হয়েছে এমন! কোথায় যাচ্ছেন রাজা অন্ধকার হলে তা কে জানে। রাজা কেন অভিসারে বেরোবেন, যাত্রা করলে নারীর অভাব?

চতুরিকা অনুনয় করল, আমাদের যেতে দাও, ক্ষুধার্ত।

ক্ষুধার অন্ন আর জুটবে না, জানিস নে কী হয়েছে, গিয়েছিলি তোরা?

আজ্ঞে।

তোরা না গেলে ওদেহ ঢেকে দিল কে, শোন মহাপার্শ্ব আমি কিন্তু তোকে সাক্ষী করব দরকারে, রাজা যে কাজ করেছেন তা অতি ভয়ঙ্কর, কত ভয়ঙ্কর তা বুঝতে পারছিস, কিন্তু এখন রাজার পক্ষে কথা বলতে হবে, বিপক্ষে বলা চলবে না।

চতুরিকা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে। উদ্ধব আবার লাফ দিয়ে তার অশ্বপৃষ্ঠে আসীন হলো, বলল, কাল প্রাতঃকালে আসবি মহাকাল মন্দিরের সামনে, আমি এখন শ্রেষ্ঠীর গৃহে—না, তুই শ্রেষ্ঠীগৃহে সংবাদটা দিয়ে আয়, চতুরিকা একা একা চলে যাবে, ওই তো চাঁদ উঠছে।

চন্দ্রমা অতি শীর্ণ, চন্দ্রমা অতি শুষ্ক, ওই চন্দ্রমায় কোনো মায়া নেই, মায়া তৈরি হয়ে ওঠে না। মহাপার্শ্ব চলল। উদ্ধব মশাল উঁচিয়ে তার ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হলো অন্ধকারে। উদ্ধব চলে যেতে মহাপার্শ্ব ঘুরে এল। ধাবমান হলো অন্ধকার পথে। এই পথের সমস্তটা তার চেনা। পথেই তো কাটে তার দিবস রজনী। সে শ্রেষ্ঠীগৃহে যাবে কোন কথা নিয়ে এই অন্ধকারে? অন্ধকারে ডাকছিল সে চতুরিকাকে অনুচ্চ স্বরে। সাড়া পেল। পেয়ে যেন বাঁচল সত্যি।

চতুরিকা জিজ্ঞেস করে, গেলিনে তুই?

না ভয় করল, তুই তো এগোসনি।

আমারও ভয় করছে, মহাপার্শ্বভাই,অন্ধকারে এগোতে পারছিনে, সখী যদি ওভাবে মরে, আমার কী হবে হে মহাকাল!

মহাপার্শ্ব হাত ধরল চতুরিকার, বলল, উজ্জয়িনী থেকে পালাতে হবে।

কেন, কী হলো?

কী হলো তা বুঝছিস নে তুই চতুরিকে, উদ্ধব সব জানল কী করে, কে কখন আমাকে পদাঘাত করে জাগিয়ে তুলেছিল সন্ধের পরে সব জানে ও।

চতুরিকা বলল, কথা বলিসনে, অন্ধকারে সে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারে, মহাপার্শ্বভাই আমরা পালাই, উদ্ধব তোকে সাক্ষী মানবে।

রাজার বিপক্ষে মিথ্যে বলতে হবে আমাকে, আমি কী করে বলব, না হলে উদ্ধব মেরে ফেলে দেবে, চতুরিকে আর না, পালাই না হলে দু'জনেই মরব।

কিন্তু রাত্রিকালে পালানো হলো না, দেখল দুই সৈনিক বসে আছে দুয়ারে। তারা বলল, উদ্ধব সেনাপতির আঁজ্ঞা নিয়ে এসেছে, প্রাতঃকালে মহাকাল মন্দিরে যেতে হবে। সেখানে প্রধান সেনাপতি থাকবেন। উদ্ধব সেনাপতি কোথাও যেতে বারণ করেছে। কুঁকড়ে বসে থাকল মহাপার্শ্ব। সৈনিক দুজন পরস্পরে আলাপ করছিল। সেই আলাপ কানে আসতে থাকে। দুই সৈনিকের হাতেই খোলা তলোয়ার। মহাপার্শ্ব কোনোদিন তলোয়ার ছুঁয়ে দ্যাখেনি। তাকালেই মনে হয় রক্ত চায়। চতুরিকা দুয়ার বন্ধ করে কাঁদছে। নিজের ঘরে ঢুকে কাঁদতে পারছে সে।

এক সৈনিক বলল, রাজা ধর্ষণ করেছে, হত্যাও করেছে।

অন্য সৈনিক বলল, মুখে কালো কাপড় ঢেকে রাজা গিয়েছিল।

প্রথমজন বলল, দেবদত্তার প্রদীপটি পর্যন্ত নিভিয়ে দিয়েছিল।

হুঁ, কাল যে কী হবে, আমরা কি রাজার পক্ষে বলব না বিপক্ষে?

কীসে সুবিধে হবে জানিনে, রাজা ধর্ষণ করতে পারে, হত্যা করতে পারে বিশ্বাস হয় না।

দেবদাসীকে তো অন্ধকারে ধর্ষণই করেছিল, মহাকাল তাকে বাঁচিয়েছিল, না হলে ললিতাদাসী মরত সেদিন।

প্রথমজন বলল, রাজা এমন কাজ করেছে যে নগরের সব মানুষের কানে চলে যাবে আজ রাত্তিরেই, রাজাকে দেখেছিল ওই বীট গর্দভ, ও কেন ওখানে ছিল সেই সময়, যা হতো গোপনে হতো, কেউ জানতনা কে মেরেছে।

দ্বিতীয়জন বলল, রাজার ভয়ে ও ওখানে ছিল, ওহে মর্কট, রাজা কী করল বল দেখি, কী ভাবে হত্যাকান্ডটি হলো, তার আগে ধর্ষণ হলো কী করে?

মহাপার্শ্ব আবার কাঁপতে লাগল। দু'হাঁটুর ভিতরে মাথা গুঁজে নিজেকে আড়াল করতে লাগল। দুই সৈনিক আলাপ করতে করতে ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ঝিমোতে থাকে। আস্তে আস্তে ঢলে পড়ে। মহাপার্শ্ব দেখল চাঁদ মধ্যগগনে, মানে রাত শেষ হয়ে এল প্রায়। সে উঠল। চতুরিকার দুয়ার ঠেলে দিল। ভিতরে প্রদীপ জ্বলছিল। স্তব্ধ হয়ে বসেছিল গণিকা। মহাপার্শ্ব ইঙ্গিতে তাকে বেরিয়ে আসতে বলল। চতুরিকা পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসতেই এক সৈনিক কী যেন বলে উঠল। কুঁকড়ে গেল দু'জনে। তারপর

বুঝল ঘুমের ঘোরে কথা বলছে সৈনিকটি। ঘুম ওর পাতলা। এখনই ভেঙে যেতে পারে। দুজনে বেরিয়ে এসে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে ছুটতে লাগল।

আশী

কোথায় মহাপার্শ্ব, কোথায় চতুরিকা? তারা নগর থেকে পালিয়েছে। তাদের খুঁজতে উদ্ধবের বাহিনীর সৈনিক এদিক যাচ্ছে, ওদিক যাচ্ছে, দলপতি উদ্ধব তার ঘোড়া ছুটোচ্ছে যেদিকে পারে। কোথায় লুকোল মহাপার্শ্ব, চতুরিকা? গণিকা হত্যার বড় সাক্ষী যে তারা। রাজাকে দেখেছিল মহাপার্শ্বই। মহাপার্শ্বই শূন্য গণিকাপুরীতে প্রবেশ করে রাজার আগমনের সংবাদ দিয়েছিল। তখন গণিকা বেরিয়ে এসেছিল রাজাকে স্বাগত জানাতে। তারপর রাজা প্রবেশ করেন ভিতরে। তারপর নিহত গণিকাকে পাওয়া যায় তার ঘরে, ধর্ষিতা, সমস্ত অঙ্গে এককণাও বস্ত্র ছিল না। ধর্ষণের পর গণিকাকে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছিল। হায় হায়! উজ্জয়িনীতে এমন কখনো হয়নি। উজ্জয়িনীর সিংহাসনে পবিত্র নিষ্কলঙ্ক মানুষের অধিকার। রাজা গন্ধর্ব সেন ছিলেন নিষ্কলঙ্ক পুরুষ। রাজা তো তেমনই হয়ে থাকেন। এ কার মূর্তি দেখছে উজ্জয়িনীবাসী?

সমস্ত সংবাদই জেনে গেছে নগরবাসী। একদিনেই গণিকার মৃত্যু সংবাদ পল্লবিত হয়ে ভয়াবহ অবস্থা ধারণ করেছে। শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্তর কাছে মৃত্যু সংবাদ পৌঁছেছিল সেই রাত্রেই। সংবাদ নিয়ে গিয়েছিল উদ্ধবনারায়ণ। তার হাতে ছিল পুরোহিতের পত্র। সেই পত্রটি আবার প্রধান সেনাপতি নিজ হাতে লিখেছিলেন। শ্রেষ্ঠী তাঁর যাত্রা স্থগিত করেননি। তিনি চলে গেছেন নগর ত্যাগ করে সার্থবাহ নিয়ে। শীতের আগে পৌঁছতে চান বাহ্লিক দেশে। পুরুষপুর, তক্ষশীলা, গান্ধার দেশ হয়ে যত যাবে উত্তরে শীত ভয়ানক। শীত জেঁকে বসার আগে আবার তাঁরা রওনা হতে চান দক্ষিণদিকে। শূন্য হয়ে শ্রেষ্ঠী ত্যাগ করেছেন নগর। উতঙ্কের মৃত্যু এবং এই গণিকার মৃত্যু শ্রেষ্ঠীকে নাকি এক রাতেই ন্যুব্জ করে দিয়েছে। যারা দেখেছে, তারা বলছে শ্রেষ্ঠী গন্ধর্বের দেশে পৌঁছতে পারবেন না শেষপর্যন্ত। সার্থবাহ ফিরে আসবে।

গণিকা দেবদত্তার নিহত হওয়ার সংবাদ নগরবাসীর এক অংশকে ভীত করে তুলেছে। কী হলো? রাজা ভর্তৃহরি এমন কাজ কি সত্যি করতে পারেন? এও কি সম্ভব? রাজা অবন্তীদেশের অধীশ্বর, তাঁর কি নারীর অভাব? এমন হীন প্রবৃত্তির মানুষ তিনি! নারী হত্যা করবেন! নারী তো অবলা, আর সে ছিল প্রধান গণিকা, রাজার ভোগ্যা। সে যদি শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে বাহ্লিক দেশে চলে যাওয়ার কথা ভেবেই থাকে, রাজাদেশে তার যাত্রা রুদ্ধ হতে পারত। তার বাহ্লিক দেশে যাওয়ার কথা কে না জানত।

দেবদত্তা ছিল সেরা সুন্দরী। তার তুল্য রূপবতী গণিকা এই নগরে আর নেই। ছিলনা ও কখনো। তার মা রসমঞ্জরীর চেয়েও দেবদত্তা ছিল অনেক গুণবতী। যেভাবে তার মরণ হয়েছে তাতে নগর চঞ্চল হয়েছে। চঞ্চলতা দুদিন বাদেও যায়নি, বরং বেড়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। যে নাগরিক জানত না, সেও জেনে যাচ্ছে রাজার হাতেই নিহত হয়েছে গণিকা। রাজা কি উন্মাদ হয়ে গেলেন? দীর্ঘকাল এমন অনাবৃষ্টির অভিজ্ঞতা নগরের মানুষের ছিল না। অনাবৃষ্টিই কি রাজাকে ক্রমশ উন্মাদ করে দিচ্ছে? নাহলে কী করে রাজা গোপনে মহাকাল মন্দিরে গিয়ে সামান্য দেবদাসীকে মন্দির মধ্যেই ধর্ষণ করে ফিরে আসেন? কে কবে শুনেছে রাজা কামোন্মাদ হয়ে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে বেরিয়ে পড়েন? কে কবে শুনেছে রাজা যান অভিসারে? রাজার নিকটেই তো আসবে অবন্তীদেশের যত সুন্দরী ধনী। রাজাই তো দেবতা। দেবতা কেন এমন হবেন যা সাধারণ নগরবাসীকেও লজ্জায় ফেলে?

অপরাহ্ন বেলায় প্রৌঢ় নাগরিক দুর্মুখ বেরিয়েছে শীতল বায়ু সেবন করতে। শুধু সেই বা কেন, এখন নগরের পথ ধীরে ধীরে নাগরিকদের কোলাহলে পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। যেন মেলা বসে যায় অপরাহ্ন কালে। দীর্ঘ মধ্যাহ্ন, দ্বিপ্রহর জুড়ে নগর ছিল প্রায় জনশূন্য। প্রবল রৌদ্রের ভিতরে পথ পড়েছিল শুনশান। নিঃস্তব্ধ সেই পথকে মনে হচ্ছিল যেন মৃত অজগর। শুধু মাঝে মধ্যে সেই স্তব্ধতা ভেঙেছে রথচক্রের ঘর্ঘর, অশ্বারোহী সৈনিকদের গমনাগমণে। রৌদ্রে কোষমুক্ত তরবারি যেন ভয়াল হয়ে ছুটে বেড়িয়েছে নগরের পথে। সামনে কোনো নাগরিক পড়ে গেলে তখন হয়ত তার শিরচ্ছেদ ঘটে যেত। প্রৌঢ় দুর্মুখ দেখল মধ্যবয়সী, সদ্য তারুণ্য পার করে আসা বসুদেব হাঁটছে মন্দির অভিমুখে। সে ডাকছিল, ওহে

বসুদেব, শোনো, শুনে যাও, রাজা এবার রমণী নিধনে নেমেছেন, শাসন দণ্ড হাতে নিয়েছেন, দাঁড়াও হে, কী শুনলে বলো।

বসুদেব দাঁড়াল, বল, এ বিষয়ে কী আলাপ করব, ঘটনাটি অতীব কষ্টদায়ক।

হ্যাঁ শ্বাসরোধ হয়ে মরেছে তো গণিকা, এমন মরণে কষ্ট হয় বেশি। তবে এর চেয়ে বেশি কষ্ট হয় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মরণে, কী বলো?

জানিনা, দেবদত্তার মৃত্যু খুব খারাপভাবে হয়েছে, হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া প্রয়োজন, সে ছিল অতি গুণবতী রমণী।

প্রৌঢ় দুর্মুখ হাসে, তুমি তার কাছে যেতে নাকি?

সে ছিল প্রধান গণিকা, রাজার আশ্রিতা, রাজঅনুরাগিনী, আমি তো সামান্য মানুষ, তবে কিনা একবার তার নৃত্য দেখেছিলাম মহাকাল মন্দিরের প্রাঙ্গণে, কী রূপ তার, নৃত্যের সময়ে যেন অগ্নিশিখার মতো প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল।

প্রৌঢ় ঈষৎ বিরক্ত হলো, বলল, থাক থাক বসুদেব, ওই সমস্ত নারীর ভবিতব্য এমন, ওর মা ছিল বেশ্যা রসমঞ্জরী, সে আবার ভিনদেশী এক যবনের প্রেমে পড়েছিল, কী সব্বোনেশে মেয়েছেলে, এদেশী পুরুষে তার হলো না, ভিনদেশী চাই, সেও তো মরেছিল।

কে, কার কথা বলছেন?

যবন, সে হত হয়েছিল সৌরাষ্ট্র দেশে, এসব আমার জানা, তবে রসমঞ্জরী ছিল আরো সুন্দরী, তাই তো?

তাঁকে আমি দেখিনি, তবে যা শুনেছি দেবদত্তার মতো রূপ তাঁর ছিল না।

হবে না কেন, যবন রক্তে জন্ম যে, শোনো বসুদেব, মেয়েমানুষ যদি বহুগামিনী হয় তবে শেষ পর্যন্ত এমন ভাবেই মরতে হয় তাকে।

বসুদেব বলল, গণিকার কাজই তো বহুজনের মনোরঞ্জন করা।

অবিশ্বাসিনী নারীর এমন হয়, যা হয়েছে ঠিকই হয়েছে, এবার মেয়েমানুষ সতর্ক হবে, গেরস্ত বাড়ির মেয়েমানুষ অভিসারী হবেনা, যাক এবার গণিকা বাহ্লিক দেশে।

বসুদেব বলল, ঘটনা খুব দুঃখজনক, বিপজ্জনকও বটে, গণিকা কীভাবে অবিশ্বাসিনী হয়, শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে বাহ্লিক দেশে যে যাচ্ছে তাতো সবাই জানত।

হয়ত রাজার মত ছিল না।

মত না থাকলে রাজা তো আদেশ করবেন না যেতে, রাজাই কি হত্যাকারী?

রাজাকে গণিকার কাছে যে পৌঁছে দিয়েছিল, তার কাছ থেকেই তো সব জানা গেছে, বীট মহাপার্শ্বকে চেনা আছে, গণিকা চতুরিকা?

তারা তো নগরে নেই।

থাকলে হত হতো, কামোন্মাদ রাজার কোপে পড়তে কে চায়, ওই গণিকা চতুরিকাই হয়ত এরপর ধর্ষিত হতো, হত হতো।

কথাটা কি তাদের কাছে শোনা গেছে?

তারা তো বলেছে উদ্ধব সেনাপতিকে, অন্ধকারে তাদের ধরে ফেলেছিল উদ্ধব, এসব জান না তুমি, কোথায় বাস করো হে বসুদেব?

তাদের কাছে নিজে না শুনলে বিশ্বাস হবে না।

কেন, উদ্ধব সেনাপতির কথা?

ওই সত্রি, ওর কথা বিশ্বাস হয় না।

এ তুমি কী বলছ বসুদেব, তাহলে কি ওই বীটের কথা বিশ্বাস হবে, ও তো মহাপাতক, এক বেশ্যা মাগির বেজন্মা সন্তান, আর চতুরিকাও তো তেমনি, যৌবন ফুরিয়ে গেলে কুক্কুরিরও অধম হয়ে যায় মেয়েমানুষ, কেউ তাকাবে না তাদের দিকে, এসব তো মানো?

বসুদেব অবাক হলো। বৃদ্ধ দুর্মুখ কোন প্রসঙ্গ থেকে কোন প্রসঙ্গে চলে গেল। সে যেতে চাইছে। এই শান্ত অপরাহ্নে দুর্মুখ বুড়োর সঙ্গে আলাপে তার এতটুকুও আগ্রহ নেই। মানুষটাকে তার পছন্দ হয়

না। কিন্তু নিজের পছন্দ অপছন্দের কী আছে, বৃদ্ধ যে তার হাত চেপে ধরেছে শক্ত করে, জিজ্ঞেস করে, তোমার স্ত্রী কি রূপ?

এ বিষয়ে আলাপ করা শোভন হবে না।

দ্যাখো সমস্ত মেয়েমানুষ যে অবিশ্বাসিনী সেই কথা আমি বলতে পারি না, আমার প্রথম পক্ষ, যিনি রোগেভুগে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন, অতিশয় সুমধুরভাষিনী, অতি বিশ্বাসিণী, পতিপ্রাণা ছিলেন, তোমার স্ত্রীও হয়ত সেই রূপ, কিন্তু আমার তরুণী ভার্যার মন অন্য পুরুষে, আমার সন্দেহ সত্য, ভাবছি আবার বিবাহ করব, সুশীলা কন্যার সন্ধান জানো?

বসুদেব এতক্ষণে টের পায় বৃদ্ধের উদ্দেশ্যটি কী? সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে চাইল, কিন্তু পারল না। এই বয়সেও বৃদ্ধ শক্তি ধরে। আবার প্রসঙ্গে ফিরেছে দুর্মুখ, বলছে, স্ত্রীলোক অতি দুর্জ্ঞেয়, তাদের মন সর্বদা পাপে পরিপূর্ণ থাকে, গণিকা সেই কারণেই হত হয়েছে, রাজা যা করেছেন উজ্জয়িনীবাসীর মঙ্গলের জন্যই, এতে নগরের মঙ্গল হবে, যুবতী স্ত্রীলোক অতি ভয়ানক।

বসুদেব শক্ত হয়ে ওঠে, বলল, হাত ছাড়ুন, রাজা এত নিষ্ঠুর প্রকৃতির নন, এ কাজ তিনি করতে পারেন না।

তুমি কী বলছ বসুদেব, উদ্ধবই সমস্ত খোঁজ পেয়েছে, সে তো আসলে ছিল গুপ্তচর, এখন সেনাপতি, নিজে শুনেছে সমস্ত ঘটনা।

চোখেও দেখেছে নাকি?

দুর্মুখ মাথা নাড়তে থাকে, চাপা গলায় বলে, তুমি খুব সাবধান, বসুদেব নগরের মানুষ যা জানে, তুমি তার বিপরীত জানো, এমন তো হওয়ার কথা নয়, সবাই যেমন জানে, তুমিও তো তেমনিই জানবে, কে না জানে রাজা কামোন্মাদ।

বিশ্বাস করি না।

নগরের সবাই জেনে গেছে তা।

বসুদেব বলল, রাজা অন্য প্রকৃতির মানুষ, অনাবৃষ্টির জন্য এই সমস্ত কথা রটছে, আমার মনে হয় বৃষ্টি হলে লোকে এইসব আর বিশ্বাস করবে না।

দুর্মুখ হাসে, বৃষ্টি হলে ওই বেশ্যামাগি দেবদত্তা কি বেঁচে উঠবে আবার, তাকে তো দাহ করা হয়ে গেছে। আমার মত ছিল ওই কলঙ্কিত দেহ মহাকাল অরণ্যে নিক্ষেপ করা হোক, শিয়াল শকুনে খেয়ে বাঁচুক।

শিয়াল শকুনেই তো খেয়েছে। বলল বসুদেব।

তার মানে, গন্ধবতীর ধারে দাহ করা হলো যে।

না হলে ওই ভাবে মরে।

মেরেছে তো রাজা।

বিশ্বাস হয় না, তিনি অতি কোমল হৃদয়ের, ওই কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়, আর কেনই বা হত্যা করবেন অবলা গণিকাকে?

উন্মাদে কী না করে, আবার যদি সে কামে উন্মত্ত হয়।

মাথা নাড়ে বসুদেব, রাজার নিন্দা অতি গর্হিত কাজ ম'শায়, আমি যাচ্ছি।

শুনে বৃদ্ধ দুর্মুখ তার হাত আরো শক্ত করে ধরে রাখে, বলল, আমরা তো নিজেদের ভিতরে কথা বলছি, কে জানবে, তবে শোনো, উজ্জয়িনীর আকাশ দেখেছ তুমি রাত্তিরে?

না তো।

শোনা যাচ্ছে নতুন একটা তারা....।

আমি তারাদের তেমন চিনিনা।

আমিও চিনিনা, তবে আমার ভার্যা চেনে, আমার চোখ দেখতে পায় না দূরের তারা, ভার্যার চোখ পারে।

তিনি কী বলছেন?

কিছুই বলছে না মাগি, আমাকে তার পছন্দ নয়, তুমি একটি সুশীলা কন্যা দ্যাখো, হ্যাঁ যা বলছিলাম

আকাশে একটা নতুন তারা এসেছে।

কে বলেছে?

কেন উদ্ধব, আকাশে নতুন তারা আসা মানে নানারকম ঘটনা ঘটে যাওয়া, তাইই হচ্ছে, না হলে রাজার দুর্মতি হবে কেন দেবদাসী ধর্ষণের, প্রধান গণিকাকে হত করবেনই বা কেন, শোনো বসুদেব, সময় ভাল নয়, এই যে এতকাল বৃষ্টি নেই, কেন নেই তা জানো?

বসুদেব নিজের উত্তরীয় দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বলে, অধিককাল অনাবৃষ্টি মানুষের যুক্তিবোধ নষ্ট করে দেয়, নাহলে রাজা যে ও কাজ করবেন না তা সবাই জানে।

কোন কাজের কথা বলছ?

প্রধান গণিকা হত্যা, আপনি কি বিশ্বাস করেন?

করতেই হবে, এসব তো আকাশের ওই নতুন তারার আগমন বার্তা, বুঝতে হবে তা, না হলে যা হওয়ার কথা নয় তা হবে কেন, সিংহাসনে বসে রাজা কখনো উন্মাদ হয়ে যায়?

এ কথা কে বলল?

কোন কথা?

বিরক্ত হলো বসুদেব, বলল, আপনি একবারে কোনো প্রশ্নই বুঝে উঠতে পারেন না, আমি কথা বাড়াতে চাই না।

বৃদ্ধ বলল, কথাটা সত্যি, উদ্ধব হলো আদিতে গুপ্তচর, গুপ্তচর বংশ তার, তার কাছে সব খোঁজ থাকে, রাজা এখন উন্মাদ, নগরের যুবতী নারীরা যেন সাবধান থাকে, আকাশে যখন নতুন তারা জন্মায়, এমন মহাপ্রলয় ঘটে যায়।

বসুদেব এবার ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নেয়, বলল, আপনি নিজেও অনুমান করতে পারেন সত্যটি, রাজা ভর্তৃহরিকে কে না চেনে, কেন ওই সমস্ত মিথ্যা কথা বলছেন, উদ্ধবকে আপনি চেনেন না?

উদ্ধব অতি সুশীল প্রকৃতির।

হাঁটল বসুদেব। সে বুঝতে পারছিল কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। আর তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে এই সমস্ত ঘটনায়। কী ঘটতে পারে তার কোনো ধারণাই তার নেই। তবে বুঝতে পারছিল দুরাচারী উদ্ধবের হাতে ক্ষমতা এসে গেছে অনেক বেশি। সে বলে বেড়াচ্ছে রাজাই হত্যাকারী, রাজা উন্মাদ হয়ে বসে আছেন সিংহাসনে—এ কি তার কথা, নাকি অন্য কারোর কথা? বসুদেব হাঁটতে হাঁটতে পথের দুপাশ থেকে কথাটা আবার শুনল। একই কথা। সে আকাশের দিকে তাকায়। যদি বৃষ্টির মেঘ এসে যেত উজ্জয়িনীর আকাশে, তাহলে হয়ত মানুষের মন আবার নরম হয়ে যেত। অন্ধকারে বসুদেব গন্ধবতী নদীর কাছে গিয়ে পৌঁছল। দাঁড়াল একা। সে সামান্য মানুষ। সামান্য মানুষকে সবসময় চুপ করে থাকা উচিত। কিন্তু পারে না বসুদেব। তার গা ছমছম করে উঠল অশ্ব ক্ষুরধ্বনিতে। ঘুরেই দেখল জ্বলন্ত মশাল হাতে এক অশ্বারোহী ছুটে আসছে এদিকে। অশ্বপৃষ্ঠ থেকেই ডাক দিল, কে আছে বসুদেব?

বসুদেব ঘুরে দাঁড়ায়, আমি।

ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে মশালের আলোয় বসুদেবের মুখখানি দেখে উদ্ধব নারায়ণ গর্জন করে উঠল, কুক্কুরির বাচ্চা, তুই বসুদেব, ঠিকই খবর দিয়েছে দুর্মুখ বুড়ো, এদিকেই পেয়ে গেলাম, তুই কী বলেছিস রাজা সম্পর্কে— ! কোষমুক্ত তরবারি অন্ধকার আকাশে যেন হিল হিল করে ওঠে। ভীষণ ক্রোধে তা নেমে এল বসুদেবের ঘাড়ের উপর।

একাশী

রানী ভানুমতি বললেন, গন্ধ আসছে, ও নিপুণিকে টের পাস?

বুড়িদাসী মাথা নাড়ায়, বলল, কই কোথায়, ঘরে না বাইরে?

রানী ভানুমতি বললেন, বাইরে থেকে আসছে হয়ত, ইস! কী মরল, কী পচল, ও বুড়ি সেই গণিকাটা পচছে নাকি, তুই কী জানিস, কী টের পাস নিপুনিকে?

দাসী চুপ করে থাকে। এবার টের পায় খুব অবচ্ছ একটি গন্ধের ভাব। আছে কোথাও। এই ঘরে, কিংবা দীর্ঘ অলিন্দে। প্রাসাদের কোথাও কোথাও। মনে করলে গন্ধটা পাওয়া যায়, না মনে করলে কিছুই

না। এত বয়সেও নিপুণিকার ঘ্রাণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। এই প্রাসাদের অন্দরমহলে, ঘরে ঘরে, দীর্ঘ অলিন্দে নিঃশব্দে চলাফেরা করে এমন একটা অভ্যাস অর্জন করেছে সে, সব টের পেয়ে যায়। অনেক রকম গন্ধ তার চেনা, মানুষের নানা গন্ধ, মনুষ্যতর প্রাণীর গন্ধ। এই প্রাসাদের যে কোনো জায়গায় বসে সে টের পায় কে আসে কে যায়। রাজা ভর্তৃহরি এলেন কিনা, তাঁর বৈমাত্রেয় অনুজ বিক্রম কোথায় গেলেন, এলেন কিনা শ্রেষ্ঠী, মহাকাল মন্দিরের প্রধান পুরোহিত, এমন কী সামান্য কোনো সৈনিক তা বাতাস থেকে জেনে নিতে পারে নিপুণিকা। গন্ধটা সে পেয়ে যায়। সেই কবে তার কাছে এসেছিল গণিকা চতুরিকা, নিয়ে এসেছিল প্রধান গণিকার পত্র, রাজার জন্য—এখন যদি চতুরিকা লুকিয়েও আসে এই প্রাসাদে, গন্ধে গন্ধে জেনে যাবে নিপুণিকা কে এল। এখন এই ঘরে একটি গন্ধ আছে। মৃত মুষিকের মতো। নিপুণিকা ঘ্রাণ নিল। সব গন্ধেই সে অভ্যস্থ, কোনো গন্ধেই তার ভিতরে বিবমিষা জেগে ওঠে না। নিপুণিকা দেখল রানী ক্লান্ত হয়ে বসে আছেন শয্যায়। শয্যা ঈষৎ বিধ্বস্ত যেন। সে ঘ্রাণে ঘ্রাণে টের পেয়ে যায়, গন্ধটা উঠছে যেন ওই শয্যা থেকে। বিড় বিড় করে বলল, গন্ধ কি এখনো পাচ্ছ মা?

পাইরে নিপুণিকে, কী হলো, নগরে গণিকা হত্যা হলো?

মানুষ তো অপরাধ করে।

এ যে ভীষণ অপরাধ!

অপরাধী ধরা পড়ুক।

মাথা আমার নিচু হয়ে গেছে নিপুণিকে, শুনে আমি কী যে করব, আমি কি মরব, না মরে আমি কোথায় যাব?

দাসী বলল, থাক মা, তুমি রানী হতে জন্মেছিলে, রানী হয়েই থাকবে।

রাজার সমাচার সব জানিস নিপুণিকে?

দাসী বলে, জানিনে।

তুই সব জানিস, আর এইটা জানিসনে, আচ্ছা রাজাকে দেখে কি উন্মাদ মনে হয় তোর, উন্মাদ হয়ে যাওয়ার লক্ষণ কী নিপুণিকে?

নিপুণিকা বলে, জানিনে, আমার বাবা উন্মাদ ছিল, সমস্ত দিন বসে বসে বলত রাজা হবে, আমি জানিনে মা, বাবা রাজা হবে ভাবতে ভাবতেই মরে গেল।

তুই শুনিস কি কিছু, কী হচ্ছে এই নগরে?

মাথা নাড়ে নিপুনিকা, গন্ধ পাচ্ছি মা, তুমি না মা অবন্তী লক্ষ্মী?

আমি কী তা আমি জানিনে।

না জানলে হবে কী করে মা, তুমিই না অবন্তীর রানী।

ভানুমতি বললেন, রাজা নিজ হাতে গণিকা হত্যা করেছেন, হত্যার আগে তাকে বাধ্য করেছেন, ও নিপুণিকে এ কি রাজার কাজ?

নিপুণিকে বলল, না, রাজার কাজ হতে পারে না।

তাহলে আমি কার রানী, সিংহাসনে কে বসে আছেন নিপুণিকে?

বুড়ি বলল, রাজা আছেন, রাজা ভর্তৃহরি, এমন রাজা অবন্তীর সিংহাসনে কখনো বসেননি, রাজাকে দেখতে আমার বর্ষার মেঘের মতো নরম মনে হয় মা।

ফুহ্! রানী হাসলেন, হাত ঘুরিয়ে বক্ষবাস শিথিল করলেন, কবরী ভেঙে দিয়ে সাজসজ্জা নষ্ট করতে করতে বললেন, ভালই বলিস দাসী, তা না হলে তুই আর দাসী কেন আমিই বা রানী কেন! যাকে দেখলে মেঘের মতো নরম মনে হয় তোর, তার আমলে দুটি বর্ষায় বৃষ্টি নেই, আড়াই বছরের উপর খরাই চলছে, এমন অনাবৃষ্টি কখনো দেখেছিস বুড়ি?

বুড়ি দাসী বলল, দেখেছি।

কোথায় কবে দেখলি?

অনেক অনেক দিন আগে, মা বলত, মরুদেশ থেকে অনাবৃষ্টির সময় মাকে নিয়ে তার মা চলে এসেছিল এই দেশে, সে দেশে সাত বছর ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল না মা; পথে প্রান্তরে মানুষের কঙ্কাল, হাড় গোড়....।

ভানুমতি বলল, মরুদেশে অমন হয়।

না অমন হতো না, সেইবার হয়েছিল। বৃষ্টি কম, তবু তো হয়ে থাকে, ওই অনাবৃষ্টি আমার মা দিদিমাকে এই দেশে এনে ফেলেছিল।

ভানুমতি বলল, এখেনে কি সাত বছর হবে তাহলে? তিন বছর তো হতে যায়।

তা কেন মা, বর্ষা হবে, উজ্জয়িনীর রাজার কৃতকর্মেই বৃষ্টি আসবে।

কৃতকর্ম যে ভয়ানক।

দাসী বলল, আমি বিশ্বাস করিনে মা।

তুই বিশ্বাস করিসনে, সেই যে সেই দেবদাসী।

তাঁর কোনো দোষ ছিলনা মা, দেবদাসীও জানত না রাজা এসেছেন, আর এও তো সত্যি সে ডেকেছিল, মানুষের তো ভুল হয় মা, কার না ভুল হয়, দেবদাসীর উপর অত্যাচার তো হয়নি, তাকে বাধ্য করেননি রাজা।

করেছিলেন কিনা তা জানবি কী ভাবে?

তুমি কি জিজ্ঞেস করোনি?

প্রবৃত্তি হয়নি, রাজার দৃষ্টি এত নীচে কেন, উঁচুতে থাকে আর নীচুতে তাকিয়ে থাকে কে, বল দেখি বুড়ি।

নিপুণিকে বলল, আমাদের রাজা নন তিনি।

আর গণিকা হত্যা যে হয়ে গেল।

তার গন্ধ পাচ্ছি আমি, ঠিক বলেছ মা, মাংস পচছে মরা গণিকার, দাহ হয়ে গেছে তো পরদিন, তবু।

আমিও পাচ্ছি, উন্মাদ না হলে এ কাজ কে করে?

নিষ্ঠুরে করে, লোভীতে করে, অমানুষ যে সে করে। দাসী স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করে।

তবে তোর রাজা কী করে মেঘের মতো নরম হন?

দাসী বুড়ি বলল, তুমি কি বিশ্বাস করেছ?

করেছি, না করে কী উপায়, নগরের সবাই জেনে গেছে।

নগরের মানুষ কি বিশ্বাস করেছে মা?

করেছে নিশ্চয়, দেবদাসী ধর্ষণের কথাটা তো কেউ ভোলেনি।

দেবদাসী তো চিরকাল রাজারই ভোগ্যা হন। দাসী বলল।

গোপনে, মন্দিরে, অন্ধকারে?

নিপুণিকা বলল, গন্ধটা খুব বেড়ে যাচ্ছে মা, হাওয়া উঠেছে, জানালা দিয়ে ভেসে আসছে, পাচ্ছো মা।

রানী ভানুমতি মাথা নাড়েন। তখন দাসী নিপুণিকা তার হেঁয়ালি বন্ধ করে বলল, তুমি যা শুনেছ মা, তা হতে পারেনা ভাব না কেন, তুমি কি তোমার স্বামীকে চেননা, তিনি কি ওইরকম মানুষ?

আমি তাকে চিনিনা।

স্বামীকে চেননা, ভেবে বলো মা।

চিনি নারে নিপুণিকে, চিনি না।

মুখ দেখলে চিনতে পারবে না।

নারে নিপুণিকে না। ভানুমতি বললেন।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল দাসী বুড়ি নিপুণিকা, ধীরে ধীরে বলল, কী জানি, অবন্তীর লক্ষ্মী যদি অবন্তীর অধীশ্বরকে না চিনে থাকে, তবে এ দেশের মঙ্গল হবে কী করে, কী করে মেঘ আসবে, বৃষ্টি হবে, শোনো মা তুমি যা শুনেছ সব মিথ্যা, এর চেয়ে মিথ্যা আর হয় না।

রাজার কথা বলছিস?

হ্যাঁ মা, রাজা তা পারেন না, কেউ বিশ্বাস করে না মা একথা।

প্রত্যক্ষদর্শী আছে।

নেই, তারা এই নগরে নেই, সব মিথ্যা।

নগরের মানুষ জেনে গেছে রাজা উন্মাদ।

সব মিথ্যা, তুমি তো জান একথা সত্যি হতে পারে না, সেনাপতি কী বলে গেল মা, তিনি অন্তঃপুরে এসে নিন্দা করে গেছেন তোমার কাছে?

যা বলছে নগরের মানুষ, তাইই বলে গেছে সে।

নগরের মানুষ কিছু বলছে না, বললে তো বেঁচে থাকবে না।

বেঁচে থাকবে না কেন?

নগরের অধিকার এখন সেনাবাহিনীর হাতে, নগরে সৈন্য সামন্ত সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, পথে পথে গুপ্তচর, সেনাবাহিনী যা বলছে নগরের মানুষকে সেই কথা বলতে হচ্ছে, রাজাও কাজ করতে পারেন না, যতই অনাবৃষ্টি হোক, মানুষ যত দুঃখে থাকুক কেউ বিশ্বাস করে না।

ভানুমতি বললেন, আমি এখন কী করব, আমি যে বিশ্বাস করে ফেলেছি।

দাসী বুড়ি বলল, বিশ্বাস করেছ সূয্যি ঠাকুর পশ্চিমদিকে উদয় হন?

রানী ভানুমতি সরাসরি জবাব না দিয়ে বলল, বণিক নিয়ে যাচ্ছিল ওই গণিকাকে বাহ্লিক দেশে, সেই দেশে গিয়ে আর ফিরত না গণিকা, রাজার যদি আপত্তিই থাকবে তো রাজা নিষেধ করলেন না কেন, সেনাবাহিনীই আদেশ নিয়ে গণিকার পথ রুদ্ধ করত, কিন্তু এই কাজটি কি মানুষের মতো হয়েছে?

না হয়নি।

হূন রাজ্য দিয়ে বণিকের দল যাবে, রাজার যদি মত না থাকে রাজার আদেশ কে লঙ্ঘন করত বল দেখি।

কেউ না।

লজ্জা, ঘেন্নায় আমার মুখ ঢেকে রাখতে হবে, উনিই আমার স্বামী, তিনি কিনা গণিকা হত্যাও করতে পারেন, অবলা নারী হত্যা।

. দাসী বুড়ি বলল, তুমি কি বিশ্বাস করো মা সূয্যিঠাকুর পুবদিকে অস্ত যান, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারার মুখ দেখা যাবে না আর কোনোদিন।

হতে পারে তাই, কত কাল বর্ষার মুখ দ্যাখেনি এই নগর।

তুমি কি বিশ্বাস করো মা শিলা ভাসতে পারে জলে।

ভানুমতি থমকে যান। এতক্ষণে যেন প্রত্যয় হচ্ছে সমস্তটা। তিনি যা বলছেন, এই দাসী তার বিপক্ষেই কথা বলছে। দাসী বুড়ির কী সাহস! দাসী মাগি আবার ঠারেঠোরে আকারে ইঙ্গিতেও কথা বলে। রানী গরগর করে উঠলেন, তুই কি রাজার পক্ষে কথা বলিস নিপুণিকে, কেউ বলছে না।

তাঁর অন্নে যে প্রতিপালিত।

তুই যা নিপুণিকে, কী হয় কী না হয় ঠিক নেই, যা বলেছিস আর বলিসনে, বললে তোর শিরচ্ছেদ হবে, ওই দেবদত্তা মাগির মতো মরবি, সে মরেছে না বেঁচেছি আমি, সে থাকতে অবন্তীর রানীও বলতে পারত না তার চেয়ে বড় সুন্দরী আর নেই এ জগতে, সর্বনাশীর মরণ এইভাবেই হয়।

নিপুণিকা বুড়ি বলল, সে তো চলে যাচ্ছিল, ফিরত না।

ফিরেও আসতে পারত, আর আমি জানতাম না সে চলে যাচ্ছে, তার মরণের পর শোনা গেল সব।

বুড়ি নিপুণিকা শিহরিত হলো, তুমি জানতে না সত্যি?

না জানতাম না, ও মাগি তলে তলে যে পালাচ্ছিল তা জানতাম না, ও টের পাচ্ছিল অন্য কিছু।

বুড়ি দাসীর বুক কেঁপে ওঠে। সে মাথা নামিয়ে থাকে। মুখ তুলে যে রানী ভানুমতিকে দেখবে সেই সাহসও তার হয় না এখন। ভানুমতি বলছে, যা হয়েছে বেশ হয়েছে, কিন্তু রাজা কেন নিজ হাতে করলেন এই কাজ, তার আগে রাজার সঙ্গে নিশ্চয় কথা হয়েছিল সর্বনাশীর, না পেরে রাজা মেরেছেন।

বুড়ি দাসী মাথা দোলায়, না রাজা মারেননি।

তুই কী বলিস নিপুণিকে, বেঁচে থাকবিনে এরপর।

নিপুণিকা চুপ করে থাকে। ইঙ্গিতে তাকে চলে যেতে বলেন রানী ভানুমতি।

দাসী বুড়ি গেল না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল। তা দেখে রানী বলল, যা বলেছিস ভুলে যা বুড়ি, আর কখনো বলিসনে।

বুড়ি বলল, আমি তো কিছুই বলিনি।

বলেছিস, যা বলেছিস অসত্য বলেছিস, অসত্য আর বলিসনে।

অসত্য আমি বলিনি মা, এই প্রাসাদে দাঁড়িয়ে অসত্য কথা বলব কী করে, এতো মহাকালের প্রাসাদ, তিনি দেখবেন সব।

ভানুমতি বললেন, রাজার পাপ দেখছেন তিনি।

চন্দ্র সূর্য আছে এখনো।

ভানুমতি বললেন, তুই ওই কথাটাই বলবি না দাসী, তুই আমার দাসী, আমি যা বলব তাই বলবি, বল গণিকা হত্যা রাজার পাপ।

দাসী বুড়ি বলল না। কেন বলবে সে? তার তো বোঝার বয়স হয়েছে। এখনো কি হয়নি? যৌবন চলে গেছে, শরীর ঝুঁকেছে, মরণ তার শিয়রে এসেই দাঁড়িয়েছে, এখন তার ভয় কী? এত বছর ধরে রাজার অন্নে বেঁচে আছে, সেই ঋণ কি ভুলে যাবে? সে মনে মনে জেনে গেছে সব। কীভাবে কী হয়েছে তার একবর্ণও জানতে বাকি নেই তার। এমন শেখানো কথা বলে কী করে?

রানী ভানুমতি বললেন, গণিকা মাগিকে রাজা হত্যা করেছেন, এই কথাটা বলতে তোর এত ভয়।

তুমি মা অবন্তীর লক্ষ্মী, রাজার পাশে থাকো।

ঘেন্নায় আমার মরতে ইচ্ছে করেছে রে নিপুণিকে।

বুড়ি দাসী বলল, তুমি মরবে না, কেন মরতে যাবে?

ভানুমতি থমকে তাকিয়েছেন বুড়ির মুখে। ভাবলেশহীন। বুড়ি কি ভেবে কথা বলে, জেনে কথা বলে, নাকি যা মনে হয় তাই বলে দেয়। ভানুমতি এবার বললেন, তুই আর এই অন্তঃপুরে ঢুকবিনে, শুনলি বুড়ি, যা চলে যা।

বুড়ি শুনল না, কিন্তু দাঁড়িয়েও তো আছে। দাঁড়িয়ে আছে অথচ শুনছে না, এ কী করে হয়? চোখ দুটো কীভাবে মেলে আছে বুড়ি। বুড়ির যে ভয়ডর আছে তা মনে হয় না। ভয়ডর না থাকা এ বুড়িকে নিয়ে রানীর বড় ভয়। বুড়ি কী কথা কখন বলে আসে রাজাকে তাও জানা যায় না। বলে যে আসে সে বিষয়েও ঘোর সন্দেহ আছে ভানুমতির। আসলে রানী এত দিনেও চেনেননি বুড়িকে। বুড়ি যে সন্দেহ প্রকাশ করেছে তাঁর কথায়, এইটুকু টের পেয়ে ভানুমতি চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন, চারদিকে কেউ যখন মুখ খুলছে না তখন এই বুড়ি কেন রাজার পক্ষে? রাজার পক্ষে কথা উঠলেই যখন তা বিনষ্ট করা হচ্ছে অঙ্কুরেই, তখন কেন বুড়ি তাঁর কথা বিশ্বাস করবেনা যে গণিকাকাণ্ড রাজার দ্বারাই ঘটে গেছে। ভানুমতি বললেন, তুই কী বলতে চাস নিপুণিকে?

তুমি কি আবার শুনতে চাও মা।

তুই বলেছিস, কখন বললি?

দাসী বুড়ি মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ঘর থেকে বেরিয়ে অলিন্দে আসে। আর অলিন্দে এসে দেখল ওই প্রান্তে বিষণ্ন রাজা মাথা তুলে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। বুড়ির চোখে জল এসে গেল। রাজাকে অবোধ বালকের মতো মনে হলো।

বিরাশী

রাজসভা শূন্য ছিল। রাজা ছিলেন অন্দরমহলে। রানীও ছিলেন তাই। আকাশ আছে শূন্য হয়ে। ত্রস্ত দাসী রাজাকে পার হয়ে গেল নিঃশব্দে। রাজা জানতে পারলেন না। তাঁর চোখ ঘোলাটে মেঘহীন আকাশে।

রাজার মনে হচ্ছিল এখন কোনো অলৌকিক ঘটনা ব্যতীত এই আকাশে মেঘের সঞ্চার হবে না। মেঘ আসবে এই বিশ্বাসই যেন হারিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। এমন কোনো মানুষ নেই যিনি আকাশে মেঘ এনে দিতে পারেন। এমন কোনো ঐন্দ্রজালিক? ইন্দ্রজালে মেঘ আসুক নগরে। মেঘ এলে নগরে রটে যাওয়া মিথ্যাগুলির বিপক্ষে কথা বলতে আরম্ভ করবে মানুষ। রাজা ভর্তৃহরির তেমন মনে হচ্ছে।

দাসী নিপুণিকা নিজের মনেই বেরিয়ে এসে দাঁড়াল প্রাসাদের সামনের প্রশস্ত আঙিনায়। ঘোলাটে রোদের কী তেজ! আঙিনার ঘাস মরে গেছে পর্যন্ত।

দাসী বুড়ি আকাশ দেখল। কপালে হাত রেখে প্রধান দ্বারের দিকে হেঁটে যেতেই দেখল দ্বাররক্ষীদের একজন ভিতরে আসছে।

দাসী বুড়ি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, সমাচার কী?

এক উন্মাদ এয়েছে।

উন্মাদে নগর ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, জল না নামলে এমন হবে, তাড়িয়ে দে।

যাবেই না, বলছে মেঘের খোঁজ এনেছে।

তার মানে? বুড়ি নিপুণিকা অবাক হলো, কিসের খোঁজ?

মেঘের, বলছে সে বৃষ্টি নামাতে পারে।

সত্যি উন্মাদ।

সত্যি বলেই তো বলছে এই কথা।

তাড়িয়ে দে।

যাবে না বলছে, রাজার সঙ্গে কথা বলবে, দূরদেশ থেকে আসছে।

রাজার সঙ্গে কি সবাই কথা বলতে পারে?

রক্ষী বলল, এরপর বর্শার খোঁচা মারতে হয়, কিন্তু লোকটাকে দেখে মায়া হয়, বলছে বৃষ্টি নামাবে।

এবার বুড়ি নিপুণিকার বুকটা কেঁপে উঠল। এও কি কোনো চক্রান্ত? বৃষ্টির প্রলোভনে ফেলে রাজাকে বিপদে ফেলা। বৃষ্টি নামাবে! দাসী ভাবল হয় উন্মাদ না হয় কুচক্রী। ভগবান মহাকাল ব্যতীত বৃষ্টি নামানোর সাধ্য কারো নেই। বুড়ি বলল, চ দেখি, কেমন সে বৃষ্টি নামাতে পারে, তাহলে নামিয়ে দেখাক।

রাজার সঙ্গে কথা বলবে, তারপর। রক্ষী হাঁটতে লাগল। তাকে অনুসরণ করল বুড়ি নিপুণিকা। তার ভয় করছে সত্যি। যা ঘটার নয় তা ঘটে যাচ্ছে নগরে। অনাবৃষ্টির ভিতরে বৃষ্টি নামাবে বলে যে হাজির হয়েছে তার উদ্দেশ্য কী? দাসী বুড়ি আকাশে তাকায়। ঘুরে তাকায় অন্তঃপুরের দিকে। দেখা যাচ্ছে না কিছুই, কিন্তু বাতায়নে তো রাজার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ছে আকাশের দিকে চেয়ে। রানী ভানুমতি বসে ভাবছে প্রধান সেনাপতি বিক্রমের কথা। রাজার ঘরে মসি পাত্র, হংসপাখা সব পড়ে আছে। রাজা ওসব হাতে নেন না এখন।

ভাবতে ভাবতে বুড়ি দাঁড়াল, বলল, লোকটাকে বরং চলে যেতে বল, দেখছিস তো নগরে কী ঘটে যাচ্ছে, আবার যদি কিছু ঘটে যায়, বৃষ্টি কি কেউ নামাতে পারে?

রক্ষী বলে, এক একটা মানুষ পাওয়া যায়, তারা ওসব পারে, দিনমানে রাত নামিয়ে আনতে পারে, ইন্দ্রজালে সব হয়, মানুষ অদৃশ্য হয় জানিসনে?

ঘণ্টা বেজে উঠল। রক্ষী চঞ্চল হলো, ওই আবার ঘণ্টা নাড়াল লোকটা, তুমি বরং দ্যাখো রাজার সঙ্গে যদি দেখা হয়।

বুড়ি বলল, আমি আগে দেখি লোকটাকে, দিনকাল সুবিধের নয়, যেভাবে গণিকা দেবদত্তাকে মারল দুর্বৃত্তটা, আমি কি কিছু বুঝিনে, না নগরের মানুষ কিছু বোঝে না, জল না হওয়ায় সবাই উন্মাদ, না হলে রাজার নামে ওকথা বলতে পারে, যে বলে তার জিভ ছিঁড়ে নেয় না কেন মানুষ?

চুপ চুপ! রক্ষী মুখে আঙুল দিল, বাতাসেরও কান আছে।

আছে বলেই তো শোনাচ্ছি, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আমার কী হবে, মেরে ফেলবে, ফেলুক, কেই বা মারবে, মারতে আসুক।

রক্ষী বুঝল বুড়িদাসীও উন্মাদের মতো কথা বলছে। চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে সে মনে করল। বুড়িও ধীরে ধীরে থেমে গেল। হাঁটতে হাঁটতে তারা প্রধান দ্বারের বাইরে এল। বুড়ি দেখল একটি মানুষ প্রাচীরের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে। গাল ভর্তি দাড়ি, মলিন বেশবাস, জটপাকানো রুখু চুল, খরায় পুড়ে গাত্র বর্ণ তামাটে মলিন, ঈষৎ ঝুঁকে রয়েছে দেহখানি। তার কাঁধে একটি ঝোলা, পেটিকার মতো প্রায়। দেখে মনে হচ্ছে লোকটা ভবঘুরে, ভিনদেশীই হবে। উজ্জয়িনীতে এমন মানুষ তো আসছে আর যাচ্ছে। দূরের গ্রাম থেকে আসে, দূরের দেশ থেকে আসে, ভাবে উজ্জয়িনীতে এলেই রাজা হয়ে

যেতে পারবে। ধনদৌলত, মণিমানিক্য পড়ে আছে যেন উজ্জয়িনীর পথে। কুড়িয়ে নিতে পারলেই হয়। শেষে নগরে এসে ব্যর্থ হয়ে ভবঘুরে হয়ে হেথা হোথা চলে যায়। এই ভিনদেশী চতুর কম নয়। নগরে ঢুকেই রাজার কাছে চলে এসেছে। বৃষ্টি নামাতে পারবে? রাজার দুর্বলতা বুঝে নিয়ে ওই পথে উপার্জনে নেমেছে। বুড়ি নিপুণিকা জিজ্ঞেস করল, কী চাই?

রাজদর্শন।

রাজা কেন দেখা করবেন তোর সাথে, ভবঘুরে উন্মাদ।

লোকটি মুখ তুলল না, চাপা গলায় বলল, বৃষ্টির খবর জানি।

মিথ্যে বলছিস, শোন দু আড়াই বছরের উপর এক ফোঁটা জল নামেনি আকাশ থেকে, এখন মিথ্যে স্তোক দিসনে।

সত্যি কথা, রাজার খুব বিপদ?

কী বিপদ?

লোকটা বলল, জল নেই, আমি জল নামাব।

নিপুণিকা চিন্তায় পড়ল। সত্যি কথা বলছে নাকি মিথ্যে? ইন্দ্রজাল দ্বারা বৃষ্টি নামানো সম্ভব তা জানে নিপুণিকা। শুনেছে, কিন্তু চোখে দ্যাখেনি কখনো। ঐন্দ্রজালিকরা সব পারেন, বৃষ্টি নামানো তো ছেলে খেলা। এই লোকটা কি ঐন্দ্রজালিক হতে পারে। ঐন্দ্রজালিকদের দ্যাখেনি কখনো নিপুণিকা? তারা কি এইরকম হয়? শুনেছে মায়াবলে যুবতীকে বৃদ্ধা, বৃদ্ধাকে যুবতী করে দিতে পারে তারা। সে এগিয়ে যায়, চাপা গলায় বলল, তুমি ঐন্দ্রজালিক?

কেন, কী প্রয়োজন?

জল নামাবে বলছ, সে তো ইন্দ্রজালে হবে।

লোকটি বলল, হ্যাঁ ঐন্দ্রজালিক।

মায়া জানো?

জানি। লোকটা মাথা নামিয়ে হাসছিল।

মায়াবলে মানুষকে গর্দভ, গর্দভকে মানুষ করে দিতে পারো?

লোকটি বলল, পারা যেতে পারে।

যুবতীকে বৃদ্ধা করে দিতে পার?

পারি।

তখন বুড়ির বুক টিপটিপ করে ওঠে, সত্যি বলছে লোকটা। এ কোন দেশে থেকে এল? সে জিজ্ঞেস করতে লোকটা বলল, অনেকদূর, উত্তরপুর থেকে আসছি এখন।

ওদিকে বৃষ্টি আছে?

না নেই, রাজার সঙ্গে দেখা করব।

হবে, তার আগে একটা কথা শোনো ঐন্দ্রজালিক, এক যুবতীকে বুড়ি থুত্থুড়ি করে দিতে হবে, আর এক বুড়িকে সুন্দরী যুবতী।

শুনে লোকটা হাসল, বুড়িটা কে, তুমি?

বুড়ি দাসী নিপুণিকা চুপ করে থাকল। জবাব দিল না। জবাব না দেওয়া মানেই তো ও যা বলছে তা সত্যি। বুড়ি তখন বলল, যুবতী হচ্ছে রানী ভানুমতি, অবিশ্বাসিনী, পরপুরুষ, রাজার বৈমাত্রেয় ভাই, প্রধান সেনাপতির অনুরাগে ওর মাথা গেছে, পারবে গো ঐন্দ্রজালিক?

রাজার কাছে নিয়ে চলো।

তার আগে বলো পারবে কিনা? রক্ষী এগিয়ে এসেছে, বুড়িকে যুবতী করে দিতে পারবে নাকি সত্যি, নাকি বুড়ি উন্মাদ হয়েছে?

লোকটা কথা না বলে অরক্ষিত দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে প্রাসাদের এলাকায়। তাকে অনুসরণ করে ঝুঁকে হাঁটতে থাকে বুড়ি দাসী। বুড়ির মনে হচ্ছে এই লোকটা পারবে। পারলে রানী হয়ে যাবে দাসীরই মতো। বুড়ি রানীর দিকে আর তখন কি সেনাপতি দৃষ্টি দেবেন? দাসী ভাবল, আমি তো যুবতী হবো, কিন্তু আমার দোসর হবে কে? রাজাকে তো কোলে পিঠে মানুষ করেছি আমি, তবে? রাজা আমার

সন্তানের মতো। হাঁটতে হাঁটতে দাসী ভাবে কাজ নেই, বরং রানী ভানুমতি হোক বুড়ি। তবেই ওর জ্ঞান হবে। কিন্তু এসবের আগে বৃষ্টি নামুক। দাসী ডাকল লোকটাকে, বলল, দাঁড়াও, রাজসভা শূন্য, রাজা যাবেন ওখানে, দুয়ারে বসো।

লোকটা হাসল। কী সুন্দর হাসি! অবাক হয়ে গেল দাসী। তারপর তার মনে পড়ল এতো ঐন্দ্রজালিক। হাসিটা যেমন দেখাতে চাইবে তেমন দেখবে সে। আর তাই যদি হয়, তবে চাইলেই এই মানুষটা আকাশে মেঘ এনে বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিতে পারবে উজ্জয়িনীর মাঠঘাট, নদীনালা, সরোবর সাতটি। আহা, বৃষ্টি নেই বলেই রাজার অমন দশা। রাজাকে সে সন্তানের মতো দ্যাখে মনে মনে। বুড়ি এগিয়ে গেল, বলল, ওসব দরকার নেই, শোনো তুমি যে জন্য এসেছ তাইই করো।

কী দরকার নেই?

আমি যেমন আছি তেমন থাকি, তুমি বরং জল আনো, রানী যেমন আছে তেমন থাক, তুমি বরং মেঘ আনো, মেঘবৃষ্টি এলে রানীর মনও ঘুরে যাবে, মধ্যিখান থেকে গণিকা মরলো, সে নাকি যেতে চাইছিল তার বাপের বাড়ি, অনেক দূরে।

লোকটা বলল, রাজা সমাচার শুনুন, আমি অপেক্ষায় আছি।

বুড়ি দাসী ত্রস্ত পায়ে ছুটে গেল অন্দরমহলের দিকে। বৃষ্টিই আসুক। বৃষ্টি নেই বলেই না তার মনে খারাপ চিন্তা ঢুকেছিল। বুড়ি ভিতরে ঢুকে দেখল রাজা সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে, আকাশের দিকে চোখ মেলে। সে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকটা সময়। যদি রাজা ফিরে তাকান। রাজা ভর্তৃহরির সাড় নেই যেন। বুড়ি শেষে গড় করে মেঝেতে, চাপা গলায়, করুণ কণ্ঠে ডাক দেয়, প্রণাম হই মহারাজ, এক ভিনদেশী ঐন্দ্রজালিক এসেছে, দেখা করতে চায়, মহারাজ কি সভায় যাবেন?

রাজা ঘুরলেন। বুড়ি দাসীকে দেখে অপ্রসন্ন হলেন না, বললেন, সভায় তো আজ কেউ নেই।

না নেই, কেউ নেই, শূন্য হয়ে গেছে।

আমার সেনাপতি, বিক্রম?

নেই, তিনি হয়ত মন্দিরে।

আমার অধ্যক্ষরা?

কেউ নেই, শুধু ভিনদেশী বসে আছে, ঐন্দ্রজালিক।

ভর্তৃহরি বিস্মিত হলেন, জিজ্ঞেস করলেন, কে, কী পরিচয় তার?

জানি না, ভিনদেশী মনে হয়, জল নামাবে বলছে।

জল, মানে বৃষ্টি নামাবে?

হ্যাঁ মহারাজ, ঐন্দ্রজালিকরা পারে।

বলছে তাই?

বলেছে তো, তাকে দেখে ঐন্দ্রজালিক মনে হয়, কী সুন্দর হাসি তার।

ভর্তৃহরি বললেন, উন্মাদ, বহুদিন বৃষ্টি না হয়ে চারদিকে উন্মাদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, চলে যেতে বলো।

দাসী বুড়ি বলল, একবার দেখুন তাকে মহারাজ, সে ইন্দ্রজালে মেঘ আনবে, বৃষ্টিতে নগর ভাসিয়ে দেবে, সে সব পারে।

রাজা হাসলেন। ইন্দ্রজালের মেঘ! ইন্দ্রজাল ফুরিয়ে গেলেই তো তা উধাও হয়ে যাবে। এই নগরে কি এমন মানুষ আছে যে ইন্দ্রজাল জানে? থাকতে পারে হয়ত, তিনি জানেন না। না থাকলেই বা কী, এতো ভিনদেশী। ভিনদেশী ঐন্দ্রজালিক এসে অনাবৃষ্টির অবসান ঘটাবে? তিনি হাঁটতে লাগলেন। আসলে চারদিকের ঘটনা তাঁকে দুর্বল করে তুলেছে। নিমজ্জমান ব্যক্তির মতো খড়কুটো ধরেই যেন বাঁচতে চাইছেন তিনি। রাজাকে অনুসরণ করল নিপুণিকা।

রাজা অন্তঃপুর থেকে বাইরে এলেন। রাজার পিছনে পিছনে হাঁটতে হাঁটতে বুড়ি দাসীর দুচোখ আর্দ্র হয়ে উঠল। ইনিই কি উজ্জয়িনীর রাজা গন্ধর্ব সেনের পুত্র ভর্তৃহরি? এক উন্মাদ প্রায় ভবঘুরে এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন শূন্য রাজসভায়? ইন্দ্রজাল তো শেষ অবধি সত্য হয় না। ফুরিয়ে গেলেই আবার সব যেমন তেমন। বুড়ি ভাবল সে নিজেও উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে, না হলে ঐন্দ্রজালিকের কথায়

বিশ্বাস করে রাজার কাছে আসে? এখন যদি গিয়ে দেখা যায় লোকটা নেই।

রাজসভাগৃহের দুয়ারে মানুষটা বসেছিল। বুড়ি তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হাঁপাচ্ছে সে, বলল, রাজা সভায় এসেছেন, তুমি যাবে এবার, কিন্তু সত্যি করে বলো দেখি তুমি কি পারবে জল নামাতে?

লোকটা হাসল। সেই মধুর হাসি। হাসিতে মুগ্ধ হলো বুড়ি। তার ভিতরে সন্তান বাৎসল্য জেগে উঠল। মনে হলো এই মানুষ মিথ্যে বলতে আসেনি। বুড়ি বলল, এমন কথা বলো না বাছা, যাতে রাজা ভয় পেয়ে যান, রাজার কাছে মিথ্যে বলা পাপ, এটা মনে রেখো, আর যদি বৃষ্টি আসে সত্যি, তোমাকে মাথায় রেখে দেবে নগরের মানুষ, মহাকাল তোমার সঙ্গে থাকবেন, যাও।

লোকটি উঠে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে প্রবেশ করে সভাগৃহে। এমন শূন্য কি সভাগৃহ হতে পারে? সে অবাক হয়ে দেখল বিষণ্ণ রাজা দাঁড়িয়ে আছেন দূরে। বসেননি। বসলে স্বস্তি হবে না। কার মুখোমুখি বসবেন তিনি?

শূন্য রাজসভা দেখে রাজার মনে হচ্ছিল সভা বোধহয় ভেঙে গেছে। এখনই অমাত্যবর্গ চলে গেলেন। শুধু এক দর্শনার্থী দাঁড়িয়ে আছে। না সে ভিক্ষুকের মতো দাঁড়িয়ে নেই। মাথা উঁচু করে এগিয়ে আসছে।

লোকটা মাথা নামিয়ে বলল, মহারাজার জয় হোক, জয় হোক উজ্জয়িনীর, দেশ আবার সজল হয়ে উঠুক, ফসলে সবুজ হোক, নদীতে জল আসুক, সপ্ত সরোবরে প্রস্ফুটিত হোক নীলকমল, লালকমল, শ্বেত কমল।

রাজা আবেগরুদ্ধ গলায় বলে উঠলেন, এমন কথা কেউ বলেনি, এমন আকাঙ্ক্ষার কথা বহুদিন শুনিনি, তুমি কে?

আমি ভিনদেশী, এখন উত্তরপুব দেশ থেকে আসছি।

কোন দেশের মানুষ?

সব দেশ, সেই রামগিরির পাহাড় থেকে হিমালয়ের অলকাপুরী পর্যন্ত সব আমার দেশ, মহারাজ সত্য উচ্চারণ করতে পারি?

নির্ভয়ে বলো।

আগে যে পথে যেদিকে গিয়েছি, শুনেছি মহারাজের জয়ধ্বনি, মানুষ খুব সুখে ছিল, সমৃদ্ধি ছিল সব দিকে, আবার সেই পথে যখন ফিরেছি তখন শুনেছি অন্যকথা, মানুষ খুব দুঃখে আছে, কোথাও বৃষ্টি নেই, সবুজ ফসল মরে গেছে, নদী শূন্য হয়ে গেছে, রাজার নিন্দায় ভরে গেছে, সব লোকে বলছে, তাঁরই জন্য মেঘ গেছে অন্যদিকে, মহারাজ সত্য বলছি।

রাজা ভর্তৃহরির দুচোখ সজল হয়ে ওঠে, কথা তো সত্য, দুঃখে তো মানুষ আছে, তিনিও যে দুঃখের সরোবরে ডুবে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে।

তিরাশী

রাজা বললেন, এসব আমি জানি, তুমি কি বৃষ্টি নামাতে পারো?

লোকটি বলল, মহারাজ বৃষ্টি তো নামবেই, এবছর না হোক পরের বছর, প্রকৃতি এরকম থাকবে না, আমি বলছি আপনি কি শুনেছেন উজ্জয়িনীর আকাশে নতুন তারার কথা, আপনাকে কি আচার্য বৃষভানু বলেছিলেন?

তিনি বিশ্বাস করেননি।

মহারাজ আমি উজ্জয়িনী আসতে আসতে শুনে এসেছি নতুন তারার কথা।

মানুষ কত রকম ভাবে, ভাবতে পারে, পারে বলেই বেঁচে থাকে।

মহারাজ, আমি এও শুনেছি দূর উত্তরপুবে, যে গ্রাম পার হয়ে আরো দূরে এক সীমাহীন প্রান্তরের ভিতর আচার্য বৃষভানু দেহত্যাগ করেছিলেন—।

আচার্য বেঁচে নেই? আর্তনাদ করে ওঠেন রাজা ভর্তৃহরি।

না, অন্ধ জ্যোতির্বিদ হিমালয়ের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিলেন।

আমি তা জানি।

যে পথে যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করেছিলেন সেই পথে যেতে চেয়েছিলেন।

হয়ত তাই।

পথিমধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটে, যেমন ঘটেছিল অন্য চার পাণ্ডবের।

হতে পারে তা, কিন্তু আমি জানি না।

আপনার রাজ্য সীমার ভিতরেই কিন্তু তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল।

জানি না, আশ্চর্য আমি জানি না কেন, কেউ কেন সংবাদ দেয়নি?

আপনিও তো আচার্যর খোঁজ করেননি।

মাথা নিচু হয়ে গেল রাজা ভর্তৃহরির। সত্য। তাঁর তো কোন দিকেই ঠিকঠাক দৃষ্টি নেই। অনাবৃষ্টি তাঁর প্রখর বুদ্ধিকে হরণ করেছে যেন। হায়! তিনি কেন আচার্যকে ফিরিয়ে আনেননি? জিজ্ঞেস করলেন, আচার্যর মৃত্যু কীভাবে ঘটেছিল, দেহ কোথায় দাহ হয়েছিল?

এই শিপ্রাতীরে, দেহ নয় হাড় ক'খানি।

তুমি জানলে কী করে?

জেনেছি, মহারাজ এই জগতে কেউ একা কোনো কাজ করতে পারে না, সেই কাজ ধ্বংসের হোক বা সৃষ্টির হোক, হাড় ক'খানি বয়ে এনে শিপ্রাতীরে দাহ করেছিল তাঁরই শিষ্য, থাক এসব কথা, যা হয়ে গেছে তার জন্য অনুশোচনা করে কোনো লাভ হবে না, আমি যে কথা বলছিলাম, সেই যে গ্রামে আচার্য আশ্রয় নিয়েছিলেন এক রাত্রে, সেই গ্রামের নাম কালামুখী—কালামুখী এক গ্রামদেবী।

অবাক হচ্ছিলেন রাজা ভর্তৃহরি। তাঁর দেশে কালামুখী নামের এক গ্রাম আছে, সেই গ্রামে নিষাদ চণ্ডালজাতি বসবাস করে, সেখানে গিয়েছিলেন আচার্য..... এই মানুষটি সেই গ্রাম থেকে আসছে।

তারপর? রাজা এবার বসেছেন তাঁর আসনে, ইঙ্গিতে বসতে বললেন ভিনদেশী অতিথিকে। সে বসে না, বলল, মহারাজ এখানে নয়, আমি যে সমাচার এনেছি তা শুনতে আপনাকে অন্য কোথাও যেতে হবে, এখানে এখনই কেউ এসে যেতে পারে, আমি যে কথা বলব তার জন্য নির্জনতা চাই, নদী তীর চাই, অন্ধকার চাই।

রাজা চুপ করে ভাবছিলেন নানা কথা। তাকে একা পেতে চাইছে এই ভিনদেশী। তাকে নদীতীরে নির্জনতার ভিতরে ডাকছে এই অচেনা মানুষটি। গা ছমছম করে উঠল। এই লোকটি আসলে কে? গুপ্তচর নয়তো? গুপ্ত হত্যাকারী? যে হত্যাকারী গণিকা দেবদত্তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে সে নয়ত, নাকি তারই কোনো প্রতিনিধি? তিনি অনুভব করতে পারছিলেন তিনি খুব একা হয়ে গেছেন। তাঁরই নগরে গণিকা হত্যা হয়েছে, তিনি এর কুল কিনারা করতে পারছেন না। যা শুনেছেন তা বিশ্বাস হয় না। নগরে এই সমস্ত কথা রটে যাচ্ছে কীভাবে? তিনি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন অচেনা মানুষটিকে।

এবার ভিনদেশী বলল, আপনার ভয় নেই মহারাজ, আমাকে দেখে কি মনে হয় আমার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

জানি না, মানুষের মুখ সবসময় সত্য কথা বলে না।

আমি অসত্য বলছি না, মহাকাল ভগবানের নামে সত্য বলছি, আপনি আসুন, উজ্জয়িনীর রাজা তো পৃথিবীর অধীশ্বরের সম্মান পান, আমি সামান্য মানুষ, ভবঘুরে মানুষ, দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি বহুদিন ধরে, পথে পথে যত জয়ধ্বনি শুনেছি আপনার, ততো নিন্দা শুনছি এখন, বুক ভেঙে যাচ্ছে। আমি জানি রাজার এখানে কোনো ভূমিকা নেই, প্রকৃতির খেয়াল সব, কিন্তু লোকে তা মানতে চায় না, তারা আকাশের নতুন তারাটিকে দেখে নিতে চায়, তারা বিশ্বাস করে শুক্রগ্রহের প্রভাবে যেমন অনাবৃষ্টি, নতুন তারার প্রভাবেই বৃষ্টি নামবে। মহারাজা আপনি আসুন, আচার্যর আশ্রম বন্ধ হয়ে গেছে, ওই নদীতীরে কথা হবে। সন্ধ্যায় মঙ্গলনাথের মন্দিরের সামনে।

রাজা ভর্তৃহরি মনঃস্থির করলেন। ভিনদেশী পুরুষটি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হলো। রাজা মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন। লোকটি কে? কেন এল, কী বলতে চায়—কিছুই ধরতে পারেননি তিনি। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এই ভিনদেশী সব জানে। যা তিনি জানেন না, তাও জানে। আশ্চর্য! তিনি অন্তঃপুরে ফিরতে লাগলেন।

বুড়ি দাসী ঝিমিয়ে ছিল। ভিনদেশী ঐন্দ্রজালিক যখন দ্বার পার হয়ে চলে যাচ্ছে তখন চোখ খুলে বুড়ি তাকে দেখতে পায়। ডাকল। কিন্তু সে ফিরল না। বৃষ্টি কখন নামবে? অপরাহ্নে না মধ্যাহ্নে জানা

থাকলে বুড়ি আঙিনায় এসে দাঁড়াবে। কিন্তু লোকটা চলে যাচ্ছে কেন? বুড়ি হাঁচোড় পাচোড় করে বাইরে চলে আসে। কোথায় রক্ষী? কাছে পিঠে নেই নাকি? ওই তো ঘুমিয়ে আছে সে দিনের আলোর ভিতরেই। বুড়ি দেখল হন হন করে হেঁটে তার ঐন্দ্রজালিক অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে দূরে। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সে। এখন তার মনে হলো ইন্দ্রজাল মিথ্যা। এই নগরে আর কোনো দিন বৃষ্টি নামবে না। লোকটা ঠকিয়ে চলে গেছে। কিন্তু রাজা? তিনি কোথায়? ভাল আছেন তো? গুপ্ত ঘাতক নয় তো এই ভিনদেশী? বুড়ি আবার ফিরতে লাগল প্রাসাদের দিকে। দ্রুত পায়ে মনে মনে মহাকালকে ডাকতে, ডাকতে। হায় মহাকাল! রাজা ভর্তৃহরি বেঁচে থাকুন, উজ্জয়িনীর ভাল হোক, বৃষ্টি আসুক, রাজার সমস্ত কলঙ্ক ধুয়ে যাক!

সেদিন সন্ধ্যায় দেবপথ ধরে একটি মশাল হাতে নিয়ে রাজা ভর্তৃহরি শিপ্রাতীরের উদ্দেশে রওনা হলেন। মুখখানি ঢেকে নিয়েছেন উত্তরীয়তে। গোপনে যেতে হবে। লোকটি তেমনই বলে গেছে। কাকপক্ষী যেন টের না পায়। কেউই কিছু জানল না। রাজা দেবপথেই জ্বলন্ত মশালটি রেখে অন্ধকারে শিপ্রার তীর ধরে হেঁটে যেতে লাগলেন। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতিথি আজ। চাঁদ আকাশে নেই। অন্ধকারে তারার আলোয় পথ চিনে যেতে রাজার কোনো অসুবিধে হয় না। এই পথে বহুবার তিনি গেছেন মঙ্গলনাথের মন্দির, আচার্য বৃষভানুর আশ্রমে। পথের কোথায় পথটি বাঁক নিয়েছে, কোথায় পথ হয়ে উঠেছে সঙ্কীর্ণ, কোথায় পথটি উঁচু নিচু, ঢালু হয়ে নেমে গেছে আচমকা, উঠেও গেছে তেমনি, সব জানেন রাজা ভর্তৃহরি। তিনি আকাশ দেখলেন। বর্ষার আকাশ এমন হয়ে থাকে না। পশ্চিম আকাশে ঈষৎ উত্তর ঘেঁষে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে দেখতে পাচ্ছেন রাজা। দাঁড়িয়ে পড়লেন। দক্ষিণে ঘুরে তাকালেন, ধ্রুবতারা জ্বলজ্বল করছে। সপ্তঋষির শেষজন ঋষিমরীচি থেকে পশ্চিমে নেমে এলে পূর্ব ফাল্গুনি, তার নীচে উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র। রাজা জানেন স্বাতী নক্ষত্র রয়েছে ঠিক মাথার উপরে। তার পেছন দিকে ছায়াপথ নেমে উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে গেছে তারার আলোর স্রোত নিয়ে। সরাসরি পশ্চিম দিগন্তে অস্তগামী শুক্রগ্রহকে দেখতে পেলেন রাজা। তিনি যেন অস্তগামী ওই গ্রহকে লক্ষ্য করে হেঁটে যাচ্ছিলেন।

মঙ্গলনাথের মন্দিরে পৌঁছে দেখতে পেলেন ভিনদেশীকে। মন্দিরটি বহুদিনের। সমস্ত দিন থেকে সন্ধ্যায় আরতির পর পুরোহিত চলে যায় নগরের দিকে। এখানে একটু তফাতে আচার্যর যে আশ্রম, তাও এখন জনমানবহীন। গাছগাছালির অন্ধকার শিপ্রাতীরকে আরো অবোধ্য করে তুলেছিল এখন। রাজা দেখলেন মন্দির প্রাঙ্গণে দীপের আলো। বাতাস নেই। গাছগাছালি যেন গভীর নিদ্রায় ডুবে গেছে। রাজা দাঁড়ালেন। তাঁর বুক ছম ছম করে উঠল। আচার্য বৃষভানুর আশ্রমের সেই দশার্ণদেশীয় যুবকটি কোথায়? যেদিন আচার্যর নিষ্ক্রমণ হয়, সে দিনটির কথা মনে পড়ল রাজার। তিনি শিপ্রানদীর অর্ধচন্দ্রাকৃতি রূপ দেখতে লাগলেন। নদীর জলের দিকে তাকালেন। অন্ধকার সেখানে ঘন। মনে পড়ে যায় আর এক বর্ষার কথা। সমস্ত ঋতুজুড়ে নদীর ডাক শোনা যেত। তাহলে কি নদীও ত্যাগ করে চলে গেছে এই শিপ্রাতীর। আচার্য গেছেন, তাঁর শিক্ষার্থীরা গেছে, আকাশের মেঘ গেছে—তিনি একা পড়ে আছেন এই নির্জন নদীতীরে। পিছন থেকে ডাক শুনলেন, মহারাজ আসুন।

কোথায় যেতে হবে?

মন্দিরের প্রাঙ্গণে বসি, যদি বলেন প্রদীপ জ্বলবে, না বলেন শুধুই তারার আলো থাকবে।

রাজা ধীরে ধীরে মন্দিরের প্রাঙ্গণে এলেন। দেখলেন প্রদীপ জ্বলছে ভিতরে, বিগ্রহের সামনে। অন্ধকার প্রাঙ্গণে তাঁর জন্য আসন পাতা। বসলেন। তাঁর মুখোমুখি বসল অচেনা মানুষটি। তাকে এখন যেন আরো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দিনের আলোয় চিনতে পারেননি রাজা, এখন যেন মনে হচ্ছে একেবারে অচেনা কেউ নয়। রাজা বললেন, আপনার পরিচয় আগে শুনি।

আমি সামান্য মানুষ, ভবঘুরে মাত্র।

সামান্য ভবঘুরের কী সাহস রাজা ভর্তৃহরিকে আহ্বান করে নির্জন নদীতীরে, তুমি তো বন্দি হতে পার।

স্মিত হাসল ভিনদেশী, রাজা ভর্তৃহরিকে কে না চেনে, নাগরিক, রাজ্যবাসীদের সুবিধে এই যে তারা রাজাকে সম্পূর্ণ জানে, কিন্তু রাজার দুর্ভাগ্য এই যে তিনি তাঁর প্রজাদের কাউকে চেনেন না, চেনার কোনো উপায় নেই।

ভর্তৃহরি জিজ্ঞেস করলেন, আমি কেন এখানে এলাম?

আকাশে যে নতুন তারাটি ফুটেছে তার কথা শুনতে।

বহুদিন ধরে শুনছি, আচার্য বৃষভানু বলে গেছেন এসব অলীক ধারণা, এমন কিছু হয়নি, হতে পারে না।

ভিনদেশী বলল, হয়েছে, যে পথে এসেছি, সেই পথে শুনেছি নতুন তারার গুণগান, আর রাজার নিন্দা।

ভর্তৃহরি চমকে উঠলেন। রাজ-নিন্দার কথা অজানা নয়। কলঙ্ক-কথা অজানা নয়। কিন্তু কোন তারার কথা বলছে এই ভিনদেশী? এ কে? কোথা থেকে এসেছে?

ভিনদেশী যুবক বলল, আমার কথা পরে শুনবেন মহারাজ, তারার কথা শুনুন।

আমি বিশ্বাস করি না।

ভিনদেশী তার পেটিকা থেকে একটি ক্ষুদ্র দর্পণ বের করে আনে। রাজার মুখের সামনে ধরে, জিজ্ঞেস করে, নিজেকে চিনতে পারছেন মহারাজ?

রাজা দর্পণে দেখলেন অন্ধকার। আবছা অবয়বটি ফুটেছে দর্পণে, কিন্তু তা দেখে চেনা যাচ্ছে না সত্যি, কিন্তু তিনি তো জানেন এই মুখখানি যা দর্পণের অন্ধকারে ছেয়ে অচেনা হয়ে গেছে, তা তাঁর নিজেরই, বললেন, চিনতে পারছি।

এবারও চিনতে পারছেন?

তন্ময় রাজা দেখলেন না অন্ধকার থেকে দর্পণ সরে গেছে, বললেন, হ্যাঁ।

ভিনদেশী যুবক হাসে, দর্পণই নেই, কোথায় কী দেখবেন মহারাজ, আসলে মানুষ যা মনে মনে ভেবে রাখে তাই-ই যেন দ্যাখে দর্পণে, তা সেই দর্পণ স্থির জল হোক বা উজ্জ্বল ধাতব পাত হোক, বা হোক নীরন্ধ্র অন্ধকার, আপনি আপনার বিশ্বাস থেকে যা বলছেন তা শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে থাকবে না, মহারাজ এই যে দীর্ঘদিনের অনাবৃষ্টি, এর কারণ কী?

জানি না, তুমি কি সত্যিই বৃষ্টি নামাতে পার, ঐন্দ্রজালিক?

ভিনদেশী বলল, প্রকৃতি নির্দয়া হয়েছেন, আবার সদয়াও হয়ে উঠবেন প্রকৃতি, বহুদিকে বৃষ্টি নেই মহারাজ, আমি যেতে যেতে দেখেছিলাম সবুজ বন, সবুজ পৃথিবী, শস্য শ্যামলা মাটি, ফিরতে ফিরতে দেখেছি সব বদলে গেছে, পুড়ছে সব, মহারাজ আপনি বিপন্ন।

রাজা ভর্তৃহরি অন্ধকারে চেয়ে আছেন। শেষে যে কথাটি শুনেছেন তার আবছা আন্দাজ ছিল তাঁর ভিতরে, কিন্তু উজ্জয়িনীতে যা কখনো হয়নি, তা যে হয়ে উঠতে পারে না এই বিশ্বাস তাঁর আছে। ছিল। রাজা কেন বিপন্ন হবেন? রাজার কাজ তো বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করা। ভিনদেশী আক্রমণ ব্যতীত উজ্জয়িনীর সিংহাসন কখনোই বিপন্ন হতে পারে না।

ভিনদেশী আক্রমণ? রাজা জিজ্ঞেস করলেন, কোনো বর্বরজাতি প্রবেশ করছে এই দেশে?

না, আপনার বৈমাত্রেয় অনুজ, তিনিই উজ্জয়িনীর আকাশের নতুন তারা।

রাজা তো জানা কথাই যেন জানলেন, বললেন, জ্যোতির্বিদরা তো এই কথা বলেনি।

বলেনি, কিন্তু সত্য হলো এই, মহারাজ প্রাকৃতিক এই দুর্বিপাক ভয়ানক আকার ধারণ করেছে, দুর্ভিক্ষ লেগে গেছে, ক'দিন পর দেখতে পাবেন ক্ষুধার্ত মানুষ প্রবেশ করছে নগরে, বহুদিন ধরে অজন্মা চলছে, এই দুর্বিপাক থেকে রক্ষা করতে হবে দেশকে।

বৃষ্টি আসুক, প্রকৃতি যদি নির্দয়া হন, আমি কী করব?

মহারাজ তা কি কেউ জানে না, কিন্তু মানুষ তো রাজাকেই বিশ্বাস করে, ভাবে তিনি সব পারেন, আপনার বৈমাত্রেয় অনুজ রাজ্যকে রক্ষা করতে সিংহাসন অধিকার করবেন আজ কিংবা কাল, যে কোনোদিন, যে কোনো মুহূর্তে।

রাজা ভর্তৃহরি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন, অনেকক্ষণ বিড়বিড় করে বললেন, সেই জন্য কি গণিকা হত্যা?

হ্যাঁ, আপনার তো সব জানা, কলঙ্কিত রাজার পক্ষে দাঁড়াবে কে?

জানি, কিন্তু নগর পুড়ছে বলে আমি কঠোর হয়ে উঠতে পারছি না, তুমি সত্যই বলেছ, আমার নিজের মনে হচ্ছে এই অনাবৃষ্টির হাত থেকে দেশকে রক্ষা না করতে পারা বোধ হয় আমারই ব্যর্থতা,

নিজেরই যদি এমন মনে হয় তবে নগরবাসী কেন ভাববে না আমার জন্যই এই দীর্ঘ অনাবৃষ্টি।

মহারাজ সেনাবাহিনী আপনার বিপক্ষে, নগরবাসী চায় বৃষ্টি, তারা জানেনা কীভাবে বৃষ্টি আসতে পারে, ভাবছে আপনার অপসারণ হয়ত সেই সম্ভাবনাকে জাগাতে পারে, তাই নগরবাসী কোনো কথা বলবে না, যারা বলবে তাদের শির ছিন্ন হয়ে যাবে, বিপদের সময় কুটো ধরেও বাঁচতে চায় মানুষ, তারা মনে করছে রাজা সরে গেলেই হয়ত বিপদ কেটে যেতে পারে, বৃষ্টি আসবে।

রাজার দুচোখ সজল হলো। অন্ধকারে নিঃশব্দ বৃষ্টির মতো রাজার দুচোখ থেকে জল ঝরে যেতে লাগল। তখন ভিনদেশী বলল, মানুষের ভাবনা এই নগরে একরকম, আর দূরগাঁয়ে অন্যরকম, মহারাজ কালামুখীর গাঁয়ের মানুষ জানত না তাদের কোনো রাজা আছে, অথচ সেই গ্রামটি আপনার রাজ্য-সীমার ভিতরে, তারাও পুড়ছে অনাবৃষ্টিতে, কিন্তু বিশ্বাস করে তাদের পাপেই রাজার এই দুর্গতি, তারা নিষাদ চণ্ডাল, তারা তাদের রাজার জন্য কুমারী কন্যা, স্বাস্থ্যবান নীরোগ গো-বৎস, উপযুক্ত মৃত্তিকা নিয়ে অপেক্ষা করছিল আচার্য বৃষভানুর কাছে রাজার সংবাদ পাওয়ার পর।

তারপর?

তারা আসছে।

কোথায় আসছে?

রাজার উদ্দেশে তারা যাত্রা শুরু করে এসে পৌঁছল প্রায় এই নগরে, তারা বলছে রাজা যদি নগর ছেড়ে, রাজধানী ছেড়ে কালামুখীর গাঁয়ে গিয়ে কালামুখী কন্যার কুমারীত্ব গ্রহণ করেন, পাণিগ্রহণ করেন, তবে অনাবৃষ্টির কাল শেষ হবে, গো-বৎস রাজাকে বীর্যবান করবে, পবিত্র কুমারী কন্যা নিষাদ জাতির ভিতরেই আছে।

রাজা ভর্তৃহরি বুঝতে পারছিলেন রাজার বসবাস কত না অন্ধকারে!

চুরাশী

রাজা ভর্তৃহরি বললেন, এই প্রথম বুঝতে পারছি রাজাই সবচেয়ে বেশি অজ্ঞানতা ধারণ করেন।

হয়ত সত্য নয়, তবে রাজাই সবচেয়ে অন্ধকারে হয়ত চলে যান।

কেন?

রাজ্যশাসনের রীতি হয়ত তাই, যত ক্ষমতা তত অজ্ঞানতা, ক্ষমতাই অজ্ঞানতার জন্ম দেয়।

কী করে এমন হয়?

ভিনদেশী বলল, অন্ধকারে গিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে চান, না হলে শিপ্রা তীরে শেষকৃত্য হলো আচার্যর, রাজা জানলেন না, আচার্য নিরালম্ব হয়ে মহাপ্রান্তরে একা একা মৃত্যু বরণ করলেন, শৃগাল, শকুনের খাদ্য হলো তাঁর দেহ, রাজা জানলেন না, যে গুণবতী রমণী শুধু যেতে চেয়েছিল নিজের পিতৃভূমি বাহ্লিক দেশে, সে হত হলো বিনা কারণে, কামান্ধ পুরুষ তাকে শেষ করল, রাজা জানলেন না, রাজা জানলেন না কেনই বা সেই হত্যার দায় তাঁর কাঁধে চেপে গেল, রাজা জানলেন না তাঁর সৈনিক পুত্রি কীভাবে তাঁর কর্মচারী দ্বারা নিগৃহীত হয়, কী ভাবে শূদ্রপল্লীর পুরুষগুলি বন্দি হয়ে থাকে অনাবৃষ্টির বিপক্ষে দাঁড়ানোর কারণে—অথচ এসব নগরবাসী জানে।

রাজা ভর্তৃহরি মাথা নামালেন।

ভিনদেশী পুরুষ বলল, শ্রেষ্ঠীর দাস ছিল পবিত্র পাহাড়ি বালক, তাকে কেনই বা নিষ্ঠুর করে গড়ে তোলা হয়েছিল, রাজার অজ্ঞাত, কেনই বা সে অগ্নিদগ্ধ করল শূদ্রপল্লী, কেনই বা তাকে নিষ্ঠুরতম উপায়ে দগ্ধ করা হলো, রাজার সেনাপতি জানেন অথচ রাজা জানেন না।

রাজা ভর্তৃহরি বললেন, অনাবৃষ্টি আমাকে এমন করে তুলেছে।

ভিনদেশী পুরুষ বলল, অনাবৃষ্টির বিপক্ষে দাঁড়ানোর কথা তো রাজা ভাবেননি কখনো।

জানি না কী ভাবে দাঁড়াতে পারতাম।

রাজা জানেন না, শূদ্রপল্লীর সামান্য মানুষও জানে।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে জানে, রাজা তো সরোবর খনন করতে যাবেন না, তুমি কি সেই কথা বলতে চাও?

না, এই নগরে যখন শ্রেষ্ঠী আহত করে পথের ধারে রক্তাক্ত এক যুবককে ফেলে রেখে দেন, উতঙ্কের ভয়ে কেউ তাকে বাঁচাতে যায়নি, শূদ্রপল্লীর মানুষ তাকে আশ্রয় দেয়, সেবা করে বাঁচিয়ে তোলে।

রাজা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন অন্ধকারে। যুবকটি কে? কে এই ভিনদেশী? একি সেই দশার্ণ দেশীয় যুবক যে আচার্যর আশ্রমে এসেছিল শিক্ষার্থী হয়ে, যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর কয়েকবার, এই শিপ্রা তীরেই? অন্ধকারে তার কথা মনে পড়ছে তাঁর। তিনি ফিসফিস করে বললেন, ওই ঘটনার কথা আমি জানি না, তুমি কে?

আমি এক ভবঘুরে, দক্ষিণ সমুদ্র থেকে হিমালয় পর্যন্ত আমার দেশ, পূর্বাচল থেকে দূর গান্ধার, পুরুষপুর, বাহ্লিকদেশ, অক্সাসনদী, আরো উত্তরে উরাল হ্রদ।

রাজা ভর্তৃহরি অবাক হয়ে ভবঘুরে ভিনদেশীর কথা শুনছেন। এখন মনে হচ্ছে হতে পারে মানুষটা ঐন্দ্রজালিক। সম্মোহনকারী। তিনি সজাগ হয়ে উঠতে চাইলেন, সচেতন হয়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করলেন, রাজা কীভাবে অনাবৃষ্টির বিপক্ষে দাঁড়াতে পারেন?

সৈনিকপত্নি বিপন্ন হলে তাকে রক্ষা করবেন, গণিকাদের রক্ষা করবেন, নিরপরাধ মানুষকে রক্ষা করবেন, শূদ্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখবেন, বিপন্নের পাশে দাঁড়ানই অনাবৃষ্টি প্রতিরোধ।

রাজা ভর্তৃহরি মাথা নামিয়েছেন, ধীরে ধীরে বললেন, রাজা এই দীর্ঘদিনের অনাবৃষ্টির জন্য রাজ্য শাসনে মন দেননি, মনে মনে নিজেকে দায়ী করেছেন এই অজন্মা, দুর্ভিক্ষর জন্য।

ভিনদেশী বলল, রাজা যদি সজাগ থাকতেন, যা যা ঘটেছে নগরে তা যদি না ঘটত তবে অনাবৃষ্টির ভয় এমন ভয়ানকভাবে ছেয়ে ফেলত না দশদিক।

রাজা ভর্তৃহরি নিশ্চুপ হয়ে থাকেন। আকাশে তাকান। চন্দ্রোদয় হতে এখনো অনেক দেরি মনে হয়। তার আগেই প্রাসাদে ফিরতে হবে। তাঁর ভয় করছে। মনে হচ্ছে অন্ধকারে যেন নিজের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন তিনি। মায়া দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। তিনি আকাশের একটি তারাকে অন্তত চিনে নিতে চাইছিলেন। কিন্তু চিনতে পারছিলেন না। সব তাঁর কাছে এলোমেলো হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে আকাশের তারারা স্থান বদল করে যে যেখানে পারে চলে গেছে। সপ্তর্ষি মণ্ডলের সাতটি তারা আকাশের সাতদিকে চলে গেছে বোধহয়। দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টি হলে এমনও হয়ে থাকে হয়ত। রাজা বললেন, আমাকে ফিরতে হবে।

মহারাজ আপনি কোথায় ফিরবেন, এতক্ষণে হয়ত রাজপ্রাসাদ অধিকার করে নিয়েছে আপনার অনুজ, প্রধান সেনাপতি বিক্রম, রানী আছেন তাঁর সঙ্গে, মহারাজ আমি আপনাকে বাঁচাতে নিয়ে এসেছি এইস্থানে, আপনি সিংহাসন এবং প্রাসাদ ত্যাগ করে এসেছেন মনে করুন।

রক্তের ভিতরে আগুন ধরে যায় যেন। চঞ্চল হয়ে ওঠেন রাজপুরুষ। তিনি উঠে দাঁড়ালেন ক্রুদ্ধ সিংহের মতো, গরগর করে উঠলেন, তোমার কী স্পর্ধা, উজ্জয়িনীর অধীশ্বরকে বাঁচাবার কথা ভাবতে পার, আমি প্রাসাদে ফিরব।

ভিনদেশী বলল, হত হবেন।

মৃত্যুতে আমার ভয় নেই।

ভিনদেশী বলল, কালামুখী গাঁয়ের মানুষ, নিষাদেরা তো আসছে এখানে, তারা তাদের রাজাকে বরণ করে নিয়ে যাবে, আহারের জন্য নীরোগ স্বাস্থ্যবান গো-বৎস আছে, কুমারী কন্যা আছে মিলনের জন্য, আছে উর্বর মৃত্তিকা, তারা জানে রাজা না গেলে তাদের গাঁয়ে বর্ষা নামবে না, আপনি কোথায় ফিরবেন রাজাধিরাজ ভর্তৃহরি, আপনি প্রাসাদে ফিরে গেলে কালামুখী গাঁয়ের মানুষ যে নিঃস্ব হয়ে ফিরে যাবে, আর একটি কথা, রাজার প্রাণ যদি প্রাসাদে যায়, নতুন রাজা তো বসবেন সিংহাসনে, কিন্তু রাজা ভর্তৃহরির প্রাণের মায়া যে আমার কাছে অনেক প্রভু, নিষাদেরা জানত না তাদের কোনো রাজা আছে, তারা বলছে তারা রাজাকে তাদের দেশ চেনাবে, মেঘ, মৃত্তিকা, অরণ্য, নদী, মানুষের দুঃখ, মানুষের সুখ বেঁচে থাকা, প্রেম, প্রেমহীনতা, সফলতা, ব্যর্থতা....।

অভিভূত হয়েছেন রাজা ভর্তৃহরি, ধীরে ধীরে বললেন, আমি সিংহাসন ছেড়ে নিষাদের গাঁয়ে তাদের সঙ্গে চলে যেতে পারি, তাতে কি বাঁচবে আমার সোনার অবন্তী দেশ, সোনার উজ্জয়িনী?

ভিনদেশী পুরুষ এখন নিশ্চুপ। থমথম করছিল সব দিক। তখন রাজা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি সত্য

করে বলো, তুমি কে?

ভিনদেশী পুরুষ এবার আর জবাব দিল না। রাজার মনে হচ্ছিল মানুষটি যেন তাঁর অচেনা নয়। এ যেন প্রায় সেই দশার্ণদেশীয় যুবকটির মতো, কিন্তু সে নয়। তাহলে এ কে? একমাত্র সেই তাঁকে এমনভাবে মোহিত করেছিল একদিন এইখানে।

রাজা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে, সত্য করে বলো।

আমি এক ভবঘুরে।

বিশ্বাস করি না, তুমি কি বৃষ্টি নামাতে জাননা সত্যি, তুমি কি ঐন্দ্রজালিক নও সত্যি? যদি ইন্দ্রজাল জানো তবে তা দিয়েই বৃষ্টির মায়ায় ভোলাও নগরবাসীকে। নগরবাসী এখন হয়ত ঘুমের ভিতরে আছে, ঘুমের ভিতরে শুনুক তারা মেঘের ডাক, বর্ষার শব্দ, বাদল বাতাসের বয়ে যাওয়া, সবদিক ভেসে যাক জলে—এমন সত্য তুমি তৈরি করো হে ঐন্দ্রজালিক।

ভিনদেশী পুরুষ বলল, মহারাজ, যখন ইন্দ্রজালের সত্য ফুরিয়ে যাবে, তখন তো মানুষ জানবে রাজা মিথ্যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন।

রাজা ভর্তৃহরি আবার মুখ নিচু করলেন, অস্ফুট গলায় বললেন, ইন্দ্রজালের মায়াতেই রাজা ভুলিয়ে রাখেন নগরবাসীকে, রাজ্যের অন্যান্য দিকের মানুষ তো রাজার খবরই জানে না, ইন্দ্রজাল যখন ফুরিয়ে আসে, রাজার জীবনও শেষ হয়ে আসে প্রায়, না হয় তিনি সিংহাসন হারান, আমার এমন দুর্ভাগ্য যে আমি ইন্দ্রজালও বিস্তার করতে পারিনি, আমি এক ব্যর্থ মানুষ, কিন্তু তুমি তোমার পরিচয় দাও, তোমাকে আমার অচেনা মনে হচ্ছে না।

একটু গুটিয়ে গেল যেন ভিনদেশী, বলল, আমি অচেনাই।

না, তোমাকে আমি চিনি, অনাবৃষ্টি আমার স্মৃতিভ্রম ঘটিয়ে যাচ্ছে সর্বসময়, বিচার-বোধ নষ্ট করে দিচ্ছে অনুক্ষণ, তুমি কে?

ভিনদেশী চুপ করে থাকে, তারপর বলল, আমার কোনো পরিচয় নেই।

পরিচয়হীন মানুষ, তা কী করে হয়?

ভিনদেশী পুরুষ বলল, এই অনাবৃষ্টি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছে মহারাজ, এই অনাবৃষ্টিতেই আমার জন্ম ধরে নিতে পারেন, এই অজন্মার ভিতরে আমি জন্মেছি ভেবে নিতে পারেন, আমার মনে হয় আমিই যেন অন্য কোনো মানুষের প্রতিনিধি, যে মানুষ দেখেছিল বর্ষার মেঘ, বৃষ্টি, ফসল.....।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, প্রাঞ্জল করে বলো।

ভিনদেশী বলল, আমার পরিচয় শুনে কী হবে মহারাজ, আমি এক সামান্য মানুষ, পূর্বজন্মে এই নগরে জন্ম হয়েছিল, আমার পিতা বাণিজ্য করতেন, শিশুকালেই আমি পিতৃমাতৃহীন, পূর্বজন্মের কথা মনে পড়লে বুক এখনো কেঁপে যায়, আমি মনে রাখতে চাই না, কিন্তু তা আমার পিছু পিছু ছায়ার মতো অনুসরণ করে।

তারপর?

আমি এক অপমানিত পুরুষ, আমি নিজেও প্রত্যাখ্যান করেছিলাম আমার অনুরাগিনীকে নিঃশব্দে, মহারাজ সবই যেন গত জন্মের কথা, সেই অপমানের পর নগর ছেড়ে যাই, আত্মহননে যখন নেমেছি গম্ভীরার দহে, দেবী সরস্বতী আমার সামনে আবির্ভূত হন......।

ধ্রুবপুত্র বলছিল, রাজা শুনছিলেন। তখন বহুদূরে, দশার্ণগামী একদল যাত্রীর সঙ্গে তাম্রধ্বজ গন্ধবতী আশ্রয় নিয়েছিল এক প্রাচীন বটের নীচে। যাত্রীরা আলাপ করছিল কেউ কেউ, কেউ আয়োজন করছিল রান্নার, তাম্রধ্বজ গন্ধবতীর হাত ধরে একটু দূরে এক শীর্ণ নদীর সামনে গিয়ে বসেছিল। রাতে ধরা যায় না, দিনমানে কী হয়ে যায় এই সমস্ত অঞ্চল। রোদে পুড়ে মৃত্তিকা আকাশ সবই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যেন।

অনেকদিন বাদে দু'জনে নিঃশঙ্ক হয়েছে। ভয় ছিল সদ্য সেনাবাহিনীর একটি অংশে আধিপত্য পাওয়া উদ্ধব না ছুটে আসে তাদের পিছনে পিছনে। নারী লুণ্ঠন তো স্বাভাবিক ব্যাপার সেনাবাহিনীর কাছে।

তাম্রধ্বজ এতদিন বাদে নিশ্চিন্ত, নির্ভয়, গন্ধবতীর কাছে ঝুঁকে এসে বলল, দেখতে পাও অরুন্ধতী তারাকে?

শিহরিত হলো। গন্ধবতীর উরু স্পর্শ করেছে তাম্রধ্বজ। গন্ধবতী চঞ্চল হলো। তাম্রধ্বজ তার স্তন ছুঁয়েছে। গন্ধবতী উতলা হলো। ঘুরে দুটি হাত বাড়িয়ে আকর্ষণ করেছে তাম্রধ্বজকে, কর্ণকুহরে মুখ রেখে বলল, এসো।

তাম্রধ্বজের চোখের সামনে ভুলোক দ্যুলোক টলমল করতে লাগল। গন্ধবতীকে যেন বিপুল মনে হতে লাগল। অন্ধকারে অকর্ষিত মৃত্তিকার উপর গন্ধবতী তাকে উপুড় করে দিয়েছে। তাম্রধ্বজ আরো আকর্ষিত হতে থাকে। গন্ধবতী তার সমস্ত শরীর দিয়ে তাম্রধজকে গ্রহণ করতে করতে ফিসফিস করে, ওই দেখতে পাই সপ্তর্ষি, অরুন্ধতী, ওই যে ধ্রুবতারা, ওই যে......।

তখন রাজা ভর্তৃহরির কাছে ধ্রুবপুত্র আরো উন্মোচিত হতে থাকে। রাজা বললেন, এই যে অনাবৃষ্টি, এই অনাবৃষ্টির বিপক্ষে আমি কিছুই করতে পারিনি, কিন্তু তুমি যে এত কথা বলছ হে, তুমি তো জানই না কীভাবে বৃষ্টি আসতে পারে।

ধ্রুবপুত্র বলল, আমি সামান্য মানুষ, গম্ভীরার দহে দেবী সরস্বতী আমাকে দেখা দিয়ে নতুন জন্ম দিয়েছেন, মহারাজ তারপর শুধু ঘুরেছি, দেখেছি কী ভাবে একটি সোনার দেশ রোদে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে, সবুজ পাতারা লাল হলো, কালি বর্ণ ধারণ করল, নরম মাটি পাথর হয়ে গেল, নদী সরোবর শুকিয়ে গেল, মানুষ নিষ্ঠুর হয়ে যেতে লাগল, প্রেম প্রীতি করুণা সব মুছে যেতে লাগল, কিন্তু তারই ভিতরে শূদ্রপল্লীর মানুষগুলি জলের সন্ধান করতে লাগল, অন্নজল ত্যাগ করল গ্রামবৃদ্ধ, মহারাজ কেন জানি না আমি বদলে যাচ্ছিলাম ভিতরে ভিতরে, যে অদ্ভুত আঁধার ঘিরে ধরছিল দশদিক তা থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজছিলাম, আমি বুঝতে পারছিলাম এসে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর এক অজন্মার দিন, মানুষের জন্মও হবে না এরপর, মানুষ ভুলে যাবে মানুষের জন্ম দিতে, নারী জানবেই না কীভাবে গর্ভধারণ করতে হয়, আমি তখন মানুষের জন্মের কথা ভাবতে লাগলাম, মনে পড়ে যেতে লাগল দেবাদিদেব মহাদেবের কথা, তাপসী উমার কথা, তাঁদের মিলনের রাত্রিগুলির কথা, কার্তিকেয়র জন্মকথা..।

আবিষ্ট হচ্ছিলেন রাজা ভর্তৃহরি। তিনি চোখ ফেরাতে পারছিলেন না অন্ধকার থেকে। অন্ধকার যেন কথা বলছে। এখন অন্ধকার মানে এই পৃথিবী, ঘুমের ভিতরে স্বপ্নের ইন্দ্রজালে যা ছেয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।

ধ্রুবপুত্র বলল, মহারাজ আমি সামান্য মানুষ, আমি এই প্রকৃতির নির্দয় রূপের বিপক্ষে কোন শাসনদণ্ড নিয়ে দাঁড়াব যা আছে রাজার, সামান্য মানুষ আর কী পারেন, তিনি পারেন তাঁর মনের ইচ্ছাগুলি প্রকাশ করতে, আমি চাই বৃষ্টি হোক, ফসল হোক, নারীপুরুষের মিলন হোক, মানুষ জন্মাক, কিন্তু এই অনাবৃষ্টিতো সমস্ত নারীকে করে দিয়েছে প্রোষিতভর্তৃকা, সমস্ত পুরুষ হয়ে গেছে নির্বাসিত যেন বা, কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে নির্বাসিত, কেউ বন্দিশালায় নির্বাসিত, কেউ নগর থেকে দূরে, জনশূন্য প্রান্তরে নির্বাসিত, কোনো এক কবি বুঝতে পেরেছিলেন বৃষ্টির মেঘই পারে এই নির্বাসন কালের অবসান ঘটাতে।

কে সে?

যে কবি পার্বতী আর মহাদেবের মিলনের রাত্রির কথা লিখেছিল, সেই কবিই রচনা করতে লাগলেন, মেঘের স্মৃতি নিয়ে শ্লোক, মহারাজ সেই কবি জেনেছেন এই নির্দয় প্রকৃতির বিপক্ষে দাঁড়াতে পারে তাঁর শ্লোক, তাঁর কাব্য, কবির কাজ তো সিংহাসনে বসে থাকা নয়, মানুষের পৃথিবীতে বেঁচে নিজের হৃদয়কে উন্মোচন করা, জন্ম থেকে আষাঢ়ের মেঘ দেখেছেন যে কবি, অনাবৃষ্টির কালে মেঘের স্মৃতিই তো জেগে উঠবে বারে বারে।

তুমিই কি সেই কবি?

অন্ধকার নীরব হয়ে থাকল, তারপর বলল, সেই কবি হয়ত এখন দশার্ণের পথে। সেই কবি হয়ত কালামুখীর গাঁয়ে নিষাদগৃহে, মগধে, কোশলে, পাটুলিপুত্রে, গঙ্গার কুলে রেবা নদীর তীরে, বেত্রবতীর কুলে, নীচৈঃ পাহাড়ের গুহায়, অলকাপুরীর পথে, রামগিরির কোলে, হয়ত অচেনা কোনো এক নদীতীরে মিলনের মধুরতায় আবিষ্ট ...।

রাজা ভর্তৃহরি বললেন, সেই কাব্য কোথায়?

কাব্য হয়েছে কিনা কবি জানে না, কবি রচনা করেছে বৃষ্টির মন্ত্র, যে মন্ত্রে বৃষ্টি নামতে পারে .....।

উঠেছে ভিনদেশী পুরুষ, ফিসফিস করে বলছে, কবি তো তাই পারে, অনাবৃষ্টির দিনে বৃষ্টির মন্ত্র রচনার চেষ্টাটুকু করতে পারে।

ভিতর থেকে দীপ নিয়ে এল পুরুষটি। দীপ রাখল সম্মুখে। তার পেটিকা থেকে বের করতে লাগল ভূর্জপত্র, দীপের আলোয় পাঠ আরম্ভের আগে সে বলল, মহারাজ, এই মন্ত্র সত্য হয় যেন, সত্য যেন হয়। কবি একেবারে থাকেননি, তিনি দাঁড়িয়েছেন এই অনাবৃষ্টির বিপক্ষে।

মন্ত্রপাঠ আরম্ভ হলো, ভিনদেশী না এই উজ্জয়িনীর—কে পড়ছে সেই মন্ত্র রাজা বুঝতে পারছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল অন্ধকার মৃত্তিকা থেকে কণ্ঠস্বর উঠে আসছে, তাঁর মনে হচ্ছিল, অন্ধকার আকাশ থেকে শব্দরা নেমে আসছিল, গাছের পাতারা পাঠ করছিল সেই আশ্চর্য মন্ত্র।

কশ্চিৎ কান্তা বিরহগুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগ মিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ। ....

মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল। আবিষ্ট রাজা বাক্যহারা হয়ে পড়ছিলেন। তিনি আকাশে তাকান। আশ্চর্য। মেঘের ডাক শুনতে পেলেন যেন। বাতাস যেন ঠাণ্ডা হলো। রাজা বহুমানুষের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন। নিষাদেরা আসছিল হয়ত কালামুখীর গাঁ থেকে, ঢাক বাজাতে বাজাতে। অথবা মেঘের গর্জনকে মানুষের পায়ের শব্দ ঢাকের শব্দ বলে ভ্রম হচ্ছিল তাঁর। রাজা বুঝতে পারছিলেন এই মন্ত্রের অপেক্ষায় ছিল প্রকৃতি, উজ্জয়িনী নগর, মহাকাল দেবতা। বৃষ্টিতে ভেজামাটির গন্ধ নাকে আসছিল তাঁর। তাঁর মনে হচ্ছিল ইন্দ্রজাল এত সত্য হতে পারে না। এই সত্য চিরসত্য।

তখন দূরে, নদীতীরে আকাশের নীচে প্রিয় সখা তাম্রধ্বজকে শরীরে গ্রহণ করতে করতে গন্ধবতী দেখতে পায় সপ্তর্ষি, অরুন্ধতী অদৃশ্য, আকাশের সব তারা ধীরে ধীরে ছেয়ে যাচ্ছে মেঘে। মেঘ! সত্যই মেঘ নাকি সে মিলনের সুখে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গন্ধবতী আর্তনাদ করে উঠল, দেখতে পাচ্ছ?

আমি তোমার চোখ দেখছি।
আকাশ অন্ধকার হয়ে এল।

মেঘ এল গন্ধবতী .....। তাম্রধ্বজ ফিসফিস করল, বৃষ্টি আসছে, কী আশ্চর্য, বৃষ্টি তাহলে এল।
